আমার জবানবন্দি

নির্মল সেন

www.nagorikpathagar.com

প্রখ্যাত সাংবাদিক, কলামিস্ট, লেখক, রাজনীতিক, মুক্তিযোদ্ধা নির্মল সেন ১৯৩০ সালের ৩ আগস্ট গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার দিঘীরপাড় গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। মাতা : লাবণ্যপ্রভা সেনগুপ্তা।

শৈশবকাল থেকেই নির্মল সেনের লেখালেখির হাত ছিলো। ৮ম শ্রেণীতে পড়ার সময় হাতে লেখা 'কমরেড' পত্রিকায় লিখতেন। ১৯৪৪ সালে কলসকাঠি বি এম একাডেমি থেকে প্রবেশিকা (এসএসসি) পাস করে আইএসসিতে ভর্তি হন বরিশালের বিএম কলেজে। এখানে এসে পরিচয় ঘটে আজকের বিখ্যাত সাংবাদিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, এবিএম মূসার সাথে। ১৯৪৬ সালে আইএসসি পাস করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে মা ভাইবোন সবাই চলে যান ভারতে। তিনি থেকে যান তার নিজ দেশে। ১৯৪৮ সালে বিএসসি পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলন করতে গিয়ে রাজবন্দি হিসেবে গ্রেফতার হন। ৪ বছর জেলে থাকার পর ছাড়া পান ১৯৫৩ সালে। জেলখানা থেকে বিএসসি পরীক্ষা দিতে না পারায় পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে বিএ পাস করেন, তাও জেলখানা থেকে। ১৯৫৬ সালে যুক্ত হন সাংবাদিকতায়। কাজ শুরু করেন দৈনিক জেহাদে। ১৯৬১ সালে *ইত্তেফাক* পত্রিকায় সহকারি সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স করেন। এরপর ১৯৬৪ সালে *দৈনিক পাকিস্তান*, পরবর্তীতে *দৈনিক বাংলা* পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। প্রেস ট্রাস্টের এই পত্রিকাটি ১৯৯৭ সালে বন্ধ হওয়ার দিন পর্যন্ত নির্মল সেন এই পত্রিকায় সহকারি সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭২-৭৩ সালে নির্মল সেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও ১৯৭২-৭৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবের আজীবন সদস্য। আশির দশকে প্রায় আট বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অতিথি শিক্ষক ছিলেন।

নির্মল সেন বিভিন্ন সময়ে ভারত, জার্মান, রাশিয়া, হাঙ্গেরি, নেপাল, যুগশ্লাভকিয়া, চেকশ্লাভকিয়া ভ্রমণ করেছেন। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে লন্ডন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, চীন ভ্রমণ করেছেন।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : মানুষ সমাজ রাষ্ট্র, বার্লিন থেকে মস্কো, পূর্ববঙ্গ-পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশ, মা জন্মভূমি, লেনিন থেকে গর্বাচেভ, আমার জবানবন্দি, স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই, আমার জীবনে '৭১ এর যুদ্ধ।

www.nagorikpathagar.com

আমার জবানবন্দি। এটি নির্মল সেনের আত্মজীবনী নয়। তবে তার এ লেখার মধ্যে আত্মজীবনীর একটি ছায়া পাওয়া যাবে। পাওয়া যাবে পুরো পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক বাস্তবতার চিত্র এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতীয় উপমহাদেশের তথা বিশ্বরাজনীতির একটি চলমান চিত্র বা ঘটনাপুঞ্জি। একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক রাজনীতিকের চোখে সেই সময়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। আমাদের মাঝে যে বাস্তবতায় মুক্তিযুদ্ধ এসেছিল তার নানামাত্রিক ব্যাখ্যা এবং কঠোর কঠিন এক বাস্তবতার কথা নিজস্ব চিন্তায় তুলে ধরেছেন লেখক।

পাকিস্তান আমলের সামরিকতন্ত্র আর মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা তিনি যেভাবে দেখেছেন তা বোধকরি এভাবে এর আগে কেউ ব্যাখ্যা করার সাহস দেখাননি। সময় এবং ঘটনা তিনি যেভাবে অকাট্য যুক্তি, অকপট স্বীকারোক্তি এবং কঠিন বাস্তবতাকে একজন রাজনীতিকের চোখে ব্যাখ্যা করেছেন তা কেবল তার পক্ষেই সম্ভব। স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতাকে তিনি যেভাবে সাহস করে তার কলমে তুলে ধরেছেন তা দ্বিতীয় কেউ পারেননি। তার এ লেখা এককথায় বিগত শতাব্দীর উপমহাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ও তার ইতিহাস এবং বাস্তবতার এক অখণ্ড দলিল; যেখানে প্রকাশ পেয়েছে জন্মভূমি বাংলাদেশের প্রতি আজন্ম দায়বদ্ধ থাকা একজন রাজনীতিকের তীব্র হাহাকার।

প্রচ্ছদ : সমর মজুমদার

www.nagorikpathagar.com

আমার জবানবন্দি

www.nagorikpathagar.com

www.nagorikpathagar.com

আমার জবানবন্দি

নির্মল সেন

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

www.nagorikpathagar.com

আমার জবানবন্দি
আত্মজীবনী
নির্মল সেন

স্বত্ব
লেখক

প্রথম ইত্যাদি সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

অক্ষরবিন্যাস
বন্ধু কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

মূল্য
৭০০ টাকা

ISBN : 984 70289 0238 8

www.nagorikpathagar.com

উৎসর্গ

বাবা

সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মা

লাবণ্যপ্রভা সেনগুপ্তা

www.nagorikpathagar.com

www.nagorikpathagar.com

মুখবন্ধ

প্রায় এক দশক ধরে আমি অসুস্থ। এখন আমি আমার গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় থাকি। শুনতে পারি, বুঝতে পারি, কিন্তু লিখতে পারি না। চোখে দেখি না। আমার কথা আমার একান্ত কাছের স্বজনেরা ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না। এ অবস্থার মধ্যেও নানাজন তাগিদ দেয় কিছু একটা লিখবার। এ কাজে আমাকে এখন সহযোগিতা করে আমার ভাইয়ের ছেলে কংকন সেন ও আমার পড়শি স্থানীয় সাংবাদিক মিজানুর রহমান বুলু। অসুস্থ হওয়ার আগে ঢাকায় থাকতে এ কাজে সহযোগিতা করতো সাংবাদিক হোসেন শহীদ মজনু এবং প্রশান্ত অধিকারী।

আমার জবানবন্দি বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলাম ২০০০ সালে। তারও আগে বিভিন্ন ম্যাগাজিনে এই বইয়ের কিছু লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল সাংবাদিক দীপঙ্কর গৌতমের সহযোগিতায়। সর্বশেষ কাজটি যখন করছিলাম তখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তাই কাজটি আর এগোয়নি। ফলে যেভাবে পাণ্ডুলিপিটি ছিল সেভাবেই তরফদার প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মাহবুব আলম বইটি প্রকাশ করে। সেখানে নানা ভুলত্রুটি ছিল। পরবর্তীতে আমার এক সময়ের সার্বক্ষণিক সহযোগী প্রশান্ত অধিকারীর সহযোগিতায় *ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ*-এর স্বত্বাধিকারী জহিরুল আবেদীন জুয়েল ও আদিত্য অন্তর বইটি প্রকাশের আগ্রহ দেখায়। তারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছে বইটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের। আমি তাদের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক যদি বইটি পড়ে সেকালের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারেন এবং জানতে পারেন সে সময়ের ইতিহাস সে লক্ষ্যেই আমার এ প্রয়াস। এ লেখায় আমার অনেক রাজনৈতিক ও সাংবাদিক বন্ধুদের কথা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছি। অনেকে মনে করতে পারেন আমি তাদের সমালোচনা করেছি। আসলে তা নয়। এটা একান্তই আমার রাজনৈতিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত মতামতের বহির্প্রকাশ। আশা করি এ নিয়ে আমার বন্ধুরা ভুল বুঝবেন না।

নির্মল সেন

দিঘীরপাড়, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
৩১ জানুয়ারি ২০১২

www.nagorikpathagar.com

www.nagorikpathagar.com

আজকে অনেকে আমাকে সাংবাদিক বলে চেনে। অথচ সাংবাদিক হবার কোনোই কথা ছিল না। ভবিষ্যতে কী হব সে নিয়ে এমন কোনো চিন্তা-ভাবনা শৈশবে ছিল না। বাবার এক খুড়তুতো ভাই ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন, এক সময় হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড-এর সম্পাদক ছিলেন। সেই সূত্রে সাংবাদিকতা সম্পর্কে কৌতূহল ছিল স্কুল জীবন থেকে। কাকা বাড়ি এলে অসংখ্য পত্রিকা আসত। আমরাও কখনো কখনো হাতে লিখে কাগজ বের করতাম। তবে সে পটভূমিও আমাকে সাংবাদিক বানায়নি।

আমাদের গ্রামে মোটামুটি একটি ভালো লাইব্রেরি ছিল। যেখানে শ'তিনেক ভালো ভালো বই ছিল। ঐ লাইব্রেরি চালাতে গিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের কোপানলে পড়লেন আমার এক কাকা। আমার এক বোনকে পুলিশ ডেকে নিয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের নটির পূজা ও রক্তকরবী পড়ার জন্যে। তখন থেকেই কিছুটা ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব জন্ম নেয়। তবে তাও খুব একটা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

নানা কারণে আমার বাড়িতে থেকে পড়ালেখা হয়নি। পাঠশালায় পড়া শেষ করে আমি ভর্তি হয়েছিলাম গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এই স্কুলটি আজকের টুঙ্গিপাড়া থানায় অবস্থিত। কাকারা সেখানে ডাক্তারি করতেন। ঐ স্কুলের শিক্ষকদের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানও লেখাপড়া করেছেন। টুঙ্গিপাড়ার পাটগাতিতে অবস্থান করার জন্যে শেখ সাহেবদের পরিবারের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তবে সে ছিল একান্তই পারিবারিক আত্মীয়তা, এর সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক ছিল না।

আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন। বইও লিখতেন। হঠাৎ বই লেখার জন্যে তিনি ১৯৩৯ সালে ঢাকায় আসেন। আমিও ঢাকায় এলাম। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছিল যুদ্ধ নিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরুর মতৈক্য হচ্ছে না। এ সময়

www.nagorikpathagar.com

সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েও সভাপতির পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র বসু ঢাকায় আসেন। আমাদের বাসা ছিল তৎকালীন দয়াগঞ্জ রোডে। ১৩ নম্বর বাড়িতে আমরা থাকতাম। একদিন দেখলাম সুভাষচন্দ্র বসুর মিছিল যাচ্ছে। তিনি যাচ্ছিলেন শক্তি ঔষধালয় দেখতে। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে তিনি মিছিল করে গেলেন। এর পরে ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ঢাকায় তখন যুদ্ধের খবর নিয়ে প্রতিদিন একটি টেলিগ্রাম বের হতো। টেলিগ্রামটির নাম ছিল 'অবন্তিকা'।

যুদ্ধের জন্যে আমরা ঢাকা থেকে বাড়ি চলে যাই। বাড়িতে পড়াশোনা হলো না। সেই কাহিনী আমার জীবনের গল্পের মতো। হঠাৎ একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে ডেকে তুললেন মা। বাড়ির প্রায় সকলে ঘুমিয়ে। মা বললেন, হাত-মুখ ধুয়ে নাও। বিকেলে বরিশালের কলসকাঠি যেতে হবে। বাড়িতে পড়া হবে না। দূরে দেখলাম দাঁড়িয়ে নৌকার মাঝি। মাঝির মাথায় আমার স্যুটকেস।

আমার চোখে জল আসছিল। আগের রাতে বাড়িতে নাটক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর। আমি অভিনয় করেছি। ভেবেছি ভোরবেলা সকলের সাথে দেখাশুনা হবে। শুনব নিজের অভিনয়ের কথা। না, সব ভেস্তে গেল। মার হাতে নারকেল তেল। মা বললেন, মুখে তোমার নাটকের মেক-আপ আছে। মুখে নারকেল তেল মাখো। তারপর মুখ ধুয়ে ফেলো। আমার চোখে জল। আমি কলের পুতুলের মতো সব করলাম। তারপর রওনা হলাম। বাড়ির সামনে সড়ক। তারপর সুবিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের পরে কচুরিপানা। এখানে নৌকা। নৌকা যাবে স্টিমার স্টেশন পাটগাতি। স্টিমার আসবে খুলনা থেকে। ঐ স্টিমারে আমাকে বরিশাল যেতে হবে।

আমি হাঁটছি আর হাঁটছি। পিছনে তাকাচ্ছি। শ্বেতশুভ্র কাপড়ে আমার মা তাকিয়ে আছেন, এক সময় চোখের কোণ থেকে মা হারিয়ে গেলেন। আমি নৌকায় উঠলাম। সেদিন যেমন করে বাড়ি ছেড়েছিলাম, তেমন করে আর আমার বাড়ি ফেরা হলো না।

চলে গেলাম বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার কলসকাঠিতে। ভর্তি হলাম কলসকাঠি বরদাকান্ত মুক্তাকেশী একাডেমিতে। এই কলসকাঠিতে এসেই হয়তো আমার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হয়ে গেল। স্কুল জীবন থেকেই ধারণা ছিল বড় একটা কিছু হতে হবে। অনেক সময় ভেবেছি ভালো শিক্ষক হব, গবেষক হব। একটির পর একটি বিষয়ে থিসিস করব এবং ডক্টরেট হব।

www.nagorikpathagar.com

কাকা ডক্টরেট বলে ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল ডক্টরেট হতেই হবে। সুবোধ বালকের মতো লেখাপড়া করতে হবে এবং শিক্ষাবিদ হিসাবে খ্যাতি লাভ করতে হবে। কিন্তু কলসকাঠিতে এসে সবই যেন পাল্টে গেল।

এই কলসকাঠির একটি ইতিহাস আছে। কলসকাঠিতে এক সময় স্টিমার স্টেশন ছিল। ইংরেজিতে স্টেশনের নাম ছিল কলুষকাঠি। তাহলে কি কলসকাঠিতে কলুষিত হবার মতো কোনো ঘটনা ঘটেছিল? কলসকাঠিতে ১৩ ঘর জমিদার ছিল। জমিদারদের বাগানবাড়ি ছিল, ছিল ছোটখাটো চিড়িয়াখানাও। আজ থেকে এক-দেড়শ' বছর আগে প্রিন্টিং প্রেস ছিল। এই জমিদারদের অনেক ভবনের কক্ষের সংখ্যা কোনোদিনই হিসাব করা যায়নি। অনেক জমিদারের বাড়ির ভেতরে ছোট ছোট পিলার আছে। লোকে বলে প্রজাদের ধরে এনে খুন করে রাতারাতি কবর দিয়ে ঐ পিলার তৈরি করা হয়েছে। তবে এই জমিদারেরা লোক দেখানো জনকল্যাণের জন্যেও কিছু কিছু কাজ করেছে। স্কুল করেছে নিজ খরচে। ডাকঘর দিয়েছে। গ্রামে ইট বিছানো সড়ক করেছে। তবে আমি যখন কলসকাঠিতে গিয়েছি তখন সবকিছুই অতীতের স্মৃতি মাত্র।

কলসকাঠির একটি ঐতিহ্য ছিল। এই ঐতিহ্য হচ্ছে রাজনীতির। কংগ্রেসের প্রথম যুগে গ্রাম গ্রামান্তরে নেতা ছিলেন জমিদার শ্রেণির লোক। এক শ্রেণির জমিদার ও তহশিলদার কংগ্রেসকে সহযোগিতা করত এবং অর্থ যোগাত। জমিদার সন্তানেরা নির্বিরোধ বিলাসী জীবনযাপন করত। রাজনীতি করায় তাদের খুব অসুবিধা ছিল না। এছাড়াও ছিল এ সকল এলাকায় এককালের গুপ্ত বিপ্লবী দলের প্রভাব। তখন কমিউনিস্ট পার্টিও গঠিত হয়েছে ঐ এলাকায়। কলসকাঠি স্কুলে ভর্তি হয়ে আমার প্রথম দেখা হলো ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্রদের সাথে। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ওদের সাথে যখন আমার দেখা হলো, তখন সুভাষচন্দ্র বসু এক রহস্যময় পুরুষ। তিনি ভারত থেকে ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছেন জার্মানিতে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে নতুন সেনাবাহিনী গড়বেন এবং ভারতকে স্বাধীন করবেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই সুভাষচন্দ্র বসু দেশ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধের প্রথম দিকেই ব্রিটিশকে আঘাত করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু গান্ধী ও নেহেরু সে প্রস্তাবে রাজি হননি। অথচ ১৯৪২ সালে ঐ প্রস্তাবেই রাজি হলেন গান্ধী ও নেহেরুর নেতৃত্বের কংগ্রেস। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট মুম্বাইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। ব্রিটিশ সরকারকে আলটিমেটাম

www.nagorikpathagar.com

দেয়া হলো ভারত ছাড়ার। এই আন্দোলনের নাম হলো 'কুইট ইন্ডিয়া' অর্থাৎ ভারত ছাড়ো আন্দোলন। গান্ধীজীর শ্লোগান হলো 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। গান্ধী, জওহরলাল, মাওলানা আজাদসহ কংগ্রেসের সকল নেতারা ঐ দিনই গ্রেফতার হয়ে গেলেন। এর প্রতিক্রিয়া হলো সারা ভারতবর্ষে। সে ঢেউ কলসকাঠিকেও তছনছ করে দিল। আমার জীবনও পাল্টে গেল।

১৯৪২ সাল এসেছিল আমার কাছে ভিন্নভাবে। কলসকাঠি পড়তে এসে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব আরো তীব্র হয়ে উঠল। শৈশব থেকে আমার অভ্যাস ছিল পত্র-পত্রিকা খুঁটেখুঁটে পড়া। স্কুল জীবনেই সংবাদপত্রের খবর রাখতাম। কংগ্রেস-এর নাম জানতাম। মুসলিম লীগের নাম জানতাম। কমিউনিস্ট পার্টির কথাও শুনেছি। সুভাষচন্দ্র বসুর জন্যে আবেগও ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর দেখেছি কংগ্রেসের সাথে ব্রিটিশ সরকারের বনিবনা হচ্ছে না। কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারকে শর্ত দিয়েছে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি না দিলে যুদ্ধে সহযোগিতা করবে না। মুসলিম লীগের অভিমত একটু ভিন্ন ধরনের। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। এ প্রস্তাবের মর্মকথা হচ্ছে, ব্রিটিশকে ভারত ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু যাওয়ার আগে ভারত ভাগ করে যেতে হবে। মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টি করতে হবে। অপরদিকে কংগ্রেসের ছিল অখণ্ড ভারতের আন্দোলন। মুসলিম লীগ কংগ্রেস ব্রিটিশবিরোধী প্রতিটি আন্দোলনকেই অখণ্ড ভারতের আন্দোলন বলে মনে করত। তাই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এ ধরনের পরিস্থিতি তখন ছিল না। অথচ ঐ বয়সে আমি অন্তত এ ধরনের একটি ঐক্যের পক্ষপাতি ছিলাম না। ভাবতাম এমন হলে কেমন হয়। সবসময় মনে হতো হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধ না হলে ভারতের স্বাধীনতা আসবে না।

আমার এ চিন্তার হয়তো একটি পটভূমি ছিল। আমার বাড়ি আজকের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া হলেও পাঠশালা ব্যতীত কোটালীপাড়ার কোনো বিদ্যালয়েই আমি পড়িনি। পাঠশালার পরে আমার প্রথম পাঠ শুরু হয় গোপালগঞ্জের গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া এম.ই স্কুলে।

এই এলাকায় শতকরা ৯০ জনই মুসলমানের বসবাস। আমার দুই কাকা এখানে চিকিৎসা পেশায় খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এই স্কুলে পড়ার ফলে আমার ভিন্ন মানসিকতার জন্ম হয়। হয়তো সেই মানসিকতাই পরবর্তীকালে আমার জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। আমি সপ্তম শ্রেণিতে এসে কলসকাঠিতে ভর্তি হই। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের সাথে

www.nagorikpathagar.com

ব্রিটিশের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রশ্নে আপসহীন ভূমিকা নিয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ শ্রমিক দলের নেতা স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাল ভারতে। উদ্দেশ্য আপসে কংগ্রেসের সাথে একটি রফা করা। মূল বক্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। তার পূর্বে নয়। তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন উইনস্টন চার্চিল। এই ভদ্রলোককে আমি আদৌ পছন্দ করতাম না। তিনি বলেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভেঙে ভেঙে টুকরো করার জন্যে তিনি ক্ষমতায় আসেননি। তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি ক্ষমতাসীন থাকা পর্যন্ত ভারত স্বাধীন হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর দৌড় ব্যর্থ হয়ে গেল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চরমপত্র দেয়া হলো। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্টের মধ্যে ভারতকে স্বাধীনতা দেয়া না হলে ৯ আগস্ট থেকে কংগ্রেস ভারত স্বাধীন করার লক্ষ্যে চূড়ান্ত আন্দোলন শুরু করবে।

ব্রিটিশ সরকার কোনো হুমকিতেই কান দিল না। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট বোম্বেতে কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে ঘোষণা হলো সংগ্রামের কর্মসূচি। তখন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। মহাত্মা গান্ধী শ্লোগান দিলেন, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে—ডু অর ডাই। বোম্বেতে কংগ্রেসের অধিবেশন থেকেই কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফতার করা হলো। কংগ্রেস নেতারা সংগ্রামের কৌশল সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা না দিয়েই জেলে চলে গেলেন। সারা ভারতবর্ষে অসংগঠিত বিক্ষুব্ধ জনতা রেল লাইন উপড়ে ফেলল। ডাকঘর এবং সরকারি ভবনে আগুন দেয়া শুরু হলো। সেই সংগ্রামের ঢেউ বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ থানার কলসকাঠিতেও আঘাত হানল। আমরা আন্দোলনে শরিক হলাম। আমি তখন নবম শ্রেণির ছাত্র। ক্লাসে বয়সের দিক থেকে সর্বকনিষ্ঠ। স্কুলের গেটে শুয়ে ১৬ দিন ধর্মঘট করলাম। এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেল।

১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন দু'টি দিকে আমার চোখ খুলে দিল। কৈশোরে নিজের চোখে দেখলাম ব্রিটিশের দণ্ডনীতি, বিভেদ নীতি এবং কমিউনিস্ট পার্টির দুঃখজনক আচরণ।

কলসকাঠিতে তেমন কোনো স্বদেশী আন্দোলন ছিল বলে আমি জানতাম না। মাইলখানেক উত্তরে বেবাজ গ্রাম। সে গ্রামে রাজনৈতিক কর্মীদের একটি আশ্রম ছিল। আশ্রমের নাম 'গান্ধী আশ্রম'। সে আশ্রমের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল না। কলসকাঠি স্কুলের কাছে কোয়ার্টারে থাকতাম। স্কুলের দক্ষিণে

www.nagorikpathagar.com

ডাকঘরের সামনে ছোট একটি মাঠ ছিল। সেই মাঠেই একদিন সভা জমে উঠল। সভায় বক্তারা তীব্র ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করল। গান্ধী, নেহেরু ও মওলানা আজাদের মুক্তির দাবি হলো। পত্রিকায় খবর আসছিল সারা ভারতে বিক্ষোভের। বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রেন লাইন উপড়ে ফেলছে। ডাকঘর ও স্টেশনে স্টেশনে আগুন দিচ্ছে। আগুন দিচ্ছে সরকারি বাসভবনে। কলসকাঠিতে তেমন সরকারি ভবন ছিল না। তারও একটি ইতিহাস আছে।

কলসকাঠি উন্নত গ্রাম। তের ঘর জমিদারের বসবাস। তাদের একটি ডাকঘর চাই। টেলিগ্রাফ অফিস চাই। কিন্তু সেকালে থানা সদরের বাইরে টেলিগ্রাফ অফিস দেয়া হতো না। সরকারের শর্ত ছিল প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেলিগ্রাফ না হলে টেলিগ্রাফ অফিস দেয়া যাবে না। কলসকাঠির জমিদারেরা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। তারা প্রতিদিন সকালে ও বিকালে বরিশাল থেকে কলসকাঠিতে টেলিগ্রাফে খবর পাঠানো শুরু করলেন। ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে কলসকাঠি বাজারে টেলিগ্রাফ অফিস চালু করল।

সেই টেলিগ্রাফ অফিস আক্রান্ত হলো ১৯৪২ সালে আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে। স্টিমার অফিসও পুড়িয়ে দেয়া হলো। আমরা তখন উৎসাহী দর্শক। কলসকাঠি বাকেরগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত। মাঝখানে নদী। নদীর ওপারে থানা। সেখানে স্পিডবোট ছিল না। পুলিশকে নৌকায় যাতায়াত করতে হতো। জরুরি প্রয়োজন দেখা দিলে পুলিশ লঞ্চ ব্যবহার করত। কলসকাঠি থানা সদর থেকে দূরে হওয়ায় সেদিনই পুলিশের আবির্ভাব ঘটল না। পুলিশ এল পরের দিন। নেতৃস্থানীয় চারজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। প্রথমদিনে আর কাউকে গ্রেফতার করতে পারল না।

সে এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি। পুলিশ নেতাদের গ্রেফতার করে বাকেরগঞ্জ থানায় নিয়ে যাচ্ছে। পরদিন তাদের পাঠানো হবে স্টিমারে বরিশাল। আমরা তাদের বিদায় দেবার জন্যে বাকেরগঞ্জ থানায় গেলাম। স্টিমার স্টেশনের নাম রঙ্গশ্রী। দুপুরের দিকে পটুয়াখালী থেকে বরিশালগামী স্টিমার আসত। স্টেশনে অসংখ্য মানুষ ভিড় জমত। মেয়েরা গান গাইত। বন্দিদের গলায় মালা দিত। পুলিশ তেমন কিছু বলত না।

রঙ্গশ্রীর কথা মনে হলে এখনও আমার চঞ্চলাদির কথা মনে পড়ে। কলসকাঠিতে আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন চঞ্চলাদির আত্মীয়রা। চঞ্চলাদির বাড়ি ছিল বিক্রমপুরের শ্যামসিদ্ধি, থানা শ্রীনগর। স্বামী বাকেরগঞ্জে চাকরি করতেন। কী চাকরি করতেন তা আর এখন মনে নেই। চঞ্চলাদি বড্ড ফর্সা ছিলেন। ফর্সা ছিল তাঁর চোখের তারা। সেই চঞ্চলাদিকেও দেখতাম

www.nagorikpathagar.com

বন্দিদের বিদায় দেয়ার জন্যে স্টিমার স্টেশনে আসতেন। চঞ্চলাদি আদর্শ গৃহবধূ। সাত চড়ে কথা বলেন না। তিনি কী করে স্টিমার স্টেশনে আসতেন বা কেন আসতেন তা আমিও বুঝতে পারিনি।

ঐ চঞ্চলাদিদের বাকেরগঞ্জের রঙ্গশ্রী ছেড়ে সন্ধ্যার দিকে আমরা কলসকাঠি ফিরতাম। ইতোমধ্যে আমাদের কর্মসূচি নির্ধারণ হয়ে গেছে। আমাদের একমাত্র কাজ নেতাদের খবর দেয়া এবং নেয়া। পুলিশের পক্ষ থেকে অসংখ্য লোকের নামে ইতোমধ্যে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। নেতারা আত্মগোপন করেছেন। প্রতিদিন রাতে পুলিশ ঘেরাও করছে বাড়ি। আমরা কয়েকটা ঘণ্টার ব্যবস্থা করেছি। পুলিশের খবর পেলেই ঘণ্টা পিটানো হতো। নেতারা পালিয়ে যেতেন। দিনের পর দিন পুলিশ এসে ফিরে যেত। সেকালের এক জমাদারের কথা এখনও মনে পড়ে। পুরো নাম কখনো শুনিনি। নাম ছিল গাঙ্গুলী জমাদার। গাঙ্গুলী খুব ধুরন্ধর। কোনো নেতাকে খুঁজে না পেয়ে তিনি আমাদের খোঁজ করতেন। কাছে এসে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতেন। কিন্তু কোনো দিনই কোনো কথা বের করতে পারেননি। কিন্তু আমাদের সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করেননি।

তখন প্রতিদিন বিকালে মিছিল হতো। একদিন মিছিলে কয়েকজন কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের দেখলাম। দেখলাম তারা আমাদের মিছিলে যোগ দিয়েছে। কিছুটা অবাক হলাম। শুনেছিলাম কমিউনিস্ট পার্টি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সমর্থন করে না। তারা সে মুহূর্তে ব্রিটিশকে বিব্রত করতে চায় না। তাই তাদের দেখে প্রথমে খুব ভালো লাগল। ভাবলাম কমিউনিস্ট পার্টি বোধ হয় আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। আমাদের মধ্যে যাদের বয়স কম ছিল সবাই ভাবতাম আন্দোলনে সকলের আসা উচিত। একদিন মিছিল করতে করতে শুনলাম, মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও নাকি গ্রেফতার হয়েছেন। এ খবরে মিছিলটা যেন অগ্নিগর্ভ হয়ে গেল। ভাবলাম এবার ব্রিটিশের রক্ষা নেই। এবার ব্রিটিশকে যেতেই হবে।

কিন্তু খবরটা সত্যি ছিল না। বাসায় ফিরে পিসেমশাইয়ের কাছে শুনলাম খবরটা সত্যি নয়। পিসেমশাই কলসকাঠি স্কুলের গণিতের নামজাদা শিক্ষক ছিলেন। পিসেমশাইর সুবাদেই আমার কলসকাঠি যাওয়া। তাঁর বাসায় থেকেই স্কুলে পড়তাম। সেদিন পিসেমশাইর কাছে খবর শুনে যেমন বিমর্ষ হয়েছিলাম তেমনি আবার কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের দেখে উৎফুল্লও হয়েছিলাম।

কলসকাঠির পাশের গ্রাম গাড়ুরিয়া। গাড়ুরিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির কিছু লোক আছে জানতাম। তারাই সেদিন এসেছিলেন মিছিলে। শেষ পর্যন্ত তাঁদের

www.nagorikpathagar.com

কথায় আমার চমক ভাঙল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা আমাদের কয়েকজন ছাত্রকে ডেকে মিছিল থেকে দূরে নিয়ে গেলেন। মাথায় হাত বুলালেন, আমাদের খুব প্রশংসা করলেন। তারপর এক সময় বললেন, তোমরা ভুল করছ। এভাবে স্বাধীনতা আসবে না। কংগ্রেস নেতারা জার্মানি ও জাপানের দালাল। সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বাসঘাতক। ওরা ভারতবর্ষকে জাপানের হাতে তুলে দিতে চায়। এ যুদ্ধ হচ্ছে জনযুদ্ধ। জার্মান সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছে। জার্মান আগে আক্রমণ করেছে ব্রিটেনকে। আক্রান্ত ব্রিটেন এবং আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন বন্ধু। সমাজতন্ত্র বাঁচাতে হলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাঁচাতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাঁচাতে হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র ব্রিটেনকে এখন বিব্রত করা চলবে না। সুতরাং এখন ব্রিটিশকে বিব্রত করলে ফ্যাসিবাদী জার্মান ও জাপান জিতে যাবে। তাই এখন যারা ব্রিটিশকে বিব্রত করতে চায় তারা বিশ্বাসঘাতক এবং ফ্যাসিবাদী শক্তির মিত্র। সুভাষ বসু এই ষড়যন্ত্র করার জন্যে জার্মান গেছেন। বার্লিন বেতার থেকে ভাষণ দিয়েছেন। তিনিও ফ্যাসিস্টদের দালাল। তাই কংগ্রেস ও সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সমাজতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে, জাপানের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে হলে ব্রিটেনের সাথে সহযোগিতা করতে হবে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করতে হবে। তখন আমি নবম শ্রেণির ছাত্র। রাজনীতিতত্ত্ব তেমন বুঝতাম না। অবাক বিস্ময়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের কথা শুনলাম। তাদের সাথে বিতর্ক করার মতো বুদ্ধি আমার ছিল না। শুধুমাত্র সুভাষচন্দ্র বসুকে গালি দেয়ায় মনটা খরাপ হয়ে গেল। মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে তেমন দুর্বলতা আমার সে বয়সেও ছিল না। গালভরা আবুল কালাম আজাদ নামটি বলতে গেলে তা ভালো লাগত।

কংগ্রেসের সভাপতি না বলে আমরা বলতাম রাষ্ট্রপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। তাঁকে মুসলিম লীগের ছেলেরা গালাগালি করত। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারাও তাঁকে সমালোচনা করল। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এরপর থেকে তাদের এড়িয়ে চলতাম। কলসকাঠি থাকাকালীন এরপর কোনোদিন তাদের সাথে ভালোভাবে কথাও বলিনি। এর মাঝখানে আর একটি ঘটনা ঘটে গেল। একদিন ভোরের দিকে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল লঞ্চের বাঁশিতে। ছুটে স্কুলের পাশে খালপাড়ে এলাম। এসে দেখি লঞ্চ ভর্তি পুলিশ আর গুর্খা সৈন্য। প্রায় সব নেতাই গ্রেফতার হয়ে গেছেন। সবাইকে লঞ্চে তোলা হচ্ছে। আমাকে দেখে গাঙ্গুলী জমাদার কাছে এলেন। বললেন তোমাদের ঘণ্টার কী হলো? আজ ঘণ্টা বাজল না! বুঝলাম, কেউ টের পাইনি।

www.nagorikpathagar.com

কাউকে খবর দিতেও পারিনি। চারদিকে তখন ভয় আর ভয়। পুলিশ কাকে গ্রেফতার করবে তা কেউ বলতে পারে না। তখন কেউ গ্রেফতার হলে আমরা রঙ্গশ্রী যাই না। বন্দিদের বিদায় দিতে কেউ স্টিমার ঘাটে যায় না। গ্রামে গ্রামে পুলিশ নেমেছে। নেমেছে পুলিশের ফেউ। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না। আর এমন সময় ব্রিটিশ সরকার নামল নতুন দণ্ডনীতি নিয়ে। দশ হাজার টাকা পাইকারি জরিমানা ঘোষণা করা হলো। বলা হলো, যে সম্প্রদায়ের লোক গ্রেফতার হবে বা গ্রেফতারের তালিকায় যাদের নাম থাকবে সেই সম্প্রদায়ের লোককেই এই জরিমানা দিতে হবে। এই ঘোষণার সাথে সাথে এক শ্রেণির মানুষ জরিমানা না দেয়ার ফিকিরে নামলেন। দালালির খাতায় নাম লেখালেন অনেকে। সকলেরই চেষ্টা নিজের সম্প্রদায়কে বাঁচাবার। এ আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের কাউকে জরিমানা দিতে হলো না। ভাগ করা হলো হিন্দুদের মধ্যেও। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার-কুমার, কুলি বা শাঁখারীর ভিত্তিতে। যাদের সম্প্রদায়ের লোক অভিযুক্ত নয় তাদের জরিমানা নেই।

কলসকাঠির স্কুলের কাছে আমি থাকতাম। ঐ স্কুলেই সরকারি কর্মকর্তারা এলেন। সারাদিন ভরে জরিমানা আদায় করলেন। আমরা দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। প্রতিবাদ করার কেউ ছিল না। বরিশাল জেলায় শুধুমাত্র কলসকাঠি ও রহমতপুরে ভারত ছাড়ো আন্দোলন তীব্র হয়েছিল। আর কোথাও আন্দোলন তেমন ছড়িয়ে পড়েনি। গান্ধীবাদী কংগ্রেস এই আন্দোলনে এসেছিল নেহায়েত বাধ্য হয়ে। কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনে আসেনি। বরিশালে সুভাষচন্দ্র বসুর ফরোয়ার্ড ব্লক কোনোদিনও গঠিত হয়নি। মোটামুটিভাবে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল আরএসপি বরিশালে সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিনিধিত্ব করত। আরএসপিও তখন তেমনভাবে সংগঠিত হয়নি। এককালের অনুশীলন সমিতির অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা জেলখানায় মার্কসবাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা তাঁরা সঠিক বলে মনে করেননি। ১৯৪০ সালের ১৯ মার্চ তাঁরা আরএসপি গঠন করেন এবং ঘোষণা করেন যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ব্রিটিশকে হটাতে হবে। এ ঘোষণা দিয়ে এঁরা কেউই বেশিদিন বাইরে থাকতে পারেননি। দীর্ঘদিন কারাবাসের পর ১৯৩৮ সালে তাঁরা মুক্তি পেয়েছিলেন। দল গঠনের ছয় মাসের মধ্যে প্রথম শ্রেণির সকল নেতাই আবার গ্রেফতার হয়ে গেলেন। তবুও তাঁদের নেতৃত্বেই রহমতপুরে আন্দোলন হয়েছিল। কলসকাঠিতে মুখ্যত আন্দোলন ছিল গান্ধীবাদীদের হাতে।

www.nagorikpathagar.com

১৯৪৪ সালে আমি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হলাম। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে এককালীন অনুশীলন সমিতির প্রবীণ বিপ্লবীদের সাথে আমার পরিচয় হয়। এ পরিচয় আমাকে কৌতূহলী করে। এ বিপ্লবীরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করেছেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে চান। অথচ কমিউনিস্ট পার্টি করেন না। এঁদের সুস্পষ্ট বক্তব্য, লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভুল পথ অনুসরণ করেছে। ফলে বিশ্ববিপ্লব হয়নি এবং এই মস্কোপন্থী কমিউনিস্টদের দ্বারা কোনো দেশেই বিপ্লব হবে না।

তাহলে লেনিনের পথটা কী? কোন পথ থেকে স্ট্যালিন বিচ্যুত হয়েছেন? প্রবীণ বিপ্লবীদের কথায় এ বিতর্ক বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিয়ে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা নিয়ে এ প্রশ্নে বিপ্লবের তিন নেতা—লেনিন, ট্রটস্কি এবং স্ট্যালিন একমত হলেন না। প্রথমদিকে স্ট্যালিন লেনিনের মতই পোষণ করতেন। দু'জনেরই বক্তব্য হচ্ছে—একটি দেশের সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব হলেও পূর্ণ বিজয় আদৌ সম্ভব নয়। তাঁদের অভিমত বুর্জোয়া দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন শুরু করা যায়নি। কিন্তু একাধিক উন্নত ধনবাদী দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন না হলে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র রক্ষা করা সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ও সম্ভব নয়।

ট্রটস্কির বক্তব্য ছিল পুঁজিবাদী বেষ্টনের পরিবেশে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণও শুরু করা যাবে না। তাঁর কথায় এক দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ও সম্ভব নয়। অর্থাৎ এক দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্নে একদিকে লেনিন ও স্ট্যালিন অপরদিকে ট্রটস্কি অবস্থান নিলেন। এ চিত্রের পরিবর্তন ঘটল ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর। ১৯২৫ সালে স্ট্যালিন বললেন, অপর কোনো দেশে বিপ্লব ছাড়াই সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয় সম্ভব। তাঁর কথা হচ্ছে বিপ্লবের পরিবর্তে অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের সহযোগিতা ও সাহায্যের উপর নির্ভর করে পূর্ণ বিজয় সম্ভব।

কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল এ সহযোগিতা ও সাহায্যের সংজ্ঞা নিয়ে। বিপ্লব ব্যতীত অপর দেশের শ্রমিকশ্রেণি কীভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে, তার ব্যাখ্যা নিয়ে। স্ট্যালিনের বক্তব্য হলো, অপর দেশের শ্রমিকশ্রেণি তার নিজ দেশের সরকার সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করবে সেই দেশের সরকারের সোভিয়েত ইউনিয়ন সংক্রান্ত নীতির ওপর ভিত্তি করে। কোনো দেশের সরকার

www.nagorikpathagar.com

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হলে সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সে দেশের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবে। একইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে কোনো দেশের সরকারের সম্পর্ক ভালো থাকলে কমিউনিস্ট পার্টি সে দেশের সরকারের সাথে সহযোগিতা করবে।

প্রবীণ বিপ্লবীদের ভাষায়—এ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অন্ধ অনুকরণের নীতি। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর এ নীতি অনুসরণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি। প্রথমে এরা জার্মানির বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেনি। কারণ জার্মানির সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনাক্রমণ চুক্তি ছিল। জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করার পরই তারা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এবার তাঁরা বলেছেন—জার্মানি, সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছে। সুতরাং জার্মানি আমাদের শত্রু। জার্মানি ব্রিটেনকে আক্রমণ করেছে—সুতরাং আক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেন পরস্পরের মিত্র। ব্রিটিশ সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র হওয়ায় ব্রিটিশ ভারতেরও মিত্র। সুতরাং যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ব্রিটিশকে বিপর্যস্ত করা যাবে না। এতে ভারতের স্বাধীনতা বিলম্বিত হলেও করার কিছু নেই। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশকে সহযোগিতা করারই একমাত্র কাজ।

অনুশীলন সমিতির প্রবীণ বিপ্লবীরা এ তত্ত্ব মেনে নেননি। তাই তাঁরা লেনিনের পথকে অনুসরণ করে গড়ে তুলেছিলেন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল। সেই অর্থে বলা যায়, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল আরএসপি ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির বিকল্প বিপ্লবী দল। এ দু'টি দলের তাত্ত্বিক বিতর্ক ছিল তীক্ষ্ণ এবং তীব্র। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে এই বিপ্লবীদের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। এ দলের নেতারা তখনও জেল থেকে মুক্তি পাননি। এক নাগাড়ে প্রায় চৌদ্দ-পনের বছর এঁদের জেলে থাকতে হয়েছে।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় এঁদের গ্রেফতার করা হয়। ১৯৩৮ সালে এঁদের মুক্তি দেয়া হয়। আবার ১৯৪০ সালে আরএসপি গঠনের ছ'মাসের মধ্যে সকলেই গ্রেফতার হয়ে যান। তবে সকলেই ছাড়া পান ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়ে সকল বন্দিদের মুক্তি দেন।

এই প্রবীণ বিপ্লবীদের সাথে আলোচনার ফলে আমাদের দীর্ঘদিনের সংশয় কেটে যায়। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কমিউনিস্ট পার্টির

www.nagorikpathagar.com

আচরণ আমাকে বেদনার্ত করেছিল। আরএসপির বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে আমি সেদিনের কমিউনিস্ট পার্টির আচরণের একটি ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম। এই ব্যাখ্যাই আমাকে বলে দিল—কমিউনিস্ট পার্টিতে অনেক সংগ্রামী এবং বিশ্বস্ত নেতা কর্মী থাকলেও অন্ধ অনুকরণ তাদের বিপর্যস্ত করবে। অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণের নীতির ফলে ভারতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে সুদূর পরাহত। কারণ 'আমি চাই বা না চাই কমিউনিস্ট পার্টিই তখন সমাজতন্ত্রের পক্ষে সবচেয়ে বড় শক্তি বলে পরিগণিত'—এই পটভূমিতেই আমার আরএসপি'র সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

তবে সে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৪৬ সালে সকল নেতাই মুক্তিলাভ করেন। ১৯৪৬ সালেই সারা ভারতবর্ষে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়। আর এর পূর্বে ঘটে যায় কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনা। প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৯৪৫ সালে ২১ নভেম্বর। কলকাতার ছাত্ররা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতাদের মুক্তির দাবিতে মিছিল করছিল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। লক্ষ্য ছিল নিজের শক্তিতে সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। জাপান সরকার আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ইম্ফলের কোহিমা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল ব্রিটিশ বাহিনীর সাথে। সেই সময় পেছন থেকে জাপান বিশ্বাসঘাতকতা করল। সর্বশেষে জাপান বুঝতে পেরেছিল যে, সুভাষচন্দ্র বসু তাদের ওপর নির্ভর করবেন না। তাদের কথা শুনবেন না। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিরোধের সুযোগ নিয়ে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃত্বে ভারতবাসীরাই ভারতবর্ষ স্বাধীন করবে। এ পরিস্থিতি জাপানের কাছে কাম্য ছিল না। তারা ভেবেছিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কাঁধে সওয়ার হয়ে ভারতবর্ষ দখল করবে। সে স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ায় তারা আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে সকল সাহায্য ও সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়। পর্যুদস্ত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে বন্দি হলেন। ইতোপূর্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দুই প্রতিনিধি হরিদাস মিত্র ও পবিত্র রায় বিশেষ বার্তা নিয়ে সাবমেরিনে উড়িষ্যার উপকূলে পৌঁছলে গ্রেফতার হয়ে যান। বিচারে তাঁদের প্রাণদণ্ড হয়। গান্ধীজীর হস্তক্ষেপে প্রাণদণ্ড স্থগিত হয়ে যায়।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচারের খবরে সারাদেশ তখন অগ্নিগর্ভ। এর মধ্যে খবর এল যে, তাইপেতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষ বসু মারা গেছেন। তিনি তাইপে থেকে বিমানে ব্যাংকক যাচ্ছিলেন। তাঁর এই মৃত্যুর খবর কেউ বিশ্বাস করল না। সন্দেহ আরো গভীর হলো। এ সময় ব্রিটিশ

www.nagorikpathagar.com

সরকার সিদ্ধান্ত নিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দি সেনানায়কদের বিচারের। বিচার হবে নয়াদিল্লির লালকেল্লায়। অভিযুক্ত নেতৃবৃন্দ হলেন কর্নেল শাহনেওয়াজ, ধীলন, সায়গল, রশিদ আলী, কাসির লক্ষ্মী বাঈ প্রমুখ। সারা ভারতবর্ষ ভেঙে পড়ল। উকিলের পোশাক পরলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু থেকে শুরু করে কংগ্রেসের সকল ডাকসাইটে নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, এঁরা ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এ পেশা ত্যাগ করেছিলেন।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃবৃন্দের বিচার বসবে নয়াদিল্লির লালকেল্লায়। সারা ভারতের মানুষের মুখে তখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নাম। ঘরে ঘরে সুভাষচন্দ্র বসু, কর্নেল শাহনেওয়াজ, ধীলন, সায়গল, রশীদ আলী, লক্ষ্মী বাঈ-এর ছবি।

এই বিচারের বিরুদ্ধে ১৯৪৫ সালের ২১ নভেম্বর কলকাতায় মিছিল হলো। মিছিলে পুলিশের গুলিতে মারা গেলেন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকায় বাড়ি। কলকাতার ছাত্র। ঢাকার বাসা হাটখোলা রোডে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের কেন্দ্রীয় দফতরের কাছে। তাঁর কাকা সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এককালীন অনুশীলন সমিতি ও পরবর্তীকালের আরএসপি নেতা। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল ফেব্রুয়ারি মাসে। আমি তখন আইএসসি পরীক্ষার্থী। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অন্যতম সদস্য রশিদ আলীর মুক্তির দাবিতে মিছিল নেমেছে কলকাতায়। মিছিলে গুলি হলো। নিহত হলেন আবদুস সামাদ। মুসলিম লীগ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিকে নিজস্ব দাবি হিসেবে সাম্প্রদায়িক রং দেবার চেষ্টা করেও সফল হলো না। ব্রিটিশ সরকারের গুলি আবার সকলকে ঐক্যবদ্ধ করল।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতাদের মুক্তির দাবিতে সারা ভারতে আন্দোলন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ নেতাদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিল। এককালে কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহেরু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে ফ্যাসিস্টদের সহযোগী বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই নেহেরুকে উকিলের কোর্ট পরতে হয়েছিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবির তীব্রতায়।

অপরদিকে মুসলিম লীগ দেখল—এ আন্দোলন সফল হলে ভারত স্বাধীন হবে, পাকিস্তান হবে না। তাই তাঁরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সীমারেখা টানবার চেষ্টা করল। কর্নেল রশীদ আলীকে মুসলিম লীগের লোক বলে অভিহিত করে রশীদ আলী দিবস পালনের ডাক দিলেন। তাঁরা শাহনেওয়াজ, সায়গল বা লক্ষ্মী বাঈয়ের কথা বললেন না। কিন্তু কাজ হলো না। রশীদ আলীর মুক্তি আন্দোলনও সর্বজনীন রূপ পেল। ব্রিটিশের

www.nagorikpathagar.com

পুলিশ কাউকে ক্ষমা করল না মুসলমান বলে। আন্দোলন আরো তীব্র হলো। তৃতীয় ঘটনা হলো—নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীতে বিদ্রোহ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সারা ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হয়। সামরিক বাহিনীতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বামপন্থীরা পরিকল্পনামাফিক কিছু রাজনৈতিক কর্মীকে সেনাবাহিনীতে ঢুকিয়েছিল। এরাই পরবর্তীকালে এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

এ পরিস্থিতিতে রাওয়ালপিন্ডিতে বিমানবাহিনীর সদস্যরা বিদ্রোহ করল। প্রকাশ্যে নৌবাহিনীর সদস্যরা বিদ্রোহ করল বোম্বেতে। বোম্বের বিদ্রোহে শঙ্কিত হলো ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু এ বিদ্রোহ থামানো যাবে কিভাবে। বিদ্রোহীরা জাহাজে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্টদের লালঝাণ্ডা উড়িয়েছে। বোম্বেতে কার্ফু জারি করা হয়েছে। বিদ্রোহ দমন করা গেল না।

ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারলো কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ নেতাদের সহযোগিতা ব্যতীত এ বিদ্রোহ দমন করা যাবে না। তখন মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কলকাতা সফর করছিলেন। তাঁকে জরুরি ভিত্তিতে বম্বে আনা হলো। কংগ্রেসের দু'নম্বর জাঁদরেল নেতা বল্লভভাই প্যাটেল বম্বেতে ছিলেন। জিন্নাহ ও বল্লভভাই প্যাটেলকে বম্বের সমুদ্রতীরে কার্ফুর ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁরা মাইকে বিদ্রোহী নৌবাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। বললেন, শান্ত হও। দেশ স্বাধীন হবে।

কী অভিনব দৃশ্য! একজন ভারত ভাগ করে পাকিস্তান করতে চান—অপরজন অখণ্ড ভারত চান। এঁরা এক হলেন ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে বিদ্রোহ থামাতে। অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের মতোই এঁরা কেউই চাইতেন না যে, ভারতবর্ষ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন হোক। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ আপসে স্বাধীনতা চেয়েছে। আপসে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছে ব্রিটিশ সরকার। ভারতবর্ষে তার কোটি কোটি টাকার পুঁজি খাটছে। ভারতের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। সেই ভারতবর্ষ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন হলে সবকিছু হারাতে হবে ব্রিটিশকে। সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা এলে মুসলিম লীগের পাকিস্তান হবে না। ক্ষমতা আসবে না কংগ্রেসের হাতে। তাই বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ তিনপক্ষই একমত এবং ঐক্যবদ্ধ।

চতুর্থ ঘটনা ঘটলো ২৯ জুলাই। ডাক ও তার কর্মচারীদের সমর্থনে সারা ভারতে হরতাল। বম্বের বিদ্রোহ থামানো কংগ্রেস, মুসলিম লীগ নেতাদের পক্ষে

www.nagorikpathagar.com

সম্ভব হলেও ২৯ জুলাইয়ের ঘটনায় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হলো। ভারতের রাজনীতিতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক সমাজের নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক নেতৃত্বকে শঙ্কিত করে তুলল। দীর্ঘদিন ধরে সারা ভারতে ডাক ও তার কর্মচারীরা ধর্মঘট করে আসছিল। তাদের সমর্থনে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলো প্রথমবারের মতো সারা ভারতে হরতাল আহ্বান করে। ২৯ জুলাই সারা ভারতে হরতাল পালিত হলো। এবার শঙ্কিত হলো ব্রিটিশ, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ। পাকিস্তানের দাবিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আহ্বান করলো মুসলিম লীগ। ইংরেজিতে বলা হলো ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে? জিন্নাহ সাহেব বা মুসলিম লীগ এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। ২৯ জুলাইয়ের ১৬ দিন পর ১৬ আগস্ট এলো। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের পরিণতি কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেশে-বিদেশে প্রচারিত হলো গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং বলে। প্রমাণিত হলো ২৯ জুলাইয়ের শ্রমিক-জনতার ঐক্য ঠুনকো ঐক্য। ১৬ আগস্ট প্রমাণিত হলো হিন্দু-মুসলমান এক নয়। তারা পৃথক জাতি। তাদের পৃথকভাবে বসবাস করতে হবে। তাই মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি চাই। সংখ্যালঘু মুসলমানদের বাঁচতে হবে মান-সম্মান, ইজ্জত এবং মর্যাদা নিয়ে। সুতরাং পাকিস্তান চাই।

আমি বরিশাল বিএম কলেজের ছাত্র। সার্বক্ষণিক রাজনীতিতে প্রায় জড়িয়ে গেছি। নিয়মিত আরএসপি অফিসে যাই। প্রবীণ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এদের গোটা জীবনের ইতিহাস কারাবরণের ইতিহাস। বরিশালে বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে এদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রবল। ঐ চরম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিনেও এদের ছাত্র ফ্রন্টের প্রথম সারিতে মরহুম মোজাম্মেল হক, আবুল কালাম শামসুদ্দীন (পরবর্তীকালে শামসুদ্দীন আবুল কালাম), আব্দুল খালেক খান (পরবর্তীকালে সাংবাদিক), জাহিদ হোসেন জাহাঙ্গীর প্রমুখ। তখন দেখা হয়েছিল প্রণব ঘোষের সাথে। সদ্য জেলখানা থেকে এসেছেন। বিএ ক্লাসের ছাত্র। সরকারি নির্দেশে গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। কলেজে আসতে পারতেন। তবে ক্লাসে ঢুকবার অনুমতি ছিল না। ক্লাসে ঢুকবার দুয়ারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনতেন।

তখন আমরা ছাত্র ফেডারেশন (১৮ মির্জাপুর স্ট্রিট)-এর সদস্য। এই ছাত্র সংগঠনের ইতিহাসও বিচিত্র। ত্রিশের দশকে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়। এই ছাত্র ফেডারেশনের ভাঙন আসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। তখন কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এন-এফ) নামে কাজ করত। ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ

www.nagorikpathagar.com

করলে কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির তখন কোনো প্রকাশ্য সংগঠন না থাকায় ছাত্র ফেডারেশনের মঞ্চ থেকে তারা যুদ্ধকে জনযুদ্ধ ঘোষণা দেয়। এতে তীব্র আপত্তি করে কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক, জয়প্রকাশ নারায়ণের কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আরএসপি)। এর পরিণতিতে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন দু'ভাগ হয়। নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেস গঠিত হয়।

তবে কংগ্রেসের নেতৃত্বে নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেস গঠিত হলেও বাংলাদেশে তার ভিন্ন রূপ ছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ভেঙে গেলেও বাংলাদেশে আরএসপি'র নাম পাল্টাল না। কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র সংগঠনটির নাম থাকল ছাত্র ফেডারেশন (১৮ মির্জাপুর স্ট্রিট)। কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের নাম হলো বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেস। আর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মুসলিম লীগের ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নাম নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন হলেও বাংলাদেশে তাদের ছাত্র সংগঠনের নাম হলো মুসলিম ছাত্রলীগ।

একদিন বরিশালে অশ্বিনীকুমার টাউন হলে গেলাম হিন্দু মহাসভার জনসভা শুনতে। ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার নির্মল চ্যাটার্জি। তিনি খুব ঔদ্ধত্যপূর্ণ সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দিচ্ছিলেন। আমি উত্তেজিত হয়ে গেলাম। খেয়াল হলো আমার কাছে দাঁড়ানো আমার এক প্রাক্তন শিক্ষক। তাঁর নাম রমেশ চ্যাটার্জি। কলসকাঠি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমাকে থামাতে চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, তুমি কি জান নোয়াখালীতে মুসলমানেরা হিন্দু মেয়েদের স্তন কেটে নিয়েছে? আমি বললাম, আমি এও জানি যে বিহারের হিন্দুরাও মুসলমান মেয়েদের স্তন কেটে নিয়েছে। মাস্টারমশায় আমার দিকে গম্ভীরভাবে তাকালেন। আমি চলে এলাম। ঠিক বুঝতে পারলাম না শিক্ষকের মুখে জবাব দেয়া ঠিক হয়েছে কি না। সেকালে ছোটবেলা থেকে আমাদের শেখানো হতো গুরুজনদের কথায় জবাব দিতে নেই।

তবে এ ধরনের কথাবার্তা আমি কোনোদিনই মানিনি। তারও একটা পটভূমি ছিল। ১৯৪৪ সালে আমি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হই। আমাদের বয়স তখন কম ছিল। আমরা জনাত্রিশ ছাত্র হাফপ্যান্ট পরে কলেজে আসতাম। সামনের বেঞ্চে বসতাম। লেখাপড়ায় খুব ভালো না হলেও সকলের ধারণা ছিল ছাত্র হিসেবে আমরা মন্দ নয়। পেছনের বেঞ্চের ছাত্ররা আমাদের এড়িয়ে যেত। তাই কথা বলায় আমাদের একটা অহমিকা ছিল। এই অহমিকা প্রকাশ পেত বিতর্ক শুরু হলে। দাঙ্গা আর সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে তর্ক শুরু হলে

www.nagorikpathagar.com

প্রায় একঘরে হয়ে যেতাম। কারো সাথে একমত হতে পারতাম না। কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক মনোভাব লক্ষ্য করতাম।

ঠিক এ সময় পার্টির সিদ্ধান্ত হলো গ্রামে যাবার। দাঙ্গার ভয়ে গ্রামের মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত। গ্রামে যেতে হবে। দাঙ্গার পরিবেশ ঠেকাতে হবে। পার্টির নেতা অনিল দাশ চৌধুরী। আমাকে তাঁর সাথে যেতে হবে ভোলা মহকুমায়। সপ্তাহখানেক ভোলায় কাটালাম। তখনই চিনেছিলাম দৌলতখান, গুপ্তেরবন্দর, রাধাবল্লভ, বোরহানউদ্দিন, লালমোহন।

ভোলা থেকে ফিরে মন আরো খারাপ হয়ে গেল। দেখলাম সর্বত্র একটা দুঃখজনক অবিশ্বাস বিরাজ করছে। শতাব্দী ধরে যারা পাশাপাশি বাস করছিল তারা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছে মনে হচ্ছিল ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে কোনো চিন্তাভাবনা না করে হিন্দুরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে।

কিন্তু আমরা কী করবো। বায়োজ্যেষ্ঠ অনিল দাশ চৌধুরী। মোজাম্মেল হক এমপ্লয়মেন্ট এক্সপ্রেসে চাকরি করেন। শামসুদ্দীনদা বিএ পাস করে কলকাতা চলে গেছেন। খালেকদা আছেন। এর পরে আমরা সবাই বয়সের দিক থেকে সমান।

নয়াদিল্লিতে তখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন হয়েছে। এ সরকার হয়েছে সর্বদলীয়। এ সরকারের প্রেসিডেন্ট বড় লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার বল্লভভাই প্যাটেল। আর অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। ঠিক এ বছরই নয়াদিল্লিতে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল আরএসপির প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলনে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয় যে, ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে এই উপমহাদেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হবে। আর এই ঘাঁটি ব্যবহৃত হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে।

তবে আমাদের কাছে মুখ্য প্রশ্ন হলো সে মুহূর্তে আমাদের ভূমিকা কী হবে? আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব ভারতের অন্তবর্তীকালীন সরকারকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ছাত্র ফ্রন্টের কাছে নির্দেশ এল ছাত্রদের নিজস্ব দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করার। আমার এখন মনে পড়ে আমরা শিক্ষামন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলাম এই নির্দেশ পাবার পর। তখন অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন সাফায়েত আহম্মদ খান।

আমরা তখন নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেসের সদস্য। আমাদের ছাত্র ফেডারেশনের নাম পাল্টাতে হয়েছে নিখিল ভারত কংগ্রেসের নির্দেশে। এ নির্দেশ মানতে মানতে উপমহাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন এসে যায়।

www.nagorikpathagar.com

ভারত বিভাগ তখন অবশ্যম্ভাবী। এবার দাবি উঠেছে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের জন্য। মনে হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে ভারতবাসী বলে কেউ নেই। সকলেই হিন্দু বা মুসলমান। তাই দাবি উঠছে হিন্দু এলাকাগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হোক। মুসলিম এলাকাগুলো থাক পাকিস্তানে। এক সময় যারা বাংলা বিভাগকে মায়ের অঙ্গচ্ছেদ বলে মনে করত তারাই বাংলা বিভাগের দাবি করল সবচেয়ে আগে।

তখনকার একটি ঘটনা আমার চোখের সামনে ভাসে। নয়াদিল্লিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মিটিং বসেছে। এ বৈঠকে ভারত বিভাগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হবে। এই বৈঠকে ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে মাত্র দু'জন বক্তাই কথা বলছেন। একজন জয় প্রকাশের সমাজতান্ত্রিক দলের অরুণা আসফ আলী। অপরজন বাংলাদেশের রংপুরের অধিবাসী বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল আরএসপি'র সদস্য কমরেড সুনীল দেব।

কংগ্রেসের সভায় ভারত বিভাগ প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হলে সাংবাদিকরা এল অরুণা আসফ আলীর কাছে। সাংবাদিকরা বললেন বামপন্থীরা হেরে গেছে। বিক্ষুব্ধ অরুণা আসফ আলী বললেন, না দক্ষিণপন্থীরা জিতে গেছে। এটাই ছিল অরুণা আসফ আলীর কথা বলার ধরন। অরুণা আসফ আলীর জন্ম বরিশাল শহরে। নাম অরুণা গাঙ্গুলি। গ্রামের বাড়ি বরিশালের গৌরনদী। বিয়ে করেছিলেন কংগ্রেস নেতা আসফ আলীকে। খ্যাতি লাভ করেছিলেন ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়। আত্মগোপন করে আন্দোলন করেছিলেন। আবার একদিন ঘোষণা দিয়ে ব্রিটিশের চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কলকাতার এক জনসভায়।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দেশ বিভাগ মেনে নেবার পর বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার চেষ্টা হয়েছিল বাংলাদেশে। দাবি করা হয়েছিল সার্বভৌম বাংলার। এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল আরএসপি ও ফরোয়ার্ড ব্লক। কিন্তু সে আন্দোলন তেমন কাজে আসেনি। সিন্ধু, গঙ্গা ও যমুনায় তখন অনেক জল গড়িয়েছে। আমাদের তখন ঘর গোছাবার পালা।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট গভীর রাতে দেশ ভাগ হয়ে গেল। গ্রামের পর গ্রাম থেকে হিন্দুরা চলে যেতে থাকল। ওপার থেকে এল পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুসলমানরা। ১৯৪৭ সালে পূজায় বাড়ি গেলাম। দেশের প্রায় সকলেই শঙ্কিত। সকলেই শেষ সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে। সকলেরই ধারণা এদেশে থাকা যাবে না।

www.nagorikpathagar.com

এদিকে আবার আরেক ঘটনা ঘটিয়েছে আমার আর এক কাকা। তিনি কংগ্রেস করতেন। ব্রিটিশ আমলে গৃহে অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বাড়িতে পাকিস্তানের পতাকা উড়ালেন না। উড়ালেন কংগ্রেসের দলীয় পতাকা। যদিও কংগ্রেসের দলীয় পতাকা এবং ভারতের জাতীয় পতাকা এক নয়। তবুও এই দুই পতাকার অনেকটা মিল আছে। ভুল বুঝবার অবকাশ আছে। অনেকেই কাকার কংগ্রেসের পতাকা ওড়ানোকে ভারতের পতাকা বলে মনে করল। কাকার যুক্তি হচ্ছে যে কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানে আমার দলীয় পতাকা ওড়াবার অধিকার আছে। পাকিস্তান কংগ্রেস অবলুপ্ত হচ্ছে না। পাকিস্তানে কংগ্রেস থাকবে তাই তার পতাকাও থাকবে। তাই পতাকা ওড়াবার অধিকারও থাকবে।

পূজার সময় আমার সাংবাদিক ও অধ্যাপক কাকা ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন বাড়ি এলেন। সেটাই তাঁর শেষবারের মতো বাড়ি আসা। তিনি একটা অদ্ভুত কথা বললেন। তিনি বললেন, তোমরা কেউ দেশ ছেড়ে চলে যেও না। তোমরা দেশ ছেড়ে গেলে এসকল গ্রামে অবাঙালিদের পুনর্বাসিত করা হবে। পাকিস্তান হবে দুই অর্থনীতির দেশ। অর্থনৈতিক কারণেই পাকিস্তান টিকবে না। টিকতে পারে না।

সেই আমার কাকার সাথে শেষ দেখা। কাকা বাড়ি থেকে চলে যাবার পর আমাদের বাড়িতে পুলিশের হামলা হলো। হঠাৎ পুলিশ এসে দালানের সিঁড়ির নিচ থেকে একটি অকেজো বন্দুক আবিষ্কার করল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেয়েদের আটকে রাখল। সারা বাড়ি জুড়ে এক তোগলকি কাণ্ড। পুলিশের নেতৃত্ব দিলেন বর্ডার মিলিশিয়ার নর্টর জোন্স। আমার সেই কংগ্রেসি কাকাকে গ্রেফতার করা হলো। আমাদের বাড়িতে হামলা চালাবার আগে বেছে বেছে ১৬ জন তফশিলি নেতাকে গ্রেফতার করা হলো। গোপালগঞ্জে তখনও হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তফশিলি নেতারা খুবই প্রভাবশালী। আমাদের বাড়িতে হামলার প্রতিক্রিয়া হলো তীব্র। গ্রামের পর গ্রাম শূন্য হতে থাকল। শতকরা ৯৫ জন মধ্যবিত্ত হিন্দু দেশ ছেড়ে চলে গেল। আমি তখন বরিশালে। চতুর্থ বর্ষ বিএসসির ছাত্র। বিএসসি পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। পড়াশোনার খোঁজ নেই। অনার্স পড়া ছেড়েছি বছরখানেক আগে। রাজনীতি করে অনার্স পড়া হয় না। দল থেকে বলা হয়েছে অনার্স পড়া চলবে না। নিয়মিত বিএসসি পরীক্ষা দেবে কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে। তোমরা বিএসসি পরীক্ষা দিয়ে চলে গেলে নেতৃত্বের শূন্যতা দেখা দেবে। এ পরিস্থিতিতে বিএসসি টেস্ট পরীক্ষা এগিয়ে এল। আমি তখন বরিশাল শহরের কালিবাড়ি রোড বাণীপীঠ স্কুলের একটি কক্ষে

www.nagorikpathagar.com

থাকি। সে স্কুলটি এখন নেই। বরিশাল বিএম স্কুলের পশ্চিমে সেই এলাকায় এখন পরিবার পরিকল্পনার বিরাট দালান। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর বাণীপীঠ স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্নেহাংশু সেনগুপ্তকে গ্রেফতার করা হয়। স্কুলটি উঠে যায়। সেই স্কুলের জমিতে পরবর্তীকালে ধান চাষ করতে দেখেছি। পরে উঠেছে পরিবার পরিকল্পনার দালান।

সেই বাণীপীঠ স্কুলের কক্ষে মোমবাতি জ্বালিয়ে পরীক্ষার পড়া পড়ছিলাম। পরের দিন টেস্ট পরীক্ষা। সন্ধ্যার পরে অনিলদা এলেন। অনিলদা অর্থাৎ দলের নেতা অনিল দাশ চৌধুরী এসে বললেন, তোমার কাল পরীক্ষা দেয়া হবে না। কলকাতা থেকে কৃষ্ণ সেন এসেছেন। বাড়ি খলিশাকোঠা। কৃষ্ণ সেন কৃষক ফ্রন্টে কাজ করছেন। আমাদের কৃষক ফ্রন্টে কিছু কাজ আছে গৌরনদীর মেদাকূলে। তোমাকে কৃষ্ণ সেনের সঙ্গে মেদাকূল যেতে হবে।

সুবোধ বালকের মতো ব্যাগে জামা কাপড় গোছালাম। মোমবাতি নেভালাম। ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বুঝলাম এবার বিএসসি পরীক্ষা দেয়া আমার হবে না। তখন জানতাম না, আর এক ঘটনা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

চারদিন পরে বরিশাল ফিরলাম। এসে দেখলাম আমার রুম খোলা। কাপড় জামা বই বিছানা কিছুই নেই। পার্টি অফিসে ছুটলাম। অনিলদা বললেন, তোমার সব কিছু নিয়ে গেছে পিনাকী বোস। তুমি পিনাকীর খুড়তুতো বোনদের গালি দিয়েছিলে। তুমি নাকি বলেছিলে এ বয়সের মেয়েদের ড্যাং ড্যাং করে রাস্তায় বের হওয়া ঠিক নয়। পার্টির কাজ থাকলে তাদের বাড়িতে খবর দেয়া হবে। পিনাকীর কাকীমা একথা শুনে ক্ষেপে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শাসন করতে হলে ঐ ছেলে যেন আমাদের বাড়িতে এসে শাসন করে। রাস্তায় আমাদের মেয়েদের শাসন করা যাবে না। তাই তোমার অনুপস্থিতিতে ওরা তালা খুলে সবকিছু নিয়ে গেছে। ঘটনাটি এমন দাঁড়াবে তা আমি কোনোদিন ভাবিনি। সেকালে রাজনীতির মেয়েদের নিয়ে অনেক কথা হতো। এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির দুর্নাম ছিল সবচেয়ে বেশি। ইতোমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির অসংখ্য কমরেড নিজেরা নিজেরা বিয়ে করে ফেলেছেন। অনেকে কৌতুক করে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসকে প্রজাপতির অফিস বলত। তাই পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল ভিন্নতর।

আমাদের দলে অনেক মেয়ে ছিল। আমরা আবার অনুশীলন সমিতির উত্তরাধিকার। অনুশীলন সমিতির অধিকাংশ নেতা অকৃতদার, সংযমী, উদার এবং আদর্শ চরিত্রের অধিকারী। তাই মেয়েদের রাজনীতি নিয়ে আমাদের

www.nagorikpathagar.com

অফিসেও আলোচনা হতো। একদিন ছাত্র বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নিল আমাদের অফিসে এমন ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আমাকে। তাই যা ঘটবার তাই ঘটেছে। পিনাকীর বোন শান্তি, তার কাকার মেয়ে সাধনা ও বাসনা প্রায় প্রতিদিন আমাদের অফিসে আসত। আমি তাদের একদিন ধমকে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, কাজ না থাকলে অফিসে না আসতে। যার পরিণতিতে পিনাকীদের বাসায় আমার যেতে হলো। তবে সেখানেও আমার বেশি দিন থাকা হয়নি। তারাও এদেশে থাকেনি। ১৯৪৮ সালের ২৯ মার্চ ওদের আমি পৌঁছে দিয়েছিলাম শিয়ালদহ। শিয়ালদহ স্টেশনে পিনাকীর কাকিমা বলেছিলেন আমি কলকাতায় বাড়ি করব। তোমার জন্য একটি কক্ষ থাকবে সেই বাড়িতে। যদি কোনোদিন ভারতে আস তাহলে আমার খোঁজ কোরো।

তারপর ৪৮ বছর কেটে গেছে। ১৯৭১ সাল থেকে ভারতে যাতায়াত করছি। কোনোদিনই কাকীমাকে খোঁজ করা হয়নি। খোঁজ করিনি সাধনা, বাসনা বা শান্তির। আর এতদিন নিশ্চিয়ই কাকিমা বেঁচে নেই। আর সবচেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে বেঁচে নেই আরএসপির এককালের একনিষ্ঠ কর্মী পিনাকী বোস। গৌরনদী থানার চাঁদসী বোস বাড়ির ছেলে পিনাকী বোস। আত্মীয়-স্বজন সব চলে গেলেও পিনাকী বোস পাকিস্তান ছাড়েনি। তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে '৭১ সালে। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী পিনাকী বোসকে খুন করেছে। আমার কাকীমার কাছে যাবার যোগাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। শুধু পিনাকী বোসের কাকীমা—বরিশালের চাঁদসীর সতীশ বোসের স্ত্রী নন, এমন অনেক মা-বোনের কথা আজ মনে পড়ে। ১৯৪৭ সালের জুন মাস। রাজনীতির কারণে গিয়েছিলাম বানারীপাড়া, স্বরূপকাঠি, কমারখালী, জলাবাড়ি ও সমুদয়কাঠি। স্বরূপকাঠিতে খালের পাড়ে এক ক্লাবঘরে সভা করছিলাম। সভায় বাদল দত্ত নামে একটি ছেলে এল। স্কুলের ছাত্র। বলল, মা আপনাকে ডেকেছে। আমি বললাম, তোমার মা। তিনি আমাকে দেখলেন কী করে? বাদল বলল, আপনি যখন খালপাড় দিয়ে আসছিলেন মা আপনাকে দেখেছেন।

সভা শেষে বাদলদের বাড়ি গেলাম। বাদলের মা বললেন, তুমি বসো। তুমি দুপুরে এখানে খাবে, ঘুমাবে। বিকালে তোমাকে নৌকা করে দেব। তুমি যেখানে খুশি যাবে। আমি বললাম, আমি খেয়ে এসেছি। বাদলের মা হেসে ফেললেন। বললেন, তুমি লক্ষ করনি যে যাবার সময় তোমাকে আমি দেখেছি। বুঝেছিলাম তুমি কিছুই খাওনি ভোর থেকে। আমার রান্না হয়ে গেছে। তুমি খেয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.com

বাদলের মা'র কথা অসত্য ছিল না। আগের দিন বরিশাল থেকে বানারীপাড়ায় পৌঁছেছিলাম। থাকার জায়গা ছিল না। উঠেছিলাম নরত্তোমপুরের রামকৃষ্ণ মিশনে। মিশনে বড় বড় পাথরের বাটি, জল, নিরামিশ আর বড় বড় লাল চালের ভাত। রাতে তেমন খাওয়া হয়নি। ভোরে সেখানে খাবার প্রত্যাশাও ছিল না। ভোরে রওনা হয়ে এসেছি স্বরূপকাঠি।

সেকালে ভাটা ও জোয়ারের উপর নির্ভর করে নৌকা চলাচল করত। বানারীপাড়া থেকে ভাটিতে স্বরূপকাঠি জলবাড়ি, কাউখালী হয়ে পিরোজপুর যাওয়া যেত। জোয়ারের সময় আবার ফেরা যেত একই পথে নৌকায়। পয়সা অনেক কম লাগত। সেদিনও সূর্য পশ্চিমে হেলে যেতে থাকলে বাদলের বাড়ি স্বরূপকাঠি থেকে হুলারহাট যাবার নৌকায় উঠেছিলাম। নেমেছিলাম সমুদয়কাঠি। গন্তব্যস্থান উপেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ি। উপেন্দ্রনাথ দত্ত পিরোজপুরের হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ছেলে সরোজ আমাদের সাথে রাজনীতি করত। সে অনেক কাল আগের কথা। অনেক ঘটনার এক ঘটনা। কোনোদিন মনে করিনি বাদল আর বাদলের মা'কে। যিনি বলেছিলেন, তুমি কার ছেলে জানি না। আমার বাড়ি থেকে না খেয়ে যেতে পারবে না। তুমি খেয়ে ঘুমাও। বিকালে আমি নৌকা ঠিক করে দেব।

তবে টেস্ট পরীক্ষা না দিলেও পরীক্ষার জন্য এলাউ হতে আমার তেমন কষ্ট হয়নি। কলেজের অধ্যাপকরা আমাকে বড্ড ভালবাসতেন। বিশেষ করে ভালোবাসতেন পদার্থবিদ্যার শিক্ষক বিমলাপ্রসন্ন রায়। তিনি কলেজের সব কিছু নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। লেখাপড়া থেকে খেলাধুলা সবই তাঁর নেতৃত্বে হতো। শিক্ষক হিসেবে তিনি তেমন নাম করতে পারেননি। কিন্তু নাম করেছিলেন পরোপকারে। বিমলাপ্রসন্ন রায় সব ছাত্রদের বন্ধু।

টেস্ট পরীক্ষার পর কলেজে ঢোকামাত্র তিনি চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, কোথায় ছিলে? পরীক্ষা দাওনি কেন? আমি বললাম, আমি এবার পরীক্ষা দেব না। আমার প্রস্তুতি নেই, টাকাও নেই। বিমলা বাবু বললেন, কোনো চিন্তা নেই, সবই হবে। তুমি টেস্টে অ্যালাউ হবে। তোমার টাকাও জোগাড় করা হবে। তিনি আমাকে সঙ্গে করে অধ্যক্ষ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কাছে নিয়ে গেলেন। আমি পরীক্ষায় অ্যালাউ হলাম। আমার ৫ মাসের মাইনে মাফ করা হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় পরীক্ষা দিতে পারলাম না।

১৯৪৮ সালের ২৮ আগস্ট আমার বিএসসি পরীক্ষা শুরু। গ্রেফতার হয়ে গেলাম ২০ আগস্ট। অদ্ভুত এক স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলো। কোথায় মানুষ উল্লাস করবে, উৎসব করবে! সেই উৎসব এল

www.nagorikpathagar.com

খণ্ডিত রূপে। পাকিস্তানে হিন্দু, শিখ সম্প্রদায় এবং ভারতে মুসলমানরা ভয়ে ভয়ে থাকল। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ ব্যতীত কংগ্রেসসহ সকল রাজনৈতিক দলের মনে হলো কখন জেলে যেতে হবে। বিশেষ করে শঙ্কিত হলো কমিউনিস্ট পার্টি ও আরএসপি। এরা মার্কসবাদে বিশ্বাস করে। এরা সমাজতন্ত্রী। নাস্তিক। পাকিস্তান ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। পাকিস্তানে কোরান-সুন্নার অনুসরণে সংবিধান হবে। এ রাষ্ট্রে এই বামপন্থীদের স্থান কোথায়!

বিশেষ করে ভয় দেখা দিল আরএসপি'র। কমিউনিস্ট পার্টি ভারত বিভাগ সমর্থন করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির জ্যোতি বসু ও রতন লাল ব্রাহ্মণ, রূপনারায়ণ রায় আইনসভায় বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। দেশ বিভাগের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু আরএসপি আন্দোলন করেছে সার্বভৌম বাংলার জন্য।

এছাড়া বরিশালে আছে আর এক বিপদ। বরিশালের মুসলিম লীগে নাজিমুদ্দিন গ্রুপের মুসলিম ছাত্রলীগের প্রভাব বেশি। তাদের সাথে এক হয়ে আরএসপি'র ছাত্র কংগ্রেস গান্ধী নিহত হবার পর বরিশালে মিছিল ও আন্দোলন করেছে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে নাজিমুদ্দিন গ্রুপ মুসলিম ছাত্রলীগের সাথে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে হরতাল করেছে। ক্ষমতাসীন মহলে এ নিয়ে উষ্মা আছে। আছে উদ্বেগ। ইতোমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে কলকাতায়। সাবেক সম্পাদক পিসি যোশীকে সরে যেতে হয়েছে। সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বিটি রনদিভে। কমিউনিস্ট পার্টি জঙ্গি লাইন নিয়েছে। ঘোষণা করেছে, 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়, লাখ ইনসান ভুখা হ্যায়'। সুতরাং এবার আন্দোলন।

কংগ্রেসের পর কমিউনিস্ট পার্টিও আন্দোলনে নেমেছে। দেয়ালে পোস্টার পড়েছে। গ্রেফতার হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা। তাদের ওপর চরম নির্যাতন নেমে আসছে। একদিনে বরিশাল সদর রোডে আমাদের পার্টি অফিসের কাছাকাছি গিয়ে শুনলাম, পুলিশ অফিস ঘেরাও করেছে। গ্রেফতার হয়েছে তিনজন কর্মী। পার্টি অফিসে নাকি বোমা পাওয়া গিয়েছে। একেবারে তাজা বোমা।

এ বোমা রেখেছিলেন আমাদের মুসলিম ছাত্রলীগের এক বন্ধু পুলিশের সহযোগিতায়। এখানেও শেষ রক্ষা হলো না। কমিউনিস্ট পার্টি মে দিবস পালনের অনুমতি চাইল। জেলা কর্তৃপক্ষ রাজি হলো না। বলা হলো রাশিয়ার কোনো দিবস পাকিস্তানে পালিত হবে না। অন্ধ কমিউনিস্ট বিদ্বেষ তাদের বিচার-বুদ্ধিকেও লুপ্ত করেছিল।

www.nagorikpathagar.com

২১ এপ্রিল ইকবাল দিবস। আমাদের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ছাত্র এসোসিয়েশন (পিএসএ) ইকবাল দিবস পালনের অনুমতি চেয়েছিল। অনুমতি দেয়া হলো না। উপরন্তু ইকবাল দিবস পালনের পোস্টারটিও বাজেয়াপ্ত করা হলো।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান সৃষ্টির পর আমরা ছাত্র কংগ্রেস নামে একটি প্রতিষ্ঠান কাগজে-কলমে বাঁচিয়ে রাখলেও, মূল ছাত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি পাকিস্তান ছাত্র এসোসিয়েশন নামে। আরএসপি এ সিদ্ধান্ত নেয় ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে ময়মনসিংহ শহরে। এ সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৃণাল দত্ত ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র রুহুল আমিন কায়সার।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের শেষে কাকীমাকে দিতে যাই কলকাতায়। টেলিগ্রাম এল তাড়াতাড়ি চলে এসো। মা, ভাইবোন সকলে কলকাতা চলে গেছে। সকলকে বোঝাতে হলো, বিএসসি পাস করেই চলে আসব। বরিশালে ফিরে দেখি সব গোলমাল হয়ে গেছে। বোমার মামলার পর জুন মাসে আমাদের এক পোস্টার নিয়ে মামলা হলো। পোস্টারে লেখা হয়েছিল খাদ্য সমস্যা নিয়ে। আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল—আবারও কি পঞ্চাশ সালের মতো দুর্ভিক্ষ আসছে! এবার গ্রেফতার হয়ে গেলেন দলের নেতা অনিল দাশ চৌধুরী, মোজাম্মেল হক, আব্দুল খালেক খান ও ছাত্রনেতা নারায়ণ দাশ শর্মা। নারায়ণ আমার সাথে বিএসসি পরীক্ষার্থী।

রাজনীতিকদের কাছে বরিশাল তখন এক বিপন্ন শহর। হাঁটতে গেলে লোক পিছু লাগে। উকিল-মোক্তার মামলা নিতে চায় না। কারো কাছে গেলে ভয় পায়। আমাদের পক্ষে দেন দরবার করার লোকও বিরল। হিন্দুদের মনে আশঙ্কা। জড়িয়ে পড়ে বিপদ ডেকে আনব নাকি।

আমার একমাত্র কাজ আইবি অফিসে যাওয়া। থানায় যাওয়া। আদালতে জামিনের জন্য চেষ্টা করা। আমার সুবিধে হচ্ছে দেশভাগের আগে আমার কাকা বরিশাল সদর থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। আমি সকলের চেনা।

কিন্তু তদ্বিরে তেমন কাজ হলো না। বোমা মামলায় জামিন পাওয়া গেলো। পোস্টারের মামলায় জামিন মিলল না। ইতোমধ্যে এগিয়ে এসেছে নারায়ণের পরীক্ষা। পরীক্ষার আগে তার জামিন প্রয়োজন। ২৮ আগস্ট আমারও পরীক্ষা। নারায়ণ জামিনে মুক্তি পেল ১৮ আগস্ট। আমাকে গ্রেফতার করা হলো ২০ আগস্ট। মনে হলো এবার পরীক্ষা আর দেয়া হবে না। গ্রেফতার হয়ে বরিশালে রাজনীতির এক পর্ব শেষ হলো।

www.nagorikpathagar.com

তবে পরীক্ষার অনুমতি দিয়েছিলেন জেল কর্তৃপক্ষ। বরিশাল জেলখানা থেকে জনাদশেক পুলিশ আমার হাতে হাতকড়া দিয়ে মিছিল করে হেঁটে যেত বিএম কলেজে। রাস্তায় লোকের ভিড় হতো। পরীক্ষার হলে যেতাম। পড়ার বই ছিল না। তবুও পরীক্ষার নাম করে হলে যেতাম। বন্ধুদের চিঠি লিখতাম। দলের খবর আদান-প্রদান করতাম। দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার প্রিয় শিক্ষকেরা দেখতেন। সকলেই বিষণ্ন। কারণ কারো কিছু করার নেই বা ছিল না। এমনি করে পরীক্ষার ভান করতে করতে জেলে ফিরে দেখি নারায়ণ আবার গ্রেফতার হয়ে এসেছে। কারণ তার লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্র। প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা বাকি। তাই তাকে আর বাইরে রাখা ঠিক নয়। আমরা বাইরে থাকলে পাকিস্তান কি টিকবে!

এবার দু'জনেই প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা দেবার জন্য কলেজে গেলাম। আজ দীর্ঘদিন পরে সেকালের শিক্ষক আর ল্যাবরেটরির পিওনদের জন্য দুঃখ বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়। ওরা প্রত্যেকে প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় আমাকে সাহায্য করেছিল সব দিক থেকে। কেউ জানত না আমি পরীক্ষা দিচ্ছি না। প্রতিদিন ভান করছি পরীক্ষার নামে।

আমি জেলে যাব এ কথা আমি আদৌ ভাবিনি। ভেবেছিলাম সবাই গ্রেফতার হলে আমি বেঁচে যাব। দেশ ভাগের আগে আমার কাকা বরিশালের পুলিশ বিভাগে ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে পুলিশ বিভাগের বড় বড় কর্মকর্তাদের সাথে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তখন আমার একমাত্র কাজ ছিল সকল দলের বন্দিদের জন্য তদবির করা। প্রতিদিন আমাকে থানায় যেতে হতো। আইবি অফিসে যেতে হতো। আদালতে যেতে হতো। তখন আমি বিএম কলেজের বিএসসি শেষ বর্ষের ছাত্র। আমাদের পার্টি অফিস সদর রোডের আর্ট ভিলার দোতলায়। নিচতলায় বাড়ির মালিক অনিল ঘোষ। অনিল দা আমাদের দলের সমর্থক ছিলেন। অনিল দা'র কাকা প্রবীণ বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ। অনিলদার ওখানে বসতাম। এক কাপ চা খেতাম। অনিলদা বলতেন—এবার তুমি চলে যাও। তোমার পাহারাদার এসে গেছে। আমি উঠবার সাথে সাথে ৪ বার আমার পিছু নিত। প্রায় সারা দিন এ চারজনের পাহারায় আমাকে ঘুরতে হতো। মাঝে মাঝে কেমন যেন মনে হতো। আমি হাফ প্যান্ট ও হাফ শার্ট পরা এক তরুণ। আমার পেছনে চার জন লোক প্রকাশ্য দিবালোকে ঘুরছে। আমাকে পাহারা না দিলে নাকি পাকিস্তান টিকবে না। সেই পাহারা দেবার পালা শেষ হলে ২০ আগস্ট। আমি বিকালে আর্টভিলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। সাদা পোশাকের দুই ভদ্রলোক

www.nagorikpathagar.com

এসে বললেন—আমরা পুলিশের লোক। আপনাকে থানায় ওসি সাহেব ডেকেছেন। আমি বললাম, আমার যাবার সময় নেই। আমার সাথে ছিল আমার বন্ধু নারায়ণ দাশ শর্মা। নারায়ণ জামিনে মুক্তি পেয়েছে ১৮ আগস্ট। নারায়ণ বলল, তুই থানায় গিয়ে দেখে আয় তোকে কেন ডেকেছে। আমি বাসায় যাচ্ছি।

থানায় যাবার সাথে সাথে ওসি সাহেব বললেন, আপনার বাসায় যেতে হবে। আমি বললাম, কেন? আর বাসায় যেতে হলে আমি হেঁটে যেতে পারব না, রিকশায় যেতে হবে। আমার বাসার চারপাশে জল। আমি আর পিনাকী বোস কাকীমার বাসা পাহারা দিতাম। আমাদের এক কাজের মেয়ে ছিল। আর ছিল তার স্বামী। সেদিন পিনাকী বরিশালে ছিল না। কাজের মেয়েটির স্বামীও বাড়ি গিয়েছিল। ইতোমধ্যে কলেরা হয়ে কাজের মেয়েটি মারা গেল। আমি তখন একেবারে একা। কোনোমতে সকালের দিকে ওর সৎকারের ব্যবস্থা করে বাইরে বেরিয়েছি। এমন সময় পুলিশ এল বাসায়। আমাকে সাথে করে নিয়ে আমার বাসায় পৌঁছাল সন্ধ্যার পর।

এবার শুরু হলো তল্লাশি। আমার বাসায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পত্র-পত্রিকা ছিল। প্রতিটি পত্রিকা পেয়েই পুলিশ চমকে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক পুলিশ বলল—একটি রিভলবার পাওয়া গেছে। রিভলবারের কথা শুনে আমিও চমকে উঠলাম। দেখলাম একটি খেলনা রিভলবার। যাদের ফেলে যাওয়া বাড়িতে আমি ছিলাম এ খেলনা রিভলবার তাদের বাচ্চাদের। কিন্তু পুলিশকে কিছু বিশ্বাস করানো যায় না।

তারা বলছিল অনুশীলন সমিতির কথা। বলছিল, আপনার রাজনীতির হাতেখড়ি অনুশীলন সমিতির কাছে। অনুশীলন সমিতির নেতারা এই খেলনা রিভলবার দিয়েই ডাকাতি করত। সুতরাং এই রিভলবার আপনার নামেই থানায় জমা হবে।

থানায় ফিরতে ফিরতে রাত ১০টা হয়ে গেল। ওসি সাহেব খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন। কাগজে লিখলেন নির্মল সেনের বাড়ি তল্লাশি করা হয়েছে এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে...। এ কথা লিখতেই আমি বললাম, লিখুন, তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বিশেষ ক্ষমতা আইনের সাতের তিন ধারায়। ওসি সাহেব বললেন, না আপনাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৮ ধারায়।

আমি একদম চুপসে গেলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ১৮ ধারার অর্থ হচ্ছে বিনা বিচারে আটক। বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দি রাখা। আমি

www.nagorikpathagar.com

কোনো আদালতে যেতে পারব না। মামলা করতে পারব না। সরকারের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী যতদিন ইচ্ছে আমাকে জেলে রাখা যাবে। মাত্র ৮ দিন পর আমার বিএসসি পরীক্ষা। ভেবে পাচ্ছিলাম না কী করব।

তবে থানা কর্তৃপক্ষ খুবই ভালো ব্যবহার করেছিলেন আমার সাথে। ওসি সাহেব তাঁর বাসা থেকে বিছানা দিয়েছিলেন। খাবার দিয়েছিলেন। পরের দিন ভোরে এসে বললেন—আপনাকে তাড়াতাড়ি জেলে পাঠাতে হবে। আমি গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের ডাকছি। আপনার সাথে ওরা কথা বলতে পারে। ওদের হেফাজতে আপনাকে দেব না, তাহলে ওরা মারপিট করবে। আপনার আগে কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের ওপর বেদম অত্যাচার করা হয়েছে। আমি আপনাকে আগেই জেলে পাঠিয়ে দেব।

ওসি সাহেবের কথামতো গোয়েন্দা বিভাগ থেকে একজন লোক এল। আমার সাথে ঘণ্টা দু'য়েক কথাবার্তা হলো এবং কথাবার্তার শেষে আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো জেলখানায়। সে হচ্ছে আমার জেলজীবনের শুরু। দু'দিন বাদে গ্রাম থেকে কাকা এলেন আমার সাথে দেখা করতে। তিনি বাড়িতে খবর পেয়েছেন পুলিশের কাছ থেকে। পুলিশের বড় কর্মকর্তারা বাড়িতে চিঠি লিখেছেন, আপনাদের ছেলেকে বরিশাল থেকে নিয়ে যান। নইলে গ্রেফতার হতে পারে যে কোনোদিন। সে চিঠি বাড়ি পৌঁছেছিল আমি গ্রেফতার হয়ে যাবার পর।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে তখন এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র ইসলামের কথা বলে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলেন। পাকিস্তানের কোনো রূপরেখা তাঁদের সামনে ছিল না। সমস্যা দেখা দিল পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে। পাকিস্তান সৃষ্টি হলো মুসলমানদের স্বতন্ত্র বাসভূমির দাবিতে। বলা হলো—হিন্দু, মুসলমান দুই জাতি। তাদের সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি আলাদা। তাদের একই সাথে বসবাস করা সম্ভব নয়। তাই এই দুই জাতির জন্য দু'টি রাষ্ট্রের প্রয়োজন। কিন্তু পাকিস্তান প্রস্তাবে দুই রাষ্ট্রের হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠী বিনিময়ের কোনো প্রস্তাব ছিল না। পাকিস্তান প্রস্তাব মতে, ভারত ভেঙে দু'টি রাষ্ট্র হলেও উভয় রাষ্ট্রে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় জাতিই থাকবে। লোক বিনিময় হবে না। পাকিস্তান প্রস্তাবের এটাই ছিল সবচেয়ে দুর্বল দিক। মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাই। মুসলমানদের জন্যে ভারত ভেঙে পাকিস্তান করতে হবে। অথচ খণ্ডিত ভারতবর্ষের ভারত অংশে ৬ কোটি মুসলমানকে হিন্দুদের সাথেই বসবাস করতে হবে। আবার

www.nagorikpathagar.com

হিন্দুদের সাথে এক সাথে বসবাস করা যাবে না—এই চুক্তিতে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান হলেও পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গে দেড় কোটি হিন্দু থেকে গেল।

দেশ বিভাগের পূর্বে মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র কাছে এ প্রশ্নটি তুলেছিলেন ভারতীয় মুসলমানরা। তারা বলেছিলেন, হিন্দুদের সাথে থাকা যাবে না, এ চুক্তিতে আমরা পাকিস্তান আন্দোলন করেছি। অথচ আমাদের ভারতেই থেকে যেতে হচ্ছে। তাহলে আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? হিন্দুরা আমাদের বিশ্বাস করবে কেন? মুসলিম লীগ সভাপতি জিন্নাহ তখন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন। এ কথার জবাব তিনি ভারতের মাটিতে দিলেন না। পাকিস্তান পৌঁছে জিন্নাহ বিমানবন্দরে বললেন, রাজনৈতিকভাবে কোনো মুসলমান এখন আর মুসলমান নয়, কোনো হিন্দু আর কোনো হিন্দু নয়, সকলেই পাকিস্তানি। অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমানদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবেই থাকতে হবে। পাকিস্তান প্রস্তাবকে তিনি জোড়াতালি দিয়ে বাঁচাতে চাইলেন। প্রকৃতপক্ষে এভাবে জোড়াতালি দিয়ে পাকিস্তান প্রস্তাবকে বারবার বাঁচিয়ে ভারতকে ভাগ করা হয়েছিল ১৯৪৭ সালে।

এ প্রশ্ন উঠেছিল ভারত বিভাগ সম্পর্কিত আলোচনায়। আলোচনা হচ্ছিল ভারতের শেষ ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ও মোহাম্মদ আলী জিন্নার মধ্যে। তখন ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগ নিয়ে। জিন্নাহ প্রথম থেকেই বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের বিরোধিতা করেন।

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন জিন্নাকে বলেন যে, আপনি নিশ্চয়ই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা চান। সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্যই আপনি পাকিস্তান চেয়েছেন। যে পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যায় যে, আপনি নিশ্চয়ই হিন্দু শিখ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে অসম্মত হবেন না। কংগ্রেস ও শিখ সম্প্রদায় বাংলা ও পাঞ্জাবের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা চেয়েছে। তাদের প্রস্তাব বাংলা ও পাঞ্জাবের ভারত সংলগ্ন সংখ্যালঘু এলাকা ভারতের সাথে যুক্ত হোক অর্থাৎ পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করা হোক।

মি. জিন্নাহ এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, বাংলার একজন হিন্দু বা মুসলমান প্রথমে বাঙালি, পরে হিন্দু বা মুসলমান। পাঞ্জাবের একজন শিখ, মুসলমান বা হিন্দু প্রথমে পাঞ্জাবি, পরে হিন্দু, মুসলিম বা শিখ। সুতরাং সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বাংলা বা পাঞ্জাবকে ভাগ করা যায় না। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন বললেন, মি. জিন্নাহ, আপনার কথা মেনে নিতে হলে ভারতও ভাগ

www.nagorikpathagar.com

করা যায় না। কারণ ভারতের নাগরিকেরা প্রথমে ভারতীয়, পরে হিন্দু, মুসলমান বা শিখ। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের এই কথার পর জিন্নাহ তেমন কোনো জবাব দেননি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের প্রস্তাব মেনে নিতে হয়।

এছাড়া লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সাথে আলোচনায় বিভক্ত ভারতের ভারত ও পাকিস্তান অংশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন কংগ্রেস নেতা আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষ হিন্দু ও মুসলমানের ভিত্তিতে ভাগ হচ্ছে। অথচ পাকিস্তানে হিন্দুরা থাকছে, ভারতেও থাকছে মুসলমানেরা। তাদের নিরাপত্তা কী হবে? এ প্রশ্নের একটি অদ্ভুত জবাব দিয়েছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। তিনি বলেছিলেন, এই দুই দেশের সংখ্যালঘু একে অপরের জামানত হিসাবে বসবাস করবে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের ওপর অত্যাচার হলে, অত্যাচার হবে পাকিস্তানি হিন্দুদের ওপর। আবার পাকিস্তানি হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হলে, অত্যাচার হবে ভারতীয় মুসলমানদের ওপর। মাওলানা আজাদ এ মন্তব্য শুনে বলেছিলেন—এ উক্তি বর্বরের। বর্বরের এ সিদ্ধান্তের সাথে আমি আদৌ একমত নই। এর পরে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ আর ভারত বিভাগ সংক্রান্ত আলোচনায় যোগ দেননি।

তবে জিন্নাহর জন্যে শুধু সম্প্রদায়গত সমস্যা না, ভিন্ন সমস্যা ছিল পাকিস্তানে। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের মতো সংগঠিত ছিল না। মুসলিম লীগের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্য ছিল না। এছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পূর্বে নির্বাচনের ও সীমান্ত প্রদেশে সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গাফফার খানের নেতৃত্বে কংগ্রেস জিতেছিল। সিন্ধু এবং পাঞ্জাবেও মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। সুতরাং পাকিস্তান অর্জনে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব দিলেও সমগ্র পাকিস্তানে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব ছিল না। মি. জিন্নাহ বুঝেছিলেন, সাম্প্রদায়িক স্লোগান দিয়ে দেশ শাসন সম্ভব নয়। তাই তিনি লোক দেখানো চাল দিলেন। পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম সভাপতি হলেন তপশীলি সম্প্রদায়ের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

১৯৫০ সালের হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় তিনি ঢাকা থেকে ভারতে পালিয়ে যান। উল্লেখ্য, তফশীল ফেডারেশন ভিআর অম্বেদকর ও যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেছিল।

কিন্তু জিন্নাহ সাহেবের কোনো কৌশলই কাজে এল না। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে শক্তিশালী না হওয়ায় আমলা এবং সামরিক বাহিনী সক্রিয়

www.nagorikpathagar.com

এবং শক্তিশালী হয়ে উঠল। বিশেষ করে সামরিক বাহিনীতে এবং আমলাদের সঙ্গে পাঞ্জাবিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় পাঞ্জাবিরা পাকিস্তানে শক্তিশালী হয়ে উঠল।

বিরোধ দেখা দিল করাচি নিয়ে। অবিভক্ত ভারতে করাচি ছিল সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী। করাচি পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ায় সিন্ধুর রাজধানী স্থানান্তরিত হলো হায়দারাবাদে। সিন্ধু নেতারা এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন না। ইতোমধ্যে জিন্নাহ সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য পাঠান হলো কোয়েটার জিয়ারতে। সিন্ধুর নেতৃবৃন্দ সেখানে জিন্না সাহেবের সাথে দেখা করে বললেন, তারা করাচিতে সিন্ধুর রাজধানী চান। এই প্রতিনিধি দলের সাথে গভর্নর জেনালের জিন্নাহর কথা কাটাকাটি হলো। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠল।

আমি জেলে গিয়েছিলাম ১৯৪৮ সালের ২১ আগস্ট। তখন পূর্ববঙ্গে কোনো সংবাদপত্র ছিল না। কলকাতা থেকে ইত্তেহাদ, স্টেটসম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, আনন্দবাজার, যুগান্তর আসত। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে জেলখানায় হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডর একটি সংখ্যা হাতে এল। সে কাগজে একটি খবরে বলা হয়েছে—পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মরতে বসেছেন বা মারা গেছেন জিয়ারতে। তাঁকে দেখার কেউ নেই। তাঁর চিকিৎসা হচ্ছে না। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর এক সময় দেখলাম জেলখানার ভবনে ওড়ানো পাকিস্তানি জাতীয় পতাকা নামানো হচ্ছে। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়েছে। জিন্নাহ সাহেব মারা গেছেন। কোথায় মারা গেলেন জিন্নাহ সাহেব—জিয়ারতে? জিয়ারত থেকে বিমানে করাচি পৌঁছাবার সময় বিমানে? না করাচিতে তাঁর বাসভবনে? এ প্রশ্নের জবাব আজো মেলেনি।

বরিশাল জেলে তখন নতুন নতুন বন্দি আসছে। প্রায় প্রতিদিনই নিরাপত্তা আইনে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ বামপন্থী দলের সদস্য। তবে যারা গ্রেফতার হয়ে আসেন তাঁদের সকলের সাথে আমাদের দেখা হয় না। কারণ অধিকাংশ বন্দিকে তৃতীয় শ্রেণিতে রাখা হয়। রাখা হয় আমাদের চেয়ে দূরে। তাই তাঁদের সাথে দেখা হয় কদাচিৎ।

এর মধ্যে তিনজন বন্দি আমাদের এলাকায় এলেন। এঁরা হচ্ছেন—কমিউনিস্ট পার্টির নেতা নরেন্দ্রনাথ রায়, হিন্দু ছাত্র ফেডারেশনর প্রশান্ত দাশগুপ্ত এবং অন্যতম নেতা অজিত বসু। শুনেছি নরেন বাবু জীবিত নেই। প্রশান্ত দাশগুপ্ত'র সাথে দেখা হয়েছিল ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের

www.nagorikpathagar.com

বারাসাত স্টেশনে। তিনি বললেন—অনেক নির্যাতন সহ্য করলেও আপনারা জিতে গেলেন। অজিত বসুর কোনো খোঁজ আজো পাইনি। সেকালের পূর্ববাংলার জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁরা সকলেই দেশান্তরী হয়েছিলেন।

এই তিনজনের সাথে একই স্টিমারে বরিশাল থেকে ঢাকা এসেছিলাম ১৯৪৮ সালের অক্টোবরে। তখন স্টিমার ঘাট বাদামতলীতেই ছিল। ঢাকায় এমন ভিড় ছিল না। পুলিশ প্রহরায় ঢাকা জেলে এলাম ঘোড়ার গাড়িতে। এই ঘোড়ার গাড়ি ও বুড়িগঙ্গা নদীর এক দীর্ঘ স্মৃতি আছে আমার শৈশব জীবনের। বাবা তখন বই লিখতেন ঢাকায়। বিভিন্ন প্রকাশের সাথে চুক্তিতে বই লেখা। মূল লেখক বাবা হলেও বাজারে সেই বই বিক্রি হতো ভিন্ন নামে। আমরা তখন থাকতাম নারিন্দার ১৩ নম্বর দয়াগঞ্জ রোডে। সে সড়কের নতুন নাম শরৎগুপ্ত রোড। ঐ সড়ক থেকে স্বামীবাগের দিকে গেলে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কের রেল লাইন। ঐ রেল লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে কখনো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যেতাম। আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, এককালে রমনা কালীবাড়ি এলাকা অর্থাৎ রেসকোর্স ময়দানে এসে ঘোড়ার দৌড় দেখতাম। ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশন থেকে ৮ পয়সা অর্থাৎ দু'আনা ঘোড়ার গাড়িতে নারিন্দা যেতাম। বিকালে যেতাম বাবার বই'র এলাকা বাংলাবাজারে। সেখান থেকে বুড়িগঙ্গার তীরে করোনেশন পার্ক। করোনেশন পার্কে রাত ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত বসে থাকতাম। সন্ধ্যার পরে বরিশাল থেকে স্টিমার আসত। আলোতে চিকচিক করতো বুড়িগঙ্গার জল। তবে বুড়িগঙ্গা বরাবরই বড় নিস্তরঙ্গ। বরিশালের স্টিমার বাদামতলীর ঘাটে ভিড়লে বাসায় ফিরতাম। সে ১৯৩৯ সালের কথা।

১৯৪৮ সালের অক্টোবরে বরিশালের স্টিমারে বাদামতলীর ঘাটে এলাম। আবার ঘোড়ার গাড়িতে উঠলাম। এবার নারিন্দার বাসা নয়, একেবারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার। আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো পুরনো হাজতে। ঐ এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়া মুশকিল। আন্দামান থেকে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের ফিরিয়ে এনে পুরনো জেলে রাখা হয়েছিল। সে পুরনো জেল এখন সংস্কার করা হয়েছে।

১৯৪৮ সালের অক্টোবরে ঢাকা জেলে ঢুকে অবাক হলাম। বুঝতে শুরু করলাম পাকিস্তান কাকে বলে এবং কী প্রকার। উত্তরাধিকার সূত্রে পাকিস্তান সরকার অনেক কালাকানুন পেয়েছিল ব্রিটিশের কাছ থেকে। ঐ আইনে কোনো কারণ না দেখিয়ে যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যায়। আটক রাখা যায় অনির্দিষ্টকালের জন্যে। দেখলাম পাকিস্তান সরকার জন্মলগ্ন থেকেই এ

www.nagorikpathagar.com

আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু করেছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নয়, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পাকিস্তান সরকার যাকে খুশি গ্রেফতার করছে এবং আটক রাখছে। এর কোনো বাছ-বিছার নেই।

এই আইনে গ্রেফতার করে আটক রাখা হয়েছে নোয়াখালীর রামগঞ্জ থানার খিলপাড়া গ্রামের আবুল কাসেম চৌধুরীকে। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় অনেক খুনের অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। সরকারি ভাষ্য হচ্ছে—ঐ আইনে আটক করা না হলে কাসেম চৌধুরীকে খুনের আসামী হতে হয়। তাকে বাঁচাবার জন্যে সরকার তাকে নিরাপত্তাবন্দি করেছিল। অথচ কাসেম চৌধুরীর বক্তব্য ভিন্নরূপ।

ঐ কালো আইনে আটক রাখা হয়েছে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জের নাসির উদ্দিন পাটোয়ারী ও তোফাজ্জল হোসেন পাটোয়ারীকে। একেবারেই তুচ্ছ ঘটনার জন্যেই তাদের আটক করা হয়েছে। পাড়া প্রতিবেশীর বিবাদ এবং থানার সাথে ঝগড়াই এই আটকের কারণ। ছোট ভাই তোফাজ্জল তখন ছাত্র। তাকে দেখতাম মুক্তির জন্যে প্রতিদিন সরকারের কাছে চিঠি লিখত। সে দরখাস্তে লেখা হতো পাকিস্তান আন্দোলনে তাদের ভূমিকার কথা। আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে সিলেটের গণভোটে অংশগ্রহণ। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় সিলেট ভারত না পাকিস্তানের অংশ হবে, এ প্রশ্নে গণভোট হয়। গণভোটে সিদ্ধান্ত হয় সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অদ্ভুত বিশেষ ক্ষমতা আইনে তিনজন ব্যক্তিকে আটক করে আনা হয়েছিল কুমিল্লা থেকে। এদের নাম ফজর আলী, অম্বর আলী ও সেকেন্দার আলী। তখন কুমিল্লাব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন আইএ খান। ভারতের প্রথম পাকিস্তান হাইকমিশনার ইসমাইল খানের ছেলে। অপর এক বিখ্যাত আমলা মাদানীর ভাই। ঐ তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা আইএ খানের আর্দালিকে প্রহার করেছিল। এ অভিযোগে তিন ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করা হলো। কুমিল্লার পুলিশ লিখে পাঠান, এই তিন ব্যক্তি জেলের বাইরে থাকলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সুতরাং তৎকালীন স্বরাষ্ট্র দফতর সবকিছু অনুধাবন করে নির্দেশ দিলেন, এদের অনির্দিষ্টকালের জন্যে কারাগারে আটক রাখা হোক। এ হচ্ছে সেকালের পাকিস্তান ও পাকিস্তানের শাসকদের চিত্র।

সেকালের কথা মনে হলে আমার কুমিল্লার সেই সেকেন্দার আলীর কথা মনে পড়ে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আর্দালিকে প্রহারের দায়ে অভিযুক্ত সেকেন্দার

www.nagorikpathagar.com

আলী। ফজর আলীর নেতৃত্বে কাজ করে। দিন আনে দিন খায়। ৬ মাস হয়ে গেছে জেলখানায় এসেছে। প্রতিরাতে চোখের জল ফেলে স্ত্রী-পুত্রের জন্য। স্ত্রীর নাম ছমিরন বিবি। সপ্তাহে সপ্তাহে স্ত্রীকে চিঠি লিখত সেকেন্দার আলী। চিঠির লেখক আমি। সেকেন্দার আলীর বড্ড ভয়— দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির ফলে স্ত্রী যদি ভিন্ন ঘরে চলে যায়! কী হবে তার উপায়? জেলখানায় সেকেন্দার আলীর সাথে তারপর বেশিদিন দেখা হয়নি। আমরা অনশন করার ফলে আমাদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। শুনেছি মাস ছ'য়েক পর সেকেন্দার আলীকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। আমার মুক্তি পেতে পেতে বছর পাঁচেক। তারপর অনেকবার জেলে যাওয়া-আসা করেছি। কুমিল্লা গিয়েছি অসংখ্যবার। ফজর আলী, সেকেন্দার আলী ও অম্বর আলীর খোঁজ করা হয়নি।

ঢাকা জেলে প্রথম রাতে ঘুম ভাঙল এক বন্দির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নায়। উজ্জ্বল এক তরুণ ভারতীয় বিমানবাহিনীর পাইলট। বাড়ি মানিকগঞ্জের জামিয়তা। ঢাকায় আসা-যাওয়া ছিল দীর্ঘদিন ধরে। প্রেমে পড়েছিলেন এক গায়িকার। গায়িকার দু'বোন তখন নজরুল সঙ্গীত গাইতেন ঢাকা বেতারে। এই প্রেমের উপাখ্যান শুরু ভারত বিভাগের পূর্বে।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হলো। গায়িকা দুই বোন ঢাকায় ওয়ারীতে থেকে গেলেন। বিমানবাহিনী পাইলট জামিয়তার শচীন রায় অপসন দিয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যোগ দিলেন। ভারত ভাগের পরেও শচীন রায় দু'একবার ঢাকায় এসেছেন। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ শুরু হওয়ায়। শচীন রায়ের কাছে শুনেছি সে নাকি ভারতীয় বিমান নিয়ে কাশ্মীর ফ্রন্টে এক দফা যুদ্ধ করেছে। তারপর এসেছিল ঢাকায় বেড়াতে। পাকিস্তান সরকার তাকে গ্রেফতার করেছে। কোনো মামলা দেয়নি। আটক রেখেছে অনির্দিষ্টকালের জন্যে।

শচীন রায় জানে না সে কবে মুক্তি পাবে। কোথায় যাবে? কিভাবে যাবে? যাদের জন্যে ঢাকা এসেছিল তারাও দূরে সরে গেছে। কারণ তখন পাকিস্তানে চলছে ভয়াবহ এক ভয়ের রাজত্ব। কবে কিভাবে শচীন রায় জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছে তা জানি না। শুনেছি সে দেশ ছাড়েনি। জামিয়তা ঘর বেঁধেছে। তবে সে খবরও দীর্ঘদিন পূর্বের।

ঢাকা জেলে ঘুম ভাঙার সাথে সাথে ধরণী বাবুর কণ্ঠ শোনা গেল। ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ধরণী রায় রেল শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে প্রথম থেকে ছিলেন। গেফতার হয়ে এসেছিলেন অনেকের সাথে। প্রথমবার মুক্তি পেলেও দ্বিতীয়বার তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়নি।

www.nagorikpathagar.com

দেখা হয় রণেশ দাশগুপ্তের সাথে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভদ্রলোক রণেশ দাশগুপ্ত। উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন না। নিজের মত কখনও অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চান না। সকলেই তাঁর বন্ধু। কারণ শত্রু হবার উপায় নেই। দেখা হলো বরিশালের জ্যোতি ব্যানার্জির সাথে। ডাক নাম নুটু ব্যানার্জি। বরিশালের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। লেখাপড়া করেন। দীর্ঘকাল পাকিস্তানের জেলে ছিলেন। মুক্তি পেয়ে দেশান্তরী হলেন। পরবর্তীকালে শিক্ষকতা করতেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ঢাকা জেলে দেখা হলো হরিগঙ্গা বসাকের সাথে। আদি বাড়ি ঢাকার বনগ্রাম লেনে। রাজনীতি করতেন আগরতলায়। আগতলায় ত্রিপুরা কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। তাঁর গ্রেফতার এবং বন্দি জীবন এক আশ্চর্য ঘটনা।

ভারত বিভাগের সময় একটি কাউন্সিল করা হয়েছিল। কাউন্সিলের নাম ডিভিশনাল কাউন্সিল। এই কাউন্সিলে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি থাকত। ত্রিপুরা তখন দেশীয় রাজ্য। ত্রিপুরা কংগ্রেসের নেতা হিসাবে হরিগঙ্গা বসাক এ ডিভিশন কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে রাগ ছিল পাকিস্তান সরকারের। ১৯৪৮ সালে অসুস্থ মাকে দেখার জন্য হরিগঙ্গা বসাক আগরতলা থেকে ঢাকা এসেছিলেন। তখন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর গ্রেফতারের নির্দেশ তারিখ ছিল ১৯৪৮ সালের ১৯ জুলাইয়ের। অথচ তিনি ঢাকা এসেছিলেন ২৯ জুলাই। এ নিয়ে হরিগঙ্গা বাবু অনেক লেখালেখি করেছিলেন। কিন্তু কোনো কাজে আসেনি। ১৯৫০ সালে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন হরিগঙ্গা বসাক ঢাকা জেলে। যারা আগরতলা গেছেন তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন সেই শহরের একটি সড়কের নাম হরিগঙ্গা বসাক সড়ক। তখন জেলখানার রাজনীতির একটি বিশেষ দিক ছিল। ব্রিটিশ আমলে যাঁরা জেলে ছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন কংগ্রেসের নেতা ও কর্মী। কংগ্রেস, আরএসপি, ফরোয়ার্ড ব্লক, কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল সিএসপির সদস্য থাকলেও সকলেই আবার কংগ্রেসের সদস্য ছিল। জেলখানায় তারা কংগ্রেসি বলে পরিচিত ছিল। অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা ও কর্মী ছিলেন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আসা। ব্রিটিশ সরকার এই সকল রাজবন্দিদেরই ভারত স্বাধীন হবার আগে মুক্তি দিয়েছিল।

কিন্তু পাকিস্তানে সেই মুক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই আবার রাজনৈতিক ধরপাকড় শুরু হয়। যাঁরা গ্রেফতার হলেন তাদের অধিকাংশই এককালের কংগ্রেস কর্মী ও নেতা হলেও তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ

www.nagorikpathagar.com

ছিলেন বামদলের নেতা ও কর্মী। অধিকাংশই হিন্দু মধ্যবিত্ত ঘর থেকে আসা। তাই জেলখানার কর্মচারী ও কয়েদিদের কাছে নতুন রাজবন্দিদের নতুন কোনো পরিচয় হলো না। তাদের কাছে এরা কংগ্রেসি। এরা হিন্দু এবং এককালের পাকিস্তান-বিরোধী। তাদের ধারণা হলো পাকিস্তান-বিরোধী বলেই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এ জন্যে পাকিস্তান সরকারকে তেমন দোষ দেয়া যায় না।

এই ঐতিহ্য ধরে ঢাকা জেলের কর্মকর্তারা আমাদের সাথে তেমন আচরণ করতেন। ইতোমধ্যে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার হয়ে এলেন কমিউনিস্ট পার্টির ফরিদ খান। জেল কর্তৃপক্ষ কিছুতেই তাঁকে আমাদের ওয়ার্ডে দিলেন না। একদিন তাঁকে ভিন্ন সেলে রাখা হলো। বলা হলো—আপনি মুসলমান, আপনি হিন্দু বন্দিদের সাথে কেন থাকবেন? আপনার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করা হবে। জবাবে ফরিদ খান বললেন, আমি মুসলমান বা হিন্দু নই। আমি কমিউনিস্ট। আমাকে অন্যান্য রাজবন্দিদের সাথেই থাকতে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত ফরিদ খানকে আমাদের ওয়ার্ডেই পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ঢাকা জেলে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে দীর্ঘ সময় লাগে। পরবর্তীকালে অসংখ্য মুসলমান কমরেড জেলে আসতে থাকায় এক সময় পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়। এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে শুরু করে ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর।

তবে জেলের সমস্যা আদৌ সাম্প্রদায়িক সমস্যা ছিল না। মুখ্য ছিল রাজনৈতিক সমস্যা। সেকালে রাজবন্দি হিসাবে যারা ছিল তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই কমিউনিস্ট পার্টির। এছাড়াও ছিল কংগ্রেস, আরএসপি, ফরোয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভার সদস্য। আমরা সকলেই রাজনীতি করি বলে এই রাজনীতির ছাপ পড়েছিল জেলখানায়। সে রাজনীতির উদ্যোক্তা ছিল মুখ্যত কমিউনিস্ট পার্টি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলনের নতুন কৌশল নিয়েছে। ভারত বিভক্ত হলেও কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়নি। তাই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কৌশল প্রয়োগ ছিল পাকিস্তানের জন্যে।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য হচ্ছে ব্রিটিশ চলে গেলেও ভারত বা পাকিস্তান প্রকৃতার্থে স্বাধীন হয়নি। তাই ক্ষমতাসীন সরকারকে আঘাতের পর আঘাত করে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। জেলখানায় কৌশল হবে জেলখানার যে কোনো ছুতায় সঙ্কট সৃষ্টি করতে হবে। জেলখানার সঙ্কটে অঘটন ঘটলে বাইরে তার প্রতিক্রিয়া হবে। মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করবে। সরকারকে আঘাত করবে। সরকারের পতন ঘটবে।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু জেলখানায় এ কাজটি কী করে করা যাবে? বলা হলো—জেল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি দাওয়া পেশ করো। দাবি মানা না হলে অনশন ধর্মঘট করো। আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে অনশনকে ভিত্তি করে।

আমাদের দল বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল আরএসপি। আমাদের দলের মূল্যায়ন হলো, কমিউনিস্ট পার্টির এ সিদ্ধান্ত ভুল। হঠকারী কৌশল। দেশ স্বাধীন হলেও সমাজ পরিবর্তন করা না গেলে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না—এ বক্তব্য সঠিক। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হবার পরপরই এ তত্ত্ব গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতি হয়নি। এ ছাড়া এ আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো শক্তিশালী শ্রেণি সংগঠনের অভাব আছে। আর সমগ্র উপমহাদেশে তখন সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ভয়াবহ। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টির এ তত্ত্ব আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। জেলখানার কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার সদস্যদের এ আন্দোলনে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু জেলখানায় রাজবন্দিদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর সর্বকনিষ্ঠ রাজবন্দি হিসেবে জেলে এসেছিল প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা অনিল মুখার্জির ভাইয়ের ছেলে অতীশ মুখার্জি। আমি ঢাকা জেলে আসার পূর্বে সে মুক্তি পায়। আমার সাথে পরবর্তীকালে আরো দু'জন বয়সে কম রাজবন্দি ছিল। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মুন্সীগঞ্জের শফিউদ্দীন আহমদ যিনি সাংবাদিক হিসাবে পরিচিত। আর একজন খুলনার আনোয়ার হোসেন। ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজবন্দি অবস্থায় জেল পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন। আমার সিদ্ধান্ত হলো অন্য সবাই অনশন করলে আমার পক্ষে ভাত খাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমিও অনশনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমাদের অনশনের পূর্বে কয়েকটি ঘটনা ঘটল। আমাদের প্রতিনিধি কমরেড জ্যোতি ব্যানার্জিকে ঢাকা জেল থেকে অন্য জেলে পাঠানো হলো। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার দেখা হয়নি। আমাদের নতুন প্রতিনিধি হলেন রণেশ দাশগুপ্ত। আমাদের পক্ষ হয়ে তিনি জেল কর্তৃপক্ষের সাথে দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করতেন।

এর মধ্যে একদিন জেলখানার সবচেয়ে বড় কর্মকর্তা সার্জন জেনারেল কর্নেল টিডি আহমেদ জেলখানায় এলেন। তিনি নাকি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস (আইজি) অর্থাৎ কারাগারসমূহের মহাপরিদর্শক। কর্নেল টিডি আহমদ আমাদের ওয়ার্ডে এসে আমার দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন—এই বাচ্চা, তুমি এখানে কেন? সুপারিন্টেডেন্টকে বললেন, রেকর্ড নিয়ে এসো। একে

www.nagorikpathagar.com

রিলিজ করে দাও। একজন ডেপুটি জেলার এগিয়ে এসে বললেন, স্যার উনি রাজবন্দি। এদের বিচার নেই। জামিন নেই। তাই মুক্তি দেয়া যাবে না। কর্নেল টিডি আহমদ বললেন, ইজ ইট পাকিস্তান?

আমাদের অনশনের দিন নির্ধারিত হলো। ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ। ঐ দিন পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির রোড ইউনিয়নের ডাকে রেল ধর্মঘট। আমার কাছে এ সিদ্ধান্ত সঠিক মনে হলো না। এমনিতে আমাদের ভারতের দালাল বলা হয়, তারপরে একই দিনে দু'দেশে হরতাল ডাকা আদৌ সঠিক কি!

কমিউনিস্ট পার্টির এক বন্ধুর সাথে আলোচনা করলাম। নাম নরেশ চক্রবর্তী। বাড়ি কুমিল্লা। এক সময় আরএসপি করতেন। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে গিয়েছেন। তিনি আমার কথা শুনে হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগান দিই। আমাদের এত ভয় কেন? আমি শুধু বুঝতে পারলাম না—ঢাকা জেলের অনশনের সাথে কলকাতার রেল শ্রমিকদের আন্দোলনের সম্পর্ক কী। জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে নরেশ বাবু কলকাতায় যান। ১৯৭১ সালে শুনেছি নাকতলায় আছেন। সিপিআই(এম)-এর সদস্য।

১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ ঢাকা জেলে অনশন শুরু হলো। অনশন টিকল না। পূর্ববাংলা সরকারের মৌখিক বিশ্বাসে ১৫ মার্চ অনশন প্রত্যাহার করা হলো। পূর্ব বাংলার রাজবন্দিদের জীবনে এক ভয়াবহ নতুন নির্যাতন নেমে এল।

ব্রিটিশ আমলে জেলখানায় রাজবন্দিদের বছরের পর বছর সংগ্রাম করতে হয়েছিল নিজেদের সম্মান ও মর্যাদার জন্য। শেষ দিকে ব্রিটিশ সরকার তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলে। ১৯৪০ সালে প্রণীত হয়েছিল সিকিউরিটি প্রিজনার্স রুল ১৯৪০। এই বিধান বলেই জেলখানায় বিশেষ সুবিধা দেয়া হতো রাজবন্দিদের।

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে সাথে পাকিস্তান সরকার বিনা কারণে ধরপাকড় এবং বিনা বিচারে আটক রাখার আইন উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল ব্রিটিশের কাছ থেকে। তেমনি ১৯৪০ সালের রাজবন্দিদের জন্য প্রণীত রুলসও পেয়েছিল। ১৯৪৯ সালের মার্চের অনশন ধর্মঘটের পর পূর্ববঙ্গ সরকার রাজবন্দিদের ঐ আইন বাতিল করলেন। মৌখিক আশ্বাসকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রাজবন্দিদের সুবিধাগুলো কেড়ে নিলেন।

এবার রাজবন্দিরা পরিণত হলো সাধারণ কয়েদীতে। কোনো মর্যাদা নয়। তাদের সাথে আচরণ শুরু হলো চোর-ডাকাতের মতো। এ সকল অপরাধে

www.nagorikpathagar.com

যারা গ্রেফতার হয় বা যাদের সাজা হয় তাদের তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে জেলে রাখা হয়। এই শ্রেণির প্রাপ্তি নির্ভর করত সামাজিক-পারিবারিক অবস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশার ওপর। বিনা বিচারে আটক রাজনীতিকদের প্রশ্নে এ ধরনের কোনো শ্রেণি বিভাগ ছিল না ব্রিটিশ আমলে। এ কাজটি করলেন পাকিস্তান সরকার ১৯৪৯ সালে।

আমাদের হাতে গোনা কয়েকজনকে দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা দেয়া হলো। বাকি সবাইকে পরিণত করা হলো তৃতীয় শ্রেণির কয়েদীতে। অর্থাৎ থালা-বাটি কম্বল জেলখানার সম্বলের অধিকারী বানানো হলো তাদের। অথচ এই অনশনের আগে তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা ছিল। খাট, লেপ, তোষক, মশারি, জুতো, জামা, স্যুট, ব্রাশ, সাবান, পেস্ট, কোট, উন্নতমানের খাবার ব্রিটিশ প্রণীত বিধি অনুযায়ী সব কিছুই ছিল। ১৯৪৯ সালের মার্চের প্রথম অনশন ধর্মঘটের পর এদের সামনে এদের খাট-তোষক, লেপ নিয়ে যাওয়া হলো। পাঠানো হলো থালা বাটি কম্বল। আমাদের অন্য ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হলো। আমরা পৃথক হলাম। সেই পৃথক হবার পরে অনেকের সাথেই আর আমার আজো দেখা হয়নি। এদের মধ্যে অধিকাংশই পরবর্তীকালে দেশান্তরী। আর এদেশে যারা ছিল তারা লোকান্তরিত বা রাজনীতিতে আদৌ নেই।

সুতরাং শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্ব বা কৌশল নয়। রাজবন্দিদের হৃত অধিকার ফিরিয়ে আনার দাবিতেই আবার আন্দোলনে যেতে হলো। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দ্বিতীয় অনশন শুরু হলো মে মাসে। সে মাসে অনশন ধর্মঘট শুরু হবার পূর্বে ঢাকায় আন্দোলন হচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের নিয়ে। এপ্রিল মাসে এ আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। এই আন্দোলনে শরিক হবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ৬ জনকে ৪ বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার, ১৫ জনকে হল থেকে বহিষ্কার। ৫ জনের ১৫ টাকা ও ১ জনের ১০ টাকা জরিমানা করা হয়।

১৫ টাকা যাঁদের জরিমানা হয় তাদের তালিকায় ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ আন্দোলনের সময় গ্রেফতার হন আব্দুল মতিন, এনায়েত করিম, খালেক নওয়াজ, আজিজুর রহমান, বাহাউদ্দিন চৌধুরী ও নিতাই গাঙ্গুলী। পরবর্তীকালে নিতাই গাঙ্গুলী ব্যতীত সকলকেই মুক্তি দেয়া হয়। ঢাকা জেলা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল আরএসপি'র সম্পাদক নিতাই গাঙ্গুলী আমাদের সাথেই থেকে গেলেন। তিনি আমাদের সাথে দ্বিতীয় অনশনে অংশ নিলেন।

www.nagorikpathagar.com

দ্বিতীয় অনশনের সময় নগ্নরূপ প্রকাশিত হলো মুসলিম লীগ সরকারের। পূর্ববাংলা সরকার একটি প্রেসনোট দিল জেলখানায় অনশন সম্পর্কে। প্রেসনোটের মর্মার্থ হলো—ব্রিটিশ আমলে রাজবন্দিরা দেশপ্রেমিক ছিল তাই তাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেয়া হতো। এখন আর তারা দেশপ্রেমিক নয়। সুতরাং সে সুবিধা দেয়া যাচ্ছে না।

এ ধরনের প্রেসনোটের অন্যতম কারণ হলো—প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্রিটিশবিরোধী তেমন কোনো আন্দোলন করেনি। পূর্ববাংলায় যারা সরকারে এসেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কোনোদিন জেল খাটেনি। রাজবন্দিদের সম্মান বা মর্যাদা সম্পর্কে এদের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। একমাত্র স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহারের কিছুটা বাম ঘেঁষা গন্ধ ছিল। আর সকলেই ছিল উকিল-মোক্তার এবং চাকরিজীবী। রাজনীতি এদের মুখ্য পেশা ছিল না। শুধু ছিল অন্ধ কংগ্রেস এবং বাম রাজনীতির বিরোধিতা।

২৪ দিন পর দ্বিতীয় অনশন ধর্মঘট শেষ হলো জেলমন্ত্রী মফিজউদ্দীন, মুসলিম লীগ নেতা ফকির আবদুল মান্নান ও কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধরের সাথে আলোচনার পর। তবে সে আলোচনা কোনো কাজে আসেনি।

আমাদের অনশন ধর্মঘট রাজবন্দিদের দাবি আদায়ের নামে হলেও মুখ্যত ছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির ভুল কর্মপন্থার ফল। ফলে তৃতীয়বারের মতো আবার অনশন শুরু হলো আগস্ট মাসে। এ অনশন স্থায়ী হয় ৪০ দিন। এবারও কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

আমি কমিউনিস্ট পার্টি করি না। ভিন্ন দলের লোক। তাদের সমর্থনে বার বার অনশন করছি। শরীর ভেঙে গেছে। তাই প্রতিবারই অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহারে সময় আমার সাথে মতানৈক্য হতো। ধর্মঘট প্রত্যাহারের বিরোধী ছিলেন—দিনাজপুরের ঋষিকেশ ভট্টাচার্য, কিশোরগঞ্জের নগেন সরকার, চট্টগ্রামের আব্দুস সাত্তার। আমি এদের পক্ষে থাকতাম।

তৃতীয় অনশন অর্থহীনভাবে প্রত্যাহার হওয়ায় আমাদের মনে ভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিল। দেখা গেল কমিউনিস্ট পার্টি নতুন করে অনশনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। শুধু অপেক্ষা করছে একটা অজুহাতের। সে অজুহাত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে সৃষ্টি করলেন নাদেরা বেগম। শুনলাম নাদেরা বেগম ও দেবপ্রসাদ মুখার্জি নতুন নির্দেশ নিয়ে এসেছে জেলখানায়। অর্থাৎ জেলের আন্দোলন তীব্র করতে হবে। তাই চতুর্থবারের জন্য অনশন শুরু হলো ঢাকা জেলে ১৯৪৯ সালের ২ ডিসেম্বর।

শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বরের অনশন ধর্মঘটে আমাদের যাওয়া হয়নি। দলের কঠিন নির্দেশ হলো—কমিউনিস্ট পার্টির অনশনের সিদ্ধান্ত হটকারী। এই

www.nagorikpathagar.com

কৌশল আদৌ রাজনৈতিক কৌশল নয়। এই অনশন ধর্মঘট আদৌ রাজনৈতিক দিক থেকেও সঠিক নয়। তবুও আমরা প্রথম দিকে এই অনশনে ছিলাম। আমরা অর্থাৎ আরএসপি'র আমি ও নিতাই গাঙ্গুলী। প্রথমে কথা হয়েছিল মহিলা ওয়ার্ডে হামলার জন্য ৭ দিন অনশন করা হবে। দাবি মানা না হলে অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। কমিউনিস্ট পার্টি তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনশন অব্যাহত রাখে। কারো সাথে আলোচনা না করেই এ অনশন ৫২ দিন চলেছিল এবং এই অনশন শেষ হয় ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে।

১৯৪৯ সালে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল টাঙ্গাইলের উপনির্বাচন। এই আসনে এককালে নির্বাচিত হয়েছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মাওলানা ভাসানীর নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়, তিনি নির্বাচনের হিসাব দাখিল করেননি বলে। ১৯৪৯ সালে এই আসনে উপনির্বাচনে বিরোধী দলের প্রার্থী হলেন মোহাম্মদ শামসুল হক। শামসুল হক মুসলিম লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে জয়লাভ করেন। কিন্তু তাঁর জয়লাভও কোনো কাজে আসেনি। তার নির্বাচনও ট্রাইব্যুনাল বাতিল করে দেয়। আমাদের কাছে ছিল এ এক দারুণ খবর। মাসের পর মাস অনশনের মধ্যে এ খবর ছিল আশার খবর। পাকিস্তান সৃষ্টির দু'বছরের মধ্যে পাকিস্তানের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় রাজনৈতিক দিক থেকে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই শামসুল হক আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্মলগ্নে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

১৯৫০ সালের জেল জীবন শুরু হলো এক নতুন প্রেক্ষিতে। মনে হলো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নীতির পরিবর্তন হচ্ছে। এছাড়া জেলখানায় অনশন করার মতো অবস্থাও কারো ছিল না। দীর্ঘদিন অনশনের ফলে প্রায় সকলেরই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছিল। এরমধ্যে একদিন দিনাজপুরে ক্ষেমেশ চ্যাটার্জি পত্রিকা হাতে নিয়ে সোরগোল শুরু করেছেন। ক্ষেমেশ চ্যাটার্জি বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির লোক (রিভল্যুশনারি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া—আরসিপিআই)। তাঁর নেতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিবারের সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর। সৌমেন্দ্র ঠাকুর লেনিনের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি সপ্তম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রেসিডিয়ামের সদস্য ছিলেন। স্ট্যালিনের সাথে মতের মিল না হওয়ায় তিনি ভারতে এসে আরসিপিআই গঠন করেন। তারই দলের ক্ষেমেশ চ্যাটার্জি মাত্র কিছুদিন আগে দিনাজপুর থেকে ঢাকা জেলে এসেছিলেন। ক্ষেমেশ বাবু অনশনে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ঘোরতর বিরোধী।

www.nagorikpathagar.com

ক্ষেমেশ বাবুর হাতে স্টেটসম্যান পত্রিকা ছিল। ঐ পত্রিকা পড়েই তিনি চিৎকার করছিলেন। খবরটি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে আপাতত সরকার বিরোধী আন্দোলন স্তিমিত করার নির্দেশ দিয়েছে। ক্ষেমেশ বাবুর ধারণা হচ্ছে—নিশ্চয়ই এশিয়ায় কোনো বড় ধরনের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। যে ঘটনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন জড়িয়ে পড়তে পারে।

ক্ষেমেশ বাবু এই মন্তব্য করেছিলেন ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে। তাঁর মন্তব্য সত্যে প্রমাণিত হলো জুন মাসে। জুন মাসে কোরিয়া সীমান্তে সংঘর্ষ শুরু হয়। উত্তর কোরিয়াকে সাহায্য সহযোগিতা করে সোভিয়েন ইউনিয়ন ও চীন। দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে দাঁড়ায় জাতিসংঘের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গ। এ যুদ্ধ তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল।

এই ১৯৫০ সালে আরেক ঘটনা ঘটল হাইকোর্টে। আমি ঢাকা হাইকোর্টে আমার আটকাদেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলাম। জেলখানা থেকে আমার আবেদনপত্র লিখে দিয়েছিলেন দেবেশ ভট্টাচার্য। দেবেশ বাবু বিশিষ্ট আইনজ্ঞ। ময়মনসিংহে প্র্যাকটিস করতেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ময়মনসিংহের আদালতে আন্দোলনে গ্রেফতার ও দণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষে মামলা করতেন। এটাই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় অপরাধ। তাই বিশেষ ক্ষমতা আইনে তাঁকে গ্রেফতার ও আটক রাখা হয়। দেবেশ বাবু পরবর্তীকালে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি হন।

আমার আবেদপত্র হাইকোর্ট গ্রহণ করে। আমি কলকাতায় আমার আত্মীয়দের কাছে ভালো উকিল নিযুক্ত করার জন্যে চিঠি লিখি। ঢাকায় তখন ওকালতি করতেন বর্মা প্রত্যাগত রায় বাহাদুর রমেশ তালুকদার। তাঁকে কলকাতায় ডেকে পাঠিয়ে ব্রিফ করে আমার মামলার জন্য নিয়োগ করা হয়। এ সকল খবর জেলখানায় খুব পাওয়া যেত না। শুধু জানতাম হাইকোর্টে আমার মামলার শুনানি হবে। আমার মামলা ছিল সেকালের পূর্ব বাংলার দ্বিতীয় মামলা। নিরাপত্তা বন্দি হিসাবে প্রথম মামলা হয়েছিল দবিরুল ইসলামের। সে মামলায় উকিল ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

এর মাঝখানে হঠাৎ একদিন জেল অফিসে আমার ডাক পড়ল। দেখলাম এক আইবি অফিসার বসে আছেন। তিনি বললেন, আপনার নাম কি নির্মল সেন? আপনি রাশিয়ার লোক। আপনি কোনোদিন জেল থেকে মুক্তি পাবেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তখন তিনি হাইকোর্টের শুনানির এক অপূর্ব বিবরণ দিলেন। হাইকোর্টে তখন আমার মামলার বিচারপতি ছিলেন জাস্টিস

www.nagorikpathagar.com

এলিস, জাস্টিস ইস্পাহানি ও জাস্টিস ইব্রাহিম। আমার পক্ষের উকিল অ্যাডভোকেট রায়বাহাদুর রমেশ তালুকদার নাকি বলেছিলেন, মাননীয় বিচারপতি, আমার মক্কেল নির্মল সেনের বয়স খুব কম। সে গান্ধী পরবর্তী যুগের রাজনৈতিক কর্মী এবং সহিংসতায় বিশ্বাস করে না। বিচারপতি এলিস অ্যাডভোকেট তালুকদারকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি লেনিনের নাম শুনেছেন? লেনিন সোভিয়েত ইউনিয়নে সহিংস বিপ্লব করেছিল। আপনার মক্কেল নির্মল সেন বরিশালে লেনিন দিবস পালন করেছেন। সুতরাং নির্মল সেন অহিংসায় বিশ্বাস করে, এ তথ্য সঠিক নয়।

গোয়েন্দা বাহিনীর ভদ্রলোক হাইকোর্টের শুনানির এই অংশটুকু শুনেই জেলখানায় চলে এসেছিলেন এবং তাঁর ধারণা বলেছিলেন আমাকে। তিনি নিঃসংশয় যে আমি রাশিয়ার লোক এবং কোনোদিনই আমার মুক্তি হবে না। তবে এ কথা সত্য যে ঢাকা হাইকোর্ট আমার রিট পিটিশন অগ্রাহ্য করেছিল। একই রায়ে আমার সাথে আরো ২১ জনের রিট পিটিশন অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

তবে এ চিত্রের অপর পিঠও আছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারাগারে আটক রাজবন্দিদের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করা হয়। আমাদের পক্ষে উকিল ছিলেন হামিদুর রহমান ও বীরেন চৌধুরী। হামিদুর রহমান পরবর্তীকালে হাইকোর্টের বিচারপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন এবং পাকিস্তানের রাজনীতিতে পরিচিত হয়েছিলেন বিভিন্ন কারণে। তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন শেরেবাংলা এ.কে ফজলুল হক। এবার হাইকোর্টের রায়ে আমাদের মুক্তির আদেশ দেয়া হলো। অ্যাডভোকেট জেনারেল তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনকে আমাদের মুক্তি দেবার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার অনড়। তারা নতুন অর্ডিন্যান্স জারি করল। ঢাকা জেলের চারপাশে ঘিরে ফেলা হলো পুলিশ ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলের লোক দিয়ে। আমাদের জেল গেটে নিয়ে যাওয়া হলো। এক এক করে মুক্ত করে জেলের বাইরে দাঁড় করানো হল। আর সাথে সাথে ভিন্ন পুলিশ অফিসার আমাদের নতুন নির্দেশ হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আপনাদের এই আইনে গ্রেফতার করা হলো এবং আপনাদের ঢাকা জেলেই আটক রাখা হবে।

সে এক অপূর্ব নাটক। হাইকোর্টের নির্দেশে আমাদের ছেড়ে দেয়া হতে পারে এমন একটা খবর পাওয়া গিয়েছিল আগেই। অনেকে উৎফুল্ল হয়েছিল। ভেবেছিল লৌহ কপাটের বাইরে হয়তো নিজের বাড়ি যাওয়া যাবে। অনেকে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু তেমনটি ঘটল না। সকলকে নতুন

www.nagorikpathagar.com

আটকাদেশ দিয়ে আবার জেলখানায় ঢুকতে হলো। তখনকার মনের অবস্থা যারা কোনোদিন জেলে যায়নি, তাদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কিছুদিন পরে আরেকটি ঘটনা ঘটল আমাকে নিয়ে। বিকালের দিকে জেল গেটে আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো। একটা ক্ষীণ ধারণা হয়েছিল হয়তো আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। কারণ জেলখানায় ৬ মাস পরপর নতুন আটকাদেশ দিতে হয়। একটি অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ ৬ মাস হলে নতুন নির্দেশ না দিয়ে ৬ মাসের বেশি আটক রাখা যায় না। আমার সেদিন ছিল ৬ মাস পরে আদেশ দেবার আরেক ৬ মাসের শেষদিন। ৬ মাসের শেষ দিনে জেল গেটে ডাকলে অনেকেরই ধারণা হয়—ঐ রাজবন্দিকে মনে হয় ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। আমার ক্ষেত্রে হলো আরেক নতুন নাটক।

জেল গেটে গিয়ে দেখলাম উচ্চপদস্থ পুলিশের কর্মকর্তারা বসে আছেন। সাথে আমার অ্যাডভোকেট রায়বাহাদুর রমেশ তালুকদার। তাঁরা জানালেন—পূর্ব বাংলার সরকার আমাকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে একটি শর্ত আছে। শর্ত হচ্ছে, জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে আমার বাড়ি বা অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না। পুলিশ আমাকে সাথে করে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আমাকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে ভারতে।

অ্যাডভোকেট রমেশ তালুকদার অনেক কাকুতি মিনতি করলেন। বললেন—আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথে নাকি তাঁর কথা হয়েছে। আমি জেলে আসায় আমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। জেলখানায় পড়াশোনা করা সম্ভব নয়। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় প্রাইভেট পরীক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। তিনি আরো বললেন, এ ব্যাপারে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের চাচা খান সাহেব মোশাররফ হোসেনের সাথেও কথা বলেছেন। এ ব্যবস্থা নাকি তিনিই করেছেন।

একথা আংশিক হলেও সত্য ছিল। ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে খান সাহেব আমার সাথে ঢাকা জেলে দেখা করতে এসেছিলেন। সাথে ছিল আমার ছোট কাকা। আমার নওয়া কাকা ও ছোট কাকা টুঙ্গীপাড়া থানার পাটগাতীতে ডাক্তারি করতেন। ছোট কাকা টুঙ্গীপাড়ার শেখ পরিবারের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল গভীর এবং সকল প্রকার জাত-পাত ও সম্প্রদায়ের গণ্ডি পেরিয়ে। নাইলে খান সাহেব আমার সাথে দেখা করতে আসতেন না। পাকিস্তান আমলে আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে রাজবন্দিদের সাথে দেখা করা দুঃসাধ্য ছিল। সেকালে পাকিস্তান সরকারের একমাত্র নীতি ছিল কাউকে বিশ্বাস না করা। এই নীতির ফলে অনেকে আত্মীয়-স্বজনের সাথে

www.nagorikpathagar.com

দেখা করতে এসে গ্রেফতার হয়ে গেছে। ঢাকা জেলে সেবারের প্রায় ৫ বছরের জেল জীবনে বাইরের কারো সাথে দেখা করার সুযোগ হয়েছিল আমার মাত্র তিনবার।

সে পরিস্থিতিতে খান সাহেবের পক্ষে আমার সাথে দেখা করা ছিল দুঃসাধ্য কাজ। এ কাজটি তিনি করেছিলেন। গোয়েন্দা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে নিয়ে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন ঢাকায়। সাথে ছোট কাকা। তাঁদের একমাত্র অনুরোধ সরকারের কাছে মুচলেকা দিতে হবে আমি রাজনীতি করব না। এই মুচলেকা দেবার সাথে সাথে আমি মুক্তি পেয়ে যাব। আমি রাজি হলাম না। খান সাহেব ক্ষুব্ধ হলেন। কাকা বিদায় নিলেন চোখের জলে।

সেই ঘটনারই যেন আরেক ধরনের পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল ১৯৫০ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে। অ্যাডভোকেট রমেশ তালুকদারের কথা শুনে আমার মাথা যেন বিগড়ে গেল। আমি বললাম, আমি কোনো শর্তে মুক্তি চাই না। আমার লেখাপড়ার কথা আপনাদের ভাবতে হবে না। আমি কোথায় যাব, কোন দেশে থাকব সে সিদ্ধান্ত আমিই নেব। আর আপনারা আমার কেউ অভিভাবক নন। এ ব্যাপারে আমাকে উপদেশ দেবার চেষ্টা করবেন না। আমার কথা শুনে রমেশ বাবুর মুখ কালো হয়ে গেল। মনে হয় তিনি সরকার পক্ষকে বুঝিয়েছিলেন যে তিনি আমাকে রাজি করাতে পারবেন। আমার কথায় সব কিছু ভেস্তে গেল।

এরপর আর কথা জমল না। পুলিশ অফিসার একটি নতুন নির্দেশ বের করলেন। ঐ নির্দেশে আমার আটকাদেশ আরো ৬ মাস বাড়িয়ে দেয়া হলো। আমি জেলখানায় আমার ওয়ার্ডে ফিরে এলাম। জেলখানার বন্ধুরা অনেক খুশি হলেন। অনেকে ভিন্ন কথা বললেন। তখন একটা ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল ঢাকা জেলে। দীর্ঘদিন অনশনে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। কোনোকিছুই হজম হচ্ছে না। মাসের পর মাস দু'বেলা বার্লি খেয়ে কাটাতে হচ্ছে। ভিন্ন পরিবেশে ঘটে যায় ৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আমি আর একটি আটকাদেশ নিয়ে ঢাকা জেলে ফিরে এলাম। পাকিস্তান সরকারের প্রস্তাব ছিল—আমাকে মুক্তি দেয়া হবে। শর্ত হচ্ছে—আমাকে পাকিস্তান ছাড়তে হবে। কিন্তু সে প্রস্তাবে আমি রাজি হলাম না। ফলে আটকাদেশ আরো ৬ মাস বৃদ্ধি পেল। তখন প্রায় ২ বছর জেল খাটা হয়ে গেছে।

জেলে তখন ভিন্ন পরিস্থিতি। কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনশন করে সকলেরই শরীর ভেঙে গেছে। চতুর্থ অনশন ধর্মঘটের সময় কুষ্টিয়ার

www.nagorikpathagar.com

শিবেন রায় মারা গেছেন। সে এক মর্মান্তিক কাহিনী। ঢাকা জেলে ৬ নম্বর ওয়ার্ডে শিবেন রায়কে রাখা হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণির কয়েদীর মতো। শুয়ে থাকতে হতো মেঝেতে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ৬ নম্বর সেলে কখনো সূর্যের আলো পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ আমলের নির্জন সেল। কুষ্টিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শিবেন রায়। ঐ সেলেই তিনি অনশন শুরু করেন। ডাক্তাররা অনশনের ৪ দিন পর অন্য বন্দির মতো তাকেও জোর করে নাক দিয়ে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করেন।

নাক দিয়ে দুধ খাওয়ানোর একটা বিপদ আছে। দুধ খাওয়ার নলটি নাক দিয়ে ঢুকে পাকস্থলিতে না গিয়ে লাংসে চলে যেতে পারে। লাংসে চলে গেলে মৃত্যু অনিবার্য।

শিবেন রায়ের ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। সেই দুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি ছিল বীভৎস। জেলের সিপাইরা জোর করে রাজবন্দিদের মেঝেতে ফেলে দিত। হাত পায়ের ওপর বসত। কখনো বুকের ওপরও বসত। তারপর ডাক্তার নাকে নল ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করত। ফলে দুধের নল সরে যাবার সম্ভাবনা থাকত। শিবেন রায়কে দুধ খাওয়ার সময় নলটি লাংসে চলে যায়। নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়। অন্যান্য সেলে খবর গেলে প্রতিবাদে রাজবন্দিরা স্লোগান দিতে থাকে। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ কোনো ভ্রূক্ষেপ করল না। আবার জোর করে একইভাবে তাকে দুধ খাওয়ানো হলো। ফলে মৃত্যু হলো শিবেন রায়ের। এবারের অনশনে রাজবন্দিরা কিছুটা জয়ের মুখ দেখল। রাজবন্দিদের অন্যান্য বন্দিদের চেয়ে পৃথক মর্যাদা দেয়া হলো। রাজবন্দিদের দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করা হলো। শিবেন রায়ের মৃত্যু ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন জেলখানার আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করল।

সঙ্কট দেখা দিল ভিন্ন প্রশ্নে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাইকারি হারে বামপন্থীদের ধরপাকড় শুরু হয়। এদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ ভাগ হওয়ায় প্রতিটি পরিবারে শঙ্কা। কোনো পরিবারই স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি আদৌ তারা পাকিস্তানে থাকবে কিনা। বাড়তি অসুবিধা দেখা দিয়েছে ঘরে ঘরে রাজনৈতিক কর্মী থাকায়। তাদের ধারণা হয়েছে রাজনৈতিক কারণেই হয়তো তাদের দেশান্তরী হতে হবে।

পারিবারিক এই সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যেই গ্রেফতার হয়ে জেলখানায় এসেছে অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা। তারা জেলে আসার পর তাদের ঘরবাড়ি তছনছ হয়েছে। নির্যাতিত হয়েছে আত্মীয়-স্বজন। জেলে থাকাকালে অনেকের

www.nagorikpathagar.com

পরিবার দেশ ত্যাগ করে চলে গেছে। অর্থাৎ এদের পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবন একান্তভাবেই অনিশ্চিত।

জেলখানায়ও এই অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই স্থির করতে পারেনি মুক্তি পেলে তারা কোথায় যাবে। আদৌ পাকিস্তানে থাকবে কিনা। অনেকে আবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুক্তি পেলেই দেশ ছেড়ে চলে যাবে। এ ব্যাপারে লেখালেখিও করেছে পূর্ববাংলার সরকারের সাথে। এদের মধ্যে অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা ও কর্মী।

আর এর মাঝখানেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগ্রামের ডাক এসেছে। জেলখানায় একের পর এক অনশন ধর্মঘট হচ্ছে। সংঘর্ষ হচ্ছে। আর বিপাকে পড়েছে এই রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা। তাদের সাথীরা জেলখানায় অনশন করছে। সংঘর্ষ করে জীবন দিচ্ছে। অথচ তারা এই সংগ্রামের শরিক হতে পারছে না। সে ছিল এক মর্মান্তিক জ্বালা।

এ পরিস্থিতিতে আমি সরকারি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো। অনেকে সাধুবাদ জানালেন। অনেকে স্পষ্টতই বললেন, সরকারের এ প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত ছিল। কারণ কোন কালে মুক্তি পাওয়া যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। পাকিস্তানে কবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হবে এবং তারপরে আমরা মুক্তি পাব সে কথা সঠিক করে বলা আদৌ সম্ভব নয়। তাই তাদের মতে, এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা আদৌ সঠিক ছিল না।

এর পরপরই এক মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দুই বাংলার বড় খবর হয়ে উঠল। জেলখানায় কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। একমাত্র পত্রিকা দৈনিক আজাদ আর কলকাতার স্টেটসম্যান। কোনো কাগজ থেকেই প্রথম দিকে দাঙ্গার ভয়াবহতা অনুধাবন করা যায়নি। মাস তিনেক পরে এক খ্রিস্টান যাজক বরিশালের দাঙ্গা সম্পর্কে স্টেটসসম্যানে ধারাবাহিক লিখতে শুরু করেন। এই ধর্ম যাজকের নাম এডওয়ার্ড ম্যাক-ই নার্নি। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সময় তিনি নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। সেই সুবাদে আমার সাথে মৈত্রী ও বৈরী সম্পর্ক হয়েছিল তাঁর সাথে বরিশালে। সে কাহিনীতে পরে আসব।

ম্যাক-ই নার্নির রিপোর্ট থেকে বোঝা গেল যে, পূর্ববাংলার অবস্থা আদৌ স্বাভাবিক নয়। বরিশালের বন্দিরা উদগ্রীব হলেন। দীর্ঘদিন যাবত পরিবার-পরিজনের কোনো খবর নেই। চারদিকে অনিশ্চয়তা, আশঙ্কা এবং চরম অসহায়ত্ব।

www.nagorikpathagar.com

এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে চুক্তি হলো। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। এ চুক্তি নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তিতে বলা হলো—পূর্ববাংলার যে হিন্দুরা পশ্চিম বাংলায় যেতে চান বা পশ্চিম বাংলার যেসব মুসলমান পূর্ব বাংলায় যেতে চান দুই সরকার যৌথভাবে তাঁদের স্থানান্তরের দায়িত্ব নেবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতা, বরিশাল, চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে স্টিমার চলাচল শুরু হলো। লাখ লাখ মানুষ দেশান্তরী হলো।

আমার তখন বারবার জেলখানায় মাওলানা আবুল কালাম আজাদের কথা মনে হলো। দেশ বিভাগের সময় তিনি এ প্রশ্নটি তুলেছিলেন। প্রশ্ন তুলেছিলেন উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার প্রশ্নে। সে প্রশ্নের জবাব মিলল ১৯৫০ সালে। প্রমাণিত হলো সাম্প্রদায়িক বিভক্তির ভিত্তিতে স্বাধীনতা সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেয় না। দিতে পারে না।

সে এক অদ্ভুত স্বাধীনতা। ভারতের মুসলমান জানে না সে তার জন্মভূমিতে থাকতে পারবে কিনা। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা জানে না তারা আদৌ নিরাপদ কিনা। দু'টি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা চুক্তি করে নিজের দেশের নাগরিকদের ভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিল। পৃথিবীতে এর কোনো নজির নেই। তাহলে এ স্বাধীনতা কার? কাদের জন্য এ স্বাধীনতা? হিন্দু মুসলিম যদি দুই জাতিই হয়ে থাকে, যদি এক সাথে তাদের না থাকা হয়, সে জন্য যদি দেশ ত্যাগ করতে হয়, তাহলে ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে লোক বিনিময় কেন করা হলো না? কেন জানমালের নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা না করে এই উপমহাদেশকে ভাগ করা হলো সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে?

জেলখানায় আমার এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া সম্ভব ছিল না। কাউকেই স্বাভাবিক মনে হতো না। সকলেই মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কারো কোনো ধারণা নেই। ১৯৫০ সালে দাঙ্গার পর পরিস্থিতি এমন হলো, কেউই জানে না এ মুহূর্তে তাকে মুক্তি দেয়া হলে সে কোথায় যাবে, কোথায় গিয়ে উঠবে। কে তাকে আশ্রয় দেবে। আদৌ পূর্ববাংলা নামক জন্মভূমিতে তার জন্য কোনো আশ্রয় আছে কিনা।

একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল ভারত থেকে আসা কমরেডদের নিয়ে। তখন কমিউনিস্ট পার্টি ও আরএসপি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাকিস্তানে মুসলিম কমরেড ও ভারতে হিন্দু কমরেডরা রাজনীতিতে মুখ্য দায়িত্ব পালন করবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টির অসংখ্য মুসলিম কমরেড পশ্চিমবাংলা

www.nagorikpathagar.com

থেকে পূর্ববাংলা চলে আসেন। তাঁরা পূর্ববাংলার বিভিন্ন কারাগারে আমাদের সাথে দিনের পর দিন অনশন ধর্মঘট করেন। অনেকের স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ১৯৫০ সালের দাঙ্গা ও নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির পর তাঁদেরও নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

জেলমন্ত্রী চলে যাবার পরেও পরীক্ষা নিয়ে তেমন কোনো সুরাহা হয়নি। দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে জানাতে থাকলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় বলে আমাকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেয়া যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘদিন আবেদন-নিবেদনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত আমার কাজে এল না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানালেন, এ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য নয়। নিশ্চিত হয়ে গেল যে, জেলে থাকতে আমার আর পড়াশোনা করা সম্ভব নয়।

একদিক থেকে জেলখানায় আমি ছিলাম ভাগ্যবান। ভাগ্য বলে কিছু বিশ্বাস করি কিনা সে প্রশ্ন বিতর্কিত। তবে জেলখানায় যাদের চিঠি আসত তাদের ভাগ্যবান মনে হতো। সে এক অদ্ভুত মানসিকতা। অবরুদ্ধ দেয়ালের জগতে চিঠি হচ্ছে বাইরের খবর। বাইরের সাথে যোগাযোগ। তাই সকলেই প্রতিদিন চিঠির জন্য অপেক্ষা করত। জেল অফিস থেকে কেউ এলে জিজ্ঞাসা করা হতো চিঠি এসেছে কিনা। আর জেলের ঠিকানায় চিঠি এলেই যে আমাদের হাতে পৌঁছাবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। জেল অফিসে চিঠি পৌঁছালে সেন্সরের জন্য গোয়েন্দা অফিসে পাঠানো হতো। অনেক চিঠি গোয়েন্দা অফিস বাজেয়াপ্ত করত। আবার কোনো চিঠির কোনো অংশ কেটে দিত। ফলে জেল অফিসে কোনো চিঠি পৌঁছাবার পর সে চিঠি রাজবন্দিদের হাতে পৌঁছাতে দীর্ঘদিন লেগে যেত। আবার অনেক চিঠিই দেয়া হতো না।

তবুও এ চিঠি নিয়ে হৈচৈ ছিল জেলখানায়। একটি চিঠি এলে সে চিঠি বারবার পড়া হতো। প্রতিটি বাক্য বিশ্লেষণ করা হতো। আবিষ্কার করার চেষ্টা হতো ঐ চিঠিতে কোনো গোপন সংকেত আছে কিনা। জেল থেকে মুক্তি পাবার ইঙ্গিত আছে কিনা। তাই যাদের চিঠি আসত না তাদের মন খারাপ হয়ে যেত। আমার সব সময় মনে হয়েছে জেলে যাদের আত্মীয়-স্বজন আছে তাদের উচিৎ ঐ বন্দিকে চিঠি লেখা। সে বন্দি রাজবন্দি হতে পারে, খুনের আসামী হতে পারে। হতে পারে ভিন্ন কোনো অভিযোগে অভিযুক্ত। আমার অনুরোধ জেলখানার স্বজনদের জন্য চিঠি লিখবেন। সে যেই হোক না কেন। চিঠির অভাব আমার কোনোদিনই হয়নি। আমার চিঠি ছিল সকলের কাছে ঈর্ষার।

www.nagorikpathagar.com

এ চিঠি আসা না আসা নিয়ে জেল জীবনে একটি বিরাট অংশ কাটে। আবার জেলে কোনো অপরাধ করলে চিঠি লেখা এবং চিঠি পাওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তেমনটি হতো অনশনের সময়। যারা অনশন করত তারা জেলখানার আইনে অপরাধী। তাই তাদের চিঠি বন্ধ করে দেয়া হতো। বন্ধ করা হতো বাইরের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাতকার।

১৯৫০ সালে জেলখানার চতুর্থ অনশন শেষ হবার পর এই অনশন পর্ব শেষ হলো। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নতুন সিদ্ধান্ত নিল জেলখানার আন্দোলন সম্পর্কে। কমিনফর্ম কমিউনিস্টদের ফনফর্মেশন ব্যুরো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তীব্র সমালোচনা করে জানাল, তাদের রাজনীতি নিতান্তই ভুল। তাদের সমালোচনায় বলা হলো জেলখানা হচ্ছে শ্রেণি শত্রুর সবলতম ঘাঁটি। সেই ঘাঁটির মধ্যে তারা হচ্ছে সর্বশক্তিমান। সেখানে বিপ্লব করার চেষ্টা অথবা শত্রুর সাথে একটা সরাসরি বোঝাপড়ার কর্মসূচি ছিল নিতান্তই ভুল। শত্রুর এই সবলতম ঘাঁটিতে শত্রুকে আঘাত করতে গিয়ে সংগঠনের দিক থেকে পার্টি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কমিনফর্মে এই সমালোচনায় জেলখানায় আমাদের অনশনের বহর কমল। কিন্তু ইতিমধ্যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে রাজবন্দিদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে। রাজশাহীর সাঁওতাল এলাকায় গ্রেফতার করে ইলা মিত্রের ওপর চালানো হয়েছে ইতিহাসের জঘন্যতম অত্যাচার। রাজশাহী জেলে পাখির মতো গুলি করে মারা হয়েছে রাজবন্দিদের। সে পর্ব শেষ হলো কমিনফর্মের নির্দেশে। এ কমিনফর্ম কী? এর নির্দেশ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির শুনতে হবে কেন?

১৯৫০ সালে জেলখানায় মোটামুটি তেমন কোনো গোলমাল ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টির সেকালের কৌশল পরিবর্তন হয়েছে। জেলখানায় আন্দোলন স্তিমিত। তবে জেলখানা থেকে কবে মুক্তি পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে কেউই তেমন নিশ্চিত নয়। ১৯৫০ সালে দাঙ্গার পরে কেউই জানে না কার ভবিষ্যৎ কী হবে?

পাকিস্তানের রাজনীতিতেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে তখন। ১৯৪৮ সালে ১১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মারা যান। একক নেতৃত্বে আসেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। লিয়াকত আলী ভারতের উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। ভারত ভাগ হওয়ার সময় তিনি পাকিস্তানে আসেন। মুসলিম লীগের সম্পাদক হিসেবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। মুসলিম লীগের নেতা হিসেবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

www.nagorikpathagar.com

ও লিয়াকত আলী খান-ই বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। জিন্নার মৃত্যুতে নেতৃত্ব শূন্যতা দেখা দেয়। পাকিস্তানে গভর্নর জেনারেল কে হবে সেই বিতর্ক উঠতে থাকে। কে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট হবেন সে প্রশ্নও দেখা দেয়। এ সময় পাকিস্তানের আমলারা ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করেন। গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত একাউন্ট সার্ভিসের গোলাম মোহাম্মদ। তিনি ভারতের হায়দারাবাদের নিজাম সরকারের অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন। পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার প্রথম অর্থমন্ত্রী ছিলেন। গোলাম মোহাম্মদের গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্তির পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন খেলা শুরু হয়। মুসলিম লীগের সভাপতি হন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিজেই।

তখন মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ছিলেন জমিদার, জোতদার এবং নব্য শিল্পপতিরা। এই জমিদার ও জোতদারের স্বাভাবিক মিত্র ছিল সামরিক ও বেসামরিক আমলারা। জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলীর মতো ব্যক্তিত্বের উপস্থিতির জন্য তাঁদের জীবিতকালেই আমলারা রাজনীতিতে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু জিন্নার মৃত্যুর পর ক্ষমতায় প্রভাব বিস্তার করার জন্য সামরিক ও বেসামরিক আমলারা তৎপর হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তখন পৃথিবীতেও ছিল ভিন্ন পরিস্থিতি। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম শিবির, অপরদিকে সোভিয়েন ইউনিয়ন। পশ্চিম মহলে তখন ভয়, যে কোনো দেশে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসতে পারে। এছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশের কাছে চীন। চীনেরও বিপ্লব হয় ১৯৪৯ সালে। সারা পৃথিবীতে তখন চরম কমিউনিস্ট আতঙ্ক। কমিউনিস্টদের ঠেকাবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎপর। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট বিরোধী উদ্যোগ দ্বিধা-বিভক্ত হলো ভারতীয় উপমহাদেশে।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান এই সময়ে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু তখন দু'টি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এক ছিল না। ব্রিটিশ আমলের প্রায় সকল শিল্প কারখানাই ভারতীয় এলাকায় পড়েছিল। ব্রিটিশ আমলেই এক শ্রেণির শিল্পপতি ভারতে জন্ম নিয়েছিল। এই শিল্পপতিরা অনেক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপতিদের সাথে টক্কর দিতে পারত। তাই ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে বিভিন্ন প্রশ্নে ব্রিটিশ-মার্কিনসহ পাশ্চাত্যের সরকারের সাথে ভারতের মতানৈক্য শুরু হয়। কমিউনিস্ট বিরোধিতার নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন একের পর এক চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়। পাকিস্তান এ উদ্যোগের সামিল হলেও ভারত সরকার কোনোদিনই এ ধরনের উদ্যোগের সাথে যুক্ত হয়নি। পাকিস্তানের কাছে পরিস্থিতি ভিন্নতর। পাকিস্তানে শিল্পায়নের

www.nagorikpathagar.com

জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ছিল না। তাকে মূলধন সংগ্রহ করতে হতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেনের কাছ থেকে। আর এই মূলধন পাওয়া কখনোই শর্তহীন ছিল না। তাদের শর্ত ছিল, কমিউনিস্টদের প্রতিরোধ করতে হবে, প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে, অন্যথায় সাহায্য মিলবে না। অপরদিকে পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ এককালের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাংগঠনিকভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের কোনো ঐতিহ্য ছিল না। ফলে পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকেই পাশ্চাত্যের শিবিরে চলে যায়।

কিন্তু ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের একটি দীর্ঘ দিনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্য ছিল। আবার ভারতীয় শিল্পপতিদের তেমন মূলধনের সঙ্কট ছিল না। তাই ভারতের কংগ্রেস নেতারা পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক কোনো শিবিরেই পুরোপুরি যোগ দেননি। তাঁরা দরকষাকষি করে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছেন এবং এ ভিত্তিতে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি ছিল গোষ্ঠী নিরপেক্ষ। আর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি ছিল পাশ্চাত্য ঘেঁষা।

তবে পশ্চিমা ঘেঁষা পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করতেও পাকিস্তানকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছিল—পাকিস্তান কোন পক্ষে যাবে? পাকিস্তান এককালে ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটেন পাকিস্তানকে কব্জায় রাখতে চেয়েছে। অপরদিকে পাশ্চাত্যের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে ব্রিটেনকে হটিয়ে নেতৃত্বে এসে যায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে ব্রিটেনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। এ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। ফলে পাকিস্তানের ব্রিটেন লবিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। তখন পাকিস্তানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন খাজা শাহাবুদ্দীন। তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের কনিষ্ঠ ভাই, খাজা পরিবার বরাবরই ব্রিটিশ রাজনীতির পরম সুহৃদ।

শাহাবুদ্দীনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিত্বের আমলে ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডিতে এক জনসভায় ভাষণ দেয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রকাশ্য দিবালোকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। লিয়াকত আলীর হত্যাকারী সৈয়দ আকবর একজন জেলমুক্ত আসামী। সে সীমান্তের হাজেরা জেলায় অন্তরীণ ছিল। সে লিয়াকত আলীকে গুলি করার সাথে সাথে অপর একজন পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা তাকে গুলি করে হত্যা করে। অর্থাৎ লিয়াকত আলীর সঙ্গে তার হত্যাকারীকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। ফলে লিয়াকত হত্যার ঘটনা আর কোনোদিনই জানবার সুযোগ থাকল না। রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.com

ভাষ্যকারদের মতে, এটা ছিল পাকিস্তানের রাজনীতিতে ব্রিটিশ ও মার্কিন লবির সঙ্কটের অনিবার্য পরিণতি। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মিত্রের সন্ধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীনের উপদল এটা পছন্দ করেনি। তাই নিহত হলেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। হত্যাকারী একজন অন্তরীণ ব্যক্তি। প্রশ্ন দেখা দিল এই অন্তরীণ মানুষটি হাজেরা থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কী করে রাওয়ালপিন্ডিতে এল। কেনই বা হত্যাকারীকে মামলার স্বার্থে বাঁচিয়ে না রেখে সাথে সাথেই হত্যা করা হলো। এ রহস্যের জট আজো পাকিস্তানের রাজনীতির অঙ্গনে কেউ খুলবার চেষ্টা করেনি। লিয়াকত আলী নিহত হলেন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে ব্রিটিশ লবি আর মার্কিন লবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে পারলেন না।

জেলখানায় কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিল কমিনফর্মের নির্দেশে। কমিনফর্ম হচ্ছে কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে কমিনফর্ম গঠিত হয়েছিল ৯টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে। এ ৯টি দেশ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লাভিয়া, ইতালি ও ফ্রান্স। কমিনফর্মের লক্ষ ছিল বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা, সংবাদ আদান-প্রদান। কিন্তু কমিনফর্মও এক সময় তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কমিনটার্ন-এর ভূমিকা গ্রহণ করে। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ বাস্তবায়নই এককালে কমিনফর্মের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এ পরিস্থিতির প্রতিবাদ করলে ১৯৪৮ সালে জুন মাসে যুগোশ্লাভিয়াকে কমিনফর্ম থেকে বহিষ্কার করা হয়। কমিনফর্মের প্রধান দফতর বেলগ্রেড থেকে রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট স্থানান্তরিত করা হয়। আবার ক্রুশ্চেভের আমলে যুগোশ্লাভিয়াকে খুশি করতেই ১৯৫৭ সালের ১৭ এপ্রিল কমিনফর্ম ভেঙে দেয়া হয়। এই ক্ষেত্রে কমিনফর্মই হচ্ছে শেষ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা।

রাজনীতির ইতিহাসে আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ করার প্রথম প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন কার্ল মার্কস। ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস ও ফ্রিডারিক এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। এ ম্যানিফেস্টোতে বলা হয় যে—পৃথিবীর ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস এবং একদিন পুঁজি ও শ্রমের তীব্র সংঘর্ষের ফলে শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতায় আসবে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে শোষণহীন সমাজ।

এই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর পরিপ্রেক্ষিতেই মার্কস-এঙ্গেলস আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিক শ্রেণিকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেন। ১৮৬৪ সালে

www.nagorikpathagar.com

তিনি গড়ে তোলেন ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস অ্যাসোসিয়েশন। ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত এ সংগঠন বেঁচে ছিল। মার্কস ১৮৮৩ সালে মারা যান। মার্কসপন্থীরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন ১৮৮৯ সালে। প্যারিসে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কারস কংগ্রেসের বৈঠক বসে। নামকাওয়াস্তে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বেঁচে ছিল ১৯১৪ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে মতানৈক্য ছিল চরম।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে মতানৈক্য দেখা দেয় বিশেষ করে যুদ্ধে সমাজতন্ত্রীদের ভূমিকা নিয়ে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ এগিয়ে আসছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, যুদ্ধে সমাজতন্ত্রী কমিউনিস্টদের ভূমিকা কী হবে। সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যুদ্ধ হচ্ছে সর্বহারাদের একটি সুযোগ। যুদ্ধের সময় সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক দলের কর্তব্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নিজ নিজ দেশের পুঁজিবাদী সরকারকে আঘাত করা এবং এ দুর্বল মুহূর্তে আঘাত করে ক্ষমতা দখল করা।

কিন্তু একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যতীত কোনো দেশেই এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলো না। গণতান্ত্রিক সমাজবাদী (সোস্যাল ডেমোক্রেটরা) যুদ্ধের সময় জাতীয়তাবাদী হয়ে গেল এবং নিজ দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগী হল। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক হলো অর্থহীন-অস্তিত্বহীন।

এই পটভূমিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের পর ১৯১৯ সালে তৃতীয়বারের মতো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন লেনিন। বৈঠক ডাকা হয় মস্কোতে, লেনিনের নেতৃত্বে গঠিত এই আন্তর্জাতিকের নাম হয় তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা কমিনটার্ন (কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল)।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠনের ৫ বছর পর মারা যান লেনিন। সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আসেন স্ট্যালিন। স্ট্যালিন নেতৃত্বে আসার পর প্রথম বিতর্ক শুরু হয় সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। একক বিচ্ছিন্ন একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা সমাজতন্ত্রের বিজয় বা পূর্ণ বিজয় সম্ভব কিনা এ প্রশ্নে পৃথিবীতে তিনটি মত দেখা দেয়। স্ট্যালিনের মতে, একটি দেশের শুধু সমাজতন্ত্রের বিজয় নয়, পূর্ণ বিজয় সম্ভব। ট্রটস্কীর মতে বিজয় বা পূর্ণ বিজয় আদৌ সম্ভব নয়। এমনকি ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিপ্লব না হলে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিনির্মাণের কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। তৃতীয় ধারার মতে, একটি দেশের সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয় আদৌ সম্ভব নয়, তবে সমাজতন্ত্রের বিনির্মাণের কাজ শুরু করা যায়। ভারতে প্রথম

www.nagorikpathagar.com

ধারার অনুসারী ছিল কমিউনিস্ট পার্টি, দ্বিতীয় ধারার অনুসারী ট্রটস্কীবাদীরা এবং তৃতীয় মতের অনুসারী বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল আরএসপি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিক স্ট্যালিনের মতকেই গ্রহণ করে এবং প্রচার করতে থাকে।

এই তৃতীয় আন্তর্জাতিকে সঙ্কট দেখা দেয় ১৯২৮ সাল থেকে। তৃতীয় আন্তর্জাতিকে ৬ষ্ঠ কংগ্রেসে নতুন কৌশল নির্ধারণ হয়। গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের (সোস্যাল ডেমোক্র্যাট) ফ্যাসিস্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়। এমনকি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার নির্দেশ দেয়া হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে ভারতের কমিউনিস্টরা ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের বিরোধিতা করে। কারণ কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিল সংস্কারবাদী প্রতিক্রিয়াশীল গান্ধী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই তত্ত্বের ভয়াবহ পরিণতি দেখা দেয় পরবর্তীকালে। জার্মানিতে সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ও কমিউনিস্টরা বিভক্ত হয়ে যায়। হিটলারের নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান ঘটে ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৫ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসের বৈঠক বসে। এবার পপুলার ফ্রন্টের তত্ত্ব আনা হয়। বলা হয়, ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানের ফলে পৃথিবীতে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবী এখন তিন ভাগে বিভক্ত— (১) সোভিয়েট সমাজবাদ (২) গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ (ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) (৩) ফ্যাসিবাদ। বলা হয় ফ্যাসিবাদকে রুখবার জন্য গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের সাথে ঐক্য করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লেনিনপন্থী দাবিদার কমিউনিস্ট সোসালিস্টদের পক্ষ থেকে বলা হলো—এটা সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাঁচাবার কৌশল। এতে লেনিনবাদের চিহ্নমাত্র নেই।

এ ব্যাখ্যা সত্য প্রমাণিত হলো ১৯৩৯ সালে। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘটা। যে কোনো মুহূর্তে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। ঐ মুহূর্তে আগস্ট মাসে জার্মানি রাশিয়ার সাথে অনাক্রমণ চুক্তি করল। অর্থাৎ জার্মানি তখন পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পূর্বে রাশিয়াকে ঠেকা দেয়াই ছিল এ চুক্তির লক্ষ্য। অথচ পপুলার ফ্রন্ট তত্ত্বে ফ্যাসিবাদের সাথে চুক্তির কথা ছিল না। বিশ্বের রুশপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিগুলো এ সত্ত্বেও বলল, এটাই সঠিক। এবার যুদ্ধ হচ্ছে জার্মানি ও ব্রিটেন-ফ্রান্সের সাথে। এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে আমাদের নিজ দেশের সরকারকে উৎখাতের সংগ্রাম করতে হবে। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি বলল—এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এ যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। কিন্তু তেমনটি ঘটল না। ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নকে

www.nagorikpathagar.com

আক্রমণ করল। বিশ্বের মস্কোপন্থী কমিউনিস্টদের এবার স্লোগান পাল্টে গেল। এবার আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়। রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ায় এ যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। সুতরাং পপুলার ফ্রন্ট তত্ত্ব অনুযায়ী গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ, ফরাসি, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের যুদ্ধকালীন বন্ধু। এদের বিরুদ্ধে এখন কোনো আন্দোলন নয়। এখন যুদ্ধ ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করার জন্য। এ তত্ত্বের ফলে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধের সময় ব্রিটিশের সাথে সহযোগিতা করে। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করে। সুভাষচন্দ্র বসুকে ফ্যাসিস্টদের দালাল বলে আখ্যা দেয়।

এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তিনটি বৃহৎ শক্তি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধকালীন মৈত্রী হয়। ১৯৪৩ সালে আবার দু'শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে দাবি করে যে, তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দিতে হবে। কারণ তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নির্দেশে দেশে দেশে কমিউনিস্টরা নাশকতামূলক কাজ চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক চাপে স্ট্যালিনকে রুজভেল্ট ও চার্চিলের প্রস্তাব মেনে নিতে হয়। তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেয়া হয়। যদিও প্রকাশ্যে বলা হয় যে, বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ায় এখন আর আন্তর্জাতিকের প্রয়োজন নেই। দেশে দেশে কমিউনিস্টরা নিজেরাই আন্দোলন করবে। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজস্ব প্রয়োজনেই চাপে পড়ে আন্তর্জাতিক ভেঙে দিতে হয়।

কিন্তু কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিকের প্রয়োজন কোনোদিন ফুরায় না। সাম্যবাদী বিশ্ব আন্তর্জাতিক কোনো দেশের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। তাই আবার কমিনফর্মের নামে নয়া আন্তর্জাতিক গড়ে তোলা হয় ১৯৪৭ সালে। সদর দফতর স্থাপিত হয় বেলগ্রেডে। এবার বেলগ্রেড থেকেই অভিযোগ ওঠে যে কমিনফর্মের নামে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মতামত চাপিয়ে দিচ্ছে। ফলে যুগোশ্লাভকে কমিনফর্ম থেকে বহিষ্কার করা হয়। কমিনফর্ম ভেঙে দেয়া হয় ১৯৫৭ সালে। সেই কমিনফর্মের নির্দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৫০ সালে জেলখানার আন্দোলনের কৌশল পরিবর্তন করে। আন্তর্জাতিকের নামে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে দেশে দেশে চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তের এভাবে শিকার হয় কমিউনিস্ট আন্দোলন। এই কমিনফর্ম-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলখানায় আন্দোলন স্তিমিত হলো। কিন্তু বাইরে তখন আন্দোলন নতুন করে গতি পাচ্ছে। লিয়াকত আলীর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন খাজা নাজিমুদ্দীন। গভর্নর জেনারেল হলেন আমলা গোলাম মোহাম্মদ। প্রধানমন্ত্রী হয়ে ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকা আসেন। তিনিও মোহাম্মদ আলী জিন্নার

www.nagorikpathagar.com

ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। পল্টন ময়দানে তিনি এক জনসভায় বললেন— উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো পূর্ব বাংলায়। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়। ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করা হয় ২১ ফেব্রুয়ারি। ৩১ জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরিতে রাজনৈতিক দলসমূহের এক সভা হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী। ৪ ফেব্রুয়ারি ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ঢাকায় মিছিল করে। ২১ ফেব্রুয়ারি নিয়ে পূর্ব বাংলায় সরকারি মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তখন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নূরুল আমিন। মুখ্য সচিব অর্থাৎ চিফ সেক্রেটারি ছিলেন জাঁদরেল পাঞ্জাবি আমলা আজিজ আহম্মদ। বলা হতো আজিজ আহম্মদ-ই ছিলেন তখন পূর্ব বাংলার প্রকৃত শাসনকর্তা। সিদ্ধান্ত হয় ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করার। কিন্তু ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বাসভাজন ছিলেন না। ফলে নারায়ণগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক অবাঙালি কোরেশীকে ঢাকায় রাতারাতি বদলি করে আনা হয়। ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি হয়। সেই ১৪৪ ধারা ভেঙে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করে।

তবে ১৪৪ ধারা ভাঙা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। বলা হয়, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভাঙতে রাজি ছিল না। তারা কোনো বড় ধরনের গোলমালে যেতে রাজি হননি। মুখ্যত ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এ ব্যাপারে কার কী ভূমিকা ছিল তা এখনো অস্পষ্ট। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন অনেকেই ভাষা সৈনিক হবার দাবিদার। এই খেতাব নিয়ে তাঁদের মধ্যে অনেকে এখন সভা সমিতিতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তবে এ সম্মান তাঁরা পাবার যোগ্য কিনা সে প্রশ্নের জবাব তাঁদেরই দেবার কথা। তাঁরা নিজের কথা সঠিকভাবে বললে এ অস্পষ্টতা অনেকটা দূর হতো। এ প্রসঙ্গে শুধু একটি কথাই জোর দিয়ে বলা যায়, সেদিন সাধারণ ছাত্ররা বিশেষ করে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

আমি তখন ঢাকা জেলে। প্রায় বছর চারেক হলো বরিশাল জেল থেকে ঢাকা জেলে এসেছি। জেলা শহরে থাকতাম। রাজধানীর খবর তেমন রাখতাম না। পূর্ব বাংলার খবরের কাগজ একমাত্র দৈনিক আজাদ। এ কাগজটিতেও বিরোধী দলের খবর তেমন থাকত না। তাই খবর পাওয়া ছিল খুব কষ্টকর। অপরদিকে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর বামপন্থী রাজনীতি একেবারে তছনছ

www.nagorikpathagar.com

হয়ে গেছে। কে কোথায় আছে তাও দীর্ঘদিন খবর পাইনি। দলের নেতা অনেকেই দেশান্তরী হয়ে গেছেন। এমনকি মোজাম্মেল দা-ও নাকি কলকাতায় চলে গেছেন (মোজাম্মেল হক পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। দৈনিক পাকিস্তান-এর প্রথম বার্তা সম্পাদক—যিনি কায়রোগামী পিআই-এর বিমান দুর্ঘটনায় ১৯৬৫ সালের ২০ মে মারা যান)। আমাদের নেতা অনিল দাশ চৌধুরী, আব্দুল খালেক খান ও ছাত্রনেতা নারায়ণ দাশ শর্মা কোথায় আছেন তাও জানি না। বরিশালের এই তিন নেতা মোজাম্মেল-দাসহ পাকিস্তান সৃষ্টির বছর কয়েকের মধ্যে গ্রেফতার হয়ে যান। আদালত তাদের শাস্তি দেয়। শুনেছিলাম তাঁরা সিলেটে জেলে আছেন। মুক্তি পেয়েছেন কবে তাও জানি না। লোকমুখে শুনেছি ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর মোজাম্মেল দা ও অনিল দা কলকাতায় চলে গেছেন। ভেবেছি হয়তো নারায়ণও চলে গেছে কলকাতায়। জানতাম না খালেক দা কোথায়? খালেক দা—আব্দুল খালেক খান। পরবর্তীকালে সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। খালেক দা মারা গেছেন ২০০২ সালে।

সময়টা ছিল অস্বস্তিকর ও অনিশ্চিত। তখন ফাল্গুন মাস। হঠাৎ যেন মনে হলো দক্ষিণের বাতাস এসে সব পুরনো পাতা ঝরিয়ে দিল। ঢাকা জেলের তখন পুরনো হাজতে আছি। তিন দিকে উঁচু উঁচু দেয়াল। বারবার চোখ দেয়ালে ধাক্কা খায়। এককালে ওখানে ২০ জন বন্দি ছিলেন। ৬ মাসের মধ্যে ১৯ জনকে চশমা নিতে হয়েছিল। আমি দক্ষিণ দিকে ঘরে থাকতাম। পাশে উঁচু দেয়াল। সেই দেয়াল ছাড়িয়ে একটি অশ্বত্থ গাছ। সেই অশ্বত্থ গাছের পাতা ঝরা ও নতুন নতুন পাতা দেখে বছরের পর বছর ঋতু পরিবর্তন লক্ষ করতাম।

সেই দেয়ালের জগতে ২১ ফেব্রুয়ারি একজন সিপাহি এল। পরনে লুঙ্গি। একটি ব্যাগে তার প্যান্ট ও জামা। সে এসে বলল, দেশ দোজখ হয়ে গেছে। চারিদিকে গুলি আর গুলি। বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি হয়েছে। অসংখ্য ছাত্র মারা গেছে। সে ভয়ে সরকারি জামা-কাপড় পরে জেলে ঢুকতে পারেনি। লুঙ্গি পরে ঢুকেছে।

আমরা চমকালাম। কিভাবে চমকেছিলাম বর্ণনা করা যাবে না। পূর্ববাংলা অর্থাৎ পাকিস্তানে এমন ঘটনা ঘটতে পারে আমরা তা আশা করিনি। সবার মনে ছিল মুক্তি পাবার চিন্তা। এটা জানা ছিল যে, সহজে মুক্তি হচ্ছে না। আমাদের মুক্তির জন্য কেউ আন্দোলনও করবে না। হঠাৎ যেন সবকিছু পাল্টে গেল। সন্ধ্যার দিকে জেলখানায় নতুন কণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সমগ্র জেলখানা মুখরিত। একদল তরুণ ঢাকা জেলে ভরে

www.nagorikpathagar.com

গিয়েছে। ওরা কিছু মানে না। ওরা কিছু মানতে চায় না। কিন্তু আমাদের কারো সাথে ওদের দেখা হলো না। কারণ রাজনীতির ভাষায় আমরা 'বি ক্লাস'। অর্থাৎ আমরা দাগী আসামী। আমাদের সাথে ওদের রাখা চলে না। আমাদের সাথে এলে ওরা খারাপ হয়ে যাবে।

কিন্তু আমরা কী করবো? দেশে গুলি হবে। হত্যা হবে। তাতে আমাদের কিছুই করার নেই। জেলে বন্দি আছি বলে কি কিছুই করতে পারব না। সিদ্ধান্ত হলো পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি আমরা ২৪ ঘন্টা অনশন করব। অথচ অনশন করবার মতো স্বাস্থ্য কারও ছিল না। ২২ ফেব্রুয়ারি ভোরে এক সিপাহি লুকিয়ে একটি আজাদ পত্রিকা দিয়ে গেল। পত্রিকাটিতে বড় করে আছে আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের পদত্যাগের খবর। খবর আছে খয়রাত হোসেন ও আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ-এর। ভেতরে খবর আছে মিছিল, গুলি আর আন্দোলনের।

আমরা সবাই উজ্জীবিত। কিন্তু শরীর বড্ড দুর্বল। ২৪ ঘন্টার অনশনও যেন শেষ করা যাচ্ছিল না। রাত ১২টায় আমার জন্য চিকিৎসক এলেন। বললেন—কোনো কিছু না খেলে অঘটন ঘটে যেতে পারে। আমি বছরখানেক ধরে স্বাভাবিক খাবার খেতে পারছিলাম না। দীর্ঘদিন অনশনে শরীর ভেঙে গিয়েছিল। বছর দু'য়েক ধরে দু'বেলা বার্লি খেতাম। অন্য কিছু সহ্য হতো না। বন্ধুরা বললেন, কিছু খেতে হবে। আমি বললাম—শুধুমাত্র ধনে ভিজানো জল পেলেই হবে। ঐ জল খেলেই বমি বমি ভাব কেটে যাবে—আমি ঘুমিয়ে যাব। তারপর ২৩ ফেব্রুয়ারির ভোর এল। আমার আর উঠবার শক্তি ছিল না। সারা জেলখানায় তখন তারুণ্যের কলরব আর কোলাহল। জেলখানায় ২১ ফেব্রুয়ারি এল নতুন বাতাসের মতো। ১৯৪৮ সালে জেলে এসেছিলাম। ১৯৫০ সালে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। সেই দাঙ্গার পর আন্দোলনের প্রত্যাশা দিনের পর দিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল। সে আবহাওয়া একেবারে পাল্টে দিল ২১ ফেব্রুয়ারি। মনের জগতে নতুন হাওয়া। নতুন উদ্দীপনা। তবে দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল।

বরিশালে গ্রেফতার হয়েছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী দেবেন ঘোষ। তাঁর সাথে গ্রেফতার হয়েছিলেন তার বড় ভাইয়ের ছেলে দেবকুমার ঘোষ, যিনি মনা ঘোষ নামেই বিশেষ পরিচিত। গ্রেফতার হয়েছিলেন বরিশালের বাণীপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রেমাংশু সেনগুপ্ত।

দেবেনদা অর্থাৎ দেবেন ঘোষ এবং মনাদার সাথে আমার সম্পর্ক কলেজ জীবন থেকে। এরা দু'জনেই এককালে অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন।

www.nagorikpathagar.com

পরবর্তীকালে তাঁরা আরএসপি গঠন করেন। দেশ ভাগ হবার পূর্ব মুহূর্তে জয়প্রকাশের নেতৃত্বে সোস্যালিস্ট পার্টিতে তারা যোগ দেন।

আমি কলেজ জীবনে আরএসপি'র সংস্পর্শে আসি। দীর্ঘদিন বরিশালে দেবেন দা-দের বাসায় থেকেছি। আমি মোজাম্মেল দা-সহ (মোজাম্মেল হক) অনেকেই দেবেন দা-দের বরিশালের কাউনিয়ার বাসায় ছিলাম। বাসাটি ছিল রাজনীতিকদের হোটেল। কে কখন আসত, কে কখন খেত, কে কখন ঘুমাত তার কোনো হিসাব ছিল না। দেবেনদার বৌদি অর্থাৎ মনাদার মা সব কিছু দেখাশোনা করতেন। বরিশালের ঐ একটিমাত্র বাসায় কোনো জাত-পাতের বিচার ছিল না।

মনাদা ছিলেন সাদাসিদে। ঘোরপ্যাঁচ বুঝতেন না। তত্ত্বের বেশি ধার ধারতেন না। মেঝ কাকা অর্থাৎ দেবেন ঘোষ যা বলবেন তাই শিরোধার্য। তবে এই সাদাসিদে মানুষটির আর একটি রূপ ছিল। অস্ত্র চালনায় তিনি ছিলেন দক্ষ। অনুশীলন সমিতি গড়ে উঠেছিল কতগুলো ক্লাবকে কেন্দ্র করে। দৈহিক কসরত থেকে শুরু করে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা সবকিছুর প্রশিক্ষণ দেয়া হতো এই ক্লাবে। এই কাউনিয়া ক্লাব থেকে এককালে মনাদাকে পাঠানো হয়েছিল বিহারে সদাকৎ আশ্রমে। এই আশ্রমে মনাদা অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিতেন। ব্রিটিশ আমলে মনাদা ও দেবেন দা দীর্ঘদিন জেল খেটেছেন। দেবেন দা অভিযুক্ত হয়েছিলেন বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায়। অনেকে বলেন, দেবেন দা'র পরিবার বরিশালের নাজিরপুরের উত্তরে বিস্তীর্ণ এলাকার জমির মালিক ছিলেন। বরিশালে তাঁদের দু'টি কাটা কাপড়ের দোকান ছিল। একটির পর একটি মামলা মোকাবেলা করতে গিয়ে তাঁদের সবকিছু বিক্রি করতে হয়েছে। গল্পের মতো প্রচারিত আছে, বরিশাল সদর হাসপাতালের অনেকগুলো পেইং ওয়ার্ড যাঁদের নামে প্রতিষ্ঠিত সেই দাতারা টাকা রোজগার করেছিলেন দেবেন দা-দের বিরুদ্ধে আইনজীবী হিসেবে ব্রিটিশ পক্ষের উকিল হয়ে। শেষ জীবনে তাঁদের অনুতাপ হয়। তাই ঐ মামলায় আয় করা টাকা তাঁরা হাসপাতালে দান করেন।

দেবেন দা'র সাথে দেখা হয় আমার ১৯৪৬ সালে। তিনি তখন ৬ বছর পর জেল থেকে এসেছেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত একটানা ৮ বছর জেলে ছিলেন। আবার গ্রেফতার হয়ে যান ১৯৪০ সালে। দেবেন দা তখন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। আরএসপি'র নেতা। আমাদেরও নেতা। কিন্তু দেবেন দা-দের সাথে আমার মতানৈক্য শুরু হলো কিছুদিন পরেই। অগ্নিযুগের প্রবীণ বিপ্লবীদের অনেকে ভাবলেন—ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র করতে হলে বড় দল

www.nagorikpathagar.com

করতে হবে। আরএসপির নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে বিপ্লব সম্ভব নয়। তখন সমাজতন্ত্রী নেতা হিসাবে জয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেহতা, নরেন্দ্র দেও, অরুণা আসফ আলী, রাম মনোহর লোহিয়া সারা ভারতে পরিচিত। তাঁরা আবার গান্ধীর আশীর্বাদপুষ্ট। আমাদের অনেক নেতা মনে করলেন, এঁদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হলে ভারতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ত্বরান্বিত হবে। আমাদের নেতারা বললেন ভিন্ন কথা। তাঁরা বলেন—জয়প্রকাশ এবং তাঁদের দল প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। এরা সোস্যাল ডেমোক্রাট। এরা ভোটের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র চায়, এরা বিপ্লব করবে না। এবং গান্ধীজীর প্রভাবের বাইরে তারা যেতেও পারবে না। অর্থাৎ আরএসপি'র তরুণ নেতৃত্ব দেবেন দা-দের সাথে একমত হলেন না। মনা দা, দেবেন দা চলে গেলেন আরএসপি থেকে।

১৯৫০ সালে দাঙ্গার পর দেবেন দা ও মনা দা গ্রেফতার হলেন। তাঁদের বরিশাল থেকে ঢাকা জেলে আনা হলো। তাদের পাঠানো হলো আমাদের ওয়ার্ডে। আমি চমকে গেলাম। মনে হলো কোন দেশে জন্মেছি! পাকিস্তান সরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গ্রেফতার করেছেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী দেবেন ঘোষ ও মনা ঘোষকে। এ কোন রাজনীতি? এ কোন পুরস্কার? সারাজীবন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বৃদ্ধ দেবেন ঘোষ গ্রেফতার হলেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দায়ে। বরিশালের একটি মাত্র বাসায় কোনো সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। অথচ পাকিস্তান সরকার সেই বাসাটিকেই আক্রমণ করলো দাঙ্গার দায়ে। একশ্রেণির বন্ধুরা বললেন—এটাই তো হবার কথা। তাঁদের কথা হচ্ছে, দেবেন দা, মনা দা'র ভারতে চলে যাওয়া উচিত ছিল। সেখানে তাঁরা অগ্নিযুগের বিপ্লবী হিসেবে সমাদর পেতেন। সাহায্য পেতেন। পাকিস্তানে তাঁদের ভিক্ষুকের মতো জীবনযাপন করতে হতো না।

কিন্তু শত দুঃখেও দেবেন দা মাতৃভূমি ছাড়েননি। ১৯৫৪ সালে তিনি পূর্ববাংলা আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বয়স একশ' ছাড়িয়েছে। চোখে তেমন দেখেন না। কানে শোনেন না বললেই চলে। বরিশালের কাউনিয়ার বাসায় থাকেন। চেষ্টা করেন যতদূর সম্ভব অন্যের উপকার করতে। মনা দা মারা গেছেন দেশ স্বাধীন হবার পর। দীর্ঘদিন বহুমূত্রে ভুগছিলেন। চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বড্ড ইচ্ছে ছিল চোখের চিকিৎসার। ইচ্ছে ছিল নতুন করে পৃথিবী দেখার। আমার কাছে বার বার চিঠি আসত। অন্যের হাতের লেখায় আর মনা দা'র জবাবে। তিনি লিখতেন—নির্মল, তুমি আমাকে বিদেশে পাঠাতে পার না, আমার চোখের একটা চিকিৎসা করাতে?

www.nagorikpathagar.com

আমার পক্ষে কোনো কিছুই সম্ভব হয়নি। মনা দা পরিবার নিয়ে এক দুর্বিসহ জীবনযাপন করতেন। বাণীপীঠ স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রেমাংশু সেনগুপ্তের কোনো খোঁজ পাইনি। তিনি ঢাকা জেলে আমাদের ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ছিলেন। প্রচণ্ডভাবে ভগবানে বিশ্বাস করতেন। প্রতিদিন আমার সাথে তর্ক হতো। বড্ড দুঃখ পেতেন আমি ভগবান বিশ্বাস করি না বলে। বেদ-উপনিষদ থেকে অনেক যুক্তির অবতারণা করতেন। আমি বলতাম–ভগবান আমার সৃষ্টিকর্তা হলে ভগবানের সৃষ্টিকর্তা কে? এ প্রশ্নের জবাব কোথায়? আমি যা দেখি না তার আমি বিশ্বাস করি না।

প্রেমাংশু বাবু বলতেন, তুমি লন্ডন দেখেছ? আমি বলতাম, না। তিনি বলতেন তাহলে লন্ডন আছে বিশ্বাস কর কী করে? আমি বলতাম, পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। এবার তিনি পাল্টা প্রশ্ন করতেন। বলতেন, যারা ভগবানের সান্নিধ্যে গিয়েছে তাহলে তুমি তাদের অভিজ্ঞতা মানবে না কেন? আমি বলতাম—সান্নিধ্যে যাবার কোনো প্রমাণ নেই। এরপর আর কথা জমতো না।

জেলখানা থেকে মুক্তি পাবার পর ১৯৫৩ সালে বরিশালে গিয়েছিলাম। কালীবাড়ি রোডে খুঁজতে গিয়েছিলাম বাণীপীঠ স্কুল ও প্রেমাংশু বাবুকে। কালিবাড়ি রোডের বিএম স্কুলের পশ্চিমে গিয়ে ডানে দেখলাম বাণীপীঠ স্কুলের চিহ্নমাত্র নেই। বাণীপীঠ স্কুলের ভিটিতে ধান চাষ হচ্ছে। ধানের ডগা লক লক করছে। এরপর প্রেমাংশু বাবুর খোঁজ করার মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। বাণীপীঠ স্কুলের ভিটিতে এখন পরিবার পরিকল্পনার বিরাট দালান। এখন কে রাখে সে খবর!

১৯৫২ সাল। দেখতে দেখতে ৪ বছর কেটে গেল জেলখানায়। ১৯৪৮ সালের আগস্টে গ্রেফতার হয়েছিলাম বরিশালে। বরিশাল জেল থেকে ঢাকা এসেছিলাম অক্টোবরে। তারপর অনেক ঘটনা ঘটল। জেলখানায় দিনের পর দিন অনশন হলো। ১৯৪৯ সালে ভারত হায়দারাবাদ অভিযান চালাল। এ অভিযানকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে গ্রেফতার হলো হাজার হাজার লোক।

ঢাকা জেল ভরতে থাকল। মাদ্রাজের এক তরুণকে গ্রেফতার করে আনা হলো ঢাকা জেলে। সে নাকি ভারতের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জনমাথাই'র আত্মীয়। তবে তাকে প্রকৃতিস্থ মনে হতো না। মাঝে মাঝে অদ্ভুত চিঠি লিখত। চিঠির ঠিকানা লেখা থাকত—to god, P.O HEAVEN, Dominian HEAVEN... । এ সময় এক হিন্দিভাষী ভারতীয়কে ধরে আনা হয়েছিল। ধর্ম বিশ্বাসে মুসলমান। সে নাকি ভারতের চর। সে মাঝে মাঝে মাছি ধরে ধরে খেত। এরা বাইরে থাকলে ভারত নাকি পাকিস্তানকে দখল করে নেবে।

www.nagorikpathagar.com

এই চার বছরে অনেকের সাথে দেখা হয়েছে জেলে। চট্টগ্রামের অমল সেন, আব্দুস সাত্তার, অনঙ্গ সেন, হাসি দত্ত, কালীপদ চক্রবর্তী। কুমিল্লার চন্দ্রশেখর দাশগুপ্ত, ইয়াকুব মিঞা, এবাদত উল্লাহ, ফরিদ খান, কান্তি সেন, সত্য ঘোষাল, অমূল্যকাঞ্চন দত্ত রায়, নরেশ চক্রবর্তী। ময়মনসিংহের আলী নেওয়াজ খান, সিরাজুল ইসলাম, সুধীন দত্ত রায়, প্রফুল্ল সেন, সতীশ সাহা, মাধব সান্যাল, আলতাফ আলী, জমির আলী, হাসি বসু, অজয় রায়। ঢাকার ধরনী রায়, রণেশ দাশগুপ্ত, শৈলেন রায়, তকিউল্লাহ, নাসির, মুনির চৌধুরী, নাদেরা বেগম, ইরা চৌধুরী, বিনয় বসু, আব্দুর রহমান মাস্টার, জিতেন ঘোষ, সিরাজুল হক। বরিশালের নরেন্দ্রনাথ রায়, নুটু ব্যানার্জি, অবনী সরকার, কাশী ব্যানার্জি, অজিত বসু, প্রশান্ত দাশগুপ্ত। এ ধরনের বিভিন্ন দলের বিভিন্ন জনের সাথে ঢাকা জেলে দেখা হয়েছে। কখনো একসাথে থেকেছি। কখনো ভিন্নভাবে থেকেছি। এছাড়াও থেকেছি ফরিদপুরের সমরেন্দ্র নাথ সিংহ ও প্রফুল্ল রায়, মুন্সিগঞ্জের শফিউদ্দিন আহমদ ও খুলনার আনোয়ার হোসেনের সাথে।

যাদের সাথে জেলে ছিলাম তাদের মধ্যে তিনজনের সাথে এক সময় নৈকট্য গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে একজন আনোয়ার। গরীবের ছেলে। দৌলতপুর কলেজের ছাত্র। আমাদের সাথে বেশ কিছুদিন ছিল ঢাকা জেলে। মুক্তি পেয়ে চলে যায় খুলনায়। আবার গ্রেফতার হয়। ১৯৫০ সালে ২৪ জানুয়ারি রাজশাহী জেলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। আনোয়ার মারা যায়।

১৯৪৯ সালে আরো দু'জন রাজবন্দি আসে আমাদের এলাকায়। একজন মুন্সিগঞ্জের সামসুদ্দিন আহমেদ। অপরজন এমএ আউয়াল। পরবর্তীকালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। ইত্তেফাকের সহকারি সম্পাদক ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর আদমজী জুট মিলের প্রশাসক হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যোগ দিয়েছিলেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদে।

রাজনীতিতে সামসুদ্দিন আহমেদের জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি এককালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। আবার ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এটা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির এক ধরনের কৌশল। তাদের কৌশল ছিল অন্যান্যদের প্রতিষ্ঠান দখল করা। যে প্রচেষ্টা তারা করেছে পাকিস্তান আমলে। ন্যাপ ও আওয়ামী লীগে নিজস্ব লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে। লক্ষ করা গেছে, এ কৌশল কাজে আসেনি। এ কৌশল ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার জর্জ ডিমিট্রভের পপুলার ফ্রন্ট তত্ত্বের পরিণতি।

www.nagorikpathagar.com

এই উপমহাদেশে এই তত্ত্বের পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। কমিউনিস্ট পার্টি থেকে যারা কংগ্রেস বা মুসলিম লীগে ঢুকেছিল তারা কেউ আর নিজ দলে ফিরে আসতে পারেনি। নিজ দলে ফিরে এসেও শেষ রক্ষা হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির যে সদস্য একালে আওয়ামী লীগ, ভাসানী ন্যাপ বা মোজাফফর ন্যাপে ঢুকেছে তারাই সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে।

সামসুদ্দিনের ক্ষেত্রে প্রায় তেমনটি ঘটেছিল। ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক হিসেবে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে তাঁর বিশেষ গুরুত্ব ছিল। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো তরফের আস্থা অর্জন করতে পারেননি।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর সামসুদ্দিন আহমেদ খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। সব আন্দোলনেই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু এক সময় তিনি দলের আস্থা হারিয়ে ফেলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সন্দেহ হয় যে, সামসুদ্দিন আহমেদ পুলিশের এজেন্ট হয়ে গেছেন। সুতরাং তাঁকে এড়াতে হবে। সার্কুলার চলে গেল দলের সব সদস্যদের কাছে। সামসুদ্দিনের ছোট ভাই সফিউদ্দিন আহমেদ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। সেও সার্কুলার পেল। আর দুই ভাই এক সাথে জেলে এল আমাদের ওয়ার্ডে।

আমি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নই। ফলে সামসুদ্দিন আহমেদের আড্ডা হলো আমার এলাকায়। বড় দুঃখ করতেন তিনি। পার্টির জন্য তিনি জিন্নাহর সাথে টক্কর ধরেছেন। সকলের বিরাগভাজন হয়েছেন। সেই পার্টিই এখন তাঁকে বিশ্বাস করে না। এক গভীর বিক্ষোভ ছিল সামসুদ্দিন আহমেদের মনে। শেষ পর্যন্ত সামসুদ্দিন আহমেদের অবস্থান হলো আবার সেই মুসলিম লীগের সাথে। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এককালের মুসলিম লীগের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের সাথে পাকিস্তান চলে গেছেন। পাকিস্তানের নূরুল আমীন ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। সামসুদ্দিন আহমেদ ছিলেন তাঁর একান্ত সচিব। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকা এসেছিলেন। আমার সাথে আর দেখা হয়নি।

১৯৪৯ সাল। দেখলাম ঢাকা জেলে আমাদের ওয়ার্ডে এক তরুণ এল জেল পুলিশের সাথে। তার সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষার অনেক বইপত্র। শুনলাম তরুণের নাম এমএ আউয়াল। ভাবলাম এই বয়সে ভদ্রলোক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছেন—ব্যাপারটি কী!

এমএ আউয়ালের বাড়ি চাঁদপুরের মতলব থানার আশ্বিনপুর। শৈশবে তার বাবা মারা যান। চলে যান কলকাতায়। কলকাতায় খিদিরপুর ডক

www.nagorikpathagar.com

এলাকায় তাঁর পরিচয় হয় ড. মালেকের সাথে। সেখানে তিনি শ্রমিক রাজনীতি শুরু করেন এবং শুরু করেন লেখালেখি। আমি পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথমদিকে এমএ আউয়ালের লেখা পড়েছি। আরএসপির সাপ্তাহিক গণবার্তায় ও কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক স্বাধীনতায়। সেকালে এই দলগুলো মুসলিম ছেলেদের নিয়ে খুব টানা-হেঁচড়া করত। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলোতে তখন মুসলমান ছেলেদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ফলে এদের দলে টানার একটা উদ্যোগ ছিল সকল দলে। সেভাবেই এমএ আউয়াল গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিলেন প্রবেশিকার চৌকাঠ পার হয়েই।

যে ছাত্রটি তখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেনি, তখন কিন্তু সে খ্যাতি অর্জন করেছিল ছাত্রনেতা হিসাবে। পূর্ববাংলায় ৯টি জেলায় তার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত প্রবেশ নিষিদ্ধ হলো ঢাকা জেলায়। তাই জেলখানায় আসতে হলো। তার কথায়, লেখাপড়া করার তেমন ইচ্ছা তার ছিল না। কিন্তু শিক্ষা বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ সাহেব নাকি তাকে উৎসাহিত করেছেন লেখাপড়ার জন্য এবং কথা দিয়েছেন বোর্ডের অনুমতি তাকে দেয়া হবে। তার বইপত্র সবই সংগ্রহ করে দেয়া হলো। সেই প্রতিশ্রুতিতেই তার পরীক্ষা দেবার বাসনা।

তবে এই সামসুদ্দিন সাহেব কিংবা আউয়াল সাহেব কেউই দীর্ঘদিন জেলখানায় থাকেননি। কেউ এসেছেন। কেউ গিয়েছেন। শুধুমাত্র আমরা কিছু লোক জেলখানায় রয়ে গেছি বছরের পর বছর।

জেলখানায় আউয়াল সাহেবের সাথে আমার দীর্ঘ আলাপ হয়েছে। আমি তখন আরএসপি'র ছাত্র ফ্রন্ট, পাকিস্তান ছাত্র এসোসিয়েশনের সদস্য। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব বাংলার নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেসের নাম পাল্টানা হয়। পাল্টিয়ে করা হয় পাকিস্তান ছাত্র এসোসিয়েশন। আউয়ালের প্রস্তাব ছিল এক সাথে ছাত্রলীগ করবার। আমি বললাম ছাত্রলীগ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আউয়াল বলল—কালক্রমে এই সংগঠনের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ তুলে দেয়া হবে। পরবর্তীতে ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের 'মুসলিম' শব্দটি তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। অপেক্ষায় ছিল কাউন্সিল অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত অনুমোদনের। কিন্তু এর মধ্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এসে যায়। তাই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ছাত্র আন্দোলনের একটি নতুন ঘটনা ঘটে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নামে

www.nagorikpathagar.com

একটি সংগঠনের জন্ম হয়। এই সংগঠনের উদ্যোক্তারা জানান, দেশে কোনো অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান না থাকায় ভাষা আন্দোলনের আলোকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে। কিন্তু এই বক্তব্য ইতিহাসের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। কারণ ইতিপূর্বেই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ অসাম্প্রদায়িক হবার ঘোষণা দিয়েছে। অপরদিকে এ কথাও সত্য যে, যারা এককালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করেছিলেন তাঁদের অনেক নেতাই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের নেতৃত্ব দিলেন। সুতরাং প্রশ্নটি নীতিগত বা আদর্শগত নয়। কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ফ্রন্টছাত্র ফেডারেশনের নামে তখন কাজ করতে পারছিল না। তাই এককভাবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটি ছাত্রফ্রন্ট প্রয়োজন। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের হাতে চলে গিয়েছে। এই পটভূমিতেই ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম হয়। যাঁরা বলেন, একটি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের তাগিদেই ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল তাঁরা জেনেশুনে বা অজ্ঞতাবশত এই ব্যাখ্যা দেন।

যদিও এ ঘটনা আমি অনেক পরে জেনেছি। এমএ আউয়ালের কথা এল বলে প্রাসঙ্গিকভাবে এ কথাগুলো উল্লেখ করলাম। ১৯৫৩ সালে আমাদের দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা ছাত্রলীগে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিই। সে কাহিনিও অনেক দীর্ঘ।

এমএ আউয়াল দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন না। সামসুদ্দিন আহমেদও তাড়াতাড়ি মুক্তি পেয়ে যান। ভাষা আন্দোলনের সময় আউয়ালের নামে আবার হুলিয়া জারি করা হয়। ভাষা আন্দোলনে আউয়াল গ্রেফতার হয়েছিল কিনা মনে নেই। তবে জেলখানায় তার সাথে আমার আর দেখা হয়নি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যারা জেলে এসেছিলেন আস্তে আস্তে সবাই ছাড়া পেতে থাকেন। তখন জেলখানায় আমার শরীর খুবই খারাপ। সিভিল সার্জন লিখলেন, এই রাজবন্দিকে বাইরে ছেড়ে দেয়া না হলে বেশিদিন বাঁচবে না। সুতরাং তাকে মুক্তি দেয়া যায়।

আমার মুক্তির জন্য তদ্বির করছিলেন দেবেন দা। অর্থাৎ বরিশালের দেবেন ঘোষ। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি কুমিল্লার ধীরেন দত্তের সাথে আলোচনা করেন আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে। একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে দেখা করেন পূর্ববাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীনের সাথে। নূরুল আমীন সিভিল সার্জনকে রিপোর্ট দিতে বলেন এবং রিপোর্টের ভিত্তিতেই আমার মুক্তির নির্দেশ দেয়া হয়।

www.nagorikpathagar.com

এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। ভাবতাম, যতদিন পাকিস্তান আছে ততদিন জেলে থাকতে হবে। তখন ঢাকা জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন নাসির উদ্দিন সরকার। খ্যাতনামা চিকিৎসক। তিনি আমার জন্য অনেক কিছু করেছেন। একদিন তিনি বললেন, এদেশে আপনার কোনো চিকিৎসা হবে না। মুক্তি পেয়ে কলকাতায় যান। হয়তো কলকাতার ট্রপিক্যাল মেডিসিন হাসপাতালে আপনার চিকিৎসা হতে পারে। কিন্তু ডাক্তার সাহেব জানতেন না, আমি মুক্তি পেলেই কলকাতায় যেতে পারব তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

তখন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পাসপোর্ট-ভিসা চালু হয়েছে। পাকিস্তান সরকার এ কাজটি করেছেন ভাষা আন্দোলনের পর। পাসপোর্ট-ভিসা চালু হবার আগে যে কেউ যখন খুশি ভারত যেতে পারত। ভারত থেকে পাকিস্তান আসতে পারত। পাকিস্তান সরকারের সন্দেহ হলো এই অবাধ যাতায়াতের সুযোগ নিয়ে ওপার থেকে দুষ্কৃতিকারীরা আসছে। তারাই আন্দোলনে ইন্ধন যোগাচ্ছে। দৈনিক মর্নিং নিউজ খবর ছাপাল, নারায়ণগঞ্জে হাজার হাজার ধুতিপরা হিন্দু ভাষা আন্দোলনের পক্ষে মিছিল করছে। সুতরাং অবাধ যাতায়াত বন্ধ করতে হবে। পাসপোর্ট-ভিসা চালু করতে হবে। কিন্তু কাজটি সহজ হলো না। তখন ভারত থেকে আসা অসংখ্য চাকরিজীবী পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে। তাদেরও বাড়িতে যাতায়াত করতে হয়। তারা হুমকি দিলো পাসপোর্ট-ভিসা চালু হলে দল বেঁধে তারা ভারতে চলে যাবে। এবার নূরুল আমীন ভিন্ন প্রস্তাব দিলেন। বললেন, আপাতত পাসপোর্ট-ভিসা চালু হচ্ছে না। পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। কিন্তু রাজি হলেন না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধান রায়। তিনি পাসপোর্ট ও ভিসা চালুর পক্ষে নন। তিনি বললেন, তবে এ নিয়ে বারবার বিতর্ক করা যাবে না। পাসপোর্ট-ভিসা চালু করতে হলে এখনি করতে হবে। নইলে কোনোদিনই নয়। পাকিস্তান সরকার পাসপোর্ট-ভিসা চালু করতে বাধ্য হলো।

ঠিক এই সময় একদিন দুপুরের দিকে আমাকে জেল অফিসে ডাকা হলো। ভাবলাম নিশ্চয়ই অন্য জেলে পাঠিয়ে দেয়া হবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমনিতেই শরীর খারাপ। অন্য জেলে গেলে ঢোকাই মুশকিল হবে। ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কোনোদিন প্রিয়ভাজন ছিলাম না। আমার সাথে বাঙালি, বিহারি সকল জেল পুলিশেরই ভালো সম্পর্ক ছিল। জেলের খবরাখবর ছিল আমার নখদর্পণে। বাইরের খবর আদান-প্রদান করতে পারতাম অতি সহজেই। তাই ভয় ছিল হয়তো আমাকে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে। জেল গেটে নিয়ে ঠিক এমন কথাই আমাকে বলা হয়। বলা হলো—এত খবর

www.nagorikpathagar.com

আপনি রাখেন কী করে? তবে আপনাকে অন্য জেলে পাঠানো হচ্ছে না। বলা হলো, অন্য জেলে বদলি নয়—আপনার মুক্তির নির্দেশ এসেছে। আমি চমকে গেলাম। আমি এখন কোথায় যাব?

জেল গেটে ডেপুটি জেলার বললেন, আপনি রিলিজড। রিলিজ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নিঃশর্ত? নইলে কিন্তু আমি জেলের বাইরে যাব না। ডেপুটি জেলার জামান সাহেব (বৃহত্তর ফরিদপুরের এ যাবতকালীন সর্বকনিষ্ঠ ডেপুটি জেলার। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কারাগারসমূহের মহাধ্যক্ষ হয়েছিলেন) হাসলেন। বললেন, এবার আপনার নিঃশর্ত মুক্তি। কিন্তু কত টাকা চান? কত টাকা আপনার বাড়ি যেতে লাগবে? পাঁচ টাকা, দশ টাকা, পনের টাকা।

ডেপুটি জেলারের কথা শুনে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বললাম, এক পয়সাও না। আপনার মতো অনেক ডেপুটি জেলার আমাদের বাড়িতে থেকে মানুষ হয়েছে। তাই আপনার বুঝবার কথা নয়, আমার কত টাকা প্রয়োজন হবে।

পরিবেশ খারাপ হতে থাকলে হস্তক্ষেপ করলেন একজন পুলিশ অফিসার। তাকে আমি চিনি না। তিনি বললেন, ডেপুটি জেলার সাহেব, নির্মল সেনকে নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না। তিনি অসুস্থ। তিনি কোথায় যাবেন কেউ জানে না। তাঁর বাড়ি গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া। পড়েছেন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে। রাজনৈতিক অনেক বন্ধু আছেন ঢাকায়। উচ্চ মহল থেকে তাঁর সম্পর্কে আমাদেরকে বিশেষভাবে বলে দেয়া হয়েছে। বলে দেয়া হয়েছে—যেখানে তিনি যেতে চান সেখানে তাঁকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে ঢাকায় এসে আমাদের রিপোর্ট করতে হবে। তাই সব দায়িত্ব আমাদের। এমনকি তিনি দেশান্তরী হতে চাইলেও সে ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

পুলিশ কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বের হলাম বেলা দু'টার দিকে। সবকিছুই তখন নতুন মনে হচ্ছে। প্রথম ঢাকা এসেছিলাম ১৯৩৯ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার ঢাকা এসেছিলাম ১৯৪৮ সালের ময়মনসিংহ সম্মেলনে যাবার পথে। সেটা ছিল জানুয়ারি মাস। ১৯৪৮ সালের অক্টোবরেই ঢাকা জেলে এলাম রাজবন্দি হিসেবে। এই ৪ বছরে ঢাকা জেল থেকে মাত্র একবার বের হয়েছি। ডাক্তার দেখাতে অনেক পুলিশ দিয়ে আমাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তারপর আর বাইরের রোদ দেখার সুযোগ হয়নি।

১৯৫২ সালের শেষে মুক্তি পেয়ে মনে হলো আমি কোথায় যাব? ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর দল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাইরে কে কোথায় ছড়িয়ে

www.nagorikpathagar.com

ছিটিয়ে আছে জানি না। শুনেছিলাম মোজাম্মেল দা কলকাতায় গিয়েছিলেন। সেখানে আরএসপি'র মুখপত্র দৈনিক গণবার্তার প্রধান বার্তা পরিবেশক হয়েছিলেন। শুনেছি পাসপোর্ট-ভিসা চালু হবার আগেই তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। ঢাকার একটি সংবাদপত্রে কাজ করছেন। খালেক দা'ও নাকি ঢাকায়। তিনিও নাকি সংবাদপত্রে কাজ করেন। দলের অন্যতম নেতা শ্রমিক নেতা নেপাল সাহা দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন। মুক্তি পেয়ে কোথায় আছেন জানি না। শুনেছি রুহুল আমীন কায়সার অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় গেছেন। শুনেছি আবদুল গাফফার চৌধুরী ঢাকায় আছেন। ঢাকা বেতারে কাজ করছেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন। যিনি শামসুদ্দিন আবুল কালাম নামে পরিচিত।

আমার এক মামা ছিলেন মালিটোলায়। বাংলাবাজারে বইয়ের দোকান ছিল। শিক্ষকতা করতেন প্রিয়নাথ স্কুলে (বর্তমান নবাবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে)। তিনি এককভাবে ঢাকা বোর্ডের বই সরবরাহ করতেন। ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় তিনি সব কিছু হারিয়েছেন। সবকিছু হারিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছেন। এক মেসোমশাইর বাসা ছিল গোয়ালনগরে। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলের অন্যতম মালিক ছিলেন। তিনিও দেশান্তরী দেশ বিভাগের পর।

জেলখানার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম আমি কোথায় যাব। বাড়িতে কে আছে তাও জানি না। মা দেশান্তরী হয়েছে অনেকদিন আগে। দেশে তিন কাকা আছেন। একজন কোটালীপাড়ায়। অপর দু'জন টুঙ্গীপাড়ার পাটগাতীতে। শুনেছি ছোট কাকা পাসপোর্ট-ভিসা চালু হবার আগেই চলে গেছেন ভারতে। এছাড়া ঢাকা থেকে বাড়ি যেতে হলেও অনেক ঝামেলা। স্টিমারে বরিশাল। বরিশাল থেকে খুলনাগামী স্টিমারে পাটগাতী স্টেশনে নামতে হবে। তারপর ঘণ্টা তিনেক নৌকায়। সে পথের কী হাল তাও জানি না।

হঠাৎ মনে এল ঢাকার মোহন দাস রোডের কথা। যতদূর মনে ছিল হেমেন দাস রোডে অগ্নিযুগের বিপ্লবী স্বদেশ নাগের একটি বাড়ি আছে। স্বদেশ নাগ এককালে আরএসপি করতেন। পরবর্তীকালে জয়প্রকাশের সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। সে যুগের বিপ্লবীরা ঢাকা এলে স্বদেশ নাগের বাড়িতেই থাকতেন। এখানে উঠতেন মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ধীরেন দত্ত, ফণী মজুমদার এবং দেবেন ঘোষ প্রমুখ। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম হেমেন দাস রোডেই যাব।

হেমেন দাস রোডে স্বদেশ বাবুর সাথে দেখা হলো। তিনি খুব খুশি হলেন বলে মনে হলো না। কারণ তখন সারা দেশে ভয়ের রাজত্ব। মুসলিম লীগের

www.nagorikpathagar.com

ত্রাসের শেষ ছিল না। বিশেষ করে হিন্দুরা ছিল ভীষণভাবে শঙ্কিত। তারপর আমি রাজবন্দি এবং ধর্মের বিচারে মুসলমান নই।

স্বদেশ বাবু খুব দুঃখ করলেন। বললেন, এখানে থাকো। চেষ্টা করে দেখো কোনো বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা যায় কিনা। তোমার বাড়ি যাবার একটা ব্যবস্থা হবেই। তবে একবার শামসুদ্দিনের কাছে যাও। শামসুদ্দিন রেডিওতে চাকরি করে। ঢাকা জেলের কাছেই রেডিও অফিস। শামসুদ্দিন তোমাকে নিশ্চয়ই খবর দিতে পারবে।

বিকেলের দিকে আমি রেডিও অফিসে গেলাম। আমার সাথে গোয়েন্দা বাহিনীর দু'জন লোক। ওরা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। আমার নাম করে অফিসে স্লিপ পাঠালাম। শামসুদ্দিন দা যেন কেমন হয়ে গেলেন। বললেন, তুই কোথায় থেকে এলি? কোথায় ছিলি এতদিন? আমার যেন মনে হলো শামসুদ্দিন দা কোনো খবরই রাখেন না।

শামসুদ্দিন দা'র সাথে দেখা হয়নি দীর্ঘদিন। তাঁর সাথে পরিচয় বরিশালে ছাত্রজীবনে। তিনি তখন আরএসপি'র ছাত্র ফ্রন্টের অন্যতম নেতা। কবিতা লেখেন। গল্প লেখেন। শামসুদ্দিন দা তখন বিশেষ আকর্ষণ। ছাত্রজীবনেই তাঁর গল্পগ্রন্থ 'শাহেব-বানু' প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন ছোটদের জন্য উপন্যাস 'কাকলী মুখর'। মুসলিম লীগের তখন প্রচণ্ড প্রতাপ। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেন না। তিনি নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। শামসুদ্দিন দা ছিলেন আমাদের কাছে একটি গল্প।

দেশভাগের আগে শামসুদ্দিন দা ব্রজমোহন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। যতদূর মনে আছে তিনি এমএ পড়ার জন্য কলকাতা যান। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার সময় শামসুদ্দিন দা বললেন—তিনি পাকিস্তানে থাকবেন না। তাঁর কথায় পাকিস্তান হবে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র। ঐ রাষ্ট্রে তিনি থাকবেন না। তাই চলে গেলেন কলকাতায়। ১৯৪৮ সালের ২৯ মার্চ আমি কলকাতা যাই একটি পরিবারকে পৌঁছে দিতে। কলকাতা গিয়ে শামসুদ্দিন দা'র খোঁজ নিলাম। তিনি থাকেন পার্ক সার্কাসের কংগ্রেস একজিবিশন রো-তে। তাঁকে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। লোয়ার সার্কুলার রোডে আরএসপি'র রাজ্য দফতরে গেলাম। তখন সেখানে থাকতেন ড. অরবিন্দ পোদ্দার। তখন 'ক্রান্তি' নামে আরএসপির একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা বের হতো। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ড. নীহার রায় ও ত্রিদিব চৌধুরী। তবে পত্রিকাটির সব কাজ চালাতেন ড. অরবিন্দ পোদ্দার। অরবিন্দ পোদ্দারকে জিজ্ঞেস করলাম শামসুদ্দিন দা'র কথা। তিনি

www.nagorikpathagar.com

বললেন, আপনার দাদা এখন বড্ড ব্যস্ত। খুব লেখালেখি করছেন। তাঁকে এখন খুঁজে পাওয়া ভার। শামসুদ্দিন দা'র সাথে দেখা না করেই বরিশাল ফিলাম। তার কয়েক মাস পর গ্রেফতার হলাম। এই দীর্ঘদিন তেমন খবর রাখিনি। শুনেছিলাম শামসুদ্দিন দা পূর্ববাংলায় ফিরে রেডিওতে কাজ নিয়েছেন। আর তাঁকে নিয়ে একটি ভিন্ন ধরনের বিতর্ক চলছে শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে।

তবে এ বিতর্কের জন্মসূত্র রাজনীতি। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে মতানৈক্য ছিল আরএসপি'র। এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুরা দুঃখজনকভাবে অসহনশীল। আরএসপি'র কাউকে তারা সহ্য করতে পারতেন না। আরএসপিকে কোণঠাসা করতে মুসলিম লীগ, পরবর্তীকালে আওয়ামী মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ এবং ন্যাপের সাথেও তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আবার কমিউনিস্ট বন্ধুদের কথায় তারাই একমাত্র সাচ্চা সমাজতন্ত্রী। যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করবে তারা নিশ্চয়ই মার্কিনপন্থী। আরএসপি অন্ধভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি অনুসরণের পক্ষপাতি ছিল না এবং এই মৌলিক পার্থক্যের জন্যই আরএসপি'র জন্ম হয়েছিল। সুতরাং আরএসপিকে ঠেকানো ছিল যেন কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুদের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের অংশ। তার চরম শিকার হতে হয়েছিল শামসুদ্দিন আবুল কালাম ও আবদুল গাফফার চৌধুরীকে।

এই দু'জনের সাথে আমি সব প্রশ্নে একমত ছিলাম, তাও নয়। কিন্তু এদেশে ডিগবাজির ইতিহাসও কম নয়। যারা পাকিস্তান আমলে আদমজী পুরস্কার পাবার জন্য দৌড়-ঝাঁপ করেছেন, পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে তকমা পেয়ে গলায় ঝুলিয়ে বুক ফুলিয়ে হেঁটেছেন তাঁরা কিন্তু আজো প্রগতিবাদী। তাঁরা সবচেয়ে বড় মুক্তিযোদ্ধা এবং বাঙালি। কিন্তু আজো আবদুল গাফফার চৌধুরী কোনো নিবন্ধ লিখলে সাত রকমের প্রশ্ন ওঠে। আমার প্রগতিবাদী বন্ধুরা বলেন, ধ্যাৎ! গাফফার চৌধুরী তো সারাজীবনই দালালি করেছে। একে নিয়ে বিতর্ক করে লাভ নেই। আমি গাফফার চৌধুরীর পক্ষে কিছু বলছি না। গাফফারকে যারা প্রতিদিন গালি দেন তাদের বলব—বন্ধুরা, একটু নিজেদের অতীত স্মরণ করুন। একবার হলেও আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে নিজেদের অতীতের কথা চিন্তা করুন। এমনকি '৭১ সালেও আপনারা সকলে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পেরেছেন তার প্রমাণ কিন্তু মিলছে না।

শামসুদ্দিন দা'র কথায় তেমন ঘাবড়ে গেলাম না। জানতাম, তিনি খুব অসুবিধায় আছেন। প্রথমে মনে হয়েছিল জেলখানা থেকে বের হয়ে গোয়েন্দা

www.nagorikpathagar.com

নিয়ে সরাসরি রেডিও পাকিস্তানে যাওয়া ঠিক হবে কি না। শামসুদ্দিন দা বিপদে পড়বেন কি না। তবুও আমার উপায় ছিল না। তাই বন্ধুদের খোঁজ-খবর করতে শামসুদ্দিন দা'র কাছে গিয়েছিলাম। তিনি কারো ঠিকানা দিতে পারছিলেন না। নিজের দাদার ঠিকানা দিলেন। বললেন, কাল ভোরে আমার বাসায় আসবি। তোর সাথে অনেক কথা আছে।

ঐ দুই গোয়েন্দা সাথে নিয়ে আমি আবার বের হলাম। এবার হাঁটছি ফুলবাড়িয়া স্টেশনের দিকে। কোথায় যাব ঠিক জানি না। স্টেশনের কাছে পৌঁছাতে দূর থেকে দেখি খালেক দা আসছেন। খালেক দা আমাকে দেখে অবাক হলেন। বললেন, তুমি কোথা থেকে এলে! কখন মুক্তি পেলে? কোথায় থাকছ? কোথায় খাচ্ছ? আমি তখন নির্বাক। আদৌ ভাবিনি খালেক দা'র সাথে আমার রাস্তায় দেখা হবে। বললাম, আপনাদের খুঁজছিলাম। শামসুদ্দিন দা'র কাছ থেকে এলাম।

খালেক দা গোয়েন্দাদের বিদায় নিতে বললেন। বললেন, তুমি আমার সাথে চলো। বললেন, চলো বংশাল রোডে। ওখানে মোজাম্মেল আছে। একটি দৈনিক পত্রিকায় চাকরি করে। যতদূর মনে আছে দৈনিকটির নাম 'আমার দেশ'। সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমেদ। আমাকে দেখে মোজাম্মেল দা যেন চিৎকার করে উঠলেন। আমার হাতে তখন বাড়ি যাবার একটা স্টিমার টিকেট। তিনি টিকেটটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। বললেন, তোমার বাড়ি যাওয়া হবে না। তুমি কিছুদিন ঢাকা থাকবে। তোমার জন্য পাসপোর্ট করতে হবে। কলকাতায় গিয়ে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কলকাতায় তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি খুব দুঃখ করছিলেন—তোমাকে ফেলে কেন আমরা সবাই ভারতে চলে এলাম। মোজাম্মেল দা বললেন, কলকাতায় যাওয়া তোমার প্রথম কাজ। তারপর তুমি কোটালীপাড়া যাবে।

আমি সেই পড়ন্ত বেলায় মোজাম্মেল দা'র মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। এই সেই মোজাম্মেল দা। ১৯৪৭ সালে আমি বরিশাল বিএম কলেজে পড়ি। তিনি আমাদের নেতা। দেশ বিভাগের পর মা চলে গেলেন পশ্চিমবঙ্গে। আমি বরিশালে, জানতেন তিনি। আমি মোজাম্মেল দা'কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কী করব। তিনি বললেন, তোমার যাওয়া হবে না। তুমি রাজনীতি করবে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২। ঢাকা বংশাল রোডের একটি অফিসে আমি মোজাম্মেল দা'র সামনে দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, মোজাম্মেল দা, আমার একটি কথা আছে। ১৯৪৭ সালে আপনি বলেছিলেন, তোমার দেশ ছেড়ে যাওয়া হবে না। এবার আমি বলছি—আমি দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি আগে

www.nagorikpathagar.com

কোটালীপাড়া যাব। আপনি পাসপোর্ট-ভিসার চেষ্টা করতে পারেন। পাসপোর্ট-ভিসা পেলে আমি যাব মাকে দেখতে।

মোজাম্মেল দা আমার পাসপোর্টের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে আমি পাসপোর্ট পেয়েছিলাম দুই মাসের জন্য। সে পাসপোর্ট আমার হাতে আসতে আসতে দুই মাস কেটে গেছে। এরপর ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার আমাকে কোনো পাসপোর্ট দেয়নি।

মোজাম্মেল দা আমার কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে। চলো, পাতলাখান লেনে যাই। পাতলাখান লেনে গাফফার আছে। অর্থাৎ আবদুল গাফফার চৌধুরী। যতদূর মনে পড়ে গাফফার দোতলায় থাকত। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

১৯৪৮ সালে বিএসসি পরীক্ষার্থী ছিলাম। ১৯৫৩ সালে আবার চেষ্টা করছি ঐ বিএসসি পড়বার। দু'টি সেশন চলে গেছে, তাই নতুন অনুমতি নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেলখানায় বিজ্ঞান পড়া যায় না। তাই জেলখানার দিনগুলো আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ায় কোনো কাজে আসেনি।

কিন্তু আমার জন্যে তদ্বির করবে কে? বরিশাল এসে দেখলাম পুরনো বন্ধু তেমন কেউ নেই। দলের অন্যতম নেতা সুধীর সেন জেলখানায়। বরিশাল শহরে অসংখ্য চেনাজানা লোক আছে। রাজনৈতিক দলের সদস্য আছে। কিন্তু থাকব কোথায়। শেষ পর্যন্ত ঐ দেবেন দা অর্থাৎ দেবেন ঘোষের বাসায়ই উঠতে হলো। ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড ম্যাক-ই-নার্নীর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটির সদস্য। ক্যাথলিক চার্চের লোক। বাড়ি আয়ারল্যান্ড। আইসিএল। ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বর্মায় ব্রিটিশের পক্ষে গোয়েন্দাগিরিও করেছেন।

একটি বিশেষ লক্ষ্যে তাঁকে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ করা হয়েছিল। ছাত্র আন্দোলনের জন্যে তখন ঢাকার বাইরের ৩টি কলেজ চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই তিনটি কলেজ হলো— বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং রংপুরের কারমাইকেল কলেজ। পাকিস্তান সরকার এ কলেজগুলোতে প্রাক্তন সিভিল সার্ভেন্টদের নিযুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সুবাদে ব্রজমোহন কলেজে আসেন ম্যাক-ই-নার্নী।

এডওয়ার্ড ম্যাক-ই-নার্নী আমার সঙ্গে ভালো আচরণ করলেন। বললেন, তিনি ঢাকা গিয়ে আমার জন্যে তদ্বির করবেন। তদ্বিরের জন্যে আমিও ঢাকা গেলাম। আবদুল গাফফার চৌধুরীর ভগ্নিপতি আব্দুল হামিদ

www.nagorikpathagar.com

তালুকদার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। তাঁর কাছে গেলাম গাফফারকে নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত আবার ব্রজমোহন কলেজে পড়বার অনুমতি মিলল। দেবেন দা একটা থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন বরিশালে এক বাসায় পড়াবার বিনিময়ে। বিপদ দেখা দিল ভর্তি নিয়ে। পাকিস্তান আমলে কড়া নিয়ম ছিল। মুচলেকা দিতে হতো যে রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করব না এবং সে জন্য প্রয়োজন হতো একজন স্থানীয় অভিভাবকের।

বরিশাল শহরে কে আমার স্থানীয় অভিভাবক হবেন? আমি জেলখানা থেকে এসেছি। সরকারের সুনজরে নেই। কেউ রাজি হবেন না আমার স্থানীয় অভিভাবক হতে। এবার সহযোগিতা করলেন জাহিদ হোসেন জাহাঙ্গীর। তিনি জাহাঙ্গীর হোসেন নামে পরিচিত। ছাত্র জীবনে আরএসপি করতেন। তাঁর ব্যক্তিগতভাবে পারিবারিক দিক থেকে বরিশালে বেশ প্রভাব ছিল। তিনি আমাকে ব্রজমোহন কলেজের তৎকালীন ভাইস প্রিন্সিপাল দেবেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি ডিএনসি নামে পরিচিত। ইংরেজির অধ্যাপক ডিএনসি আমার স্থানীয় অভিভাবক হলেন। ১৯৫৩ সালের জুলাইতে আমি পুনরায় ব্রজমোহন কলেজে বিএসসি শেষ বর্ষের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলাম। সামনে পরীক্ষা।

আমি কলেজে ভর্তি হবার পর প্রিন্সিপালের আচরণ পাল্টে গেল। তিনি আমাদের ক্লাসের কাছাকাছি আসতেন। দেখতেন, আমি ক্লাসে আছি কি না। কোনো ছাত্র আমার সঙ্গে কলেজ প্রাঙ্গণে কথা বললে তিনি ডেকে পাঠাতেন। বলতেন—Do not spoil yourself— he is a marxist (নিজেকে নষ্ট করো না—ঐ ছেলে মার্কসবাদী)। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের ডেকে বলতেন, সাবধান, ওর সঙ্গে ঘুরলে বৃত্তি কাটা যাবে। অর্থাৎ প্রিন্সিপালের জন্যেই কলেজে আমি আমার অজান্তে ভয়ের বস্তুতে পরিণত হলাম।

এই রাজনীতি নিয়ে একটি ঘটনা আছে ম্যাক-ই-নার্নীর আমলে ব্রজমোহন কলেজে। ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিন মারা যান। ছাত্র সংঘের পক্ষ থেকে কলেজ ছুটি ঘোষণা দাবি জানানো হলে তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে দিলেন—দ্য ক্যান্সার ইজ আউট। তিনি ছুটি দিতে রাজি হলেন না। পরদিন কলেজ ধর্মঘট। ফলে ছাত্র সংসদের সঙ্গে প্রিন্সিপালের বিরোধ দেখা দেয় এবং তিনি ভিপিসহ ছাত্র সংসদের সদস্যদের বহিষ্কার করেন। এ সময় আমি কলেজে ভর্তি হই।

তবে আমার তখন রাজনৈতিক তেমন পরিচিতি ছিল না ছাত্রদের মধ্যে। ছাত্র সংসদ ছিল ছাত্র ইউনিয়নের দখলে। ছাত্রলীগ দুর্বল। এ সময় আমাদের

www.nagorikpathagar.com

দল ছাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছাত্রলীগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমি বরিশাল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হই। সাধারণ সম্পাদক হন হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি গোলাম রাব্বানী। কলেজের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে।

অপরদিকে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষিত হয়। ঘোষণা করা হয় ৫৪ সালের প্রথম দিকে পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন হবে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর এটাই ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। সুতরাং রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। এ সময় ঘোষণা হয়, ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে।

১৯৫৪ সাল। পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন। এর আগে কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেয়া হলো। বিরোধী দলের পক্ষে ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হলো। নাম—কলিজিয়েট ফ্রন্ট। টিকল না। আমি ভিপি প্রার্থী কলিজিয়েট ফ্রন্ট থেকে।

এ নির্বাচন নিয়ে একটি ঘটনা ঘটল। এ নির্বাচন আমার মনে তখন বেশ দাগ কেটেছিল। নির্বাচনের পূর্বদিন রাতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা বললেন, সামনে সাধারণ নির্বাচন—ব্রজমোহন কলেজে আমাদের জিততে হবে। না হলে সাধারণ নির্বাচনে তার ছাপ পড়বে। তা ছাড়া ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে মাত্র ২০০ হিন্দু ছাত্র। আপনি দাঁড়ালে নির্বাচনে জেতা যাবে না। আপনি সরে দাঁড়ান।

তাদের বক্তব্য আমার অযৌক্তিক মনে হয়নি। তবে খারাপ লেগেছিল হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নটি উত্থাপন করায়। সব সময় রাজনৈতিক অঙ্গনে দেখেছি কমিউনিস্ট পার্টি বরাবরই সাধারণ মানুষকে শ্রেণি ভিত্তিতে না দেখে সম্প্রদায় হিসেবে দেখেছেন। এ হিসেবে পাকিস্তান সমর্থন করেছে। মুসলিম লীগের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল 'কমরেড' খুঁজেছে। এবারও তাদের মুখ্য যুক্তি হচ্ছে আপনি হিন্দু—তাই আপনার দাঁড়ানো ঠিক হবে না।

আমি রাজি হলাম না। ভাবলাম এই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চিন্তার রাজনীতি সঠিক নয়। আমি পরাজিত হতে রাজি। তবে হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে নয়। সুতরাং নির্বাচন হবে আগামীকাল এবং আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।

তবে সরকার সেভাবে ভাবেনি। আমাদের ভাবনার বাইরে একটি সিদ্ধান্ত ছিল সরকারে। সে সিদ্ধান্ত কার্যকর করলেন ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ। নির্বাচনের দিন দুপুরের দিকে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর কক্ষে। ইতোমধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল যে আমাকে দাঁড়াতে দেয়া হবে না। অধ্যক্ষ

www.nagorikpathagar.com

শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করে আগেই তাঁর কথা বলেছেন। অধ্যক্ষের শঙ্কা হচ্ছে, আমি নির্বাচিত হলে স্লোগান উঠবে—'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।' আমি দাবি করব বহিষ্কৃত ছাত্রদের ফিরিয়ে নেয়া হোক। সুতরাং আমাকে দাঁড়াতে দেয়া হবে না। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, তাহলে নির্মল সেনের মনোনয়নপত্র কেন গ্রহণ করা হয়েছিল? কোন ভিত্তিতে? তখনই বলা উচিত ছিল যে তুমি দাঁড়াতে পারবে না। জবাবে অধ্যক্ষ বলেছিলেন—তিনি নাকি ধারণাই করতে পারেননি যে, আমি নির্বাচিত হব। ভেবেছিলেন আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ক্ষতি নেই। কারণ আমি পরাজিত হবই। সেদিন নাকি তাঁর ধারণা হয়েছে আমি জিতে যাব। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত, আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেই দেয়া হবে না। এ ক্ষমতা নাকি ছাত্র সংসদের প্রধান হিসেবে তাঁর আছে। তিনি শিক্ষকদের আশ্বাস দিলেন যে কলেজে হাঙ্গামা এড়াবার জন্যে এ পথ নেয়া হচ্ছে এবং আমার নির্বাচনের জন্যে কোনো টাকা ব্যয় হয়ে থাকলে কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে দিয়ে দেবে।

আমি এ খবর পেয়েই অধ্যক্ষের কক্ষে ঢুকলাম। ঢোকামাত্র অধ্যক্ষ ম্যাক-ই-নার্নী বললেন—তুমি কলেজে গণ্ডগোল করছ। তোমার ছেলেরা সন্ত্রাস করছে। আমি বললাম, আপনি মিথ্যা বলছেন। কলেজে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে। অধ্যক্ষ বললেন, তোমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেয়া হবে না।

আমি বললাম, কেনো?

তিনি বললেন, আমার ইচ্ছে। তুমি নির্বাচিত হয়ে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' বলবে। বহিষ্কৃত ছাত্রদের কলেজে ফিরিয়ে নিতে বলবে। কলেজে গোলমাল হবে। আমি বললাম, আমাকে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে না দেবার আপনি কে? তিনি বললেন, আই অ্যাম দি কনস্টিটিউশন—আমি ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র। আমি বললাম, আমি আপনার নির্দেশ মানি না। আমি বললাম, আমি নির্বাচন করব। আপনি পারলে ঠেকাবেন। আপনার সঙ্গে নির্বাচনের কক্ষে দেখা হবে। আমি অধ্যক্ষের কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলাম।

তখন ব্রজমোহন কলেজে সরাসরি ভাইস প্রেসিডেন্ট, সাধারণ সম্পাদক বা সহ-সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হতো না। নির্বাচনী কলেজ প্রতিনিধি গঠিত হতো প্রতিটি শ্রেণির প্রতিনিধি নিয়ে। বিভিন্ন শ্রেণির জন্যে বিভিন্ন পদ নির্ধারিত থাকত। নির্বাচিত কলেজ প্রতিনিধি ঐ তিনটি পদে নির্বাচন করত। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো কলেজ মিলনায়তন কালী প্রসন্ন হলে, অর্থাৎ কেপি হলে।

আমি নির্বাচন হলে ঢোকামাত্র আমাদের পক্ষে একজন আমার নাম ভিপি হিসেবে প্রস্তাব করল। অন্য দু'জনের নামও প্রস্তাবিত হলো। ভিপি প্রার্থী ছিল

www.nagorikpathagar.com

তিনজন—আমি, কলেজিয়েট ফ্রন্টের অন্যতম প্রার্থী হাবিবুল্লাহ ও মুসলিম ছাত্র সংঘের আব্দুল বারী। নাম প্রস্তাবিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—নির্মল সেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। কারণ সে ভর্তির সময় মুচলেকা দিয়েছিল যে কলেজে রাজনীতি করবে না।

আমি উঠে বললাম, আপনি ডাহা মিথ্যা কথা বলছেন। এমন কোনো মুচলেকা আমি দিইনি। আর ছাত্র সংসদ নির্বাচন আদৌ রাজনীতিও নয়। এবার অধ্যক্ষ বললেন, আমি সংসদের প্রধান হিসেবে তার প্রার্থীপদ বাতিল করলাম। আমি তখন আমাদের সমর্থকদের কলেজিয়েট ফ্রন্টের প্রার্থী হাবিবুল্লাহকে ভোট দেবার জন্যে বললাম। অধ্যক্ষ বললেন, তুমি কাউকে সমর্থন করতে পারবে না। তোমার সদস্যপদ বাতিল। আমি বললাম, তাহলে অধ্যক্ষ হিসেবে আপনি নিরপেক্ষ নন। আপনাকেও আমার সাথে কক্ষের বাইরে যেতে হবে। দীর্ঘদেহী ব্রিটিশ আইসিএস এডওয়ার্ড ম্যাক-ই-নার্নী আমার সঙ্গে কক্ষ থেকে বের হলেন। কিছুক্ষণ পরে নির্বাচনের ফল বের হলো। আমাদের সমর্থিত তিনজন প্রার্থীই জিতে গেল। অধ্যক্ষ বললেন, নির্মল সেন একজন গুণ্ডা। পরদিন তিনি আমার স্থানীয় অভিভাবক অধ্যাপক দেবেন চ্যাটার্জিকে বললেন—নির্মলকে টেস্ট দিয়ে চলে যেতে বলুন—আমি ওকে আটকাব না।

ইতিমধ্যে নির্বাচনী গোলমাল শুরু হলো। আমি খুনের মামলায় জড়িয়ে গেলাম। খুন হলো তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের বরিশাল সফর নিয়ে।

১৯৪৮ সালে গ্রেফতার হয়ে বরিশাল ছেড়েছিলাম। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বরিশালে এলাম ১৯৫৩ সালে। ১৯৪৮ সালে জেলে যাবার ফলে বিএসসি পরীক্ষা দেয়া হয়নি। ভেবেছিলাম বিএসসি পরীক্ষাটা শেষ করব। তাই বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আবার ভর্তি হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এবার হয়তো হুড়-হাঙ্গামা হবে না। কিন্তু ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা হলো। নতুন করে হাঙ্গামা শুরু হলো। মনে হচ্ছিল সেবারও পরীক্ষা দেয়া হবে না।

জেলখানা থেকে ফিরে বরিশালে এক ভিন্ন চিত্র দেখলাম। এককালের বরিশালের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টি, আরএসপি এই দুটি বামপন্থী দলের প্রভাব ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর নির্যাতনের ফলে দু'টি দলই বিপর্যস্ত। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে এ দু'টি দলের মৌলিক পার্থক্য ছিল। পার্থক্য ছিল জাতীয় রাজনীতি নিয়েও। কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তান সমর্থন

www.nagorikpathagar.com

করেছিল। আরএসপি সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসুর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সার্বভৌম বাংলার আন্দোলনে নেমেছিল। পাকিস্তান আমলে আরএসপি ও কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্ব ও চিন্তার দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও সরকারি নির্যাতনের ফলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেরই চেষ্টা করা হতো।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে রুখবার জন্যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। এই যুক্তফ্রন্টে ছিল আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেজামে ইসলাম এবং গণতন্ত্রী দল। প্রথম দিকে আরএসপি এই নেতৃত্বের সম্পর্কের প্রশ্ন তুললেও পরবর্তীকালে সকল বামপন্থী দলই যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দেয়। ১৯৫৩ সালে আরএসপি পুনর্গঠিত হয়। এই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হলেন রুহুল আমিন কায়সার, নিতাই গাঙ্গুলী ও এবিএম মূসা। এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কাজ করা শুরু করি এবং বরিশালে আমি ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হই।

১৯৫৪ সাল। নির্বাচন এগিয়ে আসছে। বরিশালে নির্বাচনী সফরে আসবেন পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন। সঙ্গে আসবেন উত্তর প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী আব্দুল কাইয়ুম খান। বরিশালের ছাত্রদের সিদ্ধান্ত—এ সফর ঠেকাতে হবে।

আমি তখন কলেজ নিয়ে বিব্রত। কলেজ নির্বাচন নিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড ঘটিয়েছে আইএসসির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা। তারা একদিন পড়ন্ত বেলায় পদার্থবিদ্যার ক্লাসের আগে ছুটি দেবার জন্যে শিক্ষকের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু ক্লাসের শিক্ষক রাজি হননি। তখন তিনজন ছাত্র কলম থেকে কালি ছিটিয়ে দিয়েছে সামনে বসা ছাত্রীদের শাড়িতে। ছাত্রীরা চিৎকার করে উঠলে ক্লাস ছুটি হয়ে যায়। অভিযোগ চলে যায় অধ্যক্ষের কাছে। তিনি নির্দেশ দিলেন, তিনজন ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কারের। তবে এ নির্দেশ কার্যকর করার পূর্বে ভাইস প্রিন্সিপালকে বললেন—আমার মতামত জানার জন্যে। আমি তখন কলেজে যাই না। টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে গেছি। তবুও অধ্যক্ষের আশঙ্কা এ ছাত্রদের বহিষ্কার করা হলে আমি হয়তো কলেজে গণ্ডগোল করব। তাই আমাকে ডেকে পাঠানো হলো কলেজে।

কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালের কক্ষে কথা শুরু হলো। ভাইস প্রিন্সিপাল দেবেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি (ডিএনসি) আমার স্থানীয় অভিভাবক। তিনি বললেন—নির্মল, তুমি কোনো প্রতিবাদ করো না। তোমার সামনে অনেক

www.nagorikpathagar.com

বিপদ। গণ্ডগোল করলে পরীক্ষা দেয়া হবে না। আমরা সকলেই চাই তুমি পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে যাও কলেজ থেকে।

আমি বললাম, স্যার লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে যাচ্ছে। এই বয়সের ছেলেরা মেয়েদের দেখলে শিস দেয়। শাড়িতে কালি দেয়াটাও অসম্ভব কিছু নয়। এই বয়সের এটাই ধর্ম। ছেলেগুলো আমার কাছে এসেছিল। আমি বলেছি, তোমাদের মনে এমন কিছু থাকলে চিঠিপত্র লিখতে পারতে। এভাবে কালি দেয়া ঠিক হয়নি। ওরা আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে; ক্ষমাও চেয়েছে। আমি ওই মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে বলেছি।

ভাইস প্রিন্সিপাল বললেন, তোমার কথা শুনতে ভালো। কিন্তু প্রিন্সিপাল তোমার কথা মানবেন না। তুমি এ ব্যাপারে নাক গলাবে না। আমি বললাম, তাহলে এ ব্যাপারে আমার অভিযোগ আছে। আমার অভিযোগ হচ্ছে বিজ্ঞানের অনেক শিক্ষকই ঘন্টার পর ঘণ্টা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে দাঁড়িয়ে ছাত্রীদের সবকিছু বোঝানোর চেষ্টা করেন। ছাত্ররা ডাকলে কাছেও আসেন না। তাই আমাদের ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে হলে ঐ শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি কিন্তু ছাত্রদের এসব কথা বলব।

ভাইস প্রিন্সিপাল বললেন, তাহলে তোমার এ ব্যাপারে প্রস্তাব কী? আমি বললাম, শুধুমাত্র একটা ওয়ার্নিং। ঐ ছাত্রদের আপনি ডেকে সতর্ক করে দিন যে, ভবিষ্যতে এমন ঘটলে তোমাদের বহিষ্কার করা হবে। শেষ পর্যন্ত তাই হলো। ছাত্ররা বেঁচে গেল।

যতদূর মনে আছে—এ হচ্ছে ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের কথা। জানুয়ারি মাসের ১৯ তারিখ নূরুল আমীন বরিশাল সফরে আসবেন। বরিশাল তখন উত্তপ্ত। এক সন্ধ্যায় মিছিলের সামনে পড়ায় এক মুসলিম লীগ নেতার মুখে থুতু দেয়া হয়েছে। মিছিলে স্লোগান উঠেছে নূরুল আমীনকে জুতা মারো। এ পরিস্থিতিতে ১৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সকল দলকে ছাত্র ইউনিয়ন অফিসে ডাকা হলো। কমিউনিস্ট পার্টি এবং ইউনিয়নের কথা হচ্ছে নূরুল আমীনের বিরুদ্ধে কঠিন কিছু করা ঠিক হবে না। কোনো খুন জখম হলে এই অজুহাত দেখিয়ে সারা দেশে হয়তো নির্বাচনই বন্ধ করে দেয়া হবে। এ ঝুঁকি আমাদের নেয়া ঠিক হবে না। আমি বললাম, আপনাদের কথা আমি মানতে রাজি আছি। কিন্তু সরকার পক্ষ কিছু ঘটালে ছাত্রলীগ তার প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ করবেই। শেষ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ হলো।

১৯ জানুয়ারি সকাল থেকেই বরিশাল শহর থমথমে। আমরা তেমন কোনো বিক্ষোভের ব্যবস্থা করিনি। সদর রোডে ছাত্রলীগ অফিসে মাইক থেকে

www.nagorikpathagar.com

বক্তৃতা দিচ্ছি। নূরুল আমীন সদলবদলে ঢাকা থেকে বরিশালে পৌঁছাবেন স্টিমারে। আমাদের বারণ সত্ত্বেও ডজন খানেক ছাত্র পকেটে কালো রুমাল নিয়ে স্টিমার স্টেশনে যায়। নূরুল আমীন স্টিমার থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে তারা কালো রুমাল দেখায়। তাদের গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মধ্যে ছিল নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের এককালের সভাপতি আকতার উদ্দিন এবং ছাত্রলীগ নেতা নুরুল ইসলাম মঞ্জুর। এদের গ্রেফতারের খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে গেল শহরে। তখন শর্ষিনার পীরের মুরিদেরা মুসলিম লীগের সমর্থনে মিছিল করেছিল সারা বরিশালে। ছাত্রলীগের অফিস থেকে সব স্কুল এবং কলেজে ধর্মঘটের খবর পাঠানো হলো। খবর এল কলেজে মাত্র একটি ক্লাস হচ্ছে। ঐ কলেজে ধর্মঘটের খবর পাঠানো হলো। ঐ ক্লাসের নেতৃত্বে আছে মুসলিম ছাত্রলীগের ছেলেরা। আমি কলেজে পৌঁছালাম। শিক্ষকরা বললেন, কী করব? পার্সেন্টেজ দিয়ে ছুটি দেব না এমনিই ছুটি দিয়ে দেব? আমি বললাম, পার্সেন্টেজের দরকার নাই। এমনিই ছুটি দিয়ে দেন। মুসলিম লীগের নেতৃত্বের ক্লাসটিতে ঢুকলাম। ওদের নেতা নুরুল উল্লা [পরবর্তীকালে ইঞ্জিনিয়ার নূরুল উল্লা নামে খ্যাত], যিনি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে জগন্নাথ হলের হত্যাকাণ্ডের ছবি তুলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন]। নূরুল উল্লার ডাক নাম ছিল ভানু। ভানু আমাকে দেখেই সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এল।

তারপর শুরু হলো মিছিল। সকলের মুখে এক কথা, নূরুল আমীন কোথায়? তাকে ঘেরাও করতে হবে। ছাত্রদের মুক্তি দিতে হবে। ইতিমধ্যে প্রিন্সিপাল ম্যাক-ই-নার্নী একটি ভিন্ন পদক্ষেপ নিলেন। তিনি লিখিতভাবে কলেজে জানালেন যে তাঁর কলেজের ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি জেলে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করলেন। জেল কর্তৃপক্ষকে জানালেন ছাত্রদের জেলে রেখে নূরুল আমীনের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনে তাঁর যোগ দেয়া সম্ভব নয়।

এ খবর ছাত্রদের সাহসী করে তুলল। মিছিল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। জানা গেল নূরুল আমীন সার্কিট হাউসে চলে গেছেন। আমার ইচ্ছা ছিল সংঘর্ষ এড়াবার। চেষ্টা করলাম সার্কিট হাউস এড়িয়ে মিছিল নিয়ে যাবার। কিন্তু সম্ভব হলো না। মিছিল গিয়ে সার্কিট হাউস ঘিরে ফেলল।

তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ছেলেরা অস্থির হয়ে উঠেছে। পুরো সার্কিট হাউসের লনে দাঁড়িয়ে আছেন ম্যাজিস্ট্রেট, এসপি, বিভাগীয় কমিশনার জিএম ফারুকী এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী খান আব্দুল কাইউম

www.nagorikpathagar.com

খান। নূরুল আমীন সার্কিট হাউসের ভেতরে, এমন সময় এসপি আমাকে ডেকে পাঠালেন, বললেন কী চান? আমি বললাম গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের ছেড়ে দিতে হবে। তিনি বললেন, ছেড়ে দেয়া হবে। আমি বললাম, তাদের ছেড়ে দেয়া নয়, এখানে এনে দেখাতে হবে। তাহলে মিছিল চলে যাবে।

এসপি বললেন, তাই হবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের আমাদের সামনে হাজির করা হবে। আমি মিছিল নিয়ে টাউন হলের দিকে চলে যাবার কথা বললাম। ছাত্র-জনতা কেউই রাজি হলো না। ঘেরাও চলল। ইতিমধ্যে দক্ষিণ দিক থেকে মুসলিম লীগের লাঠিয়াল বাহিনী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের মিছিলের ওপর। সার্কিট হাউসের সামনে তখন নির্মিত হচ্ছিল একটি পেট্রোল পাম্পের ভবন। পড়ে ছিল ইট-কাঠ। জনতার হাতিয়ার হয়ে উঠল এই ইট। দু'পক্ষের সংঘর্ষের মধ্যে এক সময় এসপি মুসলিম লীগের নেতাদের নিয়ে সার্কিট হাউসের পেছন দিক থেকে বের হয়ে চলে গেলেন এ কে স্কুলের মাঠে জনসভা করতে। সে জনসভা ভণ্ডুল হয়ে গেল।

বিকেলের দিকে সারা শহরে যেন উন্মত্ততা চলছে। শর্ষিনার পীরের মুরিদদের ধরে আনা হচ্ছে। খোঁজা হচ্ছে মুসলিম লীগের লাঠিয়াল বাহিনীকে। এদের ওপর যুক্তফ্রন্টের কর্মিদের প্রচণ্ড রাগ। কারণ ওদের মধ্যেই অনেকে ছিল চেনাজানা। বলেছিল মুসলিম লীগের এতদিনের ভাড়া খাটব, আবার ফিরে আসব। কোনো গোলমাল করব না। অথচ তারাই আমাদের মিছিলে হামলা করেছে লাঠি নিয়ে।

আমি ছাত্রলীগ অফিসে বসা। খবর এল মুসলিম লীগের লাঠিয়াল বাহিনী এ কে স্কুলে স্থান নিয়েছে। যুক্তফ্রন্টের ছেলেরা জিন্দেগী রেস্টুরেন্ট থেকে সুন্দরী কাঠের লাঠি নিয়ে ছুটেছে। আমিও ছুটলাম। জনতা তখন মারমুখী। আমাকে বলছে, আপনি বারণ করতে পারবেন না। ওদের আমরা মেরে ফেলব।

আমি ঠেকাতে পারলাম না। আমরা এ কে স্কুলে ঢুকবার আগেই মুসলিম লীগ বাহিনীর অনেকে পালিয়েছিল। কিন্তু পালাতে পারেনি আব্দুল মালেক। আমার সামনে তার মাথায় ছুঁড়ে দেয়া হলো একটি বিরাট পাথর। মালেক পড়ে গেল। আমি ফিরলাম টাউন হলে। টাউন হলের সামনে তখন হাজার হাজার জনতা। সকল দলের নেতারা বক্তৃতা দিলেন। আমি কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই ঘোষণা করলাম, আমরা পরবর্তী ঘোষণা দেবার পূর্বে বরিশাল জেলার কোনো স্কুল-কলেজ আর খুলবে না।

www.nagorikpathagar.com

জনসভা থেকে বের হয়ে আসতেই অন্যান্য দলের বন্ধুরা ধরল। বলল, এ ঘোষণা কেন দিলেন? পদস্থ পুলিশ অফিসাররা এলেন। বললেন, স্কুল-কলেজ কবে খুলবে। কারো কথার জবাব দিলাম না। সেদি এ ঘোষণা কেন দিয়েছিলাম আজ আর মনে নেই। বড্ড ক্লান্ত ছিলাম। ফিরে গেলাম কালীবাড়ি রোডের আস্তানায়। ছাত্র পড়িয়ে থাকি। শুনলাম আহত মালেকের তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রিতে নেমে গেছে।

২০ জানুয়ারি ১৯৫৪। সারা বরিশাল শহরে একটি অস্থিরতা। সকলের মনে আশঙ্কা। কী হবে। সরকার পক্ষ কালকের ঘটনার বিরুদ্ধে কী ধরনের ভূমিকা নেবে। আহত আব্দুল মালেক বাঁচবে কি না।

বিকালের দিকে ছাত্রলীগ অফিসে এলাম। এ সময় ছাত্রলীগ অফিসের সামনের দেয়ালে প্রতি ঘন্টার খবর লিখে কাগজে লাগিয়ে দিচ্ছিলাম। দাবি করছিলাম, আব্দুল মালেক আমাদের লোক। কিছুক্ষণ পরে খবর এল মালেক মারা গেছে। সকলেই খানিকটা থমকে গেলাম। অফিসে নামলাম। জানতাম এবার পুলিশ তৎপর হবে।

সে রাতে ইচ্ছে করেই বাসায় থাকলাম। বাড়ির মালিক ধনী ব্যবসায়ী। পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। দুপুর রাতে আমার ঘুম ভাঙানো হলো। বাড়ির মালিকের হাতে থানার এজাহারের অনুলিপি। পুলিশ প্রায় দু'শ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বরিশাল সদর থানায়। আমি তিন নম্বর আসামী—এজাহারে লেখা হয়েছে, নির্মল সেন (কমিউনিস্ট)। পিতার নাম নেই। ঠিকানা নেই। এজাহারে বয়ানে লেখা, একজন হিন্দু ছেলে মুসলমানের পোশাকে মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সেদিন আমার পরনে ছিল পাজামা-পাঞ্জাবি। আমাকে রাতে বাসা ছাড়তে হলো। রাতে থাকতে হলো বাড়ির মালিকের দোকানের দোতলায়।

কিন্তু কোথায় যাব! স্থির হলো বাড়ির মালিকের গ্রামের বাড়ি গৌরনদী থানার মেদাকুলে যাব। দু'দিন পর বরিশালের উত্তরে মহামায়ার মেলা। দুপুরে বোরখা পরে রিকশায় উঠলাম। চারদিকে কাপড়ের ঘের দেয়া রিকশায়। মহামায়ায় গিয়ে বাস ধরলাম। বাস যাচ্ছিল বরিশাল থেকে অধুনা মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার ভুরঘাটা। ভুরঘাটার পথে ইল্লা নেমে হাঁটা পথে মেদাকুল। মেদাকুলে একটি সুবিধা ছিল। যে বাড়িতে থাকতাম সে বাড়ির পাশে খাল। খালের ওপারে ফরিদপুর জেলা। মেদাকুল বরিশাল জেলায়। সুতরাং দু'জেলার পুলিশ এড়ানো সম্ভব ছিল।

কিন্তু গ্রামে দিন কাটানো কঠিন। একদিন গৌরনদীর দারোগা সাহেব

www.nagorikpathagar.com

এলেন ঐ বাড়িতে আমার সন্ধানে। বাড়ির কর্তা বললেন, আপনার কোনো ভয় নেই। ঐ দারোগা আপনার কক্ষেই ঘুমাবে। আমাদের টাকায় ওদের সংসার চলে। আপনাকে ধরবার মুরোদ নেই। বাড়ির মালিক বড় ব্যবসায়ী। আন্তঃদেশ সুতা ব্যবসায়ী। তাঁকে এড়ানো সেকালের গৌরনদী থানার কোনো দারোগার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবং তাই-ই হলো। রাতে দারোগা সাহেব আমার কক্ষে ঘুমালেন। তেমন কোনো কথা হলো না। তিনি আমাকে চিনলেন মনে হলো না। ভোরবেলা চলে গেলেন।

আমি বুঝলাম এ বাড়িতে থাকা যাবে না। পুলিশ জেনে ফেলেছে আমি কোথায়। তাই ভাবলাম বরিশাল ফিরব। ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস। হয়তো সরকার কিছুটা শিথিল করবে বাড়াবাড়ি। ২২ ফেব্রুয়ারি বরিশাল এলাম। পুরান আস্তানায় জায়গা নিলাম। সকালে বলল—এভাবে থাকলে ধরা পড়বে। আমি বললাম, পুলিশ ভাবতে পারবে না যে আমি পুরান আস্তানায় ফিরে এসেছি। তবে পুলিশ সত্যি সত্যি আমাকে খুঁজেছিল হন্যে হয়ে। মাঝখানে পুলিশ প্রধান বিখ্যাত সামসুদ্দোহা সাহেব বরিশাল সফর করে গেছে। তাই পুলিশ সতর্ক এবং সন্ত্রস্ত।

সারা দেশে তখন নির্বাচনী জোয়ার। শেরেবাংলা ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট হক ভাসানী যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিত। এদের সঙ্গে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রচারে যোগ দিয়েছেন সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গাফফার খান। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩০৯। এর মধ্যে অমুসলমানদের জন্যে ৭২। তারা স্বতন্ত্রভাবেই নির্বাচনে নেমেছে। মুসলিম আসন সংখ্যা ২৩৭। নির্বাচনের সময়কালেই বোঝা গেলো মুসলিম লীগ গো হারা হারবে। যুক্তফ্রন্টের নেতাদের মোকাবেলা করার মতো তাদের কোনো নেতা নেই। শুধু পাকিস্তান সৃষ্টির পর ৭ বছরের ইতিহাস আছে নির্যাতন ও বঞ্চনার। এই নির্যাতন ও বঞ্চনার প্রতিবাদে প্রণীত হয়েছিল যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা। ঐ ২১ দফায় ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, শহীদমিনার নির্মাণ, ২১ ফেব্রুয়ারি ছুটি, প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিনের বাসভবন বাংলা ভাষা প্রচারের জন্যে ব্যবহারের দাবি [নুরুল আমিনের বাসভবন বর্ধমান হাউস এখন বাংলা একাডেমী], দাবি ছিল কেন্দ্রের হাতে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও মুদ্রা ব্যবস্থা রেখে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেবার। এ দাবি সারাদেশে নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করল। এর বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের কোনো যুক্তিই গ্রহণযোগ্য হলো না কোনো মহলে। তাদের পক্ষে সভা সমাবেশ করাই সম্ভব হলো না।

www.nagorikpathagar.com

মেদাকুল থেকে বরিশাল এসে বুঝেছিলাম মুসলিম লীগ হেরে গেছে। আমাদের বেশিদিন আত্মগোপন করে থাকতে হবে না। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ৮ মার্চ।

নির্বাচনের ফলাফল শুনতে সকল রাস্তায় ভিড়। সকল বাড়িতে এবং দোকানে তখন রেডিও ছিল না। রেডিওয়ালা দোকানের সামনে ভিড় হতো। মাইক্রোফোন লাগিয়ে খবর শোনানো হতো। তখন ভয়েস অব আমেরিকা বা বিবিসি'র তেমন নামধাম ছিল না। উল্লেখযোগ্য ছিল আকাশবাণী।

খবর আসতে থাকল যুক্তফ্রন্টের জয়ী হবার। প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন পরাজিত হলেন ছাত্রলীগের এককালীন সম্পাদক খালেক নওয়াজ খানের কাছে। ২৩৭ আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট জিতল ২২৭টি আসনে। ৯ আসন পেল মুসলিম লীগ। পাকিস্তান সৃষ্টির দাবিদার মুসলিম লীগ পাকিস্তান সৃষ্টির ৭ বছরের মধ্যে পরাজিত হলো শতকরা ৯৭ ভাগ ভোটে। বাকি ৭২ অমুসলমান আসনে যারা জয়ী হলেন তারাও চরম মুসলিম লীগ বিরোধী। ব্যালটে একটি সংসদীয় বিপ্লব হয়ে গেলো সেকালের পূর্ব পাকিস্তানে।

সকলের ধারণা তখন বাইরে যাওয়া যায়। যুক্তফ্রন্ট জিতেছে। পুলিশ দেখলেও গ্রেফতার করবে না। তেমন বিশ্বাস না হলেও একদিন সন্ধ্যার দিকে বের হলাম। হঠাৎ দেখা হলো এসপি সাহেবের সঙ্গে। বললেন, আপনি খুনের মামলার আসামী। এভাবে বের হলে আমাদের চাকরি থাকে না। আদালতে যান। জামিন পেয়ে যাবেন। অন্যান্য সকলে জামিন পেয়েছেন। বুঝলাম আমার বের হওয়া নিরাপদ নয়। যুক্তফ্রন্ট জিতেছে বলে আমাকে ধরতে পারছে না পুলিশ।

দিন সাতেক পর সিদ্ধান্ত হলো আদালতে আত্মসমর্পণ করব। এতদিনে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। আমাকে জামিন দিতেই হবে। কিন্তু তেমনটি হলো না। আমিসহ দশজন ছাত্র আদালতে হাজির হলাম। আমাদের উকিল সদ্য নির্বাচিত পরিষদ সদস্য এন ডব্লিউ লিয়াকতউল্লাহ এবং অ্যাডভোকেট শমসের আলীসহ অসংখ্য আইনজীবী। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে ব্যতীত ৯ জনকে জামিন দিলেন। বললেন আমার বিরুদ্ধে খুন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুটপাটের অভিযোগ আছে। আমি বরিশাল নয়, ফরিদপুর জেলার অধিবাসী অর্থাৎ ভিন্ন জেলার লোক। তাই আমাকে জামিন দেয়া যাবে না।

আমাকে জামিন না দেয়ার তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো। আদালত প্রাঙ্গণে ছাত্রদের ভিড় জমতে শুরু করল। তাদের থামানো মুশকিল। অবস্থা সামাল দেয়া না হলে হয়তো ভাঙচুর হবে। ছাত্রলীগ নেতারা উকিলদের কাছে

www.nagorikpathagar.com

বললেন, পরিস্থিতি সামলানো মুশকিল হবে। উকিলেরা হাকিমের সঙ্গে কথা বললেন। এবার আমার জামিন হলো। তবে শর্ত দেয়া হলো শুধু উকিল নয়, নগদ অর্থ জামিন থাকিবে। সেই হাকিম সাহেবের কথা এখনো মনে আছে। তিনি পরবর্তী হাজিরার দিনও আমার জামিন বাতিলের চেষ্টা করেছিলেন। আবার সেই হাকিম সাহেবই দেশে ৯২(ক) ধারা জারি হলে আমার অনুপস্থিতিতে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণে রাজি হননি। আমি তখন পলাতক। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিয়ে পাকিস্তান সরকার জেলে পুরেছে হাজার হাজার যুক্তফ্রন্টের নেতা ও কর্মীদের।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জামিন পেলাম। ভেবেছিলাম ভালো থাকব। বিএসসি পরীক্ষা জুন মাসে। এবার পরীক্ষা দিতে পারব। এ পরীক্ষা দেবার কথা ছিল ১৯৪৮ সালে। গ্রেফতার হবার কারণে পরীক্ষা দেয়া হয়নি। আশা ছিল এবার জেল এড়াতে পারব। পরীক্ষা দেবো নিয়মিত। কিছুদিন পর মনে হলো এবারও পরীক্ষা দেয়া হবে না। বিপুল ভোট যুক্তফ্রন্ট নির্বাচিত হলো। কিন্তু সরকার গঠন নিয়ে একমত হতে পারল না।

ঠিক হলো ২ এপ্রিল যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত করা হবে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত হলেন। কিন্তু মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে শেরেবাংলা, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে একমত হলেন না। অনেক বাদানুবাদ হলো। শেষ পর্যন্ত তিনজন সদস্য নিয়ে শেরেবাংলা, প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। অনেক কাঠখড় পোড়ানার পর ১৫ জন সদস্য নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সম্প্রসারিত হলো ১৫ মে।

প্রতিপক্ষ এ সুযোগই খুঁজছিলেন। প্রতিপক্ষ হচ্ছে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার। সামরিক বেসামরিক আমলা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তখন পাকিস্তান সরকারের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচণ্ড প্রভাব। তখন সারাবিশ্বে ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাল। এই ঠাণ্ডা যুদ্ধের শুরু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান-জাপান ইতালির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তি অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে নেমেছিল। এবং জিতেছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল একেবারে বিপরীতমুখী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছিল। পাশ্চাত্যের শাসকবর্গ অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের ভয় ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও এমন ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাদের লক্ষ্য ছিল শুধু জার্মানিকে পরাজিত করা নয়, পরবর্তী সময়ে কমিউনিজম অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব খর্ব করা। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ্য ছিল

www.nagorikpathagar.com

সমাজতান্ত্রিক শিবিরে প্রভাব বলয় বৃদ্ধি। এই দু'শিবিরের প্রভাব বলয় বৃদ্ধির প্রতিযোগিতার নামই ছিল ঠাণ্ডা যুদ্ধ। এ যুদ্ধ প্রকাশ্যরূপ নিয়েছিল কোরিয়ায়। এ প্রতিযোগিতায় পৃথিবী তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই তিনটি ভাগ হচ্ছে (১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট বিরোধী শিবির; (২) সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির; (৩) যুগোস্লাভিয়া, ভারত, মিসর, ইন্দোনেশিয়ার নেতৃত্বে জোট নিরপেক্ষ শিবির। এই তিন ভাগের প্রথম ভাগের সঙ্গে ছিল পাকিস্তান। দ্বিতীয় ভাগে নিরপেক্ষ ভারত। অপরদিকে কমিউনিস্ট চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের কাছে পাকিস্তান ছিল গুরুত্বপূর্ণ তার ভৌগলিক অবস্থানের জন্যে। এবং অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকারের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুসলিম লীগ উৎখাত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল না তাদের কাছে। তাই পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ হেরে যাওয়ার পর তৎকালীন পাকিস্তানের মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন, পাকিস্তানের রাজনীতিতে এ নির্বাচনের প্রভাব পড়বে না। ভাবখানা যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সকল নীতি নির্ধারক। তবে প্রকৃতপক্ষে অবস্থা তেমনই ছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের পরাজয়ের পর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে খান খান করার। এর অন্যতম কারণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত সদস্যদের প্রকাশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা এবং ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষ শরিক ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল পাকিস্তানকে কমিউনিস্টবিরোধী ঘাঁটি বানাতে। পেশোয়ারে বিমান ঘাঁটি মার্কিন বিমানকে ব্যবহার করতে দেয়া হতো সোভিয়েত ইউনিয়নে গোয়েন্দাবৃত্তি করার জন্যে। আর প্রস্তুতি চলছিল পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরের। পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেই এ চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। নবনির্বাচিত পরিষদের অধিকাংশ সদস্য এ চুক্তির বিরুদ্ধে স্বাক্ষর অভিযানে সাড়া দেয়। তাই পূর্ব পাকিস্তানের বিজয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে উৎখাত করা তাদের কর্মসূচির অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় কালাহান নামক একজন মার্কিন সাংবাদিক পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তিনি প্রচার শুরু করেন যে, হক সাহেব দু'বাংলার ঐক্য চান। আর এই ষড়যন্ত্রের অপর এক পর্যায়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হওয়ার দিন ১৫ মে আদমজীতে ভয়াবহ বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা হয়। প্রমাণ করার চেষ্টা হয়

www.nagorikpathagar.com

যে—পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অধীনে অবাঙালিরা আদৌ নিরাপদ নয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতা সংকোচন করতে শুরু করে এবং সদলবলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে করাচি ডেকে পাঠানো হয়।

অভিযোগ আনা হয় যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার দু'বাংলা এক করতে চাচ্ছে। নির্বাচনের পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কলকাতা গেলে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা দেয়া হয়। সেই সংবর্ধনা সভায় হক সাহেব নাকি এমন কথা বলেছেন, যার অর্থ হচ্ছে, স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান। অপমানজনকভাবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কালাহানকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করায়। হক সাহেবদের বিবৃতি দিতে হয় যে, তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা চান না।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। হক সাহেব ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা ঢাকা ফিরতে ফিরতে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট শাসন জারি হলো। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া হলো। গভর্নর হয়ে এলেন ইস্কান্দার মীর্জা ও চিফ সেক্রেটারি হয়ে এলেন এনএম খান। গ্রেফতার হলেন শেখ মুজিবুর রহমানসহ হাজার হাজার নেতা ও কর্মী।

বরিশালে আমরা কী করব? গ্রেফতার অনিবার্য। এমনই খুনের আসামী। এবার পুলিশ কিছুতেই ছাড়বে না। মাত্র কিছুদিন আগে স্কুল-কলেজ খুলেছে। নতুন করে ধর্মঘট ডাকাও কঠিন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, আদালতে হাজির হতে পারবো না। জামিন বাতিল হবে। হুলিয়া জারি হবে। বরিশাল থাকা যাবে না। থাকা যাবে না বাড়িতে। অপরদিকে কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে বা না নিয়ে অন্যান্য দলের সকল নেতারা গা ঢাকা দিয়েছে। ক্ষেপে গেছে ছাত্ররা। তাদের দাবি একটা কিছু করা প্রয়োজন এবং করতে হবে।

কিন্তু হরতাল করা কি আদৌ সম্ভব? সিদ্ধান্ত হলো বরিশালের একটি স্কুলে উদ্যোগ নিয়ে দেখা যাক। বরিশাল শহরের ব্রজমোহন স্কুল অর্থাৎ বিএম স্কুলে ছাত্রসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সেখানে তখন আব্দুল মান্নান হাওলাদার পড়ত। আবদুল মান্নান হাওলাদার আবদুল মান্নান নামে পরিচিত। প্রথমে আমাদের দল আরএসপি করত। ঢাকায় এসে পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হয়। পরে আমাদের ছেড়ে শ্রমিক লীগে যোগ দেয়। দেশ স্বাধীন হবার পর লালবাহিনী গঠন করে। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়।

সিদ্ধান্ত হয় ওই স্কুলেই একদিনের ধর্মঘট ডাকতে হবে। আমি একটা ছোটো কাগজে স্বাক্ষর দিয়ে লিখে পাঠালাম। কাগজটি স্কুলের দেয়ালে সেঁটে দেয়া হলো। ধর্মঘট হলো। বিএম স্কুলে কোনো ঘোষণা ব্যতীতই।

www.nagorikpathagar.com

এবার পুলিশ তৎপর হলো। আমার আর বরিশাল থাকা সম্ভব নয়। সে সময়ের একটি মজার ঘটনা এখনো আমার মনে আছে। বিএম স্কুলে ধর্মঘট করতে গিয়ে আমাদের একজন ছাত্রকর্মী তিমির রায় চৌধুরী গ্রেফতার হয়ে গেল। সেদিন কালীপূজা। রাতে অন্য ছেলেরা এসে বলল, তিমিরের মা কালী মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছেন—এতে লোক মারা যাচ্ছে, নির্মল সেন মারা যাচ্ছে না কোনো। নির্মল সেন মারা গেলে আমার ছেলেটাকে জেলে যেতে হতো না। সেদিন অনেক সঙ্কটের মধ্যেও হাসি পেয়েছিল। তিমিরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সর্বশেষ ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে। তিমির একটি কলেজের বাংলার অধ্যাপক। জানি না এখন কোথায় কিভাবে আছে।

আমার তখন মারা যাবার সময় ছিল না। কোথায় যাব? শেষ পর্যন্ত বরিশাল ছাড়বার সিদ্ধান্ত নিলাম। ক'দিন পর বিএসসি পরীক্ষা। এবারে পরীক্ষা দেয়া হবে না। আবার গৌনরদী থানার মেদাকুল। মেদাকুল থেকে মাদারীপুর। মাদারীপুর থেকে একদিন লঞ্চে সুরেশ্বর। সুরেশ্বর থেকে গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জের স্টিমারে নারায়ণগঞ্জ হয়ে ঢাকা। তখন ১৯৫৪ সালের জুন মাস।

নারায়ণগঞ্জ থেকে সন্ধ্যার দিকে ঢাকায় পৌঁছালাম। শৈশবে ঢাকায় ছিলাম। বাবা ইস্টবেঙ্গল ইন্সটিটিউশনে শিক্ষকতা করতেন। বই লিখতেন। তারপর আবার ঢাকা এলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। বাবা বই লিখতেন বিভিন্ন লাইব্রেরির। ভিন্ন নামে সে বই বিক্রি হতো। আমার মেসো প্রিয়নাথ সেন ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলের অন্যতম মালিক। মামা ছিলেন বাংলাবাজার বইয়ের দোকানের মালিক, শিক্ষক। ঢাকা বোর্ডের বইয়ের একমাত্র সরবরাহকারী। আর এক মেসো ছিলেন উকিল। সে সব বিভাগপূর্ব ১৯৪৭ সালে। দেশ বিভাগের পর যাঁরাও বা ছিলেন তাঁরাও চলে গেছেন ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর। সুতরাং এবার ১৯৫৪ সালে ঢাকায় থাকার সমস্যা প্রকট। পকেটে আট টাকা দশ আনা। চশমার বাট ভেঙে গেছে। দু'টি জামা, দু'টি পাজামা, দু'টি লুঙ্গি, দু'টি হাফপ্যান্ট সম্বল। উঠলাম দলনেতা অর্থাৎ আরএসপির নেতা নিতাই গাঙ্গুলীর মেসে।

নিতাই গাঙ্গুলী দেশ বিভাগের পূর্বে ঢাকা জেলা আরএসপি'র সম্পাদক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারিদের আন্দোলনের সময় ১৯৪৯ সালে গ্রেফতার হন শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতার সঙ্গে। অন্যান্য সকলে মুক্তি পেলেও নিতাই গাঙ্গুলী মুক্তি পেলেন ১৯৫৩ সালে। তাঁকে মুক্তি দিয়ে বলা হলো—আপনাকে আপনার মামাবাড়ি কেরানীগঞ্জ থানার

www.nagorikpathagar.com

শুভাড্ডায় অন্তরীণ করা হলো। শুভাড্ডায় গিয়ে দেখা গেলো মামাদের ভিটি পর্যন্ত অপরের দখলে। কেউ কোথাও নেই। নিতাই গাঙ্গুলী ঐ নির্দেশ অমান্য করে ঢাকায় থেকে গেলেন। চাকরি পেলেন ঢাকেশ্বরী মিলের সদর দফতর ঢাকায়। এর একটি ইতিহাস আছে। ব্রিটিশ যুগে বাঙালি মালিকানায় অনেক মিলকারখানা গড়ে উঠেছিল। এরা সেকালের স্বদেশী আন্দোলনে সাহায্য-সহযোগিতা করত। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অগ্নিযুগের বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতিকে সবদিক থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তাই ঢাকেশ্বরী মিলে প্রথমদিকে নিতাই গাঙ্গুলীর চাকরি পেতে বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু সে চাকরিও টেকেনি ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হবার পর। ঢাকেশ্বরীর চাকরি ছেড়ে তাকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল দৈনিক মিল্লাতে সহ-সম্পাদকের চাকরি। ১৯৫৯ সালে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার এড়াতে তিনি দেশান্তরী হন।

হাটখোলা রোডে ঢাকেশ্বরী মিলের প্রধান দফতর ছিল। পাশে ছিল মেস। একদিন সন্ধ্যায় মেসে এসে উঠলাম। নিতাই বাবুর চাকরিও খুব বড়ো চাকরি নয়। তার ওপর ক'দিন থাকব। আমিই বা কোথায় যাব। খুনের আসামী। দিনে-দুপুরে বের হওয়া মুশকিল।

ঠিক হলো ছাত্র পড়াব। যতদূর লুকিয়ে সম্ভব অন্যত্র থাকব। নাম পাল্টাব। এ ব্যাপারে সাহায্য করলেন মানিকগঞ্জের অনিল চৌধুরী। এককালে কংগ্রেস করে জেল খেটেছেন। অনেক মহলে পরিচিত। তিনি বললেন, এক বাসায় ছাত্র পড়াবার কথা। রাজি হয়ে গেলাম। এর আগে তেমন ছাত্র পড়াইনি। বরিশালে দু'একটি ছাত্র পড়িয়েছি। তাও বেশিদিন নয়। কিন্তু উপায় নেই। কী করা যাবে।

অনিল বাবু বললেন, শিক্ষকতা করতে হলে ইন্টারভিউ দিতে হবে। সেই ইন্টারভিউ দিতে হলো দুপুর বেলা। রিকশায় হুড দিয়ে হাটখোলা থেকে পুরান মোগলটুলিতে মুকুল ফৌজের অফিস। মুকুল ফৌজের পরিচালক মোহাম্মদ মোদাব্বের হোসেন। ওই বাসা থেকে অর্ধসাপ্তাহিক পাকিস্তান নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ওই বাসায় পড়াতে হলে আমাকে কথা বলতে হবে মোহাম্মদ মোদাব্বের-এর সাথে। মোহাম্মদ মোদাব্বের কলকাতার দৈনিক আজাদের বাঘা বার্তা সম্পাদক ছিলেন। ঢাকায় মিল্লাতের সম্পাদক ছিলেন। বরিশাল থাকতে তাঁর নাম শুনেছি। স্কুলে পড়াবার সময় তার লেখা 'সন্ধানী আলো' বইটি পুরস্কার পেয়েছিল। রাজনীতির দিক থেকে কড়া মুসলিম লীগ হলেও বিশ্বাসের দিক থেকে ছিলেন র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট অর্থাৎ মানবেন্দ্র

www.nagorikpathagar.com

রায় (এমএন রায়)-এর অনুসারী। আর আমাদের দল আরএসপি সম্পর্কে তিনি ভালো করেই জানতেন। আরো জানতেন যে, বরিশালে তাঁর মুকুল ফৌজের অনেকেই আমাদের প্রতি অনুরক্ত।

সঙ্গে অনিল চৌধুরী। দুপুর রোদে গিয়ে হাজির হলাম মোদাব্বের সাহেবের বাসায়। দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম?

—নির্মল সেন।

নির্মল সেন? তুমি পাঁচ বছর জেলে ছিলে। তুমি খুনের আসামী। তোমার নামে হুলিয়া আছে—ধরে দিলে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে এমন কথা আমি শুনেছি।

মোদাব্বের সাহেব যেনো এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন। অনিল বাবু আমার দিকে বারবার তাকাতে থাকলেন। আমিও অবাক হতে থাকলাম। ভাবলাম এ ভদ্রলোক এতো কথা জানেন কী করে? বুঝলাম এখানে শিক্ষকতা করা আমার হবে না।

আমি বললাম, সবই সত্যি। তবে পাঁচ হাজার টাকা ঘোষণার কথা শুনিনি। এবার মোদাব্বের সাহেব ভিন্ন কথা তুললেন। বললেন, তুমি ভয় পেও না। তোমার কাকা ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান—হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক। তাঁর সঙ্গে আমার কলকাতায় দেখা হয়েছিল। তিনি একবার তোমার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনকে বলতে। নাজিমুদ্দীন-সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তোমার কাকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমি তোমার কথা নাজিমুদ্দীন সাহেবকে বলতে ভুলে গেছি। আজ হঠাৎ তোমার নাম শুনে সে কথা মনে হলো। কিন্তু আমার প্রশ্ন—তুমি এভাবে ছাত্র পড়াতে এলে কেন? তোমার তো ছাত্র পড়িয়ে বাঁচার কথা নয়।

আমি বললাম, এ প্রশ্ন আপনার করবার কথা নয়। আমি এসেছি এটাই সত্য। মোদাব্বের সাহেব চুপ করে গেলেন। বললেন ঠিক আছে, এখানে পড়াবে। আমি বললাম, থাকার জায়গা নেই? তিনি বললেন, তা হবে না। তবে তোমাকে কথা দিতে পারি আমার বাসায় পড়ালে তুমি জেলে গেলেও আমি সাহায্য করতে পারব।

আমি আর বেশি কথা না বাড়িয়ে চলে এলাম। হাটখোলা নিতাই বাবুর মেস থেকে চলে এলাম। নাম পাল্টালাম। বনগ্রামে একটি মেসে জায়গা নিলাম। থাকা খাওয়া ৪৫ টাকা। ঐ টাকাও মাসে আয় করতে পারতাম না। বাড়ির লোক জানে না আমি কোথায়। কলকাতায় মা জানেন না আমি

www.nagorikpathagar.com

কোথায়। তাঁর ধারণা আমার জেলে থাকা অনেক ভালো। তাহলে মা জানতে পারেন আমার স্থায়ী ঠিকানা। চিঠি লিখতে পারেন নিয়মিত।

পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা চলছে। ৯২(ক) ধারার শাসন হচ্ছে প্রেসিডেন্টের শাসন। অর্থাৎ প্রদেশে কোনো মন্ত্রিসভা থাকবে না। প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী চার এজেন্ট প্রদেশের গভর্নর আমলাদের নিয়ে শাসন চালাবে। এই আমলাদের দিয়ে শাসন চালু রাখতে হলে প্রয়োজন হবে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের বিশ্বস্ত লোক। তাই পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নর ও চিফ সেক্রেটারি পাল্টানো হয়। তখন গভর্নর ছিলেন চৌধুরী খালিকুজ্জামান। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। ভারত বিভাগের সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নার পরিবর্তে ভারতের মুসলিম লীগের সভাপতি হন। ১৫ আগস্ট ভারতীয় গণপরিষদে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে ভাষণ দেন। তারপর একদিন ভারতীয় মুসলমানদের নেতৃত্ব ছেড়ে পাকিস্তানে চলে আসেন এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগের এক সময় সভাপতি হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি মুখ্যত রাজনীতিক। শোনা যায় এই রাজনীতিক গভর্নর একটি নির্বাচিত সরকারকে বাতিল করে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা জারি পছন্দ করেননি। পাকিস্তান সরকার যাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেননি। তাই পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা জারির সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাল্টানো হয়। গভর্নর হয়ে আসেন প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা। একই সঙ্গে চিফ সেক্রেটারি ইসহাক সাহেবকেও পাল্টে দেয়া হয়। তিনিও নাকি নরমপন্থী ছিলেন, পরবর্তীকালে যিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ইসহাক সাহেবের পরিবর্তে চিফ সেক্রেটারি হয়ে এলেন জাঁদরেল আমলা এনএম খান। এনএম খান ইতিপূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে চাকরি করেছেন। সেই সুবাদে অনেক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে পরিচিতি ছিলেন। তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে নিযুক্তির অন্যতম কারণ ছিল এক শ্রেণির রাজনীতিবিদের কেনাবেচার চেষ্টা করা।

পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা জারি করলেও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল করেননি। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য তাঁদের সদস্যপদেই আছেন। পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য ছিল এই সদস্যদের কেনাবেচা করে যদি একটি সরকার গঠন করা যায় এবং সে কাজটিই ইস্কান্দার মীর্জা ও এনএম খান শুরু করলেন পূর্ব পাকিস্তানে এসে। অর্থাৎ তাদের লক্ষ্য ছিল যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে হবে। একটি অনুগত সরকার গঠন করতে হবে পূর্ব পাকিস্তানে। এ উদ্যোগের পেছনে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদ।

www.nagorikpathagar.com

আগেই উল্লেখ করেছি যে, পৃথিবীর রাজনীতিতে তখন তিনটি ভাগ একান্তই স্পষ্ট— (১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের শিবির, (২) সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির, (৩) যুগোশ্লাভ-ভারতের নেতৃত্বে জোট নিরপেক্ষ শিবির। সেকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো-নর্থ আটলান্টিক চুক্তিসহ একের পর এক সমাজতান্ত্রিক শিবির বিরোধী জোট গঠন করা হচ্ছিল। অপরপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল ওয়ারশ চুক্তি। তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র এই দু'জোটের সঙ্গে না গিয়ে একটি তৃতীয় জোট—জোট নিরপেক্ষ ধারা গঠন করে। পাকিস্তানের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত। ভারতের এই রাজনীতি পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও এই রাজনীতির প্রভাব পড়ে। সেই সময়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ নিচ্ছিল। আর সেই সময়ই পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র জয়লাভ করে। বিরাট সংখ্যক নবনির্বাচিত পরিষদ সদস্য পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিবৃতি দেয়। তাই যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেয়া মার্কিন যুক্তরাষ্টের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। কারণ এই এলাকায় পাকিস্তানই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বস্ত বন্ধু।

এই দল ভাঙা শুরু হলো পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা জারির পর। পাকিস্তানের সরকার মুখ্যত আঘাত হানল আওয়ামী লীগ ও গণতন্ত্রী দলের বিরুদ্ধে। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো না হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক পার্টি বা মওলানা আতাহার আলীর নেজামে ইসলাম। যুক্তফ্রন্টের তখন বেহাল অবস্থা। শেখ সাহেবসহ হাজার কয়েক কর্মী বন্দি। যুক্তফ্রন্টের সরকার তাঁকে নজরবন্দি করেছেন। আশরাফ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে যুক্তফ্রন্ট পরিষদ দলের সভা হলো। সিদ্ধান্ত হলো সাবেক মন্ত্রী এবং জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ দলে দলে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করবেন। তবে সভাও শান্তিতে হলো না। পুলিশ এসে সকলকে চলে যাবার নির্দেশ দিলে সভা ভেঙে গেল। তবুও শেষ চেষ্টা করা হলো। হক সাহেবের কাছে যাওয়া হলো। তিনি এ কর্মসূচিতে রাজি হলেন না। সকলকে এলাকায় গিয়ে বিপ্লবাত্মক কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। তাই যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে আর তেমন কিছু করা হলো না।

ইতোমধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ১৬ জুন এক বক্তৃতা দিলেন। হক সাহেবদের দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করলেন। অভিযোগ করলেন হক সাহেব নাকি এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করেছেন। এরপরে হক সাহেবের বাসায় পুলিশ পাহারা কড়াকড়ি করা হলো। তিনি কিছুতেই কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

www.nagorikpathagar.com

মাওলানা ভাসানী তখন ইউরোপে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী অসুস্থ অবস্থায় বিদেশে। হক সাহেব নজরবন্দি। সুতরাং ৯২(ক) ধারার বিরুদ্ধে আন্দোলন তেমন জমল না। জমল ষড়যন্ত্র আর কোন্দল।

দেশে ৯২(ক) ধারা জারি। রাজনীতি সীমিত। আত্মগোপন করে আমার পক্ষে আর রাজনীতি করাও সম্ভব নয়। এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেল। আমি বিশ্ববিদ্যালয় যাবার পথে কার্জন হলের সামনে বাস থেকে নামতেই কয়েকজন গোয়েন্দা বিভাগের লোক আমার কাছে এল। পালাবার কোনো পথ ছিল না। তাদের মধ্যে একজন বললেন, আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। মনে হয় ভদ্রলোককে আমি বরিশালে দেখেছি। তিনি বললেন, আপনাকে ধরা হবে না। যে কোনো কারণেই হোক, বরিশাল জেলা গোয়েন্দা বিভাগের দ্বিতীয় কর্মকর্তা (ডিআইও-২) ইউসুফ সাহেব আপনার প্রতি সদয়। তিনি বলেছেন, এ ছেলেটি বারবার ভুগছে। জেলে যাচ্ছে। পরীক্ষা দিতে পারছে না। এবার তাকে ডিস্টার্ব করবে না। তাকে ঢাকায় পড়াশুনা করতে বলো। তার গ্রেফতারি পরোয়ানা বরিশাল থেকে তার নিজের জেলা ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে পাঠিয়ে দেবে। সে যেন বরিশাল না আসে বা বাড়ি না যায়।

কথাগুলো আমার তেমন বিশ্বাস হয়নি। তবে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও স্বস্তি পেলাম। গ্রেফতার না হয়েও চলে এলাম। সেদিন থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হব। আবার বিএসসি পরীক্ষা দেব। রাজনীতি শুরু করব। বরিশাল ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলাম। ঢাকায় ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। আমি ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক নির্বাচিত হলাম। তখন ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হলেন আবদুল মতিন তালুকদার এবং সম্পাদক ছিলেন এমএ আউয়াল।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার টাকা কোথায়? ছাত্র পড়ানো নিয়ে একদফা গোলমাল হয়ে গেছে। রাগ করে ছেড়ে দিলাম ছাত্র পড়ানো। ঘটনাটি ঘটেছিল মাইনের টাকা নিয়ে। জীবনে কোনোদিন পড়িয়ে টাকা নিইনি। তাই মাস চলে গেলেও টাকা চাইতে পারিনি। একদিন মোদাব্বের সাহেবের স্ত্রী বললেন, তোমার কি টাকার প্রয়োজন নেই? এই বলে আমার পকেটে টাকা গুঁজে দিলেন। আমি টাকা গুনিনি। মেসে এসে দেখলাম টাকার অংশ নির্ধারিত টাকার চেয়ে বেশি। অর্থাৎ আমাকে বেশি টাকা দেয়া হয়েছে না বলে। মাথা টনটন করে উঠল। ভাবলাম, আমাকে কি বকশিশ দেয়া হলো আমাকে না বলে! পরদিন পড়াতে গিয়ে বললাম, আপনাদের টাকা ফিরিয়ে নিন। আমি আর আপনাদের বাসায় পড়াব না। তাঁরা বিস্মিত হলেন।

www.nagorikpathagar.com

মোদাব্বের সাহেবের স্ত্রী হোসনে আরা। ড. শহীদুল্লার ভাইয়ের মেয়ে। শিক্ষা জীবনে কংগ্রেসী রাজনীতি করেছেন। কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মাউন্ট পুলিশ ডিঙিয়ে কংগ্রেসের পতাকা উড়িয়েছেন। দেশ ভাগ হওয়ার পর ঢাকায় এসেছেন। সারাদিন তিনি সাপ্তাহিক পাকিস্তানের কাজ করেন। ঘর গোছান, ছড়া লেখেন। অতিথিদের আপ্যায়ন করেন। প্রতি শুক্রবার অর্ধ-সাপ্তাহিক পাকিস্তান বের হবার দিন। চার ছেলে এক মেয়ে নিয়ে কাগজ ভাঁজ করেন। টিকিট লাগান। ডাকে পাঠান। সে এক আশ্চর্য কাণ্ড। সারাদিন বাড়ির সকলে ব্যস্ত।

আমার কথা শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন, তুমি ভুল বুঝেছ। তুমি খুব ভালো পড়াও। তোমাকে দ্বিগুণ টাকা দেয়া উচিত। তাই আমি আর সাহেব সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু টাকা বেশি দিয়েছি। তাতে মনে করার কী আছে। আমার মেজাজ তখন তিরিক্ষি। বললাম, আপনি আমাকে বললেন না কেন? রিকশাওয়ালাকে দশ আনার পরিবর্তে বারো আনা দিলে খুশি হয়, আমি রিকশাওয়ালা নই। এ টাকা আমি নেবো না। এই বলে টাকা রেখে চলে গেলাম।

কিন্তু এরপর কী করবো। মেসের টাকা বাকি পড়েছে। আত্মীয়স্বজন কেউ আমার কথা জানে না। শুনেছি আমি বরিশাল ছাড়বার পর মেজো কাকার ছেলে নাকি এসেছিল বরিশালে আমার খোঁজে। ফিরে চলে গেছে আমাকে না পেয়ে। আমিও তাদের কোনো খোঁজ দিইনি। কারণ বারবার পুলিশ যাবে বাড়িতে। হেনস্তা হবে। যাদের আমি কোনোদিন সাহায্য করতে পারিনি তারা হেনস্তা হোক আমার জন্যে তা আমি চাইনি। কলকাতায়ও চিঠি লিখিনি মা বা ভাইয়ের কাছে। জেলে থাকা পর্যন্ত কলকাতা থেকে ডাকে টাকা আসত। কিন্তু পাসপোর্ট চালু হবার পর সে পথও বন্ধ।

এর মধ্যে একদিন অনিল চৌধুরী এলেন আমার মেসে। বললেন, তুমি নাকি টিউশনি ছেড়ে দিয়েছ? বললাম, হ্যাঁ। বললেন, এবার কী করবে? তুমি পলাতক খুনের আসামী, এ পরিচয়ে কোথাও আর ছাত্র পড়াতে পারবে কি? যে বাসায় তুমি পড়াতে তারাও তোমাকে চিনে ফেলেছে। তুমি এক বাসায়ই পরিচিত থাকো মামলা থাকা পর্যন্ত। মোদাব্বের সাহেবের স্ত্রী তোমাকে যেতে বলেছেন।

আবার সে বাসায় গেলাম। এবার সমঝোতা হলো আগামী মাস থেকে আমাকে বর্ধিত বেতন দেয়া হবে। আগের মাসে দেয়া বাড়তি টাকা আমি নেব না। মোদাব্বের সাহেবের স্ত্রী দুঃখ পেলেন। বললেন, তোমার বাবা মা'র মতো

www.nagorikpathagar.com

আমাদের বয়স। এতো অপমান বোধ করছ কেনো? আমি এবার সব টাকাই নিলাম। দোকানে গিয়ে বাড়তি টাকা দিয়ে বই কিনে ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে দিলাম।

ছাত্রছাত্রী পড়াতে গিয়ে এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার বারবার হয়েছে। লক্ষ করেছি প্রতিটি বাসায় প্রাইভেট টিউটর কাজের মানুষের মতোই একজন। এরা বাড়ির কাজের লোকের মতো টাকা নেয়। অথচ চাকর নয়। এরা রক্তের সম্পর্কে অভিভাবক নয়। অথচ উপদেশ দেয়। অনেক ক্ষেত্রে এই অবস্থানটি টিকিয়ে রাখা কষ্টকর। অনেকে প্রাইভেট টিউশনি করতে গিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকে। জল খাবার প্রত্যাশা করে। মাসের পর মাস টাকা না দিলে মুখ ফুটে বলতে পারে না। অনেক বাসায় মেয়ে পড়াতে গেলে দোরগোড়ায় ঝি বসিয়ে রাখা হয়। কখনোবা হঠাৎ করে অভিভাবকদের মধ্যে কেউ এসে মাস্টারের চরিত্রের পরীক্ষা নেয়।

কথাটি আমাকে মোজাম্মেল দা বলেছিলেন প্রথমে। আগেই বলেছি, মোজাম্মেল হক আমাকে রাজনীতিতে এনেছিলেন। এককালে আরএসপি করতেন। সাংবাদিক ইউনিয়নের সম্পাদক হয়েছিলেন। অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা—সেকালের দৈনিক পাকিস্তানের প্রথম বার্তা সম্পাদক ছিলেন। তিনি চাননি আমি পাকিস্তানে থাকি। তিনি বলেছিলেন, কী করে থাকবে? বললাম, টিউশনি করব। মোজাম্মেল দা বললেন, তুমি পারবে না, নির্মল। যে সমাজে তুমি মানুষ হয়েছো—মুসলিম সমাজ সেটা নয়। এখানে কোনো বাড়িতে গেলে তোমাকে চাকর দিয়ে চা দেবে। তুমি কোনো চুড়ির শব্দ শুনবে না। তুমি কলকাতায় চলে যাও। আমি বলেছিলাম, মোজাম্মেল দা, আমি পারব। দেখুন না কী হয়।

পরে বুঝেছি আমার মানসিকতা নিয়ে টিউশনি করা মুশকিল। আমি বলতাম—আমি সপ্তাহে প্রতিদিন আসতে পারি। কোনোদিন নাও আসতে পারি। তবে শর্ত হচ্ছে—আমাকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করা যাবে না—আমি কেন গতকাল আসিনি। অনেক বাসায়ই এ শর্তটি মনে রাখতে পারত না। কোনোদিন অনুপস্থিত থাকলে জানতে চাইত, কেনো আগের দিন আসিনি। আমাকে সঙ্গে সঙ্গে কোনো চিন্তা-ভাবনা না করেই বলতে হতো, কাল থেকে আমি আর পড়াব না। আমি তোমাদের কোনো ফার্ম-এ চাকরি করি না যে কৈফিয়ত দিতে হবে। এভাবে অনেক টিউশনি আমি মাসের মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছি। পকেটে পয়সা থাকেনি। মুড়ি খেয়ে দিন কাটিয়েছি ঢাকা শহরে। কেউ কোনোদিন জানতে পারেনি।

www.nagorikpathagar.com

পাকিস্তানের রাজনীতি আবার সেই নির্দিষ্ট বলয়ে ঘুরপাক খেতে শুরু করল। পাকিস্তান মার্কিন ব্লকের রাষ্ট্র। কমিউনিস্ট বিরোধী শক্ত ঘাঁটি। পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচিত হলে কমিউনিস্টরা দেশ দখল করবে। পাশে ধর্ম নিরপেক্ষ জোটনিরপেক্ষ ভারত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে সরকারে। সেই ভারতের পূর্বাঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তান। তাই পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকার বহাল থাকা সঠিক নয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এ ধারণা দিতে পেরেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। তাই পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা জারিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা ছিল।

কিন্তু ইচ্ছে হলেই পূর্ব পাকিস্তানে সে সময় ৯২(ক) ধারা জারি না করে কোনো সরকারের পক্ষে নিরাপদ থাকা সম্ভব নয়। তাই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়ায় শেরেবাংলা ফজলুল হকের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার অভিযোগ করলেন।

ঘটনাটি ছিল এমন—পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করলে হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি জীবনে শেষবারের মতো কলকাতা শহরে যান, যে শহরে তাঁর কর্মজীবন কেটেছে— যে শহরে তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এখন কোলকাতা আর তার পার্শ্ববর্তী এলাকা পূর্ব পাকিস্তানে উদ্বাস্তুদের ভিড়। হক সাহেব কোলকাতায় গিয়ে বিপুল সংবর্ধনা পেলেন। সংবর্ধনার জবাবে হক সাহেব বললেন, বঙ্গদেশ খণ্ডনের দ্বারা বাঙালিকে, বাঙালি সত্তাকে, বাঙালি স্বকীয়তাকে, বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি ও বাঙালি মনের কামনাকে দু'টুকরো করা যায় না। যাবেও না। মতলববাজরা দেশটাকে দু'টুকরো করলেও এপার বাংলা, ওপার বাংলার ভাষা ঐ বাংলা ভাষা। মিথ্যার প্রাচীর থাকলেও এপার বাংলা, ওপার বাংলার মানুষ একই ভাষায় কথা বলে। সংস্কৃতিগতভাবে একইভাবে চলাফেরা করে। ইতিহাসের প্রয়োজনে আবার তারা একে অপরের নিকটবর্তী হবে।

কোলকাতায় দি স্টেটসম্যান এ ভাষণের শিরোনাম করল—হক সাহেব আশা করছেন, দু'বাংলার কৃত্রিম প্রাচীর থাকবে না। আনন্দবাজারের শিরোনাম—উভয়বঙ্গের মিথ্যার প্রাচীর ভেঙে ফেলার সংকল্প।

কোলকাতার পত্রিকার এই খবরকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র শুরু হলো। পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল হলো। হক সাহেব নজরবন্দি হলেন। পূর্ব পাকিস্তানের নতুন নিযুক্ত গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা সংবাদ সম্মেলনে বললেন, 'কোথায় মওলানা ভাসানী। আমি তাকে প্রয়োজনে গুলি করব। আমার শাসনের বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি করলে সহ্য করা হবে না। দরকার

www.nagorikpathagar.com

হলে আমি পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করব। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে দশ বিশ হাজার মানুষ হত্যা করতেও পিছপা হব না।' ২৩ জুলাই অন্তরীণ অবস্থায় হক সাহেব রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের ঘোষণা দিরেন।

পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা জারি হওয়ায় মুসলিম লীগের নেতারা খুশি হলেন। কিন্তু তাঁদের এ আনন্দও দীর্ঘস্থায়ী হলো না। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ২৩ অক্টোবর গণপরিষদ ভেঙে দিলেন। মুসলিম লীগের অধিকাংশ নেতা ১৯৪৬ সালে নির্বাচন হওয়ায় গণপরিষদের সদস্য ছিল। এবার সে সদস্যপদও গেল। গভর্নর জেনারেলের কাজটি ছিল একান্তই অগণতান্ত্রিক। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে আনন্দের ঢেউ দেখা গেল। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র। আমার শত্রু মুসলিম লীগ। সেই মুসলিম লীগ অধ্যুষিত গণপরিষদ গোলাম মোহাম্মদ ভেঙে দিয়েছে। সুতরাং গোলাম মোহাম্মদ আমার বন্ধু। তাই হঠাৎ যুক্তফ্রন্টের শরিক দল আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দল এবং নেজামে ইসলাম গভর্নর জেনারেল ওপর খুশি হলো।

২৩ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল গণপরিষদ ভেঙে দিলেন। প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরে গিয়েছিলেন। তাঁকে দেশে ফিরবার জন্যে জরুরি বার্তা পাঠানো হলো। তিনি করাচি ফিরে এলে তাঁকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দেশ দেয়া হলো। ২৫ অক্টোবর মোহাম্মদ আলী দেশে ফিরে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। এই মন্ত্রিসভাকে বলা হলো মিনিস্ট্রি অব ট্যালেন্ট। বিজ্ঞজনদের মন্ত্রিসভা। এ মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হলো সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা, এককালের সীমান্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ড. খান সাহেব, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কৃষক শ্রমিক পার্টি নেতা আবু হোসেন সরকার, শিল্পপতি ইস্পাহানী, মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী, মরি গোলাম আলী প্রমুখ। আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী তখন জুরিখে চিকিৎসাধীন।

আমরা হতভম্ব হলাম। এ কোন রাজনীতি। দীর্ঘদিন পর জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচিত হলো। ২ এপ্রিল যুক্তফ্রন্টের পরিষদ দলের নেতা নির্বাচিত হলেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। কিন্তু একটি যৌথ মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারলেন না। তিনি কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার, ভাগ্নে

www.nagorikpathagar.com

সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া এবং নেজামে ইসলামের আশরাফ উদ্দীন চৌধুরীকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল (সোহরাওয়ার্দী সাহেবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও)। হক সাহেব রাজি হলেন না। ইতোমধ্যে চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলি পেপার মিলে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা। অনেক আলোচনার পর ১৫ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হলো—মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিবুর রহমান অন্তর্ভুক্ত হলেন। সে দিনই আদমজীতে বাঙালি-বিহারী দাঙ্গা হলো। হক সাহেবের কোলকাতার সংবর্ধনা সভায় একটি কথিত উক্তিকে ভিত্তি করে ৩০ মে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা জারি হলো। বলা হলো, 'কমিউনিস্ট বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যর্থ শেরেবাংলার মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা হলো।' ২ জুলাই বিবৃতি দিয়ে হক সাহেব রাজ চাকরি ছেড়ে দিলেন।

তখন দেশে এক চরম হতাশা। সেই মুহূর্তে নজরবন্দি হক সাহেবের সহকর্মী আবু হোসেন সরকার আর কারগারে আটক শেখ মুজিবুর রহমানের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হলেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর অধীনে। এই মোহাম্মদ আলী অবিভক্ত বাংলার শেষ মন্ত্রিসভায় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অধীনে অর্থমন্ত্রী ছিলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন বিদেশে ছিলেন। অনেকে আশা করলেন হয়তো বা তিনি দেশে ফিরে মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন না। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ৯২(ক) ধারার শাসনকালেই পাকিস্তান কমিউনিস্ট বিরোধী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রক্ষা চুক্তি (সিটো)-এর সদস্য হয়।

এ মন্ত্রিসভা গঠনের পর ১৫ ডিসেম্বর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ঢাকায় আসবেন বলে ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের ধারণা হলো শহীদ সাহেব মন্ত্রিসভায় যাবেন। তাই কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের পক্ষে। সুতরাং গোলাম মোহাম্মদকে সংবর্ধনা জানালে তাদেরই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে ডাকা হবে ৯২(ক) ধারা প্রত্যাহারের পর।

অপরদিকে ঢাকা আসার পূর্বে গোলাম মোহাম্মদ ঘোষণা দিলেন, শেরেবাংলা ফজলুল হক তাঁর একান্ত বন্ধু। তিনি দেশের আদৌ শত্রু নন। ফলে কৃষক শ্রমিক পার্টি ভাবল গোলাম মোহাম্মদকে সংবর্ধনা জানালে মন্ত্রিত্ব তারাই পাবে।

সুতরাং ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় কার্জন হলের সংবর্ধনা সভায় আতাউর রহমান এবং আবু হোসেন সরকার উভয়েই গোলাম মোহাম্মদকে মালা দিলেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানের জেলে বন্দি হাজার হাজার নেতা ও কর্মী।

www.nagorikpathagar.com

আমরা আত্মগোপন করে আছি। আর আমাদের নির্বাচিত নেতারা মালা নিয়ে ছুটছেন—কে আগে স্বৈরশাসককে মালা দেবে।

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। সকলের তখন প্রতীক্ষা শহীদ সোহরাওয়ার্দী কবে দেশে ফিরবেন। তিনি বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন কিনা।

আর এদিকে আমার জীবনে ১৯৫৪ সালের জুলাই মাস। অনেক দেনদরবার করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অনুমতি পেয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ৯৮ টাকা প্রয়োজন। অনেক কষ্ট করে ৪৮ টাকা সংগ্রহ করেছি। বাকি ৫০ টাকার খবর নেই। হাতে মাত্র একদিন। বের হবার উপায় নেই। মনে হচ্ছে পুলিশ আবার সতর্ক হয়েছে। একদিন বন্যার জল দেখতে গিয়ে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলাম।

সেবার ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। ঢাকার বিভিন্ন সড়কে নৌকা চলত। ভাবলাম কোন এলাকায় কেমন বন্যা হয়েছে তা দেখে আসি। শুনেছিলাম মুন্সীগঞ্জ শহরে নাকি একহাঁটু জল। অনেক কষ্ট করে নারায়ণগঞ্জ গিয়ে একটি ছোট লঞ্চে মুন্সীগঞ্জ পৌঁছলাম। সত্যি সত্যি মুন্সীগঞ্জে জল আর জল। বেশ কিছুক্ষণ জলের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করলাম। একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে। এমন সময় দেখলাম এক ভদ্রলোক ছাতি মাথায় দিয়ে আমাকে অনুসরণ করছেন। কিছুক্ষণ পর আমার কাছে এসে বললেন, আমি বরিশালের লোক। মুন্সীগঞ্জ থানার ওসি। আপনাকে আমি চিনি। এখনই ঢাকায় ফিরে যান। কেন এসেছেন এখানে গ্রেফতারি পরোয়ানা মাথায় নিয়ে?

আমার আর বন্যা দেখা হলো না। আমি মুন্সীগঞ্জ গিয়েছি তাই কেউ জানে না। তাড়াতাড়ি ফিরতে হলো বৃষ্টির মধ্যেই। ঢাকা ফিরে বুঝলাম বিপদ কাটেনি। সব সময় বাইরে যাওয়া যাবে না। বাইরে না যেতে পারলে টাকা পাব কোথায়। দেশের কোনো লোকই আমার প্রকৃত পরিচয় জানে না। মাসে যা আয় করি তাতে মেসের খাওয়া এবং থাকার ভাড়া হয় না। হোটেল রেস্টুরেন্টে খাওয়ার অভ্যাস নেই। আর পয়সাও নেই।

এই হোটেল রেস্টুরেন্টে খাওয়া নিয়েও কম বিপদে পড়িনি জীবনে। ছোটবেলায় শুনেছি খারাপ ছেলেরা হোটেল রেস্টুরেন্টে খায় এবং আড্ডা মারে। ভালো ছেলেদের এটা করণীয় নয়। সুতরাং বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে পড়বার প্রথম যুগে আমি কোনোদিন কোনো রেস্টুরেন্টে ঢুকিনি। আড্ডা মারিনি। চা খাইনি। কলকাতায় গিয়ে এই রেস্টুরেন্টে খাওয়া নিয়েই একবার বিপত্তি ঘটল।

www.nagorikpathagar.com

আমার সঙ্গে আমার এক বোনের বর। কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গিয়েছি। তিনি বললেন, এখানে রেস্টুরেন্টে ভালো চপকাটলেট আছে। চল রেস্টুরেন্টে খাই। আমি বললাম, ভালো ছেলেরা রেস্টুরেন্টে যায় না বা খায় না। তিনি আমাকে জোর করে নিয়ে গেলেন। একটি চপ কিনে দিলেন। আমার চোখে তখন জল। চোখের জলে আমার খাওয়া হলো না। শুধু ভাবলাম আমি খারাপ হয়ে গেলাম।

সেই আমি ঢাকায় ১৯৫৪ সালে রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে বিপদে পড়লাম। শৈশবে শুনেছি ভালো ছেলেরা নেশা করে না। বিড়ি, সিগারেট, চা খায় না। তাই রেস্টুরেন্টে আমাকে নিয়ে গেলে অন্যের বিপদ হয়। মোজাম্মেল দা বলতেন, নির্মল চা খাও। তুমি চা খেলে সস্তায় হয়। চায়ের বদলে অন্য কিছু খেতে অনেক পয়সা প্রয়োজন। ১৯৪৮ সালে নতুন করে ভালো ছেলে হবার জন্যে চা ছেড়ে দিলাম। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় এসে সস্তায় কিছু খাবার জন্যে আবার চা খাওয়া শুরু করতে হলো।

প্রকৃতপক্ষে নিয়মিত চা খাওয়া ভুলে গিয়েছিলাম। একান্ত দু-একজন পরিচিত ব্যতীত কারো পয়সায় খাওয়া আমার ধাতে সইত না। সেই দিক থেকে নির্ভর ছিলেন একমাত্র নিতাই গাঙ্গুলী। তিনিও অল্প মাইনের চাকুরে।

সেই নিতাই গাঙ্গুলীই দুপুরের দিকে আমার মেসে এলেন। তখন শুয়ে শুয়ে ভাবছি কী করা যায়। আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির শেষ তারিখ। নিতাই বাবু বললেন, ব্যাপার কী অনেক দিন দেখা নেই। বললাম, টাকা নেই। আরো ৫০ টাকা প্রয়োজন। কালকে ভর্তির শেষ তারিখ। বললেন, শুয়ে থাকলে কি সমস্যার সমাধান হবে? আমি বললাম, আমি চার্লস ডিকেনস-এর ডেভিড কপারফিল্ডের মিকবার চরিত্র পছন্দ করি। এই বই আমাদের পাঠ্য ছিল ম্যাট্রিকে। মিকবার প্রায় সব সময়ই কপর্দকশূন্য থাকত। বলত একটা কিছু ঘটবেই (সামথিং উইল টার্ন আপ)। আমি সেই একটা কিছু ঘটবার আদর্শে বিশ্বাসী। তাই শুয়ে আছি। করার কিছু নেই।

নিতাই বাবু হাসলেন। পরের দিন ৫০ টাকা পাঠিয়ে দিলেন। আমি ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসির শেষ পর্বে। মাস খানেক পরে ঢাকা হলে (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) সিট পেয়ে চলে গেলাম। আমার জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু হলো।

হলে থেকেও আমার আত্মগোপনের একটি রাস্তা জুটে গেল। আস্তানা ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের টিবি ওয়ার্ড। আমাদের দলের সদস্য পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন দলের প্রথম সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান তখন বরিশাল

www.nagorikpathagar.com

ব্রজমোহন কলেজের আইএসসি'র দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে ধরা পড়ল তাঁর যক্ষ্মা হয়েছে। তখন ঢাকায় কোনো টিবি হাসপাতাল ছিল না। মিটফোর্ড হাসপাতালের প্রধান ভবনের চারতলায় টিবি রোগীদের জন্যে একটি ওয়ার্ড ছিল। সিদ্দিকুর রহমান ভর্তি হলেন ওই ওয়ার্ডে। ৫৬ জন রোগী আর আমি। দিনের পর দিন মাসের পর মাস ওই হাসপাতালে গিয়েছি। ডাক্তার লুৎফর রহমান আমাকে ধমকাতেন। বলতেন, আপনি মারা পড়বেন। তখন দেখতাম রোগীদের নিকটতম আত্মীয়েরা নাকে রুমাল দিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকত। তারা বুঝত না যে এতে রোগীরা মনে করে আমরা পরিত্যক্ত। নিঃসহায়। আমরা বড় একাকী। আমি কোনোদিন নাকে রুমাল দিয়ে যাইনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দক্ষিণের জানালা খুলে বসে বসে গল্প করেছি। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা। ওপারে জিনজিরা দেখেছি। দেখেছি বুড়িগঙ্গায় নৌকা চলা আর স্টিমারের হুল্লোড়। আমি নিশ্চিত ছিলাম এই ওয়ার্ডে পুলিশের লোক আমাকে খুঁজতে আসবে না।

তাও রাজনীতি এড়ানো গেল না। ঘটনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের। ১৯৫৪ সালে চারদিকে বন্যা। ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ সিদ্ধান্ত রিলিফ দিতে হবে। টাকা, কাপড় তুলতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের গ্রুপ ভাগ করে পাঠাতে হবে বিভিন্ন এলাকায়। এ নিয়ে একদিন বৈঠক বসল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংগঠন ডাকসুর অফিসে। বৈঠকে একজন ছাত্রী বলল, তারা কিছুতেই ছেলেদের সঙ্গে যাবে না। তাকে আমি চিনি না। মনে হলো সে নেত্রীস্তরের হবে। এ নিয়ে সকলেই উত্তেজিত, বিতর্কে লিপ্ত। এক সময় হঠাৎ আমি বলে ফেললাম, তোমরা কেউ না গেলে ভোরবেলা হলে গিয়ে কানধরে নিয়ে আসা হবে।

সকলে একেবারে নীরব হয়ে গেল। বিতর্কের ছাত্রীটি আমার কাছে এল। বলল, ঠিক আছে আমরা যাব। তবে আপনি ভোরবেলা এসে গ্রুপ ভাগ করে দেবেন। আপনাদের বিগলিত ব্যানার্জি মার্কা ছাত্রদের সঙ্গে আমরা যাব না। শুনলাম ছাত্রীটির নাম কামরুন্নাহার লায়লী। বাড়ি পিরোজপুরে। ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী। পরদিন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইনি। শুনেছি ছাত্রছাত্রী সকলে এসেছে। গ্রুপ ভাগ করে চলে গেছে রিলিফের জন্যে টাকা আদায় করতে। ক'দিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের কিছু ছাত্রীর বরাত দিয়ে আমার কাছে একটি চিঠি এল। সে চিঠিতে লেখা ছিল, আমরা শুনেছি আপনি আত্মগোপন করে আছেন। অর্থকষ্টে আছেন। আমরা আপনাকে অর্থ সাহায্য করতে চাই। কী করা যায়, আমাদের জানাবেন।

আমি জানতাম এদের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র ইউনিয়ন অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক। হয়তো এরা আমাকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বলে ধারণা

www.nagorikpathagar.com

করেছে এবং সাহায্য করতে চাচ্ছে। আর সেকালে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল—সকল বিপ্লবীরাই কমিউনিস্ট পার্টি করে। সকল মার্কসবাদী, লেনিনবাদীরাই কমিউনিস্ট। পূর্ব বাংলায় যে এককালে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আরএসপি)সহ অনেক বামপন্থী দল ছিল তা অনেকেরই জানা ছিল না। দেশ বিভাগের পর অনেক নির্যাতন সহ্য করেও কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্ব কাঠামো ধরে রাখতে পারলেও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল চরমভাবে। আমি ভাবলাম নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলার প্রয়োজন। অন্যের পরিচয়ে সাহায্য নেয়া অন্যায়। তাই তাদের জানালাম, আমি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নই। আমি বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল করি। সুতরাং আপনারা নিজের দলের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। আর এ মুহূর্তে আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

এবার প্রশ্ন উঠল আরএসপি কী? কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাদের তফাৎ কী। এ দু'টি দল কি এক হতে পারে না? একদিন কামরুন্নাহার লাইলী এসে বললো, আপনাদের দু'দলের বসতে হবে। আমরা চাই আপনারা এক হোন। আমি বললাম, তুমি ব্যবস্থা করো। আমরা রাজি। লাইলীর সঙ্গে তখন আমার সম্পর্ক অনেক সহজ এবং তখন এই একটি ছাত্রীই দেখেছি আপাদমস্তক রাজনীতিক। বৈঠকের তারিখ নির্ধারিত হলো ২৯ আগস্ট। কামরুন্নাহার লাইলী জানাল, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আলোচনার কথা তাকে জানিয়েছে তাদের খালেদা আপা। তাদের কাছে যতদূর শুনেছি খালেদা আপার প্রকৃত নাম যুঁইফুল বসু। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা কমরেড খোকা রায়ের স্ত্রী। এই ভদ্রমহিলার নাম আমি বরিশালে শুনেছি। তাঁর বাড়িও এককালে বরিশাল ছিল। তাঁর এক বোন আমাদের দল আরএসপি করত। সেই খালেদা আপাই নাকি কমিউনিস্ট পার্টির মেয়েদের নেতৃত্ব দিতেন। যদিও আজ পর্যন্ত কোনোদিন এ খবর আমি যাচাই করিনি। আমার এ ব্যাপারে একেবারেই আগ্রহ কম। ছদ্ম নামটি খালেদার পরিবর্তে রাবেয়া হতে পারে।

কিন্তু আমাদের পক্ষে কে আলোচনা করবে? আলোচনার বিষয়বস্তু কী হবে কামরুন্নাহার লাইলী বারবার এ প্রশ্ন নিয়ে এল। আমাদের সিদ্ধান্ত হলো আমরা কেউ নই, সিদ্দিকুর রহমানই আলোচনা করবেন। তিনি হাসপাতালে থাকলেও অনেকটা সেরে উঠেছেন। তাই কোথাও গেলে পুলিশ তাঁকে তেমন খোঁজ খবর নেবে না।

এখন তা হলে আলোচনার বিষয়বস্তু কী হবে? আমি লাইলীকে বললাম, সিদ্দিক দু'টি প্রশ্নের জবাব চাইবে। এ দু'টি প্রশ্ন হচ্ছে আরএসপি-কমিউনিস্ট

www.nagorikpathagar.com

পার্টির পার্থক্যের মূলকথা। (১) আরএসপি মনে করে লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন সঠিক পথ গ্রহণ করেননি। লেনিন কখনো বলেননি যে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয় সম্ভব। কিন্তু স্ট্যালিন ক্ষমতায় এসে লেনিনের এ নীতি পরিহার করেন। অন্যদেশে বিপ্লবের দায়িত্ব না নিয়ে পৃথিবীর কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির লেজুড়ে পরিণত করেন। এক্ষেত্রে ট্রটস্কির নীতির সঙ্গে আরএসপি'র তফাৎ আছে। ট্রটস্কি বিশ্বাস করতেন ইউরোপের উন্নত দেশগুলোতে বিপ্লব না হলে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ও সম্ভব নয়। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের বিনির্মাণ শুরু করাও সম্ভব নয়—আরএসপি'র মত হচ্ছে—অন্যদেশে বিপ্লব না করেও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণের কাজ শুরু করা সম্ভব।

(২) আরএসপি মনে করে স্ট্যালিনের এই নীতি ত্রিশের দশকে ডিমিট্রিভ তত্ত্বের জন্ম দেয়। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রস্তাবে বলা হয় যে, পৃথিবী তিনভাগে বিভক্ত—১. সোভিয়েত সমাজবাদ, ২. গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ, ৩. ফ্যাসিবাদ। ডিমিট্রিভের পপুলার ফ্রন্ট তত্ত্বে বলা হয়েছিল ফ্যাসিবাদকে রুখতে গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঐক্য করা যায়। আরএসপি মনে করে ওই গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঐক্যের নীতিই পরবর্তীকালে সহ-অবস্থানের নীতির জন্ম দেয়। ১৯৪৩ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের চাপে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেয়।

আমাদের এ দু'টি প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া গেলে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সমঝোতা কঠিন নয়। তবুও কামরুন্নাহার লাইলী চাপ দিতে থাকল আমাদের আলোচনায় বসাবার জন্যে। সর্বশেষ আমি বললাম, লাইলী এত ভেবে লাভ নেই। তোদের পার্টি আমাদের সঙ্গে বসবে না। বললেন, নির্মল সেন আত্মগোপন করলেও ৯২(ক) ধারায় আদলে তাদের নেতা নিতাই গাঙ্গুলী তার কার্যে বহাল তবিয়তে আছে। এরা সরকারের দালাল। তাদের সঙ্গে বসা যাবে না। ঝুঁকি আছে। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি অন্য কাউকে কমিউনিস্ট মনে করে না। মনে করে মার্কিন দালাল। ওরা ছাড়া সাচ্চা কমিউনিস্ট বা প্রগতিশীল আর কেউ নেই। লাইলী আমাদের কথা বিশ্বাস করল না।

এরপর ক'দিন লাইলীর দেখা নেই। লাইলী এল ২৭ আগস্ট। সিদ্দিককে বলে গেল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বৈঠক হবে না। কারণ তারা মনে করে আরএসপি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল। ওদের সঙ্গে বসলে ঝুঁকি আছে।

www.nagorikpathagar.com

সিদ্দিক মাস তিনেক হাসপাতালে থাকার পর বরিশাল চলে গেল। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বৈঠকের পর্ব এভাবে শেষ হলো। দেশের রাজনীতিতে তখন ভিন্ন নাটক।

রাজনীতিতে সকলের দৃষ্টি তখন করাচির দিকে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী হবেন—এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি দেশে নেই বলে মন্ত্রিসভায় যোগ দেননি। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীগ লীগের সিদ্ধান্ত, শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ঠেকাতে হবে। তিনি মন্ত্রিসভায় যোগ দিলে আর রাজনীতি করা যাবে না।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শহীদ সোহরাওয়ার্দী করাচি ফিরলেন। করাচিতে আওয়ামী লীগের আট নেতার বৈঠক। সকলেরই মত প্রধানমন্ত্রীত্ব পেলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভায় গেলে আপত্তি নেই। কিন্তু শহীদ সাহেব ভিন্ন কথা বললেন। তিনি বললেন, গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তাকে ছ'টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রতিশ্রুতি ছ'টি হচ্ছে—(১) শহীদ সাহেব মন্ত্রিসভায় ঢুকবার তিনদিন (মতান্তরে তিন সপ্তাহ) পরে তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। (২) আওয়ামী লীগের আরো দু'জন মন্ত্রী নেয়া হবে। (৩) সংবিধান রচনার ভার শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ওপর দেয়া হবে। (৪) ছ'মাসের মধ্যে সংবিধান রচনা শেষ করে একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হবে। (৫) এক বছরের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন হবে। (৬) নতুন সংসদে সংবিধান সংশোধনের পূর্ণ অধিকার থাকবে।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ রাজি হলেন না। তাদের যুক্তি—ক'দিন পরেই যখন শহীদ সাহেব প্রধানমন্ত্রী হবেন, তখন আর আগে যোগ দিয়ে লাভ কি? ক'দিন পরে শহীদ সাহেব প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই মন্ত্রিসভা গঠন করুক। কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোনো কিছুই মানলেন না। তিনি বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন ২০ ডিসেম্বর। পরবর্তী সময়ে দেখা গেলো, কেন্দ্রীয় সরকার শহীদ সাহেবকে দেয়া কোনো প্রতিশ্রুতিই মানছে না। একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব মুক্তি পেলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের নতুন কোনো মন্ত্রী নেয়া হলো না। উপরন্তু কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভার সদস্য করা হলো।

আমরা তখন সকল ঘটনার নীরব সাক্ষী। দেশে ৯২(ক) ধারা অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট শাসন। সভা মিছিল সমাবেশ করা মুশকিল। অপরদিকে নেতৃত্বের কোন্দল। প্রগতিশীল শক্তি বিভ্রান্ত। ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সমর্থক হলেও যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাক তা কেউ চায়নি। অথচ মনে হচ্ছে

www.nagorikpathagar.com

ষড়যন্ত্রকারীরা যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে চাচ্ছে। সেই ষড়যন্ত্রে জেনে হোক না জেনে হোক শরিক হয়েছেন সকল দলের নেতৃবৃন্দ। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যুক্তফ্রন্টের নেতা শেরেবাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয়।

কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাব এনে আওয়ামী লীগ লাভবান হলো না। কারণ পরিষদের সকলেই ছিল যুক্তফ্রন্টের মনোনীত সদস্য। কেউ আওয়ামী লীগ বা কেএসপির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়নি। তাই আওয়ামী লীগের এক শ্রেণির সদস্য যুক্তি দেখাল—আমরা আওয়ামী লীগের নির্দেশ মানতে রাজি নই। নির্দেশ হতে হবে যুক্তফ্রন্টের। ফলে হক সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে আওয়ামী লীগ জিততে পারল না। আমরা শুধু দেখলাম। ১৯৫৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি যুক্তফ্রন্টের নতুন নেতা নির্বাচিত হলো। ভোট নিয়ে অনেক হইচই হলো। বিকেলে টেলিগ্রাম বের হলো। উভয় পক্ষই দাবি করলেন তাঁরাই জিতেছেন। আওয়ামী লীগ গ্রুপের নেতা হলেন আতাউর রহমান খান। কৃষক শ্রমিকের পার্টি কেএসপি দাবি করল অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়নি। তাই তাঁরা জিতেছেন।

আমাদের মনে হলো, জিতেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদে পাকিস্তানের সামরিক বেসামরিক আমলার নেতৃত্বে মুসলিম লীগের রাজনীতি। পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর তারা আতঙ্কিত হয়েছিল। এবার তাদের শঙ্কা দূর হলো। আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হলো পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট। এগিয়ে এলো ২১ ফেব্রুয়ারি।

২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস। ১৯৫৪ সালের সাড়ম্বরে পালিত হয়েছিল। এবার ১৯৫৫ সালে দেশে কোনো মন্ত্রিসভা নেই। মিছিল করা যাবে না। কোথাও গোপন বৈঠকও করা যাচ্ছে না। হলে হলে পুলিশের এজেন্ট। তাদের মধ্যে অনেকে এখন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। তখনকার লালবাগ থানার ওসির বাড়ি ছিল বরিশালে। তার এক ছোট ভাই একদিন আমার কাছে ঢাকা হলে এল। বললো, সরে যান। ভাইজান পাঠিয়েছে, আজ আপনাদের গ্রেফতার করতে পারে। আপনি গ্রেফতার হলে বিপদ হবে। আপনার বিরুদ্ধে খুনের মামলা আছে।

প্রকৃতপক্ষে আমার পক্ষে গ্রেফতার হওয়া সম্ভব ছিল না। হল থেকে দূরে চলে গেলাম। তখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ আউয়াল। সভাপতি আব্দুল মমিন তালুকদার। যতদূর মনে আছে ২০ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে মিছিল করার চেষ্টা করায় ২১ ছাত্রীসহ

www.nagorikpathagar.com

অনেক ছাত্র গ্রেফতার হয়ে গেল। পরের দিন ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপিত হলো—পুলিশ প্রহরায়। গ্রেফতারের মধ্যে ছিল এমএ আউয়ালসহ অনেক ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা। মাসখানেক পরে জেলখানা থেকে সকলে ছাড়া পেল।

জেলখানা থেকে বের হয়ে আউয়াল আমাকে জানাল—ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্যের প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। ছাত্র ইউনিয়ন নেতারা জেলে আলাপ-আলোচনায় সম্মত হয়েছে ছাত্রলীগ নামে ঐক্যবদ্ধ হতে। ছাত্র ইউনিয়ন আগামীতে তাঁদের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক ডাকবে। কাউন্সিল ডাকবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেছে ছাত্রলীগের ফরিদপুর জেলা কমিটির নেতা লিয়াকত হোসেন। লিয়াকত তখন জেলে ছিল। অনেকে বলল, লিয়াকত বিশ্বাসের দিক থেকে কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি এবং বরাবরই সে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্যের কথা বলেছে। ঐক্যের প্রশ্নটি খুব জোরালো ছিল দেশের ছাত্র রাজনীতিতে। ছাত্রলীগের প্রতীক ছিল—শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি। ছাত্র ইউনিয়নের ঐক্য, শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি। প্রশ্ন হতো, ছাত্রলীগের প্রতীক ঐক্য নয় কেন? তাহলে কি ছাত্রলীগ ঐক্য চায় না?

একবার রাজশাহীতে ছাত্রসভায় এ ধরনের প্রশ্নের মুখে পড়েছিলাম আমি ও মমিন তালুকদার। ছাত্রসভায় প্রশ্ন উঠল—আপনাদের প্রতীক ঐক্য নয় কেনো? আপনারা কি ঐক্য চান না? ছাত্রলীগের সভাপতি তালুকদার সাহেব জবাব দিলেন—যে শিক্ষা ঐক্য শেখায় না সে শিক্ষা আদৌ শিক্ষাই নয়। তাই আমাদের সংগঠনের প্রতীকের মধ্যে ঐক্য নেই।

মনে হলো, ছাত্ররা খুশি হলো না। আমি বললাম, দেখুন আমি জবাব দিতে পারি। আপনারা রাগ করবেন না তো? কারণ যাঁরা প্রশ্ন করছেন তাঁরা সকলে ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য। আমার কথা কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যাবে।

আমার কথা হচ্ছে—ছাত্রলীগ গঠিত হয়েছিল ১৯৪৮ সালে। তখন ঐ প্রতিষ্ঠানেরই সদস্য ছিলেন পরবর্তীকালে ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতারা। তাই সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সংগঠন করায় ঐক্যের প্রশ্ন ওঠেনি। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পর একটি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয়। এ ব্যাপারে আমি পূর্বেই লিখেছি যে, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠন ছিল তৎকালীন আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগের ফসল। দেশ বিভাগের কালে

www.nagorikpathagar.com

কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল ছাত্র ফেডারেশন [এই ছাত্র ফেডারেশন ছিল নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন অনুমোদিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের অঙ্গ]। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এ নামে পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করায় অসুবিধা দেখা দেয়। এ নামের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি জড়িত এবং প্রতিষ্ঠান ভারতের একটি সংগঠনের অঙ্গ। ফলে পাকিস্তান ছাত্র সংগঠনের নাম পাল্টাবার প্রশ্ন দেখা দেয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত নতুন কোনো সংগঠন করা সম্ভব ছিল না। তাই কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর নিজস্ব ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এর আগ পর্যন্ত এরা কেউ ছাত্র ফেডারেশনের নামে, কেউ আবার ছাত্রলীগের নামে কাজ করত। এমনকি ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে ছাত্র ইউনিয়ন কোনো কমিটি গঠন করেনি। ঐ দু'টি জেলায় তারা ছাত্রলীগের মাধ্যমে কাজ করত। এ দু'টি জেলা কমিটি মুখ্যত কমিউনিস্ট পার্টির পরামর্শেই চলত।

একই কাজ আরএসপি করেছিল ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর। তাদের প্রভাবিত ছাত্র প্রতিষ্ঠান নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেসের নাম পাল্টে রাখা হয় পাকিস্তান ছাত্র এসোসিয়েশন—পিএসএ।

এ পটভূমি মনে রেখেই আমি রাজশাহীতে ছাত্রসভায় বলেছিলাম, ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করে প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতিতে প্রথম ভাঙন সৃষ্টি করা হয়। এবং যারা এই ভাঙন সৃষ্টি করেছিল তারাই প্রতীক নিয়েছিল ঐক্য। ছাত্রলীগ যখন গঠন হয়েছিল ১৯৪৮ সালে, তখন ঐক্যের প্রশ্ন ওঠেনি। যারা ভেঙেছে তারাই ঐক্যের কথা বেশি বলছে। কারণ ১৯৫২ সালে শুধুমাত্র অসাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে নতুন সংগঠন গঠনের প্রয়োজন ছিল না। কারণ ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দ তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফলে কাউন্সিলে ঐ প্রস্তাব পাস করা সম্ভব হয়নি। ১৯৫৩ সালে এ সিদ্ধান্ত কাউন্সিলে চূড়ান্ত হয়। সকলেই জানত এ ঘটনা ঘটবে—যেমন ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দ তুলে দেয়া হলেও এর আগে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মোহাম্মদ তোয়াহার মনোনয়ন নিতে অসুবিধা হয়নি। এমনটি ১৯৫৪ সালে অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রী দলের টিকেটে নির্বাচিত হয়ে বরিশালের মহিউদ্দীন আহমেদ এবং আব্দুল করিম পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং এ নিয়ে কথা না বাড়ানো অনেক ভালো। সবকিছু হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্তের ফলে। তাই আমি আউয়ালকে

www.nagorikpathagar.com

বলেছিলাম, ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নামে ঐক্যবদ্ধ হবে না। কমিউনিস্ট পার্টি এ সিদ্ধান্ত মানতে পারে না।

একটি নির্দিষ্ট রাজনীতির এই ধারাবাহিকতায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্ট হিসেবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলেছিলাম—ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নামে ঐক্যবদ্ধ হবে না। হতে পারে না। এর মধ্যে একদিন আউয়াল জানাল, নির্মল ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হয়েছে—সাতজন সভায় উপস্থিত ছিল। সর্বসম্মত হয়েছে তারা ছাত্রলীগ নামে ঐক্যবদ্ধ হবার। আমার তেমন বিশ্বাস হলো না।

কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে দেখি মহা হইচই। ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্রলীগকে ঐক্যের জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রস্তাব দেয়া হয়েছে ইউনাইটেড স্টুডেন্টস লীগ নামে ঐক্যবদ্ধ হবার। ছাত্র ইউনিয়নের বিজ্ঞপ্তি পড়লে মনে হবে, তারাই ঐক্যের অগ্রদূত। তারাই এগিয়ে এসে আহ্বান জানিয়েছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের। তাদেরই ত্যাগের ফল ঐক্যবদ্ধ অর্থাৎ ইউনাইটেড স্টুডেন্টস লীগ নামে নতুন প্রতিষ্ঠান গঠনের আহ্বান।

সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। অনেকেই জানত যে, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের ঐক্যবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা চলছে। হঠাৎ এ ধরনের প্রচারপত্র আমাদের সবাইকে হতভম্ব করে দিল। তবে আমার কাছে ছাত্র ইউনিয়নের এই প্রস্তাব সঠিক বলে মনে হলো না। দীর্ঘদিন পরে একটি সংগঠনের অপর একটি সংগঠনে অবলুপ্ত হওয়া সহজ নয়। এতে মতানৈক্য হতেই পারে। শুনলাম ছাত্র ইউনিয়নের কমিটির পূর্ণাঙ্গ সভায় এবং কাউন্সিলে ছাত্রলীগের নামে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। তারা নতুন প্রস্তাব দিয়েছে ইউনাইটেড স্টুডেন্টস লীগ নামে ঐক্যবদ্ধ হবার। তাদের কাছে এটাই স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু বিপদে পড়লাম আমরা। ব্যক্তিগতভাবে আমিও খুশি হয়েছিলাম ঐক্যবদ্ধ হবার প্রস্তাবে। কারণ ছাত্রলীগ থেকে আওয়ামী লীগের জন্ম। তাই এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ঢাকার বাইরে দু'টি সংগঠনকে পৃথক করে দেখা হতো না। আওয়ামী লীগের সকল সভায়ই ছাত্রলীগ নেতারা বক্তৃতা দিতেন। সাধারণ সম্পাদক এমএ আউয়াল ও আমি এর বিপক্ষে ছিলাম। আমাদের বক্তব্য ছিল—ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের লেজুড় নয়। তাই আওয়ামী লীগের সভায় ছাত্রলীগ নেতাদের বক্তৃতা দিতে হলে আগে লিখিতভাবে ছাত্রলীগকে অনুরোধ করতে হবে। ছাত্রলীগ অনুমোদন করলেই

www.nagorikpathagar.com

একমাত্র ছাত্রলীগ নেতারা আওয়ামী লীগের মঞ্চে বক্তৃতা দিতে পারবে। আমাদের মনোভাবের ফলে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, আমি একদিন পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভার মঞ্চ থেকে বক্তৃতাদানকারী একজন ছাত্রলীগ নেতাকে নামিয়ে দিয়েছিলাম। এ ঘটনা অনেকেই ভালো চোখে দেখত না। অপর দিকে তখন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন। ছাত্রলীগের ওপর আওয়ামী লীগের প্রভাব বাড়ছে। ব্যক্তিগতভাবে এমএ আউয়াল শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রিয়পাত্র। ফলে পরবর্তীকালে ছাত্রলীগের রাজনীতি নিয়ে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। আমি ভেবেছিলাম ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হলে হয়তো ছাত্রলীগকে নিরপেক্ষ রাখা যাবে। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নের এই বিজ্ঞপ্তির পর মনে হলো সবকিছু ভেস্তে যাচ্ছে।

তবুও একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করা হলো। বৈঠক বসবে ১৫৭ নম্বর নবাবপুর রোডে। ছাত্রলীগ অফিসে। জন্মলগ্নে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রথম অফিস ছিল ৯০ মোগলটুলীতে। মুসলিম শব্দটি তুলে দেবার প্রশ্নে ছাত্রলীগ দু'ভাগ হয়ে যায়। যারা মুসলিম শব্দ তুলে দেবার পক্ষে ছিল তাদের অফিস স্থানান্তরিত হয়ে ১৫৭ নম্বর নবাবপুর রোডে। এই দফতরটিও আমরা বিনা ভাড়ায় পেয়েছিলাম। ছাত্রলীগের জন্মের প্রথম দিকে এক বন্ধু এই দফতরটি আমাদের দিয়েছিলেন। আমি ছাত্রলীগে থাকা পর্যন্ত এ ভবনেই ছাত্রলীগের অফিস ছিল।

সেদিন ঐক্য সম্পর্কিত বৈঠক বসার কথা ছিল বেলা ৯টায়। ৯টার মধ্যেই ছাত্র ইউনিয়নের নেতা এসএ বারী এটি, আনোয়ারুল আজিম এবং আব্দুস সাত্তারসহ অনেকেই আমাদের অফিসে উপস্থিত হলেন। ছাত্রলীগের সম্পাদক এমএ আউয়াল পৌঁছালেন বেলা দশটায়। তাকে আমি বিলম্বে আসার কারণ জিজ্ঞেস করতেই এমএ আউয়াল ক্ষিপ্ত হলেন। তিনি বললেন—ছাত্র ইউনিয়নের এই নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। তারা কথা দিয়ে কথা রাখেনি। আমাদের না জানিয়ে তারা তাদের নিজস্ব প্রস্তাব বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করেছেন। সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে ধারণা হয়েছে আমরাই ঐক্য চাই না। এ পরিস্থিতিতে তাদের সাথে নতুন করে ঐক্য নিয়ে আলোচনা করার কোনো অবকাশ নেই। তারা জানে, ইউনাইটেড স্টুডেন্টস লীগ গঠনের দাবি আমরা কিছুতেই মেনে নেব না। সাধারণ ছাত্ররা এ ঐক্য প্রক্রিয়ার পূর্ব ইতিহাস জানে না। তাই মনে করবে ছাত্র ঐক্য না হবার জন্যে আমরাই দায়ী।

www.nagorikpathagar.com

আমার মনে হলো দুই সংগঠনের ঐক্যের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। আউয়ালের মন্তব্যগুলো অপমানজনক। ভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিজেদের দফতরে আমন্ত্রণ জানিয়ে এ ধরনের কথাবার্তা আদৌ রুচিকর নয়। তবুও আমি শেষ চেষ্টা করলাম। আমি একটি নতুন প্রস্তাব দিলাম ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের কাছে। আমি বললাম, আমাদের সভাপতি আব্দুল মোমিন তালুকদার, সম্পাদক এমএ আউয়াল এবং দফতর সম্পাদক আমি নির্মল সেন একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে দিচ্ছি। আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে—দু'টি সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ হবার পর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগই নাম থাকবে। তবে ঐ সংগঠনের কর্মকর্তা হিসেবে যাদের নামই আপনারা লিখে দেবেন আমরা তিনজন সে কমিটি মেনে নেব। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে দিচ্ছি।

আমি এ প্রস্তাব সম্পর্কে পূর্বে কারো সঙ্গে আলাপ করিনি। তবে জানতাম সভাপতি ও সম্পাদক আমার প্রস্তাব পছন্দ না করলেও প্রকাশ্যে কিছু বলবেন না। আমার প্রস্তাব শুনে দু'জনেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ বললেন, ইউনাইটেড স্টুডেন্টস লীগ ব্যতীত কোনো প্রস্তাবে একমত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমাদের বৈঠক ভেঙে গেল। আমার ধারণা ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনয়নের ঐক্যের এটাই বোধ হয় ছিল সর্বশেষ প্রচেষ্টা। আমি ছাত্র রাজনীতি থাকাকালীন ভিন্ন কোনো প্রচেষ্টা হয়েছে বলে শুনিনি। এ প্রচেষ্টা ভেঙে যাবার পর আমারও ছাত্রলীগ থেকে যাবার দিন ঘনিয়ে এল। বিপদ বাড়ল আমার এবং আমাদের। আমরা যারা কোনোদিনই চাইনি যে ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের লেজুড় হোক তাদের অসুবিধা হলো। শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো নীতির বিরুদ্ধে কোনো কিছু করা বা বলা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে গেল। অপরদিকে কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের সকল নীতির প্রতিবাদ করতে থাকলোন। আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুখ চেয়ে কিছুই বলতে পারল না।

এ মুহূর্তে নতুন সঙ্কট দেখা দিল গণপরিষদ নিয়ে। ইতোপূর্বে ২৩ অক্টোবর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ গণপরিষদ ভেঙে দিয়েছিলেন। ৭ নভেম্বর সিন্ধুর চিফ কোর্ট গণপরিষদ বিলুপ্তির আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করে। গভর্নর জেনারেল এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন। ২১ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট সিন্ধু চিফ কোর্টের রায় বাতিল করেন এবং অবিলম্বে সংবিধান

www.nagorikpathagar.com

প্রণয়নের জন্যে একটি সংস্থা গঠনের আদেশ দেন। সেই আদেশ অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল ১৫ এপ্রিল আর একটি আদেশ জারি করেন। এই আদেশের নাম হচ্ছে সংবিধান কনভেনশন আদেশ। এই আদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল আরো কিছু শর্ত। এই শর্তে বলা হয় পাকিস্তান দুই ইউনিটে বিভক্ত হবে। পূর্ব পাকিস্তান হবে একটি ইউনিট এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে আর একটি ইউনিট। পশ্চিম পাকিস্তানের ৪ প্রদেশের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। সর্বক্ষেত্রে সংখ্যা সাম্যনীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা শতকরা ৫৬ ভাগ হলেও তারা পশ্চিম পাকিস্তানের মতোই ৫০ ভাগ সুযোগ-সুবিধা পাবে। এর নাম ছিল সংখ্যাসাম্য। এই প্রস্তাবনার ব্যাপারে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন আপোষহীন। তিনি হুমকি দিলেন যে, প্রয়োজনবোধে সামরিক বিধানের মাধ্যমে এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করা হবে।

এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সমগ্র পূর্ব বাংলার সকল মহল বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। কৃষক শ্রমিক পার্টি, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলো। তারা সংবিধান কনভেনশন বয়কটের প্রস্তাব গ্রহণ করল। এ সময় ইস্কান্দার মীর্জা ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এলেন। ইস্কান্দার মীর্জা কৃষক শ্রমিক পার্টিকে তাদের প্রস্তাবনা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কৃষক শ্রমিক পার্টি মীর্জার প্রস্তাবে রাজি হলো না। শুধুমাত্র শহীদ সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগকে সম্মত করালেন। আওয়ামী লীগ কনভেনশনে যোগ দিতে সম্মত হলো। সারাদেশে তখন আওয়ামী লীগ সমালোচিত। আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পথে কলকাতাতে অবস্থান করছেন। তিনি কলকাতা থেকে বিবৃতি দিয়ে সংবিধান কনভেনশনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। কিছুটা হলেও আওয়ামী লীগের মুখ রক্ষা হলো।

কিন্তু সবকিছু পাল্টে গেল মওলানা ভাসানীর ঢাকা আগমনের পর। ২৫ এপ্রিল মওলানা সাহেবকে নিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় পৌঁছালেন। সেই একটি রাতের কথা আমার এখনও মনে আছে। আমি তখন ঢাকা হলে থাকি। গভীর রাতে আমাদের হলে এলেন ছাত্রলীগের এককালীন সভাপতি বর্তমান শিক্ষক নেতা কামরুজ্জামান-সাহেব। বলা হলো—ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের মওলানা ভাসানী ডেকেছেন। আমাদের যেতে হবে পুরান ঢাকার কারকুন বাড়ি লেনে জনাব ইয়ার মোহাম্মদের বাড়ি। গভীর রাতে আমরা সেখানে হাজির হলাম। আমাদের মধ্যে ছিল আব্দুল মোমিন তালুকদার, এমএ

www.nagorikpathagar.com

আউয়াল, নূরুল ইসলাম, আবদুল গাফফার চৌধুরী, আব্দুল জলিল এবং ছাত্র ইউনিয়নের এসএ বারী, আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। আমরা জানতাম না কেন আমাদের ডাকা হয়েছে। শুধু এটুকু জানতাম যে সংবিধান সম্মেলনে যোগদান নিয়ে আওয়ামী লীগে বিরোধ চলছে। ওই সম্মেলনে যোগ দেয়া নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তখনও হয়নি। আমাদের ধারণা ছিল শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে না।

আমরা নিজেদের মধ্যে এই আলোচনাই করছিলাম। ইতোমধ্যে মওলানা সাহেব আমাদের কক্ষে এসে ঢুকলেন। কুশল বিনিময় করলেন। বললেন, গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ এবং প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী তাঁকে কথা দিয়েছেন যে, আওয়ামী লীগের তিনটি শর্ত তারা মেনে নেবে। শর্ত তিনটি হচ্ছে—(১) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, (২) রাজবন্দিদের মুক্তি, (৩) যুক্ত নির্বাচন। মওলানা সাহেব বললেন, এই তিন শর্তে তিনি সংবিধান সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপর তিনি আমাদের মতামত জিজ্ঞেস করলেন।

আমরা ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেলাম। আদৌ ভাবতে পারিনি যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা মওলানা সাহেবের কথা মেনে নিতে পারলাম না। বললাম, এই ঝানু আমলাদের বিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই। এছাড়া আমরা সংখ্যাসাম্য মানব কেন? এমনিতেই সব ব্যাপারে বাঙালিরা বঞ্চিত হচ্ছে। এবার সাংবিধানিকভাবে আমাদের বঞ্চিত করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা গভর্নর জেনারেল বা প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাস করি না। মওলানা সাহেব আমাদের সঙ্গে তেমন বিতর্কে যোগ দিলেন না।

আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে তাঁর চিরপরিচিত ভাঙা বাংলায় কথা বলতে বলতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী আমাদের কক্ষে ঢুকলেন। তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বললেন—তোমাদের কথা আমি বুঝি। কিন্তু কাউকে তো বিশ্বাস করতে হবে। সকলকে অবিশ্বাস করলে তো চলবে না। গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী আমাদের পাকা কথা দিয়েছেন। বলেছেন, আমাদের শর্ত মেনে নেবেন।

এবার বিস্ফোরণ ঘটল—আবদুল গাফফার চৌধুরী বললো—শহীদ সাহেব, আপনার সব কথাই আমরা বুঝি। তবে আমাদের ধারণা হচ্ছে আপনাদের দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিয়ে একদিন আপনাকেই মন্ত্রিসভা থেকে কিক আউট করবে। গাফফারের কথার তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো। মোমিন তালুকদার ও নুরুল ইসলাম ক্ষিপ্ত হলো। আমাদের আলোচনা তেমন আর

www.nagorikpathagar.com

এগুল না। এক সময় মওলানা সাহেব ও শহীদ সাহেব আমাদের কক্ষ থেকে চলে গেলেন। রাত তখন শেষ। আমরা ইয়ার মোহাম্মদের বাড়ি দোতলা থেকে নিচতলায় নামলাম। দেখলাম কতিপয় তরুণ কিছু হ্যান্ডবিল বিতরণ করছে। তারা আওয়ামী লীগের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং তারা আওয়ামী লীগেরই লোক।

ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে নবাবপুর রোড দিয়ে হাঁটছিলাম। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। যতদূর প্রতিবাদ করার কথা ছিল তা করতে পারলাম না। আওয়ামী লীগ এ প্রস্তাব মেনে নিল। প্রতিরোধ করার মতো কোনো শক্তিই দেশে থাকল না। কারণ শেরেবাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টি শেষ পর্যন্ত আপোষ করবেই। মৃত মুসলিম লীগ ও অর্ধমৃত কংগ্রেস কাগজপত্রে বয়কট করলেও রাজপথে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে না। আর ৯২(ক) ধারার যাতাকলে বামপন্থীরা বিপর্যস্ত। কেউ জেলে। কেউ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি শুনলাম অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে এ প্রস্তাব পাস করাতে হয়েছে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদে। তিনি লিখিতভাবে মুচলেকা দিয়েছেন... আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, ২২ দফা ও যুক্ত নির্বাচন প্রস্তাবাবলি কনিস্টিটিউশন কনভেনশনে গ্রহণ করবার লক্ষ্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব—যতদূর পর্যন্ত প্রস্তাবগুলো সংবিধানের সঙ্গে সম্পর্কিত। ব্যর্থ হলে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করব।

কিন্তু এত করেও আওয়ামী লীগ হালে পানি পেল না। দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সদস্যরা মনোনয়নপত্র দাখিল করল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) ও আলি আহমাদসহ আওয়ামী লীগ সদস্যরা মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন। অন্য কোনো দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল না। ধারণা সৃষ্টি হলো যে, পূর্ববাংলা থেকে আওয়ামী লীগের শতকরা একশ জন সদস্যই নির্বাচিত হবে। কিন্তু গভর্নর জেনারেলের তখন অনেক খেলা বাকি। তিনি মনোনয়নের তারিখ পিছিয়ে দিলেন। ইতোমধ্যে ফেডারেল কোর্ট গভর্নর জেনারেলের সংবিধান কনভেনশনের নির্দেশ বাতিল করে দিল। ফেডারেল কোর্টের পক্ষ থেকে বলা হলো—সংবিধান কনভেনশন নয়, সংবিধান প্রণয়নের জন্যে গণপরিষদ গঠন করতে হবে। এই গণপরিষদ গঠনের জন্যে ২৮ মে নতুন নির্দেশ জারি করা হলো। গভর্নর জেনারেল নির্দেশ দিলেন ১৯৫৫ সালে ২৮ মে গণপরিষদ গঠনের। এই গণপরিষদের দুই ইউনিটের ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠিত হবে। গণপরিষদে সংখ্যাসাম্য থাকবে।

www.nagorikpathagar.com

পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০ জন করে সদস্য থাকবেন। নির্বাচনে পূর্ববাংলার ৩১ জন মুসলমান ও ৯ জন অমুসলমান নির্বাচিত হলো। কারণ তখন স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি চালু ছিল। ৩১ জন মুসলিম সদস্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেল ১২; কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্র দলের কোয়ালিশন পেলো ১৬, মুসলিম লীগ একটি ও স্বতন্ত্র দু'টি। মুসলিম লীগ সদস্য হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন কেন্দ্রের আইনমন্ত্রী। গণপরিষদে তাঁর সমর্থক সংখ্যা ১২। এর পরেও তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে চাচ্ছেন। এ আশ্বাসই নাকি গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দিয়েছেন।

কিন্তু কোনো প্রতিশ্রুতি কাজে এল না। প্রতিশ্রুতি ভাঙার পালা শুরু হলো পূর্ববাংলার নতুন সরকার গঠন নিয়ে। পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। কিন্তু তাদের ক্ষমতা দেয়া হলো না। অসুস্থতার জন্যে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সুইজারল্যান্ড গিয়েছিলেন। আইনমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীও সুইজারল্যান্ড গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে কিছু সমস্যা নিয়ে আলাপের জন্যে। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী এ সুযোগ নিলেন। ১৯৫৫ সালের ৬ জুন পূর্ব বাংলা থেকে ৯২(ক) ধারা তুলে নেয়া হলো। আওয়ামী লীগ ভেবেছিল মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে তাদেরই ডাকা হবে। কিন্তু ডাকা হলো যুক্তফ্রন্টের নামে কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলামকে। পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী হলেন আবু হোসেন সরকার। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত স্বাস্থ্যের অজুহাতে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ৫ আগস্ট পদত্যাগ করলেন। এবার ভারপ্রাপ্ত গভর্নর জেনারেল হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইস্কান্দার মীর্জা। প্রধানমন্ত্রী হলেন মুসলিম লীগের চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন একে ফজলুল হক, যাকে মাত্র কিছুদিন আগে দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে পূর্ববাংলায় ৯২(ক) ধারা জারি করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী পুনরায় রাষ্ট্রদূত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিরোধী দলের নেতা হলেন। তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। এবার শুরু হলো পাকিস্তানের রাজনীতিতে আরেক অধ্যায়।

সারা পাকিস্তানজুড়ে তখন এক অভাবনীয় রাজনীতির খেলা চলছিল। কোনো আদর্শ বা নীতির বালাই ছিল না। ব্যক্তিস্বার্থ ছিল মূলকথা এবং এটাই ছিল স্বাভাবিক। পাকিস্তানের জন্ম কোনো স্থির বিশ্বাসের পরিণতি নয়। শেষ

www.nagorikpathagar.com

পর্যন্ত পাকিস্তানের দাবি সফল হবে এ কথা অনেক মুসলিম লীগ নেতা বিশ্বাস করতেন না। ভারত বিভাগের সময় পাকিস্তানের দু'অংশে রাজনৈতিক চিত্র ছিল পরস্পরবিরোধী। সিন্ধু, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ (বেলুচিস্তান) ছিল জোতদার ও জমিদারের দেশ। একশ্রেণির পাঞ্জাবিরা সেনাবাহিনীতে ছিল। সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সর্বকালে জোতদার ও জমিদারদের হাতে ছিল। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এককালে তীব্র ছিল পাঞ্জাবে। কিন্তু সে নেতৃত্ব ছিল শিখ ও হিন্দুদের হাতে। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের অধিকাংশ মুসলিম নেতৃত্ব ছিল জমিদার ও ব্রিটিশ সরকারের অনুগত। রাজনৈতিক আদর্শের বালাই ছিল না। দলত্যাগ ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে এককলে কিছুটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় তা চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়।

অপরদিকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চিত্র ছিল একান্তই ভিন্ন। এরা ধর্মবিশ্বাসে গোঁড়া মুসলমান। কোনোদিনই ব্রিটিশ সরকারের কাছে মাথা নত করেনি। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে এরা কংগ্রেসের সহযোগিতা ও সহানুভূতি পেয়েছে। এই প্রদেশে কংগ্রেস শক্তিশালী ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় এই প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ছিল। নেতৃত্বে ছিলেন সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গাফফার খান। সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস দেশবিভাগের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। এ প্রদেশটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার শিকার। এদের সান্ত্বনা দেবার জন্যে ব্রিটিশ ও কংগ্রেস সীমান্ত প্রদেশে গণভোটের ব্যবস্থা করে। বলা হয়েছিল, সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা ভারত কিংবা পাকিস্তানে যাবে। গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হবে। সীমান্তের কংগ্রেস এ গণভোট পাত্তা দেয়নি। গণভোটে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে যোগ দেয়।

উপরের চিত্র থেকে পরিষ্কার যে, পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো একক রাজনীতি বা একক নেতৃত্ব ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে কোনো প্রদেশেই মুসলিম লীগ সরকার ছিল না। ফলে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মুসলিম লীগ তেমন শক্তিশালী ছিল না পশ্চিম পাকিস্তানে। তবুও জিন্নাহ-লিয়াকত আলী জীবিত থাকা পর্যন্ত রাজনীতিতে মুসলিম লীগের কিছুটা নেতৃত্ব ছিল। তাঁদের মৃত্যুর পর সে নেতৃত্ব ভেঙে পড়ে।

তখন আর একটি ঘটনা ঘটে পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে। দেশ বিভাগের ফলে এ দু'টি প্রদেশ থেকে লাখ লাখ হিন্দু ও শিখ ভারতে চলে যায়। ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে আসে লাখ লাখ মুসলমান। একই সঙ্গে ভারত থেকে পাকিস্তানে আসে ব্রিটিশ আমলের আমলারা, বম্বে ও গুজরাটের ব্যবসায়ীরা।

www.nagorikpathagar.com

নিজস্ব ব্যক্তি ও শ্রেণিস্বার্থেই এরা পরবর্তীকালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ শুরু করে। পাকিস্তানের রাজনীতিকদের দুর্বলতার জন্যে এবং অনিবার্য কারণে পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে সামরিক বাহিনী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিকাংশ কর্মকর্তা জন্মসূত্রে পাঞ্জাবি এবং জমিদার শ্রেণির। দেশ বিভাগের মুহূর্তে কাশ্মীর নিয়ে সংঘর্ষসহ বিভিন্ন কারণে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তারাও রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

এর আবার একটি ভিন্ন কারণও ছিল। এ কারণটি হচ্ছে পাকিস্তানে প্রভাব বিস্তার নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশের প্রতিযোগিতা। পাকিস্তান ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। পাকিস্তানে ব্রিটিশ সহায়-সম্পত্তি ছিল। পাকিস্তান ব্রিটিশ কমনওয়েলথে ছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকেও ছিল ব্রিটিশ মুদ্রা অর্থাৎ স্টার্লিং ব্লকে।

অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী পরিবেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাকিস্তান হয়ে ওঠে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান সীমান্তে বৃহৎ দু'টি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। পাকিস্তানের পাশে ভারত জোটনিরপেক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষায় সোভিয়েতপন্থী।

এ পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাচ্ছিল পাকিস্তানকে কব্জায় নিতে। এক সময় সাহায্যের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর একটি অংশের ব্যয়ভার বহন করত। পেশোয়ারের বিমানঘাঁটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে দিত। ফলে ব্রিটিশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব তুঙ্গে ওঠে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে অনেকের ধারণা এই দ্বন্দ্বেই রাওয়ালপিণ্ডির ষড়যন্ত্রের নামে সামরিক বাহিনীর একশ্রেণির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করা হয়। আইয়ুব খান অনেককে ডিঙিয়ে প্রধান সেনাপতি হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। পরবর্তীকালে রাওয়ালপিণ্ডির এক জনসভায় গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। সে হত্যা মামলার কোনো তদন্ত হয়নি। লিয়াকত আলীকে হত্যা করেছিল সীমান্ত প্রদেশের হাজরা জেলার সৈয়দ আকবর। সে তখন অন্তরীণ ছিল। তখন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন খাজা শাহাবুদ্দিন। খাজা শাহাবুদ্দিনের বড়ো ভাই খাজা নাজিমুদ্দিন তখন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল। লিয়াকত আলী নিহত হবার পর খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। গভর্নর জেনারেল হন আমলাদের প্রখ্যাত নেতা গোলাম মোহাম্মদ। এই গোলাম মোহাম্মদই পরবর্তীকালে খাজা নাজিমুদ্দিনকে পদচ্যুত করেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে

www.nagorikpathagar.com

পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে ডেকে এনে প্রধানমন্ত্রী বানানো হয়। অর্থাৎ পাকিস্তানের রাজনীতিতে তখন পিছু হটছে ব্রিটিশ। এগিয়ে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানই ছিল তৎকালীন রাজনীতির কেন্দ্র।

তবে পূর্ববাংলার চিত্র ছিল একান্তই ভিন্ন। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পূর্ববাংলার মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সীমিত সংখ্যক জোতদার-জমিদার থাকলেও অধিকাংশ নেতা ছিলেন উকিল ও মোক্তার। মুসলিম লীগের মূল শক্তি ছিল ছাত্র সংগঠন। এ ছাত্র সংগঠনের তরুণরা অনেক সময়ই নেতাদের পাত্তা দিত না। তাদের কাছে পাকিস্তান ছিল হিন্দুদের প্রতিযোগিতামুক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি পাবার একটি স্বপ্নের আবাস। তারা পাকিস্তানকে দেখেছে নিত্যদিনের জীবনের দেনাপাওনার হিসেবের ভিত্তিতে। তাই তারা প্রথম থেকেই ছিল অধিকার সচেতন। তাদের কাছে রাষ্ট্র ভাষার আন্দোলন প্রথমদিকে কোনো আবেগ বা ঐতিহ্যের আন্দোলন ছিল না। ছিল অধিকার রক্ষার আন্দোলন। তাদের কাছে ইংরেজির সঙ্গে উর্দুর কোনো পার্থক্য ছিল না। ইংরেজি তাদের পদে পদে পরাভূত করেছে হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। তাই তারা বিদেশি ভাষা উর্দু মেনে নিয়ে আর একবার পরাভূত হতে চায়নি।

এছাড়া পূর্ববাংলায় ছিল অবিভক্ত বাংলার বামপন্থী আন্দোলনের রেশ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্য। এ বাঙালি তরুণরাই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ১৯৪৬ সালে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমেছিল। এ ঐতিহ্যের তারতম্যের জন্যেই পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক চিত্রের তারতম্য ছিল। এখানে লক্ষণীয় যে, এ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বামপন্থী তরুণরাই ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে একই মঞ্চে দাঁড় করিয়েছিল। পরাজিত করেছিল মুসলিম লীগকে। পূর্ববাংলা পরিণত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ঘাঁটিতে। পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। পূর্ববাংলার রাজনীতিতে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ত্রাতা হিসেবেই আবির্ভূত হন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাসাম্য ও এক ইউনিট মেনে নেয়। আর পশ্চিমাদের এ সুযোগ দিয়ে বিনিময়ে ৮০ জনের পার্লামেন্টে মাত্র ১২ জন সদস্য নিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হবার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে আদর্শের কোনো বালাই ছিল না।

www.nagorikpathagar.com

একই প্রতিযোগিতায় নামেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক কৃষক শ্রমিক পার্টি নিয়ে। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন পাকিস্তান মন্ত্রিসভায়। দুটি দলই সব আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়েছিল ব্যক্তিস্বার্থে। তখন সঠিক বুর্জোয়া আদর্শ ধারণ করেও কোনো রাজনৈতিক দল দেশে আত্মপ্রকাশ করেনি। ব্যক্তি বড় হয়ে উঠেছিল—দলটির মূল চরিত্র ছিল সুবিধাবাদী।

এই আওয়ামী লীগ ও কেএসপি তখন পূর্ববাংলার রাজনীতির নেতৃত্বে। দেনা-পাওনাই ছিল তাদের মূল চালিকা শক্তি। এই দেনাপাওনার জন্যেই দু'টি দল বারবার পূর্ববাংলার স্বার্থ বিক্রি করেছে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃত্বের কাছে।

অপরদিকে মুসলিম লীগ না থাকলেও তার ভাবাদর্শ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে তখন সামরিক বেসামরিক আমলার নেতৃত্বে গড়ে উঠছিল একটি পুঁজিপতি শ্রেণি। রাজনীতির মঞ্চ থেকে একের পর এক বিদায় নিচ্ছিল রাজনীতিকরা। পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজির বিকাশ হচ্ছিল আমলাদের নেতৃত্বে। রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আসছিল আমলারা। এরা ছিল একান্তই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্ভর। এরা তাই নিজস্ব প্রয়োজনে পূর্ববাংলায় নিজস্ব মিত্র খুঁজছিল এবং রাজনীতির দিক থেকে তাদের পছন্দ ছিল মার্কিন ঘেঁষা শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

৯২(ক) ধারা আমলে পাকিস্তান কমিউনিস্ট বিরোধী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থার (সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন) এবং বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষর করে। পূর্ববাংলার নেতাদের মধ্যে একমাত্র শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই দুই কমিউনিস্ট বিরোধী জোটের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মূল রাজনৈতিক সংগঠন পূর্ববাংলার আওয়ামী মুসলিম লীগ এ চুক্তি সমর্থন করল না—তাই পশ্চিম পাকিস্তানের আমলা নেতৃত্বের সঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কোনো সমঝোতাই স্থায়ী হচ্ছিল না। পার্লামেন্টে ১২ সদস্যের নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ব্যক্তিগতভাবে যতই পশ্চিম ঘেঁষা হোক না কেনো, রাজনীতির বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্ব তেমন ছিল না।

তবুও তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের উভয় অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য শেষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে রাজনীতি থেকে অপসারণ না করে সামরিক-বেসামরিক আমলাদের পক্ষে ক্ষমতায় আসা সম্ভব ছিল না। তাই একবার শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ক্ষমতায় এনে ছুঁড়ে ফেলে দেবার ষড়যন্ত্রেই শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বারবার প্রধানমন্ত্রী হবার টোপ দেয়া হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আওয়ামী লীগকে সে সত্যটি অনুধাবন করতে হয়েছে পরবর্তীকালে।

www.nagorikpathagar.com

১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে আওয়ামী মুসলিম লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি তুলে দেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তবে এ প্রস্তাব গ্রহণও সহজ ছিল না। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রস্তাবের পক্ষে দাঁড়ালে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পিছু হটতে হয়। ভোর ৪টায় এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৯ সালে জন্মের ৬ বছর পর ১৯৫৫ সালে এসে আওয়ামী মুসলিম লীগ আওয়ামী লীগে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবার পরেই যুক্ত নির্বাচনের প্রশ্ন গুরুত্ব লাভ করে। ব্রিটিশ আমলের মুসলিম লীগ দাবি করেছিল তারাই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি। তাই তারা পৃথকভাবে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। অপরদিকে কংগ্রেস নিজেকে অসাম্প্রদায়িক ও সকল ভারতবাসীর প্রতিষ্ঠান বলে মনে করত। তাই তারা যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ও মুসলিম লীগের আঁতাতে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি চালু হয় এবং একই সময় অনুন্নত বলে তফশিল সম্প্রদায়ের জন্যে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। নির্বাচন সম্পর্কে এই উত্তরাধিকার নিয়ে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান নামে বিভক্ত হয়। তাই পাকিস্তান মুসলিম লীগের নীতিগতভাবেই যুক্ত নির্বাচন করার কোনো উপায় ছিল না। আওয়ামী মুসলিম লীগ মুসলিম শব্দটি তুলে দেয়ার পরে এ দাবি নিয়ে সামনে এগিয়ে আসে।

এ যুক্ত নির্বাচন নিয়ে কিছু কিছু ঘটনা এখনও আমার মনে আছে। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়ন শুরু হয়। সংবিধান প্রণয়ন নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় পূর্ব বাংলায়। বিশেষ করে এক ইউনিট ও সংখ্যা সাম্যের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় সভা সমাবেশ শুরু হয়। একের পর এক মিছিল হতে থাকে ঢাকায়। তখন আমি ছাত্রলীগের দফতর সম্পাদক। আমাদের দল বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল (আরএসপি) তখন নিষিদ্ধ। কমিউনিস্ট পার্টিও তখন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। আমাদের তখন প্রকাশ্যে কাজ করার কোনো সুযোগ ছিল না। প্রকাশ্যে কাজ করার অর্থ হচ্ছে—নির্যাতন এবং কারাবরণ। আমাদের অনেক বন্ধুদেরই মত ছিল প্রয়োজন হলে ঝুঁকি নিয়েই প্রকাশ্যে কাজ করতে হবে। তখন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আবু হোসেন সরকার। তাঁর আমলে রাজারবাগে পুলিশ ধর্মঘট হয়। এ ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে কতিপয় রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। আমাদেরও আবার নতুন করে গা ঢাকার চেষ্টা করতে হয়। শুধু আমি থেকে গেলাম ছাত্রলীগ হিসেবে

www.nagorikpathagar.com

প্রকাশ্যে কাজ করার জন্যে। এ সময়ে সংবিধানে যুক্ত নির্বাচনের সংযোজনের দাবি উঠতে থাকে।

এ যুক্ত নির্বাচন নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রলীগের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বক্তা আমি এবং ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি আবদুল মোমিন তালুকদার। আমরা যুক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তাব পাস করাতে সমর্থ নই। তখন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের অধিবেশনে চলছিল (বর্তমান জগন্নাথ হল মিলনায়তনে)। আমরা পরিষদ ভবনে গিয়ে আমাদের প্রস্তাব পেশ করি।

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন বিচারপতি ইব্রাহিম। এ সময় একদিন আমি তাঁর বাসায় যাই। তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল বরিশাল থেকে। বরিশালে তিনি দীর্ঘদিন বিচারপতি হিসেবে ছিলেন। ব্রিটিশ আমল থেকে পাকিস্তান সৃষ্টির পর তাঁর আদালতে প্রতিবারই আমরা সুবিচার পেয়েছি। তাই তাঁর সম্পর্কে একটি ভিন্ন ধারণা ছিল আমার ছাত্র জীবনের প্রারম্ভে। সেই বিচারপতি ইব্রাহিমের সঙ্গে দেখা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়, যুক্ত নির্বাচন প্রস্তাব পাস হবার পর। তিনি আমাকে বললেন—নির্মল, কাজটি তুই ঠিক করিসনি। আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিশ্বাস করি না। তুই নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবি বরিশালে আমি কোনোদিন মুকুল ফৌজের অনুষ্ঠানে যাইনি। আমি মুসলিম লীগের রাজনীতি পছন্দ করি না। আমি শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বিশ্বাস করি না। তিনি যুক্ত নির্বাচনের প্রস্তাব এনেছেন তোদের অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করার জন্যে। স্বতন্ত্র নির্বাচন থাকলে সংখ্যালঘুরা রাজনীতির রদবদলের নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হবে। তারা যে দলকে সমর্থন করবে তারাই মন্ত্রিসভা গঠন করবে। যুক্ত নির্বাচন হলে সংখ্যালঘুরা তেমন নির্বাচিত হতে পারবে না। রাজনৈতিকভাবে তারা পরাজিত হয়ে যাবে। তোর এ প্রশ্নটি লক্ষ করা উচিত ছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোনো আদর্শের তাড়নায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি।

ঠিক একই কথা বলেছিলেন প্রয়াত রসরাজ মণ্ডল। তফশিল ফেডারেশনের নেতা রসরাজ মণ্ডল তখন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিমন্ত্রী। তাঁর কাছে আমি ছাত্রলীগের আমতলার প্রস্তাবের অনুলিপি দিয়েছিলাম। তিনি প্রস্তাব হাতে নিয়ে বললেন, আপনি শেষ পর্যন্ত আমাদের সর্বনাশ করলেন। আপনাদের প্রস্তাবই হচ্ছে যুক্ত নির্বাচন সম্পর্কে ছাত্রদের প্রথম প্রস্তাব।

আমি সেদিন কোনো জবাব না দিয়ে চলে এসেছিলাম। কিন্তু আমার প্রিয় ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি ইব্রাহিমের কথার জবাব আমাকে দিতে

www.nagorikpathagar.com

হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, স্যার আপনার কথার জবাব আমি আজকে দেব না। আপনার কথাই সত্য কিন্তু আমি একটি আদর্শে বিশ্বাস করে রাজনীতি করি। আমার আদর্শ সাম্প্রদায়িক গণ্ডি মানে না। আমি বিশ্বাস করি, যে কোনো জায়গা থেকেই হোক অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটি নতুন অধ্যায় শুরু করতে হবে। স্যার, আপনি অনেক কিছু জানলেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জ্বালা আপনার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ জ্বালা অনুধাবন করতে পারে পূর্ব বাংলার হিন্দু, পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ এবং সারা ভারতের মুসলমান। কেউই ইচ্ছে করে পূর্ব পুরুষের ভিটা ছেড়ে চলে যায় না। যায় অনেক চোখের জলে। সে ঘটনাই ঘটছে এ উপমহাদেশে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্যে। এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হাতিয়ার ছিল স্বতন্ত্র রাজনীতি পদ্ধতি। সাধারণ মানুষের মতো বাঁচতে হলে এ পদ্ধতির ইতি টানতেই হবে। সেদিন বিচারপতি ইব্রাহিম আমার কথা শুনে হেসেছিলেন। বললেন—তোর মতো বয়সে আদর্শবোধ থাকাই স্বাভাবিক। ঠিক আছে, তুই যা করছিস ভালোই করেছিস। কিন্তু আমি তোর সঙ্গে একমত নই।

সেদিন নির্বিবাদে স্যারের ভবন থেকে বের হয়েছিলাম। বিপদে পড়লাম গভীর রাতে একটি পত্রিকা অফিসে। পত্রিকাটির নাম সাপ্তাহিক যুগবাণী। সম্পাদক বহু বিতর্কিত চিত্তরঞ্জন সুতার। তিনি তখন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য। আমি তখন ঐ পত্রিকার বিনা পয়সার কলাম লেখক। আমি উপসম্পাদকীয় লিখি। আমি সে রাতে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে উপসম্পাদকীয় লিখেছিলাম, কী করে যেনো তাঁর কাছে খবর পৌঁছেছিল। তিনি গভীর রাতে পত্রিকা অফিসে পৌঁছালেন। বললেন, এমনি করে ঢালাওভাবে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে লেখা যাবে না। আমি বললাম, তাহলে আমি লিখব না। আজ থেকেই আপনার পত্রিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ। সেদিন দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের মধ্যে আলাপ হলো। তারপর আমি নতুন করে উপসম্পাদকীয় লিখলাম। আমার লেখায় নতুন করে একটু ঘুরিয়ে একটি বাক্যবিন্যাস করলাম। আমাকে লিখতে হলো—আমরা যুক্ত নির্বাচন চাই। তবে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্যে কিছুদিনের জন্যে আসন সংরক্ষণ করা বাঞ্ছনীয়।

যদিও শেষ পর্যন্ত কোনো সুপারিশ কাজে আসেনি। পাকিস্তানের সংবিধানে একটি অদ্ভুত ধারা সংযোজিত হয়েছিল নির্বাচন সম্পর্কে। রাতভর বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে যুক্ত নির্বাচন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন। সেই সংবিধানের পূর্ব পাকিস্তান এখন

www.nagorikpathagar.com

বাংলাদেশ আর পশ্চিম পাকিস্তান এখন পাকিস্তান। বাংলাদেশে এখন চালু আছে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি। আর পাকিস্তানে এখনও চালু আছে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি।

১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের সংবিধান রচনা শুরু হলো। এবার সে সংবিধানের বিরুদ্ধে বিরোধীদলীয় নেতা হলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সংবিধান সম্পর্কে বিতর্কে শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর ইতিহাস বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন। সে যেনো আর এক সোহরাওয়ার্দী। যে সংবিধানের কাঠামো তিনিই প্রণয়ন করেছিলেন পূর্ববর্তী সরকারের আইনমন্ত্রী হিসেবে, সেই সংবিধানের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ালেন হিমালয়ের মতো। কিন্তু কাজে এল না।

পূর্ব বাংলায় তখন প্রতিদিন মিটিং এবং মিছিল। আমি তখন আজকের শহীদুল্লাহ হল তৎকালীন ঢাকা হলে থাকি। হরতালে আমার দায়িত্ব পড়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন এবং চানখাঁরপুল এলাকায়। হরতাল থাক বা না থাক প্রতিদিন হরতালের জন্যে টোকাইরা আমার রুমের সামনে ভোরবেলা ভিড় জমাত। আমি তখন ঢাকা হলের তিনতলার পশ্চিম দিকের একটি কক্ষে থাকতাম।

এ কক্ষটিতে থাকার একটা শর্ত ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এ কক্ষে তালা লাগানো যাবে না। অর্থাৎ নকল তালা থাকবে। এ কক্ষে জানালার কপাট খুলে ঘুমাতে হবে। কোনো কিছু বন্ধ রাখা যাবে না। এ সিদ্ধান্তের একটা ভিন্ন প্রেক্ষিত ছিল। প্রেক্ষিত হচ্ছে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ডা. এস এন মিত্রকে কেন্দ্র করে। ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাছে গেলে তিনি তাদের দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করতেন, কোন হলের ছাত্র? হলের নাম শুনে ওষুধ লিখতে শুরু করতেন। খুব বেশি হলে জিজ্ঞেস করতেন ঘুমাবার সময় দরোজা জানালা খোলা থাকে কিনা। যারা দরোজা জানালা খোলা রেখে ঘুমাত তাদের তিনি ভালো করে দেখতেন। অন্যথায় কথাই বলতেন না। তাই আমি ডা. মিত্র'র কাছে গেলে প্রতিদিনই ঝগড়া হতো এবং এ পরিপ্রেক্ষিতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমাদের রুমে থাকতে হলে দরোজা-জানালা খুলে ঘুমাতে হবে। এভাবে ঘুমাতে অনেকেই রাজি হতো না। অনেকে অসুস্থ হয়ে যেত। আমাদের কক্ষ থেকে অন্যত্র চলে যেত। ওই কক্ষে আমরা যারা দীর্ঘদিন টিকেছিলাম তার মধ্যে ছিলেন জহিরুল ইসলাম, আহমদ হোসেন, মনমোহন রায় এবং হিমাংশুরঞ্জন দত্ত। পরের তিনজনের কেউ কেউ পরবর্তীকালে চাকরিতে যুগ্মসচিব এবং অতিরিক্ত সচিব স্তরে পৌঁছেছিলেন।

www.nagorikpathagar.com

আমাদের এ কক্ষের সামনে প্রতি ভোরে টোকাই জমতো। হরতাল না থাকলে তারা বিরক্ত হতো। হরতালের দিন আমাদের সঙ্গে নিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যেত। তবে তারা আমাকে বিশেষ পছন্দ করতো না। কারণ আমি ঢিল মারতে দিতাম না। গাড়িতে আগুন দিতে দিতাম না। এমনকি রিকশার দমও ছেড়ে দিতে দিতাম না। হরতালের দিন গাড়ি দেখলে টোকাইদের খুব আনন্দ হতো। সঙ্গে সঙ্গে ওরা ইট নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যেতো। আমাকে কিছুতেই সামনে যেতে দিতো না। এমনকি একটি হরতালের দিনে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো হলের সামনে একটি গাড়ি দেখা দিল। টোকাইরা তখন গাড়ির আরোহীকে নামিয়ে ফেলেছে। সামনে এগিয়ে চিনলাম গাড়ির আরোহী ঢাকার ডিসি হায়দার সাহেব। হায়দার সাহেব অবাঙালি। আমি তাঁকে বললাম, আপনি একটু সামনে হেঁটে এগিয়ে যান। গাড়িটি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে এমনি করে আজকে আপনার বের হওয়া ঠিক হয়নি। টোকাইরা বিক্ষুব্ধ হলো। তারা গাড়ি ছাড়তে কিছুতেই রাজি নয়। অনেক অনুনয় বিনয় করে গাড়ি ছাড়াতে হলো।

এ হরতাল নিয়ে আর একটি ভিন্ন ঘটনা ঘটল পরবর্তীকালে। সেদিন আমি টোকাইদের নিয়ে পুরোনো বেতার ভবনের দিকে এগিয়েছি। এমন সময় ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সের এক মানুষ আমার কাছে এগিয়ে এল। আমাকে বলল, চলুন হিন্দুদের দোকানগুলো পুড়িয়ে দেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? সে জবাব দিল, ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। অথচ কারো বাড়ি আমি আগুন দেইনি বা লুটও করিনি। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে ৫ বছর আমাকে জেল খাটানো হয়েছে। মিথ্যা মামলায় যখন জেল খাটলাম তখন রায়ট করতে অসুবিধা কী? আমি বললাম, ঠিক আছে। পরে একদিন রায়ট করা যাবে। আজকে রায়টের হরতাল নয়। আজকে আমাদের দাবিদাওয়া আদায়ের হরতাল। পরে একদিন সবাই মিলে রায়ট করা যাবে। সে মানুষটি আমার কথা শুনল। আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকল। সন্ধ্যা পর্যন্ত হরতাল করল আমার সঙ্গে।

এ হরতাল আর বিক্ষোভের মধ্যে একদিন পাকিস্তান সংবিধান প্রণয়ন করা হলো। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভালো বক্তৃতা করলেন ঠিকই কিন্তু দাবি আদায় হলো না। প্রকৃতপক্ষে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোনো দাবি আদায় করা গেল না। প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ঘোষণা করলেন, ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে ওই সংবিধান চালু করা হবে। উল্লেখ্য, ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরের মুসলিম লীগ অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সে

www.nagorikpathagar.com

পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস পালন করা হতো। কিন্তু সংবিধান নিয়ে একমত হওয়া গেল না। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সংসদ থেকে বেরিয়ে আসলেন। সংবিধানে স্বাক্ষর করলেন না। তাঁরা ২৩ মার্চ প্রজাতন্ত্র দিবসও পালন করলেন না। এ নিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে মতানৈক্য হলো। শহীদ সোহরাওয়ার্দী পরবর্তীকালে সংবিধানে সই করেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারা সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি। ১৯৫৬ সালে সংবিধান প্রণয়নের পর পূর্ববাংলার নাম হলো পূর্ব পাকিস্তান।

পূর্ব পাকিস্তানে তখন প্রধানমন্ত্রী কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার। প্রদেশের গভর্নর শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। কেন্দ্রে মুসলিম লীগ ও কেএসপি। পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম দল আওয়ামী লীগ অথচ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় নেই। আবু হোসেন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিদিনই সভা মিছিল হরতাল হতে শুরু করল। অপরদিকে কোন্দল দেখা দিল কেএসপির কোয়ালিশন সরকারে। আওয়ামী লীগেও বিরোধ দেখা দিল বৈদেশিক নীতি নিয়ে। পাকিস্তানের সংবিধানে অর্থবছর পরিবর্তন করা হলো। নতুন অর্থবছর হলো জুলাই থেকে জুন। অথচ আবু হোসেন সরকার ভয় পাচ্ছিল প্রাদেশিক পরিষদ ডাকতে। বাজেট পাস করতে। কারণ ভয় ছিল পরাজয়ের। অপরদিকে আওয়ামী লীগ দাবি জানাচ্ছিল প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ডাকতে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার আবু হোসেন সরকারকে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার নির্দেশ দেয়। পরিবর্তে আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করেন ৩০ আগস্ট।

আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করায় দেশে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। প্রতিদিন চালের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিছিল হচ্ছে চালের দাবিতে। ৪ সেপ্টেম্বর এমন একটি মিছিল জিঞ্জিরা থেকে বুড়িগঙ্গা পার হয়ে চকবাজার হয়ে নতুন ঢাকার দিকে আসছিল। পুলিশ এই মিছিলে গুলি করে। চার জন নিহত হয়। আওয়ামী লীগসহ সকল ছাত্র প্রতিষ্ঠান সারাদেশে এই হত্যার প্রতিবাদে হরতাল আহ্বান করে ৫ সেপ্টেম্বর।

৫ সেপ্টেম্বর আমার হরতালের দায়িত্ব পড়ে হাইকোর্ট এলাকায়। আমার সঙ্গে ছিলেন ফজলুল হক হলের ছাত্র আবদুর রহিম। যিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রধান তথ্য অফিসার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন।

আমাদের এলাকা ছিল হাইকোর্ট মোড় থেকে মেডিক্যাল কলেজের মোড় পর্যন্ত। সেদিন এই এলাকায় কতগুলো দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। ওইদিন

www.nagorikpathagar.com

প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন ছিল। আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করলেও গভর্নর ফজলুল হক তখনো কাউকে নতুন সরকার গঠন করতে বলেননি। তাই সেদিন পরিষদ অধিবেশন থাকায় অসংখ্য সদস্যকে তৎকালীন পরিষদ ভবন (জগন্নাথ হল) মিলনায়তনে যেতে হচ্ছিল আমাদের এলাকা হয়ে এবং প্রতিটি গাড়ি নিয়েই বিবাদ হচ্ছিল।

এক সময় দেখা গেল, সামরিক বাহিনীর পাহারায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাস আসছেন। স্বাভাবিকভাবেই জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠল। লতিফ বিশ্বাস কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী। আর ঢাকায় গুলি হয়েছে ভুখা মিছিলের ওপর। তাই জনতার বিক্ষুব্ধ হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। এ পরিস্থিতিতে আব্দুল লতিফ বিশ্বাসের গাড়িবহর হাইকোর্টের কাছে এলে আমরা তাঁকে গাড়ি ছেড়ে দিতে বললাম। বললাম, আপনাকে পৌঁছে দেব পরিষদ ভবনে। তিনি আমাদের কথায় রাজি হলেন। হেঁটে চললেন আমাদের সঙ্গে।

কিন্তু আমরা রমনা গেটের কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে মিছিল হিংস্র হয়ে উঠল। মিছিল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। ভাবলাম পরিষদ ভবন নয়, লতিফ বিশ্বাসকে বাঁচাতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীনিবাসে পৌঁছে দেব। কারণ তাঁকে নিরাপদে পরিষদ ভবন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব বলে মনে হচ্ছিলো না। ইতোমধ্যে কে যেন তাঁর মুখে গোবর মাখিয়ে দিল।

রমনা গেটের উত্তরে মিছিলে গোলযোগ শুরু হলো। বাংলা একাডেমীতে মিছিল পৌঁছাতে পারল না। সিদ্ধান্ত নিলাম যে কোনো ভবনে তাঁকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। বাংলা একাডেমীর দক্ষিণ পাশে আজকের পুষ্টি ভবনে তাঁকে ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু জনতা তখন মারমুখি। আর সঙ্গী তখনকার ছাত্রলীগের সদস্য আজকের জাতীয় পার্টি নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। তাঁকে বললাম, মোয়াজ্জেম একটা বক্তৃতা দিয়ে মিছিল ফিরিয়ে নাও।

সেদিন মোয়াজ্জেমের বক্তৃতা আজো আমার মনে আছে। মোয়াজ্জেম হোসেন বলল, ভাইসব মানুষ দেখে কারা পালায়?—কুকুর। আপনারা কি কুকুরের পিছু ছুটবেন? না, মিছিলে যাবেন আমাদের সঙ্গে?

মিছিল চলে এল আমাদের সঙ্গে। তখনো জানতাম না যে, এর চেয়েও বড়ো সমস্যা অপেক্ষা করছে রমনা গেটে। আবদুস সালাম খান এবং হাশেমুদ্দীন সাহেব তখন গাড়িতে যাচ্ছিলেন পরিষদ ভবনের দিকে। এ দু'জন এক সময় আওয়ামী লীগ করতেন। এরা আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভায় গিয়েছিলেন দল ছেড়ে। তাই এঁদের বিরুদ্ধে জনতার স্বাভাবিক আক্রোশ ছিল। রমনা গেটের মোড়ে এদের গাড়ি এলে আমি গাড়ি থামালাম। বললাম, নামুন।

www.nagorikpathagar.com

পৌঁছে দিচ্ছি পরিষদ ভবনে। গাড়িতে যেতে পারবেন না। তাঁরা গাড়ি থেকে নামতেই মিছিল থেকে এক লোক গিয়ে তাদের মুখে গোবর মাখিয়ে দিল। কোনো মতে তাঁদের নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের দিকে এগোলাম। কিছুটা পশ্চিমে গিয়ে তুলে দিলাম ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট ড. মযহারুল হকের বাসায়। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলাম ভিড় বাড়ছে। জনতা ক্ষিপ্ত হচ্ছে। ফজলুল হক হলের প্রভোস্টের বাসা বাঁচানো দায়। আমি একটি রিকশা নিয়ে পরিষদ ভবনের দিকে গেলাম। ভাবলাম মাওলানা সাহেব বা শেখ সাহেবকে ছাড়া এ জনতা ঠেকানো যাবে না। তাঁদের একজন প্রয়োজন। নইলে অঘটন ঘটে যেতে পারে।

পরিষদ ভবনে পৌঁছে তোপের মুখে পড়লাম যেন। সামনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার। পাশে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাস। প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার আমাকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, পরিষদে আপনার বিরুদ্ধে মোসন আনব। আপনি আমাদের সদস্যদের পরিষদ ভবনে আসতে বাধা দিচ্ছেন। আমি শুধু লতিফ বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। প্রকৃত চিত্র হচ্ছে—আমি না থাকলে আজ লোকটি রাজপথে নির্ঘাত মারা পড়ত।

আমি প্রধানমন্ত্রীকে পাস কাটিয়ে গেলাম। পরিষদ ভবনে মওলানা ভাসানীকে পেলাম না। শেখ সাহেবকে বললাম। তিনি মিছিল নিয়ে আমার সঙ্গে এলেন। সেদিন দেখেছিলাম মিছিল নিয়ন্ত্রণের অটুট ক্ষমতা। তিনি আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের উত্তরের রাজপথে এসে জনতাকে ধমক দিলেন। বললেন, তোমাদের পরিষদ সদস্যদের আক্রমণ করতে কে বলেছে? কে বলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাড়িতে ঢিল মারতে? জনতা টু শব্দটি না করে আস্তে আস্তে সরে গেল। আর ইতোমধ্যে ড. মযহারুল হকের বাসা থেকে আমার কাছে একটি স্লিপ এলো। স্লিপ লিখেছেন হাশেম উদ্দীন আহমদ। তিনি লিখেছেন, তাঁর কাপড়ের অবস্থা বেহাল। বাড়ি থেকে নতুন কাপড় না এলে পরিষদে যাওয়া সম্ভব হবে না। আমি স্লিপটি শেখ সাহেবের হাতে দিলাম। তিনি হেসে স্লিপটি হাতে নিলেন। আমি জানতাম, এ মানুষটিই এ কাজটি করতে পারবেন এবং করবেন।

হরতালের পরে রাতে শুনলাম গভর্নর এ কে ফজলুল হক আবু হোসেন সরকারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন এবং আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে বলেছেন। মনে হলো আমার ছাত্রলীগ ছাড়বার পালা এল। কারণ প্রদেশে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা। ছাত্রলীগের পক্ষে এই মন্ত্রিসভার বিরোধিতা

www.nagorikpathagar.com

করা সহজ হবে না। আর আমার পক্ষে আওয়ামী লীগকে অন্ধ সমর্থন দেওয়া সম্ভব হবে না।

সেই সময়টা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তখন আত্মীয়স্বজন কারো সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। ১৯৫৪ সালের পর আমার আর বাড়ি যাওয়া হয়নি। চিঠিপত্রও বন্ধ। আমার সঙ্গে কারো খবর রাখাও বিপজ্জনক। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি যে কত বিপজ্জনক তা তখন আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

ছাত্রলীগের রাজনীতিতে তখন আমার সঙ্গে মতানৈক্য দেখা দিচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরপরই কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১২ সেপ্টেম্বর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পদত্যাগ করেন। ৮০ জনের পার্লামেন্টে মাত্র ১২ জন সদস্য নিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হন। এ সময় তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ৮ সেপ্টেম্বরে রাজবন্দি মুক্তি।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ওয়াদা ছিল। ওই ওয়াদায় বলা হয়েছিল জননিরাপত্তা আইন বাতিল করা হবে এবং রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়া হবে। আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর ৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান তাঁর মন্ত্রিসভার সকল সদস্য নিয়ে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে যান। ৫৯ জন রাজবন্দিকে মুক্তি দেন। ইতিহাসে এ ছিল একটি অনন্য ঘটনা। পৃথিবীর কোনো সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে জননিরাপত্তা আইন বাতিল হয়নি। এভাবে মুক্ত হয়নি কোনো দেশের রাজবন্দিরা। কেন্দ্রে তখন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হননি।

প্রশ্ন উঠেছিল জননিরাপত্তা আইন না থাকলে দেশ চলবে কী করে? তখন কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ। পাকিস্তান সরকার কমিউনিস্ট বিরোধী সরকার। সুতরাং পাকিস্তানে কমিউনিস্টদের আটক করার জন্যে একটি আইন প্রয়োগ করা হবেই। পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানেরই অঙ্গ। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার নতুন করে জননিরাপত্তা আইন জারি করলে পূর্ব পাকিস্তানেও তা প্রযোজ্য হবে। তবে জননিরাপত্তা আইন না থাকলে কী অবস্থার সৃষ্টি হয় পরবর্তীকালে সে নজির পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সরকারই দেখিয়েছে। এই আওয়ামী লীগ সরকারই শেষ পর্যন্ত ৭ জন কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেফতার করেছিল চোরাচালানীর অভিযোগে। আওয়ামী লীগের এ কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানানো তখন সহজ ছিল না। ইত্তেফাকের পাতায় পাতায় তখন কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে ঝড় বইত। ইত্তেফাকের মালিক সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) তখন ইচ্ছামতো কমিউনিস্টদের গালি দিতেন।

www.nagorikpathagar.com

এ সময় একটি ভিন্ন কারণে আমি মওলানা ভাসানীর কাছাকাছি আসি। একদিন সন্ধ্যা রাতে হলে ফিরে দেখি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও মোহাম্মদ তোয়াহা আমার জন্যে আমার পাশের কক্ষে অপেক্ষা করছেন। আমি খানিকটা বিস্মিত হলাম। তাঁরা বললেন, বিশেষ কারণে তারা আমার কাছে এসেছেন। কারণটি হচ্ছে মওলানা সাহেবের প্রথম পুত্র আবু নাসের খান ভাসানী অর্থাৎ বাবুকে পড়াতে হবে। বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী। ছাত্র তেমন ভালো নয়। আমার উপায় ছিল না তাদের ফিরিয়ে দেবার। তবে বলেছিলাম আমি কিন্তু বিনা বেতনে পড়াব না এবং টাকা নিয়েই বাবুকে পড়াতাম। বাবু আমার কাছে এসেই পড়ত। বাবু দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

তখনও আমি ছাত্রলীগের দফতর সম্পাদক। তখন পিরোজপুর ও ভোলায় দু'টি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী এ দু'টি জেলায় সফর করবেন। আমি এককালে বরিশালের ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলাম। আমাকে তাঁর সফরসঙ্গী হতো হলো। এই সফরে গিয়ে আমি মওলানা ভাসানীর একটি বিশিষ্ট রূপের সন্ধান পেলাম। তাঁর সঙ্গে আমার শুরু হলো বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক। আমরা একটি বিশেষ লঞ্চে করে বরিশাল যাত্রা করেছিলাম। যাওয়ার পথে বিভিন্ন স্টেশনে লঞ্চটি থামতো। মওলানা সাহেব সব স্টেশনেই ভাষণ দিতেন। তার প্রথম স্টেশনের ভাষণকে কেন্দ্র করেই আমার সঙ্গে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। তিনি তাঁর ভাষণে বললেন—'দুনিয়ার সকল সম্পদ শতকরা পাঁচ জনের হাতে জমা হইয়াছে। দুনিয়ায় শতকরা ৯৫ ভাগ মজলুম। ১৯৬০ সালের মধ্যে তামাম দুনিয়া হইতে সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। দেশে দেশে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হইবে।....'

মওলানা সাহেবের ভাষণের পর লঞ্চ ছেড়ে দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মওলানা সাহেব, এ তথ্য আপনি কোথা থেকে পেলেন? এ তথ্য সঠিক নয়। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬০ সাল। মাত্র ৪ বছর। এ ৪ বছরের মধ্যে দুনিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। এ তথ্যটি আপনি বেভানের কাছ থেকে পেয়েছেন। বেভান ব্রিটিশ শ্রমিক দলের বামপন্থী অংশের নেতা। শুনেছিলাম মওলানা সাহেব লন্ডনে থাকাকালীন বেভানের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। বেভানের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে পাকিস্তানের জন্ম এবং কাশ্মীর নিয়ে। আমার ধারণা হয়েছিল মওলানা সাহেব হয়তো তাঁর কাছে এমন একটা কিছু শুনেছেন।

www.nagorikpathagar.com

মওলানা সাহেব আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। এমনিতেই তিনি আমার আচরণে খুশি নন। আমি তাঁকে হুজুর বলে সম্বোধন করি না। এটি তিনি লক্ষ করেছেন।

তবে মওলানা সাহেবের জবাবের জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হলো না। লঞ্চ আর একটি স্টেশনে পৌঁছাল। সেই স্টেশনেও মওলানা সাহেবকে ভাষণ দিতে হলো। শ্রোতা অধিকাংশ মুসল্লি। মওলানা সাহেব এবার আর সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি উল্লেখ করলেন না। তিনি কোরান থেকে দু'টি সুরার উদ্ধৃতি দিলেন। খলিফা হারুন-অর রশিদের শাসন আমলের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, ইসলামের বিধান হচ্ছে দুনিয়ার সকল মানুষ দুনিয়ার সকল সম্পদের অংশীদার। ইসলাম সাম্যের ধর্ম। ইসলাম হচ্ছে অসাম্যের বিরুদ্ধে জেহাদ।

এমনি করে ভোলার বিভিন্ন জনসভায় তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। উপস্থিত জনসভায় তিনি ভাষণ দিলেন। উপস্থিত জনতার মনমেজাজ পরিচ্ছদ লক্ষ রেখেই তাঁকে বক্তৃতা করতে দেখলাম। কোথাও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের কথা বললেন। কোথাও বললেন ইসলামের সাম্যের কথা। আরো লক্ষ করলাম, সব সভায় তিনি একক বক্তা হতে চান। তারপরে কেউ বক্তৃতা দিতে পারে না। তাঁর দীর্ঘ ভাষণের পর তিনি জিজ্ঞেস করেন—আদৌ কোনো বক্তা আছে কিনা। নিজে নিজেই বলেন, আর কোনো বক্তা নেই। কাজেই প্রস্তাব পাঠ শুরু করেন। চোখের সামনে কোনো কাগজ ছাড়াই তিনি স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, সড়ক-সেতুগুলো দাবি করেন এবং এক সময় বলেন, এখানেই শেষ।

আমার জীবনে এ ধরনের সমাবেশের অভিজ্ঞতা আদৌ ছিল না। কখনো লক্ষ করিনি নেতাদের এ ধরনের বৈশ্যতা। কেউ যেন মওলানা সাহেবের সামনে কথা বলতে পারে না। তিনি হঠাৎ সবাইকে ধমক দেন। কারো যুক্তি বেশিক্ষণ শুনতে চান না। নিজেই শুরু এবং শেষ করেন। তাঁর সঙ্গে বৈঠক করতে গেলে হতে হয় নির্বাক শ্রোতা। প্রতিবাদ করা যেত না। আমার সঙ্গে এমন ঘটনাই ঘটেছিল।

আমরা উপনির্বাচনের সফরে বেরিয়েছিলাম। কথা ছিল ভোলা ও পিরোজপুর দু'টি এলাকাতেই জনসভায় ভাষণ দেয়া হবে। কিন্তু ভোলা সফর শেষে তিনি বললেন, তিনি এখন ঢাকায় ফিরবেন। কাগমারী যাবেন। আমি বললাম, তা হবে না। তিনি বললেন, বেশি বাড়াবাড়ি করো না। বরিশালে খবর দিয়ে দাও, ওরা যেনো স্টিমারে টিকেট কেনে। আমি আগামীকালই স্টিমারে ঢাকা যাব।

www.nagorikpathagar.com

উপায় নেই। আমরা বিশেষ লঞ্চে বরিশাল ফিরলাম। পিরোজপুরে আর জনসভা হলো না। স্টিমারের প্রথম শ্রেণিতে আমাদের আশ্রয় হলো। তখন বরিশাল থেকে স্টিমার নারায়ণগঞ্জ আসত। ঢাকা পর্যন্ত আসত না।

স্টিমার নারায়ণগঞ্জে পৌছাতে পৌছাতে বেলা হেলে পড়ে পশ্চিমে। মওলানা সাহেব দেরি করেই ঘুম থেকে উঠলেন। বললাম, নাস্তার কথা। তিনি প্রথম রাজি হলেন না। বেশ কিছু পরে বললেন, নাস্তার অর্ডার দাও। নাস্তা এলো। প্রথম শ্রেণির দামি নাস্তা দেখে তিনি বলেন, এ নাস্তার অনেক দাম। পয়সা সৃষ্ট করা যাবে না। আর আপনি এ নাস্তাই আনতে বলেছেন। তিনি কিছুটা খেলেন। বাকিটা কর্মচারীদের দিয়ে দিলেন। নারায়ণগঞ্জ পৌছে বললেন, আমি চাষাড়ায় ওসমান আলীর বাড়িতে থাকব। তুমি ঢাকা যাও। মুজিব আর মাহমুদ আলীকে খবর দাও আমার সঙ্গে নারায়ণগঞ্জে দেখা করতে। মাহমুদ আলী তখন গণতন্ত্রী দলের নেতা। গণতন্ত্রী দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে। কোয়ালিশন সরকারে আছে। আমার মনে হলো, মওলানা সাহেব উপনির্বাচন নিয়ে দু'জনের সঙ্গেই আলোচনা করতে চান।

আমি নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা ফিরলাম। সকলকে খবর দিলাম। পরদিন ভোরে ইত্তেফাকে দেখলাম, অসুস্থ মওলানা ভাসানীর কাগমারী গমন। আর আমি ঢাকায় পৌছে আর এক সঙ্কটের মুখোমুখি হলাম। শুনলাম মিসরের বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্স হামলা চালিয়েছে। প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্র জনতা পুরানা পল্টনের মোড়ে ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের ভবন পুড়িয়ে দেয়।

ইংরেজ ও ফরাসি মিসর হামলার কারণ ছিল সুয়েজ খাল। একশ' তিন মাইল দীর্ঘ সুয়েজ খাল ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে আরব সাগরকে যুক্ত করেছে। এ খাল কাটা না হলে নৌপথে ইউরোপ থেকে এশিয়ায় আসতে হতো উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে। প্রয়োজন হতো মাসের পর মাস। সুয়েজ খাল খননের ফলে পাশ্চাত্যের উপনিবেশ শক্তিবর্গের প্রাচ্যে শাসন ও শোষণের পথ আরো সহজ হয়। খালটি খনন করে ফরাসি নাগরিক ফার্ডিন্যান্স দ্য লেসেপস ১৮৫৯-১৮৬৯ সালে। এক সময় ব্রিটিশ ও ফরাসি সরকার মিসরের কাছ থেকে এক কোম্পানির শেয়ার কিনে কোম্পানির মালিক হয়। মিসরের নাসের ক্ষমতায় আসার পর নীল নদের ওপর বাঁধ দেয়ার পরিকল্পনা করে। এ বাঁধ আসোয়ান বাঁধ নামে পরিচিত। এ বাঁধে পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গ অর্থ সাহায্য দিতে রাজি না হওয়ায় প্রেসিডেন্ট নাসের ১৯৫৬ সালের জুন মাসে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করেন। এ জাতীয়করণের তিন মাস পর ব্রিটিশ ও ফ্রান্স ৩০ অক্টোবরে মিসরে হামলা চালায়। সারা পৃথিবীতে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও

www.nagorikpathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধমকে ইঙ্গ-ফ্রান্স সরকারকে নতিস্বীকার করতে হয়। ঢাকাতে ভস্মীভূত হয় ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের ভবন। নতুন সঙ্কট দেখা দেয় শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতিতে। প্রশ্ন ওঠে পাশ্চাত্য ঘেঁষা শহীদ সোহরাওয়ার্দী কোন দিকে যাবেন?

সুয়েজ সংঘর্ষ শুরু হলো ২৯ অক্টোবর। কলম্বো শক্তিসমূহ ১২ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে বৈঠক আহ্বান করল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী রাজি হলেন না এই বৈঠকে যেতে। পরিবর্তে তিনি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে নিয়ে তেহরান চলে গেলেন বাগদাদ চুক্তির বৈঠকে যোগ দিতে। বাগদাদ চুক্তি ছিল মধ্যপ্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিরোধী সামরিক জোট।

মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসের বাগদাদ চুক্তির তীব্র বিরোধী ছিলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হলো মিসর। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মিসর সফরে যেতে চাইলে নাসের প্রত্যাখ্যান করল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুমকিতে সুয়েজে যুদ্ধ বিরতি হলো। সিদ্ধান্ত হলো সুয়েজে খবরদারি করবে জাতিসংঘ বাহিনী। পাকিস্তান এ বাহিনীতে সৈন্য দিতে চাইলে মিসর আপত্তি জানায়। অর্থাৎ সুয়েজ সঙ্কট শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে একঘরে করল মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া থেকে। তবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন জানায়নি মিসরের প্রশ্নে। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান ও মওলানা ভাসানী বিবৃতি দিয়েছিলেন—মিসরের পক্ষে। পূর্ব পাকিস্তানে মিসর দিবস পালিত হয়েছিল। এ দিবস পালনে আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান একমত না হলেও বিরোধিতা করেননি।

আওয়ামী লীগ পাকিস্তানভিত্তিক সংগঠন হলেও এ সংগঠনের মূল শক্তি ছিল পূর্ব পাকিস্তান। এই পূর্ব পাকিস্তানে ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্য। আবার বিভিন্ন বামপন্থী দল প্রকাশ্যে কাজ করতে না পেরে আওয়ামী লীগের আশ্রয় নিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছিল সকল ধরনের যুদ্ধচুক্তি বিরোধী এবং প্রতিবাদ জানিয়েছিল পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি, বাগদাদ চুক্তি এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা চুক্তির। অথচ আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাশ্চাত্য ঘেঁষা এবং এই চুক্তির সমর্থক। ফলে সঙ্কট অনিবার্য হয়ে উঠল।

আমি এ সফরে বিপদে পড়লাম ভিন্ন দিক থেকে। দীর্ঘদিন পর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৫৪ সালে ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান পদত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন তাঁরা এ পদে

www.nagorikpathagar.com

আছেন। এ নিয়ে বিক্ষোভ আছে ছাত্রদের মধ্যে। তাই সিদ্ধান্ত হলো ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে সম্মেলন হবে। সম্মেলনের নাম উঠতেই প্রশ্ন উঠল, পরবর্তী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কে হবে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রস্তাব এল মোমিন তালুকদার সভাপতি থাকবেন না। সভাপতি হবেন এম এ আউয়াল, সাধারণ সম্পাদক হবে নির্মল সেন। অনেক আলোচনার পর এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো।

কিন্তু সম্মেলনের পূর্ব মুহূর্তে সবকিছু পাল্টে গেল। প্রস্তাব এল, এবার পূর্বের কমিটি বহাল থাকবে। শুধু নির্মল সেন দফতর সম্পাদক থেকে সহ-সভাপতি হবে। সভাপতি মোমিন তালুকদার মাত্র ক'মাস পরে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তাঁর আসন শূন্য হলে নির্মল সেন সভাপতি হবেন।

আমি এ জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। জানতামও নাম। সম্মেলনে এ প্রস্তাব উঠলে আমি বিরোধিতা করলাম। প্রতিবাদে নয়'টি জেলার প্রতিনিধিরা সম্মেলন ত্যাগ করল। তাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নিখিল পাকিস্তান কো-অর্ডিনেটিং কমিটি গঠন করা হলো। আমাকে তার সদস্য করা হলো। আমি চলে এলাম। প্রকৃতপক্ষে সেদিন আমার সঙ্গে ছাত্রলীগের সম্পর্ক ছিন্ন হলো। আর আমার পক্ষে ছাত্রলীগে থাকাও সম্ভব ছিল না। কারণ শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হবার পর আমাদের দল অর্থাৎ আরএসপি'র বৈঠক বসেছিল কুমিল্লায়। কুমিল্লা বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল—আমাকে ছাত্রলীগ ছাড়তে হবে। ছাত্রলীগ অন্ধভাবে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি সমর্থন করছে। ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের লেজুড় হয়ে গেছে। সময় সুযোগ বুঝে ছাত্রলীগ ছাড়তে হবে। আমি ছাত্রলীগ থেকে চলে এলাম। তবে প্রকাশ্যে কোনো ঘোষণা দিলাম না। তাই মাঝে মাঝে ছাত্রলীগ নেতারা আমার কাছে আসতেন আলোচনার জন্যে। আমি জানতাম আমি চলে আসায় ছাত্রলীগকে বিপদে পড়তে হবে। অসম্মানজনকভাবে এম এ আউয়ালকে চলে যেতে হবে ছাত্রলীগ থেকে। কারণ সব হিসাব, সংগঠনের যোগাযোগ আমার সঙ্গে। আমি না থাকলে সে থাকতে পারবে না। নতুন ছেলেরা সব হিসাব চাইবে। তাই আউয়াল প্রায়ই আসত আলোচনার জন্যে। এখানে বলা প্রয়োজন, আমি যখন ছাত্রলীগে যোগ দিই তখন সারাদেশে ছাত্রলীগের মাত্র তিনটি জেলায় সক্রিয় কমিটি ছিল। আমি চলে আসার আগে দেশের ১৭ জেলায়ই সক্রিয় কমিটি গঠিত হয়।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু ছাত্রলীগে আমার আর ফেরা হলো না। ইতোমধ্যে একদিন প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এলেন। তিনি সলিমুল্লাহ হল প্রাঙ্গণে ভাষণ দিলেন তাঁর পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে। এ ভাষণে তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর বিখ্যাত জিরো— শূন্য তত্ত্ব। তিনি বললেন, পাকিস্তানের মতো ছোট রাষ্ট্রগুলো কতগুলো গণিতের শূন্য-এর মতো। এর বাঁ দিকে যে কোনো অংক বসালেই তার অর্থ হয়। যেমন একটি শূন্যের বাঁয়ে এক বসলে ১০ হয়। অন্যথায় শূন্য হয়ে যায়। এই এক অংকটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত আমরা শূন্য থেকে যাবো এবং এই অংকেই তিনি বাগদাদ চুক্তি, পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি এবং সিটো চুক্তির সমর্থক। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এ ভাষণে পাণ্ডিত্য থাকলেও গ্রহণযোগ্য হলো না সাধারণ ছাত্র সমাজের কাছে। ওই সভায় আমি যাইনি। শুধুমাত্র আমাকে ঢাকা হলে বসে অনেক কথা শুনতে হলো। সকলেই জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল—আর কতদিন ছাত্রলীগে থাকবেন?

তবে এর পরেও ঘটনার বাকি ছিল। একদিন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি এম এ বারী এ টি আমার রুমে এলেন। আমাকে বললেন, আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় সমাবেশ ডেকেছে ফজলুল হক হল, এসএম হল, ইকবাল হলের ছাত্র সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্টরা। আলোচনার বিষয়বস্তু মওলানা ভাসানীর কথিত বক্তব্য। এই ছাত্র নেতারা নাকি কাগমারীতে মাওলানা সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন ইউরোপ সফর শেষে মাওলানা সাহেব মাত্র দেশে ফিরেছেন, তাই নাকি ছাত্র নেতাদের তাঁর কাছে যাওয়া। আলোচনাকালে মওলানা সাহেব নাকি ছাত্রনেতাদের কাছে ব্রিটিশ শ্রমিক দলের বামপন্থী নেতা বেভানের একটি বক্তব্যের উল্লেখ করেছিলেন। ঘটনটি নিম্নরূপ—

মওলানা সাহেব আলোচনাকালে বেভানের কাছে কাশ্মীর সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মতামত জানতে চান। বেভান নাকি বলেছিলেন, মওলানা, কাশ্মীর দিয়ে কী হবে, তোমরা পাকিস্তান চেয়ে ভুল করেছ।

মওলানা সাহেবের কাছে এই কথা শুনে ছাত্রনেতারা মওলানা ভাসানীকে জিজ্ঞাসা করেন, বেভান এ কথা বলার পর আপনি কী বললেন? মওলানা সাহেব নাকি জবাবে বলেছিলেন, আমার কী বলার আছে। বেভান ঠিকই তো বলেছে।

মওলানা সাহেবের কথায় ছাত্রনেতারা ক্ষুব্ধ হয়। তারা ঢাকায় এসে প্রচার শুরু করে যে, মওলানা ভাসানী পাকিস্তান বিদ্বেষী, ভারতীয় এজেন্ট। সুতরাং

www.nagorikpathagar.com

তাঁর বিরুদ্ধে সভা সমাবেশের সিদ্ধান্ত হয়। মওলানা সাহেব তখন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি।

বারী সাহেব বললেন, কাল আমতলার সমাবেশে মারামারি হবে। পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর অবস্থান দুই মেরুতে। তাই মওলানা ভাসানীকে হেনস্তা করা প্রয়োজন। নইলে এই তুচ্ছ ঘটনার জন্যে মওলানা সাহেবের কথিত উক্তির প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশ ডাকার কোনো কারণ ছিল না।

আমার কাছে ঘটনাটি স্পষ্ট হয়ে এল। বুঝতে কষ্ট হলো না যে, ছাত্রলীগের শহীদ সোহরাওয়ার্দী পন্থীরাই এ কাজটি করেছে। সংঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু আমি কী করবো। ছাত্রলীগ প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। আর সপ্তাহখানেক ধরে জ্বরে ভুগছি। আমাকে দেখার আমি ব্যতীত কেউ নেই। ইতোমধ্যে আমাকে শুনতে হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি এবং পরবর্তীকালে ন্যাপ নেতাদের হস্তক্ষেপে আমি ছাত্রলীগের সম্পাদক হতে পারিনি। তাঁদের বক্তব্য, নির্মল সেন হিন্দু। তাই দেশের সবচে' বড় ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নেতা হিন্দু হলে কাশ্মীর এবং অন্যান্য প্রশ্নে নাকি অসুবিধা হবে। এ যুক্তি দিয়েছিলেন তৎকালীন আওয়ামী লীগের ভেতরের এবং বাইরের বামপন্থী নেতারা। ডানপন্থীরা নন। এবার আবার সেই ডানপন্থী-বামপন্থীদের সংঘর্ষের মোকাবেলায় আমাকে নামতে হবে। তাই জ্বর নিয়ে একটি আলোয়ান গায়ে দিয়ে হাজির হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়। তখনো সমাবেশ শুরু হবার অনেক দেরি। মনে হলো 'দু'পক্ষের কাছে আমিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি।

আমতলায় পৌঁছে ছাত্রলীগের কোনো বড় নেতার সাক্ষাৎ পেলাম না। দেখা হলো সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের ভিপি সামসুল হক, ফজলুল হক হলের ভিপি আব্দুল মতিন ও ইকবাল হলের ভিপি দেওয়ান সফিউল আলমের সঙ্গে। দেওয়ান সফিউল কুমিল্লা কলেজে পড়বার সময় আমাদের দল আরএসপি'র সংস্পর্শে এসেছিল। এদের সকলের সঙ্গে কথা বললাম। স্থির হলো কোনো উস্কানিমূলক বক্তব্য নয়। কাশ্মীরের দাবিতে যাদের যা খুশি বলতে পারে।

ঘণ্টাখানেক পর সমাবেশ শুরু হলো। লক্ষ করলাম মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের অনেকে ছাত্র সমাবেশে এসেছে। মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রলীগ বরাবর দুর্বল। সভার শুরুতে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন সামসুল হক। বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি কারো নাম উল্লেখ না করে বললেন, পাকিস্তানে কোনো মীর জাফরকে সহ্য করা হবে না। সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র কালিদাস

www.nagorikpathagar.com

বৈদ্য স্লোগান দিলেন—মওলানা ভাসানী জিন্দাবাদ। প্রতিপক্ষ স্লোগান দিলো—শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ—হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। সেকালে মারামারিতে বোমা-রাইফেল, পিস্তল ছিল না। তাই সংঘর্ষ হাতাহাতিতে সীমাবদ্ধ থাকল। দীর্ঘক্ষণ সংঘর্ষ চলার পর দোতলা থেকে অর্থনীতি বিভাগের ড. নূরুল হুদা ও ইংরেজির টার্নার নিচে নেমে এলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে সবাই শান্ত হয়ে গেল।

সে সময়ের একটি ঘটনা আজও মনে পড়ছে। ছাত্রলীগের সদস্যরা ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যদের ভারতীয় দালাল মনে করত। তাই ওই দিন ছাত্রলীগের এক সদস্য ছাত্র ইউনিয়নের এক সদস্যকে কান ধরে বলতে বাধ্য করছিল—কাশ্মীর পাকিস্তানে চাই। দৃশ্যত সংঘর্ষে ছাত্রলীগ জিতেছিল। বিকেলের দিকে আমতলায় দাঁড়িয়ে ছিল বাংলার ছাত্র সুনীল মুখোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)। আমি তখন ক্লান্ত। আলোয়ান ছিঁড়ে গেছে সংঘর্ষ ঠেকাতে। সুনীল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—এরপর কী হবে বলুন? তিনি হেসে বললেন, আমতলায় কোনোদিন সিরাজদ্দৌলা জিততে পারে না। এরপর ছাত্রলীগে ফেরার কথা আর ভাবতে পারছিলাম না।

এরপর আর এক বিপদ এগিয়ে এল আমার জন্যে। পূর্ব পাকিস্তানে তখন আওয়ামী কংগ্রেসে কোয়ালিশন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান এবং অর্থমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সিদ্ধান্ত নতুন গোলযোগের সূত্রপাত করে।

১৯১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি হল ছিল। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল), জগন্নাথ হল এবং ছাত্রলীগের জন্যে চামেলী হল (বর্তমানে রোকেয়া হল)। সলিমুল্লাহ হল ও ফজলুল হক হল মুসলমান ছাত্রদের জন্যে। জগন্নাথ হল হিন্দু ছাত্রদের জন্যে এবং ঢাকা হল ছিল সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্যে নির্দিষ্ট। তবে ঢাকা হলে কোনোদিন মুসলিম ছাত্র ভর্তি না থাকায় (শুধুমাত্র ড. শহীদুল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ শফিউল্লাহ কিছুদিনের জন্যে এ হলের ছাত্র হয়ে সলিমুল্লাহ হলে চলে যায়) ঢাকা হল শেষ পর্যন্ত অমুসলমান ছাত্রদের হলে পরিণত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর হিন্দু ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পায়—এ সময় পাকিস্তান সরকার জগন্নাথ হলের উত্তরের বাড়িতে পোস্টমাস্টার জেনারেলের অফিস স্থাপন করে। দক্ষিণ বাড়িতে স্থাপিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার অফিস—জগন্নাথ হল মিলনায়তন পরিণত হয় পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে।

www.nagorikpathagar.com

জগন্নাথ হলের হিন্দু ছাত্রদের পাঠানো হয় ঢাকা হলে। ঢাকা হল পরিণত হয় ঢাকা জগন্নাথ হলে। অমুসলমান ছাত্রসংখ্যা আরো হ্রাস পেলে ঢাকা হলের পূর্বের এলাকা দিয়ে দেয়া হলো ফজলুল হক হলকে। ফলে তখন নাম হয় ফজলুল হক হল এক্সটেনশন।

১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন যে জগন্নাথ হলকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে শুধুমাত্র উত্তর বাড়ি নিয়ে। দক্ষিণ বাড়িতে রেজিস্ট্রার অফিস থাকবে। তবে নতুন রেজিস্ট্রার ভবন নির্মিত হলে ঐ বাড়িও ছেড়ে দেয়া হবে। ঢাকা হলকে মুসলিম হলে পরিণত করা হবে। জগন্নাথ হলকে অমুসলমান ছাত্রদের ছাত্রাবাসে পরিণত করা হবে। ঢাকা হল মুসলিম হলে আর অমুসলমান ছাত্রদের চলে যেতে হবে জগন্নাথ হলে।

ঢাকা হলের ছাত্ররা এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. জেনকিনস। ঢাকা হলের একদল প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি জানালেন, তিনি নিজে খ্রিস্টান, তিনি সংখ্যালঘু ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধা জানেন। তাঁর ধারণা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু ছাত্রদের সংখ্যা আর বৃদ্ধি পাবে না। অথচ মুসলিম ছাত্র সংখ্যা বাড়ছে—তাই অমুসলিম ছাত্রদের জগন্নাথ হলে যাওয়া উচিত। এ সময় গেলে তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। এ সিদ্ধান্তে রাজি হলে তারা অনেক ভালো করবে। ঢাকা হলের ছাত্রদের বক্তব্য হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কোনো পরিবর্তন আনতে হয়, তাহলে সম্প্রদায় ভিত্তিতে আনা চলবে না। সকল হল সকল সম্প্রদায়ের জন্যে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। কোনো সম্প্রদায়ের জন্যে বিশেষ হল থাকতে পারে না। সকল হল হবে কসমোপলিটন। এ দাবি না মানা হলে ঢাকা হল যেমন আছে তেমন থাকবে। ড. জেনকিনস একমত হলেন না। তবে চলে যাবার পূর্বে ঢাকা হলকে মুসলিম হল করার পরিবর্তে কসমোপলিটন হল করার সিদ্ধান্ত দিয়ে গেলেন। তবে জগন্নাথ হল অমুসলমান ছাত্রদের হলে পরিণত করার সিদ্ধান্ত বহাল থাকল।

ড. জেনকিনস চলে যাবার পর ভাইস চ্যান্সেলর হলেন। বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম। ইব্রাহিম সাহেবের সঙ্গে তৎকালীন রেজিস্ট্রার হাদি তালুকদারের সুসম্পর্ক ছিল না। আমরা ইতিমধ্যে হল সম্পর্কে ইব্রাহিম সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, ঢাকা হলের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করেই পরবর্তীকালে সকল সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। কিন্তু ইব্রাহিম সাহেব চিকিৎসার জন্যে লন্ডন গেলে রেজিস্ট্রার হাদি তালুকদার এক

www.nagorikpathagar.com

অদ্ভুত নির্দেশ জারি করলেন ঢাকা হলের ছাত্রদের ওপর। যতদূর মনে আছে জুন মাসের শেষের দিকে এক নির্দেশ জারি করে বললেন, ঢাকা হলের সকল হিন্দু ছাত্রদের ১ জুলাইয়ের মধ্যে জগন্নাথ হলে চলে যেতে হবে। ঢাকা হল কসমোপলিটন হল। এ হলে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রদের থাকবার অধিকার আছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনো ক্ষমতা নেই কাউকে নির্দেশ দিয়ে হল থেকে তাড়াবার। দ্বিতীয়ত জগন্নাথ হল তখন বাসযোগ্য ছিল না। দীর্ঘদিন পিএমজি থাকায় কোনো মেরামত হয়নি। পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, জল নেই, ক্যান্টিন নেই, কমনরুম নেই, প্রভোস্ট অফিস নেই। একটি ছাত্রাবাসের জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু নেই। একমাত্র লোভনীয় হচ্ছে প্রতিজন ছাত্রের জন্যে এক আসনের একটি কক্ষ। সর্বশেষ কথা হচ্ছে—ভাইস চ্যান্সেলর কথা দিয়েছিলেন, আলোচনার মাধ্যমেই সকল সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু সবকিছুই হলো একতরফা। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, কেউই ঐ তারিখে ঢাকা হল ত্যাগ করব না।

আমরা সিদ্ধান্তে অটল থাকলাম। ভাইস চ্যান্সেলর ফিরে এলেন। তিনি বললেন, সকলকে জগন্নাথ হলে যেতে হবে না, যাদের খুশি তারা যাবে। আমরা বললাম, তাও হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলকে ঢাকা হলের মতো কসমোপলিটন হল করতে হবে। আমরা সকল হলে থাকব। নইলে যে কোনোদিন যে কোনো হল থেকে আমাদের তাড়ানো হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের কথা মানলেন না। মাঝখানে একদিন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য অগ্নিযুগের অন্যতম বিপ্লবী রাজশাহীর প্রভাস লাহিড়ী আমাকে ডাকলেন। বললেন, তুমি নাকি ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার এসএন মিত্রের সঙ্গে দেখা করেছ। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান এ অভিযোগ করেছেন। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। আমি ভারতীয় হাইকমিশনের কাউকে চিনতাম না। শুধু জানতাম আমার সম্পর্কে তাঁদের ধারণা অনুকূল নয়। পরদিন ভোরে ইত্তেফাকে এ সম্পর্কে রাজনৈতিক মঞ্চে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার লিস্ট বের হলো। তিনি সরাসরি লিখলেন—একজন সংখ্যালঘু বিপ্লবী ছাত্রনেতা ঢাকা হল-জগন্নাথ হল নিয়ে ভারতীয় কূটনীতিকের সঙ্গে আলোচনা করেছে। তারপর যা লিখবার সবই লেখা হয়েছিল ইত্তেফাকের পাতায়। শুধুমাত্র আমার প্রতিবাদ পত্রটি ছাপা হয়নি।

এভাবে চারিদিকে প্রচারণা করে ঢাকা হলের ছাত্রদের চরমপথ গ্রহণে বাধ্য করা হলো। এসময় অনশন ধর্মঘট করতে বাধ্য হলাম। সিদ্ধান্ত হলো প্রথম দিন ছ'জন ছাত্র অনশনে যাবে। এরা দুর্বল হলে তরল জাতীয় কিছু গ্রহণ

www.nagorikpathagar.com

করবে। দ্বিতীয় দিন আমি অনশনে যোগ দেব। আমার অনশন হবে একান্তই কোনো কিছু না খেয়ে।

এ ধরনের অনশন করার অভ্যাস আমার হয়েছিল জেলখানায়। ১৯৪৮-৪৯-৫০ সালে ঢাকা জেলে চারবার অনশন করেছিলাম। ৬ দিন, ২৪ দিন, ৪০ দিন এবং ৫০ দিন। অনশনের ফলে অসুস্থ হয়েছিলাম, যে অসুখের ঐতিহ্য বহন করে জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। তাই ১৯৫৭ সালে অনশনে যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। আর আমাকে বারণ করারও কেউ ছিল না। ১৯৪৮ সালে মা পশ্চিমবঙ্গে চলে গেলেন। গোপালগঞ্জের গ্রামে বাবা আছেন। দু'কাকা আছেন টুঙ্গিপাড়ায়। জেলে থাকতে থাকতে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর। আর তাঁরা কোনোদিনই আমার কোনো সিদ্ধান্তে বাধা দেননি।

প্রথমদিকে ৬ জন ছাত্র অনশন শুরু করে। দ্বিতীয় দিনে আমাকে নিয়ে ৭ জন। চারদিকে একটি থমথমে ভাব। ঢাকা হলের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে ভয় পাচ্ছে। একটি দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সর্বত্রই যেন একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব। মনে হয় ঢাকা হলের সংখ্যালঘু ছাত্ররা একটা অন্যায় কাজ করছে। ঢাকা হলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান তিন সম্প্রদায়ের ছাত্র থাকলেও চিহ্নিত হচ্ছে হিন্দু হল বলে। সুতরাং হিন্দু হলের ছাত্রদের আন্দোলন নিশ্চয়ই হবে সাম্প্রদায়িক। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন একটি বিবৃতি দেয়া ছাড়া কোনো ছাত্র সংগঠনই আমাদের আন্দোলনের পক্ষে এগিয়ে আসেনি। তারা বিক্ষুব্ধ। কারণ আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায় এবং আমি ছাত্রলীগের সদস্য হয়েও ঐ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছি।

অনশনের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাবেলায় ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি ইব্রাহিম আমাদের দেখতে এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সকল হলের প্রভোস্ট। প্রভোস্টদের মধ্যে ছিলেন ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। তিনি ঢাকা হলের ভারপ্রাপ্ত প্রভোস্ট ছিলেন। নতুন পরিস্থিতিতে তিনি জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট নিযুক্ত হয়েছেন। নতুন পদ পেয়ে তিনি খুশি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বোঝাতে চাচ্ছিলেন, ঢাকা হল মুসলিম হল হয়ে যাক। জগন্নাথ হলকে অমুসলমানদের হল হিসেবে চালু করা হোক। একটু দেনদরবার করতে পারলে এ পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘু ছাত্ররা অনেক সুযোগ-সুবিধা পাবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু ছাত্রদের সংখ্যা আর বৃদ্ধি পাবে না। এবার সুযোগ হারালে সংখ্যালঘু ছাত্ররা আর কোনদিন সুযোগ-সুবিধা পাবে না। ড. গোবিন্দ দেবের মতে আমরা একমত হতে পারিনি। তিনি আমাদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে

www.nagorikpathagar.com

জগন্নাথ হলের দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তিনি তখন আমাদের কাছে ছিলেন অসহায়। তাই ভাইস চ্যান্সেলর আমাদের কক্ষে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, ড. গোবিন্দ দেব থাকলে আপনাদের সঙ্গে কোনো কথা হবে না। তাঁকে চলে যেতে হবে। তিনি অসম্মানিত হলে আমরা দায়ী থাকব না। ড. গোবিন্দ দেব হতচকিত হয়ে গেলেন এবং কক্ষ ছেড়ে বের হয়ে গেলেন।

ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে ছিলেন ঢাকা হলের নবনিযুক্ত প্রভোস্ট এম এন কিউ জুলফিকার আলি। বছর খানেক আগে তিনি ঢাকা হলে প্রভোস্ট হয়েছেন। কিন্তু আমরা তাঁকে কোনোদিন হলে ঢুকতে দিইনি। আমি বললাম, জুলফিকার আলি সাহেবকে আমরা হলের প্রভোস্ট মানি না। তিনিও কক্ষে থাকলে কোনো আলোচনা হবে না। তাঁকেও চলে যেতে হবে। তিনিও চলে গেলেন।

এবার আলোচনা শুরু হলো। বিচারপতি ইব্রাহিম বললেন, Best of the things will be done for the minority students. তাঁর কথাগুলো এখনও আমার কানে ভাসছে। তিনি বললেন, তোমরা অনশন করছ। আমরা তোমাদের সব দাবি মেনে নেব। তোমরা অনশন প্রত্যাহার করো। আলোচনায় আমাদের মধ্যে ছিলেন তৎকালীন ঢাকা জগন্নাথ হল সভাপতি তরুণ সেন। সাধারণ সম্পাদক শিশির দাস, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার এককালীন প্রধান দেবপ্রিয় বড়ুয়া এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. অজয় রায়।

বিচারপতি ইব্রাহিমকে আমি বললাম, স্যার, আমার একটি কথার জবাব দিতে হবে। ঢাকা হল কসমোপলিটন হল। এ হলে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রদের থাকার অধিকার আছে। আপনারা কোন যুক্তিতে এ হলের হিন্দু ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে জগন্নাথ হলে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন? আমি ঢাকা হলে থাকব কি-না সে সিদ্ধান্ত আমি নেব। আমার ওপর কোনো অধিকার আপনাদের নেই।

বিচারপতি ইব্রাহিম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। পরে বললেন, এ নির্দেশটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। এবার তোমরা যারা খুশি এখানে থাকবে এবং যারা খুশি জগন্নাথ হলে যাবে। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু বলার নেই। আমি প্রবাসে থাকাকালীন এ নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। এ নির্দেশ আর কার্যকর নয়। আমি বললাম, আমাদের মূল দাবি হচ্ছে ঢাকা হলের মতো সব হলকে কসমোপলিটন করতে হবে। সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে কোনো হল থাকতে

www.nagorikpathagar.com

পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্যে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে কোনো ছাত্রী নিবাস নেই। তাই ছাত্রদের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাই আমাদের দাবি স্ট্যাচুট পরিবর্তন করে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে মুসলিম শব্দটি তুলে দেয়া হোক। সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্যে এই হল দু'টির দুয়ার খুলে দেয়া হোক।

বিচারপতি ইব্রাহিম বললেন, কোনো হলের স্ট্যাচুট পরিবর্তন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এতে অনেক ঝামেলা হবে। আমি বললাম—স্যার আপনার কথা সত্য নয়। ইচ্ছা হলেই আপনারা স্ট্যাচুট পাল্টাতে পারেন। আপনারা জগন্নাথ হলের স্ট্যাচুট পাল্টিয়েছেন। স্ট্যাচুট অনুযায়ী জগন্নাথ হল শুধুমাত্র হিন্দু ছাত্রদের জন্যে সংরক্ষিত ছিল। স্ট্যাচুট পাল্টে আপনারা জগন্নাথ হলকে অমুসলমান হলে পরিণত করেছেন। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জগন্নাথ হলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান তিন সম্প্রদায়ের ছাত্ররাই থাকতে পারবে। তাই জগন্নাথ হলের স্ট্যাচুট পাল্টানো গেলে সলিমুল্লাহ হল ও ফজলুল হক হলের স্ট্যাচুট কেন পাল্টানো যাবে না?

ইব্রাহিম সাহেব চুপ করে গেলেন। বললেন, তুমি এত কথা জানলে কী করে। বললাম, স্যার, আপনাদের লাল বইটা দেখেছি। আপনাদের লাল বই আমাদের দেখা নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাদেরও উপায় ছিল না। তাছাড়া আমাদের ভিন্ন যুক্তি আছে ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) সম্পর্কে। পাকিস্তানের সংবিধানে আছে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি সাহায্য পেলে সেই প্রতিষ্ঠানে কোনো সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীকে প্রবেশে বাধা দেয়া যাবে না। সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীকে থাকবার এবং পড়বার সুযোগ দিতে হবে। ইকবাল হলে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ১২ লাখ টাকা সাহায্য দিয়েছে। তাই ইকবাল হলের দুয়ার আমাদের জন্যে খুলে দিতে হবে। এর পরেও কথা আছে। জগন্নাথ হল এখনও মানুষের বাসোপযোগী নয়। জগন্নাথ হল এ মুহূর্তে কতগুলো পায়রার খোপের সমষ্টি। ওই হলে ছাত্রদের যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

এরপরে আর আলোচনা জমল না। ভাইস চ্যান্সেলর নীরব হয়ে গেলেন। বিদায় নেবার পূর্বে আবার অনশন প্রত্যাহারের আবেদন জানালেন। অনশনের তৃতীয় দিনে অর্থমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর এলেন। তিনি খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করলেন। বললেন—ঠিক আছে অনশন যখন শুরু করেছেন চালিয়ে যান। দেখি কতদূর কী করা যায়। কিছুক্ষণ পর দেখা করতে এলেন আর একজন মন্ত্রী—কংগ্রেসের শরৎ মজুমদার। তিনিও সমর্থন জানিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ

www.nagorikpathagar.com

পরে এলেন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ফণীভূষণ মজুমদার। তাকে খুব চিন্তিত মনে হলো। তিনি বললেন, কী করবে? তোমার বাড়ি থেকে তোমার অবস্থা জানতে চেয়েছে। আমি বললাম, ভাববার কিছু নেই। বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করে দিন।

অনশনের চতুর্থ দিনে হাওয়া পরিবর্তন হতে শুরু হলো। আমাকে জানানো হলো ঢাকার আদিবাসীদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি ইব্রাহিমের সঙ্গে দেখা করেছে। তারা নাকি বলেছে দেশের হিন্দুরা তো এমনিতেই দেশ ছেড়ে চলে গেছে। বাকি আছে ঢাকা হলে শ'তিনেক ছাত্র। এদের সমস্যা তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হোক। এক বন্ধু এসে জানিয়ে গেল ঢাকা হলের অনশন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক যুগান্তরে সম্পাদকীয় বেরিয়েছে। বলা হয়েছে, এই অনশন নিয়ে অপ্রীতিকর কিছু ঘটলে পশ্চিমবাংলায় তার প্রতিক্রিয়া হবে। সন্ধ্যার দিকে সেকালের সমাজতন্ত্রী দলের নেতা অধ্যাপক পুলিন দে এলেন। তিনি বললেন—নারায়ণগঞ্জের হিন্দু ব্যবসায়ীরা একটি ভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁদের প্রস্তাব হচ্ছে—তাঁরা টাকা দিয়ে পুরো ঢাকা হল কিনে ফেলবে। হলটি হিন্দু ছাত্রদের জন্যেই থাকবে। অথবা হলের মাঝখানে একটি দেয়াল দেয়া হবে। পশ্চিম দিকে থাকবে অমুসলমান ছাত্ররা। পূর্ব দিকে থাকবে ফজলুল হক হল এক্সেটেনশন। যেমন আছে তেমন।

পুলিন বাবুর প্রস্তাবে আমি রাজি হলাম না। বললাম, সংগ্রাম আমাদেরই করতে দিন। কারো সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন নেই। আমি তখন বিব্রত বোধ করছিলাম চারদিক থেকে। চারিদিকে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ। ঢাকা হলের ছাত্ররা ক্লাসে যাচ্ছে না। শুনেছি মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানের বাসভবনে ছাত্রলীগ নেতাদের বৈঠক হয়েছে। সে বৈঠকের ফলাফল একান্তই আমাদের বিপক্ষে। আমি কাউকে কিছু বলতে পারছিলাম না। ভয় পাচ্ছিলাম। আমার কথা শুনলেই সবাই আরো ভয় পেয়ে যাবে। সকলের মন ভেঙে যাবে। আমার এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা প্রচার করছে নির্মল সেনও সাম্প্রদায়িক হয়ে গেছে। সেও হিন্দু ছাত্রদের জন্য অনশন শুরু করেছে। বড় বড় কথা বললেও নির্মল সেনও শেষ পর্যন্ত হিন্দু।

এ পরিস্থিতি আমাকে বারবার মোকাবেলা করতে হয়েছে। আমি যখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্যে সংগ্রাম করেছি তখন এ প্রশ্ন ওঠেনি। আমি ন্যাশনাল মেডিক্যাল ছাত্রদের জন্যে সংগ্রাম করেছি। তৎকালীন এলএমএফ ছাত্রদের দাবির সমর্থনে অনশন করতে ময়মনসিংহ গিয়েছি। রাজশাহীতে

www.nagorikpathagar.com

গিয়েছি। তখনও প্রশ্ন ওঠেনি। আমার অসুবিধা ছিল আমাদের দল আরএসপি'র এককালে পূর্ব পাকিস্তানে বড় সংগঠন থাকলেও দেশ বিভাগের পরে প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। ছাত্রফ্রন্টে আমার সহযোগি ছিল ছাত্রলীগ। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে তারা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। ছাত্র ইউনিয়ন কথাবার্তায়, চলনে-বলনে অসাম্প্রদায়িক হলেও সামনাসামনি প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে অবস্থান নিতে পারত না। তাদের ছিল নিদারুণ দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব। তাই তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শাহ্ আলি আব্বাস আমাকে প্রতিদিন এসে খবর দিলেও প্রকাশ্যে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি ছাত্র ইউনিয়ন। ফলে সে সময় আমাকে বড্ড নিঃসঙ্গ মনে হতো। বলার মতো একটি মানুষ আমি খুঁজে পাইনি। এর মধ্যে অনশনের ৫ম দিনে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। পদাধিকার বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। অনশনের ৫ম দিনে তিনি আমাদের দেখতে এলেন। শেরেবাংলা ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী। তাই কথায় কথায় বলতেন—আমি তোমাদের সব দাবি মেনে নিচ্ছি। তোমরা অনশন বন্ধ করো। শেরেবাংলার সঙ্গে তখন অসংখ্য লোক ঢাকা হলে। লোকে লোকারণ্য। আমি শেরেবাংলাকে বললাম, আমি আপনাকে শৈশব থেকে চিনি। শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বিশ্বাস করি না। আমি জানি একথা আপনি রাখতে পারবেন না। আমার কথায় সবাই যেন চমকে উঠলেন। কেউ কোনো কথা বললেন না। শেরেবাংলা সদলবলে ঢাকা হল থেকে সলিমুল্লাহ হলে চলে গেলেন। পরে শুনলাম তিনি সলিমুল্লাহ হলে এক ছাত্রসভা করেছেন। আমার আচরণের কথা বলেছেন। ছাত্ররা নাকি বলেছে—সলিমুল্লাহ হলের স্ট্যাচুট পরিবর্তন হবে একমাত্র রক্তের বিনিময়ে। অর্থাৎ অবস্থা আরো ঘোলাটে হয়ে উঠল।

সন্ধ্যার সময় ভাইস চ্যান্সেলর অফিস থেকে এক ভদ্রলোক এসে আরেক খবর দিয়ে গেলেন। খবরটি হচ্ছে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারেরা নাকি রিপোর্ট দিয়েছে আমার শরীর ভেঙে যাচ্ছে। তাই ভাইস চ্যান্সেলর একাডেমিক কাউন্সিলের সভা ডেকেছিলেন। একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যরা নাকি একবাক্যে বলেছেন, তাঁদের করার কিছু নেই। আর আমার সম্পর্কে বলেছেন—Let him die peacefully. এ খবর কতটুকু সত্য আমি কোনোদিন যাচাই করার চেষ্টা করিনি। তবে আমাকে নিয়ে যে ইব্রাহিম সাহেব চিন্তিত ছিলেন তা আমি বিশ্বাস করি। তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিন ধরে।

www.nagorikpathagar.com

অনশনের ৬ষ্ঠ দিনে তেমন কিছু ঘটল না। চারিদিকে চুপচাপ। মনোরঞ্জন বাবু ও শরৎ বাবু এসে আমাদের দেখে গেলেন। কোনো মহলে কোনো উচ্চবাক্য নেই। অনশনের ৭ম দিনের সন্ধ্যাবেলা দলবল নিয়ে উপস্থিত হলেন বিচারপতি ইব্রাহিম। তাঁর কাছে নাকি খবর গেছে আমার অবস্থা ভালো নয়। চিকিৎসকরা আমার দায়িত্ব নিতে রাজি নন। কক্ষে ঢুকেই ভাইস চ্যান্সেলর বললেন, নির্মল, বলো তো আমি কে? আমি বললাম, আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ভাইস চ্যান্সেলর মোহাম্মদ ইব্রাহিম। তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে শ্রদ্ধা করো? আমি বললাম, করি। বিচারপতি ইব্রাহিম বললেন, তাহলে আমার নির্দেশ, আজকে তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না। আমি বললাম, তা হতে পারে না।

ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম আঁটঘাট বেঁধেই এসেছিলেন। তিনি শুনেছিলেন আমার অবস্থা খারাপ। ডাক্তাররা কোনো দায়িত্ব নেবে না। আমার হাসি পাচ্ছিল। কারণ ৭ দিনের অনশনে আমার কিছুই হয় না। ১৯৪৯ সালে ঢাকা জেলে শুধু জল খেয়ে ১১ দিন ছিলাম। অনশন আমার কোনোদিনই কষ্টকর মনে হয়নি। মনোবল থাকলে অনশনে কিছুই হয় না। তাই ডাক্তারের রিপোর্ট সত্ত্বেও আমি আদৌ শঙ্কিত ছিলাম না। ভাইস চ্যান্সেলর ইব্রাহিম বললেন, নির্মল, আমি ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নির্দেশ দিচ্ছি আজ তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না। তুমি অসুস্থ। আমি বললাম, আপনার নির্দেশ আমাদের স্বার্থের বাইরে যাচ্ছে। আমাকে কথা বলতে হবেই। আমার কথার প্রতিবাদ করলেন সকল প্রভোস্ট একযোগে। তাঁরা বললেন, তুমি বলছো তুমি ভাইস চ্যান্সেলরকে সম্মান করো। তাই তার নির্দেশ তোমাকে মানতে হবে। নইলে ভাইস চ্যান্সেলরকে অসম্মান করা হবে। আমার ঢাকা হলের বন্ধুরা আমাকে চুপ থাকতে বলল। এবার কথা শুরু করলেন ভাইস চ্যান্সেলর মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

ভাইস চ্যান্সেলর বললেন, সেই আগের একই কথা—সংখ্যালঘু ছাত্রদের জন্যে সবকিছু করা হবে। তোমরা অনশন প্রত্যাহার করো। আমি বললাম, এমন কথায় কিছু হবে না। ভাইস চ্যান্সেলর আমাকে আবার চুপ থাকার কথা বললেন। তিনি বললেন, তোমাদের সকলকে জগন্নাথ হলে যেতে হবে না। যাদের খুশি তারা জগন্নাথ হলে যাবে। যারা ঢাকা হলে থাকতে চায় তারা ঢাকা হলেই থাকবে। জগন্নাথ হল সংস্কার করা হবে। জল, আলো, ক্যান্টিন কমনরুমের ব্যবস্থা করা হবে। আমি কথা দিচ্ছি, আমি ভাইস চ্যান্সেলর

www.nagorikpathagar.com

থাকলে ইকবাল হল কসমোপলিটন হল হবে। জগন্নাথ হলের রেজিস্ট্রার অফিস ও মিলনায়তন তোমরা একদিন পাবে।

আমি লক্ষ করলাম, আমাদের ঢাকা হলের ছাত্র বন্ধুরা অনেক নমনীয়। তারা অনশন অব্যাহত রাখতে সাহস পাচ্ছিল না। সকলেই অনশন ভাঙতে নিমরাজি। ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে সকল হলের প্রভোস্টরা প্রতিশ্রুতি দেয়ায় অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হলো। আমি কিছুই করলাম না। ভাইস চ্যান্সেলর বললেন, তুই কাল সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে যাবি। আমি বললাম, আমার সময় হবে না। আমি আগামীকাল কুমিল্লা যাবো। কুমিল্লায় আমার দলের বৈঠক আছে। অনশন প্রত্যাহারের পর অর্থমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর এলেন। তিনি অনশন প্রত্যাহারের কথা জানতেন না। বললেন, এত তাড়াতাড়ি অনশন প্রত্যাহার করলেন কেন? আমরা তো আলোচনা শুরু করেছিলাম। আমার কথার কিছু ছিল না। আমি পরের দিন ঐ শরীর নিয়েই ট্রেনে কুমিল্লা চলে গেলাম। দু'দিন পরে ঢাকা ফিরলাম।

ঢাকা এসে দেখি পরিস্থিতি ভিন্ন মোড় নিয়েছে। ঢাকা হলের ছাত্ররা এক নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, জগন্নাথ হলকে সংখ্যালঘু হল হিসেবে ঘোষণা করা হোক। ঐ হলটিতে শুধুমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্ররাই থাকবে। তাদের আশঙ্কা হচ্ছে—জগন্নাথ হল অমুসলমান কসমোপলিটন থাকলে একদিন ভবিষ্যতে আবার হয়তো নতুন দাবি উঠবে। মুসলমান ছাত্ররা বলবে ঐ হলকে কসমোপলিটন করা হোক। সকল ছাত্রকে ঐ হলে থাকতে দিতে হবে।

আমি বললাম, এ সিদ্ধান্তে আমি একমত নই। কোনো সংখ্যালঘু হল করা যাবে না। আমাদের মূল দাবি ছিল সকল হলকে কসমোপলিটন করা। আবার এখন আমরা দাবি করছি জগন্নাথ হলকে সংখ্যালঘু হল করার। এ দাবি মূল দাবির সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমার সকল বন্ধু খুশি না হলেও আমার প্রস্তাব সবাই মেনে নিল।

সন্ধ্যার দিকে ভাইস চ্যান্সেলর আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি একটি নতুন প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, নির্মল, তোর সেদিনের কথায় আমি বিবেকের দংশন অনুভব করেছি। আমরা জগন্নাথ হলের স্ট্যাচুট পরিবর্তন করেছি। অথচ এসএম হলের স্ট্যাচুট পরির্বন করতে পারছি না। এই বৈপরীত্য চলতে পারে না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি জগন্নাথ হলের স্ট্যাচুট আবার পাল্টে দেব। জগন্নাথ হল আবার হিন্দু ছাত্রদের হল হবে। আমি বললাম, স্যার, এ প্রস্তাব আমি মানব না। আমরা সকল হলকে কসমোপলিটন করার কথা

www.nagorikpathagar.com

বলেছি। জগন্নাথ হলকে নতুন করে হিন্দু হল বানাতে চাই না। তিনি বললেন, নির্মল তুই বুঝবার চেষ্টা কর। এদেশে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যা কোনোদিন বৃদ্ধি পাবে না। জগন্নাথ হলের সিট খালি থাকবে। মুসলমান ছাত্ররা দাবি তুলবে আমরা ঐ সিটে থাকব। একদিন দেখবি এসএম হলের ছাত্ররা জগন্নাথ হল দখল নিয়ে গেছে। ওরা বলবে, শুধুমাত্র অমুসলমান ছাত্রদের জন্যে নয়, সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্যে জগন্নাথ হলের দুয়ার মুক্ত থাক। বিচারপতি ইব্রাহিম জোর দিয়ে বললেন—আমি এ পথ বন্ধ করে দিয়ে যেতে চাই। তুই রাজি হয়ে যা। আমি বললাম, কিছুতেই রাজি হব না। এবার তিনি আমাকে সরাসরি একটা প্রশ্ন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তুই কি পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু ছাত্রদের প্রতিনিধি? আমি বললাম না। আমি শুধু ঢাকা হলের ছাত্রদের প্রতিনিধি।

বিচারপতি ইব্রাহিম এরপর তেমন কোনো কথা বললেন না। শুধু বললেন, ঠিকমতো তোর কথা ভেবে দেখব। বললেন, তোর একটা কাজ আছে। আগামীকাল ভোরে ঢাকা হলের প্রতিনিধিরা জগন্নাথ হলে যাবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলীরা থাকবে। সব মাপজোক করবে। কক্ষগুলোতে বাতাস ঢুকবার জন্যে দেয়াল কেটে ঘুলঘুলি করা হবে। কোথায় কমনরুম ক্যান্টিন হবে তাও ঠিক করা হবে। আমি বললাম, দক্ষিণের রেজিস্ট্রি অফিস ও এসেম্বলি অফিস কী হবে। তিনি বললেন, কালক্রমে হলগুলো তোরা পেয়ে যাবি।

পরদিন সবাই মিলে জগন্নাথ হলে গেলাম। প্রকৌশলীরা এলেন। সব মাপজোক শুরু হলো। জগন্নাথ হলে খাওয়া আর ঢাকা হলে থাকার পালা। এ ব্যাপারে ভাগাভাগি হয়ে গেল। আমরা ৭০ থেকে ৭৫ জন ছাত্র ঢাকা হলে থেকে গেলাম। বাদ বাকি সকলেই চলে গেল জগন্নাথ হলে। এ ব্যাপারেও কৌশল গ্রহণ করলো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নতুন যারা ভর্তি হতে এসেছিল সেই সংখ্যালঘু ছাত্রদের ঢাকা হলে ভর্তির ফরম দেয়া হলো না। প্রায় সকলকেই বাধ্য করা হলো জগন্নাথ হল থেকে ভর্তির ফরম কিনতে।

সেদিন আমার এবং আমাদের এ সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল কিনা এ নিয়ে পরবর্তীকালে প্রশ্ন উঠেছিল। জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের প্রথম অভিষেক অনুষ্ঠানে আমি তিরস্কৃত হয়েছিলাম বিপ্লবী ছাত্রনেতা বলে। বলা হয়েছিল আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেছিলাম। আমি ভিন্ন অবস্থান নিলে সংখ্যালঘু ছাত্ররা অনেক কিছু পেত। আমার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জগন্নাথ হলের একটি বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছিলেন

www.nagorikpathagar.com

হলের প্রভোস্ট ড. গোবিন্দ দেব। প্রধান অতিথি ছিলেন সামরিক শাসনের ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি হামিদুর রহমান। আমি তখন ঢাকা হলের ছাত্র। এই বিচারপতি হামিদুর রহমানের আমলেই আমাকে ২৪ ঘণ্টার নোটিসে ঢাকা হল ছাড়তে বলা হয়েছিল। আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল কলাভবনে। অজুহাত, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র সুতরাং আমাকে কার্জন হলের চৌহদ্দিতেই থাকতে হবে। এভাবে জগন্নাথ হলের ইতিহাসের প্রথম পর্ব শেষ হলো। পরবর্তীকালে ঢাকা হলে অমুসলমান ছাত্রদের জন্যে দিনগুলো ছিল নিদারুন দুঃখজনক। সে কাহিনী পরে বলছি।

ইতোমধ্যে আওয়ামী লীগে নতুন সঙ্কট দেখা দিল পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সকল ধরনের সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে। প্রথম থেকে আওয়ামী লীগ বাগদাদ চুক্তি ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার চুক্তির (সিটো) বিরোধী। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতানৈক্য ছিল। তবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবার পূর্বে এ নিয়ে সংকট দেখা দেয়নি। সংকট দেখা দিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবার পর।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সুয়েজনীতি সকল মহলে তীব্রভাবে সমালোচিত হলো। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এসে ১৯৫৬ সালের ৯ ডিসেম্বর সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে এক ভাষণ দিলেন। তিনি প্রকাশ্যেই সামরিক চুক্তির সমর্থন করলেন। এ পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করলেন। কাউন্সিল পূর্ববর্তী ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসল ৬ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করা গেল, এই কমিটির বৈঠকে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে একটি অভিনব প্রস্তাব গৃহীত হলো। প্রস্তাবে বলা হলো কাউন্সিলে সামরিক চুক্তি সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না। প্রস্তাবের পক্ষে ৩৫ ভোট এবং বিপক্ষে ১ ভোট পড়লো। এই ভোটটি দিয়েছিলেন অলি আহাদ, যিনি পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

তবুও গণ্ডগোল দেখা দিল পরবর্তী সময়ে কাগমারীতে আফ্রো-এশিয়া সাংস্কৃতিক সম্মেলন নিয়ে। আফ্রো-এশিয়া সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন মওলানা ভাসানী।

এই সম্মেলনে তিনি ভারত এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এবং সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তখন কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত ও

www.nagorikpathagar.com

পাকিস্তানের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছে। আর তখনই কাগমারী সম্মেলনে এসেছিলেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওয়াদুদ, সুফিয়া ওয়াদিয়া, পরোধ স্যানাল, রাধা রাণী দেবী প্রমুখ। কাগমারী সম্মেলন উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম, আব্রাহাম লিংকন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, তিতুমীর, হাকিম আজমল খান, লেনিন, শেক্সপিয়রসহ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নামে তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল।

এই তোরণ নির্মাণের ফলে মওলানা ভাসানীকে ভারতীয় এজেন্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়। মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে দৈনিক ইত্তেফাক বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করে। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগে ভাঙন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় ছিল যে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করলেও ওয়ার্কিং কমিটিতে সে প্রস্তাব কোনোদিনও গৃহীত হতো না। মওলানা ভাসানী সামরিক চুক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিতেন। কিন্তু বৈঠকে কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হতো না। অধিকাংশ সভায় তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে নিজের ভাষণের পর বৈঠক ত্যাগ করতেন। ফলে তার সমর্থকরা কোনোদিনই বৈঠকে এ ধরনের প্রস্তাব মানতেই সাহস পেতেন না। শেষ পর্যন্ত শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবুর রহমান যে ধরনের প্রস্তাব চাইতেন সে ধরনের প্রস্তাবই গৃহীত হতো। এবারও কাগমারী সম্মেলনে তাই ঘটল। আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব গৃহীত হলো না। কোন্দল চূড়ান্ত রূপ নিলো আফ্রো-এশিয়া সাংস্কৃতিক সম্মেলন নিয়ে। কাগমারী সম্মেলনের পর মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালের ১৬ মার্চ লিখিতভাবে পদত্যাগ করলেন।

আওয়ামী লীগ থেকে মওলানা ভাসানীর পদতাগপত্র দেবার পর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ একশ্রেণির আওয়ামী লীগ নেতার ধারণা হলো যে এর পেছনে আওয়ামী লীগের একশ্রেণির অনুপ্রবেশকারী বামপন্থী নেতারা দায়ী। এঁদের অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আছে এবং এদের নেতৃত্ব করছেন সংগঠনের সম্পাদক অলি আহাদ। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল ৩০ মার্চ। অলি আহাদের বিরুদ্ধে সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হলো। প্রথম বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান। এ অধিবেশনে অলি আহাদ পাল্টা অভিযোগ আনেন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না করার জন্যে। পরে বৈঠক মুলতুবি হয়ে যায়। বিকালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মনসুর আহমেদ। তিনি

www.nagorikpathagar.com

নিজে প্রস্তাব উত্থাপন করে অলি আহাদকে বরখাস্ত করেন। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আব্দুস সামাদ আজাদসহ ৯ জন সদস্য পদত্যাগ করেন। উপস্থিত ৩০ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন।

মওলানা ভাসানী তখন ফতুল্লা ঘাটে নৌকায় অবস্থান করছিলেন। অলি আহাদসহ বিক্ষুব্ধ সদস্যগণ মওলানা সাহেবের কাছে গিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডেকে সমস্যা মোকাবেলার আহ্বান জানান। মওলানা সাহেব তাতে রাজি হলেন না। তিনি ৩১ মার্চ রোববার নারায়ণগঞ্জে জনসভা করার নির্দেশ দেন। ১৮ ও ১৯ মে বগুড়ায় কৃষক সম্মেলন আহ্বান করেন। খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১ জুন থেকে ৭ জুন পর্যন্ত আত্মশুদ্ধির জন্যে অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নেন। মওলানা ভাসানী ১ জুন অনশন শুরু করলে ৩ জুন আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে। এবার তিন বছরের জন্যে অলি আহাদকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। পদত্যাগী ৯৯ জন সদস্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে নতুন ৯ জন কো-অপট করা হয়।

মওলানা সাহেব জানান, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আলোচনা হলেই তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের প্রশ্ন উঠতে পারে—এই পটভূমিতে ১৩ ও ১৪ জুন ঢাকার পিকচার প্যালেসে (পাকিস্তান সিনেমা হল) আওয়ামী লীগের কাউন্সিল আহ্বান করা হয়। কাউন্সিলের আলোচ্য বিষয় অলি আহাদকে বহিষ্কার, সামরিক চুক্তি, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, খাদ্যশস্য মূল্যবৃদ্ধি তথা মওলানা ভাসানীর অনশন।

এবারও সেই এক ঘটনা ঘটল। মওলানা সাহেব অধিবেশনের প্রথমে নিজস্ব বক্তব্য দিয়ে হল ত্যাগ করেন। সম্মেলনে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতিসহ সবকিছু গৃহীত হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের সদস্যরা মওলানা ভাসানীর সমর্থকদের ওপরে হামলা চালায়। মারামারির পর বরিশাল ছাত্রলীগের কতিপয় সদস্য ঢাকা হলে আমার কক্ষে আসে এবং বীরবিক্রমে তাদের ভূমিকা বর্ণনা করতে থাকে। আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, এবার আওয়ামী লীগ দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে। ১৪ জুন বিকালে পল্টন ময়দানে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তান শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেছে।

এরপর আমাদের পক্ষে ছাত্রলীগে থাকা আদৌ সম্ভব হলো না। আমি এনায়েত উল্লাহ খান, আহমেদ হুমায়ুন, নূরুল হক চৌধুরী (মেহেদী), আব্দুল হালিম, আনিসুর রহমান, জহিরুল ইসলামসহ ছ'টি জেলার ৬৮ জন নেতা ও

www.nagorikpathagar.com

কর্মী ছাত্রলীগ থেকে পদত্যাগ করি। ফরিদপুর এবং ময়মনসিংহ শাখা ছাত্রলীগ অবলুপ্ত হয়ে যায়।

এরপরে মওলানা ভাসানীর আওয়ামী লীগে থাকা আর সম্ভব ছিল না। তিনি ১৩ ও ১৬ জুন দু'দিনব্যাপী ঢাকায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক বৈঠক ডাকেন। এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় ২৫ ও ২৬ জুলাই ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ মওলানা ভাসানী এবার পাকিস্তানভিত্তিক নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেবেন। মওলানা ভাসানীর সিদ্ধান্ত সেদিন আমাকে কৌতূহলী করেছিল, বিস্মিত করেনি।

আমি লক্ষ্য করছিলাম, দেশে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হতে যাচ্ছে। এ দলের প্রধান বক্তব্য হবে—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অর্থাৎ পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ভাগ হচ্ছে। এমন ঘটনা পৃথিবীতে কমই ঘটেছে। এ কথা সত্য, সেকালের আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগ ভাঙনের বিরুদ্ধে ছিল—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তাদের অনুসৃত নীতি এই ভাঙনের অন্যতম কারণ ছিল।

পৃথিবীর দেশে দেশে রুশপন্থী কমিউনিস্ট পার্টিগুলো এ নীতি অনুসরণ করেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চরম বৈরী সম্পর্ক ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে। পাশ্চাত্য শিবিরের উভয় পক্ষই তখন নিজের প্রভাব বলয় বিস্তারে ব্যস্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বে তার প্রভাব বিস্তারের জন্যে আগ্রাসী অভিযান শুরু করেছিল। বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি স্লোগান দিচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ছিল কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর প্রধান কর্মসূচি। এই ঢাকার বুকে দেখা গেছে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব, ফস্টার ডালেস ঢাকা সফরে এলে তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছিল।

স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু শুধুমাত্র পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে একটি দল ভাঙা বা নতুন দল গড়া অনেকের কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নকে অন্ধভাবে অনুসরণের ফল। কারণ একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি সে দেশের অভ্যন্তরের অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হয়। শুধুমাত্র পররাষ্ট্রনীতি কোনো দেশের বা সরকারের প্রগতিশীলতার মাপকাঠি নয়। সেকালে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি তার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হয়েছিল। জন্মলগ্নেই ভারত কিছুটা শিল্পোন্নত ছিল। ভারতে প্রভাবশালী পুঁজিপতি ছিল। মার্কিন বা সোভিয়েত শিবিরে না গিয়ে মাঝখানে

www.nagorikpathagar.com

থেকে দরকষাকষি করাই ছিল তার পক্ষে লাভজনক। এই দরকষাকষির শক্তি পাকিস্তানের ছিল না। আবার পররাষ্ট্রনীতি জোটনিরপেক্ষ হলেই যে প্রগতিশীল হয় না, তার প্রমাণ মিসর। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে মিসর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে সমর্থন করেছে। আবার চরম নির্যাতন করেছে নিজের দেশের কমিউনিস্টদের। ভারত জোটনিরপেক্ষ হলেও চীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ডেকে এনেছে। সুতরাং জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করলেই কোনো সরকার বা দল প্রগতিশীল হবে এ কথা বলার অবকাশ নেই। তাই শুধু জোটনিরপেক্ষ নীতির ওপর ভিত্তি করে কোনো রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তা একান্তই অবৈজ্ঞানিক। কারণ প্রতিটি দল একটি শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। সেই শ্রেণির স্বার্থ ভিত্তি করেই দলের নীতি নির্ধারিত হয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে, ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অর্থাৎ ন্যাপ নামে যে সংগঠনটি মওলানা ভাসানী যাদের নিয়ে গঠন করলেন তাদের শ্রেণি চরিত্রের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাদের শ্রেণি চরিত্রের তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। ন্যাপে এসেছিলেন পাঞ্জাবের জননেতা মিঞা ইফতেখার উদ্দিন আহমদ, সিন্ধুর জিএম সৈয়দ, বেলুচিস্তানের আব্দুস সামাদ, সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফফার খান। শ্রেণি চরিত্রের দিক থেকে এদের মধ্যে অধিকাংশই সামন্তবাদী ধ্যানধারণারই মানুষ। ব্যক্তিগত জীবনেও এঁরা একান্তভাবেই জমিদার শ্রেণির অর্থাৎ মওলানা ভাসানী যে দলটি গড়েছিলেন সে দলটি আদৌ শ্রেণি চরিত্রের বিষয়ে আওয়ামী লীগ থেকে পৃথক ছিল না। তাই আমার কাছে মনে হয়েছে আওয়ামী লীগের এই বিভাজন ছিল অবৈজ্ঞানিক ও অনভিপ্রেত এবং রুশপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আমার ধারণা মস্কোর নেতারা তখনো এ ব্যাপারে তত সতর্ক ছিলেন না। ১৯৫৩ সালে স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিতে অনেক পরিবর্তন হচ্ছিল। সেই পরিবর্তনের হাওয়া পূর্ব পাকিস্তান পর্যন্ত পৌঁছায়নি। পৌঁছালে হয়তো বা সেদিন আওয়ামী লীগ শ্রেণিচরিত্রের প্রশ্ন বিবেচনা না করে শুধুমাত্র পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্র করে নতুন দল গঠন করত না। এটি যে সঠিক ছিল না তা প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীকালে। যতদিন সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োজন ছিল ততদিন পর্যন্ত ন্যাপ সজীব এবং সচল ছিল। পরবর্তীকালে অধিকাংশ ন্যাপ নেতা আওয়ামী লীগে ফিরে গিয়েছিলেন এবং এক সময় এই ন্যাপ নেতারা কাগজপত্রে এবং দলিলে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে বাকশাল গঠন করেছিলেন। অথচ এঁরাই ১৯৫৭

www.nagorikpathagar.com

সালে শেখ সাহেবকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলে আওয়ামী লীগ ভেঙে ন্যাপ গঠন করেন। আমার ধারণা, সেকালে আওয়ামী লীগে ভাঙন এবং ন্যাপ গঠনের জন্যে দায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতির অন্ধ অনুসরণ এবং এ কাজটি করেছেন কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুরা।

তবে ১৯৫৭ সালের ২৫-২৬ জুলাইয়ের একটি ভিন্ন কাহিনীও আছে। সেদিন ন্যাপের সম্মেলন এবং জনসভায় আওয়ামী লীগের গুণ্ডামি ছিল অবিস্মরণীয়। সেদিন পল্টন ময়দানে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্মানিত নেতাদের ওপর গুণ্ডারা হামলা করেছিল। পণ্ড করতে চেয়েছিল রূপমহল হলে তাদের সম্মেলন। আওয়ামী লীগের সে আচরণ ছিল অশোভন, বর্বর এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ আর দৈনিক ইত্তেফাক সেদিন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে Nehru Aided Party বলে অভিহিত করেছিল।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠনের আগে মওলানা ভাসানী আমাকে ডেকেছিলেন। বললেন, আমি নতুন দল গঠন করছি। আওয়ামী লীগ ছেড়ে দিচ্ছি। তোমরা ছাত্রলীগ ছেড়ে দিয়েছ—আমার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান যাবে। দেখা যাক সারা পাকিস্তানব্যাপী কোনো সংগঠন গড়ে তোলা যায় কি না।

মওলানা সাহেবের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ব্যারিস্টার শওকত আলীদের সদরঘাটের বাসায়। মওলানা সাহেব খুব আন্তরিক হলেও বোঝাতে পারলাম না যে এটা হবার নয়। কমিউনিস্ট পার্টি কিছুতেই আমাকে এ ধরনের কোনো সুবিধা দেবে না। কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য অনুযায়ী আমি ট্রটস্কিপন্থী। তারাই একমাত্র সাচ্চা কমিউনিস্ট। অন্যান্য সকলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল। আর দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে শতকরা প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ জন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যই ট্রটস্কির কোনো মূল গ্রন্থ পড়েনি। দলীয় প্রচার পুস্তিকা পড়ে এবং নেতাদের কাছে শুনে ট্রটস্কির মুণ্ডপাত করছে। আমি আদৌ ট্রটস্কিপন্থী নই। আমাদের দল সেকালের আরএসপি (বর্তমানে শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল) লেনিনপন্থা অনুসারী— ট্রটস্কি বা স্টালিনকে সঠিক বলে মনে করে না। তবে রুশ বিপ্লবের নেতা হিসেবে সকলকেই সম্মান দেয়।

এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল, ভিন্ন কোনো দলে অনুপ্রবেশের নীতি নিয়ে। ব্রিটিশ ভারতেও কমিউনিস্ট পার্টি মনে করতো অন্য দলে নিজেদের সদস্যদের ঢুকিয়ে তাদের নীতি পরিবর্তন করা যায় বা সীমিত ক্ষেত্রে হলেও ভিন্ন দলের নীতি নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই বিশ্বাস থেকেই তারা ব্রিটিশ ভারতে নিজেদের সদস্যদের মুসলিম লীগে ঢুকিয়েছে

www.nagorikpathagar.com

মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দান বা নীতি নিয়ন্ত্রণের আশায়। শেষ পর্যন্ত কোনোটাই হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির সেই সদস্যই হারিয়ে গেছে। একই বিশ্বাস থেকে এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপে ঢুকেছে। ন্যাপের নেতৃত্ব করেছে। শেষ পর্যন্ত আর কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে আসেনি। যদিও এ ধরনের নীতি গ্রহণের ব্যাপারে আর একটি বিবেচনাও কাজ করেছে। পৃথিবীর অনেক দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকা এবং নিষিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় কমিউনিস্ট পার্টি এ নীতি গ্রহণ করেছিল।

আমাদের এ ব্যাপারে একেবারে বিপরীত নীতি ছিল। আমাদের দল কোনো দিন ভিন্ন দলের ছায়ায় কাজ করেনি। ভিন্ন ফ্রন্টে ভিন্ন দলের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করলেও দলের প্রশ্নে কোনো ভেজাল নীতি ছিল না। তাই কাগমারী সম্মেলনে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও দল হিসেবে আমরা যাইনি। আমাদের প্রবীণ নেতা প্রখ্যাত অতীন্দ্রমোহন রায় কাগমারী সম্মেলনে গিয়েছিলেন। তখনো মওলানা ভাসানী তাঁকে একসঙ্গে রাজনীতি করার কথা বলেছিলেন। অতীনদা বলেছিলেন, অন্য দলে ঢুকে নিজের দলের আদর্শ বাস্তবায়ন করা যায় না। সুতরাং রাজনীতি ও কৌশলের দিক থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য ছিল।

জানতাম যে ন্যাপ গঠনের পর নতুন কোনো ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হোক এটা কমিউনিস্ট পার্টি চাইবে না এবং সে সংগঠনে আমার যাওয়াই সম্ভব হবে না। বাস্তবে তাই হয়েছিল। মওলানা ভাসানীর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। আমারও পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

তবে ন্যাপ গঠনের পর বিপদ এল অন্যদিকে থেকে। পূর্ব পাকিস্তানে তখন আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার। বিরোধী দলে আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং নেজামে ইসলাম। এ পরিস্থিতিতে ন্যাপ যে দিকে ভোট দেবে সে সরকারই একমাত্র টিকে থাকবে। কারণ আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত অনেক পরিষদ সদস্যই তখন ন্যাপে যোগদান করেছে। অপরদিকে কেন্দ্রে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্ব তখন টালমাটাল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাশ্চাত্য ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে তখন পাশ্চাত্য জগতে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলেন। কথা হচ্ছে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে ভয় ছিল পাকিস্তানের সামরিক বেসামরিক আমলাদের। ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচন তাদের আরো শঙ্কিত করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে মুসলিম লীগ উচ্ছেদ হয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.com

আমলাদের ভয় হচ্ছে—সাধারণ নির্বাচন হলে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। আমলাদের হাতের পাঁচ মুসলিম লীগ এবং ইস্কান্দার মীর্জার হাতে গড়া রিপাবলিকান পার্টি নির্বাচনে লাপাত্তা হয়ে যেতে পারে। তাই মীর্জার নেতৃত্বে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হলো শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে। ৮০ সদস্যের সংসদে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন ১২ সদস্যের নেতা। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন রিপাবলিকান পার্টির সমর্থনে। ইস্কান্দার মীর্জার ইঙ্গিতে একদিন সুপ্রভাতে রিপাবলিকান পার্টি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করল। অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন নেই এই অজুহাতে প্রেসিডেন্ট মির্জা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগের অনুরোধ জানালেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী রাজি হলেন না। তিনি মির্জাকে জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডাকার পরামর্শ দিলেন। প্রেসিডেন্ট মির্জা রাজি হলেন না। পদচ্যুত হবার অপমানজনক পরিস্থিতি এড়াবার জন্যে শহীদ সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে তখন আওয়ামী লীগের মধ্যেই চরম কোন্দল। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না। অবশেষে শেখ সাহেবকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়। তাঁকে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয় এবং বিদেশে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁকে সফর করতে দিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নে রওনা হন। কিন্তু ইতোমধ্যে শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। শেখ সাহেবকেও ফিরে আসতে হয়।

এসময় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারে তুমুল কোন্দল দেখা দেয়। এই সুযোগ গ্রহণ করে কৃষক শ্রমিক পার্টি। বিভক্ত কৃষক শ্রমিক পার্টি আবু হোসেনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান বুঝতে পারেন, যে কোনো সময় তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হতে পারে। তিনি গভর্নর শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হককে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন মুলতুবি করার আহ্বান জানান। তাঁর কথা না শুনে ৩০ মার্চ গভর্নর তাঁকে পদচ্যুত করেন। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হন আবু হোসেন সরকার। আবু হোসেন সরকারের অনুরোধে ঐদিনই পরিষদের অধিবেশন মুলতুবি হয়। কেন্দ্রে তখন প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুন। তাঁর সঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে ফিরোজ খান নুন গভর্নর ফজলুল হককে

www.nagorikpathagar.com

৩১ মার্চ অপসারণ করেন। ১ এপ্রিল আতাউর রহমান আবারও মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে চরম অস্থিরতার সৃষ্টি হয়।

১৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। পরিষদে ন্যাপের সদস্য সংখ্যা ৩৩। ন্যাপ ভোটাভুটিতে নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবার ফলে আতাউর রহমান সরকারের পতন ঘটে ১৯ জুন। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হন আবু হোসেন সরকার। ২২ জুন আবু হোসেন সরকার অনাস্থা ভোটে পরাজিত হন। ২৫ জুন পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট শাসন প্রবর্তিত হয়। এই রাজনৈতিক উত্থান-পতনের জন্যে মূলত দায়ী ছিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। তারা কখনো আওয়ামী লীগ আবার কখনো কৃষক শ্রমিক পার্টিতে ভোট দিয়ে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তাদের সিদ্ধান্ত পাল্টাবার জন্যেই শেষ পর্যন্ত একটির পর একটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রেসিডেন্ট শাসনও দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে সমঝোতা করতে থাকেন। তাঁর প্রধান দাবি ছিল ১৯৫৯ সালে সাধারণ নির্বাচন দিতে হবে। এই শর্তে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ফিরোজ খান নুনকে সমর্থন দিতে রাজি হন এবং এই ভিত্তিতেই ফিরোজ খান নুন পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রেসিডেন্ট শাসন প্রত্যাহার করেন। ২২ জুলাই পুনরায় আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক অধিবেশন বসে। তখন পরিষদের স্পিকার ছিলেন জনাব আবুল হাশিম। আবুল হাশিমের সঙ্গে আওয়ামী লীগের মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। সরকার পক্ষ থেকে স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।

নতুন স্পিকার নির্বাচিত হন ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলী। শাহেদ আলীর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে পরিষদে তুমুল হাঙ্গামা হয়। হাঙ্গামায় আহত হয়ে শাহেদ আলী ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই পরিবেশে কেন্দ্রীয় সরকার আর একটি চাল দিলেন। এবার বলা হলো আওয়ামী লীগকে কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ নিতে হবে। সিদ্ধান্ত হলো আওয়ামী লীগের দু-একজন সদস্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করবে। অনেকেই সম্মত হলো না। বলা হলো ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সারা পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন হবে। শেষ পর্যন্ত ২ অক্টোবর আওয়ামী লীগের কতিপয় সদস্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। দফতর বণ্টনের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হওয়ায় ৭ অক্টোবর

www.nagorikpathagar.com

তাঁরা পদত্যাগ করেন। ওই দিনই ইস্কান্দার মীর্জা তাঁর বাসভবনে একটি পার্টির ব্যবস্থা করেন। আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরাসহ সকলেই এই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন। পার্টি শেষে সকলেই যে যার বাসায় ফিরে যান। আর ওই রাত্রিতেই প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ এবং মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করেন। সংবিধান রহিত করেন। প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসক নিয়োগ করেন। আমি তখন ঢাকা হলে। ঢাকা হলেও তখন এক অস্থির পরিস্থিতি।

ইতোমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে আমার রাজনৈতিক জীবন ও ঢাকা হলের জীবনে। আমি, এনায়েতুল্লাহ খান, আহমেদ হুমায়ুন, আব্দুল হালিম, কাজী বারী প্রমুখ ছাত্রলীগ ছেড়ে দিলাম। আমি ব্যতীত অন্যান্য সকলে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাদেরকে কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্রলীগে কাজ করতে বলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির ধারণা ছিল তারা ছাত্রলীগে ঢুকে ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রণ করবে। এটা নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনেও ঘটেছিল। এককালে ছাত্র ফেডারেশনেও ঘটেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি ও জয়প্রকাশ নারায়ণের কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির দ্বন্দ্ব ছিল। আর অপ্রত্যাশিত হলেও সত্য যে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি অর্থাৎ সিএসপির ছাত্রফ্রন্টের নেতা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির অমিয় দাশগুপ্ত। তবে কমিউনিস্ট পার্টির এই অন্যের দল দখলের নীতি তেমন কাজে আসেনি। কমিউনিস্ট পার্টিকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হারিয়ে।

আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটি হলো না। মাত্র একটি জেলার ক্ষেত্রে আমাদের আশাভঙ্গ হলো। কুমিল্লার তাহেরুদ্দীন ঠাকুরকে আমরা কমিউনিস্ট পার্টি ঘেঁষা মনে করতাম। তিনি আমাদের সঙ্গেই চলতেন। কিন্তু দেখা গেল যে ছাত্রলীগ ছাড়বার সময় আমাদের সঙ্গে এলেন না। যদিও পরবর্তীকালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের প্যানেলে ঢাকা হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। এনায়েতুল্লাহ খান হয়েছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। এ সংসদের অন্যতম সদস্য ছিলেন শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের সিদ্দিকুর রহমান, ওয়ার্কার্স পার্টির হায়দার আকবর খান রনো, প্রয়াত নাট্যজন আবদুল্লাহ আল মামুন।

এনায়েতউল্লাহ খান, আহমেদ হুমায়ুন, আব্দুল হালিম, আজিজুর রহমান, জহিরুল ইসলাম এবং কাজী বারীর সিদ্ধান্ত ছিল ছাত্র ইউনিয়নে যাবার। তবে তাদের সকলেরই ইচ্ছা ছিল আমরা সকলে যেন এক সঙ্গেই ছাত্র ইউনিয়নে

www.nagorikpathagar.com

যোগ দিই। আমার দলেরও সিদ্ধান্ত ছিল ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেবার। তাই ঠিক হলো ছাত্র ইউনিয়নেই যোগ দিতে হবে।

কিন্তু কীভাবে ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেয়া যাবে? ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে তখন ভিন্নভাবে দেখা হলো। ছাত্র ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা মুকুল সেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি তাঁদের কয়েকজন সদস্য নিয়ে আমার কাছে একদিন ঢাকা হলে এলেন—আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে ছাত্র ইউনিয়নে যোগদানে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর কথা হলো, আপনি ছাত্রলীগের একজন নেতা ছিলেন। আর পাঁচজনের মতো আপনি আমাদের সদস্যপদ গোপনে নেবেন তা হতে পারে না। আর আপনি যদি কোনো পদে যেতে চান তাও বলুন।

সে ছিল আমার পক্ষে এক বিড়ম্বনা। আমি ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক ছিলাম। সভাপতি আব্দুল মোমিন তালুকদার এবং সম্পাদক এম এ আওয়ালের সঙ্গে আমার এমন সমঝোতা ছিল যে, এককভাবে আমি কোনো কিছু করলে তাঁরা কিছু বলতেন না। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রলীগের সকল খবরই আমার কাছে থাকত। তাই ছাত্র ইউনিয়নে কোন পদে যাবো এ নিয়ে আমার কোনোদিন চিন্তা-ভাবনা ছিল না। এটাও জানা ছিল, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্র ইউনিয়নে আমার অবাধ বিচরণ সম্ভব হবে না। কারণ এ ধরনের রাজনৈতিক উদারতা ঐ দলটির কোনোদিন পরিলক্ষিত হয়নি প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রশ্নে। এছাড়া সেখানে বামপন্থী রাজনীতিতে আমাদের দল আরএসপির তেমন কোনো প্রভাব না থাকলেও কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা জানতেন আরএসপির একটি বিকল্প বক্তব্য আছে মার্কসবাদ-লেলিনবাদ সম্পর্কে। স্টালিনকে তারা সঠিক বলে মনে করে না এবং এও মনে করে যে ক্রুশ্চেভের সহাবস্থানের নীতি স্টালিনের আমলেই শুরু হয়েছিল।

সুতরাং মুকুল সেনের সকল সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমাকে ছাত্র ইউনিয়নে নেয়া সহজ হলো না। ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর নয় কি? একজন ছাত্র, একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে অন্য একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবে, তাকে নিতে হলে প্রতিষ্ঠানের কাউন্সিল ডাকতে হবে।

আমার ক্ষেত্রে তাই-ই হয়েছিল। ছাত্র ইউনিয়নের বিশেষ কাউন্সিল ডাকায় অধিবেশন বসলো বার লাইব্রেরি হলে। আমাকে ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যপদ দেয়া নিয়ে একমাত্র বরিশাল জেলা থেকে আপত্তি এল। অবস্থান এমন দাঁড়ালো, তারা নোট অব ডিসেন্ট দেবে। কাউন্সিলে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ছাত্র ইউনিয়নের লেখা। আমার লেখা চিঠি পেশ করা হলো।

www.nagorikpathagar.com

বলা হলো নির্মল সেনের জন্যে ঐক্য হয়নি। তাই তাকে ছাত্র ইউনিয়নে নেয়া যাবে না। সম্মেলনের সভাপতি ড. আলমগীর বললেন, এ চিঠি ছাত্রলীগ সম্পাদক এম এ আউয়ালের পক্ষ নিতে নির্মল সেন লিখেছেন, তাই এ আপত্তি গ্রাহ্য নয়।

এ সময় আমার খুব খারাপ লাগছিল। বললাম, আমি কিছু বলব। বাধা দিলেন আজিজুর রহমান খান। তখন তিনি ফজলুল হক হলের ছাত্র সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট, পরবর্তীকালে অর্থনীতিবিদ এ আর খান নামে পরিচিত। আজিজ আমাদের সঙ্গেই ছাত্রলীগ ছেড়েছিলেন। আজিজ বললেন, আমরা বিবৃতি দেব। আপনি আমাদের সঙ্গে এসেছেন। আমরাই আপনাকে ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য পদ দেব।

ইতোমধ্যে আমাকে নিয়ে বক্তৃতা শুরু হয়েছে কাউন্সিলে। এ সময় কক্ষে ভাষণ দিলেন বগুড়ার সাদেক আলী আহমদ ও দুর্গাদাস মুখার্জী। পুরো এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন আজিজুর রহমান খান। আমার মনে হয়েছিল লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যুর পর ম্যাকবেথের বলা কথা শুনছি। আজিজের বক্তৃতার পর কাউন্সিলে ভোট হলো। আমার বিরুদ্ধে দু'টি ভোট পড়ল। এ দু'টি ভোটই বরিশালের।

কাউন্সিলে আমাকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হলো। পরবর্তী দিন কমিটি নির্বাচিত হবে। তখন ছাত্র ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে এমন বিধি ছিল। কাউন্সিলে পুরো কমিটি নয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হবে। এ সদস্যরাই পরবর্তীকালে সভাপতি, সম্পাদক নির্বাচন করবে।

পরদিন এই সভাপতি সম্পাদক নির্বাচন নিয়ে দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। যারা আমার ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যপদ দেয়া ঠেকাতে পারেনি তারা সারা রাত তৎপর ছিল। মুখে মুখে রটে গিয়েছিল আমাকে নাকি সহসভাপতি করা হবে। খুলনার গাজী শহীদুল্লাহ এবং গাজী লুৎফর রহমান বলল, আমাদের পক্ষে আপনাকে আর সমর্থন করা সম্ভব হবে না। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভিন্ন নির্দেশ এসেছে। কিন্তু জহিরুল ইসলামসহ অনেকে কমিউনিস্ট পার্টির লোক হলেও এ নির্দেশ মানতে রাজি ছিল না। জহির ছিল ঢাকা হলে আমার রুমমেট এবং আমার সঙ্গে ছাত্রলীগ ছেড়েছিল। এ ধরনের আমার অনেক সমর্থক ছিল যারা প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টের লোক ছিল।

এ পরিস্থিতিতে ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের বৈঠক বসল। যতদূর মনে আছে ড. আলমগীরই সভাপতি হলেন। সাধারণ সম্পাদক

www.nagorikpathagar.com

হলেন সাইফুদ্দিন আহমদ, দপ্তরবিহীন সম্পাদক হলেন আহমেদ হুমায়ূন। প্রশ্ন দেখা দিল আমার নাম সহসভাপতি হিসেবে উত্থাপিত হওয়ায়। প্রস্তাব উত্থাপন করলেন জহিরুল ইসলাম। উপর থেকে ভিন্ন প্রস্তাব এল। কিন্তু কোনো পক্ষই ভোটে যেতে রাজি নন। এক সময় জহির ক্ষুব্ধ হয়ে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে পদত্যাগের কথা বললেন। আমি এ পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। এতদিন বাইরে থেকে ছাত্র ইউনিয়নের কথা শুনে একটি ধারণা জন্মেছিল এ সংগঠনটি ঐক্য চায় না। আমার ঘটনাতেই তা প্রমাণিত। প্রকৃত পরিস্থিতি তেমন নয়। তাই বৈঠকে আমি এক সময় বললাম আমি প্রার্থী হচ্ছি না। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবেই আমি কাজ করব। গণ্ডগোল মিটে গেল। এবারের জন্যে যবনিকাপাত হলো। পরবর্তীকালে খবর হচ্ছে আমি ছাত্র ইউনিয়নের নেতা হিসেবেই জেলে গিয়েছিলাম। জেল থেকে এসে দেখি ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন হচ্ছে। কিন্তু সে সম্মেলনে আমাকে ডাকা হলো না। সে ঘটনা আরো পরে।

এদিকে ঢাকা হলে এখন ভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাইছেন না অমুসলমান ছাত্ররা ঢাকা হলে থাক। তাই প্রতিদিন গণ্ডগোল সৃষ্টি করা হতো ঢাকা হলে। ঢাকা হল কসমোপলিটন হল হলেও মুসলমান ও অমুসলমান ছাত্রদের জন্যে পৃথক রান্নার ব্যবস্থা ছিল। হলের কিছু কর্মকর্তার প্ররোচনায় কতিপয় মুসলিম ছাত্র প্রায় দিনই অমুসলমান ছাত্রদের খাবার খেয়ে ফেলত। হামলা চালাতো এদের রান্নাঘরে। এ ছাত্ররা ছিল মুখ্যত ন্যাশনাল ছাত্র ফেডারেশন এনএসএফ-এর অনুসারী। এ পরিস্থিতিতে অমুসলমান ছাত্ররা জগন্নাথ হলে যাওয়া শুরু করল।

নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো সরস্বতী পূজা নিয়ে। কসমোপলিটন হলে হিন্দু ছাত্ররা সরস্বতী পূজা করতে চায়নি। আমি বললাম, এটা সঠিক নয়। আপনারা সরস্বতী পূজা করলে মুসলিম ছাত্ররা যদি গরু কোরবানি দেয় এ হলে থাকবেন আপনারা। ওদের গরু কোরবানিও আপনাদের পূজার মতো। আমি তাদের বোঝাতে পারলাম না। সাড়ম্বরে সরস্বতী পূজা হলো ঢাকা হলে এবং পরবর্তীকালে মুসলমান ছাত্ররা ঈদুল আজহায় গরু কোরবানি দিল। কী এক করুণ অবস্থা। হলের একশ্রেণির কর্মকর্তা এ কাজে ইন্ধন যোগালেন। যিনি প্রত্যক্ষ সব কিছু করলেন তিনি হলের অন্যতম হাউস টিউটর মীর ফখরুজ্জামান। মিষ্টভাষী এবং সদালাপী এই মানুষটি যে কি করতে পারেন তা সেদিন হাড়েহাড়ে টের পেয়েছিলাম। আবার দৃঢ়তাও খুঁজে পেয়েছিলাম অন্যান্য কর্মকর্তার মধ্যে।

www.nagorikpathagar.com

ঢাকা হলে (আজকের শহীদুল্লাহ হল) আমার কক্ষ নম্বর তখন ১০৬। এ কক্ষে আমি, জহিরুল ইসলাম (এককালের সরকারি কর্মকর্তা এখন অনিয়মিত কলাম লেখক) ও আহমদ হোসেন (যুগ্ম সচিব হিসেবে অবসর নিয়েছেন)। আমাদের সঙ্গে ছিলেন হিমাংশুরঞ্জন দত্ত (অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব)। হিমাংশু দত্ত চলে গেছেন জগন্নাথ হলে। আমাদের কক্ষে এসেছেন প্রয়াত শান্তিরঞ্জন কর্মকার (বাংলাদেশ ব্যাংকের এককালীন কর্মকর্তা)।

সেদিন ঈদুল আজহা। আমাদের মন ভালো না। হলে গরু জবাই হয়েছে। না খেয়ে অমুসলমান ছাত্ররা হল ছেড়ে চলে গেছে। ক্ষুব্ধ জহিরুল চলে গেছে বাইরে। আহমেদ হোসেন বললেন, আমাদেরও হলে খেয়ে কাজ নেই। চলুন হোটেলে খেয়ে আসি। স্টেডিয়ামের সামনে মোটামুটি অভিজাত হোটেল লা সানি। আমরা দু'জন সেখানে খেয়ে হলে ফিরে এলাম।

হলে ফিরে দেখি আমার টেবিলে পরিপাটি করে খাবার সাজানো। এমনিতেই আমি ডাইনিং হলে খেতাম না। আমার হলে ফেরার সময়ের ঠিক ছিল না। তাই আমার খাবার টেবিলেই ঢাকা থাকল। তবে এমনটি করে পরিপাটি করে সাজানো নয়। ঢাকনি খুলে খাবার দেখারও প্রবৃত্তি হলো না। সারাটা দিন হলে শুয়ে থাকলাম। রাত বারোটার দিকে আমাকে জানানো হলো হাউস টিউটর ফখরুজ্জামান সাহেব আমাকে ডেকেছেন। তিনি আমাকে সাধারণত গভীর রাতেই ডাকতেন। হাউস টিউটরের কোয়ার্টারে আমাকে যেতে হলো। ঢুকতেই প্রশ্ন করলেন, দুপুরে খেয়েছি কিনা। বললেন, তোমার খাবারও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কোনো অসুবিধা হয়নি তো। আমি বললাম, স্যার আমাকে খাইয়ে কী হবে? ঈদ তো আনন্দের। গরুর পরবর্তে খাসি জবাই করলে সবাই মিলে খাওয়া যেতো। আমার কোনো ব্যাপারে আপত্তি নেই। কিন্তু যাদের আপত্তি তারা তো কেউ হলে খেল না। আমাকে এখন গভীর রাতে ডেকে কোনো লাভ আছে কি?

মীর ফখরুজ্জামান সাহেব একটু সরে বসলেন। মনে হলো তিনি ভয় পেয়েছেন। জানতে চাচ্ছেন আমি কোনো গণ্ডগোল করবো কিনা। তাই হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, নির্মল তুমি কী করে চলো। শুনেছি তোমার কেউ নেই। শুধু রাজনীতি করো। আমি বললাম—স্যার, টিউশনি করি। ছাত্র পড়িয়েই চলে যায়। কারো অধীনে কোনো কিছু করা আমার ধাতে সয় না।

নির্মল তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি। ভালো টিউশনি দিতে পারি। তুমি নেবে? গভীর রাতে হাউস টিউটরের এ কথা শুনে মনে হলো কর্তৃপক্ষ এবার আমাকে কিনতে চাচ্ছে। আমি বললাম—স্যার, জেলে যেতে না হলে

www.nagorikpathagar.com

আর নিয়মিত পড়ার সুযোগ পেলে আমিও হয়তো এতোদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারতাম। আমাকে আপনার সাহায্য করতে হবে না। আমি নিজেই চলতে পারব। আমাকে যেতে দিন। বিদায় নিয়ে কাউকে কিছু না বলে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু হল কর্তৃপক্ষকে এড়ানো গেলো না। ভোরবেলা দেখি প্রভোস্ট এস এন কিউ জুলফিকার আলী সাহেব আমার কক্ষে হাজির। বললেন, কেমন আছেন? খুব স্নেহের কণ্ঠে বললেন, এমনি করে কি দিন চলবে? আপনি আজ দুপুরের দিকে আমার বাসায় যাবেন।

প্রভোস্টের বাসা ১০ ফুলার রোড। আজকে সেখানে সায়েন্স এনেক্স। এককালে নির্মিত হয়েছিল ব্রিটিশ ধাঁচে। পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্যে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এ ভবনগুলো হস্তান্তরিত করা হয়। ভাবছিলাম প্রভোস্টের বাসায় যাব কিনা। কারণ এর মধ্যে আরো কিছু ঘটনা ঘটে গেছে।

একদিন সকালের দিকে আমাকে হাউস টিউটরের কক্ষে ডাকা হলো। কক্ষে ঢুকে দেখি চারজন হাউস টিউটরই বসে আছেন। এ চারজন হচ্ছেন ড. সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক মুনীম, মুকলেসুর রহমান এবং মীর ফখরুজ্জামান। ড. ইসলাম বললেন, তুমি কি জবাব দিতে পার তোমাকে হল থেকে বহিষ্কার করার হবে না কেন? তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে গতকাল রাত বারোটার পর তোমার কক্ষে গান হয়েছে। এটা হলের শৃঙ্খলা বিরোধী।

প্রশ্ন শুনে আমি কিছুটা অবাক হলাম। কারণ ওই গানের কথা আমি জানতাম না। পরে শুনেছি সত্য সত্যই আমার কক্ষে সে রাতে গান হয়েছিল। গান গেয়েছিলেন সুরেশ বাবু। বাড়ি নড়াইল কি মাগুরা। ইতিহাসের ছাত্র। তিনি স্বভাব গায়ক। শেষ বর্ষের পরীক্ষা হয়ে গেছে। হল ছেড়ে যাবেন। তাই মনে হয় সকলকে গান শুনিয়েছিলেন। সকলে তাঁকে ডাকত সুরেশদা। সুরেশদা আমার কক্ষে গান গেয়েছিলেন আমার অনুপস্থিতিতে। বুঝলাম আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ খুঁজে না পেয়ে এ অভিযোগ আনা হয়েছে।

আমি বললাম, রাত বারোটার পর কোনো কক্ষে গান গাওয়া অপরাধ তা আমি জানতাম না। আপনারা আমাদের কোনো নিয়ম জানাননি। আমরা ড. গোবিন্দ দেবের অধীনে ছিলাম। তিনি কোনোদিন এ সম্পর্কে কিছু জানাননি। আপনারা এ হলে নতুন। আপনারাও জানাননি। তাই আমার অপরাধ কোথায়? আমার কথা শুনে সকলে নীরব হলেন। শুধুমাত্র মুনীম সাহেব বিড়বিড় করে বলতে থাকরেন—হি ইজ টু মাচ ইনটেলিজেন্ট—ইউ ক্যান নট ক্যাচ হিম।

www.nagorikpathagar.com

মীর ফখরুজ্জামান এবার মুখ খুললেন। তিনি বললেন, তুমি প্রতিদিন গভীর রাতে হলে আস। তুমি জানো না যে, রাত ন'টার পূর্বেই হলে আসতে হবে। এ অপরাধে তোমাকে বহিষ্কার করা যায়, তা কি তুমি জানো?

প্রকৃতপক্ষে আমি রাত এগারোটা, বারোটা, একটা, দু'টায়ও ফিরতাম। তবু আমি প্রশ্ন করলাম—স্যার, এর কি প্রমাণ আছে? কেউ কি সাক্ষ্য দেবে? বা আপনাদের গেটের বইয়ে এ ধরনের কোনো কিছু লেখা আছে কি?

এবারও হাউজ টিউটরেরা চুপ করে গেলেন। একই কথা বিড়বিড় করে বললেন মুনীম সাহেব। আমি চুপ করে বসে থাকলাম।

এবার মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়লেন ড. সিরাজুল ইসলাম। তিনি বললেন, তুমি এখন হলের নিয়মিত ছাত্র নও। তুমি হলে আছ কী করে? আমি বললাম, স্যার যদি পাল্টা প্রশ্ন করি—আমি হলের ছাত্র না হলেও হলে আপনারা রাখছেন কী করে? আমার খাওয়ার টাকা নিচ্ছে কী করে? আমার নামে কক্ষ বরাদ্দ হয়েছে কী করে?

এবারও তাঁরা চুপ করে গেলেন, মুনীম সাহেব এবার জোরে বললেন, ইউ ক্যান নট ক্যাচ হিম। ড. ইসলাম বললেন, তুমি যাও। তবে সকাল থেকে রাত ৯টার মধ্যে হলে ফিরবে এবং গেটে বইয়ে স্বাক্ষর করবে।

এখানে একটি ভিন্ন কাহিনী আছে। আমার রাজনৈতিক কারণে ১৯৫৭ সালে পরীক্ষা দেয়া হয়নি। পরীক্ষা দিতে হবে ১৯৫৮ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি চেয়ে আবেদন জানিয়েছি। সেই আবেদনপত্র কিছুতেই প্রভোস্ট অফিস রেজিস্ট্রি অফিসে পাঠাচ্ছে না। আর আমাকেও কিছু বলতে পারছে না। থাকতে দিতে হচ্ছে হলে।

আমি কক্ষে চলে গেলাম। পরদিন রাত ৯টায় ফিরলাম হলে। গেটে দারোয়ান প্রমোদ বলল বইয়ে স্বাক্ষর দিন। বইয়ে স্বাক্ষর দিলাম। সময়ের জায়গায় লিখলাম, রাত তিনটা। প্রমোদ বলল, একি করছেন? আমি বললাম, দেখো না কী হয়? পরপর সাতদিন এভাবে স্বাক্ষর করায় একদিন প্রমোদ বলল—স্যার বলেছেন, আপনাকে বইয়ে সই না দিতে।

পরিস্থিতি ভিন্ন মোড় নিল হলের হিন্দু কর্মচারিরা কালীপূজা করায়। ঢাকা হল কসমোপলিটন হল। সকলেরই সকল ধর্ম পালনের অধিকার আছে। তাই হাউস টিউটর ড. সিরাজুল ইসলাম তাদের পূজার অনুমতি দিয়েছিলেন। ফলে তাকে শোকজ করা হয়। ড. ইসলামকে চলে যেতে হয় ঢাকা হল থেকে। যাবার আগে তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন, নির্মল, সতর্ক থেকো। তোমার সম্পর্কে একটি চিঠি আছে আমার কাছে। চিঠিটা লিখেছেন বিশ্ববিদ্যালয়

www.nagorikpathagar.com

কর্তৃপক্ষ। চিঠিতে লেখা হয়েছে—আউট এ কেস এগেনস্ট হিম অ্যান্ড এক্সপেল হিম ফ্রম দি হল (তার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনো এবং তাকে হল থেকে বহিষ্কার করো)। হল থেকে বহিষ্কার করার অর্থ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার। ছাত্রজীবন শেষ।

এ পরিস্থিতিতে ঈদুল আজহা আসে। ঢাকা হলে গরু কোরবানি হয়। অমুসলমান ছাত্ররা হল ছেড়ে যায়। আমাকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেন হল কর্তৃপক্ষ। প্রভোস্ট হলে এসে আমন্ত্রণ জানান তাঁর কোয়ার্টারে।

হাউস টিউটর ড. সিরাজুল ইসলাম হল থেকে চলে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন সতর্ক থাকতে। যেহেতু তাঁর কাছে চিঠি আছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।

আমি তখন সকল দিক থেকে বিপর্যস্ত। প্রভোস্ট জুলফিকার আলী সাহেবের দু'কন্যা, এক পুত্র পড়াবার দায়িত্ব নিয়েছি। অথচ তাঁর সঙ্গে আমার বনিবনা হচ্ছে না। তিনি আমাকে হলে রাখছেন। কিন্তু ভর্তি হবার জন্যে আমার ফাইল পাঠাচ্ছেন না কোথাও।

রাজনীতির দিক থেকে তখন প্রায় একাকী। দলের অবস্থানটি আশানুরূপ নয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে আগেই অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তারা কেউ ন্যাপে, কেউ আওয়ামী লীগে ঢুকে কাজ করছে। আমাদের দলের ব্যাপারে ভিন্ন মত। কোনো দলে ঢুকে নিজস্ব রাজনীতি করা যায় না। অন্যের রাজনীতিই করতে হয় অথচ প্রকাশ্যে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল (রিভল্যুশনারি সোসালিস্ট পার্টি অর্থাৎ আরএসপি) করার পরিবেশ তখন ছিল না। এ নিয়ে দলের মধ্যে মতানৈক্য আছে। নিতাই গাঙ্গুলির মতে, প্রকাশ্যে নামা উচিত। দলের অধিকাংশ সদস্যের ভিন্নমত। ১৯৫৩ সালে গঠিত দলের কেন্দ্রীয় কমিটি কাজ করছে না। এবিএম মুসা রাজনীতিতে নেই। রুহুল আমিন কায়সার অসুস্থ। মাত্র কিছুদিন আগে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বর্ষিয়ান নেতা অতীন্দ্রমোহন রায় কুমিল্লায় আছেন। এককালে ডাকসাইটে শ্রমিক নেতা নেপাল নাহা নারায়ণগঞ্জ ছেড়ে কুমিল্লায় শিক্ষকতা করছেন। বরিশালের সুধীর সেন কখন জেলে যান আর কখন মুক্তি পান তার হিসাব রাখা কঠিন। জিয়াউল হক রইসউদ্দিন নোয়াখালিতে আছেন। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর তেমন সম্পর্ক নেই।

বেশ কিছুদিন আগে রুহুল আমিন কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করি যে তিনি অসুস্থ। আমার রুমমেট হিমাংশুরঞ্জন দত্ত। তাঁর বাবা হাজীগঞ্জের নরেন্দ্রনাথ দত্ত ডাক্তার ছিলেন। পরবর্তীকালে একাত্তর সনে তাঁকে খুন করা

www.nagorikpathagar.com

হয়। আমি যাচ্ছিলাম চাঁদপুরে ছাত্রলীগ সম্মেলনে। হিমাংশু বলেছিল আমাদের বাসা হাজীগঞ্জে, যাবেন? বলেছিলাম যাব। আমি বললাম, দেখুন আমি কথা দিলে কথা রাখি। আমি গেলে বিপদে পড়বেন না তো।

হিমাংশু আশা করেনি। তবুও হাজীগঞ্জে রেল স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে ট্রেনেই চাঁদপুর হয়ে মানুষ হাজীগঞ্জ যেত। হাজীগঞ্জ গিয়ে বিপদে পড়ে গেলাম। আমি কোনোদিন প্রকৃতপক্ষে কোনো সংসারে মানুষ হইনি। শৈশবে বাবা মারা গেছেন। বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পড়েছি। কলেজে পড়তে গিয়ে বাড়ি যাওয়া হয়নি। জেলে চলে গেছি। মা, ভাই-বোন কারো সঙ্গে তেমন কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তাঁরা ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছেন। মার সঙ্গে শেষ দেখা ১৯৪৮ সালে। ১৯৫৭ সালে হিমাংশু বাবুর মায়ের সঙ্গে দেখা। তিনি প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী খেতে ভালোবাসো?

আমি বললাম, জানি না। কারণ এ প্রশ্ন আমাকে কোনোদিন কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। খানিকটা অবাক হলেন তিনি। বললেন—তোমার মা কোথায়?

- পশ্চিমবঙ্গে।

- কতদিন দেখা হয় না?

- ন'বছর।

এবার তিনি রেগে গেলেন। বললেন, তুমি আমার বাড়ি থেকে চলে যাও। এ কেমন ছেলে তুমি, নিজের মায়ের সঙ্গে দেখা করো না?

আমি বিব্রত বোধ করলাম। বললাম, আপনি আমাকে পাসপোর্ট দেবেন? গত ৮ বছরের সাড়ে চার বছর জেলে ছিলাম। দু'বছর ছিলাম খুনের মামলার আসামী হয়ে আত্মগোপন করে। কার খবর রাখব, বলুন।

এবার তিনি যেন শান্ত হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাবে? আমি বললাম, বিকালে আপনাদের মসজিদ প্রাঙ্গণে জনসভা আছে যুক্ত নির্বাচনের দাবিতে। আমি এবং মহিউদ্দিন আহমদ বক্তা। বক্তৃতার পর রাতেই রামগঞ্জ থানার পানিওলা যাব। সেখানে আমার বন্ধু রুহুল আমিন কায়সার প্রধান শিক্ষক একটি স্কুলের।

হিমাংশু বাবুর মা বললেন, তুমি এখন বারান্দায় শুয়ে থাকবে। বিকেলে জনসভায় যাবে। সন্ধ্যার আগে ফিরে আসবে। আমরা নৌকা করে দেব। ভোরবেলা পানিওয়ালা যাবে।

বিকালে জনসভা শেষ হতে সন্ধ্যা ছাড়িয়ে গেল। দেখলাম ছোট্ট একটি মেয়ে হারিকেন হাতে আমাকে খুঁজছে। মেয়েটির বয়স সাত-আট বছর হবে।

www.nagorikpathagar.com

হিমাংশু বাবুর ছোট বোন দীপু। আমার বিলম্ব দেখে তাঁর মা পাঠিয়েছেন আমাকে খুঁজতে।

সকালে নৌকায় হাজীগঞ্জ ছেড়ে গেলাম। হাজীগঞ্জ থেকে নৌকায় পানিওয়ালা। আজ মনে হয় কল্পনা করাও যায় না। বাঁধে বাঁধে এখন জমি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কোথাও জল নেই নৌকা চলার মতো।

পানিওয়ালা পৌঁছে আমার আক্কেল গুড়ুম। শুনলাম প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন কায়সার ১২ দিন যাবৎ অসুস্থ। প্রবল জ্বর। আমাকে ঢাকায় খবর দেয়া হয়েছে। তাদের ধারণা, খবর পেয়েই আমি ওখানে গিয়েছি। তাই আমার পানিওয়ালা থাকা হলো না। পানিওয়ালা থেকে নৌকায় মেহের কালীবাড়ি (বর্তমানে মেহের) রেল স্টেশন। মেহের থেকে লাকসাম। লাকসাম থেকে রাতে ঢাকা পৌঁছে রুহুল আমিন সাহেবকে ভর্তি করা হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে।

এ পরিস্থিতিতে আমাকে ঢাকা হল নিয়ে অনশন করতে হয়েছে। দলের নির্দেশে ছাত্রলীগ ছেড়ে ছাত্র ইউনিয়নে আসতে হয়েছে। অপরদিকে সামরিক শাসন জারি হয়েছে। হাজার হাজার নেতা কর্মী গ্রেফতার হয়ে যাচ্ছে। আমিও বা কতদিন বাইরে থাকব তার নিশ্চয়তা নেই। বুঝতে পারলাম আমার ঢাকা হলে থাকাও সম্ভব হবে না।

ড. ইসলাম যাবার পর একদিন হাউস টিউটর আমাকে ডাকলেন। বললেন, তুমি ভর্তি হতে পারছ না। তাই তোমার হলের আসন বাতিল করা হলো। আমি বললাম, স্যার এটা কী করেছেন? আপনারা আমার ভর্তির আবেদনপত্র আদৌ রেজিস্ট্রার অফিসে পাঠালেন না। ফলে আমার ভর্তির কোনো সুরাহা হলো না। দেশে সামরিক আইন। আমি কোথায় যাব? হলের বাইরে গেলে গ্রেফতার হয়ে যাব। আপনারা নির্দেশ দিলেও আমি যাব না।

ড. জামান বললেন, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি তোমার কক্ষে অন্যের সঙ্গে শেয়ার করে থাকবে। তুমি হলেই টাকা দিয়ে খাবে। তোমাকে ডিস্টার্ব করা হবে না। জানি না, প্রভোস্টের বাসায় শিক্ষকতা করতাম বলে এ সুবিধা দেয়া হলো কিনা। পরদিন আমি প্রভোস্টের কক্ষে ঢুকে বললাম, আমাকে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দিন। তিনি আমতা আমতা করলেন। কোনো জবাব দিলেন না।

আমি বুঝলাম আমার ঢাকা হলে থাকা হবে না। পরীক্ষার অনুমতি পাব না। অবশেষে জেলে যেতে হবেই। জেলে গেলে বিজ্ঞান পড়া হবে না। তাই একদিন ঢাকেশ্বরী এলাকায় সিটি নাইট কলেজে গেলাম। অধ্যক্ষকে বললাম,

www.nagorikpathagar.com

আমি বিএ ক্লাসে ভর্তি হব। আমার বিষয় হবে অর্থনীতি ও দর্শন। এককালে রসায়নেও অনার্স-এর ছাত্র ছিলাম। তারপর ছাত্র হলাম পাস কোর্সে পদার্থ, রসায়ন এবং গণিত নিয়ে। এবার আর বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞান আমাকে জেলখানায় অনেক জ্বালা দিয়েছে। জেলের বাইরে নিয়মিত ক্লাস করতে পারিনি। পরীক্ষা দেয়া হয়নি। এবার বিএ ক্লাসের ছাত্র হলাম, হল কর্তৃপক্ষ জানলেন না। ২/১ জন বাদে কোনো বন্ধু জানল না। জানতে পারল না সরকারি গোয়েন্দা বিভাগ। তবে বিএ ক্লাসে ভর্তি হলেও সিটি নাইট কলেজে আমি কোনোদিন ক্লাস করিনি।

এ পরিস্থিতিতে এগিয়ে এল ১৯৫৯ সাল। সামরিক আইনের কবলে পাকিস্তান। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে ডাকসু—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন। আমার জন্যে আর এক পরীক্ষা। আর এক বিপদ।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়েছে। দেশে সংবিধান, পার্লামেন্ট বাতিল হয়েছে। সামরিক আইন জারি করে ঢাকা স্টেডিয়ামে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান এসেছেন। স্টেডিয়ামে হাজার হাজার মানুষ তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে।

মাত্র ৪ বছর। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করেছিল। সে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সম্পাদক খালেক নেওয়াজ খানের কাছে। সেদিন ঢাকায় হাজার হাজার মানুষের ঢল নেমেছিল। মাত্র চার বছরে সব কিছু উল্টে গেল।

কিন্তু কেন? এর একটি স্বাভাবিক জবাব দেয়া যায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট ছিল নেতিবাচক অর্থাৎ আমরা মুসলিম লীগকে চাই না। এ কথা সত্যি যে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবি ছিল। এ দাবিকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে গিয়েছিল। সে দাবি বাস্তবায়ন করা হবে। এ প্রতিশ্রুতি যুক্তফ্রন্ট নেতারা দিয়েছিলেন। তবুও যুক্তফ্রন্টের নেতাদের আচরণ প্রথম থেকে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে।

যুক্তফ্রন্টের প্রধান তিন নেতা ছিলেন—(১) শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, (২) মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও (৩) শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এই তিন নেতার মধ্যে পার্থক্য ছিল একান্তই স্পষ্ট। নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে এঁরা একমত হতে পারেননি। এমনকি শেষ পর্যন্ত এক আসনে দুই প্রার্থীও থেমে গেছে। এছাড়াও যুক্তফ্রন্টের শরিক দল ছিল নেজামে ইসলামী ও গণতন্ত্রী দল। রাজনীতির ব্যাখ্যায় একটি জগাখিচুড়ি। এ যুক্তফ্রন্ট প্রথম দিকে

www.nagorikpathagar.com

আওয়ামী মুসলিম লীগ বা কৃষক শ্রমিক পার্টি (কেএসপি)-ও চায়নি। এ যুক্তফ্রন্টের উদ্যোক্তা ছিল পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। অর্থাৎ দেশের যুব ও ছাত্র সমাজ। বার বার নেতারা দ্বিমত পোষণ করেছেন। মনে হয়েছে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাচ্ছে। আর বারবার ছাত্ররা মিছিল করেছে। নেতাদের ঘেরাও করেছে। এদের কথা, ঐক্যবদ্ধ না হলে মুসলিম লীগকে হারানো যাবে না। শেষ পর্যন্ত ভাঙা যুক্তফ্রন্ট একসঙ্গে নির্বাচন করেছে। কেএসপি বলেছে গণতন্ত্রী দল কমিউনিস্টদের। কমিউনিস্টদের ভারসাম্য বিধান করে নিতে হয়েছে ইসলামপন্থী মওলানা আতাহার আলীর দল নেজামে ইসলামকে। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট ছিল একটি অপূর্ব রাজনৈতিক জোড়াতালি। এই যুক্তফ্রন্টের প্রশ্নে আমাদের দল আরএসপি একমত ছিল না। আমরা বলেছিলাম এ ঐক্য টিকবে না। শেষ পর্যন্ত হতাশা সৃষ্টি করবে এবং আরএসপি ওই নির্বাচনে প্রার্থী দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মওলানা ভাসানী এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুরোধে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করা হয়। আমরা একমত না হলেও যুক্তফ্রন্টের পক্ষে কাজ করেছি। সারাদেশে তখন যুক্তফ্রন্টের নামে জোয়ার আর এই নির্বাচনেই প্রথম নৌকা প্রতীক নির্বাচনের রাজনীতিতে আসে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। নৌকা প্রতীক নিয়ে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ২৩৭ আসনের মধ্যে ২২৭ আসনে জয়লাভ করল। সেদিন ঢাকায় ছিল মিছিল আর মিছিল।

কিন্তু সে যুক্তফ্রন্ট টিকল না। পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের পরাজয় স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়নি কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার এবং বেসামরিক ও সামরিক আমলারা। তাদের ধারণা পূর্ববাংলার সবকিছু হয়েছে কমিউনিস্টদের প্ররোচনায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ছিল তখন কমিউনিস্টবিরোধী জোটে। এ জোটের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই পূর্ববাংলার নির্বাচনের পর মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন—এ নির্বাচনের কোনো প্রভাব পাকিস্তানের রাজনীতিতে পড়বে না।

তাই তারা প্রথম থেকেই চেষ্টা করছিল যুক্তফ্রন্টকে ভাঙতে। আর এ সুযোগ দিয়েছিল যুক্তফ্রন্ট নেতারা। বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলেও যুক্তফ্রন্ট একটি ঐক্যবদ্ধ মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারল না। প্রথমে কেএসপির তিনজন সদস্য নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। এপ্রিলে সকলকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের পরপরই কর্ণফুলি পেপার মিল ও আদমজী জুট মিলে বাঙালি-বিহারী দাঙ্গার অজুহাতে পূর্ববাংলার মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে প্রেসিডেন্ট শাসন জারি করা হলো। শেরেবাংলা ফজলুল হককে দেশদ্রোহী ঘোষণা করা হলো। তাঁকে নজরবন্দি

www.nagorikpathagar.com

করা হলো। শেখ মুজিবুর রহমানসহ হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হলো।

এ রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মাঝখানে ষড়যন্ত্রকারীরা জিতে গেল। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেল। কখনো আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা, আবার কখনো কেএসপির নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। নিজের দলকে তোয়াক্কা না করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভার আইনমন্ত্রী হলেন। পূর্ববাংলার স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে সংখ্যাসাম্য ও দু'ইউনিট মেনে পাকিস্তানের সংবিধান রচনার চেষ্টা করলেন। অপরদিকে দেশদ্রোহী নজরবন্দি শেরেবাংলা একে ফজলুল হক—যারা তাঁকে নিগৃহীত করেছিল, সেই মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন। পরে একসময় গভর্নর হলেন পূর্ববাংলার।

অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেলেন এই নেতারা। মানুষের তখন চরম ঘৃণা এই নেতাদের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদে ডেপুটি স্পিকার নিহত হলেন। তারপর এলো সামরিক শাসন। সামরিক শাসক এলেন ত্রাতারূপে। তাই ১৯৫৮ সালে ঢাকা স্টেডিয়ামে জেনারেল আইয়ুবের সংবর্ধনা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। ছিল রাজনীতিকদের চরম পরাজয়ের স্বাক্ষর।

১৯৫৪ সালে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। এরপর ছিল সাধারণ নির্বাচন। পড়াশুনা ব্যাহত হলো। আমরা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হকের কাছে গেলাম। অনুরোধ জানালাম এবার যেন হঠাৎ করে কোনো কঠিন প্রশ্ন করা না হয়। আমরা চাই না ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীরা গোলযোগ করুক। কারণ দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এমন একটা কিছু ঘটতে পারে। তিনি রাজি হলেন। কথা দিলেন তিনি সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজটি হলো উল্টো। ইংরেজিতে একটি রচনা এলো, রচনার নাম হলো—এ জব। ড. হক স্কাউটের কর্মসূচির অঙ্গ মনে করে তিনি এ কাজটি করেছেন। অথচ গ্রামবাংলার ছাত্র এমন কি অধিকাংশ শিক্ষকও এ ধরনের রচনার খবর রাখেন না। সুতরাং আবার ড. হক সাহেবের কাছে যেতে হলো। তিনি আশ্বাস দিলেন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণের সময় বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সে সময় পাক-মার্কিন সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। তাই আমাদের স্কুলের পাঠ্যবইও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রিত হয়ে আসত। আমরা প্রতিবাদ করলাম। আবার ড. হকের কাছে গেলাম। তিনি উচ্চকণ্ঠে হাসলেন। বললেন, বলেন কী

www.nagorikpathagar.com

এতে অসুবিধা কোথায়? তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রিত বইয়ের একটি কপি হাতে নিয়ে বললেন, দেখুন এ বই কত শক্ত। এ বই টানলেও ছেঁড়ে না। আমরা বললাম, শক্ত বই নয়। পড়ার যোগ্য দেশে মুদ্রিত বই চাই। পরবর্তীকালে এ নিয়ে তুমুল আন্দোলন হওয়ায় বাধ্য হয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়।

এরপর বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে এলেন ড. কুদরত-ই খুদা। তিনি আবার বাংলায় কথা বলতে চাইতেন না। তখন চারিদিকে দাবি উঠেছে বাংলা ভাষায় সকল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে। এমনকি গণিতের প্রশ্নও বাংলায় হতে হবে। সেদিন আমি একাই বোর্ড অফিসে গেলাম। ঢুকতেই ড. খুদা বললেন, হোয়াট হ্যাজ ব্রট ইউ টু মি? আমি চুপ করে থাকলাম। বললাম, বাংলায় বলুন। তিনি বললেন, কী চাই? আমি বললাম, ছাত্রদের দাবি, গণিতের প্রশ্ন বাংলায় করতে হবে। মনে হলো, উনি আমাকে স্কুলের ছাত্র মনে করেছেন। আবার তিনি ইংরেজিতে বললেন, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ এ রাইট অ্যাঙ্গেল? তুমি কি জানো সমকোণ কাকে বলে? গো, রিড অ্যান্ড সিট ফর একজামিনেশন।

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করি। আমি বললাম, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, স্কুলে পড়ি না। স্কুলের ছাত্র পড়াই। তবে আপনাকে বলে যাই, গণিতের প্রশ্নপত্র বাংলায় হবেই। আর বিড়বিড় করে বললাম, ব্যাটা ইংরেজি ছাড়া কথা বলে না।

ঢাকা হলে ফিরে নবকুমার স্কুলের একজন ছাত্র এবং কামরুন্নেসা স্কুলের এক ছাত্রীকে বললাম, পরদিন মিছিল নিয়ে আসতে। মিছিল আসবে শিক্ষামন্ত্রীর বাসভবনের সামনে। শিক্ষামন্ত্রী আশরাফউদ্দীন চৌধুরী। এককালে ফরোয়ার্ড ব্লক করতেন। নেতাজী সুভাষ বসুর আমলে বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীকালে নেজামে ইসলামে যোগ দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন নেজামে ইসলামের কোটায়।

পরদিন মিছিল এল। শিক্ষামন্ত্রী নিজ ভবন থেকে বের হয়ে এলেন। ছাত্রছাত্রীদের আশ্বাস দিলেন, গণিতের প্রশ্নপত্র বাংলায় হবে। বছরখানেক পরের কথা। ১৫৭ নবাবপুর রোডের ছাত্রলীগ অফিসে বসে আছি। একজন ছাত্র এলো। সে ম্যাট্রিক এক বিষয়ে ফেল করেছে। তখন নিয়ম ছিল ম্যাট্রিকে এক বিষয়ে ফেল করলে স্যাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিতে পারবে। তার অভিযোগ হলো—সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার জন্যে এক বছর বসে থাকতে হলে একটি বছর নষ্ট হয়। তাই তার প্রস্তাব, তিন মাসের মধ্যে এ পরীক্ষা নিতে হবে। আবার ড. খুদার দফতরে গেলাম। তিনি এবার হেসে বাংলায় কথা বললেন। জিজ্ঞাসা

www.nagorikpathagar.com

করলেন, তোমার আরজি কী? আমি আমার কথা বললাম। ড. খুদা বললেন—আমরাও একথা ভাবছি। তুমি যেতে পার।

তবে ছাত্র আন্দোলন করতে গিয়ে মনে হয়েছে আমাদের আন্দোলনের সবচে' ন্যক্কারজনক দিক ছিল পরীক্ষার তারিখ পাল্টানোর দাবি।

১৯৫৬ সাল। আওয়ামী লীগ-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায়। প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান। প্রধানমন্ত্রী একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সভায় এসেছিলেন। ছাত্ররা তাঁর কাছে আবেদন জানালে ডিগ্রি পরীক্ষার তারিখ সরিয়ে দিতে তিনি রাজি হন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল একমত হয়নি।

ডিসেম্বর মাসে আবারো একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান আসলেন। আবারো তাঁর কাছে অনুরোধ জানানো হয় পরীক্ষার তারিখ পিছাতে। কিন্তু এবার তিনি রাজি হলেন না। এক সময় বললেন, প্রয়োজন হলে আমার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে। তবুও পরীক্ষা পিছাবার দাবি মানবে না।

ছাত্রদের বক্তব্য ছিল—বিএ পরীক্ষা মার্চ মাসে অথচ একখানা পাঠ্যপুস্তক তখনও প্রকাশিত হয়নি। আমার যতদূর মনে আছে বইটির নাম 'সিলভার স্কুল'। এছাড়া বিএসসির ছাত্রদেরও অনেক দাবি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মনোভাব হলো এভাবেও পরীক্ষা হয়।

এবার তা হলো না। প্রধানমন্ত্রী কার্জন হল থেকে চলে গেলেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি ইব্রাহিমের বাসার সামনে অবস্থান ধর্মঘট করলাম।

রাত বাড়তে থাকল। রাত ১২টার দিকে দেখলাম প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমানের ১ নম্বর গাড়িটি ভাইস চ্যান্সেলরের কম্পাউন্ডে ঢুকল। প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করলেন ইব্রাহিম সাহেবের সঙ্গে। ইব্রাহিম সাহেব আইন ক্লাসে আতাউর রহমান সাহেবের শিক্ষক ছিলেন। যতদূর শুনেছি প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, স্যার পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দিলে ভালো হয় না কি? এটা আমার অনুরোধ। ইব্রাহিম সাহেব বলেছিলেন—প্রধানমন্ত্রীর কথা অনুরোধ হয় না; প্রকৃতপক্ষে নির্দেশ। আমি কাল একাডেমিক কাউন্সিলের সভা ডাকব।

এ ঘটনার পর আমরা অবস্থান ধর্মঘট প্রত্যাহার করি। পরদিন একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক। পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে গেল। বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট অর্থনীতির শিক্ষক ড. মযহারুল হক।

কিন্তু এ আগুন থামল না। পরবর্তী বছর পরীক্ষার তারিখ পেছানোর দাবিতে অনশন ধর্মঘট শুরু করল জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা। নেতৃত্ব

www.nagorikpathagar.com

ছাত্রলীগের। আমি সম্পাদক আউয়ালকে বললাম—আমি জগন্নাথ কলেজে যাব এবং এই অনশনের বিরুদ্ধে অনশন করব। শেষ পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজে গিয়ে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে একটি মীমাংসায় পৌঁছাই। সেবার আর পরীক্ষার তারিখ পেছানো হয়নি। আমরা ধারণা পরীক্ষায় তারিখ পেছালে খুব একটা লাভ হয় না। শুধুমাত্র বিপদে পড়ে গরিব পিতামাতার সন্তানেরা। এদের কথা কেউ ভাবে না।

এ সময় আর একটি অবাঞ্ছিত কাজের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়ি। দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম লীগ শাসনকালে ছাত্র আন্দোলন ঠেকাতে অনেক কলেজে আমলাদের অধ্যক্ষ করে পাঠানো হয়েছিল। এসময় কয়েকজন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। তাই বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, দৌলতপুর ব্রজলাল একাডেমী, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, চাঁদপুর কলেজ, যশোর কলেজসহ আরো কয়েকটি কলেজের অধ্যক্ষকে সরানোর আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়েছিলাম। তবে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাধ্যতামূলকভাবে বরখাস্ত করলে ২০ ঘণ্টার মধ্যে তাকে পুনর্বহাল করেছিলাম। সেকালে প্রয়োজনে অনেক সমালোচনা সহ্য করেছি। কিন্তু কেউ বুঝতে চাননি, আমাদের অধ্যক্ষ সাহেবেরা কেমন আমলা মনোভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

তখন আন্তর্জাতিক ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল কমিউনিস্ট প্রভাবিত আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন (আইইউএস)। তবুও ছাত্র ইউনিয়ন নয়। পূর্ববাংলায় আমাদের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয় আইইউএস-এর। যক্ষা রোগীদের জন্যে আইইউএস-এর একটি হাসপাতাল ছিল বেইজিংয়ের কাছে বাঙাচু-তে। এ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে আমরা গাইবান্ধার নির্মলেন্দু মজুমদারকে পাঠিয়েছিলাম। চেকোশ্লোভাকিয়ায় স্কলারশিপ পেয়েছিল নূরুল হক বাচ্চু (পরবর্তীকালে সিনেমা পরিচালক)। কিন্তু পাকিস্তান সরকার পাসপোর্ট না দেয়ায় তার যাওয়া হয়নি। সেকালে ছাত্রলীগের বন্ধুরা অনেকেই এ খবর রাখতেন না। এ কালের সদস্যরাও জানে না।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। সরকারি আমলা এবং শিল্পপতিরা এ অভ্যুত্থান মেনে নেয়। কিন্তু কেন?

আমার মনে হয়, ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে একটি বুর্জোয়া বিপ্লব হয়েছিল। অর্থাৎ পুঁজিবাদীরা ক্ষমতা দখল করেছিল।

লক্ষণীয়, মুসলিম লীগকে ইস্পাহানি দাউদ-আদমজীসহ এক শ্রেণির শিল্পপতি সমর্থন করলেও সঠিক অর্থে মুসলিম লীগ একটি প্রকৃত পুঁজিপতিদের

www.nagorikpathagar.com

রাজনৈতিক দল ছিল না। এ দল খান সাহেব, খান বাহাদুর, উকিল মোক্তারদের সংগঠন ছিল। অর্থাৎ বিক্ষুব্ধ উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্তরা ছিল এ দলের নেতৃত্বে। তাও আবার পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে তফাৎ ছিল। মুসলিম লীগের পেছনে কলকাতাভিত্তিক মুসিলম শিল্পপতিরা থাকলেও দেশভাগের সময় কলকাতা ভারতে চলে গেল। বোম্বাই, ভারতভিত্তিক মুসলিম শিল্পপতিরা বরাবরই জানত, পাকিস্তান সৃষ্টি হলে তারা ভারতেই পড়বে। তাই দেশ বিভাগের পর দেখা গেল পূর্ববাংলার মুসলিম লীগের নেতৃত্বে এসেছে উকিল-মোক্তার, ছোট জমিদার-জোতদারসহ এক শ্রেণির নিম্নমধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী। আর পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশে ক্ষমতায় এলো যারা এককালে রাজনৈতিকভাবে মুসলিম লীগ বিরোধী এবং মুখ্যত জমিদার-জায়গিরদার। ব্রিটিশ ভারতের সেই অংশ নিয়েই পাকিস্তান গড়ে উঠল—যেখানে কোনো শিল্প-কলকারখানা ছিল না, ছিল না সংগঠিত পুঁজিপতি শ্রেণি। ফলে দেশভাগ হওয়ার পর মুসলিম লীগকে কেন্দ্র করেই একটি পুঁজিপতি শ্রেণি গড়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

কিন্তু মুসলিম লীগ সে ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। উকিল-মোক্তার জমিদার-জায়গিরদারদের একমাত্র বাসনা ছিল ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা। নিজের জন্যে ক্ষমতা দখল করা। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে প্রথম দিকে এদের জনপ্রিয়তা ছিল। তাই দেখা গেল নিজের জনপ্রিয়তা এবং দলবাজি সম্বল করে এরা ক্ষমতা দখল করছে এবং মন্ত্রিসভা ভাঙছে আর গড়ছে। দেশে কোনো ধরনের শিল্পায়ন হচ্ছে না। তাই এই শিল্পায়নের জন্যেই পুঁজিপতিদের নিজস্ব রাজনীতি বেছে নিতে হয়।

পাকিস্তানের প্রথম দিকেই প্রথম সারির দু'নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী মারা যান। ক্ষমতা চলে যায় গোলাম মোহাম্মদের নেতৃত্বে আমলাদের হাতে। কারণ, সমগ্র পাকিস্তানে গ্রহণযোগ্য কোনো নেতা তখন ছিল না। অপরদিকে কমিউনিস্টবিরোধী জোটে পাকিস্তান ছিল বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং ঘাঁটি। পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ছিল। এ সূত্রে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মার্কিন সরকারের সরাসরি সম্পর্ক ছিল। এ প্রেক্ষিতে সামরিক-বেসামরিক আমলারা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, তাদেরই একদিন ক্ষমতা দখল করতে হবে। এর প্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালে জেনারেল আইয়ুব একটি সংবিধান রচনা করেন পাকিস্তানের জন্যে। তখন জেনারেল আইয়ুব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান। রাজনীতির ব্যাপারে তাঁর নাক গলাবার কথা নয়।

www.nagorikpathagar.com

১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববাংলার নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটে। এ রাজনীতি মুখ্যত মার্কিনবিরোধী। তবে এদের অন্যতম নেতা মার্কিনপন্থী শহীদ সোহরাওয়ার্দী। কেন্দ্রের পাকিস্তান সরকারকে এ বাস্তবতা মেনে নিতে হয়। পূর্ববাংলার যুক্তফ্রন্টকে ভেঙে দিতে হয়। পূর্ববাংলার যুক্তফ্রন্টকে ভেঙে দিতে না পারলে সামরিক অভ্যুত্থান পূর্ববাংলার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। অপরদিকে পূর্ববাংলায় যুক্তফ্রন্ট জিতে যাওয়ায় পাকিস্তান রাজনীতিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একটি নতুন অবস্থান সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ব্যর্থ প্রমাণ করতে না পারলে কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হবে না। অভ্যুত্থানও সম্ভব নয়।

পাকিস্তান রাজনীতির ব্যাখ্যা এ রকম সাজালে পরবর্তী চিত্র অনুধাবন করা সহজ হবে। এ পটভূমিতে পূর্ববাংলায় ৯২(ক) ধারা জারি করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃত্ব বদলের প্রতিযোগিতায় যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। প্রধানমন্ত্রীত্বের টোপ দিয়ে কেন্দ্রে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে আইনমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহযোগিতায় পাকিস্তানের আমলা প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংখ্যা সাম্যের নামে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেড়ে নেয়া হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সহযোগিতা না করলে সাংবিধানিকভাবে পূর্ববাংলাকে বঞ্চিত করা সহজ হতো না।

সংবিধান পাস হবার পর পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলারা শেষ খেলা শুরু করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। ৮০ জনের সংসদে ১২ জন সদস্যের নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার ওপর নির্ভরশীল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী চাইলেন ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিয়ে একটি রাজনৈতিক সরকার গঠন করতে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজি হলো না। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংগঠন থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর তেমন সংগঠন বা সমর্থক ছিল না। তাদের আশঙ্কা ছিল সারা পাকিস্তানের নির্বাচন হলে মার্কিন বিরোধী শক্তি জয়লাভ করবে। তাই মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্যে আমলাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা পাকিস্তানের নতুন পুঁজিপতি শ্রেণি এবং মার্কিন সাহায্য নির্ভর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আমলা যৌথভাবে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। তারপর একের পর এক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত এবং বরখাস্ত হন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক

www.nagorikpathagar.com

শাসন জারি হয়। আর সামরিক শাসনকালেই পাকিস্তানে প্রথম ভূমি সংস্কারের কর্মসূচি নেয়া হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বুর্জোয়া ধারার কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। গমের বিনিময়ে কাজ কর্মসূচি শুরু হয়। সারাদেশে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বাজার অর্থনীতির কাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং আইয়ুব খানই প্রথম পরিবার আইন প্রণয়নের সাহস করেন। এ প্রেক্ষিতে আমার মূল্যায়ন হচ্ছে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ছিল এক ধরনের আমলা পুঁজিপতিদের ক্ষমতা দখল।

১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হয়। ১৯৫৯ সালে ডাকসু নির্বাচন এগিয়ে আসে। একদিকে ছাত্র ইউনিয়ন অপরদিকে ছাত্রলীগ, ছাত্রশক্তি এবং এনএসএফ। সেবার ভিপি হওয়ার কথা ঢাকা হল থেকে জিএস অর্থাৎ সাধারণ সম্পাদক এসএম হল থেকে। আমাদের ভিপি প্রার্থী এনায়েতুল্লাহ খান। ছাত্রলীগের ভিপি আবুল হোসেন (তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে বিএনপিতে যোগ দিয়ে এমপি হয়েছিলেন)।

ডাকসুর সদস্য সংখ্যা ১৬। হিসেব করে দেখা গেল আমরা ছাত্র ইউনিয়ন-৮ প্রতিপক্ষও ৮। প্রতিপক্ষের আটজনের মধ্যে ছিল নোয়াখালীর আবদুল মালেক। তিনি এককালে নোয়াখালী জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল। মালেক সাহেব পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকে চাকরি করতেন। আমি আর অজিত তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। সিদ্ধান্ত হলো আমাদের পক্ষে আট ভোট পড়লে তিনি আমাদের ভোট দেবেন। সুতরাং বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম।

আমার ওপর বিপদ এল ভিন্ন দিক থেকে। আমাকে প্রভোস্ট বাসায় ডাকলেন। কিছুদিন ধরে শুনছিলাম ভাইস চ্যান্সেলর আমার খোঁজ করছেন এবং আমাকে হল থেকে বের করার কথা বলছেন। তখন ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন বিচারপতি হামিদুর রহমান। প্রভোস্ট বললেন, আপনি এনায়েতুল্লাহ খানকে সমর্থন করতে পারবেন না। আপনি সমর্থন প্রত্যাহার করলে এনায়েতুল্লাহ জিততে পারবে না। আমি বললাম, তা হয় না। আর আপনার কথা আমার শোনারও কোনো প্রয়োজন নেই। প্রভোস্ট বললেন, আপনার ভালোর জন্যে বলছি। আমার কথা না শুনলে আপনার বিপদ হতে পারে।

আমি জানতাম প্রভোস্টের কথা না রাখলে হয়তো হল থেকে আমাকে বের করে দেয়া হবে। আমি বললাম, এনায়েতুল্লাহ আমাদের প্রার্থী। তাকে পাস করাতেই হবে।

www.nagorikpathagar.com

প্রভোস্ট-এর বাসা থেকে হলে ফিরলাম। দেখলাম হলের গেটে একটি নোটিস টাঙানো আছে। লেখা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্মল সেনকে হল ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

নোটিস দেখে আমি রুমে চলে গেলাম। কাউকে কোনো কথা বললাম না। চুপচাপ শুয়ে থাকলাম। রাত ১২টার দিকে হাউস টিউটর ড. কামরুজ্জামান আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তুমি নোটিস দেখেছ? আমি বললাম, দেখেছি। হাউস টিউটর বললেন, তোমাকে কাল হল ছেড়ে দিতে হবে। আমি বললাম, আমার পক্ষে হল ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সামনে ডাকসু নির্বাচন। নির্বাচন শেষ হোক—দেখা যাবে। ড. জামান তেমন কিছু বললেন না। তারপর একদিন নির্বাচন এলো। আমরা আমাদের পক্ষের সদস্যদের জগন্নাথ হলে থাকবার ব্যবস্থা করলাম। দুপুরের দিকে জহিরুল ইসলাম (বর্তমানে অনিয়মিত কলামিস্ট) ছুটে এলো আমার কাছে। বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমাদের একজন সদস্যকে কিডন্যাপ করেছে। যিনি কিডন্যাপ হয়েছিলেন তখন তিনি সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। আর যারা কিডন্যাপ করেছিল তারাও আজ অচেনা নয়। ফলে নির্বাচনে আমাদের পক্ষে ৭ ও বিরুদ্ধে ৮ ভোট হলো। আমরা প্রতিবাদ জানালাম। নির্বাচন স্থগিত রাখতে বললাম। বিচারপতি হামিদুর রহমান কোনো কথাই শুনলেন না। পরবর্তীকালে এই কিডন্যাপ নিয়ে আমরা দেন-দরবার করেছিলাম। তখন এককালের পুলিশের ডিআইজি আবদুল্লাহ সাহেব আইনের ছাত্র ছিলেন। তিনি বললেন, বৃথা আপনারা এ নিয়ে হইচই করছেন। কারণ সিদ্ধান্ত নিয়েই আপনাদের হারানো হয়েছে। সকল মহল না জানলে সামরিক শাসন আমলে ডাকসুর একজন সদস্য কিডন্যাপ হওয়া আদৌ সম্ভব কি?

ডাকসু নির্বাচনে হেরে গেলাম। এবার বিপদ ঘনিয়ে এলো। বুঝলাম ঢাকা হলে থাকা আর সম্ভব হবে না। এমন কি ঢাকায় থাকাও আর সম্ভব হবে না। ঢাকা হলের বাইরে গেলে গ্রেফতার অনিবার্য। দেশে রাজনীতি নেই বললেই চলে। সর্বত্রই গ্রেফতারের ভয়।

সামরিক শাসন জারি হবার পর আমি এবং আমার রুমমেট আহম্মদ হোসেন হেঁটে হেঁটে সেগুনবাগিচা গিয়েছিলাম। সেগুনবাগিচায় শেখ মুজিবুর রহমান থাকতেন। জানতাম তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি তখন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চা বোর্ডের সভাপতি। সেগুনবাগিচায় গিয়ে দেখলাম এই বাসা থেকে শেখ সাহেবের পরিবার-পরিজনকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সকলেরই এক

www.nagorikpathagar.com

কথা—এ সময় রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। গ্রেফতার হলে কেউ খোঁজ নেবে না।

সত্যি সত্যি সঙ্গে তখন কেউ নেই। মাত্র বছরখানেক আগের কথা। ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিলাম ছাত্রলীগ থেকে। ছাত্র ইউনিয়নের পুরুষ নেতৃত্বের একাংশ প্রবল বিরোধিতা করেছিল। আমাকে কিছুতেই গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে না দেবার জন্যে জোট বেঁধেছিল। দেশে সামরিক শাসন জারি হবার পর তারা কেউ নেই। ডাকসু নির্বাচনে দাঁড়ালেন এনায়েতুল্লাহ খান। তিনি এসেছিলেন আমাদের সঙ্গে ছাত্রলীগ থেকে। ডাকসু নির্বাচনের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করলাম আমি জহিরুল ইসলাম ও আজিজুর রহমান খান। আমরা সকলেই এসেছিলাম ছাত্রলীগ থেকে। এ সময় ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন সাদউদ্দিন আহমদ (অধ্যাপক সাদউদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন ৯০ দশকে)। অন্যতম নেতা ছিলেন কাজী জাফর আহমদ। কেউই এলেন না এ নির্বাচনের সময় সামনা-সামনি, একমাত্র আমানুল্লাহ ব্যতীত।

নিজের দলে প্রায় এক অবস্থা। নিতাই গাঙ্গুলি আবারো ঢাকেশ্বরী মিলের চাকরি ফিরে পেয়েছেন। রুহুল আমিন কায়সার আবার অসুস্থ হয়ে মিটফোর্ড হাসপাতালে। ১৯৫৭ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে কিছুদিন থাকার পর তিনি কিছুটা সুস্থ হন। তারপর চলে যান ভাইয়ের কাছে চুয়াডাঙ্গা। ভাই রেলে চাকরি করতেন। থাকতেন চুয়াডাঙ্গা। তখন ঢাকা থেকে সরসারি চুয়াডাঙ্গা যাওয়া যেত না। নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টিমারে গোয়ালন্দ। গোয়ালন্দ থেকে ট্রেনে চুয়াডাঙ্গা। আজকের দৌলতদিয়া ঘাটে বা গোয়ালন্দে সেদিনের গোয়ালন্দ খুঁজে পাওয়া যাবে না। দৌলতদিয়া এখন নদী গর্ভে। আজকের গোয়ালন্দ বন্দরেই সেকালে স্টিমার ভিড়ত।

রুহুল আমিন কায়সারকে চুয়াডাঙ্গা পৌঁছে দিয়ে এসে ভাবলাম হয়তো সুস্থ থাকবেন কিছুদিন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে যক্ষ্মায় ভুগছেন। বারবার হাসপাতালে যাচ্ছেন আর আসছেন। কিন্তু আমার প্রত্যাশা সঠিক হলো না। রুহুল আমিন সাহেব চুয়াডাঙ্গা থাকলেন না। একটু সুস্থ হয়েই প্রধান শিক্ষকের চাকরি নিয়ে চলে গেলেন বরিশালের গৌরনদী। আমি কিছুই জানতাম না।

১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে হঠাৎ একদিন এসে হাজির হলেন ঢাকা হলে। রুহুল আমিন কায়সার আবার অসুস্থ। কিন্তু কী করব? কোথায় রাখা যাবে? মিটফোর্ড হাসপাতালে কোনো সিট নেই। চিকিৎসক ড. নূরুল ইসলাম রোগী

www.nagorikpathagar.com

দেখে বললেন, এ মানুষ বেঁচে আছে কী করে। একটি লাংগস নেই। অপরটির এক-তৃতীয়াংশ চলে গেছে। ইনজেকশন দিলে ৬ ডিগ্রি জ্বর ওঠে। অনেক কষ্টে তাঁকে ভর্তি করা হলো বেআইনিভাবে, সাধারণ রোগী ওয়ার্ডে চারিদিকে কাপড় ঘিরে দিয়ে। কিছুদিন পরে টিবি ওয়ার্ডে সিট পেয়েছিলেন। সে সিটে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির কালীদাস চক্রবর্তী। কালীদাস চক্রবর্তী মারা যাওয়ায় সে সিট রুহুল আমিন কায়সারকে বরাদ্দ করা হয়।

কিন্তু যক্ষা রোগীর ওষুধ কে জোগাবে? এতো পয়সা কোথা থেকে আসবে? আমার টিউশনি জুটছে না। জুটছে না, ঠিক নয়। থাকছে না। কারণ কারো সঙ্গে আমার বনছে না। একটি টিউশনি পেলাম পুরানা পল্টনের জামায়াতখানার পেছনে। ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রী। সে পরিবারটি বিরাট ব্যবসার মালিক। একদিন অনুপস্থিত হওয়ায় জিজ্ঞাসা করেছিল : Why did you not come yesterday? আমি জবাব দিলাম, I will not come from tomorrow. কারণ আমার টিউশনির শর্ত ছিল আমি সপ্তাহে সাতদিন আসতে পারি কিন্তু একদিন না এলে আমাকে জিজ্ঞাসা করা যাবে না, আমি কেন আসিনি। কারণ আমি কারো পিতার কোম্পানিতে চাকরি করি না।

আমার ছাত্র-ছাত্রীরা ভড়কে গেল। তাদের মা এলেন। বললেন, এমন আর হবে না। আমি বললাম, আপনারা ভবিষ্যতে কোনোদিন বিপদে পড়লে আমার কাছে আসবেন। আমি সাহায্য করব। সত্যি সত্যি বছরখানেক বাদে এক মাসের জন্যে তাদের আবার পড়াতে গিয়েছিলাম। তবে ওরা বড্ড হিসেবি। প্রথমবার ২৭ দিন টিউশনি করার পর ছেড়ে দিলাম ওরা আমাকে ঠিক ২৭ দিনের টাকা হিসাব করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার পড়িয়েছিলাম ৩৬ দিন। এবার তারা গুণে গুণে ৩৬ দিনের টাকা দিয়েছিল। ঢাকা হলে এসে এবার ৩৬ দিনের টাকা নিয়ে পুরানা পল্টনে ওদের বাসায় গেলাম। ওদের মাকে ডাকলাম। বললাম, দেখুন ব্যবসা করেন ভালো কথা। এমন ব্যবসা করলে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে পারবেন না। ওরা ব্যবসায়ী হবে, মানুষ হবে না। আমি ৩০ দিনের টাকা পেলেই ৩৬ দিন পড়াতাম। মাস শেষ হবার পর ৬ দিনের জন্যে কোনো টাকা নিতাম না। এই বলে ৬ দিনের টাকা দিয়ে চলে এলাম। ওরা ছিল এককালে ঢাকার অভিজাত লাসানি হোটেলের মালিক। বায়তুল মোকাররমের হোন্ডা দোকানের মালিক। দেশ স্বাধীন হবার পর ওদের খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। দেখলাম ওদের কর্মচারিরাই ওদের সকল দোকানের মালিক হয়ে বসেছে। কর্মচারিরা অবশ্যই জন্মসূত্রে বাঙালি।

www.nagorikpathagar.com

এমনি করেই আর এক টিউশনি ছাড়তে হলো। মতিঝিল কলোনিতে দুজন ছাত্রী পড়াতে হবে। টাকার বড্ড অভাব। ত্রিশ দিন পড়ালে ত্রিশ টাকা। হলের চার্জ ৩২ টাকা। তারপর অন্যান্য খরচ। প্রথমদিন পড়াতে গিয়ে দেখলাম অনেক খাবার ব্যবস্থা। বললাম, খাবার কম দিয়ে বেশি টাকা দিলে সুবিধা হয়। আর প্রতিদিন এ ধরনের খেতে হলে খাবার পাটটা এখানেই শেষ করতে হয়। টিউশনি বাড়ির লোক রাজি হলো না। এক, দুই, তিনদিন দেখলাম। তারপর বললাম, আমি ৩০ দিনের পর আর পড়াব না। ছাত্রীরা কাঁদল। আমার মনে হচ্ছিল টিউটর বলে যেন সবাই করুণা করে। ত্রিশ দিনের ত্রিশ টাকা নিয়ে চলে এলাম। এরপর একেবারে বেকার।

এবার এগিয়ে এলেন ক্ষিতীশ দা। ক্ষিতীশ চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সেকালে স্টেডিয়ামের মতো কিছু ছিল না। পশ্চিম দিকে কিছু কক্ষ ছিল। ওই মাঠ দিয়ে হাঁটতে গেলে একটি পরিচিত লোক চিৎকার করে উঠতেন খাঁটি ঢাকার আদি ভাষায়। ক্ষিতীশ দা ডাকছেন। ক্ষিতীশ দা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টসের সঙ্গে আছেন। কী তার পদ, কী তার পরিচয় জানি না। এককালে ঢাকা হলের ছাত্র ছিলেন। খেলাধুলার ক্ষেত্রে সকলের দাদা। ক্ষিতীশ দার এলাকায় গেলে চা খেতে হবে। গল্প শুনতে হবে। পাকিস্তানের বাঘা বাঘা সকল সিএসপি আমলারা তাঁর হাতে গড়া। সকল এলাকায় তাঁর যাতায়াত। মনে হতো জন্মসূত্রে ক্ষিতীশ দা হয়তো ঢাকার কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে ছিলেন। একদিন ডেকে বললেন, কেমন আছ? বললাম ভালো নেই। টিউশনি প্রয়োজন। ক্ষিতীশ দা চমকে দিয়ে অট্টহাসি করে উঠলেন। বললেন চিঠি দিচ্ছি, এখন যাও। আমি ফোন করে দেব। এক সম্ভ্রান্ত মানুষের বাড়িতে পড়াবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের সেরা ছাত্র। এ কালের সেরা আমলা। ১৯৪৯ সালের ব্যাচের সিএসপি। সত্যি সত্যি বেইলি রোডের বাড়িতে ঢুকে বুঝলাম অন্তত একজন শিক্ষিত লোকের বাড়িতে এসেছি। তাঁর বাড়ির বসবার রুমে ফ্রিজ বা আলমারি ভর্তি কাপ, গ্লাস, প্লেটের ভিড় নেই। শুনেছি, তিনি বলে রেখেছেন ছাত্র জীবনে নিজে টিউশনি করেছি। টিউশনিতে মর্যাদা নেই। তাই টিচার এলে দূরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড বাজাবে। একটি পরিবেশ সৃষ্টি করবে পড়াবার। কোনোদিন যেন অনুভব করতে না পারেন যে তিনি এখানে বহিরাগত এবং শিক্ষক। কথাগুলো বলেছিলেন গৃহকর্ত্রী। ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর ভোর বেলা ওই গৃহকর্ত্রী এসে বলেন—স্যার, আজ আপনার পড়াতে হবে না—সাহেব বলেছেন, আপনি হয়তো জানেন না যে কাল রাতে দেশে সামরিক আইন জারি হয়েছে। আপনি হলে চলে যান।

www.nagorikpathagar.com

কোনো কথা না বলে সেদিন চলে এসেছিলাম। ভোর বেলা কাগজে দেখেছি। হলেও রেডিও ছিল না বা রেডিও শুনবার তেমন অভ্যাসও ছিল না। কিন্তু সে বাসায়ও আমার পড়ানো হলো না। তবে ছাত্রটি ভালো ছিল যাকে ইরেজিতে বলে Exeptionally Brilliant. আমিই একমাত্র তাকে পড়তে বসাতে পেরেছিলাম। আমি বললাম, ঠিক সাতটায় আমি আসব। সে বলত ঠিক ঠিক সাতটায় এসে পড়ব আমি। সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ডের ছাত্র। প্রতিদিন ঠিক সাতটায় দুয়ার খুলে দেখত আমি দাঁড়িয়ে।

এভাবে একদিন পড়াতে গিয়ে দেখলাম আমার ছাত্র ও তার ছোট ভাই কাঁদছে। কাঁদার কারণ বাবা-মা তাদের বাসায় রেখে সিনেমায় গিয়েছেন। আমি আর সেদিন পড়ালাম না। পরদিন পড়াতে গিয়ে ছাত্রদের মাকে ডেকে বললাম—আমি আর পড়াব না। তিনি অবাক হলেন। বললেন, কেন? আমি বললাম, দেখুন আমার ছাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দু'ঘণ্টা আমার কাছে থাকে। বাকি ২২ ঘণ্টা আপনাদের কাছে। দু'ঘণ্টা করে আমার কাছে রেখে ২২ ঘণ্টার ক্ষতি আমি পুষিয়ে দিতে পারব না। ছেলে দু'টি কাল কাঁদছিল। আমার করার কিছু ছিল না। আপনারা সিনেমায় গিয়েছেন। ওরা পড়েনি। ভদ্রমহিলা এক অদ্ভুত বিস্ময় নিয়ে থাকিয়ে থাকলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমি আমার সীমানা লঙ্ঘন করছি। এসব ব্যাপারে নাক গলানো আমার কথা নয়। তাই তিনি অত্যন্ত ভদ্র এবং নম্রতার সঙ্গে আমার কথা মেনে নিলেন। আমি চলে এলাম। দীর্ঘদিন জেল থেকে আসার পর একটি ফোন এসেছিল আর এক বন্ধুর মারফত। অনুরোধ জানানো হয়েছিল, আপনার ছাত্র ম্যাট্রিক দিচ্ছে, একবার আসবেন। আমি জবাব দিয়েছিলাম—না।

অর্থাৎ শেষ টিউশনি চলে গেল। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। সারাজনম কাকাদের ওপর জুলুম করেছি। তাঁরা কোনোক্রমে গ্রামে আছেন। মা-ভাইবোন সকলে কলকাতা। মাঝে মাঝে চিঠি আসে। আমার চিঠি লেখা হয় না। মা অনেকটা নিশ্চিত হন আমি জেলে গেলে। কারণ অন্তত একটি ঠিকানা তাঁদের তখন জানা থাকে।

আবার ক্ষিতীশ দা'র শরণাপন্ন হলাম। এবার টিউশনি জুটল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিএ সিদ্দিকীর বাসায়। মাহুতটুলীতে বাসা। সপ্তাহে ৬ দিন ঢাকা হল থেকে হেঁটে যেতে হয়। আর এ সময় রুহুল আমিন সাহেব এসে ঢাকায় উপস্থিত হলেন। নিজে বাঁচতে হবে, তাঁকে বাঁচাতে হবে। আত্মীয়-স্বজন বারবার এসেছেন। আমি তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছি। কারণ যে মানুষটি দলের জন্যে জীবন দিতে বসেছে, সারা জীবন নিজের পরিবার থেকে

www.nagorikpathagar.com

নিয়েছেন অথচ কিছু দিতে পারেননি। তাঁর বিপদে তাঁকে আবার সংসারে ঠেলে দেবার মতো অরাজনৈতিক, কিছু হতে পারে আমি কোনোদিন তা মনে করিনি।

রহুল আমিন কায়সারকে মিটফোর্ডে ভর্তি করলাম। আবার নিজের কক্ষে উঠলাম ঢাকা হলে। দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিরাতে হাউজ টিউটর ডেকে পাঠাতেন। বলতেন, তুমি না গেলে আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। প্রতিদিন ভাইস চ্যান্সেলর হামিদুর রহমান তোমার খোঁজ নিচ্ছেন। আমি বললাম, কোথায় যাব বলুন। কোথাও বাসা পাওয়া যায় না। আর বাইরে গেলেই গ্রেফতার। এবার শেষ প্রস্তাব দিলেন হল কর্তৃপক্ষ। ঢাকা হলের দক্ষিণের রেললাইন পার হয়ে নিমতলা। নিমতলাতে একটি হোটেল ডি-লাক্স। ওই হোটেলে তুমি থাকলে তোমার খাবার আমরা ঢাকা হল থেকে পাঠাব। হোটেল ডি-লাক্স-এ তখন আমার ঢাকা হলের বন্ধু অজয় রায় থাকতেন। তিনি পদার্থবিদ্যায় এমএসসি পাস করে থিসিস করছেন। তাঁর কক্ষেই একটি সিট পেলাম। মাসিক ভাড়া ৩০টাকা। আমার ভাড়া পাঠাবেন হল কর্তৃপক্ষ।

শেষ পর্যন্ত ঢাকা হল ছাড়তে হলো। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে ছাড়লেন না। একদিন সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ঢুকতেই প্রয়াগ ছুটে এল। দূরে দাঁড়ানো ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক এটিএম মেহেদী। মেহেদী এনএসএফ নেতা মহসিনের সঙ্গে কথা বলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমতলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এনএসএফের আক্তার আহাদ এবং ছাত্র ইউনিয়নের আমানউল্লাহ। প্রয়াগ ডাকসুর কর্মচারী। প্রয়াগ বলল, আপনি এখুনি এখান থেকে চলে যান। আপনাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। আপনার পক্ষে কথা বলছেন মেহেদী সাহেব ও আমানউল্লাহ সাহেব। যে কোনো সময় বিপদ ঘটে যেতে পারে। আমি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলাম। পালিয়ে গিয়ে লাভ নেই। সব কিছু সামনাসামনি মোকাবেলা করা ভালো।

এর মধ্যে আমানউল্লাহ সাহেব আমার দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, চলুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যাই। গুলিস্তান গিয়ে চা খাব। বুঝলাম, আমানউল্লাহ সাহেব আমাকে নিরাপদ এলাকায় নিয়ে যেতে চাইছেন। তাঁর সঙ্গে গুলিস্তান গেলাম। চা খাওয়া হলো না। নিমতলা হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম। মধুর ক্যান্টিনে আহমেদুরের সঙ্গে দেখা হলো। আহমেদুর রহমান দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারি সম্পাদক। ভিমরুল ছদ্মনামে উপসম্পাদকীয় লেখেন। আমাকে বললেন, বাঁচবেন কী করে। এভাবে তো বাঁচা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্ষেপে গেছে। পুলিশ অপ্রসন্ন। একটি মাত্র টিউশনি। কেউই প্রকাশ্যে রাজনীতি করছে না। এভাবে চললে

www.nagorikpathagar.com

গ্রেফতার হয়ে যাবেন। কোথাও একটা চাকরি নিন। আহমেদুর রহমানকে আমরা অনেকেই 'মামু' বলে ডাকতাম। বললাম, মামু, আমি কারো অধীনে চাকরি করব না। আমার টিউশনি করাই ভালো। যেদিন খুশি যাব। যখন খুশি ছেড়ে দেব। মামু বললেন, আমি ইত্তেফাকে কথা বলেছি। ইত্তেফাকের সহকারি সম্পাদক আপনার বন্ধু এমএ আউয়াল। সে আপনাকে ইত্তেফাকে চাকরি দিতে রাজি। আপনি সহকারি সম্পাদক হিসেবেই ইত্তেফাকে যোগ দেবেন। আমি রাজি হলাম না। আহমেদুর রহমান ক্ষুণ্ন হলেন।

কিছুদিন পর বিশ্ববিদ্যালয় ঢুকতেই প্রোক্টর নুরুল মোমেন সাহেব ডাকলেন। বললেন, তোমার সঙ্গে কথা আছে। দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। মধুর ক্যান্টিনে তখন অনেক ছাত্রের ভিড়। আমতলায়ও তখন অনেক ছাত্রছাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। নুরুল মোমেন সাহেব বললেন, তুমি কিছু মনে করো না। তোমার ভালোর জন্যেই একথা বলছি। ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি হামিদুর রহমান তোমার সম্পর্কে একটি নির্দেশ পাঠিয়েছেন। কলাভবনে তোমার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তুমি মধুর ক্যান্টিন বা আমতলায় আসতে পারবে না। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র। তোমাকে কার্জন হল এলাকায় থাকতে হবে। আমি বললাম, আমি তাহলে কোথায় যাব? আমাকে ঢাকা হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। এখন কলাভবনে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো। আমার তো চা খাবার জায়গাটুকুও রইল না। এ নির্দেশ আমি মানব না। আর এ নির্দেশ আমি না মানলে আপনারা কী করতে পারেন তাও আমি দেখতে চাই।

নুরুল মোমেন সাহেব আমার কথায় কিছুটা বিমর্ষ হলেন। বললেন, আমার করার কিছু নেই। আমি তোমাকে ভাইস চ্যান্সেলরের নির্দেশ জানালাম। তুমি কলাভবনে ঢুকলে আমি হয়তো খেয়াল করব না। কিন্তু তোমাকে নজর রাখবার জন্যে বহু লোক এই কলাভবনে আছে। তাদের তুমি এড়াতে পারবে না।

খানিকটা দমে গেলাম। তখুনি কলাভবন ছেড়ে গেলাম না। মধুর ক্যান্টিনে গিয়ে বসলাম। কয়েকজন মুখ চেনা লোকও আমার সঙ্গে মধুর ক্যান্টিনে ঢুকল। ওদের মধ্যে একজন আমার বড্ড চেনা। তিনি ডাকসুর সদস্য। আমাদের বিপরীত প্যানেল থেকে নির্বাচিত। যতদূর বুঝেছি তিনিই উদ্যোগ নিয়ে আমার বিরুদ্ধে এ নির্দেশটি করিয়েছেন। নুরুল মোমেন সাহেব আমার সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি ছায়ার মতো পেছনে পেছনে ঘুরেছেন।

দীর্ঘদিন পর তিনি কথায় কথায় তাঁর কৃতকর্মের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট এবং রাজাকার

www.nagorikpathagar.com

হিসেবে জেলও খেটেছেন। মধুর ক্যান্টিনে ঢুকতেই দেখি আহমেদুর রহমান বসে আছেন। তাঁকে ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, আজই আমার সঙ্গে ইত্তেফাকে চলুন। আজই আপনাকে সম্পাদকীয় লিখতে হবে। এভাবে জেলের বাইরে থাকতে পারবেন না। তাঁর কথামতো সেদিন ইত্তেফাকে গেলাম। সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সঙ্গে দেখা হলো। বললেন, যা খুশি একটা সম্পাদকীয় লিখে যাও। সংস্কৃতির ওপর একটা সম্পাদকীয় লিখে হোটেলে চলে গেলাম।

১৯৫৯ সাল, সেপ্টেম্বর মাস। আনুষ্ঠানিকভাবে আমার সাংবাদিকতা শুরু। এর আগে বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে পড়বার সময় কলকাতায় সাপ্তাহিক গণবার্তায় লিখেছি। সাপ্তাহিক যুগবাণীতে দীর্ঘদিন সম্পাদকীয় লিখেছি। তবে কারও বেতনভুক্ত কর্মচারি ছিলাম না। ইত্তেফাকেই আমার অর্থের বিনিময়ে সাংবাদিকতা শুরু। তবে ইত্তেফাকে ঢুকে বুঝলাম, শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার ঠেকানো যাবে না।

আমি ইত্তেফাকে ঢুকবার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া গ্রেফতার হয়ে গেলেন। তখন তিনি মোসাফির নামে রাজনৈতিক মঞ্চে লিখতেন। পাকিস্তান সরকার ইত্তেফাককে বরদাস্ত করতে পারত না। দেশে মানিক মিয়ার রাজনৈতিক মঞ্চ ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। এই মঞ্চের জন্যেই ইত্তেফাকের কাটতি বেশি ছিল এবং রাজনৈতিক মঞ্চে লেখার জন্যেই মানিক মিয়াকে জেলে যেতে হয়েছিল।

সম্পাদক সাহেব গ্রেফতার হবার পরে আর একটি ঘটনা ঘটল। আমি সচিবালয়ের সামনের রাস্তা দিয়ে পুরানা পল্টন মোড় থেকে প্রেস ক্লাবের দিকে যাচ্ছিলাম। ডানপাশে তখন ঢাকা জেলা গোয়েন্দা অফিস ছিল। একজন অফিসার বের হয়ে এলেন। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি পথ ঘাটে বিরক্ত করতে অভ্যস্ত। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা নাকি নতুন রাজনীতি শুরু করবেন। এবার হবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আপনারা এনএসএফ-এর সঙ্গে এক হয়ে রাজনীতি করবেন। আমার মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে গেল।

আমরা তখন এনএসএফকে সামরিক বাহিনীর দালাল বলতাম। বললাম, পায়ের স্যান্ডেল দেখেছেন। আর একবার এ কথা উচ্চারণ করলে স্যান্ডেল খুলে লাগিয়ে দেব। ওই রাস্তা দিয়ে তখন ইত্তেফাকের ফটোগ্রাফার মিজানুর রহমান সাইকেলে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ডেকে বললাম, মিজানুর দাঁড়াও। শোন এ ব্যাটা বলছে কী! আর একবার উচ্চারণ করলে কিন্তু বিপদ

www.nagorikpathagar.com

হবে। মিজান আমাকে থামাল। গোয়েন্দা বিভাগের ভদ্রলোক চলে গেলেন। ইত্তেফাকে দিন মন্দ কাটছিল না। সামরিক আইনের কড়াকড়ি। সম্পাদক জেলে। আমাদের লিখতে হতো সচেতন হয়ে। তখন সরাসরি কিছু লেখা যেত না। সবই লেখা হতো ইঙ্গিত এবং ইশারায়। এর মধ্যে আবার সামরিক আইনের ৫২ ধারা আছে। এ ধারার জন্যে ইশারায় ইঙ্গিতে কিছু বলা যাবে না। তবুও ইত্তেফাকে উপসম্পাদকীয় কলামে আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখতাম। মানুষ তখন সরকারবিরোধী লেখা চাইত। তবে মনে আছে একদিন আমি বৃষ্টি নিয়ে একটি সম্পাদকীয় লিখছিলাম। লিখেছিলাম, সেই যে শ্রাবণের শেষে মেয়েকে পরের বাড়ি পাঠিয়েছিলাম ভরা বৃষ্টির সময় তখন কি কেউ জানত যে ওই মেয়ে কলকাতার শাড়ি পরে বাড়ি ফিরে আবার একদিন কাঁদতে বসবে। সম্পাদক সাহেব খুব খুশি হলেন জেলখানায়।

মরহুম আহমেদুর রহমান তাঁর মিঠেকড়া কলামে আফ্রিকার কোনো দেশের সামরিক শাসনের তীব্র সমালোচনা করে লিখতেন ল্যাতিন আমেরিকার গণতন্ত্রের ওপর, এমেলার বিরুদ্ধে। মানুষ উৎসাহিত হতো। গোগ্রাসে গিলত। সামরিক আমলে ঢাকায় বস্তি উচ্ছেদ আরম্ভ হলো। আমি লিখলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছিল বর্ধমানের মহারাজাদের বসতবাড়িতে। ফলে হাজার হাজার পায়রা বাস্তুচ্যুত হয়। এই পায়রা বাস্তুচ্যুত হওয়া ভিত্তি করেই চলে এলাম ঢাকায় বস্তি উচ্ছেদের ঘটনায়। মনে হয় তখনি আমরা অনেকে খুঁচিয়ে লিখতে শিখেছিলাম বা শুরু করেছিলাম। সে অবরুদ্ধ হাতের লেখা। লেখা যায় না, লেখার নিয়ম নেই। লেখা শাস্তিযোগ্য, তবুও লিখতে হবে। পাঠকের চাহিদা পূরণ করতে হবে। সে অভ্যাস সহজে যায় না। স্পষ্ট না লিখে ইশারায় ইঙ্গিতে লিখেছি। তবে ঘুরিয়ে লিখলেও কিছুদিন ইত্তেফাকে ভালো ছিলাম।

তাও কাঁটায় কাঁটায় ত্রিশ দিন। ২৪ সেপ্টেম্বর ইত্তেফাকে লেখা দিয়েছিলাম। ২৪ অক্টোবর কথায় কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ঢুকেছিলাম। সকাল দশটা থেকে প্রায় রাত আটটা পর্যন্ত গল্প করেছি। চা খেয়েছি। প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম যে কলাভবনে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। এক সময় মধুদাকে চিৎকার করে বললাম, মধুদা এক কাপ চা। মধুদা বললেন, ৯৯ কাপের দাম দিয়ে যান। কারণ আসুন আর না আসুন ৯ কাপের হিসাব খাতায় লেখা থাকবেই আপনার নামে। মধুদা শুধু আমাদের চা খাওয়াতেন না। চোখে চোখে রাখতেন। হোটেলে ফিরতে রাত হলো।

www.nagorikpathagar.com

ভোর ৪টার দিকে ঘুম ভেঙে গেল টর্চের আলোয়। আমার পাশের খাটে অজয় রায়। পাশের কক্ষে রফিকুল্লাহ চৌধুরী। আমি চিৎকার করে উঠলাম, কোন শূকরের বাচ্চা টর্চ ফোকাস করছে। বাইরের দিক থেকে একটি গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এলো, নির্মল বাবু আপনার মেজাজ কি কোনোদিন ঠাণ্ডা হবে না। দুয়ার খুলুন। দুয়াল খুলে দেখলাম রমনার ওসি। সঙ্গে বেশ ক'জন পুলিশ। বললেন, চলুন। সূর্যের আলো ফুটবার পূর্বে হোটেল ডি-লাক্স থেকে বের হলাম। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন অজয় রায়, রফিকুল্লাহ চৌধুরী ও হোটেলের অন্যান্য বন্ধুরা। সামনে এগিয়ে দেখি পূর্বের সেই আইবির ভদ্রলোক। যার সঙ্গে তর্ক হয়েছিল ক'দিন আগে। জিজ্ঞাসা করলাম, কবে বের হব। ভদ্রলোক হেসে জবাব দিলেন, যদি কোনোদিন পাকিস্তানে গণতন্ত্র আসে—আপনি মুক্তি পাবেন শেষ ব্যাচে। তোপখানা রোডে তখন ঢাকা জেলার গোয়েন্দা অফিস। গোয়েন্দা অফিসে পৌছে দেখি তৎকালীন ন্যাপ নেতা (বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতা) মহিউদ্দিন আহমদ বসে আছেন। বসে আছেন নারায়ণগঞ্জের ন্যাপ নেতা শফিক খান ও হাসান জামিল। বুঝলাম, আমি একা নই। সারা দেশে সেদিন অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী গ্রেফতার হয়েছে। শুনতে পেলাম—সরকারের ধারণা ২৭ অক্টোবর নাকি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের একটা কিছু করার কথা ছিল। পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়েছিল ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর। প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ইস্কান্দার মীর্জা। ২৭ অক্টোবর বন্দুকের মুখে তাকে সরিয়ে দেয় সামরিক জান্তা। আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর ছিল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের এক বছর। গোয়েন্দা বাহিনীর ধারণা ছিল এই দিন হয়তো আমরা গোলমাল করবো।

কিন্তু এ ধরনের কোনো চিন্তা আমার মাথায় ছিল না। ন্যাপ এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিনা তাও জানি না। ছাত্রদের মধ্যে তেমন কোনো উদ্যোগ বা আয়োজন দেখিনি। এ ধরনের কোনো চিন্তা থাকলে আমি জানতাম। আজো আমার মাথায় আসছে না, কেন এ ধরনের ধারণা সেদিন গোয়েন্দা বাহিনীর হয়েছিল।

গোয়েন্দা অফিসে আমাকে জেরা শুরু করলেন জনাব মহিউদ্দিন চৌধুরী। তিনি আওয়ামী লীগ নেতা কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর পিতা। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাকে গ্রেফতার করলেন কোন ভিত্তিতে? এ পর্যন্ত কোনো ছাত্রনেতাই গ্রেফতার হয়নি। তাহলে আমাকে ধরা হলো কেন? তিনি বললেন, আমরা অমুসলমান ছাত্রনেতাদের তালিকা প্রণয়ন করেছিলাম। এ

www.nagorikpathagar.com

তালিকায় ছিল মুকুল সেন, চিত্ত ভট্টাচার্য্য, সত্য ভট্টাচার্য্য এবং স্বদেশ বসু। তারা সকলেই জগন্নাথ হলের ছাত্র। একমাত্র আপনিই ঢাকা হলের ছাত্র। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল মুকুল সেন ভারতে চলে গেছেন। চিত্ত বাবু, সত্য বাবু গভীরভাবে পড়াশুনা করছে। স্বদেশ বসু রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং বাকি থাকলেন আপনি এবং আপনাকেই গ্রেফতার করতে হলো।

আমি বললাম, দেখুন আপনাদের একটা ভুল হচ্ছে। আমি কিন্তু এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নই। ইন্সপেক্টর চৌধুরী চমকে উঠলেন। বললেন, মানে? আমি বললাম, মানে হচ্ছে—আমি জানতাম, সামরিক শাসনে আমি গ্রেফতার হবই। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র; জেলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে পারব না। তাই বেশ কিছুদিন আগে আমি ঢাকা সিটি নাইট কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। আমি চাই এ কথাগুলো আপনি আপনার রিপোর্টে লিখুন। সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানুক। ফলে আমার পরীক্ষার অনুমতি পাওয়া সুবিধা হবে।

এবার মহিউদ্দিন চৌধুরী ভিন্ন কথা শুরু করলেন। তিনি জানতে চাইলেন আমার মা কোথায়? আমি বললাম, পশ্চিমবঙ্গে। এবার তিনি বললেন, তাহলে আপনি এদেশে কেন আছেন? আমি বললাম, আপনার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, আপনার মা দেশ ছেড়ে কেন গেলেন। অথচ উল্টো আপনি জানতে চাইলেন আমি কেন এদেশে আছি। তাহলে তো আমিও আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি আপনি কেন পাকিস্তানে আছেন?

পাশে শফি খানকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন আরেকজন ইন্সপেক্টর। এবার তিনি কথা বললেন। বললেন, চৌধুরী সাহেব, আপনি কি বাতাসে বড় হয়েছেন? ১২ বছর আগে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। ১২ বছর পর আপনি নির্মল সেনকে জিজ্ঞাসা করছেন উনি পাকিস্তানে আছেন কেন।

কথায় কথায় বেলা হয়ে গেল। গোয়েন্দা অফিসেই খাবার ব্যবস্থা হলো। বিকালের দিকে আমাদের ঢাকা জেলে পাঠানো হলো। জেলে বিভিন্ন ধরনের বন্দিদের বিভিন্ন বিভাগ আছে। আমরা সিকিউরিটি আইন অর্থাৎ নিরাপত্তা আইনে আটক আছি বলে আমাদের বিভাগের নাম সিকিউরিটি বিভাগ। এই সিকিউরিটি বিভাগের তত্ত্বাবধানে এর আগে সাড়ে ৪ বছর আমি ঢাকা জেলে ছিলাম। আমাদের বিভাগে একজন জমাদার ছিল। জমাদারের নাম নজির আহমেদ। নজির আহমেদের বাড়ি ভারতের বিহারে। কিন্তু দেখতে পাঞ্জাবিদের মতো। সব সময় হাসিখুশি। কিন্তু সরকারের প্রিয়পাত্র। তার কাছ থেকে কোনো খবরই পাওয়া মুশকিল।

www.nagorikpathagar.com

ঢাকা জেলে ঢুকতেই জমাদার নজির আহমেদের সঙ্গে দেখা। হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, আবার আইলেন? এবার কোথায় থাকবেন। আমি বললাম, পুরানা জায়গায় থাকব। অর্থাৎ পুরানো হাজতে। ঢাকা জেলে ঢুকতে বাঁ দিকে পুরানো হাজত। এক নাগাড়ে চার বছর ছিলাম এই পুরানো হাজতে। এই পুরানো হাজতে এককালে ছিলেন আন্দামান ফেরত অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা। ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করার আগে তাঁদের মুক্তি দিয়ে দেয়।

জেলে ঢুকে রাজবন্দিদের কষ্ট অনেকটা কমেছে। ব্রিটিশ আমলে রাজবন্দিদের বিশেষ সুবিধা দেয়া হতো। ১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগ সরকার সে সুবিধা বাতিল করে দেয়। এর বিরুদ্ধে রাজবন্দিরা দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে। ১৯৫৬ সালে আবু হোসেন সরকারের আমলে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী প্রভাস লাহিড়ীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সুপারিশে স্টেট প্রিজনার রুলস ১৯৫৬ প্রণীত হয়। রাজবন্দিদের গ্রেড ওয়ান, গ্রেড-টুতে বিভক্ত করা হয়। সাধারণ কয়েদিদের থেকে একটু ভদ্রভাবে রাখার চেষ্টা করা হয়। তাই জেল গেটে গিয়েই বুঝলাম জেলে থাকা খুব একটা অসুবিধা হবে না। আমরা গ্রেড ওয়ান রাজবন্দি হিসেবেই জেলখানায় ঢুকলাম। পুরান হাজতে গিয়ে দেখি ইতোমধ্যে অনেক রাজবন্দি সারাদেশে থেকে এনে সেখানে জড়ো করা হয়েছে। সেখানে আছেন শহিদুল্লাহ কায়সার। তিনিও রাজবন্দি। তবে তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও আছে আওয়ামী লীগ আমলের। আছেন বরিশালের হীরণ ভট্টাচার্য। সাংবাদিক আলী আকসাদ এবং দিনাজপুরের গুরুদাস তালুকদারসহ অনেকে। বলা হতো গুরুদাস তালুকদারের বক্তৃতা দিতে কোনোদিন মাইকের প্রয়োজন হতো না। তাঁর গলাই ছিল মাইক।

গুরু দা তেভাগা আন্দোলনের নেতা ছিলেন। ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করার আগে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প এড়িয়ে একটি অগ্নিগর্ভ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল কৃষকেরা। প্রাণ দিয়েছিল অকাতরে। নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু এ আন্দোলন সামনে এগিয়ে নিতে সেদিন ব্যর্থ হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। ব্রিটিশ, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এক জোট হয়েছিল এই আন্দোলন দমন করতে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই আন্দোলন সাম্প্রদায়িক রূপ নিতে, পারে, এ আশঙ্কায় মাঝপথে আন্দোলন বন্ধ করে দেয়। সেই আন্দোলনের এক অদ্ভুত মানুষ গুরু দা। গুরুদাস তালুকদার।

বেলা বাড়তে থাকলে আমরা প্রতীক্ষায় থাকি যদি কোনো চিঠি আসে। জেলখানায় চিঠি হচ্ছে বাইরের খবর। একখানা চিঠির জন্যে মানুষের কতো প্রত্যাশা। কিন্তু গুরু দা'র কোনো চিঠি আসত না। বলতাম গুরু দা, কোনো

www.nagorikpathagar.com

চিঠি নেই আপনার? গুরু দা বলতেন—পাগল, চিঠি লিখবে কে? বাবা ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন রাজনীতি করি বলে। পোষ্যপুত্র নিয়ে সকল সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। বাবা ত্যাজ্যপুত্র করার পর কলকাতায় আসি। কলকাতায় ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে এলএমএফ পড়তাম। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসি। একবার যক্ষ্মা হলে রিলিফের জন্যে দিনাজপুরে যাই। আর দিনাজপুর থেকে ফেরা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আমার বাড়ি রংপুর। বাবা জমিদার। বাবা জীবিত থাকা পর্যন্ত আর রংপুর যাইনি। মা জীবিত থাকা পর্যন্ত দিনাজপুর এসে দেখা করতেন। পড়ার খরচ দিতেন এক জেঠতুতো বোন। মাঝে মাঝে চিঠি লিখত। সে মারা গেছে। এখন কে আমাকে চিঠি লিখবে?

গুরু দা'র কথা শুনতে শুনতে মনে হতো এ কোন রূপকথার কাহিনী। এ কোন আত্মত্যাগ। জেলখানায় গুরু দা'র কোনো চিঠি আসত না। চিঠি লিখবার কেউ নেই বলে। আমার অজস্র চিঠি আসত। চিঠি লিখবার লোক আছে। আজকের প্রজন্মকে এ কাহিনী শুনাতে গেলে বলবে—গল্প। বলবে, এ ত্যাগের কোনো মানে হয় না। আজকের সমাজে এমন লোকের অভাব আছে যারা এটুকু বলবে যে, এ লোকগুলো না জন্মালে, এভাবে সব কিছু না ছাড়লে তোমাদের এমন একটি দেশ হতো না।

এর মধ্যে দীর্ঘদিন পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে মা'র একখানা চিঠি এল। এবার তাঁরা নিশ্চিত যে, তার ছেলের একটা ঠিকানা পাওয়া গেছে। বেশ কিছুদিন হয়তো চিঠি লেখা যাবে না। মা লিখেছেন, 'দেখিতে দেখিতে ১২ বছর হইয়া গেল, তোমার সঙ্গে দেখা নাই। কোথায় থাকো, কেমন থাকো জানিতে ইচ্ছা হয়।' মা'র সাথে শেষ দেখা হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১৯ এপ্রিল। জেলখানায় মা'র চিঠি এল ১৯৬০ সালের জানুয়ারিতে। বরিশালে গ্রেফতার হয়েছিলাম ১৯৪৮ সালেরর ২০ আগস্ট। বিএসসি ফাইনাল পরীক্ষার মাত্র ৮ দিন পূর্বে। পরীক্ষা দেবার অনুমতি মিলেছিল। জেলখানায় পড়ার বই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টির পর স্বস্তি ছিল না। নিজেই জানতাম না কী হতে যাচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, দেশ ভাগ হবে আমার লাশের ওপর দিয়ে। মওলানা আজাদ বলেছিলেন, পাকিস্তান মানব না। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন, কাটছাঁট পাকিস্তান মানব না। পাকিস্তান চাই—বাংলা পাঞ্জাব ভাগ করা চলবে না। কারো কথা সত্য হলো না। জিতে গেলে ব্রিটিশ সরকার। জওহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী ভারতে ব্রিটেনের শেষ বড় লাট লর্ড মাউন্ড

www.nagorikpathagar.com

ব্যাটেনের কথা শুনলেন। ভারতবর্ষ বিভক্ত হলো। পাকিস্তান এবং ভারত হলো। বাংলা, পাঞ্জাব ভাগ হলো। কেউ জানতে চাইল না এই ভাগাভাগির ফলে সাধারণ মানুষের কী হবে। আমি নতুন প্রজন্মকে অনুরোধ জানাবো—ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ুন। জানার চেষ্টা করুন ব্রিটিশ বেনিয়াদের চরিত্র। জানুন, এই উপমহাদেশের ষড়যন্ত্রকারী নেতৃত্বের চরিত্র। এই ভাগাভাগির ফলে পাকিস্তানের করাচি আজ ৮০ লাখ ভারতীয় মোহাজেরের শহর। প্রতিদিন মারামারি ও দাঙ্গা করে বেঁচে থাকতে হয়। ঢাকার জেনেভা ক্যাম্পে মানুষ নামক এক ধরনের প্রাণী জীবনধারণ করছে। এদের জন্ম বাংলাদেশে। এদের পিতা-পিতামহ জন্মেছিল ভারতে। এরা দেশ বিভাগের শিকার। বাংলাদেশে অবাঙালি। এখন পাকিস্তানের নাগরিক। পাকিস্তান সরকার বলে দিয়েছে তাদের তারা নেবে না। কোথায় যাবে তারা, কী হবে তাদের পরিচয়? বেনাপোল থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমে যান, দেখবেন স্টেশনে স্টেশনে অসংখ্য মানুষের ভিড়। রেললাইন ধরে পাঞ্জাব-পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত যান—অন্তত একজন মানুষ পাবেন, ওদের পরিচয় এককালের এই পাকিস্তানের হিন্দু। জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে খাঁটি অবাঙালি হয়ে গেছে অনেকে বসনে, ভাষায়।

পূর্বে মিয়ানমার সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ইংল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া যান। এবার যেতে হবে পতিতালয়ে। এই পতিতালয়ে যারা আজকে আছে তাদের পূর্বপুরুষ অনেকেই এসেছিল ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় একহাত থেকে আর এক হাত হয়ে। উপমহাদেশে স্বাধীন হওয়ার পর ভারত-পাকিস্তান সরকারের যৌথ কমিশনের হিসাবে দেশ ভাগের সময় উপমহাদেশের ৬ লাখ তরুণী এবং মহিলা পণ্য হয়ে এসেছিল এ দেশগুলোর পতিতালয়ে। আর এদের জীবনের বিনিময়ে যারা নেতা হয়েছিলেন, সরকার গঠন করেছিলেন তাদের সমাধি আছে নয়াদিল্লি আর করাচিতে। এখনো এ সকল সমাধিতে হাজার হাজার দর্শনার্থী আসে প্রতিদিন। কেউ খবর রাখে না এই ভাগাভাগির ফলে কোটি কোটি মানুষের দুর্ভোগের ইতিহাস।

এ পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালে ঢাকা জেলে এসেছিলাম। মনে ভয় ছিল। পাকিস্তানের প্রথম যুগ। সবকিছু দেখা হয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে। সর্বত্রই সন্দেহ-সংশয়।

সেবার ঢাকা জেলে এসে প্রথম সবকিছু গোছানো পেয়েছিলাম। অসংখ্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ইতোমধ্যে জেলে এসে গেছেন। ঢাকা জেলে আছেন ঢাকার রণেশ দাশগুপ্ত, ধরণী রায়, বরিশালের নটু ব্যানার্জি আর কংগ্রেস নেতা

www.nagorikpathagar.com

হরিগঙ্গা বসাক। হরিগঙ্গা বসাকের ঢাকা জেলে মৃত্যু হয় ভুল চিকিৎসার জন্যে। হরিগঙ্গা বসাকের বাড়ি ঢাকার বনগ্রাম লেনে। রাজনীতি করতেন ত্রিপুরার আগরতলায়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় তিনি ত্রিপুরাকে ভারতে নেবার জন্যে তদ্বির করেছিলেন। সে জন্যে রাগ ছিল পাকিস্তান সরকারের। তাই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পরই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তিনি ১৯৪৮ সালে জুলাই মাসে ঢাকায় এলেই গ্রেফতার হয়ে যান। তখন ভারত-পাকিস্তান পাসপোর্ট চালু হয়নি। ইচ্ছে হলেই যাতায়াত করা যেত। হরিগঙ্গা বসাক অসুস্থ মাকে দেখতে এসে জেলে গেলেন। আর জেলেই তাঁর মৃত্যু হলো। কেউ আগরতলা গেলে দেখবেন একটি সড়কের নাম হরিগঙ্গা বসাক সড়ক।

১৯৪৮ সালে ঢাকা জেলে এসে প্রথমে ভয় করলেও পরে মানিয়ে নিয়েছিলাম। আর আমাদের মতো কম বয়সের কেউ জেলে না থাকায় আবার সহানুভূতি পেয়েছি সকল মহল থেকে।

তবে ঢাকা জেলে এসে বুঝেছিলাম, পাকিস্তান সরকার কাকে বলে এবং কী তার প্রকৃত চরিত্র। তখন কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ছিল সরকারকে এ মুহূর্তে আঘাত করে ফেলে দেবার নীতি। সুতরাং অনশন গণ্ডগোল জেলে প্রতিদিন লেগেই ছিল এবং এর মধ্যে পাকিস্তান সরকার রাজবন্দিদের দেয়া ব্রিটিশ আমলের সকল সুযোগ-সুবিধা বাতিল করে দেয়। রাজবন্দিদের পরিণত করা হয় সাধারণ কয়েদিতে। এ পরিস্থিতিতে ঢাকা জেলে ১৯৪৮-৪৯-৫০ সালে মোট ১২৭ দিন অনশন করেছিল রাজবন্দিরা।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৫২ সালের অক্টোবরে আমি মুক্তি পাই। তারপর ১৯৫৪ সালে বরিশালে খুনের মামলার আসামী। ১৯৫৬ সালে মামলা প্রত্যাহার। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক আইন। ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে আবার ঢাকা জেলে।

এবার খুব খারাপ লাগছিল না। ঢাকায় রাজনীতি করি। দীর্ঘদিন ছাত্রলীগ করেছি। ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিয়েছি। আওয়ামী লীগের ভাঙন দেখেছি। ন্যাপ গঠন করেছি। এবার জেলখানায় এসে দেখি অসংখ্য ন্যাপ এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জেলে। তাঁরা চেনা। তাই ভিন্ন পরিবেশ।

১৯৪৮ সালে জেলখানায় ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সে যুগের জঙ্গি নীতি। যে কোনো প্রকারে হোক জেলখানায় গোলযোগ করা। তাদের তত্ত্ব ছিল জেলখানায় গোলযোগ হলে বাইরের জনতা উত্তেজিত এবং সংগঠিত হবে। সরকার বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠবে। সরকারের পতন ঘটবে।

www.nagorikpathagar.com

এবারের চিত্র একেবারে ভিন্ন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের নামে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দল মন্ত্রিত্ব করেছে। আওয়ামী লীগ ভেঙেছে, গণতন্ত্রী দলের সঙ্গে আওয়ামী লীগের একাংশ মিলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি—ন্যাপ জন্ম নিয়েছে। এ ন্যাপ প্রাদেশিক পরিষদে কখনো আওয়ামী লীগ, কখনো কৃষক শ্রমিক পার্টিকে সমর্থন দিয়েছে। ফলে মন্ত্রিসভার ভাঙন-গড়ন হয়েছে। দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এক পর্যায়ে সামরিক বাহিনী পাকিস্তানে ক্ষমতা দখল করেছে।

প্রশ্ন আসতে পারে এ জন্যে দায়ী কে? এ অবস্থায় ন্যাপের দায়িত্ব কতটুকু? ন্যাপ বললে কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দেয়া যায় না। কারণ ন্যাপ গঠনের আগে ও পরে কমিউনিস্ট পার্টি সঙ্গে ছিল। আর ন্যাপের নেতা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এ হচ্ছে ন্যাপের প্রথম যুগ।

একদিন গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল চিৎকারে। ঘুম ভেঙে দেখলাম ন্যাপের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। একপক্ষ বলছেন ন্যাপ গঠন ভুল ছিল। আমাদের আওয়ামী লীগে থাকাই উচিত ছিল। আর একপক্ষ বলছেন—ন্যাপ গঠন ঠিক ছিল। কিন্তু গণতন্ত্রী দলের সম্পাদক সিলেটের মাহমুদ আলীকে ন্যাপের সম্পাদক করা ঠিক হয়নি। আমি বিতর্কে যোগ না দিয়ে জোরে হেসে উঠলাম। সবাই বললেন, হাসছেন কেন? আমি বললাম—দেখুন, একটা কিছু ভুল হয়েছে, নইলে দেশ সামরিক শাসন জারি হবে কেন? আর আপনারা যারা কমিউনিস্ট পার্টি করেন বা সমর্থক আপনাদের গোপন সংগঠন করাই ভালো। আওয়ামী লীগ বা ন্যাপে ঢুকে এ সকল দলকে দখল করবেন বা এ সংগঠনকে আপনার মতো চালাবেন—এ তত্ত্ব সঠিক নয়। এতে আদর্শগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। নিজের দল থাকে না। ঢাকা জেলে এককালের জাদরেল কমিউনিস্ট শামসুদ্দীন আহমদ আমার সঙ্গে ছিলেন। মুসলিম লীগ দখলের জন্যে তাঁকে আপনারা মুসলিম লীগে ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগ রাজনীতিতে গুরুত্ব পেয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর আপনাদের ভাষায় তিনি নাকি পাকিস্তানের গোয়েন্দা হয়ে গেছেন। তিনি জেলে এলেন। তাঁর ওপর আপনাদের এতো অবিশ্বাস যে, তিনি দিন-রাত আমার কাছেই থাকতেন আর দুঃখের কথা বলতেন। তাই রাত দুপুরে এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। ভুল সবাই মিলে না করলে কি সাধের পাকিস্তানে এমনি করে বারবার গণতন্ত্র বিপর্যস্ত হয়!

www.nagorikpathagar.com

এবারের জেলখানায় অনেক প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতাই ছিলেন। জীবন সায়াহ্নে শুনছি তাঁদের খেদোক্তি। দলে একের পর ভুল সিদ্ধান্তের ফলে তাঁরা বারবার জেলে এসেছেন। অনেক কমিউনিস্ট নেতাই পাকিস্তান সৃষ্টির পর বছরের পর বছর জেলে থেকেছেন। আপনজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। ঘর ভেঙেছে। কিন্তু রাজনীতি এগোয়নি। দুপুরের স্নানের সময় আমি ব্রিটিশ আমলের দেশাত্মবোধক গান গাইতাম। তখন পাশে এসে দাঁড়াতেন বরিশালের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিরণ ভট্টাচার্য। কলেজের এককালীন নামকরা ছাত্র। আত্মীয় বলতে এদেশে কেউ নেই। আত্মীয় হচ্ছে একমাত্র রাজনীতি। সে রাজনীতি বিপর্যস্ত। আমার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি গান শুনতেন। চোখ থেকে তখন টপটপ করে জল পড়ত।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন বগুড়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সুবোধ লাহিড়ী। এককালে অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। এক সময় আরএসপি করেছেন। পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছেন। জীবন মধ্যাহ্ন পার হয়েছে। দেশে সামরিক শাসন। কেউ জানে না কবে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। কবে আমরা মুক্তি পাব। সুবোধ বাবু মাঝে মাঝে গল্প বানাতেন। বলতেন, ঢাকা জেলের গেটের সামনে একটি বাদাম গাছ আছে। ওই বাদাম গাছে একটি ডাইনি বসে আছে। যে বা যারা জেলখানা থেকে বের হয়, ডাইনি তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সবাই জেলখানার কথা ভুলে যায়। সুবোধ বাবু এ কথা বলেছিলেন বড় দুঃখে। সে এক অদ্ভুত ঐতিহ্য। জেলখানায় থাকাকালীন সকলেই সকলের বন্ধু থাকে। জেল থেকে মুক্তি পাবার সময় প্রতিশ্রুতি দেয় যে, জেলের বাইরে গিয়ে সকলকে মনে রাখবে। সকলকে সম্মান করবে। কিন্তু দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া বন্ধুদের কেউ কখনো মনে রাখে না। তখন ঢাকা জেলের সুপারিন্টেন্ডেট ছিলেন নিয়ামত উল্লাহ। তার বড় ভাই রহমত উল্লাহ ১৯৫০ সালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দায়ী ছিলেন সে সময় দাঙ্গার জন্যে। কিন্তু নিয়ামত উল্লাহ ছিলেন ভিন্ন মানুষ। তাঁর ভয়ে জেলখানায় বাঘ-মোষে একসঙ্গে পানি খেত। তিনি জেলখানায় ঢুকলে জেলখানা ভিন্ন রূপ ধরত।

এক কথায় নিয়ামত উল্লাহ কঠিন লোক ছিলেন। তিনি জেলখানায় ঢুকলে জেলে পাতাটিও নড়ত না। গাছ থেকে একটি পাতা ঝরলে পর্যন্ত জেল পুলিশ কুড়িয়ে পকেটে রাখত। এই নিয়ামত উল্লাহর সঙ্গে যে কোনো কারণেই হোক আমার একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সপ্তায় বুধবার তিনি আমাদের ওয়ার্ডে আসতেন। দেখতেন আমরা কেমন আছি। একদিন আমি বললাম, আপনার জেলখানায় এসে বিপদে পড়ে গেছি। তিনি বললেন কেন? আমি

www.nagorikpathagar.com

বললাম, বাইরে থাকতে জানতাম দুধের মধ্যে জল দেয়। জেলখানায় দেখছি জলের মধ্যে দুধ দেয়া হয়। আমি একসময় রসায়নে অনার্সের ছাত্র ছিলাম। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না জলের মধ্যে দুধ দিয়ে সাদা করা হয় কী করে। জেলখানায় তো দুধের বর্ণ সাদাই দেখছি।

নিয়ামত উল্লাহ সাহেব হেসে ফেললেন। আমি একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলাম। আমার প্রয়োজন ছিল ভিন্ন ধরনের। ১৯৫২ সালে ঢাকা জেল থেকে মুক্তি পাবার সময় আমি এক ফুটফুটে বিহারী ছেলেকে দেখে গিয়েছিলাম। ছেলেটির নাম রহিম। তখন জেলখানায় অসংখ্য অবাঙালি সিপাহী ছিল। মাত্র দু'জন ছিল পাঞ্জাবের অধিবাসী। আর সবার বাড়ি বিহার এবং উত্তর প্রদেশে। বিহারের ইয়াকুব মিয়া, উত্তর প্রদেশের মাহমুদ হাদিস, উড়িষ্যার রমজান আমার কাছে দুঃখের কথা বলত। ওরা দেশ ছেড়ে এসেছে। দেশের কথা ভুলতে পারেনি। দেশ ছাড়তে গিয়ে সব হারিয়েছে। পাঞ্জাবি আলী মহাম্মদ খান এবং গোলাম খানের প্রায় স্থায়ী ডিউটি ছিল আমাদের ওয়ার্ডে। এরা ব্রিটিশ আমলের সিপাই। গোলাম খান ৮ ঘণ্টা হেঁটে হেঁটে ডিউটি করত। কখনোই বসত না। আলী মহাম্মদ খান তত কঠিন ছিল না।

১৯৫৯ সালে জেলে গিয়ে এদের খোঁজ করলাম। আলী মহম্মদ খান অবসর নিয়ে দেশে চলে গেছে। গোলাম খান কোনোক্রমে চাকরিতে আছে। বৃদ্ধ ইয়াকুব ও রমজান মিয়া এখনও ডিউটিতে এলে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে। হাদিস জমাদার হয়ে গেছে। মাহমুদ অন্য জেলে চলে গেছে। রহিম ঢাকা জেলেই আছে। একদিন সন্ধ্যার পর রহিমের সঙ্গে আমাদের দেখা। রাতের ডিউটিতে রহিম আমাদের ওয়ার্ডে এসেছিল। সে আমাকে চিনতে পেরেছে। আমি জানালার পাশে বসে পড়ছিলাম। রহিম বলল, বাবু সাব আবার জেলে এলে। তুমি বারবার কেন জেলে আস? আমি বললাম, তুমি দেশ ছেড়েছ কেন? পাকিস্তানে তুমি কী করবে। লেখাপড়া করেছে কতদূর।

রহিম ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় ১৯৫০ সালে সে বিহার থেকে ঢাকা এসেছে। আত্মীয় স্বজন অনেকেই দেশে রয়ে গেছে। তার ইচ্ছা আছে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার। আমি বললাম, তুমি পড়তে চাও? আরবি, উর্দু ছাড়া সব বিষয় আমি তোমাকে পড়াব। তুমি বড় জমাদারকে বলো। তোমাকে যেন স্থায়ীভাবে আমাদের এখানে ডিউটি দেয়।

কিন্তু ব্যাপারটি সহজ ছিল না। আমরা রাজবন্দি। রাজবন্দির ওয়ার্ডে কাউকে স্থায়ী ডিউটি দেবার নিয়ম নেই। খুব বিশ্বস্ত হলে ভিন্ন কথা। অন্যথায় রাজবন্দিদের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে এবং তাদের মারফত রাজবন্দির বাইরে

www.nagorikpathagar.com

খবর আদান প্রদান করতে পারে। তাই ব্যাপারটি সহজ ছিল না। সে প্রেক্ষিতে সুপারিন্টেনডেন্টের সঙ্গে আমার কথা বলার প্রয়োজন ছিল এবং সেদিন সুপারিন্টেনডেন্ট নিয়ামত উল্লাহ দ্বিমত করলেন না। কিন্তু আমাকে জানানো হলো রহিম আমাদের ওয়ার্ডেই ডিউটি করবে, তবে স্থায়ীভাবে নয়। মাঝে মাঝে তাকে পাল্টিয়ে দেয়া হবে।

সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। জেলখানায় যারা যায়, সবাই মুক্তি চায়। জেলে যারা থাকে বা চাকরি করে তারাও চায় আমরা যেন মুক্তি পাই। কিন্তু আমার মুক্তির কথা শুনলে রহিম বিষণ্ন হয়ে যেতে।

এছাড়া মাঝখানে আমার মুক্তির কথাও বারবার আলোচিত হতো। আমার আগে ইত্তেফাকের সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া গ্রেফতার হয়েছিলেন। তিনিও ঢাকা জেলে ছিলেন। আমি জেলে আসার পর তিনি মুক্তি পান। অনেকেই প্রত্যাশা করেছিল আমি হয়তো শিগগিরই মুক্তি পেয়ে যাব। বাইরে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল প্রখ্যাত সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বেরের সঙ্গে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি ছিলেন মোহাম্মদ আজফর। আমার গ্রেফতারের খবর পেয়ে মোদাব্বের সাহেব আজফরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমাকে কেন গ্রেফতার করা হলো। আজফর বলেছিলেন, এ ব্যাপারে সব দায়িত্ব ব্যুরো অব ন্যাশনাল রি-কনস্ট্রাকশন অর্থাৎ বিএনআর-এর প্রধান কাজী আনোয়ারুল হক-এর।

এই বিএনআর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। এই সংগঠনের দায়িত্ব ছিল বুদ্ধিজীবীদের কেনাবেচা করার। এরা দেশের প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের টাকা দিত। তাদের রচনা প্রকাশ করত। এসব রচনায় পাকিস্তান সরকারের প্রশংসা করা হতো। বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হতো শিক্ষিত মহলকে। এই সংগঠনটি তাদের এই সাহিত্যকর্মের আড়ালে গোয়েন্দাবৃত্তি করত। এদের গোয়েন্দারা ছাত্র, শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক মহলের খবরাখবর রাখত। এই সংগঠনের সুপারিশের ভিত্তিতেই কেউ গ্রেফতার হতো। কারো সরকারি চাকরি হতো। আবার কাউকে সরকারি চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হতো। এককালে এই সংস্থার প্রধান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাসান জামান এবং অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। চিফ সেক্রেটারি আজফারের কথা শুনে কিছুটা বিস্মিত হলেন মোদাব্বের সাহেব। তিনি জানতেন না যে বিএনআর গোয়েন্দা বৃত্তিও করে। তবুও তিনি কাজী আনোয়ারুল হককে জানিয়েছিলেন। তিনি বললেন, নির্মল সেন বড্ড দুর্বিনীত। সে কাউকে মানে না। রাস্তাঘাটে সবাইকে গালি দেয়। এ মুহূর্তে তাকে মুক্তি

www.nagorikpathagar.com

দেয়া সম্ভব নয়। বেশ কিছুদিন ধরে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলমাল করছে। তাকে ঢাকা হল থেকে ২৪ ঘণ্টার নোটিসে বের করে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবুও সে কোনো কিছু মানতে চাইছে না।

এ খবর জেলখানায় পৌঁছলে বুঝলাম আমি তাড়াতাড়ি মুক্তি পাচ্ছি না। বাইরে তখন সরকার মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন করার উদ্যোগ নিচ্ছে। অনেকে বলল মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন হয়ে গেলে হয়তো আমাদের মুক্তি দেয়া হতে পারে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখলাম, বিপরীত ঘটনাই ঘটেছে। একের পর এক রাজনীতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেফতার করে জেলখানায় পাঠানো হচ্ছে। তবুও আমার একটা ক্ষীণ আশা ছিল। আমি সাংবাদিক হিসেবে গ্রেফতার হয়েছি। সাংবাদিক ইউনিয়ন নিশ্চয়ই আমার মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করবে।

এবার আমার মাথায় একটা নতুন বুদ্ধি খেলল। আমি জেলে যাবার আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পরিবর্তিত হয়েছেন। ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি ইব্রাহিম আইয়ুব খান সরকারের আইনমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। আমি জেলখানা থেকে তাঁকে চিঠি লিখলাম। চিঠিতে বললাম, আপনি ভাইস চ্যান্সেলর থাকাকালীন আমি ঢাকা হলের ছাত্র ছিলাম। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের সকল ছাত্রাবাসকে ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ কসমোপলিটন করার দাবিতে অনশন করেছিলাম। আপনি কথা দিয়েছিলেন আমি অনশন ভাঙলে এই দাবিটি অন্তত আপনি পূরণ করবেন। আপনি বলেছিলেন ইকবাল হল অর্থাৎ আজকের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলকে আপনি কসমোপলিটন করবেনই। আপনি এখন আইনমন্ত্রী। আপনি আপনার কথা রাখলে বাধিত হব।

আমার চিঠি পৌঁছেছিল কি না জানি না। তবে সে চিঠির জবাব আমার কাছে কোনোদিন পৌঁছেনি আর আইয়ুব খানের আমলে কোনো হলই কসমোপলিটন হয়নি।

তবে এবার বিপদ দেখা দিল আমার বিএ পরীক্ষা নিয়ে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই দীর্ঘদিন ধরে। দলের অন্যতম নেতা রুহুল আমিন কায়সার দীর্ঘদিন যাবত মিটফোর্ড হাসপাতালে। তিনি যক্ষায় ভুগছেন। অনেক কষ্ট করে হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করিয়েছিলাম। কথা ছিল ২৫ অক্টোবর হাসপাতাল থেকে তিনি মুক্তি পাবেন। সব ব্যবস্থা হয়েছিল। ২৪ অক্টোবর তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছি। কিন্তু ওই রাতেই আমি গ্রেফতার হয়ে গেছি। ওই রাতে

www.nagorikpathagar.com

গ্রেফতার হয়ে যাবার পর শুনেছি দীর্ঘদিন রুহুল আমিন কায়সারকে হাসপাতালেই থাকতে হয়েছে। পরবর্তীকালে আরেক নেতা কমরেড সিদ্দিকুর রহমান তখন বিএ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল ঢুকেছেন। নিতাই গাঙ্গুলীর ওপর তখন পুলিশের কড়া নজর। অর্থাৎ আমি জেলে যাওয়ায় আমার মা যেমন নিশ্চিত হয়েছিলেন আমার ঠিকানা সম্পর্কে, আমার বন্ধুরা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলেন সবকিছু সম্পর্কে।

এ সময় একজনমাত্র মানুষ আমার সঙ্গী দীর্ঘদিনের বন্ধু বিএসসি ক্লাসের সতীর্থ আমার নিমতলী ডি-লাক্স হোটেলের রুমমেট তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার গবেষক অজয় রায়। তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন হিমালয়ের মতো। প্রায় প্রতিদিন তিনি ঢাকা জেলে আমার জন্যে কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকা পৌঁছে দিতেন। সিটি নাইট কলেজে গিয়ে আমার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আমার বিএ পরীক্ষার অনুমতি আদায় করেছেন। সে অজয় রায় পরবর্তীকালে ড. অজয় রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। এককালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক। বেশ কিছুদিন হলো তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। এক কথায় বলা যায়, অজয় রায় না থাকলে আমার জেলখানা থেকে বিএ পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হতো না।

কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে। অজয় রায় আমার জন্যে কতটুকু পারেন! আমি বই কোথায় পাব? এক সময় রসায়নে অনার্সের ছাত্র ছিলাম। পরে পদার্থ, রসায়ন ও গণিত নিয়ে বিএসসি পাস কোর্সের ছাত্র হলাম। রাজনৈতিক বিপত্তির জন্যে সব ছাড়তে হলো। এবার আমি বিএ'র ছাত্র। আমার পরীক্ষার বিষয় হচ্ছে—ইংরেজি, বাংলা, অর্থনীতি ও দর্শন।

ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম থেকে দু'জন বিকম পরীক্ষার্থী ঢাকায় এলেন। তাঁরা হচ্ছেন জনাব নূরুল ইসলাম ও সাইফুদ্দীন আহমেদ খান। তাঁরা আসায় আমার বেশ সুবিধা হলো। ওদের কাছে কিছু অর্থনীতির বই ছিল, কিন্তু বাংলা, ইংরেজি, দর্শনের বই কোথায় পাব? টাকাও বা কোথা থেকে জুটবে? জেলে যাবার আগে তৎকালীন অ্যাডভোকেট জেনারেল মরহুম বিএ সিদ্দিকীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পড়াতাম। তিনি আমার গ্রেফতারের খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে মাইনের টাকা জেলগেটে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বই-এর জন্যে খবর দিয়েছিলাম মোদাব্বের সাহেবকে। তিনি বই কিনে সরাসরি নিজেই গোয়েন্দা বিভাগের দফতরে চলে যান এবং অর্থনীতির একটি বই জেলখানায় পাঠিয়ে দেন।

www.nagorikpathagar.com

এদিকে তখন বাইরে তেমন আন্দোলন নেই। একদিন আমাকে জেল অফিসে ডাকা হলো। বলা হলো গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মকর্তা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। জেল অফিসে ঢুকে আমি চমকে গেলাম। দেখলাম, আমার অতি চেনা এক মানুষ সেখানে বসে আছেন। বহুদিন ধরে তাঁর সঙ্গে মধুর ক্যান্টিনে গল্প করেছি। চা খেয়েছি। তিমি আমাকে দেখে হাসলেন। বললেন, নির্মল বাবু নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছেন। আপনি জানতেন আমি আইন বিভাগের ছাত্র। রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করি, একথা সত্য। তবে প্রধানত আমি গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারি। আপনার ওপর নজর রাখার জন্যেই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। আমার মতো অনেক গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি আমার বিস্ময় কাটতে না কাটতেই একটি ভিন্ন প্রশ্ন করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ছাত্রলীগ ছাড়লেন কেন? কথা ছিল আপনি সম্পাদক এবং এমএ আউয়াল সভাপতি হবেন। সে প্রস্তাব পরে পাল্টে গেল দেশের বামপন্থীদের চাপে। তারা কেউ আপনাকে পছন্দ করল না। পরে কথা হলো মমিন তালুকদার সভাপতি হবেন। আপনি সহসভাপতি এবং এমএ আউয়াল সম্পাদক হবেন। আপনি সে প্রস্তাব মানলেন না। সে প্রস্তাব মানলে আপনি ছাত্রলীগের একচ্ছত্র নেতা হতেন।

আমি বিস্মিত হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। বললাম, এ ধারণা আপনি কেন করছেন? তিনি বললেন, দেশে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর মমিন তালুকদার কিংবা আউয়াল সাহেব নিশ্চয়ই নেতৃত্বে থাকতেন না। আপনি ছাত্রলীগকে চিনতেন। এ সংগঠনে কিছু বোহিমিয়ান সংগ্রামী কর্মী আছে। এই পুরো সংগঠন নিয়ে আপনি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে পারতেন। এ সংগঠনের সংগ্রামী ভূমিকা আপনার অন্তত অনুধাবন করা উচিত ছিল। কারণ দীর্ঘদিন এদের সঙ্গে আপনি ছিলেন এবং নেতৃত্বেই ছিলেন। আপনার সম্পর্কে তাদের কোনো প্রশ্নই ছিল না।

আমি বললাম, দেখুন আজকে ১৯৫৯ সালে একথা যেমন সত্য মনে হচ্ছে, ১৯৫৭ সালে তেমন অনুভূতি আমার ছিল না। নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা আমাকে ক্ষুব্ধ করেছিল। আমি নিশ্চিত দাবি করতে পারি, তখন আমি না থাকলে ছাত্র ইউনিয়নের এ প্রবল জোয়ারের যুগে ছাত্রলীগকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হতো। ছাত্রলীগে আমিই একমাত্র ছিলাম অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতিপন্থী রাজনীতির প্রতীক। আমার সঙ্গে একমাত্র ছিল কমিউনিস্ট পার্টির ময়মনসিংহের কাজী আব্দুল বারী। তবে ইচ্ছা থাকলেও আমার ছাত্রলীগে থাকার উপায় ছিল না। শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবার পর

www.nagorikpathagar.com

আওয়ামী লীগ একটি কমিউনিস্টবিরোধী সংগঠনে পরিণত হয়। ছাত্রলীগও আওয়ামী লীগকে অন্ধ অনুকরণ করতে শুরু করে। আমাদের দল অর্থাৎ আরএসপি সিদ্ধান্ত নেয় যে, ছাত্রলীগ ছাড়তে হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলেই আমার ছাত্রলীগে থাকা সম্ভব হয়নি। এবার তিনি প্রশ্ন তুললেন ময়মনসিংহের কাজী আব্দুল বারী সম্পর্কে। কাজী আব্দুল বারী পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ময়মনসিংহ শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মূলত কমিউনিস্ট পার্টির লোক। ময়মনসিংহে ছাত্রলীগ কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রদের দখলে থাকায় পৃথক ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করা হয়নি। কাজী বারী তাদেরই নেতা ছিল। আমরা একসঙ্গে ছাত্রলীগ থেকে পদত্যাগ করেছিলাম। ১৯৫৪ সালে একটি সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে। যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করেছিল। মুসলিম লীগ পরাজিত হয়েছিল। জেলখানা থেকে সকল রাজবন্দি মুক্তিলাভ করেছিল। অনেকের ধারণা ছিল শিগগিরই হয়তো আর জেলে আসতে হবে না। আমি খুনের মামলার আসামী হয়ে ঢাকায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। সে মামলায় আমি প্রথম দু'দিন ব্যতীত কোনোদিন হাজির হইনি। ১৯৫৪ সালের মামলা ১৯৬৫ সালে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ভেবেছি এভাবে নির্বিঘ্নে হয়তো কিছুদিন কাটানো যাবে।

কিন্তু হলো না। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া হলো। যুক্তফ্রন্টে কোন্দল হলো। সমগ্র পাকিস্তানের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। সামরিক বেসামরিক আমলারা ক্ষমতা দখল করল। দেশে সামরিক শাসন জারি হলো ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো গ্রেফতার। আমাদের মুক্ত থাকার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

আজ যাঁরা এ কাহিনী পড়বেন তাঁরা কিছুতেই সেকালের পরিস্থিতি অনুভব করতে পারবেন না। পৃথিবীতে দেশের পর দেশ বিদেশি শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে। কাছাকাছি ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়েছে। শুধু পাকিস্তান আর মায়ানমারের লোক কোনোদিন শান্তি দেখেনি। তবে পাকিস্তানের পরিস্থিতি আরো দুঃখজনক। এখানে জাতপাতের প্রশ্ন প্রধান হয়ে উঠেছিল। একটি দেশের মানুষ স্বাধীন হয়েছিল পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে যাবার শর্তে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮। এ পরিস্থিতি আমরা মেনে নিয়েছিলাম। তাই ১৯৪৮ সালের জেলের চেয়ে ১৯৫৮-৫৯ সালের জেল ছিল সেদিন থেকে অনেক নির্ভয় কিন্তু অনিশ্চিত। কারো ধারণা নেই রাজনীতির কী হবে। ১৯৫৪ সালে বিরোধী দল জিতেছিল স্বতঃস্ফূর্ততায় এবং আবেগে। রাজনৈতিক দিক থেকে দেশ তেমন এগোয়নি।

www.nagorikpathagar.com

শ্রমিক বা কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেনি। এক সময় শুধু বামপন্থী দলগুলো নিষিদ্ধ ছিল। এবার সকল দল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংসদ সংবিধান সবই বাতিল করা হয়েছে। তাহলে কী হবে?

জেলখানায় কেউ কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না। শুধু সকলের ধারণা ছিল এবারো জেলে থাকতে হবে দীর্ঘদিন। এবারো একমাত্র ভরসা ছাত্র আন্দোলন।

তবে আন্দোলন থাক বা না থাক গ্রেফতারের বিরাম ছিল না। ইতোমধ্যে জেলে এলেন ফরিদপুরের শ্যামেন ভট্টাচার্য, চুনী মুখার্জি এবং ফরিদপুরের ডিঙ্গামানিকের পণ্ডিত মশাই বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য।

পণ্ডিত মশাইয়ের পরিবার বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। পিতা মহামহোপাধ্যায়ের ছিল ধর্ম সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান। কিন্তু তিনি কমিউনিস্ট। পণ্ডিত মশাইয়ের মেজাজ তিরিক্ষি। একবার জেলখানার অফিসে একজন গোয়েন্দা অফিসার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পণ্ডিত মশাই কেমন আছেন? পণ্ডিত মশাই জবাব দিয়েছিলেন—এক চোপারের সকল দাঁত ভাঙবো। ব্যাডা জেলে রাখছো আর জিগাও কেমন আছি, জেলে কেউ ভালো থাকে? এরপর আর তাদের কথা জমেনি এবং পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে কোনোদিন গোয়েন্দা এসেছে বলে শুনিনি।

জেলখানায় দিন ভালোই চলছে। মাঝে মাঝে মুক্তি পাবার সম্ভাবনার কথা শুনি। তারপর আর কোনো কথা শুনতে পাই না। আমার মনে হতো পরীক্ষার আগে জেলে থাকাই ভালো। বাইরে গেলে ঝামেলা। শুধু জেলখানায় অসুবিধা বই নিয়ে। অগতির গতি শহীদুল্লাহ কায়সার। তিনি জেলখানায় জনপ্রিয় ব্যক্তি। দীর্ঘদিন জেলে থাকায় পরিচিত। তিনি ঘুরছেন। সকলের সঙ্গে কথা বলছেন। আবার রুমে ঢুকে লিখছেন। তাঁর সংশপ্তক এবং সারেং বৌ ওই সময় জেলে বসে লেখা। মাঝে মাঝে তিনি মামলার জন্যে বাইরে যান। একের পর এক তারিখ পড়ে। ফিরে আসেন।

আমার সঙ্গে জেল সুপারিন্টেনডেন্টের সম্পর্ক ভালো হলেও অন্যান্য জেল কর্মকর্তারা আমার ওপর খুশি নন। আমি সুপারিন্টেনডেন্টের সঙ্গে মুখেমুখে তর্ক করি। জেলখানার সব এলাকার খবর রাখি। জেল সিপাইকে পড়াই বলে সকলে কৃতজ্ঞ। ফলে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা বেজার।

হঠাৎ একদিন ডেপুটি জেলার কাজী আলতাফ হোসেনের নেতৃত্বে একদল সেপাই আমাদের ওয়ার্ডে এল। আমার পাশে এক বন্ধুর কাছে এক টুকরো সাদা কাগজ পাওয়া গেল। জেলখানায় অনুমোদিত কাগজ ছাড়া কোনো সাদা

www.nagorikpathagar.com

কাগজ রাখার নিয়ম নেই। আলতাফ সাহেব তর্ক জুড়ে দিলেন। আমি বললাম, এতে তর্ক করার কী আছে। সাদা কাগজ পেয়েছেন নিয়ে যাবেন। এ নিয়ে হইচই করছেন কেন? মনে হলো আলতাফ সাহেব আমার কথায় অখুশি হয়েছেন; উনি কোনো কথা না বলে পটপট করে পুলিশ বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন।

আমি এ নিয়ে তেমন কিছু ভাবিনি। বিকেল বেলা যোগাসন করছিলাম। সেদিন শনিবার। জেল অফিস থেকে নজির জমাদার এল। তার হাতে একটি চিরকুট। চিরকুটে লেখা আছে আমাকে জেল অফিসে যেতে হবে। নজির জমাদার বলল—আপনাকে অন্য জেলে যেতে হবে। আপনাকে এ জেলে রাখা যাবে না। সবকিছু গুছিয়ে নিন। তবে কোন জেলে আপনাকে পাঠানো হবে তা আমি জানি না।

আমি খানিকটা চমকে গেলাম। কারণ এটা জানুয়ারি মাস। এপ্রিল মাসে আমার পরীক্ষা। পরীক্ষার অনুমতি এখনো পাইনি। সব বই আমার নেই। অথচ আমাকে অন্য জেলে যেতে হবে। আমার বলার বা করারও কিছু ছিল না। সকল বন্ধুর সঙ্গেই কথা বললাম। তাদের বললাম, আমার সিট যেন ঠিক থাকে। আজকে ১২ জানুয়ারি শনিবার। আগামী ১৯ জানুয়ারি শনিবার এই জেলে ফিরে আসব। জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে চিনে না।

জেলগেটে ডেপুটি জেলার কাজী আলতাফের সঙ্গে দেখা হলো। দেখা হলো জেলারের সঙ্গে। আমি বললাম, জেলার সাহেব, একটা ভুল করলেন। আগামী শনিবার আমি আবার ফিরে আসছি। তারা দু'জনেই হাসলেন। আমার বিশ্বাস ছিল সুপারিন্টেনডেন্ট নিয়ামত উল্লাকে না জানিয়ে এ নির্দেশ স্বাক্ষর করানো হয়েছে। তিনি ঘটনা জানলে এ নির্দেশ স্বাক্ষর হতো না। আর ওরা জানত না ঢাকা জেল থেকে পরীক্ষার্থী ছাত্র বন্দিকে অন্য জেলে পাঠাবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আছে। পরীক্ষার্থী বন্দিরা ঢাকাতেই থাকবে।

কিছুক্ষণ পরে দেখলাম আর তিনজন বন্দি জেলেগেটে এসেছেন। তাদেরও আমার সঙ্গে রাজশাহী জেলে পাঠানো হবে। সঙ্গ পাওয়ায় আমার মনটা ভালো হয়ে গেল। সন্ধ্যার পরে জেলগেট থেকে ঘোড়ার গাড়িতে আমরা ফুলবাড়ি স্টেশনে এলাম। ট্রেন রাত সাড়ে দশটায়—উত্তরবঙ্গ মেইল। আমাদের স্টেশনে এসে বসে থাকতে হবে।

কিন্তু আমাকে নিয়ে বিপদ দেখা দিল জেলগেটে। আমাদের এক জেল থেকে অন্য জেলে নেয়া হবে। আমাদের কোমড়ে দড়ি বাঁধতে হবে। হাতে হাতকড়া লাগাতে হবে। এ ব্যাপারে সবাই বিদ্রোহ করে। আমার কিন্তু কোমড়ে

www.nagorikpathagar.com

দড়ি বাঁধতে এবং হাতে হাতকড়া লাগাতে মজা লাগে। কোমড়ে দড়ি আর হাতে হাতকড়া থাকলে লোকের চোখে পড়ে। মানুষ জানতে চায় আমরা কারা? কোথায় যাচ্ছি? কেন আমাদের গ্রেফতার করা হয়েছে? দেশে তখন সামরিক শাসন। অনেকেই জানেন যে, আমাদের মতো হাজার হাজার ছাত্র এবং যুবক পাকিস্তানের জেলখানায় তখন বন্দি। তবে আমার যুক্তি যাই হোক না কেন, ওই তিন রাজবন্দি কিছুতেই রাজি হলেন না কোমড়ে দড়ি দিতে। ঠিক হলো আমাদের হাতে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু কোনো হাতকড়াই আমার হাতে লাগছে না। সব হাতকড়াই বড়। আমার হাতে হাতকড়া লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি হাত বের করে আনছি। এবার ঠিক হলো প্রতীক হিসেবে আমার হাতে একটা হাতকড়া থাকবে। তবে কখনোই আমি হাত বের করব না।

রাত সাড়ে দশটায় ঢাকার ফুলবাড়িয়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ল। আমাদের সঙ্গেই রাজবন্দি শ্যামেন ভট্টাচার্য। রাশভারী চেহারা। লেখাপড়া করেছেন বিস্তর। তাঁকে তর্কে হারানো মুশকিল। রাতভর তাঁর সঙ্গে তর্ক হলো অন্যান্য যাত্রীর। বিষয় পরিবার পরিকল্পনা। শ্যামেন বাবু সবাইকে বুঝিয়ে ছাড়লেন যে, এ সমাজের মৌলিক পরিবর্তন না করে পরিবার পরিকল্পনা করতে গেলে সমাজে বিকৃতি ঘটবেই।

আমি ভাবছিলাম ভিন্ন কথা। আমাকে সাত দিনের মধ্যেই ঢাকা ফিরতে হবে। আমি আমার সাথে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম। ট্রেন ছাড়বার আগে স্টেশনে বসে গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মকর্তার কাছে চিঠি লিখলাম। লিখলাম, পরীক্ষার জন্যে আমার ঢাকা ফিরে আসা দরকার। তিনি ছিলেন ডিএসটি। যতদূর মনে আছে নাম আবদুল মজিদ। তাঁর এক ছেলে কামাল ছাত্রলীগের সদস্য ছিল। পরবর্তীকালে চাকরি নিয়েছিল বিমানে। এই মজিদ সাহেবকে আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি। অথচ তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন বারবার। ওই চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছেছিল কিনা তাও জানি না। তবে এ কথা সত্য, ৭ দিনের মধ্যে আমি ঢাকা জেলে ফিরেছিলাম।

রাজশাহী জেলে পৌঁছতে পৌঁছতে পরের দিন অর্থাৎ রোববার বিকেল হয়ে গেল। আমি জেলগেটে ঢুকেই বললাম আমি সুপারিন্টেনডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি আমাকে চিনতেন। তিনি দীর্ঘদিন বরিশাল জেলের সুপারিন্টেনডেন্ট ছিলেন। আমি তখন বিএম কলেজের ছাত্র। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে খুন মামলার আসামী। তাঁর ছেলে ভানু। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত প্রকৌশলী নূরুল উল্লা। যিনি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে জগন্নাথ

www.nagorikpathagar.com

হলের হত্যাকাণ্ডের ছবি তুলেছিলেন। ভানুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। যদিও ভানু তখন মুসলিম লীগ করত। আমার কথা শুনে ভানুর বাবা জেলগেটে এলেন। আমি তাঁকে আমার পরীক্ষা ও জেল বদলির কথা বললাম। বললাম, আমাকে তিনখানা দরখাস্তের কাগজ দিতে হবে। আমি আইজিপি, ঢাকা জেলের সুপার এবং ডিআইজি, আইবির কাছে দরখাস্ত করতে চাই। আমাকে আপনার জন্যে ঢাকায় রেডিওগ্রাম করতে হবে। আমি তিনখানা দরখাস্তের কাগজ নিয়ে জেলে ঢুকে গেলাম। তখন সন্ধ্যা নেমেছে। রাজশাহী জেলে তখন অনেক রাজবন্দি। সকল জেলখানা তালাবদ্ধ হলেও রাজবন্দি হিসেবে তাদের কিছুটা বাড়তি সুবিধা আছে। তাঁরা তখন তালাবদ্ধ হননি। আমরা তখন ওয়ার্ডে পৌঁছে গেলাম।

পরদিন জেল সুপার এলেন ওয়ার্ডে। বললেন, ঢাকার সঙ্গে কথা হয়েছে। আপনাকে পাঠাতে হবে। ঢাকা জেলের সুপার নিয়ামত উল্লাহ জানত না যে, আপনাকে বদলি করা হয়েছে। নির্দেশ এসেছে আপনাকে ফেরত পাঠাবার। তবে আমাদের এখন পুলিশ নেই। ক'দিন পরে আপনাকে পাঠালে কেমন হয়? আমি বললাম না। আমাকে শনিবার ১৯ জানুয়ারি পৌঁছাতে হবে। রাজশাহী জেলের সুপার বললেন, ঠিক আছে, জরুরি ভিত্তিতে আপনাকে পাঠাব।

মাত্র রাজশাহী জেলে এসেছি। তেমন চিনি না। সঙ্গে শ্যামেন ভট্টাচার্য, চুনী মুখার্জি এবং পণ্ডিত মশাই। পথে তেমন আলাপ হয়নি। রাজশাহী জেলে এসেও তেমন আলাপ করার সুযোগ হয়নি। আমি যাবার জন্যে ব্যস্ত। শুধু চেনাদের মধ্যে বগুড়ার দুর্গাদাস মুখার্জীর কথা মনে আছে, যিনি দীর্ঘদিন ঢাকা জেলে ছিলেন আমার সঙ্গে। আরো চেনা ছিল ছাত্র আন্দোলনের জন্যে। রাজশাহী জেলের স্মৃতি ঝাপসা থেকে গেল। আমার সেখানে থাকা হলো না। ইচ্ছে ছিল খাপড়া ওয়ার্ড দেখব। ঐ ওয়ার্ডে ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজবন্দিদের ওপর গুলি হয়েছিল। আমি তখন ঢাকা জেলে। এ দিনটি আমার কাছে মনে আছে। মনে আছে খুলনার আনোয়ারের কথা। খুলনার আনোয়ার ১৯৪৯ সালে ঢাকা জেলে এসেছিল। মাত্র কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ছোটখাটো ছেলেটি। কম বয়সের দিক থেকে আমরা তখন ঢাকা জেলে তিনজন বন্দি ছিলাম। তিনজন হচ্ছি আমি, এক সময়ের মফস্বল সাংবাদিকদের নেতা শফিউদ্দিন আহমেদ ও খুলনার আনোয়ার। বয়স কম বলে জেলখানায় তিনজন খাওয়ার দিক থেকে সুবিধা পেতাম। পাশাপাশি সেলে থেকে অনশন ধর্মঘট করেছি দিনের পর দিন।

www.nagorikpathagar.com

আনোয়ারকে ১৯৪৯ সালেই মুক্তি দেয়া হয়েছিল। তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল এলাকায়। পরে একদিন খবর পেয়েছিলাম আনোয়ার আবার গ্রেফতার হয়েছে। এবার তাকে রাজশাহী জেলে পাঠানো হয়েছে। সেই রাজশাহী জেলে গুলি হয়েছিল ১৯৫০ সালের এপ্রিলে। প্রথমে জানতে পারি নি এ গুলির কথা। যেদিন ঢাকা জেলে এ খবর পৌঁছাল তখন আমাদের প্রতিবাদ করার শক্তি পর্যন্ত নেই। দিনের পর দিন অনশন ধর্মঘট পালন করে সকলের স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত আর তখন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক লাইনের পরিবর্তন হয়েছে। জেলখানা থেকে এখন আর সংগ্রাম নয়। আপোষ আলোচনার মাধ্যমে এ দাবি দাওয়ার নীতি গৃহীত হয়েছে। অথচ আজ সে হিসেবে ধরলে ঐ লাইনের জন্যে কত কমরেড জীবন দিয়েছে। কত কমরেড জীবন ভর ভুগেছে। এখন মনে হয় যদি ঐ অনশন ধর্মঘট না হতো তাহলে অনেক ভালো থাকতাম।

সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন কথাও মনে হয়। মনে হয় কেউ আমাদের কথা জানল না। কেউ আমাদের মনে রাখল না। পাকিস্তানের প্রথম দিকের অন্ধকার দিনগুলোতে এই যে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ অমানুষিক জীবন যাপন করেছিল— যাদের সঙ্গে আচরণে পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ সরকারকেও হার মানিয়েছিল— যাদের পাকিস্তান সরকার দিনের পর দিন নাস্তিক, পাকিস্তানের শত্রু বলে গালি দিয়েছে, ভিটে-মাটি উচ্ছেদ করেছে—যাদের দেশপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ করেছে তাদের অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের পরীক্ষিত সৈনিক। ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্যে তারা ঘর ছেড়েছিল। তাদের জন্যে ব্রিটিশ ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। আর ব্রিটিশ চলে যাবার পর পাকিস্তানে তাদের পুরস্কার মিলেছিল জেল আর জুলুম। পাকিস্তানে ক্ষমতায় এসেছিল ব্রিটিশ আমলের খয়ের খাঁ—খান সাহেব আর খান বাহাদুরের দল। আজ যারা সঠিক ইতিহাস লিখতে চান তাঁদের স্মরণে রাখতে হবে ১৯৭১ সাল একদিনে আসেনি। শুধুমাত্র কোনো দল বা ব্যক্তির জন্যে দেশ স্বাধীন হয়নি। সেদিন যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদের মধ্যে আনোয়ার হোসেন একজন। জানি না খুলনার মানুষ আজ এ নামটি স্মরণ করে কি না। আদৌ জানে কি না এ নামের পরিচয়। আমি মাত্র ৬ দিন রাজশাহী জেলে ছিলাম। আমার খাপড়া ওয়ার্ড দেখা হয়নি।

১৮ জানুয়ারি শুক্রবার রাজশাহী জেল থেকে রওনা হলাম। এবার একা। শ্যামল বাবু, চুনী বাবু, পণ্ডিত মশাই রাজশাহী জেলে থেকে গেলেন। পরবর্তীকালে এঁদের কারো সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তিনজনেই এখন লোকান্তরে।

www.nagorikpathagar.com

রাজশাহী থেকে ঢাকার ট্রেন বিকেলে। তাই বিকেলের দিকে আমাকে নিয়ে পুলিশবাহিনী জেলখানা থেকে বের হলো। স্টেশনে পৌঁছাতে ভিড় জমে গেল। আমার হাতে হাতকড়া, সঙ্গে পুলিশ। সকলেই উৎসুক। হিমশিম খেয়ে গেল পুলিশ। ট্রেনে প্রথম কথা বলল মিহির গোস্বামী। সঙ্গে তার বোন বেলা গোস্বামী। নামটা আমারও মনে ছিল। ইত্তেফাকের কঁচিকাচার মেলার সদস্য। গান গায়। এদের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ। রাজশাহী এসেছে ঢাকা যাবে বলে। জেলখানা থেকে বের হয়ে এতদিনে তাদের আর খোঁজ করা হয়নি। শুধু শুনেছি বিরাট ঝড় বয়ে গেছে ঐ পরিবারের ওপর দিয়ে। মিহির চলে গেছে ভারতে।

আমাকে কেন্দ্র করে ভিড় বাড়তে থাকায় বিপাকে পড়ল পুলিশ। সিরাজগঞ্জে এসে ফেরিতে আমার কাছে কাউকে এগুতে দিল না। আমি নির্বাক বসে থাকলাম। কিন্তু বিপদ দেখা দিলো জগন্নাথগঞ্জ এসে। আমার জন্যে রিজার্ভ কোনো আসন নেই। সব বগিতে অসংখ্য যাত্রী। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী মিলে আমাকে মহিলাদের কক্ষে ওঠাল। মহিলারা প্রতিবাদ করে উঠল। দেখা গেলো ইতোমধ্যে অনেক পুরুষ যাত্রী ঐ কক্ষে উঠে গেছে। কিছুক্ষণ পর এক প্রবীণ ভদ্রলোক কক্ষে উঠলেন তাঁর কন্যাকে নিয়ে। মনে হলো কন্যাটির ঢাকায় চাকরি হয়েছে। তাকে তিনি পৌঁছে দিতে চলেছেন ঢাকায়। এরপর উঠলেন এক পদস্থ কর্মচারি। তিনি আমাকে এবং পুলিশ দেখে বুঝতে পারলেন আমার পরিচয় কী এবং তড়িঘড়ি করে কারো সঙ্গে কথা না বলে বাঙ্কারে উঠে শুয়ে পড়লেন।

ট্রেন চলতে শুরু করতেই প্রবীণ ভদ্রলোক কথা বলতে শুরু করলেন। মনে হলো তিনি কোনো কলেজের অধ্যক্ষ। এককালে বাড়ি ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। তিনি তীব্র ভাষায় সরকারকে গালি দিচ্ছিলেন ট্রেনের দুর্গতির জন্যে। সরকারের সমালোচনা করছিলেন, বলছিলেন গণতন্ত্রের কথা। বাক্‌স্বাধীনতার কথা। বলছিলেন যে দেশে বাক্‌স্বাধীনতা নেই সে দেশের মানুষ বর্বর।

কক্ষের সকলেই অবাক বিস্ময়ে তাঁর কথা শুনছিলেন। তিনি সামরিক আইনের তীব্র সমালোচনা করছিলেন। কখনো ইংরেজিতে আবার কখনো বাংলায়। আমার সঙ্গের পুলিশ এবং গোয়েন্দা বাহিনীর ভদ্রলোকদের বিব্রতকর অবস্থা। আমি আদৌ তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম না। আমার সাথে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লোকায়ত দলিল। আমি মনোযোগ দিয়ে পড়বার চেষ্টা করছি। হঠাৎ সে প্রবীণ ভদ্রলোক জোরালো কণ্ঠে ইংরেজিতে বলতে থাকলেন সামরিক

www.nagorikpathagar.com

সরকার ভেবেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো এদেশে কেউ নেই। এদেশের মানুষ আজও জানে না শ'য়ে শ'য়ে তরুণ সামরিক আইনের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে রাজশাহী, ঢাকা, কুমিল্লা জেলে আছে। ওরা বেঁচে থাকবে এবং জিতবে।

এ সময় বাঙ্কার থেকে হঠাৎ সেই পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা নিচে নামলেন। বললেন, আপনি কি লক্ষ করেছেন আপনার সামনে এমন এক তরুণ বসে আছে হাতকড়া নিয়ে। এবার প্রবীণ ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন। বললেন, কী বই পড়ছো। এবার আমার হাত থেকে বইখানা নিয়ে বললেন, এ বই না পড়লে রাজনীতি শিখবে কী করে? কী করে কষ্ট করতে শিখবে।

তারপর সকলে চুপচাপ। তিনি সারারাত লোকায়ত দর্শন পড়লেন। একটি কথাও বললেন না। পরদিন ঢাকা স্টেশনে পৌঁছলে আমাকে বইটি ফেরত দিয়ে বললেন, ভয় নেই। এদেশের মানুষ তোমাদের সঙ্গে। আমার ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত। এ মেয়েকে নিয়ে ঢাকায় এসেছি। আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এ কোন স্বাধীনতা পেলাম?

আমি নির্বাক। কৈশোরে বাড়ি ছেড়েছি। দীর্ঘদিন জেল খেটেছি। পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি। খুনের আসামী হয়েছি। কতদিন নিয়মিত খাবার জোটেনি। কিন্তু এমন কথা আমাকে কেউ বলেনি। ১৯৬১ সালের সেই কঠিন সামরিক শাসনের মুখে এদিন আমার কাছে অনেক বড় পাওয়া। এ প্রবীণ মানুষটির সঙ্গে আমার আর কোনোদিন সাক্ষাৎ হয়নি। কখনো আমি তাকে খোঁজ করিনি। কত লোক চিনেছি, দেখেছি। কত ভালোবাসা পেয়েছি। কারো খোঁজ কোনোদিন পিছু ফিরে করিনি। মনে হয় সর্বত্র হেঁটে যাচ্ছি পায়ে জল মেখে। যেন আমার সঙ্গে আমার পায়ের পাপও মিলিয়ে যায়।

তবে সেদিন ঐ প্রবীণ ভদ্রলোক আমার একটা উপকার করেছিলেন। তাঁর আচরণে আমার সঙ্গের পুলিশ এবং গোয়েন্দা বাহিনী অভিভূত। তারা ভাবল ভবিষ্যতে আমি বড় কোনো কিছু হয়ে যেতে পারি। ঢাকা স্টেশনে পৌঁছে তাদের আচরণ পাল্টে গেল। বলল, স্যার মাফ করে দিন। বুঝতে পারিনি। আপনি ইচ্ছে হলে ঢাকা শহরে জেলে যাবার আগে যে কোনো বাসায় যেতে পারেন। আপনার কোনো আত্মীয়ের বাসায় যেতে পারেন। আমরা জানি আপনি পালাবেন না। আপনাকে আমরা সন্ধ্যার আগে জেলে পৌঁছে দেব। কোনো অসুবিধা হবে না।

এ ঢাকা শহরে তখন আমার আত্মীয় বলতে কেউ নেই, আছে পরিচিত ব্যক্তি। তাঁদের বাসায় পুলিশ নিয়ে গেলে তাঁরা বিব্রত হবেন। হয়তো এ

www.nagorikpathagar.com

সুযোগে গোয়েন্দারা জেনে যাবে আমার আত্মীয়ের ঠিকানা। আমি গোয়েন্দাদের বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বললাম, চলুন জেলখানায়।

জেলগেটে ঢুকতেই জেলার সাহেবের সাথে দেখা। তিনি যেন ভূত দেখছেন। বললাম, জেলার সাহেব, আজ ১৯ জানুয়ারি শনিবার। আমার কথা রেখেছি। সাতদিন পরেই ঢাকা জেলে ফিরেছি। জেলার সাহেব বললেন, আপনার জন্যে আমার চাকরির খাতায় প্রথম কালো দাগ পড়ল। নিরাপত্তা রক্ষীদের ওয়ার্ডের জমাদার নজির আহমদ বললেন, চলুন আপনাকে ওয়ার্ডে দিয়ে আসি।

দেশের রাজনীতিতে তখন এক ভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচন হয়েছে। ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান আস্থা ভোট গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ পাকিস্তানে চালু হয়েছে সেই অভিনব 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোটের প্রক্রিয়া। এ অভিনব পদ্ধতিতে সমর্থন আদায়ের প্রক্রিয়া ভালোভাবে ব্যবহার করেছেন জিয়াউর রহমান। তিনি সংবিধান সংশোধন করেছেন, এই হ্যাঁ/না ভোট অনুষ্ঠান করে। এই ভোটে কোনোদিন কেউ অংশগ্রহণ করে না। আর সরকার পক্ষও কোনোদিন পরাজিত হয় না। লক্ষ কোটি ভোটে জয়লাভ করেন ক্ষমতাসীনরা।

শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালান। রাজনীতিকদের কোণঠাসা করার জন্যে পাবলিক অফিস ডিসকোয়ালিশন অর্ডিন্যান্স জারি করলেন। এ অর্ডিন্যান্স বলে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কেউ কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান, আবু হোসেন সরকারসহ অসংখ্য রাজনীতিকের বিরুদ্ধে এ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবু হোসেন সরকার অপরাধ অস্বীকার করলেও তাদের ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার বাতিল করা হয়। মরহুম আতাউর রহমান মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে না দাঁড়াবার মুচলেকা দিয়ে রেহাই পান।

সারাদেশে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালানো হয়। সীমান্ত প্রদেশে তিন হাজার নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। রাজবন্দিদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কোয়েটায় বন্দি শিবিরে ৪শ' বেলুচিকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় পায়ে দড়ি বেঁধে টান দিয়ে রাখা হয়। সিন্ধু প্রদেশের হায়দারাবাদে ৭

www.nagorikpathagar.com

জন ফাঁসি দেয়া হয়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ন্যাপের দফতর সম্পাদক হাসান নাসির ১৯৬০ সালে ১৩ নভেম্বর নির্যাতনের ফলে লাহোর জেলে মৃত্যুবরণ করেন। এ পরিস্থিতিতে আমাকে ঢাকা জেল থেকে রাজশাহী জেলে পাঠানো হয়েছিল। আমি ঢাকা জেলে ফিরে এলাম। ১৭ এপ্রিল আমার পরীক্ষা। কিন্তু বই কোথায়? কে দেবে?

১৯৬১ সালে জানুয়ারিতে ঢাকা ফিরে এলাম মাত্র ৭ দিন পর। সতেরো এপ্রিল আমার বিএ পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চূড়ান্ত অনুমতি তখনও আসেনি। বাইরে থেকে আমার টাকা জমা দেয়া হয়েছিল। জেলখানা থেকে পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করেছিলাম। কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারছি কিনা সে সিদ্ধান্ত আমাকে জানানো হলো না।

এদিকে ইংরেজি, বাংলার কোনো বই নেই বললেই চলে। দর্শনের বই আছে। অর্থনীতির প্রাথমিক জ্ঞান পাবার মতো বইও আছে। পাঠ্য তালিকার দু'টি বই আমার পড়া হয়েছিল। বিশ্বাস ছিল রচনা ও ব্যাকরণে ভালো নম্বর পাব। সুতরাং ইংরেজি নিয়ে তেমন ভয় ছিল না। ভয় ছিল না বাংলা নিয়েও। বাংলা গদ্যের একখানা বই ছিল। কবিতা বা অন্য কোনো বই ছিল না। আমার একটা ধারণা ছিল শুদ্ধ বাংলা ও ইংরেজি লিখতে পারলে বিএ পাস করা তেমন কঠিন নয়।

এভাবেই বিএ পরীক্ষায় বসেছিলাম। প্রথম দিনেই আমার কাছে বিস্ময়কর একটি ঘটনা ঘটল। জেলখানার ডেপুটি জেলার ছিলেন আমাদের পরীক্ষার পরিদর্শক। এক সময় তিনি আমাদের কক্ষে ঢুকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন কোনো সাহায্য প্রয়োজন আছে কিনা। তাঁর কথায় পরীক্ষার হলে বই দেখেও লেখা যায়। জেলখানায় নাকি এ ধরনের পরীক্ষা হয়। আমার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল। আমি বললাম, আপনি চলে যেতে পারেন, এ হলে আপনার প্রয়োজন নেই। ভদ্রলোক ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গেলেন। আমার বন্ধুরাও সমালোচনা করলেন। তাঁরা বললেন, ওই ভদ্রলোককে রাগানো ঠিক হয়নি। তিনি আপনার ক্ষতি করতে পারেন। কারণ পরীক্ষার সবকিছুই তাঁর দায়িত্বে। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো হলো না। কোনো মতে পরীক্ষা পর্ব শেষ হলো। বিশ্বাস ছিল পরীক্ষায় পাস করব। কিন্তু ভালো ফল করতে পারব না। অথচ সবাই আশা করেছিল জেলখানা থেকে পরীক্ষা ভালোই হবে। কিন্তু আমি জানতাম, তা হতে পারে না। আমার এখনও মনে আছে ইংরেজি বই না থাকায় আমি আন্দাজে ইংরেজি কবিতার ব্যাখ্যা লিখেছি। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছি বাইরে পড়া বইয়ের জ্ঞান দিয়ে। তবুও শেষ পর্যন্ত পাস করে গেলাম। এ পাসের পর

www.nagorikpathagar.com

সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল আমার জেলখানার ছাত্র এককালের বিহারের অধিবাসী আব্দুর রহিম। পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিন জেল অফিসে ডাক এল। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মকর্তা। এ ভদ্রলোককে আমি চিনতাম। এর আগেও আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি বললেন, আপনি শিগগিরই বাইরে খবর দিন। আনোয়ার জাহিদ ও জহিরুল ইসলামকে সাবধান হতে বলুন। তারা কিছুদিন আগে ফজলুল হক হলে সভা করেছে। সে সভার খবর আমরা জানি। ওরা সাবধান না হলে যে কোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হয়ে যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন করে আন্দোলন শুরু হতে পারে।

আমি ওয়ার্ডে ফিরে এলাম। ভাবলাম কী করা যায়। কিন্তু আমাকে ভাববার অবসর দেয়া হলো না। ইতোমধ্যে আনোয়ার জাহিদ ও জহিরুল ইসলাম গ্রেফতার হয়ে আমার ওয়ার্ডেই এল। সেদিন আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই আনোয়ার জাহিদ জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কামরুন্নাহার লাইলীকে চেনেন কিনা। আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। লাইলী ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী। প্রায় সর্বজন-পরিচিত। মিছিলের আগে থাকে। আমি ছাত্রলীগ করলেও আমার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। এই একটি মেয়েকেই আমার রাজনীতির মেয়ে বলে মনে হতো। জাহিদের প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, লাইলীকে আমি ভালোভাবে চিনি এবং মনে করি ঐ একটি মাত্র মেয়েই আমার দেশের রাজনীতি করছে। আমি তখনও জানতাম না লাইলীর সঙ্গে আনোয়ার জাহিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং শেষ পর্যন্ত ঢাকা জেলের গেটেই লাইলী ও জাহিদের বিয়ে হয়েছিল। সে বিয়েতে কেউ বাসর ঘরে যায়নি। লাইলী ফিরে গিয়েছিল তার গোপীবাগের বাসায়। আর জাহিদ ফিরে গিয়েছিল আমাদের ওয়ার্ডে।

জাহিদ ও জহির জেলখানায় আসায় আমার খুব সুবিধা হলো। এছাড়া জেলখানায় ছিল তখন আলী আকসাদ, বগুড়ার ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ছদর উদ্দীন আহম্মদ। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন মহিউদ্দীন আহম্মদ, ময়মনসিংহের বতুরায় চৌধুরী, বরিশালের হিরণ ভট্টাচার্যসহ আরো অনেকে।

ইতোমধ্যে আবদুস সামাদ সাহেব জেলখানায় এলেন (যিনি পরবর্তী সময়ে আবদুস সামাদ আজাদ নামে পরিচিত হন)। তিনি আসার পর জেলখানার রাজনীতির আবহাওয়া পাল্টে গেল। প্রশ্ন দেখা দিল জেলখানার নেতৃত্ব নিয়ে। জেলখানায় আমাদের প্রতিনিধি হবেন জনাব মহিউদ্দীন আহম্মদ। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দেবার জন্যে ছিল একটি ছোট কমিটি। এ কমিটিতে

www.nagorikpathagar.com

চার পাঁচ জন সদস্য থাকত। সামাদ সাহেব আসায় প্রশ্ন দেখা দিল মহিউদ্দীন সাহেব না সামাদ সাহেব প্রতিনিধিত্ব করবেন।

ঘটনাটি আমার কাছে চমকপ্রদ মনে হলো। জেলখানায় আমি এ ধরনের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত নই। কে নেতা থাকল না থাকল সে প্রশ্ন আমার কাছে মুখ্য নয়। জেলখানায় মোটামুটি ভালো থাকবার জন্যে আমাদের একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হয়, এর বেশি নয়।

তবুও দেখলাম সবকিছু পাল্টে যাচ্ছে। জেলখানায় প্রশ্ন উঠলো, কোন ভিত্তিতে কমিটি গঠন করা হয়েছে, প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে, এ কমিটি বা প্রতিনিধির মেয়াদকাল কত। বলা হলো সবকিছু গঠনতন্ত্র মাফিক করা হয়েছে কিনা।

আমার হাসি পেল। দেশে সামরিক শাসন, সংসদ নেই, সংবিধান নেই। আর জেলখানায় আমরা বিতর্ক করছি গঠনতন্ত্রের। তবে আমরা শেষ রক্ষা করতে পারলাম না। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হলো, নতুন কমিটি এবং নতুন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। অনির্দিষ্টকালের জন্যে কোনো কমিটি বা প্রতিনিধি থাকতে পারবে না।

এবার আমি, জহির, আনোয়ার জাহিদ এবং আলী আকসাদ ভিন্ন আলোচনা করলাম। আমরা জানতাম আমাদের ওয়ার্ডের রাজবন্দিরা এক সঙ্গে বৈঠক করবে এবং নিশ্চয়ই নতুন কমিটির নাম প্রস্তাব করবে। আজ ঐ কমিটিতে আমাদের কোনো একজনের নাম থাকবেই। তখন আমরা নাম প্রত্যাহার করব। ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে। তখনি আনোয়ার জাহিদ একটি বক্তৃতা দেবে এবং তারপরেই আমি নতুন প্রস্তাব তুলব। ঘটনা তেমনই ঘটল। কমরেড বতুরায় চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। তিনি অন্ধ। একের পর এক প্রস্তাব এল। সব প্রস্তাবেই আমার কিংবা জাহিদের নাম থাকত। আমরা দাঁড়িয়ে নাম প্রত্যাহার করতাম। ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হলো। এবার জাহিদ উঠে একটি ছোট বক্তৃতা দিল। আমি উঠে একটি প্রস্তাব দিলাম। আমি বললাম, আমি যে প্রস্তাব করব সে প্রস্তাবের কোনো সংশোধন হবে না। সংযোজন যা বিয়োজন হবে না। আমার প্রস্তাব পুরোপুরি মেনে নিতে হবে। আলী আকসাদ, আনোয়ার জাহিদ, জহিরুল ইসলাম আমার প্রস্তাব সমর্থন করল। ময়মনসিংহের কাজী আব্দুল বারীও আমার প্রস্তাব সমর্থন জানাল। আমার প্রস্তাব ছিল এই বৈঠকে সাতজনকে নিয়ে একটি কমিটি হবে। এই কমিটির বৈঠক বসবে। কমিটিতে নতুন সদস্য নিতে হলে এই কমিটির কাউকে পদত্যাগ করতে হবে। এই কমিটিই প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। আমার

www.nagorikpathagar.com

প্রস্তাব গৃহীত হলো। ঐ কমিটিতে মহিউদ্দীন আহম্মদ এবং আবদুস সামাদ আজাদ দু'জনই ছিলেন। ঐ কমিটি মহিউদ্দিন আহম্মদকেই আবার প্রতিনিধি নির্বাচন করল। আমাদের কাছে এক দুঃসহ প্রহরের অবসান হলো।

যারা জেলে যায়নি তারা এ পরিস্থিতি বুঝতে পারবে না। জেলখানা সীমাবদ্ধ এলাকা। বন্দির সংখ্যাও সীমিত। সেখানে দলাদলি ও কোন্দল থাকলে পরিবেশ বিষাক্ত হয়। স্বাভাবিক জীবন যাপন করা যায় না। এরকম ঘটনা এ উপমহাদেশে বারবার ঘটেছে। জেলখানায় দল ভেঙেছে। দল গড়েছে। এক দল অন্য দলের মুখ দেখাদেখি করেনি। অগ্নিযুগের বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন ভেঙে যুগান্তর হয়েছে। বিপ্লবী দল ভেঙে নতুন গ্রুপ হয়েছে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.বি) ঢাকার শ্রীসংঘ। এমনি করে অসংখ্য বিপ্লবী গ্রুপ গড়ে উঠেছিল। তাদের তাত্ত্বিক অনুশীলন হয়েছিল জেলখানায়। জেলখানায় সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের একটি অংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। অপর একটি অংশ কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রী দল সিএসপিতে যোগ দেয়। পরবর্তীতে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল আরএসপি গঠন করে। কেউ গঠন করে আরসিপি (বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি)। জেলখানার কমরেডদের সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জনযুদ্ধ তত্ত্ব গ্রহণ করে। জেলখানার এ তাত্ত্বিক বিতর্ক সর্বকালে ছিল এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু সে কালের সঙ্গে এ কালের অনেক তফাৎ। আমরা সে দিন তর্ক করছিলাম জেলখানার নেতৃত্ব নিয়ে। তার সঙ্গে দেশের রাজনীতির কোনো সম্পর্ক ছিল না।

সামরিক শাসন জারি হয়েছে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর। আমরা গ্রেফতার হয়েছিলাম ১৯৫৯ সালের ২৪ অক্টোবর। ১৯৬১ সালে ঢাকা জেল থেকে শেষ পর্যন্ত ডিগ্রি পাস করি। এটাই আমার ছিল সবচেয়ে বড় পাওয়া।

প্রথম থেকেই সামরিক শাসনকে মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছিল। সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর এক বছর বাইরে ছিলাম। এই এক বছরের সামরিক শাসনের বহুরূপ দেখেছি। সামরিক শাসন জারি হলে অসংখ্য আইন প্রণীত হয়। দেয়াল পরিষ্কার থেকে মাঠ পরিষ্কার রাখা পর্যন্ত সবকিছুকেই আইনের আওতায় নেয়া হয়। ঘোষণা করা হয় দণ্ডের বিধান। প্রায় সব অপরাধের জন্যে নিম্নতম দণ্ড ছিল চৌদ্দ বছর। এমনকি ইশারায় ক্ষতিকারক কথা বলা ছিল দণ্ডনীয়। আমরা বলতাম। সব অপরাধেই নিম্নতম দণ্ড হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে 'ক' অক্ষরটির বড় বিপদ ছিল। 'ক' হচ্ছে কেরানি, কনস্টেবল এবং কুকুর। তখন কেরানিদের মাথাগুঁজে কাজ

www.nagorikpathagar.com

করতে হতো, কনস্টেবলদের ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। বেওয়ারিশ কুকুরগুলো মেরে ফেলা হতো। সামরিক শাসকেরা ক্ষমতায় এসে জনপ্রিয় হবার চেষ্টা করত। তারা দুর্নীতি ও মজুদদারের বিরুদ্ধে কড়া কথা বলত। মজুদদারেরা ভয় পেত। তাই মজুদ মাল বাজারে ছেড়ে দিত। প্রথম দিকে সব পণ্যই সস্তা হয়ে যেত। ফলে মানুষ কিছুটা খুশি হতো। দু'একজন দুর্নীতিবাজকে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিত। সামরিক শাসকরা জানত তাদের গণভিত্তি নেই। তাই কিছু চমকপ্রদ কাজ করার চেষ্টা করত। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে রাস্তায় হাঁটা যেত না। সেনাবাহিনীর লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকত। তখন থেকেই শুরু হয় সিনেমায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন। সিনেমায় জাতীয় পতাকা দেখাবার সময় কেউ বসে থাকলে তার শাস্তি পেতে হতো। আইয়ুব খান তার অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ জায়েজ করার জন্যে সিনেমায় জাতীয় পতাকা দেখিয়ে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো কৌশলই কাজে আসেনি। প্রতিবারই সামরিক আইন জারি হবার পর এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এরশাদের আমলে সামরিক শাসন জারি হবার পর সেনাবাহিনীর সদস্যরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছেলেদের বড় চুল কেটে দিয়েছে। অনাবৃত উদরের মহিলাদের উদরে আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছে।

আইয়ুব খান আমলে প্রথম দু'বছর এ ধরনের অনেক ভঙ্কিচঙ্কি করা হয়েছে। কাজে আসেনি। আইয়ুব খান বিখ্যাত হয়েছিলেন কমিটি গঠনের জন্যে। সব ব্যাপারেই তিনি একটি কমিটি গঠন করতেন। এসব কমিটির রিপোর্ট কোনোদিনই বের হতো না। সে ঐতিহ্য এখনো অটুট।

আইয়ুব খানের আমলে উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, ভারতের সিন্ধুনদের পানি চুক্তি। ১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

লক্ষণীয়, এই চুক্তির ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদের পানি বণ্টনের ব্যবস্থা হয়। অথচ সেকালে গঙ্গার পানি বণ্টনের কোনো ব্যবস্থাই গৃহীত হয়নি।

আইয়ুব খানের আমলে অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে—পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন। পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটে থাকলেও ১৯৬১ সালের ৩ এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তেল অনুসন্ধান চুক্তি স্বাক্ষর করে। তবে এর একটি ভিন্ন পটভূমি ছিল। পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হবার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার। তখন বিমানঘাঁটি থেকে

www.nagorikpathagar.com

বিমান সোভিয়েত ইউনিয়নের আকাশে উড়ে যায়। সোভিয়েত সামরিক বাহিনী বিমানটি ধ্বংস করে। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ সুস্পষ্ট ভাষায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে জানিয়ে দেন যে, এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেয়া হবে। অপরদিকে ১৯৬০ সালে নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জন এফ কেনেডি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ডেমোক্রেটিক পার্টি ঐতিহ্যগতভাবে ভারতের সমর্থক। এই পরিপ্রেক্ষিতেই পররাষ্ট্রনীতি ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করতে হয়। এই পররাষ্ট্রনীতি ঢেলে সাজাতে গিয়ে তাঁকে বিশেষ করে সতর্ক হতে হয়।

ইতোমধ্যে পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিরোধীদলীয় তৎপরতা শুরু হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী কিছুটা তৎপর হতে থাকেন এবং নতুন করে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। এ সময় জেলখানায় একটি ভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হই।

জেলের বাইরে থাকতে শুনেছিলাম ভারত-পাকিস্তান এক করার চেষ্টা হচ্ছে। নাগাল্যান্ডে স্বাধীনতা আন্দোলনে পাকিস্তান নাকি সহায়তা করছে। ঢাকা জেলে এই দু'টি ব্যাপারেই আমার ভিন্ন অভিজ্ঞতা হলো। পরস্পর জানতে পারলাম নাগাল্যান্ড বাহিনীর প্রধান সেনাপতি (সিএনসি) ঢাকা জেলের ২০ নম্বর সেলে আছেন। তাঁকে নাকি জেলখানায় রেখেই আলোচনা করা হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান সম্পর্কে ভারত সরকার প্রতিবাদ জানালে তাঁকে নাকি গ্রেফতার করে জেলে রাখা হয়।

জেলখানায় আমার তিন রাজবন্দির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁরা বৃহত্তর ময়মনসিংহের অধিবাসী। এই তিনজন হচ্ছেন আবদুর রহমান সিদ্দিকী, হাবিবুর রহমান এবং আরএম সাঈদ। দেশ স্বাধীন হবার পর আরএম সাঈদের সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল। শুনেছি গফরগাঁওয়ের আরএম সাঈদ রক্ষী বাহিনীর গুলিতে মারা গেছেন।

জেলখানায় আরএম সাঈদ ও হাবিবুর রহমানের সঙ্গে আমি এক ওয়ার্ডে ছিলাম। হাবিবুর রহমানকে আমি পড়াতাম। তাঁদের কথা কতটুকু সত্য জানি না। তাঁরা বলেছিলেন, ভারত-পাকিস্তান এক করার জন্যে তাঁরা নয়াদিল্লিতে নেহেরুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। নেহেরু তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত করেননি। তাঁদের পাঠিয়েছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কাছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁদের পাঠিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা কালাচরণ ঘোষের কাছে? এর বেশি কিছু তাঁদের কাছে জানতে পারিনি। তাঁদের নাকি পাঠিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম আবুল মনসুর আহমেদ। আজকে

www.nagorikpathagar.com

যাঁরা স্বাধীনতার অবিকৃত ইতিহাস লিখতে চান, জানি না তাঁরা এ ঘটনা জানেন কিনা।

আইয়ুব খানের আমলে জেলখানায় অনেক বাহিনী ছিল। জেলখানায় তখন তর্ক বিতর্কের শেষ ছিল না। তবে এ তর্ক-বিতর্কের মধ্যেও একজন হাসিমুখী মানুষ ছিলেন। তিনি নরসিংদীর আবুল হাশিম মিয়া। তিনি আমাদের সঙ্গে একই দিনে গ্রেফতার হয়েছিলেন। জেলখানায় ঢুকতেই তিনি গল্প করলেন—ভাই আমি গণতন্ত্রের কথা বলেছি। আমাকে গ্রেফতার করা একান্তই অন্যায় হয়েছে। হাশিম সাহেবের কাহিনী হচ্ছে, সামরিক শাসন জারি হবার পর কর্নেল ভাট্টি নরসিংদীতে আসেন। তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে নিয়ে এক আলোচনা সভা করেন। ঐ আলোচনা সভায় ন্যাপের পক্ষ থেকে বক্তা হিসেবে ছিলেন হাশিম সাহেব। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন—সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। পাকিস্তান গণতন্ত্রের দেশ। এক সময় মুসলিম লীগ ক্ষমতায় ছিল। রিপাবলিকান পার্টি ক্ষমতায় ছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। এবার সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় এসেছে। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা থেকে চলে গেলে অন্য কোনো দল ক্ষমতায় আসবে, এটাই গণতন্ত্রের নিয়ম।

মনে হয় কর্নেল ভাট্টি হাশিম সাহেবের এ গণতন্ত্রের ভাষণ হজম করতে পারেননি। তাই তাঁকে জেলে পাঠিয়েছেন আমাদের গণতন্ত্রের চর্চা অব্যাহত রাখার জন্যে। কারণ জেলখানায় আলাপ আলোচনায় কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। সে ব্যাপারে জেলখানায় একেবারেই অবাধ স্বাধীনতা।

একটি ব্যাপারে হাশিম সাহেবের কথা এখনও মনে পড়ে। তিনি ঢাকা জেলা ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক। ঢাকা জেলা ন্যাপের সম্মেলন হচ্ছে ঢাকা শহরে। সম্মেলন শেষে প্রস্তাব পাঠ শুরু হয়েছে। প্রস্তাব পাঠের প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে—বিশ্বশান্তি সম্পর্কে। এই প্রস্তাব উত্থাপিত হলো, হাশিম সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ভাইসব, আগেই বিশ্ব শান্তির প্রস্তাব তুললেন। আগে দেশের কথা বলা ভালো নয় কি? এ রাজনীতি দেশের মানুষ গ্রহণ করবে কি?

বিভিন্ন প্রসঙ্গে হাশিম সাহেব এ ধরনের কথা বলতেন। আমরা চুপচাপ শুনতাম। হালকা হতাম। হাসতাম। সে হাশিমকে একদিন হঠাৎ ঢাকা জেল থেকে বদলি করে দেয়া হলো। মনটা খারাপ হয়ে গেলো।

কিছুদিন পরে গোয়েন্দা বিভাগের এক ভদ্রলোক এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর প্রশ্ন ছিল এক রাতে ঢাকা হলে ময়মনসিংহের কাজী বারী

www.nagorikpathagar.com

আপনার কক্ষে এসেছিলেন। আপনি সে রাতে হলে আসেননি কেন? অথচ কাজী বারী আমার কক্ষে গিয়েছিল এ কথা আমি প্রথম শুনলাম।

কে এই কাজী বারী? কেন সে আমার ঢাকা হলের রুমে গিয়েছিল? কাজী বারী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। প্রকাশ্যে ন্যাপ নেতা। এককালে এক সঙ্গে আমরা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ করেছি। কাজী বারী ছিলেন ছাত্রলীগের ময়মনসিংহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক। আমরা এক সঙ্গে ১৯৫৭ সালে ছাত্রলীগ থেকে পদত্যাগ করি।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হবার পর আমার কাজী বারীর সঙ্গে দেখা হয়নি। তাই জানতাম না কেন কাজী বারী সেদিন আমার কক্ষে এসেছিল। গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তা বিশ্বাস করতে চাইলেন না যে কাজী বারী সম্পর্কে আমি কিছু জানি না বা সে দিনের ঘটনা সম্পর্কে আমি কিছু জানতাম না। অবিশ্বাস নিয়েই গোয়েন্দা কর্মকর্তা আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজী বারীর সঙ্গে আমার ঢাকা জেলে দেখা হলো। জেলে তখন বন্দির সংখ্যা বেড়েছে। ঢাকার রিকশা শ্রমিক নেতা সেলিম, ন্যাপের গোলাম মোস্তফা, কমিউনিস্ট পার্টির মৃণাল বাড়ুরী, ন্যাপের সর্দার হালিম, পীর হাবিবুর রহমান, তারা মিয়া, রংপুরের মোহাম্মদ আফজালসহ অনেকে। বাইরের জগতে সামরিক শাসকদের ভয় বাড়ছে। আর একের পর এক গ্রেফতার হচ্ছে। শহীদুল্লাহ কায়সারের সাজা হয়ে গেছে। তিনি চলে গেছেন সাত নম্বর সেলে। আমাদের সরিয়ে আনা হয়েছে দু'নম্বর ওয়ার্ডে। এখানে টেবিল টেনিস এবং ভলিবল খেলার ব্যবস্থা আছে। এই ওয়ার্ডে একদিন কাজী বারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কক্ষে কেন গিয়েছিলেন? কাজী বারী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ময়মনসিংহের ভাষায় বললেন—কি আর কমু আপনারে পাইলাম না, তাই শুইয়া থাকলাম।

সামরিক শাসন আমলে কাজী বারীর সাজা হয়েছিল দশ ঘা বেত। ঢাকা জেলে কাজী বারীকে বেত্রাঘাত করা হয়। সেদিনের ঘটনা এখনো আমাকে উদ্বেলিত করে। কাজী বারীকে রাজনৈতিক অপবাদে সামরিক শাসক যে এভাবে মারবে আমরা তো কিছুতেই ভাবতে পারি না। ১৯৪৮-৪৯-৫০ সালের জেল হলে জেলখানায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যেত।

কাজী বারী বেত খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বহুমূত্র তাঁকে আচ্ছন্ন করে। কাজী বারী এমনিতে কানে কম শুনতেন। এবার যেন একবারে বধির হয়ে যান। জেলখানায় থাকতে থাকতে কাজী বারীর সঙ্গে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ

www.nagorikpathagar.com

হয়। আমি তাঁকে আশ্বাস দিই, যদি আমি তাঁর আগে জেলখানা হতে মুক্ত হই তাহলে আমার মুক্তির এক মাসের মধ্যে আমি তাঁকে মুক্ত করবই। সে কথা আমি রক্ষা করেছিলাম। সে কাহিনী পরে বলব। অথচ রাজনীতির দিক থেকে আমরা দুই মেরুতে। কাজী বারী কট্টর স্টালিনপন্থী। আর আমিও কট্টর স্টালিনবিরোধী—লেনিনবাদী। কাজী বারী কমিউনিস্ট পার্টির লোক। আমি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের লোক। কাজী বারীকে মুক্ত করতে গেলে পুলিশ প্রশাসনও অবাক হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি বা ন্যাপের কেউ নয়, কাজী বারীকে মুক্ত করবে আরএসপির নির্মল সেন।

এ সময় একদিন গভীর রাতে বড় জমাদার এসে বলল, বাবু আপনাকে সামসুদ্দিন খোঁজ করছে। সামসুদ্দিন ঢাকা হলের বাবুর্চি। আমি ঢাকা হলের ছাত্র ছিলাম। শুনলাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র গ্রেফতার হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে সামসুদ্দিনসহ ঢাকা হলের অনেক কর্মচারী। গভীর রাতে ওদের জেলে আনা হয়েছে। সারাদিন খাওয়া হয়নি। তাই ওরা আমাকে খুঁজছে। আমি বড় জমাদারকে বললাম, বেআইনি কাজ করতে হবে। গুদামের লোক এনে চিনি ডাল বের করতে হবে। নাইট গার্ডদের দিয়ে রান্না করে ওদের রাতেই খাওয়াতে হবে। কীভাবে বড় জমাদার এ কাজটি করেছিল তা আমি জানি না। শুধু জানতাম জেলখানায় রাজবন্দিদের সেকালে একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। সেকালে যারা বিনা বিচারে বন্দি হতাম আমাদের বিরুদ্ধে আজকের অনেক রাজনীতিকদের মতো দুর্নীতির অভিযোগ থাকত না। আজকাল অনেক রাজবন্দি টাকা দিয়ে জেলখানায় সম্মান কেনে। আর আমাদের ছিল ভিন্ন মর্যাদা। জেলখানা কর্তৃপক্ষ এ মর্যাদা আমাদের দিতে কুণ্ঠিত হতেন না।

শুধু ঢাকা হলের কর্মচারী সামসুদ্দিন নয়, জেলে এসেছেন অনেক ছাত্র। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি করাচিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। ৩১ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতারের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) আবার গ্রেফতার হন। ৭ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হন শেখ মুজিবুর রহমান। একই সময় গ্রেফতার হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমেদ।

ঢাকা জেল তখন জমজমাট। জেলখানার বিভিন্ন এলাকায় সকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শেখ সাহেব ঢাকা জেলেই আছেন। আমাদের ওয়ার্ড থেকে সকালের খাবার যায়। আমাদের ম্যানেজার জহিরুল ইসলাম তখন সারাদিন ব্যস্ত। ছাত্রদের মধ্যে তখন অনেকে জেলে এসেছে। অনেকের নাম আমার

www.nagorikpathagar.com

স্মরণ নেই। স্মরণ আছে রাশেদ খান মেনন ও হায়দার আকবর খান রনোর কথা। মনে আছে ঢাকা হলের দিলীপ দত্তের কথা। মনে আছে রায়েরবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র কাজী হাতেম আলীর কথা। কাজী হাতেম আলী ছিল আমাদের দলের অন্যতম নেতা মরহুম রুহুল আমিন কায়সারের প্রিয় ছাত্র। রুহুল আমিন কায়সার তখন রায়েরবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। আন্দোলনে অসংখ্য স্কুলের ছাত্র গ্রেফতার হয়েছিল। তাদের মুক্ত করার জন্যে রুহুল আমিন সাহেব সকল শিক্ষকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। সেই শিক্ষকরা ছাত্রদের পক্ষে আদালতে মামলা জুড়েছিল। ফলে ছাত্ররা কারাগার থেকে মুক্তি পায়।

জেলখানায় তখন রটে গেল শেখ সাহেব নাকি আগরতলায় গিয়েছিলেন। তিনি নাকি সেখানে ভারত সরকারের সাথে আলাপ করেছেন। জেলখানায় শেখ সাহেবের কাছাকাছি ছিলাম না। তাই এ ব্যাপারে কোনো আলাপই হয়নি। পরবর্তীকালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হলে মনে হয়েছিল সে খবরের কিছুটা হলেও সত্যতা ছিল।

এ সময় একদিন একটি ঘটনা ঘটল জেল গেটে। আমাকে জিজ্ঞাসা করার জন্যে গোয়েন্দা বাহিনীর এক লোক এসেছেন। তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন জেল অফিসে। ঐ সময় অসংখ্য ছাত্র জেলে থাকায় তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা প্রতিনিধি জেল অফিসে আসত। সেদিনও এসেছিল। সেদিন একজন সামরিক বাহিনীর অফিসার একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। ছাত্রটিকে আমি চিনতাম। তার ডাক নাম হিরু। এক সময় শুনলাম সামরিক বাহিনীর ঐ অফিসার হিরুকে ধমকাচ্ছে। বলছে, সত্যি কথা না বললে ১৪ বছর সাজা হবে। আমি বললাম, আপনি সাজা দেয়ার কে। ভদ্রলোক এবার আমার ওপর চটে গেলেন। বললেন, আপনি কে? কেমন কথা বলছেন। আমি বললাম, আমি রাজনীতি করি আর আপনি সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারি। সাজা দিতে পারে আদালত। আপনি নন। আপনাকে বারণ করছি, আপনি ওকে ধমকাবেন না।

এবার আমার সাক্ষাৎ গ্রহণকারী গোয়েন্দা একটু ভড়কে গেলেন। তিনি বললেন, আপনি কথা বলছেন কেন? আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলবো না। আমি ওয়ার্ডে ফিরে যাব। আমি ডেপুটি জেলারকে বললাম আমাকে ওয়ার্ডে নিয়ে আসুন।

সন্ধ্যার দিকে ডেপুটি জেলার এলেন। বললেন, আপনাকে নিয়ে বিপদ হয়েছে। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে। নির্দেশ হয়েছে আপনাকে অন্য

www.nagorikpathagar.com

জেলে পাঠাবার। আমরা জানিয়েছি, উনি ছাত্র তাই অন্য জেলে পাঠানো যাবে না। তিনবার নির্দেশ এসেছে আপনাকে ছাত্রদের থেকে দূরে অন্য কোনো সেলে রাখবার। আমরা বলেছি, ঢাকা জেলের সব সেলে ছাত্ররা আছে। সুতরাং তাকে জেলে পাঠানো যাবে না। অর্থাৎ আমি ওয়ার্ডেই থেকে গেলাম। আমাকে বদলি করা গেল না।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য ক্ষেত্রে। বাইরে ছাত্র আন্দোলন। ছাত্ররা দাবি করেছে পরীক্ষার তারিখ পিছাবার। তারা নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা দেবে না। ঢাকা জেলে আমরা তিনজন পরীক্ষার্থী। আমি অর্থনীতি এমএ প্রথম পর্বে। আমরা জেলখানার কমিটির কাছে সিদ্ধান্ত চাইলাম। বললাম, আপনারা সিদ্ধান্ত দিন আমরা পরীক্ষা দেব কিনা। বাইরে ছাত্ররা আমাদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করেছে। তারা পরীক্ষা দিচ্ছে না। তাই আমাদের পরীক্ষা দেয়া কি ঠিক হবে?

জেলের বন্ধুরা কোনো সিদ্ধান্ত দিলেন না। বললেন, এ সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত। কারণ আপনার শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে জড়িত। এতে আমি পড়লাম বিপদে। প্রথম দিনে আমার পরীক্ষা। তাই আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি পরীক্ষা না দিলে অপর দু'জনও পরীক্ষা দেবে না। এমনকি আমার পরীক্ষা দেয়া হয় না। জেলের বাইরে থাকতে পরীক্ষা দেবার সুবিধা হয় না। শেষ পর্যন্ত জেলে এসে বিজ্ঞানের পরিবর্তে কলা নিয়ে বিএ পাস করলাম। এবার জেলেও পরীক্ষা দিতে পারব না। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার হলে গেলাম। গিয়ে বললাম, আমি পরীক্ষা দেবো না। জেল কর্তৃপক্ষ অবাক হলেন। খুশিও হলেন। জেলার সাহেব বিকালে জানালেন, ভাইস চ্যান্সেলর আপনার পরিচয় জানতে চেয়েছেন—তিনি বলেছেন এ ছেলের পরিচয় কী যে, জেলখানায় পরীক্ষা দিতে অস্বীকার করে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন ড. মাহমুদ হোসেন—ভারতের তখনকার রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হোসেনের ভাই— যার জন্যে পরবর্তীকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পেরেছিলাম।

বাইরে আন্দোলন শুরু হয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের পূর্ব পাকিস্তানে সফর শুরু করার কথা। গোয়েন্দা রিপোর্ট হচ্ছে ছাত্ররা আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাজনীতিকরাও গোপনে বৈঠক শুরু করেছে। এ বৈঠক হচ্ছে বিয়ের দাওয়াতে বা এ ধরনের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতেই শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ৩০ জানুয়ারি গ্রেফতার করা হলো। কারণ তিনিই তখন পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে একমাত্র গ্রহণযোগ্য নেতা। তিনি

www.nagorikpathagar.com

ইতোমধ্যে দু'অংশের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং যে কোনো মুহূর্তে তাঁর আলোচনার ওপর ভিত্তি করে নতুন আন্দোলন শুরু হতে পারে। শেষ পর্যন্ত সে আন্দোলন সরকারই শুরু করলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে।

বাইরে আন্দোলন শুরু হলে ভেতরে আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। আন্দোলন দানা বাঁধে, সরকার নরম হয় এবং এক সময় রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে শুরু করে। আন্দোলন শুরু হবার পর এমন একটি চিন্তা আমাদের সকলকে পেয়ে বসেছিল। কারণ শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলে রেখে আইয়ুব খানের ক্ষমতায় থাকা যে সম্ভব নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু জেলখানায় সকলের জীবন সমান যায় না। যাদের পুত্র পরিজন আছে জেল তাদের জন্যে এক দুর্বিসহ জগৎ। যাদের বাইরে থাকা স্ত্রী-পুত্রের অন্নের সংস্থান নেই, তাদের জেলখানায় বিনিদ্র রজনী কাটে। জেলখানা থেকে মুক্তি পাবার চিন্তাও তাদের পাগল করে দেয়। কারণ তারা জানে না জেলখানা হতে বের হয়ে কোন অবস্থায় দেখবে তার অসহায় স্ত্রী-পুত্রকে।

এমনি এক রাজবন্দি ছিলেন প্রখ্যাত রিকশা শ্রমিক নেতা সেলিম। সেলিম সাহেবের কাহিনী আছে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখায়। সেলিম সাহেব আমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন। তিনি ঢাকাইয়া ভাষায় উপন্যাস এবং ইতিহাস লিখতেন। আমাদের শোনাতেন। আর এক সময় বিষণ্ন হয়ে যেতেন। কারণ জানতেন না তাঁর স্ত্রী-পুত্র খেয়ে-পরে আছে কিনা।

জেলে আসার প্রথম দিকে সেলিম সাহেবের স্ত্রী জেলগেটে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁর আসা শুরু হলো বিলম্বিত লয়ে। সেলিম সাহেব চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। তাঁর স্ত্রী আর তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন না।

এইতো রাজনীতি। এইতো জীবন। আজ যাঁরা পূর্বসূরিদের গালমন্দ করেন, যাঁরা নির্বিপাকে আত্মসমর্পণ করেন, আত্মসমর্পণকে আজকের জগতের একমাত্র রাজনীতি বলে মনে করেন, তাঁরা জানেন না রাজনীতি কাকে বলে, জানেন না আত্মত্যাগ কাকে বলে। তাঁরা সমাজের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে মনে করেন সেলিম সাহেবরা ছিল বোকা। কারণ তাঁরা রাজনীতিকে মনে করেছিলেন আদর্শের বাহুল্য। আজকের রাজনীতির বাণিজ্যের যুগে তাঁরা বেমানান।

বাইরে আন্দোলন শুরু হলে সকলের মনে আশার সৃষ্টি হয়, হয়তো মুক্তি পাওয়া যাবে। আমরা সামরিক শাসনের এক বছর পর গ্রেফতার হয়েছিলাম।

www.nagorikpathagar.com

প্রবীণ রাজনীতিকরাও জানতেন না কবে আমরা মুক্তি পাব। এবার ধারণা হলো বেশি দিন জেলে থাকতে হবে না।

তবে জেল থেকে মুক্তি পাবার দু'টি ঐতিহ্য আছে। সাধারণত শেষে যারা গ্রেফতার হয় তারা আগে মুক্তি পায়। আবার দীর্ঘদিন যারা জেলে থাকে তাদের মধ্যে নেতারাই আগে মুক্তি পায়। অনেক সময় সাধারণ সদস্যদের দীর্ঘদিন জেলে কাটাতে হয়। এ অবস্থা দীর্ঘদিন থেকেই চলছে। পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসনের বিশেষ কিছু চিত্র আছে। ১৯৫৮ সালে ৭ অক্টোবর রাতে সামরিক শাসন জারি হয়। সামরিক সরকারের প্রেসিডেন্ট হলেন ইস্কান্দার মীর্জা। তিনিই প্রথম সামরিক আইন প্রশাসক। প্রধানমন্ত্রী হলেন জেনারেল আইয়ুব খান। এই দুই নেতৃত্ব বেশিদিন টেকেনি। ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মীর্জা পদচ্যুত হলেন। আইয়ুব খান হলেন প্রেসিডেন্ট।

ইতোমধ্যে গ্রেফতার শুরু হয়ে গেছে। ১৭ অক্টোবরের মধ্যে আব্দুল গাফফার খান, মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ হাজার হাজার নেতা কর্মী গ্রেফতার হলেন। ১৫ অক্টোবর সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। সামরিক শাসনের প্রথম দিনে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা আত্মগোপন করেন। কারো সামনে কোনো কর্মসূচি ছিল না। বছর ঘুরতে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেছিলেন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে। তিনি প্রধান সেনাপতি থাকাকালে পাকিস্তানের জন্যে একটি সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬২ সালে সেই সংবিধানই জারি হয়েছিল। সংবিধান প্রণয়নের জন্যে কমিশন গঠন ছিল একটি লোক দেখানো ব্যাপার।

তখন বিশ্বে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগ। একদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের শিবির। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির। মাঝখানে যুগোশ্লাভিয়া, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার নেতৃত্বে নিরপেক্ষ জোট। এই পরিবেশে পাকিস্তানের অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ভারত, চীন এবং সোভিয়েত সীমান্তের কাছাকাছি পাকিস্তান। তাই ভৌগোলিক রাজনীতিতে পাকিস্তান ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে পাকিস্তান ছিল পাশ্চাত্য শিবিরের পক্ষে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে আইয়ুব খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গিয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন, পাকিস্তানই হবে পশ্চিমা শক্তির একমাত্র বন্ধু। তাই পাকিস্তান ছিল পাশ্চাত্য শিবিরের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতে, পূর্ব পাকিস্তান ছিল কমিউনিস্ট প্রভাবিত। তাই পাকিস্তান শাসন করার

www.nagorikpathagar.com

জন্যে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী কেন্দ্র। এছাড়া পাকিস্তানে পাশ্চাত্যের ধরনের গণতন্ত্র অচল। নতুন ধরনের গণতন্ত্র চালু করে ক্ষমতা বজায় রাখা হবে সামরিক সরকারের লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে সামরিক সরকার দু'টি আইন জারি করল। একটি হচ্ছে, নির্বাচনে অযোগ্যতা অধ্যাদেশ, অপরটি মৌলিক গণতন্ত্র। নির্বাচনে অযোগ্যতা অধ্যাদেশ বলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অসংখ্য রাজনীতিককে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হলো। আর মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ বলে ইউনিয়ন বোর্ড ভেঙে নাম করা হলো মৌলিক গণতন্ত্র। সারা পাকিস্তানে আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হবে। পূর্ব পাকিস্তানে ৪০ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০ হাজার। এরা নির্বাচিত হবে ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্তে মৌলিক গণতন্ত্র সদস্য হিসেবে। সহজে বলা যায় বোর্ডগুলোকে মৌলিক গণতন্ত্রে পরিণত করা হলো। পাকিস্তানের দুই অংশে ৪০ হাজার করে মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হবে। এরাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। এরাই প্রাদেশিক পরিষদ এবং জাতীয় পরিষদ-এর ভোটার হবে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে সাধারণ পরিষদ এবং জাতীয় পরিষদ নির্বাচন থেকে বঞ্চিত করা হলো। সব নির্বাচনের মালিক হলো এই ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী। এই ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীকে কেনা-বেচা খুব কঠিন নয়। এদের ভিত্তিতেই নির্বাচনী এলাকা নির্বাচিত হবে।

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মৌলিক গণতন্ত্র নির্বাচন দেয়া হলো। পূর্ব পাকিস্তানে এ নির্বাচনে ৭৮,৮৭৬ জন প্রার্থী ছিল। ১৪টি নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রার্থী ছিল না। দল হিসেবে এ নির্বাচনে কারোরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের ৪০ হাজার নির্বাচিত প্রার্থীর মধ্যে ৫,৮১০ জন ছিল ব্যবসায়ী, ২,৮০০ জন ছিল রাজনৈতিক কর্মী, ৪৩৪ জন কন্ট্রাক্টর, ২৫৭ জন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি, ২৯৮ জন আইনজীবী। বাদবাকি সকলেই ছিল কৃষক। এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের হ্যাঁ এবং না ভোটে জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

লক্ষণীয় যে, ১৯৫৮ কিংবা '৫৯ সালে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন তেমন জোরদার ছিল না। ছাত্ররা তেমন তৎপর ছিল না। এই সুযোগে সামরিক শাসকরা মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচন দেয় এবং শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্যে শরীফ কমিশন নিয়োগ করে।

১৯৬১ সালের দিকে ছাত্ররা কিছুটা তৎপর হতে শুরু করে ২১ ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে। প্রথম ছাত্রসভা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬১ সালে

www.nagorikpathagar.com

৫ এপ্রিল। প্রতীক ধর্মঘট হয় পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্রদের কারাদণ্ড দেয়ার প্রতিবাদে।

মোটামুটিভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন শুরু হয় শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হবার পর। ৩০ জানুয়ারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হন। ১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা মিছিল করে সামরিক আইন ভাঙে। ২ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মঞ্জুর কাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাঞ্ছিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়। আমি আগেই বলেছি আমাদের পূর্বে গ্রেফতার হলেও শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক নেতাই আমাদের আগে মুক্তি পেয়ে যান। শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হবার পর এবার আবার গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হয় ১২৮ জন ছাত্র আর ইতোমধ্যে আইয়ুব খাব তাঁর নতুন শাসনতন্ত্র জারি করলেন, যে শাসনতন্ত্র বাতিলের দাবি শেষ পর্যন্ত মুখ্য দাবিতে পরিণত হয়।

মার্চ মাসের পর প্রদেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের তিনটি দাবি ছিল—এক. নতুন শাসনতন্ত্র বাতিল, দুই. গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, তিন. শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি।

ছাত্রদের তিন দফা প্রকাশের পর সঙ্কট দেখা দিল নির্বাচন নিয়ে। ইতোমধ্যে আইয়ুব খান ২৮ এপ্রিল জাতীয় সংসদ এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ছাত্রদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা করা হয়। তারা নির্বাচন বর্জনের ডাক দেয়। কিন্তু সফল হয়নি।

নির্বাচন বর্জন করার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানে এক শ্রেণির নেতৃবৃন্দ বিবৃতি প্রদান করেন। এর মধ্যে ছিলেন নূরুল আমিন, আবু হোসেন সরকার, আতাউর রহমান খান, মাহমুদ আলী, পীর মহীউদ্দিন দুদু মিয়া প্রমুখ। কিন্তু তাদের বিবৃতিও কাজে আসেনি।

২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নির্বাচিত হন বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী প্রমুখ। এঁরা নির্বাচিত হবার পর ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাদের কাছে অনুরোধ জানানো হয় সরকারের বিরোধিতা করার। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ আইয়ুব খানকে সহযোগিতা করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ময়মনসিংহের মোনায়েম খান এবং চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী।

এসময় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে—নয় নেতার বিবৃতি। তারিখ ১৪ জুন। জেলখানায় খেতে বসেছি। সেই সময় সংবাদপত্র এল। সংবাদপত্রে নয় জন

www.nagorikpathagar.com

নেতার বিবৃতি দেখলাম। এই নয় নেতার মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান খান, হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী, মাহমুদ আলী, সৈয়দ আজিজুল হক এবং পীর মহসীন উদ্দিন আহম্মদ।

আমার পাশে খেতে বসেছিলেন ন্যাপের আবদুল হালিম। নয় নেতার বিবৃতি পড়ে তিনি বললেন, এ বিবৃতি নিশ্চয়ই আমাদের নেতারা সমর্থন করবেন। কিন্তু বলে দিতে হবে আমরা কবে কোনদিন এ বিবৃতির প্রতিবাদ করব।

বামপন্থীদের কাছে এটা এক সমস্যা। বামপন্থীরা মিছিল করবে। মার খাবে, জেল খাটবে আর আন্দোলনের সব ফসল চলে যাবে ডানপন্থীদের ভাণ্ডারে। সামরিক শাসন জারি হবার পর প্রকাশ্যে নয় জন নেতা বিবৃতি দিলেন—গণতন্ত্রের দাবিতে। আইয়ুবের সংবিধান বাতিলের দাবিতে। এই বিবৃতিদানকারীদের মধ্যে একজনও বামপন্থী নেতা নেই। অথচ এই আন্দোলন সফল করার দায়িত্ব মুখ্যত বামপন্থী কর্মীদের। নেতারা বলবেন, এ মুহূর্তে জাতীয় স্বার্থে নয় নেতার বিবৃতি সমর্থন করতে হবে। বিবৃতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তারপর একদিন দেখা যাবে—আন্দোলনের নামে ডানপন্থী নেতারা আখের গুছিয়ে নিয়েছেন। আন্দোলন আপোষ পর্যবসিত হচ্ছে। তখন বামপন্থী নেতারা বলবেন—আমাদের ভুল হয়েছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি চলছে বছরের পর বছর। এই অভিজ্ঞতা থেকে সরদার আব্দুল হালিম সেদিন প্রশ্ন তুলেছিলেন কবে আমাদের আবার এই নয় নেতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। খুব বেশিদিন গেল না। কিছুদিন পরে সরদার হালিমের বক্তব্যের সত্যতা আমাদের হাড়ে হাড়ে টের পেতে হলো।

এর পরবর্তীকালে ১৯ আগস্ট শহীদ সোহরাওয়ার্দী কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুক্তি পাওয়ার পরে আন্দোলন নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়। নয় নেতার বিবৃতিতে নতুন সংবিধান প্রণয়নের দাবি ছিল। ছাত্ররা দাবি করেছিল আইয়ুবের সংবিধান বাতিলের। আইয়ুবের সংবিধান বাতিল করতে হলে জঙ্গি আন্দোলন করতে হয়। সে আন্দোলনের রূপ হতে পারে সহিংস। এ সত্যটি বুঝেছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। তিনি জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েই বললেন—সংবিধান বাতিল নয়, সংবিধানকে গণতন্ত্রায়ন করতে হবে। অর্থাৎ আন্দোলন করতে হবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে। সরদার হালিমের কথাই সত্যি হলো। ডানপন্থী নেতৃত্ব তাদের নিজের কথায় আন্দোলন নিয়ে গেল এবং পুরনো নয় নেতা শহীদ

www.nagorikpathagar.com

সোহরাওয়ার্দী নেতৃত্বেরই আন্দোলনে শরিক হন। তাঁরাও বললেন, সংবিধান বাতিল নয়। সংবিধানে গণতন্ত্রায়ন করতে হবে।

এবার আমাদের মুক্তি পাবার পালা। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুক্তি পাবার পর রাজবন্দিদের মুক্তি পাওয়া শুরু হলো। প্রথম দিকে ছাত্ররা চলে গেল। নেতারা আগেই চলে গেছেন। আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস, আমাদের অনেকদিন জেলখানায় থাকতে হবে। এবং এর মধ্যে একদিন ভোরের দিকে জেল গেটে আমার ডাক এল। গোয়েন্দা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এসেছিল, কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। তিনি বললেন, আপনি মুক্তি পাবেন সবার শেষে।

প্রকৃতপক্ষে আমি মুক্তি পাবার চিন্তা করছিলাম না। বাইরের ছাত্ররা পরীক্ষা না দেয়ায় আবার পরীক্ষার তারিখ সরে গেছে। পরীক্ষার সময় জেলখানায় থাকা আমার পক্ষে ভালো। কারণ ছাড়া পেলে কোথায় যাব জানি না। নিমতলীর হোটেল ডি-লাক্স থেকে গ্রেফতার হয়েছিলাম। শুনেছি সে হোটেল বন্ধ হয়ে গেছে। অজয় বাবু ঢাকা হলে কোয়ার্টারে চলে গেছেন। গ্রামের বাড়ির সাথে সম্পর্ক নেই দীর্ঘদিন। কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে মায়ের চিঠি পাই। পুরনো এক বন্ধু কলকাতা থেকে একখানা অর্থনীতির বই কিনে পাঠিয়েছে। সে লিখেছে—তুই অর্থনীতির বই দিয়ে কী করবি। লাইব্রেরি থেকে বলেছে এ বই এমএ ক্লাসের পাঠ্য। তুই আমাদের সাথে বিএসসি পড়তি। এ বই দিয়ে কী করবি।

আমার পত্র লেখক বন্ধু বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার। বরিশালে এক সঙ্গে বিএসসি পড়তাম। সে বিএসসি পাস করে শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। তাকে জানানো হয়নি যে জেল খাটতে খাটতে আর জেল পালাতে পালাতে পড়াশুনা আর হয়নি। জেলখানায় এসেছি বলে শেষ পর্যন্ত বিএ পাস করা হয়েছে। ভাবছি এমএ প্রথম পর্ব জেলখানায় শেষ করতে পারলেই ভালো হতো। কারণ জেলখানা থেকে মুক্তি পেলে কোথায় যাব? কার কাছে যাব? কী করে পড়াশুনা চালাব, তার কোনো হদিস আমার কাছে ছিল না। অথচ ওই দিনই রাত ন'টার দিকে আমাকে জেলগেটে ডেকে পাঠানো হলো। ডেকে পাঠানো হলো মহিউদ্দীন আহমদ এবং নারায়ণগঞ্জের হাসান জামিলকে। এই তিনজনই ১৯৫৯ সালে একই দিনে গ্রেফতার হয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জের শফি খান। তাঁকে জেলগেটে ডাকা হলো না। আমাদের জেলগেটে নিয়ে বলা হলো, আপনাদের মুক্তির আদেশ এসেছে। আমি বললাম, মুক্তি! এতরাতে আমি কোথায় যাব?

www.nagorikpathagar.com

মাস-তারিখ মনে নেই। জেলগেটে ডেকে এনে বলা হলো, আপনি মুক্তি পাচ্ছেন। রাত বাড়ছে। হাতে টাকা নেই। ঢাকা থেকে গ্রেফতার হয়েছিলাম—তাই জেল কর্তৃপক্ষ রিকশা ভাড়া দিতে পারে। গ্রামের বাড়ি কোটালীপাড়া থেকে গ্রেফতার হলে যাবার খরচ-খাবার খরচ পেতাম। এখন যাব কোথায়? বন্ধুরা কে কোথায় আছে জানি না। একই সঙ্গে মহিউদ্দিন সাহেব এবং হাসান জামিল মুক্তি পাচ্ছে। লক্ষ করলাম একজন অচেনা লোক তাদের সঙ্গে কথা বলছে এবং তাদের হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিচ্ছে। আমার সন্দেহ হলো, হয়তো আমাদের অন্তরীণ করা হচ্ছে।

আমি জেলার সাহেবকে ডাকলাম, বললাম, ওই অচেনা ভদ্রলোক কে? কী তাঁর পরিচয়? এরমধ্যেই ওই ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন—বললেন, আপনার একটি অর্ডার আছে। আমি বললাম, আপনি কে? আপনাকে আমি চিনি না। জেলার সাহেবকে বললাম—এ ভদ্রলোককে বের করে দিন। আমি তাঁর কাছ থেকে কোনো অর্ডার নেব না। অর্থাৎ জেলগেটেই আবার গোলমাল শুরু হলো। মহিউদ্দীন সাহেব, জামিল সাহেব ওই অর্ডার নিলেন। তাঁদের ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ অন্তরীণ করা হলো। আমাকে ঢাকায় অন্তরীণ করার নির্দেশ দিলেন। আমি গ্রহণ করলাম না। ওই ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে? আমি বললাম—আগামীকাল ইত্তেফাক অফিসে। আমি ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক হিসেবেই গ্রেফতার হয়েছিলাম।

শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম ঢাকা হলে অজয় রায়ের খোঁজ করব। ঢাকা হলে গিয়ে অজয় বাবুকে পেলাম না। তিনি নেই। পরের দিন অজয় বাবুর বিয়ে। তবে তাঁর কক্ষে আশ্রয় পেলাম। জেলখানা থেকে খেয়ে এসেছিলাম। তাই রাত ভালোভাবেই কাটল।

পরের দিন ইত্তেফাক অফিস গেলাম। আমার প্রথম কাজ একটি আশ্রয় খুঁজে পাওয়া এবং আয়ের সূত্রের সন্ধান। ভাবলাম জেল থেকে এলেও ইত্তেফাকে আমাকে চাকরি দেবেই। আইয়ুববিরোধী এ আন্দোলনে ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক আলী আকসাদ গ্রেফতার হয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তাঁর চাকরি হয়েছে। আন্দোলনের সময় আহমেদুর রহমান আত্মগোপন করেছিলেন। তিনিও চাকরিতে যোগ দিয়েছেন।

ইত্তেফাক অফিসে ঢুকে মনে হলো আমার চাকরি হচ্ছে না। আমি চাকরিতে ঢুকবার সময় এমএ আউয়াল সহকারী সম্পাদক ছিলেন। আউয়াল এক সময় ছাত্রলীগের সম্পাদক ছিল। জেল থেকে শুনেছি আউয়াল ইত্তেফাক ছেড়ে দিয়েছে। কারণ ইত্তেফাকের মালিকানা নিয়ে বিরোধিতা। ইত্তেফাক

www.nagorikpathagar.com

সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া গ্রেফতার হয়ে গেলে আউয়াল নাকি পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ওমরাও খানের কাছে ইত্তেফাকের মালিকানা দাবি করে দরখাস্ত দিয়েছিল। এ বিতর্কে তাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। আমি আউয়ালের সঙ্গে দেখা করলাম। আউয়াল বলল, তোর চাকরি হবে না। আমি বললাম, কেন। আউয়ালের জবাব হলো, তোকে মানিক ভাই বিশ্বাস করবে না। কারণ তুই আমার বন্ধু।

ইত্তেফাকে চাকরির জন্যে অনেকেই দেনদরবার করলেন। তেমনি কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত বলা হলো নির্মল সেনের বার্তা বিভাগে চাকরি হতে পারে, সম্পাদকীয় বিভাগে নয়। তাও হলো না। বার্তা বিভাগের নেতা বার্তা সম্পাদক সিরাজউদ্দীন হোসেন আমাকে আশ্বাস দিলেন। দু'দিন টেবিলে বসতে বললেন। পরে বুঝলাম, এ চাকরি হবে না। কারণ সকলে জানে সম্পাদকের পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় সকলে আমাকে সমীহ করে। এরপর আমি চাকরিতে ঢুকলে আমার ক্ষমতা আরো বাড়বে। সুতরাং বার্তা বিভাগেও আমাকে নেয়া হবে না এবং হলো না।

বুঝলাম আমাকে আবার টিউশনিতে ফিরে যেতে হবে। খবর এলো তোয়াহা সাহেবের কন্যাকে পড়াতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। তোয়াহা সাহেব আত্মগোপন করে আছেন। আমাদের বিপ্লবী বন্ধুরা কেউ রাজি নয়। আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করলেও তোয়াহা সাহেবদের রাজনীতি সঠিক মনে করি না। তবুও বললাম, আমি পড়াব।

এ টিউশনি এবং তোয়াহা সাহেব নিয়ে আমার জীবনে আর একটি কাহিনী আছে। তখন ঢাকা হলে থাকি। একদিন রাতে হলে ফিরে দেখি তোয়াহা সাহেব এবং অধ্যাপক মোজাফ্ফর সাহেব আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। তাঁদের প্রস্তাব মওলানা ভাসানীর পুত্র আবু নাসের খান ভাসানী ওরফে বাবুকে পড়াতে হবে। তাকে ম্যাট্রিক পাস করানো দরকার।

আমি রাজি হলাম। আমার শর্ত ছেলেটি আমার হলে এসে পড়তে হবে এবং আমাকে বেতন দিতে হবে। কারণ মওলানা সাহেব গরিব নন। এ শর্তে বাবুকে পড়িয়েছিলাম। বাবু পাস করেছিল এবং অনেক পরিবর্তন করে মওলানা সাহেবের কাছ থেকে এক মাসের বেতন আদায় করেছিলাম।

এবার তোয়াহা সাহেবের কন্যাকে পড়াতে হবে। তিনি আত্মগোপন করে আছেন। তাই বেতন নেয়া ঠিক হবে না। আমার সমস্যা মিটল না। তবে ভিন্ন একটি টিউশনি জুটে গেল এসএনকিউ জুলফিকার আলীর বাসায়। তিনি ঢাকা হলে প্রভোস্ট নিযুক্ত হলে প্রথম এক বছর আমরা তাঁকে হলে ঢুকতে দিইনি।

www.nagorikpathagar.com

আবার তিনিই আমাকে ১৯৫৯ সালে ২৪ ঘণ্টার নোটিসে ঢাকা হল থেকে বের করে দিয়েছিলেন। যদিও ১৯৮৪ সালে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে মাসের পর মাস তাঁর বাসায় আশ্রয় পেয়েছি।

অজয় বাবু বিয়ে করেছেন। শ্বশুর বাড়ি কুমিল্লায়। অজয় বাবুর কোয়ার্টার আজিমপুরে। তাঁর সঙ্গে কোয়ার্টারে আছি। তার স্ত্রী ফেরা পর্যন্ত থাকব। ইতোমধ্যে অর্থনীতি প্রথম পর্ব পরীক্ষা দিয়েছি। মৌখিক পরীক্ষায় সকলের জিজ্ঞাসা, জেল থেকে কোন সাহসে অর্থনীতি নিয়েছি।

সেকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিতে প্রাইভেট হিসেবে পরীক্ষা দিতে দেয়া হতো না। আমি হলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ছাত্র। আমার পূর্বে পটুয়াখালীর এক আইনজীবী অর্থনীতির প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রি পেয়েছিলেন।

পরীক্ষার ফল বের হলো। ভালো হলো না। এবার বিপদ দেখা দিল। আমি জেল থেকে প্রথম পর্ব পাস করেছি প্রাইভেট হিসেবে। এবার দ্বিতীয় পর্ব পড়তে হলে আমাকে হলের মারফৎ ভর্তি হতে হবে। কিন্তু আমাকে ভর্তি করবে কে? ঢাকা হলের ছাত্র ছিলাম। ঢাকা হলের প্রভোস্টের কাছে গেলাম। তিনি রাজি হলেন না। প্রভোস্ট ড. মুশফেকুর রহমান আমার বিরুদ্ধে ১৯ পৃষ্ঠা রিপোর্ট দিলেন। আমার সিদ্ধান্ত, আমি জগন্নাথ হলে যাবো না। কসমোপলিটন হল ঢাকা হলে থাকব। ভাইস চ্যান্সেলর ড. মাহমুদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করলাম। আমি বললাম, স্যার জেলের বাইরে আসলে আমাকে পড়ার অনুমতি দেয়া হয় না। জেলে গেলে অনুমতি পাই। ১৯৪৮ সালে প্রথম জেলে গিয়ে শুরু করেছি এ সংগ্রাম। এখন ১৯৬২ সাল। এ সংগ্রাম শেষ করতে চাই।

ড. হোসেন আমাকে চিনলেন। বললেন, তুমি জেলখানা থেকে পরীক্ষা বর্জন করেছিলে। আমি তোমার জন্যে চেষ্টা করব।

তবে পরের ঘটনা নিম্নরূপ—ভাইস চ্যান্সেলর প্রভোস্টদের বৈঠক ডেকেছিলেন। সকলে আমার বিরুদ্ধে বলেছেন। ভাইস চ্যান্সেলর তখন জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ড. গোবিন্দ দেবকে বললেন—It is my request. ড. দেব বললেন—আপনাকে লিখিত নির্দেশ দিতে হবে। আপনি নির্দেশ দিলে নির্মলকে ভর্তি হতে দেব। কিন্তু সে কোনোদিন হলে সিট পাবে না। ড. মাহমুদ হোসেন আমাকে জানালেন, চুপচাপ ভর্তি হয়ে যাও। পড়ে পাস করো। হলে সিট পাবার চেষ্টা করো না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রশ্নে সুরাহা হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে গুছিয়ে ওঠা সহজ হলো না। কাজী বারীকে কথা দিয়ে এসেছিলাম যে আমি মুক্তি

www.nagorikpathagar.com

পাবার এক মাসের মধ্যে তাকে মুক্ত করবো। কাজী বারীকে মুক্ত করেছিলাম। সে ছিল আর এক অধ্যায়। জেলখানায় জেনেছিলাম এসবি'র স্পেশাল সুপারিন্টেনডেন্ট হচ্ছেন জনাব আব্দুর রহিম। তিনি ঢাকার এডিশনাল এসপি থাকাকালীন তাঁর স্ত্রীকে আমি পড়াতাম। জেল থেকে এসে তাঁকে ফোন করলাম। তিনিই চাইছিলেন আমার সঙ্গে কথা বলতে। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি প্রথমেই বললেন, দেখুন আপনি আমাকে বিপদে ফেলেছেন। আমার জন্যে আপনি মুক্তি পেয়েছেন। আপনার তখন মুক্তি পাবার কথা ছিল না। ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের সব ছাত্র নেতাকে মুক্তি দেয়া হলো। অফিসে গিয়ে দেখি আপনার নামে একটি ফাইল। জানতাম না আপনি জেলে। বাসায় স্ত্রীকে ফোন করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার স্যার কোথায়? বলল, স্যার জেলে। আমি সকল ইন্সপেক্টরদের ডাকলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, সব ছাত্রনেতা মুক্তি পেলে নির্মল সেন কেন পাবে না? কোনো ইন্সপেক্টর আপনার পক্ষে কথা বলল না। আমি বিপদে পড়লাম। তবুও আপনার ফাইলের এক কোনায় লিখলাম 'If this case can be considered...' ফাইল ডিআইজি সাহেবের কাছে পাঠালাম। তিনি অফিসে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আমি ভদ্রলোককে চিনি দীর্ঘদিন ধরে। পূর্বে একবার এর জন্যে তদবির করেছি অনেক বছর আগে। আপনি ঝুঁকি নিলে ছেড়ে দেব। তাই আপনাকে ঢাকায় অন্তরীণ করার শর্তে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। আর আপনি জেল গেটেই অন্তরীণ আদেশ অগ্রাহ্য করলেন। এখন বুঝুন আমার অবস্থা।

আমি রহিম সাহেবের কথায় বিস্মিত হলাম। বললাম, ঠিক আছে আপনার কথা মানব। তবে আমার একটি কাজ করে দিতে হবে। কাজটি হচ্ছে এক মাসের মধ্যে ময়মনসিংহের কাজী আব্দুল বারীকে মুক্তি দিতে হবে।

রহিম সাহেব বললেন, অসম্ভব। কাজী বারী দশ ঘা বেত খেয়েছেন। আসলে তাকে মুক্তি দেয়া সহজ নয়। আর বারী সাহেব কমিউনিস্ট পার্টির লোক, আপনি আরএসপি করেন। আপনি কেন তার জন্যে দেন-দরবার করছেন?

আমি বললাম, আমি কোন দল করি তা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে আমি তাকে কথা দিয়েছি। আমার কথা রাখতে হবে। রহিম সাহেব রাজি হলেন। বললেন, তিনি চেষ্টা করবেন। তিনি কথা রেখেছিলেন। কাজী বারী মুক্তি পেয়েছিল। রহিম সাহেব দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আইজি হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সচিব হয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.com

জেলখানায় দলের তেমন খবর পাইনি। জেল থেকে বেরোবার পর রুহুল আমিন সাহেব খবর পাঠালেন। তিনি রায়েরবাজারে বাসা নিয়েছেন। রায়ের বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমি জেলে যাবার আগে তিনি মিডফোর্ড হাসপাতালের টিবি ওয়ার্ডে ছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা ইতোমধ্যে কিছুটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এনডিএফ-এর নামে কাজ করছেন। দল অর্থাৎ আরএসপি'র নামে কাজ করছেন না। তখন এনডিএফ-এর নেতা জনাব নূরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, মাহমুদ আলী প্রমুখ। পাকিস্তানে সংবিধান জারি হবার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয়েছিল। প্রকাশ্যে রাজনৈতিক দল করার সুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সকল দলের সিদ্ধান্ত হলো কোনো দলকেই পুনরুজ্জীবিত করা হবে না। তবে এ সিদ্ধান্ত বেশি দিন টেকেনি। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়।

এ সময় আমরা নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। দলের সঙ্গে প্রকাশ্যে কাজ না করে শ্রমিক সংগঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বরিশালের আব্দুল মান্নান তখন বিজি প্রেসে কাজ করতেন। দলের প্রবীণ নেতা কমরেড নেপাল নাহা কুমিল্লায় শিক্ষকতা করতেন। দলের অন্যতম নেতা মিসির আহম্মদ চট্টগ্রামে শিক্ষকতা করতেন। সিদ্ধান্ত হলো নেপাল নাহা ও মিসির আহম্মদকে ঢাকায় আনা হবে। আমি ছাত্র রাজনীতি ছেড়ে দেব।

এ সময় একটি প্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। আমি জেলে যাবার আগে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিলাম। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা হিসেবে গ্রেফতার হয়েছিলাম। জহুরুল ইসলাম, আহম্মদ হুমায়ুন, আব্দুল হালিম, আজিজুর রহমান খানসহ অনেকেই তখন ছাত্রলীগ থেকে ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিলেন। আমি পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম আমার ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেয়া ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও কমিউনিস্ট পার্টি ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। আমরা জেলে যাবার পর মোহাম্মদ ফরহাদ ও আনোয়ার জাহিদ ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে আসেন। জেলখানা থেকে আসার পর একদিন শুনলাম পুরান ঢাকার স্বামীবাগে ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন হচ্ছে। অথচ আমাদের কাউকে কোনো খবর দেয়া হয়নি। সম্মেলনে সেন্ট্রাল উইম্যান্স কলেজের একজন ছাত্রী আমাদের অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, সামরিক শাসন জারি হওয়ার পূর্বে সম্মেলনে গঠিত কমিটির সভাপতি ছিলেন ডা. আলমগীর। সম্পাদক ছিলেন সাদউদ্দীন আহম্মদ, দফতরবিহীন সম্পাদক

www.nagorikpathagar.com

ছিলেন আহম্মদ হুমায়ুন, আর সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নির্মল সেন, জহুরুল ইসলাম প্রমুখ। কিন্তু এ সম্মেলনে তাঁদের দেখছি না কেন?

এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন ফরহাদ। ফরহাদ সাহেব বলেছিলেন এ ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে অতীতের ছাত্র ইউনিয়নের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা নতুন করে সংগঠন করছি। আজকের ছাত্র ইউনিয়নের বন্ধুরা নিশ্চয়ই এ খবর রাখেন না। আর ফরহাদ সাহেবের কথা মেনে নিতে হলে ধরে নিতে হয় যে এখনকার ছাত্র ইউনিয়নের ১৯৬২ সালে জন্ম হয়েছিল।

তবুও আমাকে নিয়ে ছাত্র ইউনিয়নে ভয় গেল না। ১৯৬৩ সালে ডাকসু নির্বাচন। তখন ডাকসুতে সরাসরি নির্বাচন ছিল না। সেবার জগন্নাথ হল থেকে ডাকসুর ভিপি হবার কথা। আমি জগন্নাথ হলের ছাত্র। কমিউনিস্ট পার্টির ধারণা হলো, আমি প্রার্থী হলে আমাকে ঠেকানো মুশকিল হবে। হঠাৎ একদিন মহিউদ্দিন সাহেব আমার সঙ্গে কথা বলতে আসলেন। তাঁর অনুরোধ হলো আমি যেন ভিপি পদে না দাঁড়াই। আমি হেসে ফেললাম। তাঁকে বললাম আমার দলের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আমি আর ছাত্র আন্দোলনে থাকছি না। সুতরাং আপনাদের ভয় নেই।

মহিউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলে মধুর ক্যান্টিনে আসতেই শাহ মোয়াজ্জেম ও শেখ ফজলুল হক মণির সঙ্গে দেখা। তারা বলল, আপনি ভিপি পদে দাঁড়াতে পারবেন না। আপনি ভিপি পদে দাঁড়ালে আমাদের অসুবিধা হবে। আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয়া যাবে না। কারণ আপনি ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। মনি বলল, এমনিতেই গতরাতে এসএম হলে আপনার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা বক্তৃতা দিয়েছি। বলেছি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় অফিসের ড্রয়ারে আরএসপির প্রচারপত্র পাওয়ার অভিযোগে নির্মল সেনকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। মনির কথায় আমার বলার কিছু ছিল না। কারণ আমি যখন ছাত্রলীগে ছিলাম তখন মনি ছাত্রলীগের সদস্য ছিল কিনা সন্দেহ। তবে শাহ মোয়াজ্জেমের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদে তাকে নির্বাচিত করার জন্যে আমি একদিনের জন্যে ঢাকা কলেজের ছাত্র সেজেছিলাম। আমি ওদের বললাম, আমি কোনো নির্বাচনেই দাঁড়াচ্ছি না। তবুও ছাত্রলীগ জিততে পারেনি। ডাকসুর ভিপি হয়েছিল ছাত্র ইউনিয়নের শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ।

ইতিমধ্যে আমার একটা চাকরির সংস্থান হয়েছে। চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন মোজাম্মেল দা। তখন সরকারের সমর্থনে নতুন একটি পত্রিকা বেরোচ্ছিল। পত্রিকার নাম জেহাদ। আমি তখন আজিমপুরে থাকি। একদিন

www.nagorikpathagar.com

ভোরবেলা মোজাম্মেল দা এসে হাজির। বললেন, আমার সঙ্গে চলো। তোমার চাকরি হয়েছে দৈনিক জেহাদে। সর্বকনিষ্ঠ সহ-সম্পাদক। আমি ইত্তেফাকের সহকারি সম্পাদক ছিলাম। জেহাদের সহ-সম্পাদক হবার আমার কোনো ইচ্ছা ছিল না। আমি মোজাম্মেল দাকে বললাম, আমি সরকারি কোনো কাগজে চাকরি করব না। মোজাম্মেল দা বললেন, তোমাকে একটু প্রাকটিক্যাল হতে হবে। পাকিস্তানে তোমার জন্মগত একটা বাধা আছে। তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি যে জেলখানা থেকে এসে সবাই ইত্তেফাকে চাকরি পেয়েছে, কিন্তু তুমি পাওনি। এ অপ্রিয় সত্যটি তোমাকে বুঝতে হবে। আমি বললাম, আমি সংবাদে শহীদুল্লাহ কায়সারের কাছে যাচ্ছি। শেষ চেষ্টা করে দেখব ইত্তেফাকে চাকরি হয় কিনা। এই বলে আমি মোজাম্মেল দাকে বিদায় করে দিয়ে সংবাদ অফিসে গেলাম। শহীদুল্লাহ কায়সার ফোনে মানিক মিয়ার সঙ্গে কথা বললেন। অনুনয়, বিনয় করলেন। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। শহীদুল্লাহ কায়সার বললেন, আপনাকে সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। পত্রিকার কে মালিক তা নিয়ে প্রশ্ন করে লাভ নেই। আমরা রাজনীতি করি, সংবাদপত্র আমাদের আশ্রয়। কোন পত্রিকায় চাকরি করি তা আদৌ মুখ্য নয়। আপনি জেহাদে যোগ দিন। জেহাদের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। সহকারি সম্পাদক আবদুল গাফফার চৌধুরী। জেলখানা থেকে আসার পর আবার নতুন করে সাংবাদিকতার জীবন শুরু হলো।

জেহাদে চাকরি পেলাম। কনিষ্ঠতম সহ-সম্পাদক। আমার নিচে কেউ স্বাক্ষর করত না। ইত্তেফাকে সহকারি সম্পাদক ছিলাম। জেহাদে যোগ দিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব হচ্ছে ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা। এবং সংবাদটি সংক্ষেপে গ্রহণযোগ্য করে শিরোনাম দেয়া। আমি শিরোনাম দিতে জানতাম না। আর টাইপ সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। বার্তা সম্পাদক মোসলেম আলী বিশ্বাস। এডিসন সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী। প্রধান বার্তা পরিবেশক ছিলেন আসাদুজ্জামান বাচ্চু।

পত্রিকাটি মোনেম খানের সমর্থক। অর্থাৎ সরকারি পত্রিকা। মোনেম খান আইয়ুব খানের লোক। আর আইয়ুব খানের আমলেই আমি দীর্ঘদিন জেলে ছিলাম। তাই চাকরি কিছুতেই ভালো লাগছিল না। এ পত্রিকায় যোগ দেয়ার আগে ইউনিয়নের নেতা কে জি মোস্তফাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, পেশাদার সাংবাদিক হবার চেষ্টা করুন। মালিকের কথা ভেবে লাভ নেই। এ পত্রিকায় যোগ দেয়ার কিছুকাল আগে শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে মিছিল করেছি। ১৭ সেপ্টেম্বর গুলিতে ছাত্র নিহত হতে দেখেছি। সেই সরকারের

www.nagorikpathagar.com

আমলে সেই সরকারের কাগজে চাকরি করার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। কিন্তু এই জেহাদের চাকরিতে এসে আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গেল।

মাসটা মনে নেই। ১৯৬৩ সালের প্রথম দিকে হবে। ১৯৫৩ সালে বাড়ি থেকে এসেছি। বছর দশেক বাড়ি যাওয়া হয়নি। তাই দু'দিনের জন্যে বাড়ি গিয়েছিলাম। দু'দিন পর ঢাকা এসে অফিসে গিয়ে শুনলাম একটি ছেলে আমার জন্যে ঘন্টাচারেক বসে থেকে চলে গেছে। আমি বুঝতে পারছিলাম না ছেলেটি কে হতে পারে। ছেলেটি বলেছিল, আমাকে নাকি তার বিশেষ দরকার।

অফিস শেষে আমি আমার ঢাকা হলের প্রাক্তন প্রভোস্ট জুলফিকার আলীর বাসায় পড়াতে গেলাম। এক সময় তার দুই কন্যা ও এক পুত্রকে পড়াতাম। পুত্রের নাম বাবু। সেই বাবুকে পড়াতে গিয়ে অনেক ঘটনাই ঘটেছে। সে ঘটনার একমাত্র সাক্ষী আমি। বাবু আইএ পাস করেছে। ইংরেজিত অনার্স পড়ছে। আমি এবার পড়াচ্ছি বাবুর তৃতীয় বোন মনুকে। পড়াতে গিয়ে দেখলাম বাড়িটা যেনো থমথম করছে। মনুকে জিজ্ঞেস করলাম বাবু কোথায়। মনু বললো, বাবু ঘুমুচ্ছে। অতবেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছে কেন। আমার সন্দেহ হলো। শুনলাম বাবু তার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। আমার আর পড়াতে হলো না। জুলফিকার আলী সাহেবের বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম। কিছু দূর এগোতেই ঐ বাসার কাজের ছেলেটি ছুটতে ছুটতে এল। বললো, সাহেব আপনাক ডেকেছেন। জুলফিকার সাহেবের বাসায় ফিরে বাবুর কক্ষে ঢুকলাম। দেখলাম বাবু শুয়ে আছে। বাবু নীল হয়ে গেছে। তার টেবিলে অসংখ্য ঘুমের ট্যাবলেট পড়ে আছে। জুলফিকার সাহেবকে বললাম, স্যার আমি চলে যাচ্ছি। বাবুকে হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থা করুন। বাবুকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু তার জ্ঞান ফেরেনি।

দু'দিন পর ঐ বাসা থেকে আমাকে ফোন করল আমার কনিষ্ঠ ছাত্রী রেনু। রেনু বলল, আপনার একটা চিঠি আছে। বাবুর ড্রয়ারে পাওয়া গেছে। আপনার নামে লেখা দশ পৃষ্ঠার চিঠি।

চিঠিটা পড়েছিলাম। বাবু লিখেছিল, স্যার আপনি বলেছিলেন আত্মহত্যা করতে হলেও আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করার জন্যে জেহাদ অফিসে গিয়েছিলাম। চার ঘন্টা বসেছিলাম। শুনলাম আপনি নাকি বাড়ি চলে গিয়েছেন। তাই অনুমতি নেয়া হয়নি।

বাবু লিখেছে—এ চিঠি লেখার আমার প্রয়োজন ছিল। নইলে সকলে ভাববে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য তরুণের মতো আমি প্রেমের জন্যে আত্মহত্যা করেছি।

www.nagorikpathagar.com

এরপর অনেক কথা লেখা ছিল। সে কথা পারিবারিক এবং সামাজিক। বাবু একটা ভেঙে যাওয়া সংসারের শিকার। সেই ভাঙা সংসারের কাহিনী সে দশ পৃষ্ঠায় লিখেছে। সে লেখা বড়ো করুণ, বেদনার্ত। আজকের সমাজ জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ঐ চিঠি আমি বারবার পড়েছিলাম। ফেরত দিয়েছি ঐ পরিবারকে। কারণ ঐ চিঠি রাখা বড্ড জ্বালা।

এ সমাজে আমি বইয়ের মানুষ। শৈশবে আমি সকল আত্মীয়-স্বজন ছেড়েছি। কারো সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বই পুস্তকে ভালো ভালো কথা পড়েছি। আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এ জীবন বড় কঠিন। পুস্তকের উপদেশে জীবন চলে না। জীবন অনেক বাস্তব এবং কঠিন। তাই আমার কাছে যারা এসেছে তাদের বলেছি ব্যক্তি বা বাস্তব জীবনে আমাকে অনুসরণ করতে যেও না। এ সমাজ বড় নিষ্ঠুর এবং নির্দয়। তোমার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার আশা করবে। তোমাকে ভালো থাকতে বলবে। কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করবে না। নিজেও কোনোদিন সে জীবন যাপন করবে না। এ সমাজের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলেই আট ঘাট বেঁধে নামতে হবে। শিশুর কোমলতা নিয়ে এ সামজের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না। এ সমাজ কপটতায় ভরা। সংসারে থেকে সংসারের নিত্যদিনের দুঃখ দৈন্য স্নেহ ভালোবাসার সঙ্গে সমঝোতা করে এ সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যায় না।

নিশ্চয় সে বয়সে বাবুর এ কথা বুঝবার কথা ছিল না। আর আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে আমিও তেমন আবেগমুক্ত ছিলাম না। তাই আমার কাছে পড়তে এসে অনেকেই সামাজিক সঙ্কটের শিকার হয়েছে।

এর মধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল। একদিন জেহাদ অফিসে এসে দেখি সম্পাদকসহ দশ বারো জনের চাকরি গেছে। আমি ভাবলাম আমার চাকরিও চলে গেছে। তাই জেহাদ থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কিছু দূর যেতেই জেহাদ অফিস থেকে পিয়ন এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। আমাকে বলা হলো—আপনার চাকরি যায়নি। আমি বললাম—আমি চাকরি করব না। এতো লোকের চাকরি কেন গেল জানতে চাই। আমি প্রেস ক্লাবে কেজি মুস্তাফাকে ফোন করলাম। তিনি বললেন, আপনাকে ঐ কাগজে থাকতে হবে—এটা ইউনিয়নের আদেশ।

কিন্তু পত্রিকা কে চালাবে? আমার উপরে কেউ নেই। এমনকি সালেহ দাদু পর্যন্ত নেই। ব্যক্তিগত জীবনে সালেহ সাহেব অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের বড় ভাই। জীবনে অনেক কিছু করেছেন। চাকরি করেছেন সার্কাসে। শেষ বয়সে বিয়ে করেছেন। যোগ দিয়েছেন সংবাদপত্রে। আমি সালেহ সাহেবের পাশে

www.nagorikpathagar.com

বসে অনুবাদ শিখতাম। হেডিং শিখতাম। আমার অন্যতম শিফট ইনচার্জ ছিলেন জনাব ফজলুল করিম। পরবর্তীকালে তিনি দৈনিক বাংলায় বার্তা সম্পাদক এবং এবং নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। টিপটপ, ছিমছাপ ভদ্রলোক। না বুঝে কোনো কিছু করেন না। সবকিছু ভালো করে বুঝিয়ে দেন। তবে খবরদারিও করেন। অথচ তারা কেউই দৈনিক জেহাদে থাকলেন না। শুরুতেই সব প্রাচীন সাংবাদিকদের বিদায় করে দেয়া হলো।

রাতের দিকে দেখলাম তিনজন নতুন লোক এসেছেন। তাঁরা হলেন দফতরের মীর নুরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা ও কাজী জহুরুল হক। এরা নেতৃত্ব দিয়ে কাগজ চালাতে শুরু করলেন। সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক আবদুল গাফফার চৌধুরী।

এর মধ্যে একদিন অঘটন ঘটল। রাতে গিয়ে দেখি কেউই আসেনি। কিন্তু কাগজ চালাবে কে? গাফফার এল। বসে বলল, আপনাকেই রাতের কাগজ চালাতে হবে, কারণ কেউ নেই। সেদিন সংবাদপত্র জগতের একটি বড় খবর ছিল। খবরটি হচ্ছে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অপরাধ আইন বাতিল। এ আইনটি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতোই পুরনো। ব্রিটিশ সরকার এ আইনটি জারি করে সীমান্ত প্রদেশে। এ আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হয়েছে। অসংখ্য মানুষ জেল খেটেছে। এ আইনের বলে নির্যাতন চলেছে অব্যাহতভাবে। কিন্তু ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পরেও এ আইন বাতিল হয়নি। প্রায় দেড়শ' বছর পর ১৯৬৩ সালে এ আইন বাতিল হওয়া ছিল ঐতিহাসিক ঘটনা।

আমি রাজনৈতিক তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে এ খবরটি প্রধান খবর করলাম। হেডিং দিলাম ছ'কলাম। কিন্তু ঘাবড়ে গেলাম পরের দিন ভোরে। ঢাকার কোনো কাগজে এ খবরের দু'কলামের বেশি হেডিং করা হয়নি। আবার কোনো কোনো কাগজে এক কলামের হেডিং করা হয়েছে। দুপুরের দিকে জেহাদ অফিসে গিয়ে দেখলাম অনেকের মুখ ভার ভার।

বিকেলের দিকে গাফফার পশ্চিম পাকিস্তানের কাগজ নিয়ে এল। পশ্চিম পাকিস্তানের কাগজে ঐ খবরটি আট কলামের ডাবল হেডিং হয়েছে। গাফফার বলল, আপনি ঠিক হেডিং দিয়েছেন। আজ রাত থেকে আপনি জেহাদের ভারপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক। চার মাস আগে যে পত্রিকায় সর্বকনিষ্ঠ সহসম্পাদক হয়ে ঢুকেছিলাম সে পত্রিকায় ভারপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক হওয়া সাধারণভাবে আনন্দদায়ক হলেও আমি আদৌ খুশি হতে পারিনি। কারণ এর আগে অনেক প্রবীণ সাংবাদিকের চাকরি গিয়েছে এ কাগজ থেকে। চাকরি যাওয়া আদৌ

www.nagorikpathagar.com

কোনো ভালো কথা নয়। আর তাঁরা চাকরিতে থাকলে ঐ পত্রিকায় আমার ভারপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক হওয়ার প্রশ্নই উঠত না।

১৯৬২ সাল ছিল ছাত্র আন্দোলনের এক নতুন প্রস্তুতির যুগ। আমার নিজের ধারণা ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আগের যুগের ছাত্র আন্দোলনের অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। আমাদের যুগেও সুস্পষ্ট দু'টি ভাগ ছিল। আমাদের মধ্যে একটি ভাগ এসেছিল বিভাগ পূর্ব ভারতবর্ষে ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহ্য নিয়ে। আমাদের সময়কার ছিল কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও আরএসপির ছাত্র প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে ছিল মুসলিম লীগের ছাত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৮ সালে মুসলিম লীগের ছাত্র প্রতিষ্ঠান ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যায়। একটি ধারা হচ্ছে আদি অকৃত্রিম মুসলিম লীগ অপর ধারাটি হচ্ছে বিদ্রোহী মুসলিম লীগ যারা ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠন করে। আসামের মুসলিম লীগ নেতা মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলায় আসার পর এ গ্রুপের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই ভাগাভাগির ফলে ছাত্র আন্দোলনের ও বার তিনটি ধারার সৃষ্টি হয়। একটি ধারা হচ্ছে—আদি অকৃত্রিম মুসলিম লীগের ধারা। দ্বিতীয়টি আওয়ামী মুসলিম লীগ ধারার সঙ্গে বামপন্থী ধারার ঐক্য হয়ে সংগ্রামের ক্ষেত্র। মুসলিম লীগের ধারা ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে পরাজয়ের পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই ধারা গড়ে ওঠে ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন অর্থাৎ এনএসএফ এবং অসাম্প্রদায়িক ধারার প্রতিষ্ঠান ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। এ সকল সংগঠনের নেতাদের সংগঠনের বাইরেও একটি রাজনৈতিক স্বীকৃতি ছিল। এদের সঙ্গে ১৯৫২ সালের পর আর একদল ছাত্র, ছাত্র রাজনীতিতে আসে। তারাও পুরানো নেতৃত্বকে পরিহার করতে পারেনি। আমার ধারণা পুরনো নেতৃত্বের অবসান ঘটে সামরিক শাসন জারি হবার পর।

আজকের বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছাত্ররা অনেক সময় জাতীয় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছে। বিরোধী রাজনীতির অঙ্গনে শূন্যতার ফলে ছাত্রদের অনেক সময় বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগ পর্যন্ত এ ভূমিকা খুব স্পষ্ট ছিল। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর নির্বাচিত নেতারাই রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আমাদের ভূমিকা তখন গৌণ হয়ে যায়। ছাত্ররা জাতীয় রাজনীতির পরিবর্তে দলীয় রাজনীতির অঙ্গে পরিচিত হয়। যার ফলে ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সোহরাওয়ার্দী বনাম মওলানা ভাসানীর বিতর্ককে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও ছাত্র

www.nagorikpathagar.com

ইউনিয়নের মধ্যে মারামারি হয়। এভাবে ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নেতারা সামগ্রিক অর্থে ছাত্রদের নেতা না হয়ে গ্রুপ নেতায় পরিণত হয়।

এ পরিস্থিতি চলতে থাকে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর। দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সামরিক শাসনকে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। তৎকালীন ছাত্র নেতৃত্বও সামরিক শাসনবিরোধী কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। ১৯৫৯ সালে জেলে যাবার পূর্বে আমিই লক্ষ্য করেছি প্রতিটি সংগঠনের অনাস্থা সামরিক শাসন ছিল তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত। এ সামরিক বাহিনীকে মোকাবেলা করার কোনো কৌশল তাদের জানা ছিল না।

এর প্রতিফলন ঘটে ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলন কোনো সরকার উচ্ছেদের আন্দোলনের মুখোমুখি দাঁড়ায়নি। কোনো নির্দিষ্ট দাবির জন্যে লড়েছে এবং সবশেষে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে যুক্ত ফ্রন্টকে জিতিয়ে আনতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মুখোমুখি দাঁড়ায়নি। ১৯৫৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও সর্বক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর পরামর্শ মতো চলত না। তাদের কিছুটা স্বকীয়তা এবং স্বাধীনতাও ছিল। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হবার পর এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র ছাত্র আন্দোলনই যথেষ্ট নয়। এ আন্দোলন রাজনৈতিক দলের সার্বিক সহযোগিতা এবং নেতৃত্ব প্রয়োজন। এই দোদুল্যমানতায় পড়ে ছাত্র আন্দোলন যেমন থমকে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক নেতৃত্বও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকে।

এমনি করে ৬২ ও ৬৩ সাল কেটে যায়। এই দু'টি বছরের ইতিহাস রাজনীতির ক্ষেত্রে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস। সামরিক সরকার তখন ভিন্ন কৌশল নিয়েছে। বিভিন্ন আইনে রাজনীতিবিদদের আটকে ফেলছে। রাজনীতি করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজনীতিকদের আন্দোলনের তেমন ঐতিহ্য ছিল না। বামপন্থী ছাড়া ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এদের ভূমিকা ছিল গৌণ। অনেকেরই জেলে যাওয়া শুরু হয় ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। মুসলিম উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানেরা তখন আন্দোলনের সামনে আসতে থাকে। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত হাজার হাজার রাজবন্দি ছিল পূর্ব পাকিস্তান জেলে। এর মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। সে অর্থে মুসলিম সম্প্রদায়ের জেলে যাওয়া শুরু হয় ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সে ইতিহাসও খুব দীর্ঘ নয়। দীর্ঘ নয় বলে ত্যাগ

www.nagorikpathagar.com

তিতিক্ষার প্রশ্নটি গৌণ হয়ে যায়। সরকারি হামলা এলেই শুরু হয় পিছু হাঁটা। শুরু হয় আত্মসমর্পণ। তাই দেখা যায় ভাষা আন্দোলনের অনেক সংগ্রামী নেতাকে সরকারি চাকরি নিতে। এমনকি পূর্ব বাংলার এককালীন প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানকে দেখা যায় সামরিক সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। এই পটভূমিতেই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠা ছিল সময়সাপেক্ষ।

অপরদিকে প্রথম থেকেই সামরিক শাসকেরা ছিল শংকিত। সামরিক শাসন উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়। তাই তাতে জনসমর্থন থাকার কথা নয়। তারা ভয় দেখিয়ে অর্থ এবং পদ দিয়েই রাজনীতিকদের দলে ভেড়াতে চেষ্টা করে। আইয়ুব খানেরা ক্ষমতায় এসে সে কাজটি করেছিলেন।

কিন্তু জনসমর্থনহীন কোনো সরকারই দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকতে পারে না। সে ঘটনাই ঘটল ১৯৬২ সালে। এ সময় আমার চাকরির অবস্থানের পরিবর্তন হয়। জেহাদের মালিক পরিবর্তন হয়। নতুন মালিক ইব্রাহিম তাহা। এককালে সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন ছাত্রলীগের প্রার্থী। তাই আমার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। তাহা সাহেবের বড় ভাই এটিএম মোস্তফা তখন আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভার সদস্য। সুতরাং চাকরিটি আমার জন্যে সুখকর ছিল না। ইচ্ছে হলেই সবকিছু লেখা বা ছাপানো যেত না। আবদুল গাফফার চৌধুরী তখন চাকরি ছেড়ে গেছে। সম্পাদক তখন আবুল কালাম শামসুদ্দিন। এই মানুষটিকে তখন আমি বড্ড কাছ থেকে দেখেছিলাম।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাস। ভারতে দাঙ্গা শুরু হয়েছে কাশ্মীরের হযরত বাল মসজিদ নিয়ে। প্রতিদিন দাঙ্গার খবর আসছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার আগে শামসুদ্দিন সাহেব আমার দরজায় দাঁড়াতেন। বলতেন, নির্মল বাবু, সাবধানে থাকবেন। পত্রিকার প্রথম পাতায় দাঙ্গার খবর দেবেন না। দাঙ্গা হলে সকলের সর্বনাশ হবে। ধীরলয়ে কথাগুলো বলে শামসুদ্দিন সাহেব বাড়ি চলে যেতেন। আমি ভাবতাম, এ লোকটি কি সত্যি সত্যি আমার চেনা? শৈশব থেকে জেনেছি আবুল কালাম শামসুদ্দিন আজাদের সম্পাদক। আজাদ মুসলিম লীগের পত্রিকা। আজাদের ভূমিকা সাম্প্রদায়িক। সুতরাং শামসুদ্দিন সাহেব অসাম্প্রদায়িক হতে পারেন না। পরে জেনেছিলাম শামসুদ্দিন সাহেব অসহযোগ আন্দোলনের সময় ব্রিটিশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি ডিগ্রি নিয়েছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

এর মধ্যে একদিন একটি ভিন্ন ঘটনা ঘটল। গভীর রাতে খবর এল দাঙ্গার জন্যে মধ্য কলকাতায় সামরিক আইন জারি করা হয়েছে। আমি একটু

www.nagorikpathagar.com

হতচকিয়ে গেলাম। সম্পাদক সাহেবকে ফোন করলাম। তিনি বললেন, খবরটি প্রথম পাতার প্রথম সংবাদ করুন। কিন্তু দু'কলামের বেশি হেডিং করবেন না।

দাঙ্গা থামানো গেল না। পূর্ব পাকিস্তানেও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। পূর্ব পাকিস্তানের দাঙ্গার পেছনে একটি ভিন্ন রাজনৈতিক লড়াই ছিল। লড়াই ছিল খুলনার সবুর খান ও গভর্নর মোনেম খানের সঙ্গে নেতৃত্বের। মোনেম খান তখন রাওয়ালপিন্ডিতে। অনেকের ধারণা এই সুযোগে সবুর খান খুলনার খালিশপুর শিল্প এলাকায় অবাঙালিদের নিয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। সে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে আদমজী এলাকায় এবং ঢাকার আশপাশে। দাঙ্গা থামাবার জন্যে সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদদের সভা বসে প্রেস ক্লাবে। সিদ্ধান্ত হয় দাঙ্গাবিরোধী সামবেশ ও মিছিল করার। সিদ্ধান্ত হয় দাঙ্গার বিরুদ্ধে একটি আহ্বান জানাবার। সে আহ্বান সকল পত্রিকায় ছাপানো হয় এবং রাজনৈতিক ও সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ দেখা করবেন গভর্নর মোনেম খানের সঙ্গে।

সেদিন রাতে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও'—এই শিরোনামে সেই আহ্বান জানানো হয়। আমাদের পত্রিকা জেহাদে সেই আহ্বান ছাপানো সম্ভব হয়নি মালিকের নির্দেশে। সেদিন দাঙ্গা আরো ছড়িয়ে পড়ে। সেদিনই গভর্নর মোনেম খান ঢাকায় ফিরে আসেন। রাতে সম্পাদকেরা গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে অবিলম্বে দাঙ্গা থামানোর অনুরোধ জানান। রাজনীতিবিদদের নেতৃত্ব করছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি গভর্নর মোনেম খানকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাঙ্গা থামাবার চরমপত্র দেন। সত্যি সত্যি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মোটামুটিভাবে দাঙ্গা থেমে গিয়েছিল। প্রমাণিত হয়েছিল দাঙ্গা লাগানো এবং থামানো সবকিছুই মুখ্যত সরকারের ওপর নির্ভর করে।

এ সময়ের দু'টি ঘটনা আমার এখনও মনে আছে। সেদিন রাতে আমি দৈনিক জেহাদের কাজ করছিলাম। গভীর রাতে অগ্নিযুগের নেতা মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর একটি বিবৃতি এলো। উপমহাদেশের জীবিত বিপ্লবীদের মধ্যে তখন মহারাজ ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা। তিনি ব্রিটিশ আমলে ৩০ বছর জেল খেটেছেন। তিনি হেমেন দাশ রোডে থাকতেন। দাঙ্গায় আশ্রয়হীন হয়ে শিবির থেকে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন নিজের দেশে আশ্রয় শিবিরে থাকার জন্যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিনি। তাঁর এ বিবৃতিও আমি ছাপাতে পারিনি।

ভোরবেলা সান্ধ্য আইন এড়িয়ে জগন্নাথ হলের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে দেখলাম সান্ধ্য আইনের মধ্যেই ড. আবু মাহমুদের লাল গাড়িটি দক্ষিণ দিকে ছুটছে। ড. মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক।

www.nagorikpathagar.com

আমাদের প্রিয় শিক্ষক। আমি গাড়িটি থামালাম। স্যার চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, নির্মল সাবধানে হলে যাও। আদমজীতে দাঙ্গা হচ্ছে। আমি আদমজীর দিকে যাচ্ছি। আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক একেবারে একা একটি গাড়ি নিয়ে ছুটছেন দাঙ্গা থামাতে। তিনি যাচ্ছেন আদমজীতে। আদমজীর শ্রমিকেরা দাঙ্গা করছে। আর ঐ আদমজীর শ্রমিকদের নিয়েই মাত্র ৬ মাস পরে ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে আমরা পাকিস্তানের বৃহত্তর ধর্মঘট করেছিলাম এবং সে ধর্মঘটে জিতেছিলাম।

আমি তখন জগন্নাথ হলে থাকি। এই উপকারটুকুও ড. মাহমুদ হোসেন করেছিলেন। ভাইস চ্যান্সেলর ড. মাহমুদ হোসেনের সহযোগিতায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের ভর্তি হতে পারব কিন্তু হলে থাকতে পারব না। এ পরিস্থিতিতে আমি ঢাকায় হলের বাইরে পুরনো মোগলটুলিতে থাকতাম। এক সময় গভর্নর মোনেম খানের সঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলরের অনুমতি না নিয়ে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঢুকে পড়ে। প্রতিবাদে ড. হোসেন পদত্যাগ করেন। ঢাকা ছেড়ে যাবার আগে তিনি ড. গোবিন্দ দেবকে ফোন করেন এবং বলেন, নির্মল খুব অসুবিধায় আছে। পারলে তাকে একটা সিট দেবেন। ড. গোবিন্দ দেব আমাকে ডেকে একথা জানালেন এবং বললেন, তুমি সিট পাবে কিন্তু হলে যেতে পারবে না।

ড. গোবিন্দ দেব কেনো এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা আমি কোনোদিন জানতে চেষ্টা করিনি। ড. হোসেন কেন এ ধরনের অনুরোধ করেছিলেন তাও আমি জানি না। কারণ ড. হোসেনের সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হয়নি। তবে সিট পেয়েও আমার সঙ্কট কাটেনি। সকাল সাড়ে আটটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে যেতে হতো। ১২টায় জেহাদ অফিসে যেতে হতো। হলে ফিরতে রাত তিনটায়। হলের গেটে তালা দেয়া থাকত। কী করে প্রতিরাতে ঐ হলে আমি ঢুকতাম আমি ব্যতীত ঐ হলের দারোয়ানও তা জানত না। তবে আমি এ পরিস্থিতিতে পড়াশুনা চালিয়ে গেলেও সরকার আমাকে কোনোদিনও করুণা করেনি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো জেহাদে সরকারি পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও ঐ পত্রিকায় আমি বিরোধী দলের খবর বেশি দিচ্ছি।

পত্রিকার নাম জেহাদ। পত্রিকার মালিক ইব্রাহিম তাহা। তাঁর বড় ভাই এটিএম মোস্তফা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী। সুতরাং এ কাগজে বিরোধী দলের খবর বড় হতে পারবে না। বড় করে ছাপাতে হবে সরকারি খবর। রাওয়াল পিন্ডিতে খবর দিয়েছেন, আমি সে নীতি অনুসরণ করছি না। পরপর চল্লিশটি

www.nagorikpathagar.com

বিরোধী দলের খবর বড় করে ছাপিয়েছি। ছোট করেছি সরকারি খবর। এ খবর উচ্চ মহলে দিয়েছেন মরহুম সাদেকুর রহমান। তিনি তথ্য দফতরের অধিকর্তা।

একদিন তাহা সাহেব আমাকে একথা বললেন। বললেন, মন্ত্রিসভায় কথা উঠেছিল। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলেন জেনারেল আইয়ুব খান। তিনি নাকি মোস্তফা সাহেবকে বলেছেন, নির্মল সেন বার্তা সম্পাদক থাকলে বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যাবে। এ কথা মোস্তফা সাহেব তাহা সাহেবকে জানিয়েছেন। তাহা সাহেব বলেছেন, নির্মল সেন বার্তা সম্পাদক থাকবে। সরকারি চাপে তাকে আমি সরাব না।

ইতোমধ্যে একদিন একটি পার্টিতে আমি আমন্ত্রণ পেলাম। পার্টি হচ্ছিল শাহবাগ হোটেলে। বর্তমানে পিজি হাসপাতাল। সে পার্টি ছিল তৎকালীন কেন্দ্রীয় তথ্য সচিব আলতাফ গওহরের সম্মানে। আলতাফ গওহর পাকিস্তানে তখন জাঁদরেল আমলা। সাদেকুর রহমান সাহেবও ছিলেন। এক সময় শহীদুল্লাহ কায়সার আলতাফ গওহরের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সাদেকুর রহমান তখন সামনেই ছিলেন। আমাকে দেখে আলতাফ গওহর বললেন, আপনিই সেই নির্মল সেন। এরপর কথায় কথা উঠল। আমি বললাম সাদেকুর রহমান সাহেবের অভিযোগ সত্য নয়। কোনো পক্ষেরই গুরুত্বহীন খবর আমি গুরুত্ব দিয়ে ছাপাতে অভ্যস্ত নই। সাদেকুর রহমান সাহেব তাঁর অভিযোগ প্রমাণ করতে পারলে আমি চাকরি ছেড়ে দেব। সাদেকুর রহমানের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি আমতা আমতা করতে থাকলেন। তবে এতে জেহাদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। পরবর্তীকালে জেহাদ বন্ধ হয়ে গেল নানা কারণে।

তখন জেহাদ অফিস থেকে সোনার বাংলা নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ শুরু হলো। এই সাপ্তাহিকের সকল দায়িত্বে ছিলেন আব্দুল গাফফার চৌধুরী। ঐ কাগজে চাকরি করতেন অভিনেতা নাট্যকার আবদুল্লাহ আল মামুন ও এককালের চিত্রালী সম্পাদক জনাব আহমেদুজ্জামান চৌধুরী। কাগজটি সেকালের সাপ্তাহিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

হঠাৎ কাগজটির মালিকানা পরিবর্তন হলো। মালিক হলেন আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক হাফেজ হাবিবুর রহমান। তাহের উদ্দীন ঠাকুর তখন ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার। তিনি একদিন আমার সঙ্গে কথা বললেন। বললেন, আমাকে বিকালের দিকে পুরানা পল্টনে আওয়ামী লীগ অফিসে শেখ মুজিবুর রহমান ডেকেছেন। বিকেলে আমি আওয়ামী লীগ অফিসে গেলাম।

www.nagorikpathagar.com

শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন—হাবিবুর রহমান সাহেব আমার বন্ধু। তিনি সোনার বাংলা কিনেছেন। আপনাকে একটু সহযোগিতা করতে হবে। আমি সোনার বাংলায় যোগ দিলাম। আমিই সর্বময় কর্তা। কিন্তু পেছনের কর্তা জনাব তাহের উদ্দীন ঠাকুর। সোনার বাংলায় লিখতেন জনাব তাহের উদ্দীন ঠাকুর এবং ইত্তেফাকের মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরী। নীতি নির্ধারণও তাঁরা করতেন।

সোনার বাংলায় যোগ দেবার দিন আমার নিজেকে বড্ড ছোট মনে হয়েছিল। আমি যাবার পরে আবদুল্লাহ আল মামুন ও আহমেদুজ্জামান চৌধুরীকে সোনার বাংলা ছেড়ে যেতে হয়। এ কথা আগে জানলে আমি হয়তো সোনার বাংলায় যেতাম না।

তবে সোনার বাংলায়ও আমার বেশিদিন থাকা হয়নি। সামরিক শাসনের আট বছর চলছে। ১৯৬৪ সালে এসে আইয়ুব খান বুঝতে পেরেছিল পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। তাই সংবাদপত্র জগতকে নিজেদের কব্জায় রাখার জন্যে সামরিক শাসকেরা এক নতুন কৌশল অবলম্বন করল। পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজিপতিদের সমন্বয়ে সৃষ্টি হলো পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্ট। এই প্রেস ট্রাস্টের অধীনে এলো পশ্চিম পাকিস্তানের ৯টি সংবাদপত্র ও পূর্ব পাকিস্তানের মর্নিং নিউজ এবং একটি নতুন বাংলা দৈনিক বের করার সিদ্ধান্ত হলো ঢাকা থেকে। এই দৈনিকের নাম দৈনিক পাকিস্তান। দৈনিক পাকিস্তানের বার্তা সম্পাদক হয়ে এলেন মোজাম্মেল হক। তিনি ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে প্রথম জীবন পর্যন্ত সার্বক্ষণিক রাজনীতিক ছিলেন। তিনি বরিশালে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল আরএসপি করতেন। তাঁর কাছেই আমার রাজনীতির হাতেখড়ি। তাঁর জীবনে তখন অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। দেশ ভাগ হবার পর তিনি ভারতে চলে যান। এক সময় আরএসপির মুখপত্র দৈনিক গণবার্তার প্রধান প্রতিবেদক হন। ১৯৫২ সালে ভারত ও পাকিস্তান থেকে ফিরে আসেন এবং সংবাদপত্রে যোগ দেন। এক সময় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তখন তিনি দৈনিক আজাদে কাজ করতেন। দৈনিক আজাদের মালিকের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় তিনি চাকরি হারান। দীর্ঘদিন সংবাদপত্রের বাইরে থাকার পর তিনি দৈনিক পাকিস্তানের বার্তা সম্পাদক হয়ে আসেন। সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন। এ পত্রিকায় আমাকে নেয়ার ইচ্ছা থাকলেও মোজাম্মেল দা কোনোদিনই দৈনিক পাকিস্তানের চাকরির কথা বলেননি। তিনি জানতেন আমাকে নিতে অনেক বাধা আছে।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৈনিক পাকিস্তানের মালিকদের গরজেই আমাকে নেয়ার প্রস্তাব এল। প্রস্তাব করলেন আইয়ুব খানের একজন একান্ত ব্যক্তি জামালউদ্দিন আলী ও পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের এককালের সভাপতি সালাউদ্দীন মোহাম্মদ। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে—সাধারণত সরকারপন্থী পত্রিকা সাম্প্রদায়িক হয়। সে ক্ষেত্রে নির্মল সেনকে টেবিলে বসিয়ে রাখলে হয়তো সাম্প্রদায়িকতার ঝাঁঝ একটু কম থাকবে। অপরদিকে এ পত্রিকায় বামপন্থীদের নেয়া হলে এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। তাই এ পত্রিকায় প্রথম থেকেই এসেছিলেন শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আহম্মেদ হুমায়ুন, তোয়াব খান প্রমুখ। আমি চাকরি পেলাম, শিফট-ইন-চার্জ।

কিন্তু দৈনিক পাকিস্তানে যোগ দেয়ার আগে আমি অন্যত্র কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। দলের সিদ্ধান্ত ছিল শ্রমিক ফ্রন্টে কাজ করার। ঢাকায় নেপাল নাহা চলে এলেন। এলেন মিসির আহম্মদ। গঠিত হলো পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন। প্রেসিডেন্ট হাসেম মোল্লা, ভাইস প্রেসিডেন্ট মওলানা সাইদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার আব্দুল কাদের, সহকারি সম্পাদক আবদুল মান্নান, কোষাধ্যক্ষ হলেন রুহুল আমিন কায়সার। এই আব্দুল মান্নানই পরে লালবাহিনী মান্নান বলে খ্যাত। এই চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকেই ১৯৬৪ সালের ২ জুলাই পাঁচ দফা দাবির প্রেক্ষিতে ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। এই হরতাল ২২ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই হরতালকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনা ঘটে। তখন আমার চাকরি ছিল না। দৈনিক পাকিস্তানে যোগ দেয়ার প্রশ্নই ওঠেনি।

১৯৫৪ সালের ১৪ জানুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এ দাঙ্গায় আমাদের দেশের শ্রমিক সমাজ অংশগ্রহণ করেছিল। আদমজী শ্রমিকদের ভূমিকা আদৌ গৌরবজনক ছিল না।

জুলাই মাসে এ চটকল শ্রমিকদের নিয়েই আমরা আন্দোলন শুরু করলাম। আগে চটকল শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন ছিল মাসে ৬৫ টাকা। আমরা দাবি করলাম মাসিক বেতন ৮১ টাকা হতে হবে। আমাদের দাবির ভিত্তি ছিল ৫ মণ চালের দাম। তখন চাল ছিল ১৫ টাকা মণ। ৮১ টাকা বেতন হলে ৫ মণ চাল কিনেও ৬ টাকা হাতে থাকে। আজো দাবি দাওয়ার আন্দোলনে শ্রমিকরা নিম্নতম মজুরি হিসেবে ৫ মণ চালের দাম দাবি করে থাকে। এ ভিত্তি নির্ধারিত হয় আমাদের আন্দোলনে।

১৯৬৪ সালে ২ জুলাই দেশবাসী বিস্মিত হয়ে যায়। কঠিন সামরিক শাসনের মধ্যে ৫টি চটকলে ধর্মঘট হয়ে গেল। নেতৃত্ব করছে পূর্ব পাকিস্তান

www.nagorikpathagar.com

চটকল শ্রমিক ফেডারেশন। একেবারেই নতুন এবং অচেনা। ইতোপূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে চটকল শ্রমিকদের নেতা ছিলেন আলতাফ আলী ও ফয়েজ আহমদ। তাদের সঙ্গে ছিলেন খোন্দকার আব্দুল কাদের। কাদের সাহেব তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের সঙ্গে আসেন। চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভাপতি ছিলেন হাশেম মোল্লা। ধর্মঘট শুরু হবার আগে হাশেম মোল্লা পদত্যাগ করেন। সহসভাপতি মওলানা সাইদুর রহমান সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৬৪ সালের ধর্মঘট ছিল অভূতপূর্ব। পরদিন ইংরেজি দৈনিক অবজারভার লিখেছিল—গতকাল আদমজীর আকাশে একটি কাকও উড়েনি। ৫টি চটকলের ধর্মঘট ছিল সর্বাত্মক। এই পাঁচটি চটকল হলো আদমজী, ঢাকা, করিম, ফেব্রিকস এবং রাওয়া। এ ধর্মঘট সবাইকে হতচকিত করে দিল। প্রশ্ন দেখা দিল এ ধর্মঘটের নেতৃত্বে কারা। সকলের ধারণা ছিল এদেশ বামপন্থী আন্দোলন মানে কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন। সব ধর্মঘটই কমিউনিস্ট পার্টি করে থাকে। কিন্তু দেখা গেলো এ ধর্মঘটে তাদের পাত্তা নেই। তাদের সঙ্গে ধর্মঘটের কোনো সম্পর্ক নেই। সেকালের কমিউনিস্ট পার্টি একটি শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল। সে সংগঠনের নাম পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক পরিষদ। এ সংগঠনের সভাপতি ছিলেন মরহুম মোহাম্মদ তোয়াহা এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনাব সিরাজুল হোসেন খান। এদের চটকল নেতা ছিলেন আবুল বাশার। এ সংগঠন পরবর্তীকালে মস্কোপন্থী এবং পিকিংপন্থী হিসেবে ভাগ হয়ে যায়। মস্কোপন্থীরা সহিদুল্লাহ চৌধুরী ও সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিকের নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র গঠন করেন। অপরদিকে পিকিংপন্থীরা গঠন করেন পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন। এই ফেডারেশনের পরবর্তীকালে একাধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। নেতৃত্বের কোন্দলে কাজী জাফর ও আবুল বাশার ভিন্ন সংগঠন গঠন করেন।

এদের রাজনীতির সঙ্গে আমাদের বা পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমরা যারা এককালে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আরএসপি) করতাম তাদের ইতিহাস এদের লেখায় কোনোদিন স্থান পায়নি। অথচ বিভাগ পূর্ব যুগেও গোদনাইল এলাকায় বস্ত্র মিলগুলোতে আরএসপির শক্তিশালী সংগঠন ছিল। ১৯৬৪ সালের চটকল ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিক ফ্রন্টে আরএসপির অভ্যুদয়ে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

www.nagorikpathagar.com

উল্লেখ্য, ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃত্বে ৩টি বড় ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘট ছিল। ৬৯-এর শ্রমিক এলাকার গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে আমাদের বিভিন্ন বামপন্থী লেখকেরা চটকল ধর্মঘটের এ যুগটিকে আদৌ বিবেচনায় আনেন না। আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যসহ অনেকেই শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস লিখেছেন কিন্তু এ পর্বটি সমতলে বাদ দিয়েছেন। কোনোমতে পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন সম্পর্কে দু'এক লাইন লিখে ইতিহাস শেষ করেছে। আরএসপি বা আমাদের কোনো উল্লেখই এ লেখাগুলোতে নেই। অথচ পাকিস্তানের ২৩ বছরে উল্লেখ করার মতো শ্রমিক আন্দোলন তেমন হয়নি। উল্লেখযোগ্য ছিল ঐ ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত চটকল শ্রমিক আন্দোলন। এই আন্দোলনই পরবর্তীকালে অন্য আন্দোলনের জন্ম দেয়। তবে শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম এই আন্দোলনেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি টঙ্গী শিল্প এলাকায় কাজী জাফরদের আন্দোলন এবং খুলনা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত আমাদের চটকলের আন্দোলনই ছিল শিল্পাঞ্চলে বড় ধরনের ঘটনা। কিন্তু রাজনৈতিক সংকীর্ণতার ফলে সেকালে চটকল আন্দোলন কাহিনী কোনো দিনই সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি।

উপরের ঘটনা থেকে পরিষ্কার যে আমরা এককভাবেই ধর্মঘট শুরু করেছিলাম। আমরা আরএসপির সদস্যরা তখন তেমন সংগঠিতও ছিলাম না। তাই প্রতি পদে পদে আমাদের বিপদে পড়তে হচ্ছিল। ধর্মঘট শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেশনের সম্পাদক খোন্দকার আবুল কাদের গ্রেফতার হয়ে যান। ধর্মঘট ১২ দিন অতিবাহিত হলে তিনি জেলখানা থেকে বিবৃতি দিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন এবং মুক্তিলাভ করেন। আমরা সেদিন ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিলাম। পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার আবুল কাদেরকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হলো। অস্থায়ী সম্পাদক হলেন সহকারি সম্পাদক আব্দুল মান্নান। আমরা ধর্মঘট চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের এ সিদ্ধান্ত সকল মহলে আর এক দফা বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। ইতোমধ্যে আমরা বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলাম। পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক পরিষদের সিরাজুল হোসেন খান, রেল শ্রমিক নেতা মাহবুবুল হক সমঝোতার জন্যে একটি কমিটি গঠনের চেষ্টা করলাম। তাঁরা বৈঠক করলেন গভর্নর মোনেম খানের সঙ্গে। কিন্তু আলোচনা সফল হলো না। পরবর্তীকালে আমরাই গভর্নরের সঙ্গে বৈঠকে বসলাম। মালিক পক্ষ এলেন। ২০ দিন ধর্মঘটের পর ২২ জুলাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। মালিক পক্ষ রাজি

www.nagorikpathagar.com

হলেন আপাতত ৮ টাকা বেতন বৃদ্ধি করা হবে। শ্রমিকদের কাছে ছিল এটা এক অপ্রত্যাশিত বিজয়। ইতিপূর্বে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার আমলে শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমমন্ত্রী থাকাকালে চটকল শ্রমিকদের বেতন বেড়েছিল ১ টাকা ২৫ পয়সা। আর ১৯৬৪ সালে বেতন বৃদ্ধি হলো ৮ টাকা। ইত্তেফাক আট কলাম হেডিং লিখলেন চটকল শ্রমিকদের কাছে মালিক পক্ষের নতি স্বীকার। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এ বিজয় আমাদের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের বইতে নেই।

তবে আন্দোলন এখানেই শেষ হলো না। মালিকপক্ষ দু'মাসের মধ্যে আমাদের দাবি-দাওয়া মেনে নিল। অক্টোবরে আমাদের দ্বিতীয়বারের জন্যে ধর্মঘটে যেতে হলো।

এবার শুধু ৫টি কলেই নয়, দেশের অধিকাংশ চটকলেই ধর্মঘট হয়েছিল। এ ধর্মঘট চলছিল দীর্ঘ ৫৫ দিন।

তবে এর পরেও ধর্মঘট করতে হলো। এবার ধর্মঘট হলো ১৯৬৫ সালে। এবারও দাবি বেতন বৃদ্ধির। ১৯৬৪ সলের দ্বিতীয় ধর্মঘটে বাকি ৮ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ করা গেলো বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। চালের দাম বাড়ছে। ৮১ টাকায় আর ৫ মণ চাল পাওয়া যায় না এবং সেই প্রেক্ষিতেই ১৯৬৫ সালে আবার ধর্মঘটে গেল চটকল শ্রমিকরা। এবার সারাদেশে চটকল শ্রমিক ধর্মঘট। পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন তখন অসম্ভব জনপ্রিয়। কোথাও আমাদের যেতে হয় না। শ্রমিকেরা আমাদের সঙ্গে ইউনিয়ন নির্বাচন করে এবং জয়লাভ করে। চট্টগ্রামের কিছু কিছু এলাকা ব্যতিত খুলনা থেকে শুরু করে আদমজী, কাঞ্চন, নরসিংদী, ঘোড়াশাল সর্বত্রই পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন-এর অপ্রতিহত প্রভাব। তাই এবারের ধর্মঘটে সকল প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন দিতে হলো। ফয়েজ আহমেদের শ্রমিক প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। বাকি ছিল চট্টগ্রামের আবুল বাশারের চটকল শ্রমিক সংগঠন। শেষ পর্যন্ত তারাও আমাদের সমর্থন দেয়।

তবে এই ধর্মঘটে তারা ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করে। ধর্মঘট পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন আহ্বান করেছিল। আমরাই এ ধর্মঘটের নেতৃত্ব ছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলাম। আমি তখন দৈনিক পাকিস্তানে কাজ করি। হঠাৎ একদিন শোনা গেলো তোয়াহা সাহেব এবং বাশার সাহেব চট্টগ্রামে বাওয়ানী জুটমিলের মালিক ইয়াহিয়া বাওয়ানির সঙ্গে বসেছেন এবং একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করেছেন। এই

www.nagorikpathagar.com

চুক্তির উদ্যোগ নিয়েছেন রাশেদ খান মেননের ভাই জনাব আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। তিনি তখন চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাঁর দফতরেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো অথচ আমাদের কিছুই জানানো হলো না। শুনেছি মেনন ছাত্রনেতা হিসেবে এ চুক্তির বিরোধিতা করেছিল।

আমার কাছে ঘটনাটি খুব অস্বাভাবিক মনে হয়নি। তখন কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্ব হচ্ছে জাতীয় গণতান্ত্রিক ও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই দুই বিপ্লবের সহযোগী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি। এই জাতীয় বুর্জোয়াদের অন্যতম নেতা ইস্পাহানির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক বহুল আলোচিত। ইস্পাহানিরও চটকল আছে। সেই চটকলেও ধর্মঘট হচ্ছে। সুতরাং জাতীয় বুর্জোয়ার প্রতিনিধি হিসেবে বাওয়ানীর সঙ্গে কমিউনিস্ট প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের চুক্তি আমার কাছে খুব বিস্ময়কর মনে হয়নি। তবে বিস্মিত হয়েছিলাম একটি কারণে—কী করে আমাদের না জানিয়ে যারা আমাদের ধর্মঘট সমর্থন করলো তারাই চুক্তি স্বাক্ষর করল। এটা কোন ধরনের শ্রমিক রাজনীতি! এ জন্যে চট্টগ্রাম চুক্তির নেতাদের আজও কথা শুনতে হয়। সেটা ছিল চটকল শ্রমিক আন্দোলনের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়।

তবে ঐ চুক্তি আমরা মানিনি। তোয়াহা সাহেব ধর্মঘট প্রত্যাহার করার জন্যে প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিলেন। একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিল যে ধর্মঘট আপনারা ডাকেননি সে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছেন কী করে? তোয়াহা সাহেব কোনো জবাব দিতে পারেননি। সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই এক বন্ধু আমাকে ফোন করে জানান যে তোয়াহা সাহেব ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে আমি পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করি যে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়নি, ধর্মঘট চলছে। ফলে চট্টগ্রামে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিলেও আদমজীতে ধর্মঘট চলতে থাকে।

আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে আমরা চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করব না কিন্তু কাজে যোগ দেব। প্রয়োজন হলে পরবর্তীকালে আবার ধর্মঘটে যাব। সরকার পক্ষে চারজন মন্ত্রী লিখিতভাবে আমাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানান। জানান যে আপনারা চুক্তি স্বাক্ষর না করলেও আপনাদের দাবি নিয়ে আলোচনা করা হবে। আমরা আদমজীতে ৫০ হাজার শ্রমিকের জনসভা করে চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর না করেই কাজে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু মালিক পক্ষ চুক্তি স্বাক্ষর না করে মিলে ঢুকতে দিতে অস্বীকার করেন। এরপরও ৭ দিন ধর্মঘট চলে। মালিক আমাদের কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়। শর্ত হচ্ছে আমাদের

www.nagorikpathagar.com

কোনো শ্রমিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। আমরা চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করব না। আমাদের সঙ্গে নতুন করে আলোচনায় বসতে হবে।

এ ধর্মঘটের সময় আমাদের কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। আমরা এই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি যে রাজনীতির জগতে আমরা নিতান্তই একাকী। শ্রমিক আন্দোলনে সবাই সহযোগিতা করলেও রাজনীতির সঙ্গে আমাদের আবির্ভাব কেউ পছন্দ করছিল না। এসময় বিপদে পড়ে আমরা কাগমারিতে মওলানা ভাসানীর কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন—কোনো সাহায্য করার ক্ষমতা আমার নেই। একটি বিবৃতিও আমরা তাঁর কাছ থেকে আদায় করতে পারিনি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এক বন্ধুকে নিয়ে এক ভোরে শেখ মুজিবের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি অক্ষমতা জানিয়ে দিলেন সাহায্য-সহযোগিতা করতে। আমাদের সামান্য কিছু টাকা সাহায্য হিসেবে দিতে চেয়েছিলেন। সে টাকা না নিয়ে আমরা ফিরে এসেছিলাম। এ খবর আদমজীতে জানাজানি হবার পরে আদমজীর শ্রমিকদের পক্ষ থেকেই দাবি উঠেছিল আমাদের নিজেদেরই রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে।

১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল। এ দু'বছর আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয়েছে চটকল শ্রমিকদের নিয়ে। অনেক শ্রমিক এলাকায় আমাদের পরিচিতি ছিল রূপকথার মতো। আইয়ুব খানের আমলে আমরাই বিদ্রোহ করেছিলাম প্রথমে, ষাটের দশকে এবং জিতেছিলাম। আমাদের চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন আদমজীর মওলানা সাইদুর রহমান। তখনও তেজগাঁও শিল্প এলাকা শ্রমিক অসন্তোষ চলছিল। তেজগাঁওয়ে আমাদের শ্রমিক সংগঠন নেই। তবুও তেজগাঁওয়ের শ্রমিকদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হলো একবারের জন্যে মওলানা সাইদুর রহমানকে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ঘুরিয়ে আনতে। মওলানা সাহেব একদিন শ্রমিকদের নিয়ে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় শুধুমাত্র পাঁয়ে হেটে এলেন। পরের দিন মালিকেরা শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসল।

আমাদের প্রভাব আমাদের কাল হলো। আওয়ামী লীগের একটি মহল যারা পরবর্তীকালে জাসদ গঠন করেছিল তারা আমাদের সংগঠনে তাদের লোক ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করল এবং কাজ করতে শুরু করল। তখনো শ্রমিক লীগ গঠিত হয়নি। আওয়ামী লীগ চেষ্টা করতে শুরু করল আমাদের সংগঠনকে ভিত্তি করে নতুন সংগঠন দাঁড় করাতে। আমাদের ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় অফিস ছিল ১৬ বাহাদুরপুর লেনে। বাহাদুরপুর লেনের এই অফিসে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতা প্রয়াত কমরেড নেপাল নাহা ও শ্রমিক নেতা মরহুম আব্দুল মান্নান ও মিসির আহমদ থাকতেন। এখানেই শুরু হলো ছাত্রলীগের তৎপরতা।

www.nagorikpathagar.com

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি ঘোষণা করলেন। এই ছ'দফা ব্যাখ্যা এবং গ্রহণ ও বর্জন নিয়ে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। তখন আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন বামপন্থী গ্রুপের নেতারা কথা বলেছেন। কথা বলেছেন ছাত্রলীগের নেতারা। তাঁদের সকলের কথা দেশ স্বাধীন করতে হবে। পাকিস্তানে থাকা যাবে না। আমাদের কথা হলো স্বাধীন বাংলাদেশ কেমন হবে আমরা আগে জানতে চাই। তার কোনো চিত্র ছ'দফায় নেই। ছ'দফা হচ্ছে পাকিস্তান থেকে চলে আসার দলিল। এতে ভবিষ্যৎ সমাজ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই। আমাদের এই আলোচনার সময়টা সারা দেশে এক নতুন আবেগ সৃষ্টি হলো, বাংলাদেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে। একদিন এক ব্যবসায়ী এলেন আমার কাছে। তিনি মনে প্রাণে নির্ভেজাল আওয়ামী লীগ বিরোধী। আমাকে বললেন, আমি নিউমার্কেটে একটা হোটেল দেব। হোটেলের নাম হবে বাঙালি। বাঙালি খাবার ব্যতিত অন্য কোনো খাবার থাকবে না।

এ ভদ্রলোক দেশ স্বাধীন হবার পর দু'টি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন এবং জেল খেটেছিলেন। এ ভদ্রলোকের সঙ্গে দিনের পর দিন আলোচনা হয়েছে। অপরদিকে প্রায় প্রতিদিন শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হচ্ছেন। আইয়ুব খান ধমক দিচ্ছেন। সব মিলে সারাদেশে যে একটি আবাহওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আজ মনে হচ্ছে কালের সে পরিস্থিতি আমরা হৃদয় দিয়ে নয়, শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করেছি। আমরা বুঝতে পারিনি, আমাদের সংগঠনেও এক নতুন আবেগের সৃষ্টি হয়েছে এবং তারই সুযোগ নিয়েছে আওয়ামী কর্মীরা। ১৯৬৬ সালের ৬ জুন আওয়ামী লীগ ছ'দফা দিবস ঘোষণা করে। তেজগাঁওয়ে মনু মিয়াসহ ১১ ব্যক্তি নিহত হয়। প্রথম ধরপাকড় শুরু হয় সারাদেশে। এ সময় গ্রেফতার হয়ে যায় আমাদের ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান ও আমাদের নেতা কমরেড নেপাল নাহা। আমার আজকে মনে হচ্ছে ছ'দফার প্রশ্নে নেপাল দা আমাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ আন্দোলনের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক ছিল? আপনি কেন মান্নানকে আমাদের দলীয় সিদ্ধান্তের কথা জানাননি। নেপালদা বলেছিলেন, তাঁর ধারণা ছিল এ আন্দোলন দানা বাঁধবে। তাই মান্নানকে আন্দোলনের সঙ্গে থাকতে বলেছিলেন। জেলখানায় নেপালদার সঙ্গে শেখ সাহেবের আলোচনা হয়েছিল। শেখ সাহেব বলেছিলেন আসুন একসঙ্গে আন্দোলন করি। নেপাল দা জবাব দিয়েছিলেন আমরা তো আন্দোলনে আছি, আমাদের আন্দোলন সমাজ পরিবর্তনের জন্যে। আপনারা আসুন।

www.nagorikpathagar.com

১৯৬৯ সালে শেখ সাহেব জেল থেকে বের হয়ে আসার পর আবার আমাদের ডেকেছিলেন। তার প্রস্তাব ছিল এক সঙ্গে শ্রমিক ফ্রন্ট গঠনের। তিনি আলোচনা করেছিলেন আমাদের অন্যতম নেতা রুহুল আমিন কায়সারের সঙ্গে তাঁর ৩২ নম্বর সড়কের বাসায়। রুহুল আমিন সাহেবও জবাব দিয়েছিলেন আমরা আন্দোলনে আছি। আপনার প্রস্তাব বিবেচনা করব।

১৯৬৬ সালের নভেম্বরের দিকে হঠাৎ নেপাল দা এসে হাজির। তিনি জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কেন মুক্তি পেলেন আমাদের বোধগম্য হলো না। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলো রায়েরবাজারে রুহুল আমিন সাহেবের বাসায়। দেখলাম নেপাল দা কাশছেন। কাশতে কাশতে তাঁর মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। বললাম, নেপাল দা আপনি কি অসুস্থ? তিনি বললেন, একটু কাশি হয়েছে। পকেটে কিছু ওষুধ আছে। ভাববার কিছু নেই।

আমি বললাম, নেপালদা আপনি বাড়ি যান। সকলের সঙ্গে দেখা করুন। আপনি ফিরে এলে দেখা করব।

নেপাল নাহার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার শ্রীঘর গ্রামে। রায় বাহাদুর অনঙ্গমোহন নাহার পরিবারের সদস্য তিনি। জেলখানা থেকে এমএ পাস করেছেন। নরসিংদী থেকে লঞ্চে নবীনগর যাবার পথে মানিকনগর স্টেশনে নামতে হবে। কিছুদূর হেঁটে গেলে যতদূর চোখ যায় সব জমির মালিক হচ্ছে নাহা পরিবার। নেপাল দা ছাত্রজীবনে অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। পরে আরএসপিতে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় তিনি পাকিস্তান থেকে যান। ৫০-এর দশকের নিখিল পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবারের সহকারি সম্পাদক ছিলেন। ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন ফয়েজ আহম্মদ। ৫০-এর দশকে তিনি গ্রেফতার হয়ে যান। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তিনি কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৬৩ সালে দলের নির্দেশে তিনি ঢাকায় আসেন। সদরঘাট ইস্ট বেঙ্গল ইন্সটিটিউশনে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তার বাসস্থান ফরিদাবাদের ১৬ বাহাদুরপুর লেনে ছিল পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের অফিস। নেপাল দার বাড়ি যাবার সঙ্গী হচ্ছে গামছায় জড়ানো একটি লুঙ্গি, হাতে কাঁচা একটি জামা ও দাঁতনের জন্যে একটি নিমের ডাল।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর নেপাল দা একবার কলকাতায় বেড়াতে যান। কলকাতায় নেপাল দার ভাই এক বড় হোটেলের মালিক। সেই হোটেলে আরএসপির শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল। একবার শ্রমিক-মালিক বিরোধ দেখা দিলে

www.nagorikpathagar.com

পার্টির তরফ থেকে নেপালদাকে তাঁর ভাইপোর সঙ্গে আলোচনা করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। নেপাল দা বলেছিলেন মালিক কোনোদিন ভাই হয় না। তারপর নেপাল দা চলে এলেন পূর্ব পাকিস্তানে।

কিছুদিন পরে নেপাল দা ফিরে এলেন শ্রীঘর থেকে। উঠলেন বাহাদুরপুর লেনে। নেপাল দা অসুস্থ, মুখ থেকে রক্ত উঠছে। নেপাল দার ছাত্র কুমিল্লার আশফাকুর রহমান তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পড়ছিল। তার সন্দেহ হলো নেপাল দা হয়তো ক্যান্সারে ভুগছেন।

নেপাল দাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলো। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেল নেপাল দার গলায় ক্যান্সার এবং শেষ অবস্থা। ক্যান্সার জেনেই আইয়ুব সরকার নেপাল দাকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু কাউকেই জানায়নি যে নেপাল দা ক্যান্সারে ভুগছেন।

পূর্ব পাকিস্তানে ক্যান্সারের চিকিৎসা নেই। ডাক্তাররা বলল কোলকাতায় পাঠাতে। নেপালদাকে জানানো হলো তাঁর অসুখের কথা। নেপাল দা কিছুতেই কলকাতায় যাবেন না। নেপাল দা বললেন, দেশ ভাগের পর কলকাতার বন্ধুরা আমাকে ভারতে থাকতে বলেছিল। আমি বলেছিলাম আমি মাতৃভূমিতে ফিরে যাব। বিপ্লব আমাদের দেশেই আগে হবে। এখন যদি আমি কলকাতায় যাই, বন্ধুরা বলবে আমি পরাজিত হয়েছি। কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষায় নেপাল দা বললেন—আমি ডিফিট হইতাম চাই না।

সেদিনের কথা আমার এখনো মনে আছে। আমি ও রুহুল আমিন সাহেব বারবার বোঝাতে চেয়েছিলাম এতে পরাজয়ের কিছু নেই। আপনি চিকিৎসার জন্যে যাচ্ছেন। আমি বন্ধুদের চিঠি লিখে দেব। পরিষ্কার করে সব জানাব। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। হঠাৎ নেপাল দা আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, সত্যি সত্যি আপনি লিখে দেবেন। সবাইকে বোঝাতে হবে আমি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসিনি। আপনি চিঠি লিখুন, আমি যাব।

কিন্তু নেপাল দাকে পাঠাবো কী করে। তাঁর পাসপোর্ট নেই। পাকিস্তান সরকার তাঁকে পাসপোর্ট দেবে না। সিদ্ধান্ত হলো আগরতলা সীমান্ত দিয়ে তাঁকে ভারতে পাঠানো হবে। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সঙ্গে যাবে। সব কথা শেষ করে দৈনিক পাকিস্তানে ফিরে গেলাম। তখন আমি রাতের পালায় কাজ করি। গভীর রাতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে আমাকে ফোন করল—নেপাল দার অবস্থা খারাপ। তাঁকে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। গভীর রাতে হাসপাতালে ছুটে গেলাম। নেপালদা ঘুমুচ্ছেন। অবস্থা একটু ভালো। নেপালদার কাছে আছেন তাঁর ভাই।

www.nagorikpathagar.com

পরের দিন দুপুরে দৈনিক পাকিস্তানে আবার ফোন এল। এবারো আশফাক ফোন করেছে। নেপাল দা নেই। দুপুরের দিকে তিনি ভালোই ছিলেন। ওয়ার্ডে কোনো ডাক্তার ছিল না। নেপাল দা অক্সিজেনের নলটা খুলে অন্যান্য রোগিদের সেবা করছিলেন, হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান। নেপাল দা অন্যের সেবা করতে করতেই মারা গেলেন। তাঁকে মাতৃভূমি ছাড়তে হলো না।

পরের দিন নেপাল দাকে নিয়ে আমি আর কাজী হাতেম আলী শ্রীঘর গিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় শ্রীঘরের নাহা বাড়িতে কান্নার রোল উঠল। নেপাল দার মায়ের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন, তোমাদেরও এমনি করেই মরতে হবে। কথাগুলো আজো আমার মনে বাজছে।

কমরেড নেপাল দা অর্থাৎ কমরেড নেপাল নাহার মৃত্যুতে আমরা চরম বিপদে পড়ে গেলাম। নেপাল দার সঙ্গে শ্রমিক নেতা আবুল মান্নান ও মিসির আহমদ থাকতেন। তাঁরা দু'জনেই আমাদের দলের লোক। তবে ৬ দফা নিয়ে কিছুটা মতান্তর আছে। আমাদের মত হচ্ছে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে কেমন সমাজ হবে তা বুঝেই ৬ দফাকে সমর্থন করতে হবে। মিসির আহমদ আমাদের সঙ্গে একমত। মান্নানের ভিন্ন মত থাকলেও সে খুব সোচ্চার নয়। তাদের সঙ্গে নেপাল দা থাকায় একটা ভারসাম্য ছিল। তাই নেপাল দার মৃত্যুতে আমরা কিছুটা বিপদে পড়ে গেলাম। আমরা অবিভক্ত ভারতবর্ষের আরএসপির লোক হলেও ১৯৫০ সালের পর আরএসপি নামে কাজ করা সম্ভব ছিল না। পাকিস্তানে সমাজতন্ত্রের কথা বলা ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাধারণ নির্বাচন হয়। যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। কিছুদিনের জন্যে আমরা স্বস্তিলাভ করি। আর তার পরেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া হয়। সারাদেশে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। আবার আমাদের বেছে নিতে হয় জেলে যাওয়া ও আত্মগোপনের জীবন।

এ সময় যুক্তফ্রন্ট নেতৃত্বের দেউলেপনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুক্তফ্রন্টের বড় দু'টি দলের নাম আওয়ামী লীগ এবং কেএসপি। আওয়ামী লীগের নেতা মওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী। কেএসপির নেতা ছিলেন শেরেবাংলা একে ফজলুল হক। আওয়ামী লীগের গায়ে কিছুটা প্রগতিশীল ছাপ ছিল। কিন্তু ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে কেএসপির সঙ্গে কোনো পার্থক্য ছিল না। এ দু'টি দলই ক্ষমতায় যাবার দ্বন্দ্ব লড়াইয়ে ক্রমাগত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে খুশি করার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৮ সালে রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই দেউলেপনার জন্যে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হয়েছে। সামরিক বাহিনী

www.nagorikpathagar.com

ক্ষমতায় এসেছে। এ পটভূমিতে আরএসপি নামে প্রকাশ্যে কাজ করার কোনো সুযোগই ছিল না।

এ সময় আমরা সিদ্ধান্ত নিই শ্রমিক ফ্রন্টে কাজ করার। পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন গড়ে তুলি। আমাদের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক চটকল ধর্মঘট হয়। এর পরে আসে ১৯৬৬ সালের আন্দোলন। চারদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রবল আবেগ। শ্রমিক এলাকায় কাজ করলেও আমাদের রাজনৈতিক দলের তেমন পরিচিতি নেই। স্বীকৃতি নেই কোনো মহলে। সকল মহলেরই ধারণা ছিল সকল শ্রমিক রাজনীতির সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি জড়িত। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ বা সমাজতন্ত্র একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিরই কথা। কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতিত সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী অন্য কোনো দলের অস্তিত্বের ধারণাই ছিল না।

এর একটা ঐতিহাসিক কারণ ছিল, বিশেষ করে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল অর্থাৎ আরএসপির প্রশ্নে। কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল বিশের দশকে। আরএসপি গঠিত হয়েছিল ১৯৪০ সালের ১৯ মার্চ। আরএসপি গঠন করেছিল অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা। এদের অধিকাংশ এসেছিল অনুশীলন সমিতি থেকে। ১৯১৭ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবের পর অগ্নিযুগের এই বিপ্লবীরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সংস্পর্শে আসেন। ব্রিটিশের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে এদের একটি অংশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। অপর অংশের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের নেতৃত্ব নিয়ে। অনুশীলনের এই অংশ মনে করে স্ট্যালিন সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারছে না। স্ট্যালিনের নেতৃত্ব তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ভুল নির্দেশ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিশ দশকের কংগ্রেসের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন সমর্থন করেনি। আবার ১৯৩৫ সালে এসে একই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নির্দেশে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে এবং সুভাষ বসুকে সমর্থন করেনি গান্ধীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে।

এই পটভূমিতে ১৯৪০ সালের ১৯ মার্চ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল আরএসপি গঠিত হয়। ইতোমধ্যে ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

আরএসপির মধ্যে থেকে ঘোষণা করা হলো এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এ যুদ্ধ সমর্থন করা যাবে না। আরএসপি গঠনের ৬ মাসের মধ্যে প্রথম সারির নেতারা গ্রেফতার হয়ে গেলো। দলটির নাম প্রচার হবার পূর্বেই ভয়াবহ নির্যাতন শুরু হয়ে গেল। এই দলের অজস্র কর্মী আত্মগোপন করে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। গ্রেফতার বরণ করে এবং

www.nagorikpathagar.com

নিহত হয়। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হবার পর এ দলের কর্মী ও নেতাদের মুক্তি দেয়া শুরু হয়। দলের প্রধান নেতা সাধারণ সম্পাদক যোগেশ চট্টোপাধ্যায় তখন বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত। তিনি কাদরি ষড়যন্ত্র ও আন্তঃপ্রদেশ ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগী ছিলেন শহীদ রাজনারায়ণ লাহিড়ী, জগৎ সিংহ ও আশফাক উল্লাহ প্রমুখ। যোগেশ চট্টোপাধ্যায় হিন্দুস্তান রিপাবলিকান সোসালিস্ট আর্মির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই সংগঠনটি ১৯২৩ সালে কুমিল্লার নবীনগর থানার ভোলাচং গ্রামে জন্ম হয়। তখন এই সংগঠনের নাম ছিল হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি। ভোলাচং ছিল অনুশীলন সমিতির অন্যতম নেতা বিপ্লবী অতীন্দ্রমোহন রায়ের বাড়ি। বিপ্লবী অতীন্দ্রমোহন রায় আরএসপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯৬৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন।

১৯৪০ সালে গঠিত আরএসপির অবস্থা দাঁড়াল এমন যে ৬ মাসের মধ্যে তাদের নেতারা গ্রেফতার হয়ে গেলেন। ১৯৪২ সালে এই অবস্থা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হলো। ১৯৪৬ সালে নেতারা মুক্তি পেলেন। ১৯৪৭ সালে আরএসপির সাধারণ সম্পাদক যোগেশ চট্টোপাধ্যায় বাংলাদেশে ঢুকবার অনুমতি পেলেন। এ সময় সারা ভারতবর্ষে টালমাটাল অবস্থা। নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ। বিমান বাহিনীতে বিদ্রোহ। আজাদ হিন্দু ফৌজের বিচার। সব মিলে এক রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের পরিবেশ। ব্রিটিশ সরকার, কংগ্রেস এবং মুসিলম লীগ সকলেই ভীত এবং সন্ত্রস্ত। এ অবস্থা চলতে থাকলে অভ্যুত্থানের মারফৎ ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্রিটিশ বেনিয়া ও ভারত ধনিক, বণিকগোষ্ঠী—যাদের নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ।

১৯৪৬-এর এই অভ্যুত্থানের পরিবেশ এড়ানোর জন্যে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে নামলো এই বেনিয়ারা। সারা দেশ রক্তাক্ত হলো ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গায়। সাধারণ মানুষকে বুঝানো হলো হিন্দু মুসলমান দু'জাতি। এরা এক সঙ্গে থাকতে পারে না। সুতরাং ভারত বিভাগ চাই। এ তত্ত্বে শেষ পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও সায় দিল।

এ পরিবেশে ৬ বছর জেল খেটে আরএসপির নেতৃবৃন্দ বাইরে এলেন। দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় জোর প্রতিবাদ জানালেন। সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের জন্যে নেতাজীর অগ্রজ শরৎ বসুর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হলেন। এই প্রয়াসে সঙ্গী হয়েছিলেন মুসলিম লীগের হোসেন

www.nagorikpathagar.com

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম। কিন্তু শেষ মুহূর্তের প্রয়াস কোনো কাজে আসেনি। কংগ্রেস আর মুসিলম লীগ হাইকমান্ডের সহযেগিতায় বিভক্ত হয়েছে ভারতবর্ষ।

এই বিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চল নিয়ে গঠিত পূর্ব বাংলা পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে মুখ্যত আরএসপির সংগঠন ছিল বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, পাবনা এবং দিনাজপুরে। এ সংগঠনের নেতৃত্ব এসেছিল শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। দেশ বিভাগের পর নেতৃত্বের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় চলে যায়। যারা আজকের বাংলাদেশে থেকে যায় তাদের মোকাবেলা করতে হয় চরম নির্যাতন। দল হিসেবে পরিচিত নেই, অথচ সমস্ত নির্যাতনের ভাগীদার হয়ে শ্রমিক ফ্রন্ট ভিত্তি করে সামনে আসতে আসতে ১৫ থেকে ২০ বছর কেটে যায়।

১৯৬৬ সালে চটকল আন্দোলনের মধ্যদিয়ে অনুভূত হয়, রাজনৈতিক দল গঠন না করে শুধুমাত্র শ্রমিক সংগঠনের নাম নিয়ে সর্বহারার নেতৃত্ব করা যাবে না। আরএসপির পক্ষ থেকে তখন নতুন করে চিন্তাভাবনা হয় নতুন নামের সংগঠন করা এবং এ সময় শুরু হয় ৬ দফা দাবি ভিত্তি করে সুতীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

এ আন্দোলনে শ্রমিক এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিকদের মধ্যেও এ আন্দোলনের প্রতি ঝোঁক লক্ষ করা যায়। এ সময় নেপাল দা মারা যান। তবে লক্ষণীয় যে শ্রমিক এলাকায় এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লেও আদমজীসহ অধিকাংশ পাটকলে আমাদের নেতৃত্ব অটুট থাকে। সংগ্রামের মধ্যদিয়ে একাত্ম হবার ফলে আমাদের ওপর শ্রমিকদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসকে রাজনৈতিক রূপ দিতে গিয়ে প্রতি পদে পদে আমাদের হোঁচট খেতে হয়েছিল।

তখন রাজনৈতিক অঙ্গনে একের পর এক ঘটনা ঘটছিল। কিন্তু শিল্প এলাকা ছাড়া রাজনৈতিকভাবে আমাদের কোনো চাপ ছিল না। আরএসপির কিছু ব্যক্তি হিসেবে আমরা রাজনৈতিক মহলে পরিচিত। এক সময় আমরা ছাত্রলীগ করলেও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আমলে ছাত্রলীগের কমিউনিস্ট বিরোধী পাশ্চাত্যঘেষা নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আমরা ছাত্রলীগ ত্যাগ করি। আমরা ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিলেও কমিউনিস্ট পার্টি কখনই আমাদের ছাত্র ইউনিয়নে কাজ করতে দেয়নি। ন্যাপ গঠনের পর মাওলানা ভাসানী ন্যাপে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা রাজি হইনি।

www.nagorikpathagar.com

আমরা বলেছি নিজের আত্মপরিচয় গোপন করে সমঝোতা করে অন্য দলে যোগ দিলে একদিন আদর্শচ্যুত হবই। কোনোদিন আর নিজের দলে ফিরে আসা যাবে না। কারণ শ্রেণিসংগ্রাম আর শ্রেণি সমন্বয়ের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে। শ্রেণি সমন্বয়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে শ্রেণি সংগ্রামের রাজনীতি অংশগ্রহণ করা যায় না। আমাদের দলগত বিশ্বাস ত্রিশের দলকে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট নেতা দিমিট্রভসের পপুলার ফ্রন্টনীতি এ সর্বনাশা রাজনীতির জন্ম দিয়েছে। এ নীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো ধনিক শ্রেণির বিভিন্ন দলে ঢুকে রাজনীতি করার চেষ্টা করে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের নিঃশেষ করেছেন। নিজেদের রাজনীতি করা হয়নি। এই উপমহাদেশেও তার নজির নেই। এই নীতি অনুসরণ করে এই উপমহাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতা হয়েছেন। কেউই শেষ রক্ষা করতে পারেনি।

আরএসপির কাছে দিমিট্রভসের এ তত্ত্ব ছিল ভুল এবং পরিত্যাজ্য। তাই আমরা সংখ্যায় কম হলেও আরএসপির সদস্য হিসেবে বেঁচে থাকতে চেয়েছি। অন্য কোনো দলে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করিনি এবং নেপাল দাও সেভাবেই মারা গেলেন। এগিয়ে এল ১৯৬৭, ৬৮ এবং ৬৯ সাল। আমাদের রাজনীতিতে এক অগ্নিগর্ভ যুগ।

ষাটের দশক শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেকালের পূর্ব পাকিস্তানে ষাটের দশক এসেছিল একটি ভিন্ন রূপ নিয়ে। ৫০-এর দশকে শিশু রাষ্ট্র পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে, ইসলামকে রক্ষা করতে হবে—এটাই ছিল বড় কথা। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হলে এ বিশ্বাসে প্রাথমিকভাবে ধস নামে। তবুও সাধারণভাবে মুসলিম জনতার পাকিস্তানের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ভেঙে দিলেও পাকিস্তান বিরোধী মনোভাবের তেমন প্রকাশ তখনও ছিল না। ১৯৫৬ সালে সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেয়ায় ভাষা আন্দোলনের একটি পর্ব শেষ হয়ে যায়।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পরে প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ মানুষের কাছে সামরিক শাসন অভিনন্দিত হলেও ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মনে ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। সর্বক্ষেত্রে বাংলা এবং বাঙালিকে পিছু হটাবার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেল। আইয়ুব খান সরকারের প্রথম শিকার হলো আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও অন্যান্য বামপন্থীরা। সামরিক সরকার সখ্য গড়ে তুলল ১৯৫৪ সালে পরাজিত শক্তি মুসলিম লীগের সঙ্গে।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির বিবর্তন হতে থাকল। এক এক করে নেতারা জেলখানা থেকে মুক্তি পেতে থাকলেন। কড়া সামরিক শাসনের মধ্যে শহীদ সোহরাওয়ার্দী রাজনীতিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার চেষ্টা করলেন। আর এই সময়ই সবচেয়ে বড় ভুল করল পাকিস্তান সরকার শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে। পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী রাজনীতিকদের একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম করার গড়ে তুলল ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ)। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে মারা গেলেন। এবারে রাজনীতি ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করল। পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম থেকেই দাবি উঠেছিল আইয়ুবের সংবিধান বাতিল করতে হবে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে ভিন্ন পথ নিয়েছিলেন। তিনি দাবি তুললেন সংবিধান বাতিল নয়, সংবিধান গণতন্ত্রায়ন করতে হবে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মারা যাওয়ায় পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়। সংবিধান বাতিলের দাবি জোরদার হয়।

ইতোমধ্যে সরকার এক ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটালো। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্র ধরে পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা শুরু হয়। পাকিস্তান সরকারের ভাবনা ছিল এই দাঙ্গা তাদের সঙ্কট সমাধান করবে। একদিনের জন্যে হলেও বিরোধী দলের দাবি স্তিমিত হবে। কিন্তু দাঙ্গার ফল হলো উল্টো। বাঙালিদের ধারণা হলো এ দাঙ্গা পাকিস্তানি সরকারের ষড়যন্ত্র। এ দাঙ্গার জন্যে দায়ী ভারত থেকে আসা এক শ্রেণির অবাঙালি। পূর্ব পাকিস্তানে এ দাঙ্গার সূত্র ধরে বাঙালিবিহারী সংঘর্ষ দেখা দিল বিভিন্ন এলাকায়।

ইতোমধ্যে আইয়ুব খানের সামরিক সরকার নিজের মসনদ পোক্ত করার ব্যবস্থা করেছে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম দিয়েছে মৌলিক গণতন্ত্র। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যের নাম হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্রী। এই মৌলিক গণতন্ত্রীর ভোটে জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন হবে। সাধারণ মানুষের কোনো ভোটাধিকার থাকবে না।

সকল রাজনৈতিক দল এই মৌলিক গণতন্ত্রের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছিল। বলা হয়েছিল মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনে কেউ অংশগ্রহণ করবে না। আর রাজনৈতিক দল হিসেবে মৌলিক গণতন্ত্র নির্বাচনে প্রার্থী হবার কোনো সুযোগ ছিল না। মৌলিক গণতন্ত্রের সদস্য সংখ্যা ছিল দুই পাকিস্তানে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার। ১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেন। ইতোমধ্যে তিনি পুরনো মুসলিম লীগ সদস্যদের ডেকে একটি কনভেনশন করেন। গঠিত হয় কনভেনশন মুসলিম লীগ। তিনি হলেন—সভাপতি। এ কাউন্সিলে আর একটি মুসলিম লীগ গঠিত হয়। অর্থাৎ কনভেনশন মুসলিম

www.nagorikpathagar.com

লীগ ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ নামে দু'টি মুসলিম লীগ গঠিত হয়। জেনারেল আইয়ুব কাউন্সিল লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দল কম্বিনিশন অব অপজিশন পার্টি অর্থাৎ কপ গঠন করেন। কপের সদস্যদের মধ্যে এনডিএফ ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দল ছিল। নির্বাচনে এদের প্রার্থী হলেন মিস ফাতেমা জিন্নাহ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি। এ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৫৩ দশমিক ১ ভাগ ভোট পেয়েছিলেন। আর কপ প্রার্থী মিসেস ফাতেমা জিন্নাহ পেয়েছিলেন ৪৬ দশমিক ৯ ভাগ ভোট। কিন্তু লক্ষণীয়, প্রাদেশিক পরিষদ ও জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ শতকরা ৭২ আসন পেলেও ভোট পেয়েছিল শতকরা ৫০ ভাগেরও কম। অধিকাংশ ভোটার ভোট দিয়েছিল স্বতন্ত্র ও বিরোধী দলীয় প্রার্থিদের। বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ ছিল না। এমনকি নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে একমত ছিল না। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে আবার প্রমাণিত হয়, মিস ফাতেমা জিন্নাহকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানে যে আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল তাও স্থায়ী নয়।

এই অবস্থার আর এক পরিবর্তন হয় ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে। এ যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল ১৯৬৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ১৭ দিন। প্রকৃতপক্ষে এই ১৭ দিন পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানিদের কাছে সাধারণভাবে মনে হয়েছিল পাকিস্তান সরকারের যেনো পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। অর্থাৎ প্রতিরক্ষার জন্যেও পূর্ব পাকিস্তান যে স্বাধীন হওয়া দরকার, এ যুদ্ধের পর সে কথা সামনে চলে আসে।

ষাটের দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং পুনরুজ্জীবিত করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের ভাঙন। ১৯৬৭ সালের ২ মে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট অর্থাৎ পিডিএম) গঠিত হয়। এই পিডিএমকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ভেঙে যায়।

১৯৬৭ সালে ন্যাপ ভেঙে ভাসানী ন্যাপ ও মোজাফফর ন্যাপ গঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ভাঙনের কারণ ছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন বনাম চীন বিভেদ। ভাগ বাটোয়ারার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে মোজাফফর আহমদ ন্যাপকে মস্কো ন্যাপ এবং ভাসানী ন্যাপকে পিকিং ন্যাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই ষাটের দশকেই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ নতুন আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান

www.nagorikpathagar.com

সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেন। এবার রাজনীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটে।

১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৬ দফাকে অন্তর্ভুক্ত করে ১১ দফা দাবি প্রণয়ন করে এবং ১১ দফার ভিত্তিতে নতুন আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় নিজেকে বড্ড অসহায় মনে হতো। দৈনিক পাকিস্তান-এ কাজ করছি। সরকার পক্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী পত্রিকা। অথচ এ পত্রিকার অধিকাংশ সাংবাদিক সরকার বিরোধী এবং বামঘেঁষা। এ পত্রিকায় আমি সরকারি টাকা পেলেও এ পত্রিকায় আমার অভিভাবক ছিলেন প্রথম বার্তা সম্পাদক মোজাম্মেল হক। ১৯৬৫ সালের কায়রো বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান।

এই দৈনিক পাকিস্তানে চাকরিকালে আমি প্রেস ক্লাবের সদস্য হই। চাকরি গ্রহণের শুরুতে ইউনিয়নের সদস্য হয়েছিলাম ইত্তেফাকে থাকতে। ইত্তেফাকে আমার চাকরি হয়েছিল আহমেদুর রহমানের সহযোগিতায়। আহমেদুর রহমান তখন শক্তিশালী কলাম লেখক। ইত্তেফাকে ভীমরুল নামে 'মিঠেকড়া' কলাম লিখতেন। এই আহমেদুর রহমানও মারা গেলেন ১৯৬৫ সালের কায়রোতে বিমান দুর্ঘটনায়। পাকিস্তান এয়ারলাইন্স পিআইএ বিমান চালু করছিল কায়রো পর্যন্ত। সেই বিমানের উদ্বোধনী যাত্রায় ১২৮ জন যাত্রী ছিলেন। তার মধ্যে ৪ জন পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক ছিলেন। এরা দৈনিক পাকিস্তানের বার্তা সম্পাদক মোজাম্মেল হক, ইত্তেফাকের সহকারি সম্পাদক আহমেদুর রহমান, পাকিস্তান অবজারভারের সহকারি সম্পাদক ফরিদউদ্দিন আহমদ এবং মর্নিং নিউজের আব্দুল হান্নান।

ষাটের দশকের মাঝে এসে দৈনিক পাকিস্তান মোটামুটি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বলা যেতে পারে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল সাংবাদিকতায়। অপরদিকে ট্রাস্টের কাগজ বলে বিরোধী দলের সকল খবর দিতে সীমাবদ্ধতা ছিল। একদিকে চাকরি অপরদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ার আমাকে প্রতি মুহূর্তে বিব্রত করত। আমি তখন টেবিলে শিফট ইনচার্জ। স্টাফ রিপোর্টার নই। তবুও প্রতিটি মিছিল সভায় যেতাম রাজনীতির খবরের জন্যে। সহকর্মীরা অখুশি হতো। শ্রমিক এলাকায় কাজ করলেও রাজনৈতিক দল হিসেবে কোনো পরিচিতি না থাকায় অসুবিধা হতো প্রতি পদে পদে।

এ পরিস্থিতিতে একদিন রাতে এক ঘটনা ঘটল। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬৮ সাল। রাতে আমি শিফট ইনচার্জ। রাত ১০/১১টার দিকে এক তরুণ আমার

www.nagorikpathagar.com

সামনে এসে বলল। তার মাথায় কাপড় বাঁধা। বললো আমি আসাদ। আসাদুজ্জামান। আমি হাতিরদিয়া থেকে এসেছি। ঢাকা জেলার শিবপুর থানার হাতিরদিয়া। মাওলানা ভাসানীর ডাকে আজ হরতাল করেছি, ঘেরাও করেছি। পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আসাদ বলল, আপনি বিশ্বাস করছেন না। দেখুন আমার মাথায় রক্তের দাগ। আসাদ তার মাথার কাপড় খুলে ফেলল। দেখলাম তার মাথায় চাপ চাপ রক্ত।

আমি বললাম, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। কিন্তু তোমার খবর ছাপা যাবে না। সব সত্য সংবাদপত্রের জন্যে সত্য নয়। এ সংবাদপত্রে মালিকের নির্দেশ আছে। সরকারের আইন আছে। তোমার খবর ছাপতে হলে ঢাকায় এসপি-ডিসিকে ফোন করতে হবে। তারা তোমার খবর মেনে নিলেই তোমার খবর ছাপা যাবে। আসাদ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। আস্তে আস্তে এক সময় চলে গেল। আমি সেদিন আসাদের খবর ছাপাতে পারিনি। কারণ ঢাকায় পুলিশ, জেলা কর্তৃপক্ষ এ খবরের সত্যতা স্বীকার করেনি।

আর আমার সাংবাদিক জীবনে আসাদই বলে গেল খবর কাকে বলে। বলে গেল দেখি আমার খবর কী করে ছাপা না হয়।

২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ সাল। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থমথম করছে। পুলিশের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মিছিল বের হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের কাছে গুলি বর্ষণ করেছে পুলিশ। এক তরুণ মারা গেছে হাসপাতালে।

খবরটি নিয়ে এল আমাদের দলের এক ছাত্র নরসিংদীর কাজী হাতেম আলী। হাতেম আলীকে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গেলাম। লাশের মুখে ঢাকা কাপড় তোলা হলো। কাজী হাতেম আলী বললো, এ আমাদের আসাদ। হাতিরদিয়ার আসাদ। আপনি তাকে চেননি। সেদিন ২০ জানুয়ারি। দৈনিক পাকিস্তানের রাতে অফিস শিফট ইনচার্জ ছিলাম। আসাদ খবর হয়ে এলো। আমি সেদিন পুলিশ আর ডিসিকে ফোন করিনি। আসাদ খবর হলো নিজের রক্তের বিনিময়ে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বলতে পারিনি ৩০ ডিসেম্বর আসাদকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

আমাদের রাজনীতিতে সত্তরের দশকে আর একটি আঘাত আসে। আওয়ামী লীগের কোনো শ্রমিক সংগঠন ছিল না। তাই তারা আমাদের শ্রমিক সংগঠনের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হবার আগে শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা করেন। কমরেড রুহুল আমিন কায়সার বলেছিলেন আমরা শ্রমিক আন্দোলনে আছি। আওয়ামী

www.nagorikpathagar.com

লীগের নিজস্ব সংগঠন করার অধিকার আছে। তাতে আমাদের কিছু বলার নেই। ফলে আলোচনা ভেঙে যায়।

আমাদের তখন মুখ্য সংগঠন ছিল পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন। এই সংগঠনকে ভিত্তি করে আমরা জাতীয় ভিত্তিতে শ্রমিক সংগঠন গঠনের চেষ্টা করেছিলাম। লক্ষ্য ছিল সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের।

আমাদের পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আব্দুল মান্নান। ৬ দফা আন্দোলনে সে জেলে গিয়েছিল। মনে হয় ওখানেই তার আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা হয়। এছাড়া ছাত্রলীগ নেতা সিরাজুল আলম খান চেষ্টা করছিলেন আমাদের সংগঠনের জায়গা করে নেবার। কিছু কিছু ছাত্রলীগ কর্মী এ জন্যে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল। তারা আমাদের দলের কর্মীর মতোই আচরণ করত। একথা সত্য, সিরাজুল আলম খান আমাদের সংগঠনকে ভাঙতে পেরেছিলেন। তবে তার সকল কর্মী নিজ দলের ফিরিয়ে নিতে পারেননি। এছাড়াও তাদের মান্নান হালদার যিনি পরবর্তীকালে এমপি হয়েছিলেন এবং লাল বাহিনীর নেতা হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন—তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিনের। মান্নান সাহেব চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগকে নিয়েই আমরা এক সংগঠন গড়ে তুলি। কিন্তু স্বাভাবিক কারণে আমাদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। রাজনীতিতে আমাদের তফাৎ ছিল আকাশ-পাতাল।

এ সময় শেখ সাহেবের সঙ্গে রুহুল আমিন কায়সারের আলোচনা ভেঙ্গে গেল। ইতোপূর্বে নেপাল দা মারা গেলেন। নেপাল দার সঙ্গে মান্নান সাহেব এক বাসায় থাকতেন। নেপাল দাকে মান্নান সাহেব উপেক্ষা করতে পারতেন না। কিন্তু নেপাল দার মৃত্যুতে মান্নান সাহেবের কাছে দলের বাইরে যাবার শেষ বাধা কেটে গেল। আমাদের মনে হলো আওয়ামী লীগ নতুন শ্রমিক সংগঠন করবে এবং এর আগেই আমাদের ভয় ছিল যেকোনো মুহূর্তে আমাদের শ্রমিক নেতাদের নাম দিয়েই আওয়ামী লীগ একটি সংগঠন করে ফেলতে পারে।

তাই আমি ও রুহুল সাহেব একটি ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের দলীয় সিদ্ধান্ত ছিল আমাদের শ্রমিক সংগঠনের নাম হবে সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ নামে একটি সংগঠন হয়েছে বলে পত্রিকায় সংবাদ দিতে হবে। তখন রুহুল আমিন সাহেব আদমজীর শ্রমিক সংগঠনের প্রিয় নেতা। তাকে বললাম, আপনি আদমজী চলে যান। আমি রাতে পত্রিকার খবর দিয়ে দেব, সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন নামে একটি নতুন শ্রমিক

www.nagorikpathagar.com

সংগঠন গঠিত হয়েছে। সংগঠনের কমিটির সভাপতি হয়েছেন আদমজীর মওলানা সাইদুর রহমান। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন রুহুল আমিন কায়সার।

সেদিনের কথা আজকেও আমার স্পষ্ট মনে আছে। রুহুল আমিন সাহেব জ্বরে কাঁপছিলেন। দীর্ঘদিন যাবত টিবিতে ভুগছেন। একটি ফুসফুস শেষ। অপরটির তিন ভাগের এক ভাগ নেই। কিন্তু ছিল অদ্ভুত মনোবল আর সাহস। বললেন, কমরেড, আমার যে শরীরের অবস্থা তাতে ফিরতে পারব কিনা জানি না। তবুও আমি আদমজী যাচ্ছি। আপনি পত্রিকায় খবর দিয়ে দেবেন। পরের দিন পত্রিকায় খবর বের হলো সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন গঠনের। রুহুল আমিন সাহেব ঢাকায় ফিরলেন তীব্র জ্বর নিয়ে। বিকালে মান্নানের সঙ্গে দেখা হলো। খুব বেশি কথা বলছে না। শুনেছি শেখ সাহেব তাঁকে কথা শুনিয়েছেন। কারণ মান্নান সাহেব তাঁকে কথা দিয়েছিলেন আমরা তাঁদের সঙ্গে না থাকলেও আদমজীর শ্রমিক তাঁদের সঙ্গে থাকবেই।

এই আদমজীর শ্রমিকরাই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আমাদের সঙ্গে থেকেই। আর গণঅভ্যুত্থানের মাসগুলো আমাদের কাছে ছিল বিব্রতকর। আন্দোলন কোন দিকে ঘোরে, কী হবে কেউ কিছু বলতে পারছে না। প্রতিদিন সংবাদপত্রে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানির খবর বের হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হচ্ছে। সরকার পক্ষে সাক্ষী বৈরী ঘোষিত হচ্ছে আদালতে। নিত্য নতুন ঘটনার সৃষ্টি হচ্ছে।

ইতোমধ্যে ৬ দফা আন্দোলন ১১ দফার আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন ঘটনা পাল্টাচ্ছে। সব ঘটনাই এক অভ্যুত্থানের রূপ নিল ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ সাল।

২৪ জানুয়ারি দুপুরের দিকে ঘরে ছিলাম। হঠাৎ দুয়ারে ধাক্কা পড়ল। আমি তখন সেগুনবাগিচায় ড. কাজী মোতাহার হোসেনের বাসায় থাকি। দুয়ার খুলে দেখলাম মেসবাহ। মেসবাহ ছাত্রলীগের কর্মী। মেসবাহ শাহবাগ হোটেলের মোড়ে একটি দোতলা বাসে বোমা ছুড়েছে। রমনার রেসকোর্স হয়ে ছুটে আমার বাসায় এসেছে। মেসবাহ বলল, তাদের সিরাজ ভাই অর্থাৎ সিরাজুল আলম খান নাকি তাকে বলেছেন বোমা ছুঁড়ে সোজা ছুটে দাদার বাসায় যাবি। ঐ এলাকা নিরাপদ। কিছুক্ষণ থেকে মেসবাহ সুবোধ বালকের মতো চলে গেল।

আবার দুয়ার ধাক্কা পড়লো। দরজা খুলে দেখি সামনে দাঁড়ানো দৈনিক বাংলার সাংবাদিক সালেহ চৌধুরী। জামায় রক্তের ছাপ। সে জামাটা খুলে ফেলল। বললো আমাকে একটা জামা দিন। পুলিশের গুলিতে নবাবপুর স্কুলের

www.nagorikpathagar.com

ছাত্র মতিউর রহমান মল্লিক নিহত হয়েছে। এতক্ষণ সে মতিউরের লাশ কাঁধে নিয়ে মিছিল করেছে। এবার এসেছে জামা পাল্টাতে।

সালেহ চৌধুরী আমার একটা জামা গায়ে দিয়ে বের হয়ে গেল। আমি গেলাম প্রেস ক্লাব। প্রেস ক্লাবে গিয়ে শুনলাম একদল শ্রমিক আমাকে খুঁজে গেছে। ওরা দৈনিক পাকিস্তান ভবনে আগুন দিয়েছে। তারপর তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে আমি কোথায়। আমি ঐ ভবনে আছি কিনা। সেখানে আমাকে না পেয়ে প্রেস ক্লাবে এসেছে। ওরা নাকি এখনো আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

প্রেস ক্লাব থেকে নামলাম। সংবাদপত্র হকার্স ইউনিয়নের এক নেতা, নোয়াখালী বাড়ি, তার সঙ্গে দেখা হলো। বলল, স্যার আপনাকে খুঁজছিলাম। দৈনিক পাকিস্তানে আগুন দিয়েছি। ভয় ছিল আপনি ঐ ভবনে আছেন কিনা। তাই প্রেস ক্লাব হয়ে আপনার বাসা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। আপনাদের ওপর আমাদের প্রচণ্ড রাগ। কারণ আপনারা দৈনিক পাকিস্তানের প্রথম পাতায় একদিন বড় করে লিখেছিলেন, শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্রের প্রধান হোতা।

ওদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে দৈনিক পাকিস্তানের দিকে গেলাম। বায়তুল মোকাররম থেকে এগিয়ে দেখলাম বাঁয়ে লসকরদের পেট্রোল পাম্প পুড়ে গেছে। দূরে জ্বলছে প্রেস ট্রাস্ট ভবন অর্থাৎ দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ ভবন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়বার দৃশ্য দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল মানুষের ক্রোধ কতো তীব্র। আমরা বছরের পর বছর যা লিখেছি ওরা একদিন তার জবাব দিয়েছে। দুঃখ পাইনি। তবে ভেবেছি চাকরিটা গেল। কাল কী হবে জানি না। এ সংগ্রামে নিরপেক্ষ থাকা যাবে না সাধারণ মানুষ তা বুঝিয়ে দিল।

২৪ জানুয়ারির পর ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়। এর আগেই পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। জেনারেল আইয়ুবের সঙ্গে ভুট্টোর গোলমাল ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের কাল থেকে। আইয়ুবের ধারণা ভুট্টোর হঠকারিতার জন্যে পাকিস্তান এই অবস্থায় পড়ে। আর ভুট্টোর বক্তব্য হলো রাশিয়ার নেতৃত্বে তাসখন্দে ভারতের সঙ্গে সমঝোতা করে আইয়ুব পাকিস্তানকে পঙ্কে ফেলেছে। আইয়ুব-ভুট্টো মতানৈক্য চরমে পৌছলে ভুট্টো পদত্যাগ করে আইয়ুনের মন্ত্রিসভা থেকে। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ডাক-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ডাক গঠিত হয়েছিল নির্বাচনের জন্যে। ডাক-এ ছিল পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগ, ছ'দফা পন্থী আওয়ামী লীগ, এনডিএফ, জামাতে ইসলামী,

www.nagorikpathagar.com

নেজামে ইসলাম, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও মোজাফফর ন্যাপ ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ। এ জোটে ভাসানীর ন্যাপ ও ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ছিল না। এক সময় ডাক-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, জ্বালাও-পোড়াও বলা যাবে না। পাকিস্তানি পতাকা ছাড়া অন্য কোনো পতাকা থাকতে পারবে না। ২৪ জানুয়ারির ঘটনার পর ডাক নয়, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদই সব আন্দোলনের নেতায় পরিণত হয়। ২৭ জানুয়ারি লাহোরে হরতাল হয়। ইতোমধ্যে বিমান বাহিনী সাবেক প্রধান আসগর খান রাজনীতিতে যোগ দেন। ২৭ জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে জাতীয় পরিষদে তুমুল বাক বিতণ্ডা হয়। এক সময় স্পিকার পরিষদের ৫ জন বিরোধীদলীয় সদস্যকে বহিষ্কার করেন। করাচী ও লাহোরের বিক্ষোভ দমন করতে সেনাবাহিনী তলব করা হয়।

জানুয়ারির ঘটনায় পিন্ডির সামরিক বাহিনী নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঘোষণা করেন যে, সংবিধান সংশোধন করা যেতে পারে এবং সমঝোতার জন্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় ডাকবেন। ৪ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক ধর্মঘট পালন করে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ১৭ ফেব্রুয়ারি গোল টেবিল বৈঠক ডাকেন। নবাব হাজী নসরুল্লাহ খানকে গোলটেবিল অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দেন। ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর মিছিল হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘোষণা করে গোলটেবিলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি দান। ৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার দেশ রক্ষা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়। ডাক ১৪ ফেব্রুয়ারি হরতাল আহ্বান করে। হরতাল নিয়ে ডাক ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মতানৈক্য হয়। ডাক-এর আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ ব্যতীত সকল দলই ছ'দফার বিরোধিতা করে। ৮ ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানী গোল টেবিলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ডাক-এর দাবিতে স্বায়ত্তশাসন না থাকায় ১৪ ফেব্রুয়ারি হরতাল কর্মসূচি প্রত্যাখ্যান করেন। ১০ ফেব্রুয়ারি ডাক-এর বৈঠক বসে। আওয়ামী লীগ থেকে দাবি করা হয় আগতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি। এ প্রস্তাব নিয়ে মতানৈক্য হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়।

হরতালের পর পল্টনেন জনসভায় এক ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন নূরুল আমিন। ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ তার বক্তৃতায় জ্বালাও-পোড়াও-এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলে সমগ্র জনসভায় প্রতিবাদ ধ্বনি ওঠে। স্লোগান ওঠে— জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো, গোল

www.nagorikpathagar.com

টেবিল না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ। ১১ দফা ও ৬ দফা মানতে হবে মানতে হবে। শেষ পর্যন্ত জনসভা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনসভায় পরিণত হয়। ঐদিন জাতীয় রাজনীতি শেষ হয়ে যায়।

১৫ ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্টে সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। সারা বাংলাদেশে সহিংস প্রতিবাদ হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করে। দেশের প্রতি জেলায় কনভেনশন মুসলিম লীগের দফতর পুড়িয়ে দেয়া হয়। চট্টগ্রামে আধা সামরিক বাহিনী ইপিআর তলব করা হয়। শেখ মুজিব প্যারোলে যেতে অস্বীকার করেন। তাজউদ্দিন-মুজিব বৈঠক হয় জেলে। বলা হয়ে থাকে আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী অংশ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পক্ষে ছিল। এমন কি তারা প্যারোলেই গোলটেবিল বৈঠকে যেতে রাজি ছিল। কিন্তু মাওলানা ভাসানী এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এর চরম বিরোধিতা করে। তখন মুখ্য ভূমিকা পালন করেন শেখ মুজিব পত্নী ফজিলাতুন্নেসা বেগম। এ সময় করাচিতে বিক্ষোভ হয়। গুলিতে দু'জন নিহত ও ২৬ জন আহত হয়। ঢাকায় সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বাড়ানো হয়। করাচিতে সেনাবাহিনী তলব করা হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। তারপর ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯। ক'দিন ধরে ঢাকায় কার্ফ্যু চলছে। মানুষ বের হতে পারছে না। দোকানপাট বন্ধ। কোনো যানবাহন চলছে না। মানুষ অভুক্ত। সর্বত্র একটা ক্ষোভ বিক্ষোভ দাঁনা বাঁধছে শহরের সব এলাকায়। কার্ফ্যুর দিনগুলোতে আমি প্রায় সব শিফটেই কাজ করি। আমার বাসা সেগুন বাগিচা। এ গলি সে গলি করে কোনো মতে অফিসে পৌঁছাই। প্রায় দিনই রাতে বাসায় ফেরা হয় না। অফিসেই খেতে হয়। আমাদের সহকর্মী শহীদুল্লাহ প্রতিরাতে অফিস থেকে বের হয়ে যান। কী করে খাবার জোগাড় করেন তা কেউ জানে না। শহীদুল্লাহ অফিসে থাকলে আমরা সকলে নিশ্চিত। মোটামুটিভাবে এমনি করে দিন চলছিল। পরপর পাঁচদিন আমি একনাগাড়ে ডিউটি করছি। অন্যান্য বন্ধুরা আসতে পারছে না।

১৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার দিকে মনে হলো এমন করে আর চলবে না। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এক সময় মানুষ কার্ফ্যু মানবে না। কার্ফ্যু ভেঙে রাস্তায় নামবে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কার্জন হল কম্পাউন্ডে প্রায় সারারাত ধরে মিছিল। সেদিনও মিছিল হচ্ছিল।

হঠাৎ রাত দশটায় টেলিভিশনের খবরে বলা হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ইপিআর হামলা করেছে। গুলিতে নিহত হয়েছে প্রক্টর ড.

www.nagorikpathagar.com

শামসুজ্জোহা। জোহা জনপ্রিয় শিক্ষক। আমারও চেনা। সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র ছিল। জোহার মৃত্যু সংবাদ বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে গেল। কার্জন হল প্রাঙ্গণে মিছিলের কণ্ঠ জোরদার হলো। মনে হচ্ছিল কার্ফ্যু ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাজপথে নামছে। দৈনিক পাকিস্তান থেকে উত্তরে তাকালাম। দেখলাম ফকিরাপুলে একটির পর একটি মশাল জ্বলছে। কাওরানবাজার থেকে আমাদের দলের কাজী হাতেম আলী খবর দিল—তেজগাঁও, নাখালপাড়া, গ্রিনরোডে মশাল মিছিল নেমেছে। মশাল নেমেছে রায়েরবাজারে সর্বত্র। সামরিক বাহিনীর টহল। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মানুষ সংঘর্ষে নেমেছে গ্রিনরোডে। সর্বত্রই যেন নামবার পালা। মনে হয় সকলেই নামবার জন্যে প্রস্তুত ছিল। জোহার মৃত্যু সকল বাঁধ ভেঙে দিল। সে এক অদ্ভুত পরিবেশ। সামনে কোনো নেতা নেই, কোনো নেতৃত্ব নেই। কেউ প্রস্তুত ছিল না এ ঘটনার জন্যে। ক্রুদ্ধ, বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ নেমেছে পেটের ক্ষুধায় এবং অত্যাচারের আস্ফালনের বিরুদ্ধে।

সেদিন রাতে বাসায় ফেরা হলো না। পাঞ্জাবি বাহিনী নেমেছে রাজপথে। আমার ঘুম হলো না। সারারাত ভাবলাম নেতৃত্ব থাকলে কী হতে পারত। লেনিন গণঅভ্যুত্থানের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন গণবিপ্লবের কথা। তিনি বলেছিলেন, একটি বিপ্লবী তত্ত্ব চাই। এই তত্ত্ব বাস্তবায়নের জন্যে একটি বিপ্লবী দল চাই। একটি দলের নেতৃত্ব চাই। একটি অভ্যুত্থানের মুহূর্ত চাই। একটি বিপ্লবী তত্ত্বে বিশ্বাসী দল না থাকলে বিপ্লবের মুহূর্ত কাজে লাগানো যাবে না। বিপ্লবী তত্ত্বে বিশ্বাসী দল থাকলেই অভ্যুত্থানের পরিবেশ আসবে। মানুষের মনে বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হবে। কিন্তু বিপ্লবী দল না থাকলে বিপ্লব হবে না।

১৮ ফেব্রুয়ারি তেমন একটি বিপ্লবের মুহূর্ত এসেছিল। অথচ তখন কোনো বিপ্লবী দল ছিল না। নেতারা জানতেন না কী করতে যাচ্ছেন। সর্বত্রই অচেনা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা। কেউই ১৮ ফেব্রুয়ারির মানসিকতা অনুধাবন করতে পারেনি। ১৮ ফেব্রুয়ারি একটি গণবিপ্লবের মুহূর্ত এসেছিল। অসংখ্য প্রাণের মৃত্যু হয়েছিল। মৃত্যুকে তোয়াক্কা না করে সাধারণ মানুষ রাজপথে নেমেছিল। সেদিন রাজপথে প্রাণ দেয়াটাই বড় হয়ে উঠেছিল। ঐ প্রাণ দেয়াকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারলে একটি গণবিপ্লব হতে পারত।

১৮ ফেব্রুয়ারি সারারাত দৈনিক পাকিস্তানের বার্তা বিভাগের টেবিলে শুয়ে শুয়ে ছটফট করেছি। ভেবেছি আন্দোলনের মোড় ঘোরাতে হলে রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে। পাকিস্তানের সামরিক শাসনে তখনো রাজনৈতিক দল

www.nagorikpathagar.com

গঠনের চিন্তা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু দল গঠনের বিকল্প কোনো পথ আমার কাছে সেদিন ছিল না। ১৯ ফেব্রুয়ারি ভোর থেকে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হলো। সকলে মিলে একমত হলাম। একটি বিপ্লবের মুহূর্ত হারিয়েছি। আর নয়। এবার দল গঠন করতেই হবে।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮ ফেব্রুয়ারির রেশ চলতে থাকে। পুলিশের গুলিতে ২০ জন নিহত হয়। সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস নিয়ে। ঢাকায় সান্ধ্য আইন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সান্ধ্য আইন প্রত্যাহারের দাবি জানায়। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার দিকে একবার সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হয়। এক ঘণ্টা পর পুনরায় সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। সান্ধ্য আইন ভেঙে মিছিল শুরু হয়। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হয় সান্ধ্য আইন তুলে নেবার। ১৪৪ ধারাও প্রত্যাহার করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঘোষণা করেন তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি লাভ করেন। মনি সিংহসহ ৩৪ জন রাজবন্দিও মুক্তি পান। সকলেই ১১ দফার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন।

এবার ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মতানৈক্য শুরু হয় মুক্ত রাজবন্দিদের সংবর্ধনা নিয়ে। ছাত্রলীগ কিছুতেই শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে অন্য কাউকে সংবর্ধনা দিতে রাজি হলো না। তাই শেখ মুজিবের সংবর্ধনা দেয়া হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে। এ জনসভায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কোনো শরিক ছাত্র প্রতিষ্ঠানকে না জানিয়ে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় জনাব তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেন। মনি সিংহসহ অন্যান্য সকলকে ২৪ ফেব্রুয়ারি স্টেডিয়ামে সংবর্ধনা দেয়া হয়। এদিন থেকে বঙ্গবন্ধু শব্দটিকে বিতর্কিত করা হয়।

রেসকোর্সের জনসভায় গোলটেবিল বৈঠক নিয়ে মতানৈক্য স্পষ্ট হয়। ছাত্রদের দাবি হচ্ছে ১১ দফা না মানিয়ে গোলটেবিল যাওয়া যাবে না। কিন্তু শেখ সাহেব গোলটেবিলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠক শুরু হলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ভাসানী, ভুট্টো, আজম খান এ বৈঠকে যোগ দেননি। বৈঠক ১০ মার্চ পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায়।

রেসকোর্সের ২৩ ফেব্রুয়ারির জনসভা থেকে সকল পরিষদ সদস্য ও মৌলিক গণতন্ত্রীদের ৪ মার্চের ভেতর পদত্যাগের আহ্বান জানানো হয়েছিল। মার্চের প্রথম দিকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা শুরু হয়। সারাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

www.nagorikpathagar.com

১০ মার্চ ভাসানী ন্যাপ ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি ১১ দফা সমর্থনের ঘোষণা দেয়। ৩ দফা আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়— (১) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (২) জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (৩) বিদেশ চুক্তি বাতিল।

১০ মার্চ গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যা সাম্যের বিরোধিতা করেন। জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচন দাবি করেন। ১১ মার্চ হতে সরকার সব ধরনের হুলিয়া গ্রেফতারি পরোয়ানা তুলে নেয়। গোলটেবিল বৈঠকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনের দাবি আলোচিত না হওয়ায় ১৪ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিক্ষোভ প্রকাশ করে। ১৬ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানে মৌলবাদীরা মওলানা ভাসানীকে হত্যা করার চেষ্টা করে। বিক্ষুব্ধ জনতা লাকসাম থানার ওসিসহ ১৫ জনকে হত্যা করে। ১৮ মার্চ পার্বতীপুরে বিহারি-বাঙালি দাঙ্গা হয। কার্ফ্যু জারি হয়। ২১ মার্চ মোনায়েম খানের পরিবর্তে ড. নূরুল হুদা গভর্নর নিযুক্ত হন।

২৫ মার্চ আইয়ুব খান এক ভাষণ দিয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। সংবিধান বাতিল করেন। পরিষদ বাতিল করেন। প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত হন প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান। সারাদেশে সামরিক আইন জারি হয়। আইয়ুবের পতন হয়।

২৫ মার্চ ক্ষমতা নিয়ে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরই তাঁর লক্ষ্য। ৩০ মার্চ এক ফরমান জারি করে তিনি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণার পর রাজনৈতিক মহলে আর এক দফা বিতর্ক শুরু হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন সংবিধানের অধীনে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ক্ষমতায় আসার সময় আইয়ুব খান ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করেছিলেন। সেই সংবিধানের পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংখ্যা সাম্য ছিল। পাকিস্তানকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান দুই ইউনিটে ভাগ করা হয়েছিল। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বরবাদ করা হয়েছিল। এই সংবিধান রচনায় সহযোগিতা করেছিল আওয়ামী লীগ এবং শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি (কেএসপি)। সেকালের পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ সংখ্যা সাম্য ও একই ইউনিটের বিরুদ্ধে ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব ব্যতিত সকল প্রদেশের মানুষই এক ইউনিটের বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু সামরিক এবং বেসামরিক আমলারা এক ইউনিট সংখ্যা সাম্যের পক্ষে ছিল। অন্যান্য সকলের ধারণা ছিল সংখ্যা সাম্য ও এক ইউনিটের অর্থ হচ্ছে পাঞ্জাবিদের শাসন। এই পাঞ্জাবিদের শাসনের বিরুদ্ধেই পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন গড়ে

www.nagorikpathagar.com

উঠেছিল। আন্দোলনে নেমেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের মানুষ। এই আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খানের পতন ঘটে। ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হন। সংবিধান বাতিল হয় এবং প্রশ্ন দেখা দেয় কোন ভিত্তিতে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সংবিধানের প্রশ্নে প্রথম বিতর্ক তুললেন রাজনীতিতে নতুন আসা আসগর খান। তিনি ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবনের দাবি করেন। পরবর্তীকালে কেএসপি, নূরুল আমীনের এনডিএফ, পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগ, নেজামী ইসলাম ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবনের দাবি সমর্থন করে। মাওলানা ভাসানী বলেন—শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে গণভোট করতে হবে। শেখ মুজিবর রহমান বলেন, ১১ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত হবে। কোনো দল বা ব্যক্তি নয়, জনগণই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

এ হচ্ছে জুন মাসের কথা। এই জুন মাসের ২৭ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কাউন্সিলে গণ্ডগোল দেখা দেয়। নূরে আলম সিদ্দিকী ও আবদুল মান্নান খান বেরিয়ে যান। আল মুজাহিদী ও আবদুল মান্নান খানের নেতৃত্বে বাংলা ছাত্রলীগ গঠিত হয়। ২ জুলাই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই নির্বাচন দেয়া হবে। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ সম্পাদকসহ তাজউদ্দীন আহমদ ৭ জুলাই এক বক্তৃতা দেন। তিনি এ প্রশ্নে গণভোট দাবি করেন। পহেলা আগস্ট আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোতে ১১ দফা দাবি গৃহীত হয়। ১৫ আগস্ট ভাইস এডমিরাল আহসান ও নূর খানকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

ক্ষমতায় এসে সামরিক সরকার ছাত্র ও শ্রমিক অসন্তোষ কমাবার জন্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করা হয়। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বেঁধে দেয়া হয়। নূর খান ছাত্রদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। অর্থাৎ সামরিক শাসন অনুধাবন করতে সমর্থন হয়েছিল ছাত্র এবং শ্রমিকদের হাত করতে না পারলে তাদের কোনো পরিকল্পনাই কাজে আসবে না।

এ সময় আমরা লক্ষ্য করতে থাকি, এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে এবং শ্রমিক আন্দোলন নতুন করে মার খাবে। এছাড়া সমাজে তখন একটি নতুন ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এ ধারাটি খুব ক্ষীণ হলেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ৬ দফা শেষ পর্যন্ত এক দফায় পরিণত হবে। এ ধরনের একটি ধারণা আস্তে আস্তে দানা বাঁধছিল। আমাদের ধারণা হচ্ছিল এ ব্যাপারে প্রথম থেকে সতর্ক না হলে শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের আন্দোলন আবার হারিয়ে যাবে। প্রচণ্ড ভাবাবেগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই সবকিছু তছনছ করে দেবে। দেশ

www.nagorikpathagar.com

শাসিত হলেও আন্দোলনকে প্রার্থিত পরিসমাপ্তি নিয়ে যাওয়া যাবে না। শ্রমিক কৃষকের দাবি পূরণ হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে আমাদের ব্যর্থতা ছিল পর্বতপ্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব আমাদের হাতেই ছিল। টঙ্গীতে কাজী জাফরদের কিছু সংগঠন থাকলেও চটকল এলাকায় আমাদের নেতৃত্ব ছিল অপ্রতিহত। কিন্তু সে নেতৃত্ব ছিল একান্তভাবেই দাবি দাওয়ার ক্ষেত্রে। আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি আদায় করেছিলাম। শ্রমিকদের বিশ্বাস ছিল আমাদের নেতৃত্ব কেনা যায় না। কিন্তু অর্থনৈতিক আন্দোলন করলেও আমরা শ্রমিকদের মধ্যে রাজনীতি দিতে পারিনি। রাজনৈতিক আদর্শ দিতে না পারায় আমরা লক্ষ্য করেছি, ৬ দফার আন্দোলনে আমরা বিপর্যস্ত হয়েছি। বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনে শ্রমিকরা আমাদের কাছে এলেও রাজনৈতিক আন্দোলনে তারা ৬ দফা পন্থী। এই চেতনা থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম নির্বাচনের পূর্বেই আমাদের রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে।

কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক দলের ধরন কী হবে। কী হবে তার আশু লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য? এ প্রশ্ন নিয়েও আমাদের কথা বলা এক ধরনের অপরাধ। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ। আমরা আরএসপি-এর সদস্য ছিলাম। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানে কমরেড অমর ব্যানার্জিকে সম্পাদক করে দল গঠন করেছিলাম। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন কমরেড শওকত ওসমানি। তিনি এককালে লেনিনের সহযোগী ছিলেন। তিনি বম্বে শ্রমিকদের নেতা ছিলেন। ভারত বিভাগের পর তিনি করাচিতে চলে আসেন। কিন্তু আরএসপির মূল শক্তি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর একের পর এক হামলায় আরএসপির অবস্থান তখন বিপর্যস্ত। বরিশালের আরএসপি অফিসে বোমা রেখে ১৯৪৮ সালের প্রথমেই ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে নেতাদের। নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে নির্বিচারে। দেশ বিভাগের জন্যে অনেক নেতা দেশান্তরী। এ পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে কাজ করা আদৌ সহজ ছিল না। তবুও ছাত্র ফ্রন্টের কাজ করার চেষ্টা হয়েছিল সকল ঝুঁকি মোকাবেলা করে। ১৯৫৩ সালে নতুন করে দল গঠনের চেষ্টা করা হয়। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে ৯২(ক) ধারা জারি করার পর আবার সকলকে আত্মগোপন করতে হয়। ১৯৬৯ সালে এ পরিস্থিতি মনে রেখেই নতুন করে দল গঠনের কথা চিন্তা করতে হয়। এখন রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র আশ্রয় পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন।

আন্দোলন মারফত শ্রমিকদের চেতনা যে নিজস্ব রাজনৈতিক দল না

www.nagorikpathagar.com

থাকলে আন্দোলন সফল হবার নয়। তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের সময় সকল রাজনৈতিক দল তাদের মাথায় ভর করে ফায়দা লুটতে চেষ্টা করেছিল। এমনকি শেখ মুজিবুর রহমান এবং মওলানা ভাসানীও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। সুতরাং শ্রমিকদের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছিল রাজনৈতিক দল গঠনের।

ঠিক হলো আগস্ট মাসের মধ্যেই শ্রমিক সংগঠন ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। আদমজী নগরেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেই ভিত্তিতেই ১৯৬৯ সালের ২৮ আগস্ট আদমজী নগরে সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন গঠিত হয়। সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন গঠনের সময় বাধা দেয়া হয়েছিল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। তাদের ধারণা হয়েছিল আদমজীতে আমাদের সম্মেলন হলে আদমজী আওয়ামী লীগের হাতছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের গোলমাল কাজে আসেনি। সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি হলেন মওলানা সাইদুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন রুহুল আমিন কায়সার।

এবার দল গঠনের পালা। বৈঠক বসল ঢাকায়। অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা কুমিল্লার অতীন্দ্রমোহন রায় বৈঠকে এসেছেন। বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার ভোলাচং গ্রামে। ঐ গ্রামে ১৯২৩ সালে গঠিত হয়েছিল হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মি। পরবর্তীকালে ঐ সংগঠনের নাম হয়েছিল হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি। এই সংগঠনের নেতৃত্বে এসেছিলেন যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, ভগৎ সিং, রাজনারায়ণ লাহিড়ী এবং আশফাক উল্লাহ প্রমুখ। অগ্নিযুগের বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির নেতা প্রতুল গাঙ্গুলী লিখেছেন, অতীন নিজ হাতে দু'জন পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু কোনোদিন অতীন একথা কাউকে জানায়নি। এটাই ছিল অনুশীলন সমিতির শপথ।

যারা তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' উপন্যাস পড়েছেন তারা বীরভুমের ডেটিনিউ যতীনের কথা নিশ্চয়ই পড়েছেন। সেই ডেটিনিউ যতীনই হচ্ছেন আমাদের অতীনদা। ১৯৪০ সালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বিহারের রামগড়ে আপোষবিরোধী সম্মেলন ডেকেছিলেন। সেই সম্মেলনে অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল আরএসপি গঠন করেছিল। সেই দল গঠনের অন্যতম নেতা অতীন দা। অতীন দার আকাঙ্ক্ষা ছিল মৃত্যুর পূর্বে পাকিস্তানে তাঁর স্বপ্নের রাজনৈতিক দলটি শক্তিশালী হোক। অন্তত মৃত্যুর পূর্বে একটি স্বপ্ন নিয়ে তিনি যেন মরতে পারেন। সেই অতীন দা এসেছিলেন আমাদের সম্মেলনে।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু দলের নাম কী হবে। পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্র। সমাজতন্ত্র পাকিস্তানে নিষিদ্ধ। আমরা সমাজতন্ত্র চাই। তাহলে কী নামে দল গঠন করব? শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো দলের নাম হবে শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল। আমরা সহজ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য বোঝাবার জন্যে দলের এ নামকরণ করেছিলাম। আমরা বলতে চেয়েছিলাম শ্রমিকের নেতৃত্বে কৃষকের মৈত্রীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদিত হবে। সেই অর্থেই দলের নাম শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল—আমাদের আদর্শ বিপ্লবী সমাজতন্ত্র।

দল গঠনের খবর প্রকাশিত হবার পর একটি অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো বিভিন্ন মহলে। রাজনৈতিক বন্ধুদের মুখে একই কথা, আপনারা এ সময় কেন এ ঝুঁকি নিলেন? সমাজতন্ত্রের কথা বলে টিকে থাকতে পারবেন কি? এদেশের মানুষ ধর্মভীরু। আপনাদের নাস্তিক বলে শেষ করে দেবে। আমাদের জবাব ছিল, রাজনৈতিক ঝুঁকি আছে এবং থাকবে। তবুও সাহস করে কথা বলতে হবে। আর আমাদের নতুন করে নাস্তিক হবার প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের দল গঠন সম্পর্কে তৎকালীন পাকিস্তান অবজারভার বিরূপ মন্তব্য করে সম্পাদকীয় লিখেছিল। সবচেয়ে মজার কাণ্ড করলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম। আমাদের দলের গঠনতন্ত্র রচনার জন্যে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন কুমিল্লার কমরেড আমিরুল ইসলাম। এই খবরের প্রেক্ষাপটে ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি পাঠালেন। বিবৃতিতে তিনি বললেন, নবগঠিত শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই এবং উল্লেখিত আমিরুল ইসলামও তিনি নন।

শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল গঠিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালের ২৯ আগস্ট। অবজারভার পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন করা হয়েছিল আর একটি দল কেন? এ ধরনের প্রশ্ন ছিল বিভিন্ন মহলের। বিশেষ করে বামপন্থী মহলের। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে এ অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টি, আরএসপি এবং ফরোয়ার্ড ব্লকই বামপন্থী দল বলে পরিচিত ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর নির্যাতনের মুখে সকল দল বিপর্যস্ত হয়। পাকিস্তান সরকার এ দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল না। এ দলগুলো কমিউনিজমে বিশ্বাসী। সুতরাং নাস্তিক। পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রে নাস্তিক অর্থাৎ কমিউনিস্টদের কোনো জায়গা নেই। তারা বামপন্থীদের ওপর চরম নির্যাতন শুরু করল। এ নির্যাতনের মুখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে টিকে থাকল কমিউনিস্ট পার্টি। কোনো কিছু ঘটলেই পাকিস্তানের সরকারের অভিযোগ ছিল সব কিছুই কমিউনিস্টরা করেছে। এ অভিযোগ সাধারণ মানুষের মনে কমিউনিস্ট পার্টির একটি অস্তিত্বের আসন সৃষ্টি করে।

www.nagorikpathagar.com

একথা সত্য, বামপন্থী রাজনীতিকরা আরএসপি সম্পর্কে খবর রাখতেন। তবে সাধারণ মানুষের কাছে বামপন্থী বলতে কমিউনিস্ট পার্টিকেই বোঝাত। সাধারণ মানুষ মনে করত একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে। আরএসপি সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। অপর দিকে কমিউনিস্ট পার্টি বরাবরই তাদের তাত্ত্বিক আলোচনায় আরএসপি সম্পর্কে মন্তব্য করত। ঢালাওভাবে বলা হতো আরএসপি ট্রটস্কিপন্থী। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির একটি ভিন্ন প্রচারণাও ছিল। তাদের প্রচারণা হলো তারা একমাত্র সাচ্চা কমিউনিস্ট। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অন্যান্য সকল দাবিদাররাই সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট। মার্কিন দালাল। এ খেতাবে আমি বহুবার ভূষিত হয়েছি। আমার লজ্জাজনক অভিজ্ঞতা হচ্ছে যারা আমাদের ট্রটস্কিপন্থী বলতেন, তাদের শতকরা ৯৯ জনই ট্রটস্কি লিখিত কোনো বই পড়ে দেখেনি। এদের মুখোশ খুলে যায় ষাটের দশকে চীন-রাশিয়া দ্বন্দ্বের সময়। কমিউনিস্ট পার্টি চীনপন্থী এবং রাশিয়াপন্থী হয়ে ভাগ হয়ে যায়। এবং পরবর্তীকালে একে অপরকে গালিগালাজ করতে শুরু করে। উভয় পক্ষই নিজেদের মার্কস ও লেনিনের সঠিক উত্তরাধিকারী বলে দাবি করতে থাকে। সারা পৃথিবীতে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। এটা ছিল দু'টি দলের সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে অন্ধ অনুকরণের ফল।

১৯৪০ সালে এই অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধেই আরএসপির জন্ম হয়। আরএসপির বক্তব্য ছিল লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন সঠিক পথ অবলম্বন করেননি। আন্তর্জাতিক বিপ্লবের দায়িত্ব প্রহার করে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থের নিরিখে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন স্ট্যালিন পরিচালনা করেছেন। ফলে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশ নীতির লেজুড়ে পরিণত হয়েছে। এই লেজুড়বৃত্তির জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন সমর্থন করেনি। বলেছে, এটা বুর্জোয়া নেতৃত্বের আন্দোলন। আবার জার্মানিতে হিটলারের উত্থানের পর ১৯৩৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি নির্দেশ দিয়েছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশীয় বুর্জোয়াদের সমর্থন দিতে এবং এ পরিস্থিতিতেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি শেষ দিকে সুভাষ চন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে গান্ধীর নেতৃত্বই সমর্থন করেছে। আরএসপির সংগঠকরা একে সঠিক পথ বলে মনে করেনি। তাই ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল অর্থাৎ আরএসপি গঠন করে।

www.nagorikpathagar.com

প্রশ্ন উঠতে পারে আরএসপি কেন স্ট্যালিন বিরোধী। আরএসপি ট্রটস্কিপন্থী কিনা। আরএসপি দাবি করে আরএসপি লেনিনপন্থী। আরএসপির মূল্যায়ন হলো রাশিয়ায় বিপ্লবের পর স্ট্যালিন এবং ট্রটস্কি দু'জনেই ভুল করেছেন। বিপ্লবের পর লেনিন বলেছিলেন, এক দেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব নয়। অন্তত ইউরোপের শিল্পোন্নত কয়েকটি দেশে বিপ্লব না হলে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লব ধরে রাখা যাবে না। তবে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের কাজ শুরু করা যায়। আর এর সঙ্গে অন্য দেশের বিপ্লব করার দায়িত্ব এবং উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ট্রটস্কি বলেছিলেন, অন্যান্য দেশে বিপ্লব না হলে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের কাজও সফল হবে না। স্ট্যালিন প্রথম দিকে লেনিনের বক্তব্য সমর্থন করলেও পরবর্তীকালে ভিন্ন কথা বলেন। তিনি বলেন, সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ নয়, একটি দেশের সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ও সম্ভব। তবে শর্ত হচ্ছে অন্য দেশে বিপ্লব নয়, অন্য দেশের শ্রমিকদের সহযোগিতায়ই সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিপ্লব সম্ভব হবে।

কিন্তু ক্ষমতা দখল না করে অন্য দেশের বিপ্লবের সহযোগিতা কী করে সম্ভব। এ প্রশ্নের জবাবে স্ট্যালিনের ব্যাখ্যা হচ্ছে এ ব্যাপারে শ্রমিক শ্রেণিকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কৌশল হচ্ছে তার নিজের দেশের সরকার যদি সোভিয়েত ইউনিয়নকে আঘাত করে তবে সে দেশের শ্রমিক শ্রেণির দায়িত্ব হবে নিজস্ব সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। অপরদিকে নিজের দেশের সরকারের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক অনুকূল থাকলে তাদের দায়িত্ব নিতে হবে নিজের দেশের সরকারকে বিব্রত না করা।

এ অভিজ্ঞতা আমাদেরও আছে। আমরা দেখেছি আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুসম্পর্ক থাকায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। শেখ সাহেব খুন হয়ে যাবার পর জিয়াউর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করায় কমিউনিস্ট পার্টি আবার জেনারেল জিয়াকেও সমর্থন দিয়েছে। অর্থাৎ আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি প্রকৃত অর্থে পরিচালিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশ নীতি দ্বারা।

আরএসপি সংগঠকরা মনে করেছে এ নীতিতে কোনোদিন সার্থক বিপ্লব হবে না। বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশনীতির অন্ধ অনুসরণের বৃত্তে ঘুরপাক খেতে থাকবে। এ মূল্যায়নের ভিত্তিতে ১৯৪০ সালে আরএসপি গঠিত হলেও দেশ ভাগ হবার পরে এ তত্ত্ব প্রচার খুবই কঠিন

www.nagorikpathagar.com

ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। বিশ্ব রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক শিবির শক্তিমান নেতা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং স্ট্যালিন। পাকিস্তানের মতো একটি রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টি নামেই টিকে থাকা মুশকিল। তারপরে স্ট্যালিনের নীতির বিরুদ্ধে বিকল্প কমিউনিস্ট ধারার আর একটি দল গড়ে সামনে এগুনো সহজ ছিল না। তাই আমাদের দল প্রকাশ্যে গঠন করতে হয়েছিল পাকিস্তান সৃষ্টির ২২ বছর পর ১৯৬৯ সালে। তাও আরএসপি বা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী নামে নয়। শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল নামে।

তবু শুধু সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় নয়, অন্যান্য প্রশ্নে মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমাদের পার্থক্য তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এছাড়া চীনের বিপ্লব নিয়ে আমাদের সঙ্গে মতানৈক্য ছিল। মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবী হয়েছিল। আমাদের দলের মূল্যায়ন ছিল একাধিক শ্রেণির নেতৃত্বে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবপরবর্তী সময়ে প্রতিবিপ্লবের জন্ম দেবে। কারণ নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিভিন্ন শ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লব। এ বিপ্লব শ্রেণি সংগ্রামের বিপ্লব নয়, শ্রেণি সমন্বয়ের বিপ্লব। তাই আমাদের দলের মূল্যায়ন ছিল চীনের ন্যায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করা কঠিন হবে। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ পর্যন্ত অর্ন্তবর্তীকালীন নেতৃত্ব নিয়ে সঙ্কট দেখা দেবে। পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে তথাকথিত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ নিয়ে কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই পটভূমিতে আমাদের সঙ্গে চীন বিপ্লব নিয়ে প্রথম দিকে থেকেই অর্থাৎ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কালেও মূল্যায়নে তফাৎ ছিল। তখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের সাম্রাজ্যবাদের দালাল মনে করত।

পূর্ব ইউরোপের পূর্ব জার্মান, চেকোস্লাভাকিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়ায় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবী সম্পর্কে আমাদের ভিন্ন মূল্যায়ন ছিল। আমাদের বক্তব্য ছিল এ সকল দেশে আদৌ কোনো বিপ্লব হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে বিজয়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল ফৌজ দেশে ফিরে যাবার আগে কমিউনিস্ট পার্টিও তাদের সহযোগীদের দেশে দেশে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে। এ বিপ্লবের সঙ্গে দেশের জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই। এ বিপ্লবও ভিন্ন শ্রেণির সমন্বয়ে গঠিত। এই তথাকথিত বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্নে নেতৃত্বে মতানৈক্য আছে এবং ইতোমধ্যে হাঙ্গেরি, পূর্ব জার্মানিতেও প্রতি- বিপ্লবের চেষ্টা করেছে। ১৯৪৮ সালেই যুগোস্লাভ সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত কমিন-ফরম [কমিউনিস্ট ইনফরমেশন

www.nagorikpathagar.com

ব্যুরো ১৯৪৩ সালে স্টালিন তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেবার পর কমিউনিস্ট আন্দোলন সমন্বয়ের জন্যে গঠিত] ছেড়ে গেছে। এ প্রশ্নে রুশপন্থী এবং পিকিংপন্থী অর্থাৎ উভয় গ্রুপের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ আরএসপির মতপার্থক্য ছিল স্পষ্ট।

এছাড়া আমাদের সঙ্গে, অর্থাৎ আমরা যারা এককালে আরএসপি করতাম তাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির পার্থক্য ছিল বিপ্লবের স্তর নিয়ে। বিভক্ত হবার আগে পূর্ব কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ছিল ১৯৪৭ সালে ভারতের বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্ধসমাপ্ত হয়েছে। এই অর্ধসমাপ্ত বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে রুশপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের কথা বলতে থাকে। আর চীনপন্থী গ্রুপ চীনের ঢংয়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলতে থাকে। এরপরে নকশালবাড়ি আন্দোলন এলে বলা হয় কৃষি বিপ্লব। আর আমরা বলতে থাকি মেহনতি জনতার বিপ্লবের অঙ্গনে চারটি ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠল—১। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, ২। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, ৩। কৃষি বিপ্লবের স্তর, ৪। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে—১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাপ্ত হলেও এ যুগে বুর্জোয়াদের সে বিপ্লবকে সমাপ্ত করতে হবে সর্বহারা শ্রেণিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে মাধ্যমে। যেমন—ভূমি সংস্কার, গণতান্ত্রিক কায়দায়। অথচ নির্বাচন বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে করণীয় হলেও এ যুগে বুর্জোয়ারা এ অধিকার দেয় না। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে এর একাধিক উদাহরণ আছে। দাবি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে আদায় করতে হবে। তাই এ স্তরে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবির কথা বলেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলতে হবে। অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে কোনো প্রাচীর নেই। তাই যারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল ভূমিকা আশা করেছেন, আমরা এ বক্তব্যকে সার্বিক মনে করি না।

কৃষি বিপ্লব সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে কৃষকদের নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বিপ্লব করা যাবে না। কারণ কৃষকদের বিপ্লব ঠেকাতে যারা আসবে তারা ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া সরকার। ঐ বুর্জোয়া সরকারকে উৎখাত না করে এককভাবে জোতদার, জমিদারদের উচ্ছেদ করা যাবে না। এ প্রশ্নে সংস্কারের আন্দোলন হতে পারে। বিচ্ছিন্নভাবে কৃষি বিপ্লব হতে পারে না।

www.nagorikpathagar.com

এ বক্তব্য নিয়েই ১৯৬৯ সালে ২৯ আগস্ট শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল গঠিত হয়েছিল এবং আমাদের মূল্যায়ন যে সঠিক ছিল তা আজ আর ব্যাখ্যার অবকাশ নেই।

১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের জন্ম হলেও ইতিহাসের আর একটি ধারার দিকে আমাদের কোনো নজর ছিল না। আমরা ভেবেছিলাম সর্বহারাদের একটি দল না থাকায় ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান গণবিপ্লবে পরিণত হয়নি। এ জন্যে বিপ্লবে বিশ্বাসী একটি বিপ্লবী তত্ত্বের রাজনৈতিক দল প্রয়োজন।

আমরা ভাবিনি যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের একটি ধারার তীব্র আবেগ আছে এবং আবেগ সঠিকভাবে পরিচালিত না হলে আর একটি সুযোগ আমরা হারাব। পাকিস্তানের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান একই দেশের অধিবাসী হয়ে একটি ভিন্ন পরিচিতির জন্ম দিয়েছে। পাকিস্তানি পরিচয়ের চেয়েও বাঙালি, সিন্ধি, পুশতুন, বালুচ ও পাঞ্জাবি পরিচয় বড় হয়ে উঠছে। এ পরিচয়ের কামনা এবং বাসনার আন্দোলন শ্রেণির আন্দোলনকে ছাপিয়ে উঠছে। বড় হয়ে উঠছে আমি বাঙালি নয়, অবাঙালি। শোষক এবং শোষিতের বিভাজন গৌণ হয়ে উঠেছে। গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান পদত্যাগ করেছেন। সামরিক শাসন জারি করে নেতৃত্বে বসেছেন ইয়াহিয়া। ইয়াহিয়া খান নির্বাচন দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু সে নির্বাচনে কবে? এ নির্বাচনে কোনো ঐক্য হবে কিনা। ইতিমধ্যে নির্বাচন নিয়ে বামপন্থী শিবিরের নতুন কথাবার্তা শুরু হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসগুলো হয়েছে। ২ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, ব্যক্তি বিশেষের সংবিধান জারি করার কোনো ক্ষমতা নেই। ৯ অক্টোবর ছাত্রলীগের এক সমাবেশে তিনি '৫৯ সালের সংবিধানপন্থীদের কড়া সমালোচনা করেছেন। ইতিমধ্যে ন্যাপ এক ইউনিট বাতিলের দাবি জানিয়েছে। ২৯ অক্টোবর জামাত প্রধান মওদুদী বলেছেন, ৬ দফা পাকিস্তানের সংহতির বিরোধী। মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ববঙ্গ করতে চাচ্ছেন। ঢাকায় রাজধানী আনতে চাচ্ছেন।

নভেম্বরের প্রথম দিকে ঢাকায় বাঙালি-বিহারি সংঘর্ষ শুরু হয়। বিহারির উর্দু ভাষায় ভোটার তালিকা দাবি করে। নভেম্বরে তারা হরতাল ডাকে। সংঘর্ষে ১ জন নিহত ও ১৯ জন আহত হয়। ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। এক ইউনিট ভেঙে দেয়া হয়। বলা হয়, এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত

www.nagorikpathagar.com

হবে। আর বলা হয়, ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি হতে প্রকাশ্যে রাজনীতি করা যাবে।

ইয়াহিয়া খানের এ ঘোষণা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। ইয়াহিয়া খান একটি নির্বাচনী আইনগত কাঠামো জারি করেন। এই নির্বাচনী কাঠামো নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। ছাত্রলীগ, মতিয়া ছাত্র ইউনিয়ন ও এনএসএফের একটি অংশ ইয়াহিয়ার ঘোষণা সমর্থন করলেও মেনন গ্রুপ এর বিরোধিতা করে।

১৯৭০ সালের পহেলা জানুয়ারি রাজনীতি শুরু হয়। আগের দিন ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাতে শুরু হয় মিছিল আর মিছিল। আর ওই ৩১ ডিসেম্বর জেনারেল আইয়ুব রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে। ৩ জানুয়ারি ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন নির্বাচনে বাধা দেয়া হলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে ন্যাপের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে নির্বাচনে ঐক্যের প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু শেখ সাহেব সে প্রস্তাব বাতিল করে দেন। একই দিন করাচিতে এক জনসভায় জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন পিপলস পার্টি ক্ষমতায় গেলে তিনি মূল শিল্প রাষ্ট্রীয়করণ করবেন।

তখন একটি বৈপরীত্য দেখা দেয়। এই বৈপরীত্য হচ্ছে ৬ দফা ও ১১ দফা নিয়ে। ৬ দফা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের মূল বক্তব্য। ছাত্র ইউনিয়নের কোনো গ্রুপই এককভাবে ৬ দফা সমর্থক নয়। ফলে প্রণীত হয় ৬ দফাকে ভিত্তি করে ১১ দফা। এই ১১ দফার ব্যাপারে শেখ সাহেব কিংবা আওয়ামী লীগ খুব দৃঢ় নয়। কারণ ১১ দফায় সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের কথা আছে। অপরদিকে ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপ, মোজাফফর ন্যাপ অর্থাৎ ওয়ালী ন্যাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু ওয়ালী ন্যাপ ৬ দফা সম্পর্কে একমত নয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, ১১ দফার ভিত্তিতে সংগ্রামের ডাক দেয়া হলে আওয়ামী লীগ তেমন উৎসাহ দেখায় না। অপরদিকে মোজাফফর ন্যাপ ১১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলনে ডাক দিলে ওয়ালী ন্যাপ উচ্চবাচ্য করে না। এই পরিবেশে ২১ জানুয়ারি মওলানা ভাসানী কাগমারিতে কৃষক সম্মেলন ডাকলেন। এই সম্মেলনে স্লোগান উঠল, ভোটের আগে ভাত চাই, নইলে এবার রক্ষা নাই। অপরদিকে ২০ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলাম পল্টন ময়দানে এক সভার আয়োজন করে। এই জনসভায় শেখ সাহেব ও ৬ দফার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করা হলে জনসভা ভেঙে যায় এবং এটাই বোধহয় জামায়াত নেতা মওলানা মওদুদীর পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ নির্বাচনী জনসভা ছিল। এ সময় ভাসানীপন্থী শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় আর নির্বাচন নয়। বিরামহীন সংগ্রামই হচ্ছে মুক্তির একমাত্র পথ।

www.nagorikpathagar.com

অর্থাৎ আন্দোলন তখন সুস্পষ্টভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত হতে থাকে। (১) আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়ার ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনে যাবার পক্ষে। (২) ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে যাবার বিপক্ষে। (৩) ওয়ালী ন্যাপ নির্বাচনে যাবার পক্ষে হলেও ৬ দফা ও ১১ দফার প্রশ্নে তাদের মধ্যে মতান্তর আছে। অপরদিকে ইসলামপন্থী দল ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি কঠোরভাবে ১১ দফা বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, ৬ দফা, ১১ দফার আন্দোলন বাড়তে দেয়া হলে পাকিস্তান ভেঙে যাবে। পরোক্ষভাবে সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হতে থাকে কোনোমতেই শেখ মুজিবরের হাতে ক্ষমতা নয়। সারা পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর প্রভাব একটুও ক্ষুণ্ন হোক সে প্রশ্নে সামরিক বাহিনী একেবারেই অটল। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ক্ষমতায় যেই আসুক না কেন পাকিস্তানের শাসনকর্তা হবে সামরিক বাহিনী। এ প্রশ্নে কোনো আপোষ নেই। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩১৩। যে কোনো উপায়েই হোক ৬ দফা বিরোধীদের অন্তত ১৫৬ আসন পেতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া নির্বাচনী বিধি বা কাঠামো জারি করেন। এই নির্বাচনী কাঠামোতে বলা হয়–

(১) শাসনতন্ত্রে ইসলামী আদর্শকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

(২) ফেডারেল ইউনিয়ন হবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র।

(৩) গণতন্ত্র ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার থাকবে।

(৪) ফেডারেল শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতা ভাগাভাগি হবে।

(৫) অর্থনৈতিক ও বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা থাকবে।

(৬) নির্বাচনী ও জাতীয় পরিষদ যে সংবিধানই রচনা করুন না কেন তাতে প্রেসিডেন্টের অনুমতি লাগবে। প্রেসিডেন্টের অনুমোদন ব্যতীত কোনো সংবিধান বৈধ হবে না। নির্বাচনের ফলাফল গেজেট হবার ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচিত না হলে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন দিতে পারবেন।

অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গণতন্ত্রের নামে সব ক্ষমতা সামরিক বাহিনীর কুক্ষিগত করলেন। নির্বাচন একটি প্রহসনে পরিণত হলো, আইনগত কাঠামো ঘোষণার পর। এই আইনগত কাঠামো নিয়েই তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হলো। আমাদের দল শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের পক্ষে থেকে সুস্পষ্টভাবে বলা হলো, এই আইনগত কাঠামোর অধীনে নির্বাচন হলে কোনোদিনই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে না। সংবিধানসম্মতভাবে ক্ষমতা পেতে হলেও রক্তাক্ত সংগ্রাম

www.nagorikpathagar.com

অনিবার্য। সুতরাং এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ অর্থহীন। আমরা বলেছিলাম আমরা নির্বাচনের বিরুদ্ধে নই। আমরা নির্বাচনকে সংগ্রামের হাতিয়ার বলে মনে করি। কিন্তু এই নির্বাচনী কাঠামোতে পাকিস্তানকে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। ধর্মের নামে সকল গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হবে। এ নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোনো অবকাশ নেই।

প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণা সব দলকেই বিপদে ফেলে দেয়। এই ঘোষণায় গণতন্ত্রের চিহ্ন ছিল না। সুতরাং প্রকাশ্যে এই শর্ত মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা খুবই কঠিন। সকল বামপন্থী দল প্রথমে এই শর্ত প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের কথা ছিল, নির্বাচনে অংশগ্রণ করব। নির্বাচনে জয়লাভ করব। জয়লাভ করার পর সিদ্ধান্ত নেব ওই শর্ত আমরা মানব কিনা।

এ সময় এই শর্তের বিরুদ্ধে অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা প্রয়াত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) একখানা পুস্তিকা লেখেন। এই বইয়ে তিনি দাবি করেন রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি সব সম্প্রদায়ের লোকদের জন্যেই খোলা রাখা উচিত। কিন্তু তাঁর বক্তব্য কোনো কাজে আসেনি। ততক্ষণে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। এখানে লক্ষণীয়, বামপন্থী কোনো দলই ভাবতে চেষ্টা করেনি যে ১৯৪৭ সাল, ১৯৭০ সাল নয়। এই ২৩ বছরে বাঙালি সমাজে সেনাবাহিনী থেকে সচিবালয় পর্যন্ত অনেক পেশাজীবী সৃষ্টি হয়েছে। তারা লক্ষ্য করেছে বাঙালি বলেই তারা বঞ্চিত। একই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে। সেকালে ভারতের মুসলমানদের ধারণা ছিল তারা মুসলমান বলেই বঞ্চিত। তাই মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান দরকার। আর ষাটের দশকের ধারণা হলো, বাঙালিদের জন্যে একটা কিছু করা দরকার। আমরা স্বাধীন হই বা না হই আমাদের এমন কিছু করতে হবে যার ফলে আমরা বাঙালি বলে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারি এবং সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারি। অবিভক্ত ভারতের ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন মুসিলম লীগ এ নির্বাচনকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লড়াই হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ওই নির্বাচনে মুসলিম লীগ সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিল অবিভক্ত বাংলায়।

১৯৫৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল সাধারণ নির্বাচনে। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠন হয়। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সাধারণ মানুষ যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেয়। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা শতকরা ৯৭টি আসন দখল করে। সেকালে পূর্ব পাকিস্তান

www.nagorikpathagar.com

থেকে মুসলিম লীগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু বাঙালি নেতৃত্ব এ বিজয় ধরে রাখতে পারেনি। সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের খপ্পরে পড়ে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। এই নেতারাই কেন্দ্রে পাকিস্তানের নেতৃত্বের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

পাকিস্তানকে দুই ইউনিটে ভাগ করে। ওই দুই ইউনিটের ভিত্তিতে শতকরা ৫০ ভাগ সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সেকালের বাঙালি নেতৃত্ব আঁতাত করে। অথচ জনসংখ্যার অনুপাতে বাঙালিরা ছিল শতকরা ৫৬ ভাগ। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এবং শেরে বাংলার নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টি দুই ইউনিট মেনে নেয়। বিক্ষুব্ধ বাঙালিদের তখন কিছু করার ছিল না। বামপন্থীরা সংগঠিত নয়। এককভাবে নেতৃত্ব দিয়ে তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। ফলে ডান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে বিকল্প কোনো আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। সেকালে বিকল্প কোনো আন্দোলন গড়ে উঠলে বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্নরকম হতো। বলা যায় রাজনৈতিক দিক থেকে তখন এক বিরাট শূন্যতা ছিল। এই শূন্যতার সুযোগ নিয়ে ১৯৫৮ সালে বেসামরিক আমলাদের সহায়তায় সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় আসে। দেশে সামরিক আইন জারি হয়। এই সামরিক আইন প্রথম দিকে জনগণ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে অনুভূত হতে থাকে যে বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম না করলে ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শুধু ব্যবসায়ী মহলে নয়, বাঙালি আমলা ও সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা প্রতি পদে পদে এই কঠিন সত্য অনুভব করতে থাকে। তাই তারাই প্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে আসে। যার নেতৃত্বে ছিলেন নৌবাহিনীর কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন এবং ক্যাডার সার্ভিসের ফজলুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস প্রমুখ। এই সংগ্রামকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার জন্যেই শেখ মুজিবুর রহমানকে এই আন্দোলনে জড়ানো হয় এবং এঁদের সহযোগিতায়ই ১৯৬৬ সালে শেখ সাহেব ৬ দফা দাবি তোলেন।

৬ দফার এই পটভূমি সম্পর্কে বামপন্থীরা অবহিত থাকলেও সেকালের এক শ্রেণির বামপন্থীর মধ্যে আন্তর্জাতিকীপনার নিদারুন প্রভাব ছিল। তারা সব কিছুই সমাজতান্ত্রিক শিবির বনাম সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করে। এককভাবে দেশীয় সমস্যার প্রতি তাদের ঝোঁক ছিল একান্তই গৌণ। সুতরাং তাদের কাছে শেখ সাহেবের দেয়া ৬ দফা ছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র একটি দলিল। তারা মনে করতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভাগ করতে চায়। সেই লক্ষ্যেই ৬ দফা প্রণীত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.com

সুতরাং ৬ দফা পরিত্যাজ্য। এই ৬ দফার মধ্যে যে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন আছে সে কথা তারা আমলেই আনল না।

এই ভুল ব্রিটিশ আমলে ভারতের বামপন্থীরা করেছিল। তারা লাহোর প্রস্তাবকে শুধুমাত্র ব্রিটিশের ষড়যন্ত্র বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাবে যে এক শ্রেণির মুসলমানদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন আছে সে সত্যটি বামপন্থীরা এড়িয়ে গেল। সেদিন এই অপ্রিয় সত্যটি মেনে নিয়ে বামপন্থীরা সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে হয়তো উপমহাদেশের মানচিত্র অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু বামপন্থীদের ভুলের জন্য কংগ্রেস মুসলিম লীগ এবং ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রই সফল হলো। ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গায় হাত রাঙিয়ে উপমহাদেশকে ভাগ করা হলো। ভাইয়ের রক্ত গেল। কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের বামপন্থীরা একই সঙ্কটে পড়েছিল ষাটের দশকে। আজ অনেকেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের সংগ্রাম পর্যন্ত মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেক কথা লিখছেন। অনেক তত্ত্ব দিচ্ছেন। এদের মধ্যে অনেকেই ১৯৬৯ সালেও শেখ সাহেবকে হটকারী বলেছেন। মার্কিন দালাল বলেছেন। ৬ দফার বিরোধিতা করেছেন। অথচ নিজেরা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো বিকল্প পথের সন্ধান দিতে পারেননি। তাই ১৯৬৯ সালে ৬ দফার দাবিদার আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগই সাধারণ মানুষের সামনে এসেছে। কেউ মনে রাখেনি ১৯৫৪ সালের পর এক ইউনিট ও সংখ্যা সাম্য মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগের বিশ্বাসঘাতকতার কথা। কেউই মনে রাখেনি যে আওয়ামী লীগ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী সহযোগিতা না করলে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের এত বঞ্চিত করতে পারত না। কারণ আওয়ামী লীগ বিশ্বাসঘাতকতা করলেও জনতার আন্দোলনে ছিল। জনতার সঙ্গে থেকে সাধারণ মানুষের কথা বলেছে। আবার নিজের বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্বীকার করে নিজেকে সংশোধন করেছে। জনতার নির্দিষ্ট দাবি নিয়ে জনতার সামনে এসেছে। ফলে ভালো ভালো কথা বলে এবং সঠিক যুক্তি দিয়েও বামপন্থীরা জনতার কাছে যেতে পারেনি। তাই সঙ্কটে পড়ে গেছে ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের ঘোষণা দেবার পর।

এ কথা সত্য, ইয়াহিয়া খানের দেয়া কাঠামোর মধ্যে নির্বাচনে যাওয়া যায় না। কিন্তু আওয়ামী লীগ নির্বাচনে গেলে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা নির্বাচনে যাবেন না বলছেন ঘটনা প্রবাহে তাঁদের কোনো গুরুত্বই থাকবে না। তাই দেখা গেল এক এক করে সব দলই নির্বাচনে

www.nagorikpathagar.com

যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ভিন্ন বক্তব্য দিল পিকিংপন্থী ন্যাপ বলে পরিচিতি মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ভাসানী ন্যাপ। তখন পশ্চিমবঙ্গে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে চাষিদের জমি দখলের লড়াই। এ আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছে পিকিং বেতার। তাদের বক্তব্য হচ্ছে নির্বাচন বর্জনীয়। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই ক্ষমতা দখল করতে হবে। তাই পূর্ব পাকিস্তানে ভাসানী ন্যাপের দাবি হচ্ছে, ভোটের আগে ভাত চাই। অর্থাৎ ভাতের ব্যবস্থা হলেই ভোটে অংশগ্রহণ করা যায়। আর সকলের জন্যে ভাতের ব্যবস্থা করতে হলে বিপ্লব অনিবার্য। তাদের স্লোগান যখন তখনই বিপ্লবের। অথচ দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এ দলটি আদৌ কোনো শ্রেণিসংগ্রামের দল নয়। বিপ্লবের দল তো নয়ই। তবে শেষ পর্যন্ত এ দলটিকে বিপ্লব বা নির্বাচন—এর কোনোটাই করতে হয়নি।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর উপকূল এলাকায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়। লাখ লাখ মানুষ মারা যায়। এ পরিস্থিতিতে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। এ বক্তব্যের ভিত্তিতে মওলানা ভাসানী নির্বাচন বর্জন করেন। শেখ সাহেব হুমকি দেন, ঘূর্ণিঝড়ে আরো ১০ হাজার লোক মারা গেলেও ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন হবেই। কারণ তাঁর ভয় ছিল কোনো অজুহাত গেলে সামরিক বাহিনী নির্বাচন স্থগিত করবে। পাকিস্তানে কোনোদিন নির্বাচন হবে না। ক্ষমতাও হস্তান্তর হবে না।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনেকের ধারণা মাওলানা ভাসানী শেখ সাহেবের সঙ্গে সমঝোতা করে নির্বাচন বর্জন করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল এবারের নির্বাচন নির্ধারণ করবে কে বাঙালির স্বার্থের পক্ষে আর কে-ই বা বাঙালির স্বার্থের বিপক্ষে। তাই এবারের নির্বাচনে বাঙালির ভোট বিভক্ত করা কঠিন হবে না। সবাই যাতে নৌকায় ভোট দেয় সে প্রস্তুতিই নিতে হবে। এ নির্বাচন নিয়ে আমরাও কম বিপদে পড়িনি। আমাদের শ্রমিক কৃষক দল গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের ২৯ আগস্ট। চারদিকে অভ্যুত্থানের পরিবেশ। আমরা দল গঠনের কোনো সুযোগ পেলাম না। নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হলো ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। ইয়াহিয়ার ঘোষণা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। নীতিগতভাবে এ নির্বাচনে যাওয়ার কোনো পথই আমাদের কাছে খোলা ছিল না।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে ভিন্ন আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। আমরা তখন চটকল এলাকার একচ্ছত্র নেতা। আমরা ডাক দিলে সকল শিল্প এলাকা স্তব্ধ করে দিতে পারি। আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে বিভিন্ন গ্রুপের বামপন্থী নেতারা আসছেন। আসছেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ।

www.nagorikpathagar.com

তাঁদের সকলের বক্তব্য হচ্ছে, জাতির সামনে দফা একটাই। দফা হচ্ছে দেশকে স্বাধীন করতে হবে। আমরা দেশকে স্বাধীন করার প্রশ্নে তাঁদের সঙ্গে একমত হলাম। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হলে শোষণমুক্ত সমাজ হবে কিনা। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছ থেকে এ গ্যারান্টি চাই। উপমহাদেশ এর আগেও ভাগ হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। একবার হিন্দু-মুসলমান হিসেবে দেশ ভাগ হয়েছে। এবার বাঙালি হিসেবে দেশ ভাগ হওয়ার প্রস্তাব আসছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে সমাজ পরিবর্তনের কোনো কথা হচ্ছে না। আমরা স্বাধীনতার পক্ষে শক্তির কাছ থেকে এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি চাই।

আর নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে—ইয়াহিয়ার দেয়া কাঠামোতে নির্বাচনে জয়ী হলেও ক্ষমতা পাওয়া যাবে না। কারণ সকল ক্ষমতাই প্রেসিডেন্টের হাতে। সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া পাকিস্তানের সামরিক জান্তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। সুতরাং নির্বাচন বাদ দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেয়াই এ মুহূর্তে সময়ের দাবি। কারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রতিকূল হলে নতুন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত করা কঠিন হবে। তখন নির্বাচনের ফলাফলের ওপর দাঁড়িয়েই সামরিক জান্তা বিশ্ব জনমতকে নিজের পক্ষে নিতে পারবে। আমাদের প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। তাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ নয়, ইয়াহিয়া ঘোষিত নির্বাচনী কাঠামো বাতিলের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলাই এ মুহূর্তে দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এই কাঠামোর মধ্যে নির্বাচন করলে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো সম্ভাবনা নেই।

আমরা আমাদের এ বক্তব্যের ভিত্তিতে জনসভা করি। প্রচারপত্র ছাপাই এবং ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যে নির্বাচনে আমরা অংশ নিইনি।

১৯৭০ সালের নির্বাচন হয়েছিল ৭ ডিসেম্বর। উপকূল এলাকায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল ১২ নভেম্বর। এই ১২ নভেম্বরকে কেন্দ্র করে আমার জীবনের কতগুলো বিশেষ ঘটনা আছে। আমি তখন দৈনিক পাকিস্তানের শিফট ইনচার্জ। আমি রিপোর্টার নই। আমার ঘূর্ণিঝড় এলাকায় যাবার কথাও নয়। কিন্তু আমি ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিলাম।

তখন দৈনিক পাকিস্তানের বার্তা সম্পাদক তোয়াব খান। তাঁকে বললাম, আমি ঘূর্ণিঝড় এলাকায় যাব। এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় হয়তো আমাদের জীবনে আসবে না। তাই এর ক্ষয়ক্ষতি নিজের চোখে দেখা প্রয়োজন। দৈনিক পাকিস্তানের পয়সায় নয়, আমি নিজের খরচেই যাব। তোয়াব খান রাজি

www.nagorikpathagar.com

হলেন। ঘূর্ণিঝড়ের ১০ দিন পর অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বর আমি পটুয়াখালী পৌঁছালাম। দৈনিক পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এ এলাকায় গেলেন মনসুর আহমদ। ফটোগ্রাফার আকিল খান।

কাউকেই আমি পটুয়াখালীতে পেলাম না। তাঁরা গলাচিপায় চলে গেছেন। কিন্তু গলাচিপায় কী করে যাব। কোনো লঞ্চ নেই। সকল পরিবহন সরকারি তত্ত্বাবধানে রিলিফ কাজে ব্যস্ত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও ঢাকা থেকে লঞ্চ ভাড়া করে রিলিফে গিয়েছে। এ ধরনের একটি লঞ্চ ভাড়া করে ন্যাপের নেতারা গিয়েছিলেন রিলিফের জন্যে। ঐ লঞ্চে ছিলেন মতিয়া চৌধুরী। তাঁদের লঞ্চে আমি গলাচিপায় গেলাম।

২৩ নভেম্বর আমি গলাচিপায় ঘুরছি। ইতোমধ্যে দেখলাম গলাচিপায় হইচই শুরু হয়ে গেছে। সামরিক বাহিনীর একটি লঞ্চ এসেছে। নেতৃত্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ক্যাপ্টেন পাঞ্জাবি লেরা খান। দেখলাম এসেই লেরা খান খুব তৎপর হয়ে গেছেন। গলাচিপা বাজারে একটি পুল ভাঙা ছিল। লেরা খান থানা কর্তৃপক্ষকে ধমক দিয়েছিলেন স্থানীয় চেয়ারম্যানকে ধরে আনতে। বাধ্য করেছিলেন দু'ঘণ্টার মধ্যে পুলটিকে মেরামত করতে। সন্ধ্যার দিকে দেখলাম লেরা খান ত্রাণ শিবিরগুলোর দিকে যাচ্ছেন। খোঁজ নিচ্ছেন দুর্গতরা রিলিফ পেয়েছে কিনা। দুর্গতরা কেঁদে কেঁদে তাদের অভিযোগ জানাচ্ছে। আমাদের ফটোগ্রাফার আকিল খান হিন্দি, উর্দু দুই ভাষায়ই ভালো কথা বলতে পারে। আমি আকিল খানকে বললাম, তুমি ঐ ক্যাপ্টেন-এর সঙ্গে কথা বলো। আমি তার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

সন্ধ্যার দিকে লেরা খানের সঙ্গে দেখা হলো। দেখলাম ক্যাপ্টেন খুব উত্তেজিত। ক্যান্টনমেন্ট থেকে এসেছেন। তিনি বললেন, ১২ তারিখ ঘূর্ণিঝড় হয়েছে। অথচ আমাদের এখানে আসতে খবর দেয়া হয়েছে ১৬ তারিখ। আমাদের আসতে বলা হয়েছে নৌপথে। আমরা সড়কপথে যশোর থেকে খুলনা এসেছি। খুলনায় আমাদের একটি লঞ্চ দেয়া হয়েছে। সে লঞ্চ এত ধীর গতিতে চলে যে আমাদের গলাচিপা আসতে এক সপ্তাহ লেগে গেছে। এখানে এসে দেখি অব্যবস্থা। সবাই লুটপাটে ব্যস্ত। তাই আজ থেকে আমরাই রিলিফের দায়িত্ব নিয়েছি।

একজন সাংবাদিক হিসেবে এটুকুই ছিল আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া। একটি খবর পেলাম। খবরটি হলো উপদ্রুত এলাকায় রিলিফের দায়িত্ব সামরিক বাহিনী গ্রহণ করেছে। আমি ব্যতীত কোনো সাংবাদিক সেদিন এ খবরটি পেল না। ক্যাপ্টেন ক্যাম্প থেকে বের হয়ে আমি ডাকঘরে গিয়ে

www.nagorikpathagar.com

দৈনিক পাকিস্তানে তার করলাম। পরের দিন একমাত্র দৈনিক পাকিস্তানেই খবর হয়েছিল উপদ্রুত এলাকায় রিলিফের দায়িত্ব সামরিক বাহিনী গ্রহণ করেছে।

কিন্তু সংবাদ গ্রহণ করতে গিয়ে আমি আমার যানবাহন হারিয়ে ফেললাম। ন্যাপের লঞ্চ ছেড়ে গিয়েছে। শুনলাম তারা দক্ষিণে গিয়ে কালাইয়ার দিকে যাবে। কিন্তু আমি যাব কোথায়। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আবার দেখা করলাম। বললাম, আমি তোমার সঙ্গে যাব। তুমি কোনদিকে যাচ্ছো। ক্যাপ্টেন কথা দিলেন। তাঁদের সঙ্গেই আমি যাব এবং রাতে লঞ্চেই থাকব।

লঞ্চে উঠে বিপদে পড়ে গেলাম। কী খাব? নদীর জলে মানুষ মরা গন্ধ। চারদিকে লাশ। একফোঁটা জল খাওয়া যায় না। কোনো কিছু খেতে গেলে বমি হয়। গভীর রাতে ক্যাপ্টেন এটা লক্ষ করলেন। বললেন—তোমাকে বড় এক মগ চা করে দিচ্ছি। কিছু বিস্কুট নাও। সামরিক বাহিনীর বড় মগে চা আর বিস্কুট খেয়ে সে রাত কেটে গেল।

লঞ্চেই সঙ্গী জুটে গেল। সঙ্গীর নাম গফুর রানার। গফুর রানার গলাচিপা থেকে ডাক নিয়ে প্রতিদিন রাঙ্গাবালী যায়। ঘূর্ণিঝড়ের পর রাঙ্গাবালীতে ডাক যায়নি। গফুর রানার গলাচিপায় আটকে গেছে। এবার সামরিক বাহিনীর লঞ্চ পেয়ে গফুর রানার এলাকায় ফিরছে।

গফুর রানারের কথা ফুরায় না। আমি নির্বাক। গফুর রানার বলে এ লঞ্চ দক্ষিণে গিয়ে আগুনমুখা নদীতে যাবে। আগুনমুখা থেকে আরো দক্ষিণে গিয়ে এ নদী বঙ্গোপসাগরে গেছে। আগুনমুখায় গিয়ে বাঁয়ে পানপট্টি হয়ে নদী যাবে কাজলের দিকে। আমরা সোজা যাব ডিক্রি নদীর ধরে গাববুনিয়ার দিকে। গাববুনিয়ার কাছে রাঙ্গাবালী, বাহিরদিয়া, নৌডুবি, ছোট বাইশদিয়া।

শৈশব থেকে আগুনমুখার নাম শুনেছি। শুনেছি আগুনমুখার তুফান ভারি। ঝড়ের মৌসুমে লঞ্চ বা স্টিমার এই এলাকায় গিয়ে যাতায়াত করে না। একমাত্র ওই এলাকার নৌকার মাঝি ব্যতীত কেউ আগুনমুখায় পাড়ি জমাতে সাহস পাবে না। সেই আগুনমুখা পাড়ি দিয়ে এক সময় ডিক্রি নদী ধরে আবার বাঁয়ে গিয়ে আমরা গাববুনিয়ার কাছে আটকে গেলাম। নদীতে জল কম। লঞ্চ ঠেকে গেছে। এবার কী হবে? আমরা কি এগুতে পারব না। গফুর রানার বলল, ভয়ের কিছু নেই। আমরা নৌকা নিয়ে রাঙ্গাবালী চলে যাব। রাঙ্গাবালী থেকে কয়েক মাইল দূরে গফুর রানারের বাড়ি। সে বাড়িতে কেউ আছে কিনা গফুর রানার জানে না। ওই এলাকায় প্রতি ঘরে ঘরে মৃত্যুর কান্না। অনেক বাড়িতে ছায়া পড়বার মতো লোক নেই। নিঝুম ভুতুড়ে বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। গফুর

www.nagorikpathagar.com

রানারের ইচ্ছা আমি প্রতিটি বাড়িতে যাই। আমি সাংবাদিক। আমি গ্রামে গ্রামে গেলে এলাকার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। এলাকার মানুষ রিলিফ পাবে।

তখন ছিল রোজার মাস। ছোট এক নৌকায় চড়ে আমরা রাঙ্গাবালী পৌঁছালাম। রাঙ্গাবালী পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমার ক্ষিধে পেয়ে গিয়েছিল। এক সময় গফুর রানারকে বললাম, আমাকে ভাত খেতে হবে। গফুর রানার যেন আকাশ থেকে পড়ল। রোজার মাসে আমি কেন ভাত খাব। এ প্রশ্ন তাকে বিপর্যস্ত করল। এক সঙ্গে দু'রাত থাকা সত্ত্বেও রানার কখনো আমার নাম জিজ্ঞাসা করেনি। নদীর জলে মানুষ মরা গন্ধ বলে সারাদিন তাদের সঙ্গে আমি না খেয়ে থেকেছি। সন্ধ্যার পর তাদের সঙ্গে বিস্কুট ও মগ ভর্তি চা খেয়েছি। ভাত খাইনি কোনোদিন।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর যেন গফুর রানারের চমক ভাঙল। সে কোনো কথা বলল না। আস্তে আস্তে তার ব্যাগটি কাঁধে নিল। আমার চোখের সামনে থেকে যেন নির্বিঘ্নে মিলিয়ে গেল। আমি বুঝলাম বড্ড বেশি আঘাত পেয়েছে গফুর রানার। আমি কোথায় জন্মেছি। কী আমার নাম। তা সে জানত না। আমাকে সে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। গফুর রানারের বয়স ৫০ পেরিয়েছে। সে কখনোই ভাবতে পারেনি আমার সঙ্গে তার এমন একটা ফারাক থাকতে পারে। সে বেদনায়, বিস্ময়ে মূক হয়ে গিয়েছিল। কথা ছিল আমি তার বাড়ি যাব। সকলের সঙ্গে পরিচিত হব। কিন্তু আমার এক মুহূর্তের পরিচয়ে সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে গেল।

আমি বিপদে পড়ে গেলাম। রাঙ্গাবালীতে কাউকে আমি চিনি না। গফুর রানারের আচরণ আদৌ আমাকে দুঃখ দেয়নি। আমাকে বিমর্ষ করেনি। এই উপমহাদেশে জন্মগ্রহণ করে এ ছবিই দেখেছি বছরের পর বছর। আমি ঘর পোড়া গরু হলেও সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পেতে ভুলে গেছি।

রাঙ্গাবালী বাজারে বসে আছি। কিছুক্ষণের জন্য একটি ব্রিটিশ হেলিকপ্টার ওখানে নামল। তাদের আমি আমার অবস্থান জানালাম। তাদের হেলিকপ্টারে বাড়তি আসন ছিল না। শুধু আশ্বাস দিল যে ওয়ারলেসে তারা আমার লঞ্চে খবর দেবে যে আমি আটকে গেছি। আমাকে যেন উদ্ধার করা হয়। হেলিকপ্টার চলে যাবার পর টিএন্ডটির একটি স্পিড বোট পৌঁছল রাঙ্গাবালীতে। ওরা আমাকে নিতে রাজি হলো না। ওরা বলল, ওদের একটি ইঞ্জিন বিকল। দ্বিতীয় ইঞ্জিনটি দিয়ে চালিয়ে এসেছে। বাড়তি যাত্রী নিতে হলে স্পিড বোট চলবে না। এবার রাঙ্গাবালী বাজারে মানুষগুলো যেন ক্ষেপে গেল। তারা বলল, এই সাংবাদিক সাহেবকে না নিয়ে গেলে এই স্পিড বোট আমরা

www.nagorikpathagar.com

তুলে ফেলব। এখান থেকে যেতে দেব না। ওই স্পিড বোটে চড়েই আমি গলাচিপা হয়ে গভীর রাতে পটুয়াখালী পৌঁছেছিলাম। তবে কথা সত্য যে স্পিড বোটটির স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় পথের মাঝে আমাদের থামতে হয়েছে।

আমার সাংবাদিক জীবনের ইতিহাসে নিয়মিত লেখালেখি শুরু এই ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে। এই ঘূর্ণিঝড় নিয়ে লেখালেখির এক পর্যায়ে একদিন গভীর রাতে একটি ফোন পেয়েছিলাম। ফোন করেছিলেন এক দম্পতি। তাঁদের আবেদন হচ্ছে আপনার কলম বন্ধ করুন। আপনার লেখা পড়ে প্রতিরাতে আমাদের কাঁদতে হয়। এই লেখা উল্লেখ করেই ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দিন আবুল কালাম ফোন করেছিলেন ইতালি থেকে। ফোনে বলেছিলেন, নির্মল, ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তোর একটা লেখা ইতালির পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। লেখার শিরোনাম—হাশেম চৌধুরী একটি লাশ চায়।

হাশেম চৌধুরীর বাড়ি গলাচিপা থানার চরকাজল। চরকাজলে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ঘূর্ণিঝড়ের পরে। ঘূর্ণিঝড়ে তিন পুত্র আর এক কন্যা নিয়ে হাশেম চৌধুরী এক সময় জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। নিজে ফিরে এসেছিল। কিন্তু ফিরিয়ে আনতে পারেননি একটি সন্তানকেও। সেই হাশেম চৌধুরীকে আমি দেখেছি নদীর তীরে ঘুরে বেড়াতে। হাশেম চৌধুরী অন্তত একটি লাশ চায়। সে লাশটি নিজের বাড়িতে কবর দেবে। ওই কবরকে কেন্দ্র করে স্মৃতি ধরে রাখবে তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানের।

জানি না হাশেম চৌধুরী কেমন আছে। ১৯৭০ সালের পর পটুয়াখালীর দক্ষিণে যাওয়া হয়নি। এই ঘূর্ণিঝড় ও মৃত্যুর পরিস্থিতিতেই ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন পাকিস্তান সামরিক শাসনকে বিপদে ফেলে দেয়। পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ৩১৩। জঙ্গি সরকারের ধারণা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। অথচ আওয়ামী লীগ ১৬৭ আসনে জয়ী হলো। এ পটভূমিতে আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী না করে উপায় ছিল না। অথচ জঙ্গি সরকারের হিসাব ছিল পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান মিলে আওয়ামী লীগ বিরোধীদলগুলো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে। কিন্তু পরিস্থিতি হয়ে গেল বিপরীত।

অপরদিকে আওয়ামী লীগও সঙ্কটে পড়ে গেল। আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়ায় ক্ষমতায় যাওয়া ছিল নিশ্চিত। বাঙালিদের প্রত্যাশা

www.nagorikpathagar.com

ছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ৬ দফা বাস্তবায়ন হবে। কিন্তু ৬ দফা বাস্তবায়ন সহজ ছিল না। ৬ দফার সামগ্রিক অর্থ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এ কথা কারো অজানা ছিল না। কিন্তু সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগ তখন স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার পর্যায়ে ছিল না। প্রস্তুতিও ছিল না। তাই আওয়ামী লীগও সঙ্কটে পড়ে গেল।

ছাত্রলীগের একটি অংশের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করা হলো। এ প্রশ্নে ছাত্রলীগ দু'ভাগ হয়ে গেল। কোনোদিনই আওয়ামী লীগের সভায় দেশ স্বাধীন করার প্রস্তাব উঠল না। স্বাধীনতার প্রশ্নে আওয়ামী নেতৃত্বে চরম বিরোধ। এ বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বেই সামরিক সরকারের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিল। পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো সেনাবাহিনীর একটি অংশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অসম্ভব করে তুললেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে তার চরম প্রতিক্রিয়া হলো। প্রকাশ্যেই স্বাধীনতার কথা বলা হতে লাগল। এ পরিস্থিতিতেই ১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করলেন। প্রতিবাদে শেখ সাহেবকে চরম সিদ্ধান্ত নিতে হলো। রেসকোর্স ময়দানে তিনি ঘোষণা দিলেন—'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেই জনসভায় আমিও ছিলাম। আমার মনে হলো, ইচ্ছে হলেও আওয়ামী লীগ বা শেখ সাহেবের পিছু হটবার পথ নেই। আজ হোক বা কাল হোক বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই এবং সে সংগ্রাম হবে রক্তাক্ত। দীর্ঘস্থায়ী। আমি তখন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এ যুদ্ধে কে সাহায্য করবে! কাছাকাছি কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ নেই। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক গভীর। পাশে ভারত। এটি একটি পুঁজিবাদী দেশ। বাঙালি বলে পশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুরার মানুষের আমাদের জন্যে সহানুভূতি থাকতে পারে না। কিন্তু তারপরও ভারত সরকার আমাদের সাহায্য করল।

আমার কাকীমার অসুখের খবর পেয়ে ৯ মার্চ আমি বাড়ি চলে গেলাম। বেতারে খবর পাচ্ছিলাম যে কোনো মুহূর্তে নাকি আপোষ হয়ে যেতে পারে। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল আপোষ সমঝোতা করতে হলেও রক্তপাত হবে। সাধারণ মানুষকে ধারণা দেয়া হচ্ছে, এবার বাঙালির শাসন কায়েম হবে। কিন্তু ভোটে হলো না। তাই সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া আমাদের হাতে ক্ষমতা আসবে না। কিন্তু এ সংগ্রামের প্রস্তুতি কোথায়? এ সংগ্রামের নেতৃত্ব কে করবে? এ সংগ্রামে কে আমাদের সাহায্য করবে? সে সম্পর্কে

www.nagorikpathagar.com

কোনো সুস্পষ্ট মীমাংসা হওয়ার পূর্বেই ২৬ মার্চ ভোরে ঢাকার বেতারে ভিন্ন কণ্ঠ শুনলাম। বুঝলাম সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে।

২৫ মার্চ বাড়ি ছিলাম। আজ বলতে দ্বিধা নেই যে, ২৫ মার্চ এমন করে সংকটের গভীরতা বুঝতে পারিনি। আমার কাছে প্রশ্ন ছিল, এ যুদ্ধে জিতব কী করে—এ যুদ্ধে কে আমাদের সাহায্য করবে বা কেন করবে।

দু'দিন পর বুঝলাম গ্রামে থাকা যাবে না। আমাদের মহকুমা গোপালগঞ্জ। আওয়ামী লীগ এখানে জনপ্রিয়। প্রতিপক্ষও কম শক্তিশালী নয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করায় এ মহল ভীত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর হামলা শুরু হওয়ায় এরা ঘুড়ে দাঁড়াল। নতুন করে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করল। এদের প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়াল হিন্দুদের বাড়ি লুট করা। হঠাৎ করে গ্রাম গ্রামান্তরে একটি সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেল। পাকিস্তান সরকারের প্রচারণায় প্রথম দিকে বিভ্রান্ত হলো মানুষ। হিন্দুরা ভয় পেয়ে গেল। বাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করল। ফলে সুবিধা হলো লুটেরাদের। এ লুটপাট যখন শুরু হলো তখন পাকিস্তান বাহিনী গ্রাম গ্রামান্তরে যায়নি। সুতরাং যে সকল ঐতিহাসিকেরা লুটপাটের জন্যে শুধুমাত্র পাকিস্তান বাহিনীকে দায়ী করেন, তাদের সঙ্গে আমি একমত নই। প্রকৃত চিত্র হচ্ছে আমরাই প্রথম লুটপাট শুরু করেছিলাম। একটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত করতে চেয়েছিলাম আমরাই। এ সত্যটি চেপে গিয়ে, এক সময় আমরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা সেজেছিলাম। আজ এত বছর পর সেই মুক্তিযোদ্ধাদের আচরণ দেখে হা-হুতাশ করছি। ৭১-এর সংগ্রাম সম্পর্কে প্রথম থেকেই সঠিক মূল্যায়ন হলে আজকে এ হতাশা কোনোক্রমেই সৃষ্টি হতো না।

২৫ মার্চের পর একটি দাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় গ্রাম-গ্রামান্তরে। সকলেই বিভ্রান্ত কে কোন দিকে যাবে? সাধারণ হিন্দুরা ভাবছে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করাই একমাত্র কাজ। এক শ্রেণির মুসলমান ভাবছে এটা কী হলো? এ পরিস্থিতি কেন হলো? এ সংকটের সমাধান কী?

এ সময় বিপদে পড়ল আরেক শ্রেণির মানুষ। এই মানুষগুলো শহরে ছিল। শহরে পাকিস্তানি বাহিনীর হামলা হওয়ায় তারা শহর ছেড়ে গ্রামের পথ ধরেছে। পথে পথে তারা সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছে। তাদের খাবার দিয়েছে। বাড়িতে পৌঁছবার জন্যে অর্থ সাহায্য করেছে।

কিন্তু গ্রামে ফিরে এই শহরের মানুষগুলো বিভ্রান্ত হয়েছে। গ্রামে তখন লুটপাটের পরিবেশ। একদল মানুষ বুকে পাকিস্তানি পতাকা এঁকে অন্যের সম্পত্তি দখলের সংগ্রামে নেমেছে।

www.nagorikpathagar.com

৭১ এর যুদ্ধের এই প্রথম দিকে আমি বাড়িতে ছিলাম। তখন আগরতলা বেতারে বাংলাদেশের কথা শুনতাম। মনে হতো ভারত সরকার আমাদের এ যুদ্ধে সহযোগিতা করবে। কিন্তু আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম না। একটি পুঁজিবাদী দেশ বাংলাদেশের সংগ্রামে সহযোগিতা করে যুদ্ধ করে দেবে, এ তত্ত্ব কোনোদিনই আমার বিশ্বাসে আসেনি। এ সময় থানা থেকে খবর দেয়া হলো আমার গ্রামে থাকা নিরাপদ নয়। আমি পরবর্তীকালে টুঙ্গীপাড়ায় গেলাম। টুঙ্গীপাড়ায় তখন শেখ সাহেবের বাড়ি আক্রান্ত। বরিশালে এলাম বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে। আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ৪ জন সদস্যই তখন বরিশালে অবস্থান করছেন। তাঁদের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ হলো। সিদ্ধান্ত হলো তাঁরা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাবেন। বলা হলো, এবারের যুদ্ধে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়া এবং অস্ত্র সংগ্রহ করা। এ যুদ্ধকে মুক্তি সংগ্রামে পরিণত করতে হলে, এ যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলবে। সুতরাং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

এ হচ্ছে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের কথা। বরিশালে আমির হোসেন আমুর সঙ্গে দেখা হলো। সে জানালো মুজিবনগর সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ১৮ বা ১৯ এপ্রিল বরিশালে বোমা বর্ষণ করা হতে পারে। আপনি এ শহর থেকে চলে যান। ১৯ এপ্রিল বাসে গৌরনদীর টরকী বন্দরে এলাম। টরকী থেকে মেদাকুল—হিন্দুপ্রধান গ্রাম। মেদাকুল গিয়েছিলাম টাকার জন্যে। আমার এককালীন ছাত্রদের বাড়ি। গিয়ে দেখলাম সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত। মেদাকুলেই বরিশালে বোমা হামলার কথা শুনলাম। সবাইকে গ্রাম ছেড়ে বিলের দিকে চলে যেতে বললাম। কারণ পাকিস্তানি বাহিনীর বিলে পৌঁছানোর মতো কোনো যানবাহন নেই এবং সত্যি সত্যি পরবর্তীকালে হাজার হাজার মানুষ এই বিল এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে বেঁচেছিল। বিল এলাকাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল মুক্তিবাহিনী।

২০ এপ্রিল আমি আবার বাড়ি ফিরলাম। ২০ মাইল হাঁটা পথে। বাড়িতে এসে দেখি ভয় আর ভয়। আমি বাড়ি ফিরে আসায় সবাই ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু কোথায় যাব? কয়েকদিনের জন্যে বিল এলাকায় ছিলাম। সে এলাকাও নির্ভয় নয়। এবার সঙ্গী জুটে গেল। ঢাকা থেকে গ্রামে যাওয়ার একটি পরিবার ঢাকায় ফিরতে চাচ্ছে। আমি তাদের সঙ্গে রওনা হলাম নৌকায়। নৌকায় কোটালীপাড়া থেকে মাদারীপুর। মাদারীপুরে লঞ্চ পেতে হবে। লঞ্চে আসতে হবে ঢাকা। নৌকায় মোটামুটি নির্বিঘ্নে এসেছিলাম। কিন্তু বিপদ হলো মাদারীপুরে এসে। মাদারীপুরে লঞ্চ নেই। লঞ্চ ওপারে। কালিকাপুরে অসংখ্য

www.nagorikpathagar.com

যাত্রী। কিন্তু ঢাকা থেকে লঞ্চ আসছে না। সন্ধ্যার দিকে দু'টি লঞ্চ এল। খবর হলো একটি লঞ্চ ছাড়ার পর মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার কাছে সামরিক বাহিনীর লোক ৪ জন যাত্রীকে নামিয়ে নিয়ে খুন করেছে। এর মধ্যে দু'জনের অপরাধ তারা হিন্দু। অপর দু'জন আওয়ামী লীগ কর্মী। এ খবর শুনে অধিকাংশ যাত্রী বাড়ি ফিরে গেল। আর অনেক অনুনয় বিনয়ের পর একটি লঞ্চ ঢাকায় যেতে রাজি হলো। কিন্তু লঞ্চ কর্তৃপক্ষ কিছুতেই আমাকে নিতে রাজি নয়। ইতিমধ্যে আমার পরিচয় সবাই জেনে গেছে। আমার বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ—রাজনীতিক, সাংবাদিক এবং পিতার নাম বাংলায়। অন্যান্য যাত্রীরাও আমার জন্যে উৎকণ্ঠিত। আমার সহযাত্রী বন্ধু এটি নিষ্পত্তি করলেন। নিষ্পত্তি হচ্ছে পদ্মা পাড়ি দেয়ার আগে আমাকে লাউখোলায় নামিয়ে দেয়া হবে। তারপর আমার নিজ দায়িত্বে ঢাকা পৌঁছতে হবে। জীবনে লাউখোলার নাম শুনিনি। ওপথে কোনোদিন যাইনি। কিন্তু নিরুপায়। আমার সহযাত্রী বন্ধু বললেন, আপনি লাউখোলা থেকে হেঁটে জাজিরা যাবেন। জাজিরা থেকে পদ্মা পাড়ি দেবেন নৌকায়। লৌহজং থেকে যে কোনো উপায়েই হোক শ্রীনগর পৌঁছবেন। শ্রীনগর থেকে লঞ্চে সৈয়দপুর আসবেন। সৈয়দপুর বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকবেন। একা বাসে উঠবেন না। আমি সৈয়দপুর গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব।

সেদিন এ আশ্বাসে কতদূর সাহসী হয়েছিলাম আজকে মনে নেই। তবে তাঁর অনুরোধ রেখেছিলাম। লাউখোলায় হোটেলে খেতে খেতে ৪ তরুণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাদের নাম জিজ্ঞাসা করিনি। আজো তাদের চিনি না। তাদের সঙ্গে হেঁটে জাজিরা এসেছিলাম। প্রবল ঝড়ের মধ্যে নৌকায় পদ্মা পাড়ি দিয়েছিলাম। রাতে ছিলাম নাগেরবাজার এক বাড়িতে। ভোরে এসেছিলাম হলদি। হলদি থেকে শ্রীনগর। শ্রীনগর থেকে লঞ্চে সৈয়দপুর। তখন আমি একা। ওই ৪ তরুণ বাসে উঠে চলে গেছে। হাতে একটি ব্যাগ নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি সৈয়দপুর বাসস্ট্যান্ডে। কিন্তু আমার সে বন্ধু আসছিল না। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় মনে ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হলো এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে যে কেউ এক সময় চ্যালেঞ্জ করবে। তাই বাসে উঠলাম নিজ দায়িত্বে। কেরানীগঞ্জ পৌঁছে নৌকায় বুড়িগঙ্গা পার হলাম। সোয়ারীঘাটের পথ ধরে চকবাজারের দিকে এগুচ্ছি। জগন্নাথ কলেজের এক তরুণ অধ্যাপক আমাকে দেখে চিৎকার করে নাম ধরে ডেকে ফেলল। তারপর চুপসে গেল। এ সময় দেখলাম দূরে আমার সে বন্ধু দাঁড়িয়ে। আমি একা একা আসার জন্যে গালমন্দ করলেন। বন্ধুর নাম হারুন। সারাজীবন মুসলিম লীগের সদস্য। তার

www.nagorikpathagar.com

রাজনীতির প্রথম এবং শেষ নেতা খান এ সবুর। তিনি আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। আর পরবর্তীকালে শুনেছি জগন্নাথ কলেজের সেই অধ্যাপক ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন।

৭১-এর এপ্রিলের ঢাকা। সে কাহিনী লিখতে হলে মহাভারত হবে। কোন বন্ধু কোথায় আছে জানি না। কেউ প্রত্যাশা করেনি, আমি ঢাকায় ফিরব। কারণ তখন সকলেই ঢাকা থেকে পালাচ্ছিল। বন্ধু রুহুল আমিন কায়সার রায়েরবাজার স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি নবাবগঞ্জের এক গ্রামে চলে গেছেন। আরেক বন্ধু সিদ্দিকুর রহমান টিকে আছে ঢাকায়। আমার ঢাকায় আশ্রয় পাওয়া মুশকিল। চোখ-মুখে দেখে মনে হয় সবাই আমাকে ভালোবাসে। কিন্তু আশ্রয় দিতে চায় না। সকলের মুখে একই প্রশ্ন, এ সময় ঢাকায় এলেন কেন? আপনার কি জীবনের ভয় নেই?

জীবনের ভয় আমার ছিল। কিন্তু কেউ জানি না, এ যুদ্ধে আমরা কী করব। সবাই জানি একটা যুদ্ধ আসছে। সবাই সমালোচনা করেছি শেখ সাহেবকে ৭ মার্চ সুস্পষ্টভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা না দেয়ায়। অথচ কেউ কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। মনে হয়, শেখ সাহেব ঘোষণা দিলেই সব ল্যাঠা চুকে যেতো। কিন্তু অদ্ভুত রাজনীতিক আমরা। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে সকলেই ভেবেছিল, ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসভায় শেখ সাহেব সুস্পষ্ট ভাষায় বলবেন—বাংলাদেশ স্বাধীন ঘোষণা করা হলো। শেখ সাহেব একই কথা বললেন ঘুরিয়ে। আমরা কেউ খুশি হলাম না। বিশেষ করে সমালোচনার ঝড় উঠলো বামপন্থী মহলে। আমরা তত্ত্ব দিয়ে প্রমাণ করলাম, এ ধরনের স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়া বুর্জোয়া নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন যুদ্ধ এসে গেল তখন অনুধাবন করতে পারলাম, তত্ত্ব দেয়া ছাড়া আমরা কোনো কিছুই করিনি। সংগ্রামের জন্যে নিজের দলকেও প্রস্তুত করিনি। শুধুমাত্র দলের নামের প্রথমে পাকিস্তান বা পূর্ব পাকিস্তান কেটে বাংলাদেশ প্রতিস্থাপন করেছি। আর দেখছি এ পরিস্থিতিতে ভারত সরকার এগিয়ে আসছে সহযোগিতা করতে। সুতরাং আমার পালাবার পথ কোথায়? আমাকে ঢাকা আসতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে বসতে হবে। বুঝতে হবে এ যুদ্ধ কোনদিকে গড়াবে। এ যুদ্ধে আমাদের ভূমিকা কী হবে? এই চিন্তা থেকেই আমি বাড়ি থেকে ঢাকা এসেছিলাম। শুধু বাড়ির লোককে বলে এসেছিলাম, যত হামলাই হোক বাড়ি ছাড়া যাবে না। শত হামলার মুখে আমার স্বজনরা সে ভূমিকাই পালন করেছিল। যদিও পরবর্তী মাসগুলোতে আমি তাদের কোনো খবর রাখতে পারিনি। সাহায্য সহযোগিতাও করিনি।

www.nagorikpathagar.com

ঢাকা এসে সিদ্ধান্ত হলো, নবাবগঞ্জে যেতে হবে। নবাবগঞ্জে রুহুল আমিন কায়সার আছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। খবর পেলাম ইতিমধ্যে আমাদের কিছু সদস্য সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলা ও কলকাতায় গিয়েছে। তারা যোগাযোগ করেছে আমাদের এককালীন রাজনীতিক বন্ধু বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল আরএসপির নেতাদের সঙ্গে। আমাদের ছেলেরা কুষ্টিয়া সীমান্তে ভারতের মাটিতে প্রথম শিবির গড়ে তুলেছিল।

নবাবগঞ্জে সিদ্ধান্ত হলো আমাকে কোলকাতা যেতে হবে। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ও ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। কিন্তু আমার যাওয়া তেমন সহজ ছিল না।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়। আমার মা-ভাইবোন সকলেই ভারতে চলে যায়। ১৯৪৮ সালে আমি জেলে চলে যাই। জেল থেকে ফিরতে ফিরতে পাঁচ বছর। তারপর জেল আর আত্মগোপন করতে করতে ষাটের দশক এসে গেলো। আর ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত ২৩ বছর পাকিস্তান সরকার কোনোদিন আমাকে পাসপোর্ট দেয়নি। ওই ২৩ বছর আমার সঙ্গে দেখা হয়নি মা-ভাই বোনদের। ২৩ বছর পর আমাকে বলা হচ্ছে, আমাকে এবার ভারত যেতে হবে। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে। সীমান্ত অতিক্রম করে। এই পালিয়ে যাওয়া নিয়ে আমার কাছে একটা মানসিক প্রশ্ন উঠেছিল।

ইতিমধ্যে আমি রায়েরবাজারে আশ্রয় পেয়েছি। আশ্রয়দাতা আমাদের নগর কমিটির সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন—সে এক অদ্ভুত মানুষ। তিনি আমাকে আশ্রয় দিলেন। তাঁর স্ত্রী পুত্র কেউই জানত না, আমি কে। লক্ষ্মীপুরের এক মওলানা সাহেব তাঁর বাড়িতে গৃহশিক্ষক ছিলেন। ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষা দেয়া ছিল তাঁর দায়িত্ব। এই মওলানা সাহেব এবার বাড়ি গেলেন। তাঁর পদে আমি নিযুক্ত হলাম। ধর্ম শিক্ষা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মোহাম্মদ হোসেনের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমি রাজনীতির গল্প করতাম। যাবার আগে মওলানা সাহেব বললেন, হুজুর আপনি তো আদৌ পড়াচ্ছেন না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সারাদিন নকশালদের মতো গল্প করেন। এ পরিস্থিতিতে স্থির হলো আমি ভারতে যাব। আমার সঙ্গে যাবে আমাদের নরসিংদীর অন্যতম কর্মী কাজী হাতেম আলী।

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। একদিন দুপুরে মোহাম্মদ হোসেনের হোন্ডার পেছনে চড়ে আমি ডেমরার ওপারে তারাবো পৌঁছলাম। তারাবোতে নরসিংদীগামী বাস। তারাবোতে হাতেম আলীকে সঙ্গে নিয়ে এসে উঠলাম। লক্ষ করলাম বাসে সব যাত্রী আমাদের চেনা। আমাদের নামতে হলো মাধবদী।

www.nagorikpathagar.com

মাধবদী থেকে মেঘনার পাড়। রাত কাটিয়ে পরের দিন করিমপুর। করিমপুর থেকে খানাবাড়ি হয়ে দু'দিন পর নবীনগর। নবীনগর থেকে ভারত সীমান্ত। একদিন সন্ধ্যার আঁধারে আমি আর হাতেম আলী অচেনা আগরতলা শহরে পৌঁছলাম। হোটেলের সামনে নতুন এক দেখা দেখলাম। কে যেন লিখে রেখেছে হিন্দু হোটেলের সামনে— হিন্দু মুসলমান বুঝি না, বাঙালি ছাড়া চিনি না। অর্থাৎ আগরতলা শহরের রূপান্তর হচ্ছে। অসংখ্য বাঙালি হিন্দু অধ্যুষিত আগরতলা শহরের সীমান্তের ওপার থেকে অসংখ্য বাঙালি এসেছে। সবাই মিলে একাকার হয়ে গেছে। সবাই বাঙালি। সব হোটেলেরই দুয়ার খোলা। আমি এবং হাতেম আলী একটি মুসলিম হোটেলে গিয়ে উঠলাম। একজনের ঘুমাবার মতো এক চিলতে একটি খাট দু'জনে ভাড়া করলাম। কারণ আমাদের সঙ্গে সীমিত টাকা। জানি না কে কীভাবে আমাদের সাহায্য করবে। এবার শুরু হলো ৭১-এর ভারতীয় জীবন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আরেক দৃশ্য। আরেক ছবি।

আগরতলায় পৌঁছে মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। সীমান্ত পাড়ি দেয়ার দিন মনটা খারাপ ছিল। সূর্য তখন পশ্চিমে হেলে গেছে। আমরা ৭ জন সীমান্তে দাঁড়িয়ে। আমি, কাজী হাতেম আলী ও নরসিংদীর আরো ৫ জন তরুণ। সীমান্ত পাড়ি দেয়ার আগে আমার মনে হলো, এভাবে চোরের মতো পালিয়ে ভারতে যাব না। ২৩ বছর পাকিস্তান সরকার পাসপোর্ট দেয়নি। তবুও পাকিস্তানের ভয়ে চোরের মতো দেশ ছেড়ে পালাইনি। আমি প্রস্তাব করলাম, চলো আমরা ঢাকায় ফিরে যাই।

কিন্তু সঙ্গীরা রাজি হলো না। তারা বলল, কোথায় উঠবেন। কে আমাদের জায়গা দেবে? ইচ্ছে হলেই আবার নবীনগর হয়ে ঢাকা ফিরে যাওয়া সম্ভব কি? আমি বুঝতে পারলাম ওদের নিয়ে ঢাকায় ফিরে যাওয়া যাবে না। এবার সবাই মিলে একটা কাজ করলাম। বাংলাদেশের সীমান্ত পার হওয়ার আগে বাংলাদেশের কিছুটা মাটি সবাই পকেটে নিলাম। বললাম, যেখানেই মরি না কেন আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশের মাটি থাকবে। আজ এত বছর পরে মনে হচ্ছে কী ছেলেমিই না করেছি। বাস্তবের কঠিন আঘাতে সে ভাবাবেগ খান খান হয়ে ভেঙে গেল ভারতের মাটিতে।

আগরতলার মাটিতে কত স্রোত। কত লোক। কত মত। আজ হয়তো তা নিশ্চিত করে বলতে পারব না। কিন্তু অনেকেই বারবার আমার লেখা পড়ে উষ্মা প্রকাশ করেন। কারণ আমি বানিয়ে লিখতে পারি না। তাই বানিয়ে লেখার কাহিনীর সঙ্গে আমার মতানৈক্য ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে।

www.nagorikpathagar.com

আগরতলায় গিয়ে প্রকৃতপক্ষে বিপদে পড়ে গেলাম। আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে বিভাজন একান্তই স্পষ্ট। আওয়ামী লীগের উপদলীয় কোন্দল এবং আওয়ামী লীগ বনাম অন্যান্য দলের কোন্দল সকলের কাছেই জানা ব্যাপার। আগরতলায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের দফতরের নাম হচ্ছে জয়বাংলা অফিস। এ জয়বাংলা অফিসের দায়িত্বে একান্তভাবেই আওয়ামী লীগ কর্মী এবং নেতারা। অন্যান্য দলের অনুপ্রবেশ সেখানে কঠিন। সুসম্পর্ক না থাকলে জয়বাংলা অফিস থেকে অন্যান্য দলের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ নেতৃত্ব তাজউদ্দিনের নেতৃত্ব মানতে চাচ্ছে না। তাজউদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে তারা বৈঠক করছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে ন্যাপ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোনো সমঝোতা হয়নি। তাই ন্যাপকে আগরতলায় জনসভা করতে দেখেছি ঐক্যফ্রন্ট গঠনের দাবিতে।

এই মতানৈক্য ও ঝগড়াঝাটির মধ্যে দেখেছি হাজার তরুণকে আগরতলার রাস্তায় ভিড় জমাতে। ওরা গ্রাম থেকে এসেছে। ওরা জানে না কোথায় যাবে। কোথায় ট্রেনিং নেবে। কীভাবে যুদ্ধ করবে। কোনো রাজনৈতিক নেতার কৃপাদৃষ্টি না পড়লে এরা যে মুক্তিযুদ্ধ যেতে পারবে না, এ ধারণাও তাদের ছিল না। ফলে অনেক তরুণকেই যুদ্ধ না করে দেশে ফিরতে হয়েছে। হয়তো দেশে এসে তারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাবি করেছে বা সীমান্তের ওপারে যাবার জন্যে গর্ব অনুভব করেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই রাইফেলের বাট পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনি। নেতৃত্বের ব্যর্থতায় পরবর্তীকালে এই শ্রেণির তরুণেরাই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যা করবার নয়, তাই করেছে।

তবে কাহিনী এখানেই শেষ নয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র সীমান্তের ওপারে গিয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছিল। তাদের প্রশিক্ষণের প্রথম দিকে তাদের রাজনৈতিক প্রশ্ন তখন মুখ্য হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ১৯৭১ সালের মে মাসে আমি দেখলাম রাজনৈতিক প্রশ্ন তখন মুখ্য হয়ে উঠেছে। ডানপন্থী বামপন্থী নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বামপন্থী বলে পরিচিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তরুণদের ফ্রন্টে যেতে দেয়া হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত এদের অনেকেই প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের বা দলের উদ্যোগে বাংলাদেশে এসে ঢুকেছে। নিজের এলাকায় নিজের মতো করে. যুদ্ধ করেছে। আগরতলা পৌঁছবার পূর্বে এ দৃশ্য দেখবার ধারণা আমার ছিল না।

www.nagorikpathagar.com

আরেকটি চিত্র দেখছি শরণার্থী শিবিরে। আগরতলায় শরণার্থীদের শতকরা ৯০ জনই হিন্দু সম্প্রদায়ের। যুদ্ধের কারণে সীমান্তের অসংখ্য মুসলমান পরিবারও আগরতলায় আশ্রয় নিয়েছে। লক্ষ্য করেছি অধিকাংশ শরণার্থী শিবিরে যুদ্ধ বিগ্রহের কোনো খবর নেই। অধিকাংশ হিন্দু ধরে নিয়েছে তাদের আর দেশে ফেরা হবে না। ১৯৪৭ সালের পরে বারবার তারা আক্রান্ত হয়েছে। পাকিস্তানে কোনো রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা দিলেই তারা হয়েছে প্রথম শিকার। এবারও তারাই প্রথম বিপদে পড়েছে। তারা জানে না এ যুদ্ধ কবে শেষ হবে। তারা জানে না বাংলাদেশ কবে স্বাধীন হবে। শুধু এইটুকু জানে যে, তাদের পক্ষে সেকালের পূর্ব পাকিস্তানে কোনোদিন ফিরে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। তাই তাদের স্থায়ী আশ্রয় খুঁজতে হবে। চাকরি খুঁজতে হবে। বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে বিয়ে দিতে হবে। তাদের কাছে যুদ্ধ অনেক গৌণ। প্রতিদিনের সমস্যাই মুখ্য। লাইনে দাঁড়িয়ে রেশন নিতে হবে। সরকারি সাহায্য নিতে হবে। ফলে দেখা গেল হিন্দু যুবকদের মধ্যে ভয়ভীতি আবেগ উচ্ছ্বাস থাকলেও যুদ্ধে তারা যোগ দিচ্ছে না। যদিও তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য।

অপরদিকে মুসলমান যুবকদের চোখে ভিন্ন চিত্র। তাদের বাড়ি ফিরতে হবে। সে বাড়ির নাম পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের নাম বাংলাদেশ না হলে তাদের দেশে ফেরা সম্ভব না। দেয়ালে তাদের পিঠ ঠেকে গেছে। যুদ্ধ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ তাদের চোখের সামনে নেই। আগরতলায় পৌঁছবার পূর্বে এ ধরনের কথা মনে কোনোদিনই জাগেনি।

তাই আগরতলা পৌঁছে বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। ভাবলাম তাহলে কী হচ্ছে? আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, দলীয় পরিচয় দিয়ে এখানে কোনো প্রশিক্ষণ নেয়া যাবে না। ব্যক্তি হিসেবে আমি পরিচিত বলে আমি হয়তো কিছু সুযোগ-সুবিধা পাব। কিন্তু আমাদের দলের কারো পক্ষে সরাসরি রিক্রুট হয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যাওয়া সম্ভব নয়। রিক্রুটের কালে রাজনৈতিক পরিচয় হবে বড় পরিচয়। আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকলে প্রশিক্ষণের জন্যেও গ্রহণযোগ্য হবে না।

এ পরিস্থিতিতে আর এক বিপদে পড়লাম কাজী হাতেম আলীকে নিয়ে। তার প্রচণ্ড জ্বর। আমি ভাবছি তখন কলকাতা যাবো। মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে কথা বলব।

তবে আগরতলায় তখন আমরা একেবারে নিঃসহায় নয়। স্থানীয়ভাবে কিছুটা সাহায্য পাচ্ছিলাম ত্রিপুরার বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল আরএসপির কাছ থেকে। এছাড়া ত্রিপুরার বাঙালিরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের সকলকেই

www.nagorikpathagar.com

বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। তখন ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল ১৬ লাখ আর মুক্তিযোদ্ধা এবং শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ১৪ লাখ। ওই ১৬ লাখ মানুষ আমাদের সর্বদা পাশে দাঁড়িয়েছিল। কারণ এদেরও একটা আবেগ ছিল। এরা পাকিস্তান সৃষ্টির পর বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে ত্রিপুরা এসে আশ্রয় নেয়। এদের একটা স্মৃতি আছে। সেই স্মৃতি আঁকড়ে ধরে তারা বাঁচতে চায়। সেই স্মৃতি তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ৭১-এর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই স্মৃতি তীব্র আবেগের সৃষ্টি করে। এ আবেগের জন্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ১৪ লাখ বাঙালিকে তারা কোলে তুলে নিয়েছিল। যে কোনো কারণেই হোক এ সত্যতা কোনোদিন কারো কলমে আসেনি।

আমরা বারবার ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই ৭১-এর সহযোগিতার জন্যে। কিন্তু কেউই মনে করার চেষ্টা করি না যে, ত্রিপুরা পশ্চিমবাংলা এবং আসামের বিস্তীর্ণ এলাকায় বাঙালিরা না থাকলে আমাদের কী হতো। সে বাঙালি আমাদেরই লোক। এপারের বাঙালি ওপারে গিয়ে উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুর মর্মজ্বালা থেকেই তারা লাখ লাখ উদ্বাস্তুকে জায়গা দিয়েছে। স্নেহ ভালোবাসা দিয়েছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ববাসীর কাছে কোটি কোটি বাঙালি উদ্বাস্তুর কথা বলেছেন। বলেছেন, এ সঙ্কটের কোনো সমাধান না হলে এই উদ্বাস্তুদের ভরণ-পোষণ তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি কোনোদিনই উল্লেখ করেননি, এই উদ্বাস্তুদের অনেকেই সাহায্য এবং সহযোগিতা পেয়েছেন তাঁদের নিজেদের স্বজনদের কাছ থেকে। ভারতবর্ষের সীমান্ত এলাকায় বাঙালিরা না থাকলে অবস্থা কী দাঁড়াতো আজ বোধ হয় তা কল্পনা করা যায় না।

এ পরিস্থিতি আগরতলায় আমাকে বিব্রত করত। সেখানে আলাপ করার মতো তেমন কেউ ছিল না। আগরতলার খেলার মাঠে থাকতেন সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য। তিনি কোলকাতার দৈনিক যুগান্তরের প্রতিনিধি। এক সময় তিনি বাংলাদেশের খবরাখবরের মধ্যমণি হয়ে গেলেন। আগরতলা হয়ে যারা ভারতে ঢুকেছেন, তাঁরা সকলেই তাঁর বাসায় থেকেছেন। তাঁর বাসায় সকল দলের ভিড়। সকলেই সেখানে থাকতেন। আগরতলায় কোনো সমস্যা নিয়ে আলাপ করতে হলে অনিল দা-ই ছিল একমাত্র ভরসা।

এমন সময় খবর পেলাম অতীন দা আগরতলায় এসেছেন। অতীন দা হচ্ছেন কুমিল্লার অতীন্দ্রমোহন রায়। অগ্নিযুগের বিপ্লবী। অশীতিপর বৃদ্ধ মানুষটি আগরতলায় পৌঁছালেন প্রায় নিঃস্ব হয়ে।

www.nagorikpathagar.com

অতীন দা'র একমাত্র পুত্র অসীম রায় চৌধুরী কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের রসায়নের ডেমোনেস্ট্রেটর। একমাত্র কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে। কুমিল্লার বাড়িতে পুত্র ও পুত্রবধু নিয়ে তিনি থাকতেন। পাকিস্তান বাহিনী হামলা শুরু করার পর অতীন দা'র বাড়ি আক্রান্ত হয়। তাঁর পুত্র অসীমসহ পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায় দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকেও। অসীম এবং ধীরেন বাবু আর ফিরে আসেননি ক্যান্টনমেন্ট থেকে। অতীন দা' চলে এসেছেন আগরতলায়। কুমিল্লায় রয়ে গেছে অজন্তা। তাঁর পুত্রবধূ। আমি অতীন দা'র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখলাম অতীন দা'র কোনো পরিবর্তন নেই। কুমিল্লায় যে অতীন দা'কে দেখেছি, সেই অতীন দা'কেই আগরতলায় দেখলাম। অতীন দা সম্পর্কে বিপ্লবী প্রতুল গাঙ্গুলীর একটি মন্তব্য আছে। প্রতুল গাঙ্গুলী ছিলেন অনুশীলন সমিতির প্রধান নেতা। তিনি লিখেছেন, অতীনের কাছ থেকে কথা বের করা খুবই মুশকিল। অনুশীলন সমিতির নীতি হচ্ছে, কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। অতীন দা তার জীবনে পার্টির নির্দেশে পুলিশের দুই সহযোগীকে খুন করেছিলেন, আমৃত্যু সে কথা কাউকে কোনোদিন বলেননি। দলের নেতা হিসেবে জানতেন প্রতুল গাঙ্গুলী। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে প্রতুল গাঙ্গুলী সে কথা লিখে গেছেন। আমিও কোনোদিন চেষ্টা করে অতীন দা'র কাছ থেকে সে কথা জানতে পারিনি। সেই নিশ্চুপ নীরব অতীন দা'কে আবার আগরতলায় দেখলাম। আগ বাড়িয়ে তিনি আমাকে বললেন না যে, পাকিস্তানি বাহিনী অসীমকে ধরে নিয়ে গেছে। অসীম ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফিরে আসেনি।

আগরতলায় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আবদুল গাফফার চৌধুরী ও অধ্যাপক পুলিন দে'র সঙ্গে। গাফফার আমাকে বলেছিল, আপনি লুঙ্গি পরে দাঁড়ি রেখে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? আমি বলেছিলাম আমি প্রকাশ্যে ঘুরতে চাই না। আমি আমার বাংলাদেশে ফিরে যাব। গাফফার হেসেছিল।

পুলিন বাবু বললেন, চলো তোমাকে এক কংগ্রেস নেতার কাছে নিয়ে যাই। কংগ্রেস নেতার নাম সুখময় সেনগুপ্ত। তিনি পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। সুখময় বাবুর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা আমাদের সাহায্য করছেন কেন? পাকিস্তান ভারতের এক নম্বর শত্রু। সেই পাকিস্তানে সংঘর্ষ হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে মার খেয়েছে হিন্দুরা। তারপর মার খাচ্ছে সকল সম্প্রদায়। দুর্গত হিন্দুদের জন্যে আপনারা সীমান্ত খুলে দিলে তার একটা অর্থ হয়। সকল সম্প্রদায়ের জন্যে সীমান্ত খুলে দিলেন কেন? আমাদের আশ্রয় দিচ্ছেন এবং যুদ্ধের জন্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন কেন?

www.nagorikpathagar.com

সুখময় বাবু কিছুটা বিমর্ষ হলেন। হয়তো এ ধরনের প্রশ্ন আগরতলায় গিয়ে কেউ করেনি। পুলিন বাবুও কিছুটা হতবাক হলেন। সুখময় বাবু বললেন, এ প্রশ্নের জবাব একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীই দিতে পারেন। আপনি নয়াদিল্লি গিয়ে তাঁকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।

কথা জমল না। সুখময় বাবু আমার আত্মীয়-স্বজনের কথা জানতে চাইলেন। বললেন, আগরতলায় অভিজাত এলাকায় আমার নাকি অনেক আত্মীয় আছে। তিনি বললেন, আপনি হোটেল ছেড়ে তাদের বাসায় উঠুন। আমি রাজি হলাম না। পাকিস্তান হয়েছে ১৯৪৭ সালে। তারপর ২৩ বছর কেটে গেছে। এই ২৩ বছরে আমি ভারতে যাইনি। অধিকাংশ সময় কেটেছে জেলে অথবা পুলিশ এড়িয়ে আত্মগোপন করে। কোনো আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আমার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। আর একাত্তর সালে আগরতলার সকল বাঙালিই বিপর্যস্ত। সকলের বাড়িতেই শরণার্থী। এই পরিবেশে কাউকে বিব্রত করার ইচ্ছে আমার ছিল না। তাই হোটেলে ফিরে গেলাম।

এবার সিদ্ধান্ত হলো, কোলকাতা যেতে হবে। আরএসপির পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত হয়ে আমাদের অনেক বন্ধু ভারতে ঢুকেছে। কে কোথায় আছে জানি না। সকলের খোঁজ নিতে হবে। সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে যুদ্ধের জন্যে প্রশিক্ষণ নেয়ার এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে আমার কোলকাতায় যাওয়া একান্ত জরুরি।

কিন্তু কোলকাতায় যাওয়া আমার পক্ষে সহজ ছিল না। ১৯৪৭ সালের পর আমার মা-ভাই-বোন সকলেই ভারতে। তাদের সঙ্গে আমার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের বাড়িতে কাকা আছেন। তবে জেল আর পুলিশ এড়াতে গিয়ে আমার পক্ষে বাড়ি যাওয়া হয়নি। দেশের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কটাই ক্ষীণ।

তাই পশ্চিমবঙ্গ গেলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে। মা-ভাই-বোন হয়তো কেউই রাজি হবে না আমাকে আবার বাংলাদেশে ফিরে যেতে দিতে। অথচ আমাকে বাংলাদেশে ফিরতেই হবে। যুদ্ধের মধ্যেই বাংলাদেশে আসতে হবে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে। টাকা সংগ্রহ করতে। দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্যে ভারতে নিয়ে যেতে। তাই স্থির করলাম আমি পশ্চিমবঙ্গে যাব। কিন্তু মায়ের সঙ্গে দেখা করব না। মার সঙ্গে দেখা হবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে।

আগরতলা থেকে কোলকাতা যাওয়ার দু'টি পথ আছে। একটি বিমান। অপরটি সড়ক পথে। বিমানে যাওয়ার মতো টাকা ছিল না। তাই সড়ক পথেই

www.nagorikpathagar.com

যাত্রা শুরু করলাম। সড়ক পথ একান্তই দুর্গম। আগরতলা থেকে পাহাড়ি পথে ধর্মনগর ১২৮ মাইল। একদিনে পৌঁছানো যায় না। ধর্মনগর থেকে ট্রেন যায় লামডিং। লামডিং থেকে কলকাতার ট্রেন। কোনো পথেই আমার জানা ছিল না।

৩৬ ঘণ্টায় আগরতলা থেকে ধর্মনগর পৌঁছলাম। লামডিং পৌঁছলাম পরদিন বেলা দু'টায়। সামনে একটি ট্রেন পেয়ে উঠে পড়লাম। জানতাম না ট্রেনটি যাচ্ছিল দিল্লি। ট্রেনটি ছিল সামরিক বাহিনীর জন্যে রিজার্ভ। আমি ছাড়া কোনো বেসামরিক ব্যক্তি ওই ট্রেনে উঠল না। ট্রেনে দেখা হলো বিহার রেজিমেন্টের সদস্যদের সঙ্গে। তখন বাংলাদেশের মানুষের কোনো অপরাধই অপরাধ বলে গণ্য হতো না। জয় বাংলা শব্দটি শুনলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। বিহার রেজিমেন্টের লোকেরা আমাকে লুফে নিল। সাংবাদিক জেনে সব কথা জানতে চাইল। গল্প করতে করতে রাত কেটে গেল। ওরাই আমাকে খাওয়াল। পরের দিন দুপুরের দিকে জিজ্ঞাসা করলো—তুমি তো কলকাতা যাবে। আর এ ট্রেনতো যাচ্ছে দিল্লি। তুমি নামবে কোথায়? এবার আমার সম্বিত ফিরল। আমাকে নামতে হলো বিহারের বাবঙ্গিনী স্টেশনে। বলা হলো, ওখানে হাওড়া যাওয়ার ট্রেন আছে। তুমি ওই ট্রেনে কলকাতা পৌঁছতে পারবে।

আমার মা আসানসোলে থাকতেন। আমার সিদ্ধান্ত ছিল আসানসোল এড়াতে হবে। আসানসোল হয়ে কলকাতায় যাওয়া যাবে না। এখন মার সঙ্গে দেখা করলে বাংলাদেশে ফিরতে অসুবিধা হতে পারে। অথচ আমি জানতাম না যে ট্রেনটায় আমি চেপেছি ওই ট্রেন আসানসোলে দাঁড়াবে। কোনো খবর না রেখেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ভোরের দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম ট্রেনটি নড়ছে না। স্টেশনের নাম আসানসোলে। মনটা কেমন হয়ে গেল। মা-ভাই-বোন সকলের কথাই মনে পড়ল। কিন্তু আমার নামা হলো না। কলকাতায় গিয়ে আরএসপি অফিসে উঠলাম।

কলকাতা এক ভিন্ন জগত। ১৯৪৮ সালে কলকাতা ছেড়েছি। ২৩ বছর পর আবার কলকাতায় এলাম। খুব একটা অচেনা লাগেনি। শুধু বিব্রত হয়েছি মানুষের প্রশ্নে। সকলেই বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে চায়। শেখ মুজিবুর রহমান তাদের কাছে এক কিংবদন্তী পুরুষ। বাংলাদেশের রাজনীতি তাদের কাছে বোধগম্য নয়। তারা বুঝতে পারছে না কী করে এমন হতে পারে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত একটি দেশের মানুষ কী করে একটি

www.nagorikpathagar.com

ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে সংগ্রামে নামতে পারে তাও মাত্র ২৩ বছরের মাথায়।

তবে এরপরেও কোলকাতার একটি ভিন্ন চিত্র আছে। বিরাট কোলকাতায় বাংলাদেশের যুদ্ধের কোনো ছাপ নেই। বাংলাদেশের যুদ্ধ আছে পত্রিকায় পাতায়, দেয়ালের প্রচারপত্রে, এককালের উদ্বাস্তুদের ঘরে ঘরে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শরণার্থী শিবিরে। কলকাতা শহরে বাংলাদেশের সংগ্রাম অনুভব করা যায় না।

সেদিক থেকে আগরতলা অনেক ভালো। সীমান্তের কাছাকাছি আগরতলার অসংখ্য চেনা মানুষ আছে। মুক্তিবাহিনীর লোক আছে। আবহাওয়ায় একটি যুদ্ধের ছাপ আছে। আগরতলার আলোচনা একটিই—বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ। যুদ্ধ আর যুদ্ধ। বাংলাদেশ নিয়ে যুদ্ধ।

বুঝলাম কলকাতায় থাকা হবে না। যুদ্ধের কাছাকাছি যেতে হবে। ফিরে যেতে হবে আগরতলায় আর বাংলাদেশে। সম্ভব হলে কলকাতার কিছু আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। যাওয়া যাবে না আসানসোলে।

এ কথা ভেবেই একদিন বিকেলে বড় বোনের বাসায় গেলাম। ২৩ বছর বড় বোন আমাকে চিনতেই পারলেন না। চিনল তার প্রথম সন্তান। আমাকে না জানিয়ে বড় বোন টেলিগ্রাম করেছিল আসানসোলে। আরএসপি অফিসে এসে শুনলাম আসানসোল থেকে দুই ভাই এসেছিল আমাকে নিতে। শুনে গেছে আমি এই মুহূর্তে আসানসোল যাচ্ছি না। অনুনয় বিনয় করে গেছে আরএসপি নেতাদের কাছে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

আমি তখন যুদ্ধের নেতাদের খুঁজছিলাম। মহাত্মা গান্ধী রোডে প্রয়াত ফণী ভূষণ মজুমদারের সঙ্গে এক হোটেলে দেখা হলো। এখানে অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদও থাকতেন। শুনলাম আমাকে নাকি খোঁজা হচ্ছিল স্বাধীন বাংলা বেতারের জন্যে। ফনী বাবু বললেন, তুমি একবার বালাগঞ্জে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যাও। আমি রাজি হলাম না।

ইতিমধ্যে আমাদের দলের কিছু ছেলেদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওরা কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া সীমান্ত ঢুকেছিল। সীমান্ত এলাকায়। ওখানে ওরা মুক্তিবাহিনীর শিবির গড়ে তুলেছে। ওটাই বোধ হয় ভারতের মাটিতে প্রথম মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প। ওখান থেকে আমাদের কিছু কিছু ছেলে ট্রেনিং নেবার জন্যে বিহারের চাকুলিয়ায় গিয়েছে। প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে গেছে যুদ্ধ করার জন্যে। তবে পরবর্তীকালে এই ক্যাম্পটি নিয়ে একটি ভিন্ন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। এই ক্যাম্প সফরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও

www.nagorikpathagar.com

সেনাবাহিনী প্রধান ওসমানী এসেছিলেন। ছেলেদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলা সরকার এই ক্যাম্পটিকে বাতিল করেন। কারণ এই ক্যাম্প বামপন্থীদের দখলে। ৭১ সালের এই ঘটনা আজকে অনেককে হয়তো অবাক করবে। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা সেকালে অনেক ঘটেছিল। যা আজকে বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আমি ঠিক করলাম আগরতলা ফিরব। আগরতলা হয়ে বাংলাদেশ। বন্ধুরা বলল একটু অপেক্ষা করুন। ২৯ জুন ইয়াহিয়া খান ভাষণ দেবে। ওই ভাষণে নতুন কিছু থাকতে পারে। ওই ভাষণের পরই আপনি দেশে ফিরে যেতে পারেন।

আমার সেদিন কৌতুক অনুভব হয়েছিল। আমরা যুদ্ধ করছি। যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করব। এটাই আমাদের শপথ ও প্রতিজ্ঞা। অথচ আমরা সবাই অপেক্ষা করছি ইয়াহিয়া খানের ভাষণের জন্যে। আমরা ভাবছি হয়তো বা একটা আপোষ হবে।

আমাদের কারো কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নেই। কারো চোখের সামনে সুস্পষ্ট কোনো ভবিষ্যতের দৃষ্টি নেই। অথচ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। প্রাণ দেয়ার এবং নেয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেছে। আমি ভাবলাম কোলকাতায় থেকে কোনো লাভই হবে না। ইয়াহিয়া খানের ২৯ জুনের ভাষণ শুনলাম। সে ভাষণে কিছুই ছিল না। আমি আগরতলা ফিরে এলাম। মা ভাই বোন কারো সঙ্গে দেখা না করেই।

ফিরে দেখি ভিন্ন পরিস্থিতি। শহরটা গিজগিজ করছে। আরো শরণার্থী এসেছে। এসেছে মুক্তিযোদ্ধা। আরএসপি আমাদের একটি থাকার জায়গা দিয়েছে মঠ চৌমুহনীতে। আরএসপির অঙ্গ সংগঠন প্রগ্রেসিভ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (পিএসইউ)। এই পিএসইউ অফিসে আমাদের জায়গা হয়েছে। ঘরটি খুব বড় নয়। নিজেদের রান্না করতে যেতে হয়। মেঝেতে ঘুমাতে হয়। শরণার্থীদের ভাগ থেকে কয়েকটি কম্বল পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে কয়েকটি মশারী। খাওয়া নিয়ে প্রায়ই গোলমাল হয়। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় আগরতলায় সব কিছুরই দাম বেশি। প্রায় সবকিছুর দাম কেজি প্রতি ১ টাকা ২০ নয়া। এই নয়া শব্দটি শুনলেই আমাদের ছেলেরা হাসে। তখন ভারতে নয়া পয়সা চালু হয়েছে। ৬৪ পয়সার এক টাকার পরিবর্তে চালু হয়েছে একশ' পয়সার এক টাকার দশমিকের হিসাব। আমাদের ছেলেরা এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ নয়। তাই বাজারে গিয়ে কখনো ঠকে কখনো জেতে।

www.nagorikpathagar.com

আমাদের নিয়মিত খাবার ডাল, ভাত ও মিষ্টি কুমড়া। মাছ এবং ডিমের খুব দাম। সব কিছুই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগরতলায় আমদানি। সীমান্তে যুদ্ধের তীব্রতা বাড়লে আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। ডিম, মাছ, তারকারির দাম বাড়ে।

আমাদের হয়েছে ভিন্ন ধরনের বিপদ। আমরা আওয়ামী লীগ করি না। ন্যাপ কিংবা কমিউনিস্ট পার্টিও করি না। স্বাধীন বাংলা সরকারের কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা কম। আমাদের আগরতলার বন্ধুরা আরএসপি করে। তাদের সঙ্গে আগরতলার কংগ্রেসের সম্পর্কও ভালো নয়। তাই সেদিক দিয়েও আমাদের প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করতে হয়েছে।

আমাদের ঘরের পেছনে একটি পুকুর আছে। আমি ইচ্ছা করলেও ওই পুকুরে স্নান করতে পারি না। পুকুরের তিন দিকে আবাসিক এলাকা। পুকুরের ঘাটে ছেলে মেয়েদের ভিড় থাকে। আমাদের বন্ধু শ্রমিক নেতা মিসির আহমদ নির্বিঘ্নে ওই ঘাটে গিয়ে স্নান করে আসেন। কিন্তু আমার পক্ষে বিপদ। আমার পরনে লুঙ্গি এবং মুখ ভর্তি দাড়ি। একেবারে মাওলানা সাহেব। আমাকে কিছু দূর হেঁটে কলেজ টিলায় গিয়ে স্নান করে আসতে হয়।

আগরতলার একটি ভিন্ন রূপ আছে। এককালে রাজাদের শাসনে ছিল। সড়কগুলোর একটি ভিন্ন রূপ আছে। এই সড়কগুলোর নামের মধ্যে চৌমুহনী শব্দটি থাকে। যেমন আমরা ছিলাম মঠ চৌমুহনীতে। তেমনি নাম আছে কামান চৌমুহনী। আগরতলায় আমার বেশি কাজ ছিল না। নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা ছাড়া। দুশ্চিন্তা ছিল অনেক। দেশ থেকে লোক আসছে। কিন্তু ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে পারছি না। এর মধ্যে একদিন শ্রমিক লীগের আব্দুল মান্নান এবং আদমজীর সাদুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওদের সঙ্গে ওদের ক্যাম্পে চলে গেলাম। এক সময় এ দু'জনই আমাদের দলের লোক ছিল। বলা যেতে পারে এদের রাজনৈতিক জীবন আমাদের হাতেই শুরু। আওয়ামী লীগ ৬ দফা দাবি পেশ করার পর এদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শিথিল হয়। তবে ছিন্ন হয়নি। সাদু বলল, মুক্তিযুদ্ধে যেতে হলে আমাদের কাছে লোক পাঠাবেন। আমরা শ্রমিক লীগের কোটায় ভর্তি করাব। আপনার নাম করে কেউ এলে কোনো অসুবিধা হবে না।

সাদুদের ক্যাম্পে ভাত খেয়ে নিজের এলাকায় ফিরলাম। এরকম ভাত খাওয়ার বহু বাড়ি আমার ছিল। কিন্তু বন্ধুদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতাম না। খাবার সময় কোনোদিন ডিম জুটলে ভাবতাম খুব ভালো খেয়েছি।

একদিন রাস্তায় প্রকৌশলী মানিক গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

www.nagorikpathagar.com

কুমিল্লার অধিবাসী মানিক গাঙ্গুলীর প্রকৃত নাম তুষার গাঙ্গুলী, ওয়াপদা প্রকৌশলী। মানিক বাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার পরিচিতির পরিধি বাড়ল। দেখা হলো জগদীশ কুণ্ডের সঙ্গে। জগদীশ বাবুর স্ত্রী চিত্রা। শ্যালিকা উত্তরা। জগদীশ বাবুর শাশুড়ি 'আমরা বাঙালি' সংগঠনের সদস্য। আমরা বাঙালি সংগঠন আগরতলায় খুব পরিচিত। ওরা বাংলা ছাড়া কোনো ভাষাকেই পাত্তা দেয় না। জানি না, বাঙালি রাজ্যের পত্তন করাই ওদের লক্ষ্য ছিল কিনা। আগরতলার এ কাহিনী ১৯৭১ সালে। তারপর ২৬ বছর কেটে গেছে। আগরতলা যাওয়া হয়নি। সেখানকার মানুষের নামগুলো মনে আছে। জানি না লোকগুলো কেমন আছে।

মঠ চৌমুহনীতে আমাদের ঘরের সামনে একটি সড়ক। সড়কের শেষে একটি হোস্টেল। সেই হোস্টেলে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের বন্ধুরা আছে। তাদেরও চা খেতে হলে আমাদের এলাকায় আসতে হয়।

আমি ভোর থেকেই দুয়ার খুলে পড়তে বসি। নিজেকে সড়কের পাহারাদার মনে হয়। সামনের বাড়িতে এক দম্পত্তি থাকে। ছেলেটি বাঙালি, মেয়েটি চাকমা। মাঝে মাঝে তাদের হাসতে এবং রাগতে দেখি। মঠ চৌমুহনীর মোড়ে প্রতিদিন ভোরের দিকে এক সুশ্রী তরুণী এসে দাঁড়ায়। বাসে সে কয়েরপুর যায়। আবার নির্ধারিত সময়ে বিকালে সে ফিরে আসে। শুনেছি সে মাস্টারি করে। আগরতলায় এভাবে কারো সম্পর্কে শুনতে এবং জানতে গেলে জানা যাবে এরা প্রায় সকলেই এককালের বাংলাদেশের লোক। প্রায় সকলেরই বাড়ি ছিল আখাউড়া বা ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এদের পেশা ব্যবসা, গাড়ি চালানো বা শিক্ষকতা।

তখন আগরতলা কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য। নিজস্ব আয় দুই কোটি টাকা। বার্ষিক ব্যয় হচ্ছে ৪২ কোটি টাকা। ৪০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিত কেন্দ্রীয় সরকার। আগরতলায় কোনো মৌলিক শিল্প কারখানা নেই। শিক্ষকতা, সাধারণ ব্যবসা বা বাস ট্রাকের মালিক হওয়া বা মালিকের পরিবহনে শ্রমিক হওয়াই একমাত্র পেশা ছিল আগরতলায়। আমার চেনা জগদীশ বাবু চিত্রা কিংবা উত্তরা সকলেই শিক্ষক।

আজ ২৬ বছর পরেও দু'টি ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে। তখন ঢাকায় প্রতিকাপ চা ছিল দুই আনা। আগরতলায় ৩০ পয়সা আমার চা খাওয়ার নেশা ছিল। কিন্তু পয়সা কোথায়। মঠ চৌমুহনীর মোড়ে দু'তিনটি চায়ের দোকান। ভাবলাম ওদের সঙ্গে ভাব করা যায় কিনা। আমি সারাদিন বই পড়ি বলে এলাকায় একটি পরিচিতি আছে। তাদের বিস্ময় যে একজন মাওলানা সারাদিন

www.nagorikpathagar.com

কী করে বই পড়ে। একদিন এক রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই একটি ছেলে বলল আপনি কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড মাস্টার? বুঝলাম ছেলেটির বুদ্ধির দৌড় সীমাবদ্ধ। তারপর প্রশ্ন হলো, আপনাদের আল্লাহতো আপনাদের রক্ষা করতে পারল না। আপনাদেরতো ইসলামিক রাষ্ট্র। আমি বললাম, তোমাদের কালীও কিছু করতে পারল না। শুনেছি গৌরনদী থানার বার্থি কালীবাড়ির কালীকে পাঞ্জাবিরা গুলি করেছে। তোমাদের কালী তাদের কিছুই বলেনি। ছেলেটি একটু মুষড়ে পড়ল। বললো ধর্ম নিয়ে আলোচনা ভালো নয়। আমি বললাম, আমি ধর্ম মানি না। ধর্ম বিশ্বাসও করি না। ছেলেটি বলল, আপনাকে একটি বই পড়তে দিবো। এই বই আমার গুরুদেবের। গুরুর নাম স্বামী স্বরূপানন্দ। তিনি সাক্ষাৎ দেবতা। পৃথিবীতে কী হতে পারে বা হবে সবকিছুই নাকি তাঁর বইতে লেখা আছে। আমি ছেলেটির কাছ থেকে স্বরূপানন্দের রচনাবলি নিলাম। ছেলেটি খুশি হলো। সে বলল, এবার প্রতি কাপ চায়ের জন্যে আপনাকে ৩০ পয়সা দিতে হবে না। ২০ পয়সা দিলেই চলবে।

আগরতলায় থাকতে এই একটি দোকানে ২০ পয়সায় চা খেতাম এবং লক্ষ করেছি স্বামী স্বরূপানন্দ হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ পরিচিত। বিশেষ করে এককালের বাংলাদেশের অধিবাসীরা স্বরূপানন্দের অনুরক্ত। স্বামীজী লিখেছেন, এককালে বাংলাদেশ যাওয়া নাকি সহজ হবে। এটাই ওদের চরম পাওয়া। যারা এই চরম পাওয়ার প্রশ্নটি না বুঝছেন, তাঁদের পক্ষে স্বরূপানন্দের প্রতি এই গভীর অনুরাগের মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না।

আগরতলায় গিয়ে আমার নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে নতুন ধারণা হয়েছিল। আমার সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকত শহিদুল্লাহ। শহিদুল্লার বাড়ি ভোলা। এক সময় দৈনিক পূর্বদেশ ও দৈনিক পাকিস্তানে চাকরি করত। ১৯৭১ সালে শহিদুল্লাহ বারবার আগরতলায় যাতায়াত করেছে। আগরতলায় সে আমার সঙ্গে কলেজ টিলায় স্নান করতে যেত। একদিন আমি স্নান করতে যাইনি। শহিদুল্লাহ স্নান করতে গিয়ে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। এসে বললো, স্যার তাজ্জব কাণ্ড। একেবারে অবাক কাণ্ড। একি দৃশ্য দেখলাম স্যার।

আমি শহিদুল্লাহর কথা তেমন বিস্মিত হলাম না। শহিদুল্লা সাধারণ ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে অনেক বিশেষণের আমদানি করে। ছোটখাটো ঘটনাকেও বড় করে তোলে। শহিদুল্লাহর কাহিনী হচ্ছে সে মঠ চৌমুহনী থেকে কলেজ টিলায় স্নান করতে যাচ্ছিল। কলেজ টিলায় যাওয়ার পথে সড়কের পাশে একটি প্রেস আছে। সড়ক থেকে দেখা যায় যে ওই প্রেসে কম্পোজিটররা কাজ করছে। আমরা নিত্যদিন ঐ ছবি দেখছি। কিন্তু শহিদুল্লাহ আজ ভিন্ন ছবি

www.nagorikpathagar.com

দেখেছে। শহিদুল্লাহ লক্ষ করেছে যে একজন মহিলা কম্পোজিটর কাজ করেছে। এমন তাজ্জব কাণ্ড শহিদুল্লাহ জীবনে দেখেনি। এ কথা শহিদুল্লাহ জীবনেও ভাবেনি।

২৬ বছর আগের কথা। আমাদের সমাজে তখন বোরখার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। আর্থিক দুর্নীতি তখনো ঘরের মেয়েকে ঘরের বাইরে বের করেনি। ভারতে তখন ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা নেমেছে জীবনযুদ্ধে।

আগরতলায় প্রতিদিন কোনো রেস্টুরেন্টে বা কোনো বাসায় এক ধরনের বিতর্কের সৃষ্টি হতো। ওরা আমাদের গাড়ি দেখে অবাক হতো। আমাদের দেশের অনেক নেতা গাড়ি নিয়ে আগরতলা গিয়েছিল। জাপানি সুন্দর গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে আগরতলার লোক বিস্মিত হতো। তাদের দেশ অর্থাৎ ভারতে তেমন গাড়ি নেই। তখন ভারতে বিদেশ থেকে গাড়ি আমদানি নিষিদ্ধ ছিল। তখন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু প্রণীত নীতি অনুসৃত হচ্ছিল। নেহরুর নীতি হচ্ছে কোনো আমদানি নয়। দেশে মূল, বৃহৎ শিল্প স্থাপন করো। নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করো। এ লক্ষ্য নেহরু নিয়েছিলেন বিশ্বের পরাশক্তির দ্বন্দ্বের কারণে। এই দ্বন্দ্বের ফলে পুঁজিবাদী এবং সমাজতন্ত্রী উভয় শিবিরই ভারতকে সাহায্য সহযোগিতা করতে এগিয়ে যেত তার অবস্থান এবং জনসংখ্যার জন্যে। তাই ভারতে আলপিন থেকে গাড়ি পর্যন্ত সকলই ছিল নিজস্ব। আমদানি ছিল নিষিদ্ধ।

আগরতলার মানুষ প্রথম আমাদের গাড়ির বাহার দেখে চমৎকৃত হতো। তারপর তর্ক জুড়ে দিত। বলত, আমাদের নিজেদের বলে কিছু নেই। সবকিছু জাপানি আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। আপনারা স্বাধীনতা যুদ্ধ করবেন কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াবেন কী করে? এ প্রশ্নে আমি ভারতীয়দের একটি প্রচ্ছন্ন গর্ব দেখেছি। আর এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ভারত সীমান্তের একজন ভারতীয় জোয়ানের কথা। তিনি ভারত সীমান্তে একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে আটক করেছিলেন। পরে শুনলেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। শুনলেন তাঁর ঢাকায় বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। টেলিভিশন আছে। সেই অধ্যাপককে সসম্মানে ছেড়ে দিতে গিয়ে সেই জোয়ান জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তা হলে আপনারা লড়াই করবেন কেন? কেন স্বাধীনতা চাচ্ছেন। আমাদের দেশের অধ্যাপকদের এতো সুযোগ-সুবিধা নেই। ভারতে বিপাকে পড়তাম ধর্মীয় চর্চা নিয়ে। রাস্তাঘাটে সর্বত্রই কোনো না কোনো আশ্রম বা পূজার ব্যবস্থা। আমাদের দেশে শনিবার হিন্দুরা শণিপূজা করে থাকে। কিন্তু কোথাও শণিতলা দেখিনি। আগরতলায় দেখেছি সড়কের পাশে কোনো একটি

www.nagorikpathagar.com

গাছ ঘিরে বেড়া দিয়ে শণিতলা বানিয়েছে। ওই এলাকা দিয়ে যেতে গেলে এদের দেখে পথচারিদের কাছে পয়সা চাইবে। না দিলে মস্তানদের মতো আচরণ করবে। ধর্মের এমন মাস্তানিরূপ এর আগে আমার কোথাও চোখে পড়েনি। তবে এই হামলা দেখে আমরা সাহস করে কথা বলতে পারলে মাফ পেয়েছি। বলেছি আমরা জয়বাংলার লোক। ব্যাস। সব সমস্যার সমাধান। জানি না এখনো আগরতলায় শণিতলার হামলা আছে কিনা।

জুলাই শেষ হতে চলেছে। আমাদের সংগ্রাম নিয়ে নানা কথা উঠেছে। একদিন সুখময় বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনারা শ্রীমতী গান্ধীকে সমালোচনা করছেন বাংলাদেশে অভিযান না চালাবার জন্যে। কিন্তু আপনারা কি কথা দিতে পারেন যে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানকে আক্রমণ করলে আপনাদের জনগণ আমাদের মেনে নেবে? একদিন আমাদের আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করবে না তো? যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের মানসিকতা থাকবে কি? আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক কোনোদিন ভালো ছিল না। একটি বিশেষ মানসিকতায় পরিবেশে দু'দেশের সাধারণ মানুষ ১৯৪৭ সালের পর বেড়ে উঠেছে। এ ইতিহাস বাদ দিয়েও ভারত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না। এতে ঝুঁকি অনেক।

এবার সুখময় সেনগুপ্তকে ভিন্ন মানুষ মনে হলো। এককালের কুমিল্লার একটি গ্রুপের নেতা তার প্রতিদ্বন্দ্বি গ্রুপের নেতা শচীন সিং এখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। আমার প্রথম সাক্ষাতের সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, সকল প্রশ্নের জবাব পেতে হলে নয়াদিল্লি যান। শ্রীমতী গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করুন। এবার তিনি নিজেই কথা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, বাংলাদেশের মানুষ কথা বলুন। বলুন, তারা এ যুদ্ধ কিভাবে নেবে। এ যুদ্ধ একদিন আসবে। কিন্তু এর প্রভাব থাকবে দীর্ঘদিন।

আমি সেদিন সুখময় বাবুর কথার জবাব দিইনি। এ প্রশ্ন তেমন করে ভেবে দেখিনি। তবে শ্রীমতী গান্ধী কেন পাকিস্তানকে আক্রমণ করছেন না এ জন্যে তাঁর সমালোচনা শুনেছি। ঢাকা এবং আগরতলায় হা-হুতাশ শুনেছি। ঢাকার খেদোক্তি শুনেছি, শ্রীমতী গান্ধী কি আমাদের মেরে ফেলতে চান?

তখন আমার কাছে এ প্রশ্নের জবাব ছিল না। পরবর্তীকালে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের কথা আমার কানে বাজছিল। তাঁকে বললাম, আমি ঢাকা যাচ্ছি। ফিরে এসে জবাব দেব।

আমি ১৯৭১ সালের জুলাই মাস আগরতলা থেকে ঢাকা ফিরব শুনে সকলে অবাক। এ সময় তো সকল নেতাদের পালাবার কথা। বাংলাদেশ

www.nagorikpathagar.com

থেকে আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে আসার কথা। এছাড়া আমি সাংবাদিক। নাম নির্মল সেন। কেউ হাতে পেলে ছাড়বে না। আর পরিবারের যারা দেশে ছিল তারা এখনো গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় আছে। বন্ধুরা রাজি হলেন না। তবে আমাকে আটকাবার সাধ্য কারো নেই। তাই জুলাই মাসে রওনা হলাম ঢাকার পথে। পরনে লুঙ্গি শার্ট। মুখে দাঁড়ি। সঙ্গে সঙ্গী জুটে গেল। তাদের কথায় পরে আসছি।

আগরতলা ছাড়বার আগে আ স ম আবদুর রবের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁদের তিনটি ছেলে বাংলাদেশে আসবে। আমরা এক সঙ্গে রওনা হলাম। ওই তিনটি ছেলের মধ্যে একজন হচ্ছে গজারিয়ার আতাউর। দ্বিতীয় শেখর নগরের দেলোয়ার। আর তৃতীয় ঢাকার শহিদুল্লাহ। আতাউর আর দেলোয়ার ঢাকায় ফিরছে। কসিম বেপারী ও কফিলউদ্দীন চৌধুরীকে ভারতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। এরা দু'জনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য। তাদের ধারণা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকে বাংলাদেশে থাকলে ওরা আত্মসমর্পণ করবে। শহিদুল্লাহর এমন কোনো দায়িত্ব নেই। শহিদুল্লাহ মনমরা। সে ঢাকায় ফিরে যাচ্ছে, তাই তার আনন্দ আগরতলায় সে খুব কষ্টে ছিল। আগরতলায় আসাই তার নাকি ঠিক হয়নি।

জুলাই মাসের রোদ-বৃষ্টি ঝুঁকি নিয়ে আমরা বাসে সোনামুরায় এলাম। এখন হাঁটবার পালা। এবার পাহাড়ি সড়ক। চড়াই আর উৎরাই। মাঝে মাঝে বৃষ্টি নামছে। আমাদের সঙ্গে কোনো ছাতা নেই। আমরা ভিজে যাচ্ছি। আবার রোদ উঠছে। আমাদের জামা কাপড় শুকিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে তখন ভিন্ন চিন্তা। কোনো কিছু ঠিক করে দেশের পথে পা বাড়াইনি। আগরতলা এসেছিলাম ভিন্ন পথে। কুমিল্লার নবীনগর হয়ে। এবার যাচ্ছি আর এক পথে। সম্পূর্ণ অপরিচিত পথ। বুড়িচং থানা দিয়ে সীমান্ত পার হতে হবে। রাতে কোথায় থাকতে হবে জানি না। ঢাকায় গিয়েও কোথায় উঠব স্থির করিনি। ঢাকায় অনেক চেনা মানুষ আছে। কিন্তু কারো বাসায় যাওয়া যাবে না। যেতে হবে রায়েরবাজারের জাফরাবাদ। ওখানে শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের ঢাকা মহানগর কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মোহাম্মদ হোসেনের বাড়ি। তার বাড়ি থেকে মাস দুই আগে ভারত যাত্রা করেছিলাম। জানি না ওই বাড়িতে কেউ আছে কিনা বা কেমন আছে। ঢাকার অবস্থাও জানি না। শুধু জানি রুহুল আমিন কায়সার ছাড়া সবাই অখুশি হবে। ভয় পাবে। ভাববে, আমি আবার ঢাকায় এলাম কেন।

ভাবতে ভাবতে পথ চলছি। জানি না কখন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছি। সারাটা পথ দেলোয়ার কথা বলেছে। যতদূর মনে আছে বক্সগঞ্জ

www.nagorikpathagar.com

সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছি। সেদিন বক্সগঞ্জের হাট। রাস্তায় অনেক লোক। ওই লোকদের সঙ্গে মিলেমিশে সন্ধ্যার দিকে গোবিন্দপুর পৌঁছলাম। মাইল খানেক দূরে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট। সন্ধ্যার আগে দোকান পাট বন্ধ। সর্বত্র একটা থমথমে ভাব। আমাদের ক্ষুধা পেয়েছিল। দীর্ঘদিন আগরতলায় ভালো কিছু খাইনি। ভাবলাম গোবিন্দপুর বাজারে ভালো কিছু খাবার পাওয়া যাবে। বাজারে একটি মাত্র দোকান খোলা। মাংস ভাত আর দুধ ছাড়া কিছুই মিলল না। ঐ সকল এলাকায় তখন সন্ধ্যার দিকে কেউ হাট বাজারে আসে না। আমাদের দেখে সকলের কৌতূহল হলো। লোক জমে গেল। বুঝতে পারলাম তারা ধরে নিয়েছে আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক। আমাদের বলা হয়েছিল গোবিন্দপুর বাজারে গেলে আমরা আশ্রয় পাবো। ওখানে আবদুল খালেক বলে আওয়ামী লীগের এক কর্মী আছে। তাকে খুঁজতে হবে।

আমাদের মধ্যে বেশি কথা বলে দেলোয়ার। সে দোকানীকে জিজ্ঞেস করল খালেকের কথা। তার প্রশ্নে সবাই চমকে গেলো। একজন বলে উঠল, খালেক ভারতে চলে গেছে। আমাদের প্রশ্নে ওরা নিশ্চিত হলো যে আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক। মনে হলো ওরা ভয় পেয়েছে। বারবার আমাদের হাতের ব্যাগের দিকে তাকাচ্ছে। আমি এই ভয়ের সুযোগ নিলাম। একজনকে দোকানের পেছনে নিয়ে বললাম—আমার ধারণা আপনি মুক্তিবাহিনীর লোক। আজকের রাতের জন্যে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। লোকটি চমকে গেল। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো বাজারের গুদাম ঘরে।

রাতে তেমন ঘুম হলো না। একের পর এক মুক্তিবাহিনীর দল আসছে। এক দলের নেতা আমার পাশেই শুয়ে পড়ল। ওরা নাকি ইলিয়টগঞ্জের সেতু ভাঙতে যাবে। ওরা জোরেশোরেই কথা বলছিল। আমার তেমন ভালো লাগছিল না।

এমনি করে ভোর হয়ে গেল। আমাদের প্রায় কেউই ঘুমায়নি। সড়কে উঠতে হলে আমাদের গোমতী পার হতে হবে। কিন্তু কোনো খেয়া নৌকা নেই। অতিকষ্টে একখানি ডিঙ্গি পাওয়া গেল। ডিঙ্গিতে আমরা চারজন। হঠাৎ দেখলাম এক মাওলানা সাহেব আমাদের সামনে হাজির। ছয়ফুট দীর্ঘ। মুখ ভর্তি সাদা দাড়ি। তিনিও এসেছেন সেতু ভাঙতে। কিন্তু পথ চেনে না। তিনি রেকি করতে বেড়িয়েছেন। তিনি আমাদের সঙ্গী হলেন। তাঁকে সিঅ্যান্ডবি সড়ক পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে এলাম।

আজ ২৬ বছর পর সে ছবিও স্পষ্ট। যেন চোখের সামনে জলজল করছে। ভোরের বেলা শিশির তখনো শুকায়নি। আমরা কারো বাড়ির পেছন দিয়ে

www.nagorikpathagar.com

কারো বাড়ির সামনে দিয়ে এগোচ্ছি। আমাদের পিঠে ব্যাগ। বিপর্যস্ত চেহারা। রাস্তায় রাস্তায় ভিড় জমেছে। বাচ্চারা আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। গৃহবধুরা ঘরের বার হয়েছে আমাদের দেখতে। প্রবীণেরা আমাদের দেখে দূরে সরে যাচ্ছে। সর্বত্র একটা ভয়, আনন্দ, আশা এবং প্রত্যাশা। আর সেদিন পথে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়েছে এটা বুঝি ভিয়েতনামের দৃশ্য। আমরা বুঝি ভিয়েতনামের পথ দিয়ে হাঁটছি।

হাঁটতে হাঁটতে দুপুরে আমরা দীঘিরপাড় পৌছলাম। দীঘিরপাড় চান্দিনা ও দেবিদ্বার থানার মাঝামাঝি এলাকায়। দীঘিরপাড় থেকে ক্যান্টনমেন্ট বেশি দূরে নয়। ৭১ এর যুদ্ধে দীঘিরপাড় একটি অভূতপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কুমিল্লার বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা ঢুকেছে। কেউ এসেছে নৌকায়। কেউ এসেছে হেঁটে। সন্ধ্যার পর সবাই জমেছে দীঘিরপাড়ে। আবার বিভিন্ন এলাকা থেকে নৌকায় সারাদিন ধরে মুক্তিযোদ্ধারা এসেছে। সবাই মিলেছে দীঘিরপাড়ে। সন্ধ্যার পরে সেখানে যেন একটি মুক্তিযোদ্ধার বাজার। একটি মুক্ত এলাকা। আমরা সেখানে পৌছলাম দুপুরে। কিন্তু আমরা যাব কোথায়?

এবার দেলোয়ার পথ নির্দেশ করল। সে বলল, দীঘিরপাড় থেকে নৌকায় গৌরীপুর যেতে হবে। গৌরীপুরে নৌকা পাল্টাতে হবে। নতুন নৌকা নিয়ে মতলব থানার বেলতলি যেতে হবে। রাতে থাকতে হবে আবুল হোসেনদের বাড়িতে। আবুল হোসেন ব্যাংকে চাকরি করে ঢাকায়। ন্যাপ নেতা। এলাকায় সকলের সঙ্গেই পরিচিত। দেলোয়ারের কথা অনুযায়ী আমরা দীঘিরপাড়ের নৌকা নিলাম। নৌকায় গৌরীপুর থেকে বেলতলী। বেলতলী পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো।

অবাক কাণ্ড। আবুল হোসেন বাড়িতে নেই। ঢাকা থেকে সেই বাড়ি হয়ে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা যাচ্ছে সীমান্তে। ফিরছে ওই পথে। আবুল হোসেন কখনো আগরতলা যাচ্ছে। কখনো ঘুরছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। তবে সে বাড়িতে যেই আসুক না কেন থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। আবুল হোসেনের বৃদ্ধ পিতা সন্তানের মতো সবাইকে স্নেহ করেন। বৃদ্ধের বড্ড আক্ষেপ। তিনি বলেছেন, সব বাপের পুতেরা এমন করে যুদ্ধে গেলে দেশটা স্বাধীন হয়ে যেত। আমরা বেলতলিতে রাত কাটালাম। ভোরবেলা লঞ্চে উঠে মুন্সিগঞ্জে হয়ে ঢাকা পৌছলাম।

ঢাকার অবস্থান আমি জানি না। এবার আমি একা। দেলোয়ার মুন্সিগঞ্জ থেকে গেছে। আতাউর আর শহিদুল্লাহ ঢাকায় এসে নিজের আশ্রয়ে চলে

www.nagorikpathagar.com

গেল। আমি একটি রিকশা নিলাম। সদরঘাট থেকে রায়েরবাজার। রায়ের বাজারের জাফরাবাদ। বাড়িটা যেন চিনতে পারছিলাম না। সবাইকে সন্দেহ হচ্ছিল। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাচ্ছিলাম। আমার হাতে ব্যাগ। পরনে লুঙ্গি ও হাওয়াই শার্ট। মুখে দাড়ি। ওপাড়ায় এককালে আমি বড্ড পরিচিত ছিলাম। অনেক খুঁজে জাফরাবাদের ৮০ নম্বর বাড়িতে পৌঁছলাম। মোহাম্মদ হোসেন আমাকে দেখে হেসে ফেললেন। বললেন, আইছেন ভালো কাজ হইছে। অনেক কথা আছে। ইন্ডিয়া কিছু করে না কেন কইতে পারেন। আমরা এখানে মরুম নাকি।

জুলাই মাসে ঢাকায় পৌঁছলাম। ৭১ সালের জুলাই। আমি কেন ঢাকায় এলাম সে প্রশ্ন সবার মনে। কেউ তখন ঢাকায় আসে না। আমি আগরতলা ও কলকাতায় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ঢাকা ফিরলাম। কারো বিশ্বাস হচ্ছিল না। তখন চারদিকে যুদ্ধ আর যুদ্ধ।

কেন ঢাকায় এলাম? ২৬ বছর পর সে প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। আমি পেশায় রাজনীতিক এবং সাংবাদিক। হয়তো সাংবাদিক মনের একটা চাহিদা ছিল। হয়তো ভেবেছিলাম জীবনে এই অভিজ্ঞতা আর হবে না। ভারতে নিরাপদ আশ্রয়ের লোকগুলোকে দেখেছি। এবার ইচ্ছা হলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছবি দেখবার। কেমন আছে সে অবরুদ্ধ মানুষগুলো। কী করছে। কিভাবে বেঁচে আছে। তখন ঢাকায় থাকার যে কী বিপদ আমি ঢাকায় না এলে বুঝতে পারতাম না। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, হয়তো বা দেশের মানুষগুলোকে দেখার জন্যেই সাংবাদিক হিসেবে আমি ঢাকায় এসেছিলাম।

কিন্তু রাজনীতিক হিসেবেও আমার একটি অভিজ্ঞতা ছিল। সে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি ভারতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম সেনাবাহিনীতে আমার যোগ দেয়া সম্ভব হবে না। গ্রহণযোগ্য হবে না। যুদ্ধে যেতে হলে কতগুলো পদ্ধতি আছে। ওই পদ্ধতি মোটামুটিভাবে আওয়ামী, ন্যাপ এবং কমিউনিস্ট পার্টির দখলে। আমি ভারতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি আমি ভারতে পৌঁছবার আগে যে বামপন্থী তরুণেরা প্রশিক্ষণ নিয়েছিল তাদেরকেও কোথাও যেতে দেয়া হচ্ছে না। আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে আমাদের দলের কেউ সরাসরি কোথাও গিয়ে ভর্তি হতে পারবে না। ভর্তি হতে গেলে গোপনে ভর্তি হতে হবে। অথবা নিজের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ঢুকে নিজেদের বাহিনী গড়ে যুদ্ধ করতে হবে। সে অবস্থা তখন আমাদের ছিল না। দল গঠিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে ২৯ আগস্ট। যুদ্ধ শুরু

www.nagorikpathagar.com

হলো ১৯৭১ এর মার্চে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে দলের কাঠামো দেয়া সম্ভব হয়নি। সুতরাং ভিন্নভাবে বাহিনী গড়ে তোলাও মুশকিল। তাই আমার প্রথম লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের মুক্তিযুদ্ধে ঢুকিয়ে দেয়া। দেশে এসে কিছু মানুষকে নিয়ে আবার ভারতে চলে যাওয়া। সম্ভব হলে প্রশিক্ষণ দেয়া। প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব না হলে তাদের যে কোনো উপায়ে ৭১-এর সংগ্রামে যুক্ত করা। যুদ্ধের বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া। আমার লক্ষ্য ছিল তরুণদের চোখের সামনে একটি মুক্তিযুদ্ধের ছবি এঁকে দেয়া। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের বুঝতে শেখানো যে এ যুদ্ধ কঠিন। এ যুদ্ধ ঝুঁকিপূর্ণ এবং এ যুদ্ধে গেলে পেছনে তাকানো যায় না।

আর ব্যক্তিগতভাবে আমি ভেবেছিলাম লেখালেখি ছাড়া আমার করণীয় আর কিছু নেই। প্রয়াত ফনীভূষণ মজুমদার আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারে যোগ দিতে বলেছিলেন। সেখানকার পরিবেশ সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা ছিল না। দেখেছিলাম, এতবড় সংগ্রামেও কোন্দল আর দলাদলি এবং শেষ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন স্বাধীন বাংলা বেতারে। আমার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

এই পটভূমিতে আমি বাংলাদেশে ফিরেছিলাম। আমাদের অন্যতম নেতা রুহুল আমিন কায়সার চির অসুস্থ মানুষটি তখন ঢাকা ছেড়ে অনেক দূরে আশ্রয় নিয়েছেন। আমাদের আহ্বায়ক খান সাইফুর রহমান তখন বরিশালে। অনেকদিন তাদের কোনো খবর পাচ্ছি না। তাদের খবর পাওয়া দরকার। সকলকে সঙ্গে নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে ঢাকা শহরে আমাদের নেতৃস্থানীয় কেউ সক্রিয় ছিল না। যারা ছিল তারা দুরে সরে গিয়েছে। একমাত্র নগর আহ্বায়ক কমরেড মোহাম্মদ হোসেন সক্রিয় আছে সব ক্ষেত্রে।

ঢাকায় এসে যুদ্ধের তেমন কোনো খোঁজখবর পেতাম না। লুকিয়ে ভয়েস অব আমেরিকা ও বিবিসি ধরতে হতো। সেকালে যুদ্ধের কতোগুলো নাম আমার যেনো মুখস্থ হয়েছিল। উত্তরের ভুরুঙ্গামারী, দক্ষিণের মিয়াবাজার বিবিরবাজার ও সুয়ারগাজী এবং সিলেটের সালুটিকার বিমানবন্দরের নাম। প্রায় প্রতিদিন স্বাধীন বাংলা বেতারের বুলেটিনে থাকত।

তবে যুদ্ধ সম্পর্কে আমার একটা নিজস্ব ভাবনা ছিল। আমার ধারণা হয়েছিল বছর শেষে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। বর্ষায় যুদ্ধ তীব্র হবে। ডিসেম্বরে গিয়ে চরম যুদ্ধ হবে। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ হলেও এটা ভারত পাকিস্তান যুদ্ধও হবে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে ভারতকে বিশ্ব

www.nagorikpathagar.com

জনমত গড়তে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তি সমন্বয় ঘটাতে হবে। বিশ্ববাসীর কাছে এ যুদ্ধ অনিবার্য বলে বিশ্বাসযোগ্য করতে হবে।

এ কাজ সময় সাপেক্ষ। আমি ঢাকা থেকে নবাবগঞ্জ গেলাম। রুহুল আমিন সাহেবকে নবাবগঞ্জে পেলাম। রুহুল আমিন সাহেব নবাবগঞ্জে থাকেন। তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ হলো। আমরা একমত হলাম যে এ যুদ্ধের সুযোগে যতোদূর সম্ভব তরুণদের যুদ্ধে প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধে ঠেলে দেয়াই একমাত্র কাজ। এ যুদ্ধে গেলে তাদের একটি সংগ্রামী মানসিকতা গড়ে উঠবে। এছাড়া দলের আহ্বায়ক খান সাইফুর রহমানকে বরিশাল থেকে ভারতে নিয়ে যেতে হবে। আমাকে সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই ৩১ জুলাই-এর মধ্যে ত্রিপুরার উদয়পুরে পৌঁছতে হবে। ৩১ জুলাই উদয়পুরে ভারতের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের (আরএসপি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড ত্রিদিব চৌধুরী উদয়পুরে আসবেন। তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেই উদয়পুর আসছেন।

ঢাকায় এসে আমি সহজভাবে সকল কাজ করতে পারলাম না। এর মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটে গেল। আমি ভারত থেকে ফিরে মোহাম্মদ হোসেনের বাসায় ঢুকতেই তাঁর স্ত্রী আমাকে বললেন, আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। ভারতে যাবার আগে আমি তাদের বাসায় গৃহশিক্ষক হিসেবে ছিলাম। আমার দায়িত্ব ছিল রোজা নামাজ শেখাবার। আমি শুধু ঐ কাজটাই করতাম না। ছেলেমেয়েদের গল্পে গল্পে ভুলিয়ে রাখতাম। কিন্তু ভুল হলো ভারতে যাওয়ার সময়। মোহাম্মদ হোসেনের স্ত্রী আসামের অধিবাসী। তাঁর দু'ভাইয়ের নাম আলাউদ্দিন ও মতিন। তারা আসামের হুজাউ শহরে থাকে। আমি ভারত যাবার কালে মোহাম্মদ হোসেনের স্ত্রীকে বললাম, আমি হুজাউতে আপনার ভাইদের খবর দেব। ভদ্রমহিলা চমকে গেলেন। তিনি স্বামীর কাছে জানতে চাইলেন। সাহেব, এ মওলানা সাহেব কে। তিনি কী করেন এবং শেষ পর্যন্ত আমার পরিচয় জেনে গেলেন। তাই ভারত থেকে এবার ফিরতেই তিনি এবার বললেন, আপনাকে কিন্তু আমি চিনি। এতে আমিও একটু স্বস্তি পেলাম। কারণ যে বাড়িতে থাকি সে বাড়ির গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লুকোচুরি করা বেশ কঠিন। তাই এবার পরিবেশ অনেকটা স্বাভাবিক হলো।

কিন্তু বিপদ হলো পরবর্তী শুক্রবার। রায়েবাজার মসজিদের ইমাম অসুস্থ। তিনি জুম্মার নামাজ পড়াতে পারবেন না। সুতরাং একজন ইমাম চাই। সকলেই জানে মোহাম্মদ হোসেনের বাড়িতে একজন মাওলানা আছেন। তাই সবাই মিলে আমার খোঁজে এলো। বিব্রত মোহাম্মদ হোসেন বললেন, এ মাওলানা সাহেব বিদেশী। তিনি পরহেজগার মানুষ। বাড়িতেই আল্লাবিল্লা

www.nagorikpathagar.com

করেন। বাইরে কোথাও যান না। সেদিনের ফাঁড়া কাটা গেল। দ্বিতীয় বিপদ হলো আমার এক ছাত্রকে নিয়ে। ১৯৫৪ সালে এসেছিলাম খুন মামলার ফেরারি আসামি হিসেবে। আমাকে পাঠিয়েছিল প্রখ্যাত সাংবাদিক মরহুম মুহাম্মদ মোদাব্বের। দীর্ঘদিন তার বাসায় শিক্ষকতা করেছি। কিভাবে যেন খোঁজ করে বের করেছে আমার ঠিকানা। সে গাড়ি নিয়ে রায়েরবাজার হাজির। আমাকে তাদের বাসায় যেতে হবে। তাঁর মায়ের নির্দেশ।

আমার অবস্থা তখন বিব্রতকর। পরনে লুঙ্গি, গায়ে হাওয়াই শার্ট। মাথায় জিন্না টুপি। মুখ ভর্তি দাড়ি। আমি ঘর থেকে কোথাও যাই না। কিন্তু মন্টি আমাকে জোর করে নিয়ে গেল তাদের মগবাজারের বাসায়। তারা মোহাম্মদপুর থেকে বাসা পাল্টিয়েছে। মন্টির মা বললেন, তোমার জন্যে ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। তুমি আর কোথাও যেতে পারবে না। আমার বলার কিছু ছিল না। মন্টির মায়ের চোখে জল দেখলাম। আমাকে বাঁচালেন মোদাব্বের সাহেব। বললেন, নির্মল মুক্তিযোদ্ধা নিতে এসেছে। টাকা সংগ্রহ করতে এসেছে। কতোদিন তুমি তাকে আটকে রাখবে? ওকে আটকে রাখা যায় না।

দেখলাম মোদাব্বের সাহেব বড্ড ব্যস্ত। তিনি রেড ক্রসের নেতা। রেড ক্রসের সব সহায়-সম্পদ মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে দিচ্ছেন। আমাকে বললেন, মানিকগঞ্জের ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরীকে একটি স্পিড বোট দিয়েছেন। তার এলাকা প্রায় মুক্ত। মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাচ্ছিলেন আর বলছিলেন পাকিস্তানিদের নির্যাতনের কথা। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম। মাত্র কয়েক বছর আগে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী নিয়ে তাঁর সঙ্গে তুমুল বিতর্ক হতো। তিনি বলতেন—নির্মল তোমার যুক্তি আমি মানি। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে এসে সবকিছু মেনে নিতে বড্ড কষ্ট হয়। তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর পাকিস্তান আমাদের স্বপ্ন ভেঙে খান খান করে গেছে। আজকের মোহাম্মদ মোদাব্বের মুক্তিযুদ্ধের এক বড় সহায়ক। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক বড় মুক্তিযোদ্ধা।

মগবাজারের বাসায় এক রাত থেকে রায়েরবাজার বাসায় ফিরলাম। সেখানে তখন আর এক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। মে মাসে নরসিংদীর কাজী হাতেম আলী আমার সঙ্গে ভারতে গিয়েছিল। আমি জুলাই মাসে ফিরলাম। কিন্তু সে ফিরল না। হাতেম আলীর বাবা মা কারওয়ানবাজার থাকেন। তাদের ধারণা হাতেম আলী মারা গেছে। কিন্তু আমি কী করে প্রমাণ করব হাতেম আলী মারা যায়নি। তাদের দাবি হচ্ছে আমাকে হাতেম আলীর বাড়িতে যেতে হবে। তার বাবা মা'র সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমি না গেলে কেউ বিশ্বাস

www.nagorikpathagar.com

করবে না হাতেম আলী বেঁচে আছে। আমার উপায় ছিল না। একদিন ভোরে মোহাম্মদ হোসেনের হোন্ডার পেছনে বসলাম। চলে গেলাম কারওয়ানবাজার। কিছুক্ষণ হাতেম আলীর বাবা মা ভাই বোনদের সঙ্গে আলাপ করে ফিরলাম রায়েরবাজার। আমার এ যাওয়া আসা মোহাম্মদ হোসেনকে বিপদে ফেলল। আমি চলে যাবার পর সেনাবাহিনী দু'বার তার বাড়ি ঘেরাও করেছিল। কিন্তু মোহাম্মদ হোসেন এক সময় সামরিক বাহিনীতে ছিল বলে সে যাত্রায় বেঁচে গেল।

২৯ জুলাই আবার ভারত যেতে হবে। আমার সঙ্গে চিরপুরাতন শহিদুল্লাহ। শহিদুল্লাহ বলল, স্যার আপনার জিন্না টুপিটা ফেলে দেন। একটা কিস্তি টুপি পরেন। জিন্না টুপি পরলে আপনাকে বিহারী বিহারী লাগে। সেদিন নবাবগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসার সময় সবাই আমাকে বিহারী ভেবেছে। লঞ্চ কেরানীগঞ্জ পৌঁছার আগেই সবাই ভয়ে ভয়ে নেমে গেছে। এবার ওই টুপি পরে গেলে বিহারী হিসেবেই হয়তো আমরা মার খাব।

এবার ঢাকা থেকে কোন পথে যাব? কাজী হাতেম আলীর বাসার সমস্যা শেষ করেছি। মোদাব্বের সাহেবের বাসার চিত্র ভাসছে চোখের সামনে। বড় ছেলে হোসেন জামাল লাকী পাকিস্তান টেলিভিশনে চাকরি করে। আটকা পড়েছে সপরিবারে করাচিতে। সেজ ছেলে হোসেন ফারুক সানি চাকরি করে পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে। সেও সপরিবারে আটকা পড়েছে পাকিস্তানে। বাড়িতে দুই ছেলে হ্যাপি-মন্টি। কন্যা শিরিন। এ নিয়েই তাঁদের সংসার। পাকিস্তানে ছেলেদের কথা ভাববেন, না মুক্তিবাহিনীর কথা ভাববেন। এ চিন্তা তাঁকে বিব্রত করছে। তখন ঢাকায় এ ধরনের অসংখ্য বিভক্ত পরিবার ছিল। তাদের ঝুঁকি ছিল দু'ধরনের। একদিকে দেশ স্বাধীন করবার সংগ্রাম। আর অন্যদিকে পাকিস্তানে আটকা পড়া সন্তান-সন্ততিদের জীবন হানি হওয়ার আশঙ্কা। যারা ঢাকায় ছিলেন না বা ৭১ সালে ঢাকায় আসেননি তারা এ পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারবেন না। যারা কলকাতায় ছিলেন তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় সে কালের এ মানুষগুলোর নিত্যদিনের কাহিনী। এদের অনেকে ঘৃণা করেছে, সমালোচনা করেছে, সাপ সাপান্ত করেছে। কিন্তু বুঝতে চায়নি এদের অবস্থা। এরা তখন ঢাকা ফরিদপুর বরিশাল বা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থাকলে আমাদের এখানে এসে আশ্রয় পাওয়া সম্ভব হতো না। মুক্তিযোদ্ধারা বিপর্যস্ত হতো প্রতি পদে পদে। আমরা যারা সেদিন শত ঝুঁকি নিয়েও ঢাকা এসেছিলাম একমাত্র আমাদের পক্ষেই সম্ভব ছিল সেদিনের বাস্তবতা বোঝা।

www.nagorikpathagar.com

এ পরিস্থিতিতে সকলের এক কথা, কবে ভারতীয় সৈন্য আসবে। কেন ইন্দিরা গান্ধী কিছু করছেন না। ইন্দিরা গান্ধী কি আমাদের মারতে চান? কী চান তিনি। মোহাম্মদ হোসেনও বললেন, আপনি কলকাতায় যাবেন। দিল্লি যাবেন। শ্রীমতি গান্ধীর সঙ্গে কথা বলবেন। বলবেন, বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করতে। নইলে আমরা কেউ বাঁচব না।

আমি ভাবছিলাম ভিন্ন কথা। অনেক দুঃখে আমার হাসি পাচ্ছিল। অতি বিপদে পড়ে আমরা ভারতের সাহায্য চাচ্ছি। কিন্তু আমরা ভারতকে সহ্য করতে পারবো কি? গত ২৩ বছরের ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেয় না। ১৯৪৭ সালের পর যাদের জন্ম, তারা ভারতকে শত্রু হিসেবে দেখেছে। তারা জেনেছে ভারতে দাঙ্গা হয়। মুসলমানরা নির্যাতিত হয়। মাত্র ৬ বছর আগে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়েছে। আমি সে যুদ্ধের উন্মাদনা দেখেছি। আমাদের বন্ধু খালেকদাদ চৌধুরী প্রেস ক্লাবে এসে বলেছিলেন, ভাই, প্রতিদিন একটি আন্তর্জাতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবর শুনছি ভারত আর পাকিস্তানের বেতারে। বাংলাদেশের প্রতিটি গাড়িতে CRASH INDIA নামে স্টিকার লাগানো হয়েছে। ওই স্টিকার ছিঁড়তে গিয়ে বিপত্তি হচ্ছে। আমি বিভিন্ন বাসায় পড়াতে গিয়ে দেখেছি আমার প্রিয়তম ছাত্র-ছাত্রীটি আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে। আমি তখন দৈনিক পাকিস্তানে চাকরি করি। আমি ঝুঁকি নিয়ে সারারাত কাজ করি। তারপরও কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না। সকলের ধারণা আমি ভারতের দালাল, রাতে দৈনিক পাকিস্তান থেকে ভারতে সকল খবর পাচার করে দিই। মাত্র ৬ বছর আগের কথা। সেই পাকিস্তানের মানুষ আমাকে বলছে দিল্লি যেতে। চাচ্ছে ভারতের হস্তক্ষেপ। আজকে তাদের ধারণা ভারতই শুধু তাদের বাঁচাতে পারে। আমি অবাক হয়ে ভেবেছি। সত্যি সত্যি ভারতীয় বাহিনী এলে কী হবে। এদেশের মানুষ কি তাদের মেনে নেবে? ক'দিন মেনে নেবে? আমাদের দীর্ঘদিনের মানসিকতা কি নয় মাসে কলুষমুক্ত হয়ে যাবে?

তবে আমার পক্ষে দিল্লি যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। ভারতের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আমি চুনোপুটি মাত্র। আমি বড়জোর আগরতলায় বা কোলকাতায় নেতাদের বলতে পারি। কিন্তু নিজেই বিশ্বাস করি না যে, ভারতীয় বাহিনীকে বাংলাদেশের মানুষ বেশিদিন মেনে নেবে। তবুও দেখলাম ঢাকায় যেন ভারতীয় বাহিনীর জন্যে উন্মাদনা। সবাই ভারতীয় বাহিনীর জন্যে উন্মুখ।

এ পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় যেতে হবে। কিন্তু কী করে যাব। এবার সড়ক পথে যাওয়া যাবে না। সর্বত্রই পাকিস্তানি বাহিনী। রাজাকার, আলবদর শান্তিবাহিনীর লোক। ঢাকা থেকে বের হওয়া খুবই কষ্ট। ঠিক করলাম সেই

www.nagorikpathagar.com

পুরনো পথে বেলতলী, গৌরীপুর হয়ে যাব। বিকেল ২টায় লক্ষ্মীপুর নামে একটি লঞ্চ মাছুয়াখালী যায়। মাছুয়াখালী লঞ্চে বেলতলী নামব। বেলতলীতে আবুল হোসেনের বাড়ি। আবার আবুল হোসেনের বাড়ি যাব। সেখানে রাত থেকে ভোর বেরায় নৌকায় গৌরীপুর। সেখান থেকে নৌকায় দীঘিরপাড়। দীঘিরপাড়ে রাত কাটাব। পরের দিন হেঁটে সীমান্ত যাব। সীমান্ত থেকে আগরতলার উদয়পুর।

কিন্তু ঢাকার সদরঘাট টার্মিনাল থেকে লঞ্চে উঠতে গিয়ে চমকে গেলাম। দেখলাম বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর আর ফজল শাহাবুদ্দিন টার্মিনালে দাঁড়িয়ে। তাঁদের সঙ্গে বিরাট দাড়িওয়ালা কবি হাসান হাফিজুর রহমান। তিনিও আমার লঞ্চে যাচ্ছেন। তাঁরা কেউ আমাকে চিনতে পারলেন না। লঞ্চে উঠে আমি দু'পয়সার বাদাম কিনলাম। চুপচাপ বসে থাকলাম বয়লারের কাছে। কিছুক্ষণ পর হাসান হাফিজুরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম তিনি যেন কাঁদছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন। তিনি আমাকে দেখে মলিন হাসি হাসলেন। বুঝলাম তিনি ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছেন। তাঁর দাড়ি হিন্দু সন্ন্যাসীর মতো। বললাম, আপনার আমার মতো সুন্নত দাড়ি করা উচিত ছিল। এ ধরনের দাড়ি নিয়ে ধরা পড়ে যাবেন। কোথায় যাবেন আপনি?

এমন সময় তাঁর গাইড আমার কাছে এলো। মনে হলো তাঁরা সীমান্তের ওপারে যাচ্ছেন না। কাছাকাছি কোথাও যাবেন। আমি বললাম প্রয়োজন হলে আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আমি সীমান্তের ওপারে যাব। হাসান সাহেবের গাইড আমার পরিচয় পেয়ে ঘাবড়ে গেলেন। তার বক্তব্য হলো, একে তো হাসান হাফিজুর রহমান তার ওপর নির্মল সেন যুক্ত হলে আর উপায় নেই। তাঁরা কালারবাজার নেমে গেলেন।

আমার সঙ্গে তখন শহিদুল্লাহ্। আমরা সন্ধ্যার দিকে বেলতলী নামলাম। নৌকায় আবুল হোসেনের বাড়িতে গেলাম। কিন্তু আবুল হোসেন বাড়িতে নেই। আবুল হোসেন সালিশি করতে ছেঙ্গারচর গেছেন। রাতে ফিরবেন না। আমরা বিব্রত হলাম। কিন্তু উপায় আর নেই। আমাকে কিছুটা চেনেন আবুল হোসেনের পিতা। ইতোপূর্বে একবার ওই বাড়িতে গেছি। তিনি বললেন, বাইরের ঘরে শুয়ে থাক। ও বাড়িতে অসংখ্য লোকের ভিড়। কে কোথায় থাকবে, কে কোথায় ঘুমাবে কেউ জানে না। গভীর রাতে আবুল হোসেনের পিতা আমার ঘুম ভাঙালেন। তাঁর হাতে থালা ভর্তি ভাত আর ইলিশ মাছের ঝোল। বললেন, বাবা কত লোককে খাওয়াব। তুমি কার ছেলে জানি না। কোথায় কোনদিন মারা যাবে কেউ জানবে না। বাবা, তুমি বাড়ি ফিরে যাও।

www.nagorikpathagar.com

সেদিন গভীর রাতে আমার চোখের জল নেমেছিল। সারা জনম বাপ তাড়ানো মা খেদানো ছেলে হিসেবে ঘুরে বেড়িয়েছি। কেউ কোনোদিন আমাকে এমন কথা বলেনি।

ভোরে ওই বুড়ো মানুষটা আমাকে নৌকা করে দিলেন। আমি আর শহিদুল্লাহ নৌকায় গৌরীপুর রওনা দিলাম। আজকের সড়ক পথে সে গৌরীপুর আর সেদিনের গৌরীপুর নয়। তখন বেলতলী থেকে নদী পথে পূর্বে গিয়ে ডানে মাঠে ওঠা যেত। মাঠে তখন জল ছিল। অনেক দূর ঘুরে ঢাকা, কুমিল্লা সড়কের কোনো একটি সেতুর নিচে দিয়ে নৌকায় যেতে হতো। সতর্ক থাকতে হতো ওই সেতুটি কোনো রাজাকার পাহারা দিচ্ছে কিনা।

চারদিকে ধান গাছ। মাঝখানে নৌকায় চলা ডাঙ্গা। সারাটা দেশ যেন নিস্তব্ধ। সড়কে গাড়ি দেখা যায় না। মাঝে মাঝে দু-একটা নৌকা। দূরে দূরে বিদ্যতের খুঁটি। বিদ্যুতের খুঁটির দিকে তাকালে মন খারাপ হয়ে যায়। ভাবি ওই খুঁটিগুলো এখনো অক্ষত কেন। কেন মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা ওই খুঁটিগুলো উপড়ে ফেলেনি। সে এক অদ্ভুত পরিবেশ। মাঝে মাঝে বিপদ হতো নৌকার মাঝিদের নিয়ে। কেউ সন্দেহ করত। কেউ আবার ভালোবাসতো। এই সন্দেহ আর ভালোবাসার মধ্যে একদিন প্রায় ধরা পড়ে গেলাম গৌরীপুর।

গৌরীপুরে শহিদুল্লাহ ভাত কিনতে নেমেছিল। আমরা একটি নতুন নৌকা করেছিলাম। মনে হলো মাঝি কিছুটা ধর্মভিরু। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ শহিদুল্লাহর কোনো দেখা নেই। এক সময় শহিদুল্লাহ হাঁপাতে হাঁপাতে এল। গৌরীপুর বাজার তখন রাজাকারে ভরা। শহিদুল্লাহ ভোলার ভাষায় কথা বলে। তাই তাকে সন্দেহ করে দোকানদার জেরা শুরু করেন দেন। শহিদুল্লাহ ভাত না কিনেই চলে আসে। অন্য দোকান থেকে কিছু কলা ও রুটি কিনে নিয়ে নৌকায় ফিরে আসে। অর্থাৎ সেদিন আমাদের আর ভাত মিলল না।

নৌকায় উঠে মনে হলো, আমাদের মাঝিও পাকিস্তানপন্থী। তবে আমার দাড়ি ও লুঙ্গি দেখে সে বেশ খানিকটা আশ্বস্ত। আমি তার সঙ্গে ধর্ম নিয়ে কথা শুরু করে দিলাম। আমরা কখনো খাল, কখনো বিলের মধ্য দিয়ে চলছি। অসংখ্য নৌকা চলাচল করছে ওই পথে। কেউই সড়ক পথে সামরিক বাহিনীর ভয়ে যাই না। চারদিকে মাঠ আর মাঠ। কোথাও ধান, কোথাও শাপলা। কোথাও আবার জেলেরা মাছ ধরছে। আমি মাঝির সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি।

www.nagorikpathagar.com

তাকে কলা ও রুটি খাওয়ালাম। বিকেল দিকে মনে হলো, মাঝি মানুষ ও আল্লাহর খাঁটি বান্দা। সন্ধ্যার দিকে দীঘিরপাড় বাজারে পৌছলাম। দীঘিরপাড় বাজারে তখন শত শত মুক্তিযোদ্ধা। দূর-দূরান্ত থেকে তারা সন্ধ্যার দিকে এই বাজারে আসে। তারপর বিভিন্ন এলাকায় অপারেশনে চলে যায়। শহিদুল্লাহকে বললাম, মাঝিকে নিয়ে দীঘিরপাড় বাজারে যেতে। মাঝিকে মাছ মাংস দুধ সব কিছু খাওয়াতে। কারণ তাকে হাতে রাখতে হবে। তার নৌকায় রাত কাটাতে হবে। সকালবেলা ছাড়া যাবার কোনো পথ নেই। শুনেছি কংসনগর, বলধাবাজার হয়ে সীমান্ত যাওয়া যায়। ওই পথ আদৌ আমার চেনা নেই। ওই পথ যেতে হলে গাইড প্রয়োজন।

শহিদুল্লাহ ও মাঝি নৌকায় ফিরে এলে আমি দীঘিরপাড় বাজারে গেলাম। বাজারের পুলের কাছে একটি রেস্টুরেন্ট আছে। ওই রেস্টুরেন্টের মালিক মনে হয় আমাকে চিনত। রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করলো স্যার কোনো গাইড লাগবো কিনা। একা কী করে যাবেন। আমি বললাম, একজন গাইড আমার প্রয়োজন। শেষ রাতে যেন গাইড আমার নৌকায় যায়। ওই গাইডকে নিয়ে আমাকে বলধাবাজার যেতে হবে।

ভোররাতে গাইড এসে হাজির। গাইডের নাম ইয়াকুব। বাড়ি ঘোষপাতি। শেষরাতেই আমরা নৌকা হতে উপরে উঠে যাত্রা শুরু করলাম। দেখলাম মাঝির চোখে জল। সে জানে না আমি কোথায় যাব। মাঝি ইয়াকুবকে বলল, আমি নাকি একেবারে সাক্ষাৎ আল্লাহর ওলি। আমাকে যেন সাবধানে নিয়ে যাওয়া হয়।

যাত্রা শুরুতেই বৃষ্টি। আমাদের কাছে কোনো ছাতা নেই। আমরা খালপাড় দিয়ে ছুটছি। দেখছি অসংখ্য মুক্তিবাহিনীর লোক রাইফেল মেশিনগান নিয়ে নৌকায় দীঘিরপাড়ের দিকে যাচ্ছে। তাদেরও ছাতা নেই। মাথায় বড় মানকচুর পাতা। এসময় যাওয়ার পথে আমাদের কিছু নাম মুখস্থ করে যেতে হলো। কারণ রাস্তায় যে কেউ আমাদের গ্রাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারে। সঠিক পরিচয় দিতে না পারলে বিপদ অনিবার্য। তাই প্রথম নাম মুখস্থ করেছিলাম ফুলতলির খালেক সরকারের। ফুলতলির পর কংসনগর। কংসনগরের পর গোমতি নদী। গোমতির ওপারে চণ্ডীপুর। সেখান থেকে বলধাবাজার। তাই পরিচয় দেওয়ার তেমন অসুবিধা ছিল না। কংসনগরে গোমতির ফেরি। ফেরিওয়ালা ছাড়া কেউ নেই। ফেরিতে আমরা মাত্র দু'জন যাত্রী। স্বাধীন বাংলা বেতারে চরমপত্র শোনানো হচ্ছে। শুনেছিলাম আগের দিন ওই ফেরিতে পাকবাহিনী হানা দিয়েছিল। মারা গিয়েছিল অনেক। তাই কৌতূহলও ছিল

www.nagorikpathagar.com

এপথে যাবার। ফেরিওয়ালা বলল, তেমন কোনো বড় ঘটনা ঘটেনি। মাত্র তিনজন আহত হয়েছে।

চণ্ডীপুরে এসে বিপদে পড়ে গেলাম। চারদিকে পানি। হাঁটাপথে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। চণ্ডীপুর থেকে নৌকা যাচ্ছে বলধাবাজার। নৌকার মাঝি সিদ্দিক ও আলাউদ্দিন। কিন্তু নৌকা নিয়ে বেশি দূর এগুনো গেল না। দেখলাম বলধাবাজারের দিক থেকে নৌকা ফিরে আসছে। তারা বলছে ওপথে যাওয়া যাবে না। ভারতে যাবার শেষ পথ পাকিস্তানিরা বন্ধ করে দিয়েছে। মুক্তিবাহিনীরা আটকা পড়ে গেছে। গোলাগুলি হচ্ছে। আপনারা সামনে যেতে পারবেন না।

কিন্তু আমার উপায় ছিল না। তখন বেলা দশটা বাজে। আমাকে চারটার আগে উদয়পুর পৌঁছতে হবে। উদয়পুরে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আছে। কিন্তু মাঝি যেতে নারাজ। বলধাবাজারে গিয়ে ভিন্ন নৌকা নিলাম। বললাম, যত টাকা লাগে সীমান্তে যেতে হবে। কিন্তু কিছুদূর যেতেই বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ শুরু হলো। নৌকার মাঝি কিছুতেই এগুতে রাজি নয়। শহিদুল্লাহ কান্নাকাটি শুরু করেছে। ইয়াকুবও যেতে রাজি নয়। এমনি করে নাঘির-এ পৌঁছলাম। একদল মুক্তিবাহিনীর ছেলে এল। ওরা আমাকে কিছুতেই এগুতে দিবে না। ওরা কেউ আমাকে চিনে না। তবুও আমার নৌকা ফিরিয়ে দিল।

নৌকা ফিরে এল বলধাবাজার। কিন্তু কোথায় যাব? এ এলাকায় কাউকে চিনি না। কিছুদূরে একটি স্কুলে কিছু হিন্দু শরণার্থী আছে। আর সব দিকে চুপচাপ। পথে এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হলো। বৃদ্ধ বলল, বাবা কোথায় যাবে? সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আজকেতো যেতে পারবে না। তোমরা আজকে আমার বাড়িতে থাকবে। কাল ভোরে চলে যাবে।

বুড়োর বাড়িতে আশ্রয় পেলাম। সন্ধ্যার পরে ছোট চিংড়ি ভাজা ও ভাত বুড়ো দিয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর চমকে গেলাম একটি পোস্টার দেখে। ও বাড়ির চালায় একটি পোস্টারে লেখা আছে, যা করে আল্লায় ভোট দিবো পাল্লায়। এক খাটে আমি আর শহিদুল্লাহ্ শুয়ে আছি। আমাদের কাছে একটি কালো ব্যাগ। মনে হলো শহিদুল্লাহ ভয়ে ঘুমিয়ে গেছে। হঠাৎ রাত ১২টার দিকে চারজন যুবক আমাদের ঘরে এসে ঢুকল। তারা কর্কশ ভাষায় জিজ্ঞাসা করল আপনারা কোথায় যাবেন? আমি বললাম, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমরা কোথায় যাব। ওরা বলল, এ মুহূর্তে আপনারা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। কারণ আমাদের মেহমান আছে। আমি বললাম, আমরাও আপনাদের মেহমান। আর এ কথাগুলো আপনাদের সন্ধ্যাবেলায় বলা উচিত ছিল। এই দুপুররাতে এখান থেকে আমরা কোথাও যাব না।

www.nagorikpathagar.com

ওই চার যুবকের সঙ্গে সেই বৃদ্ধও দাঁড়িয়ে ছিল। আর হাতে ছিল একটি কেরোসিনের ল্যাম্প। তিনি ইশারায় আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, আপনি বুঝতে পারছেন না, তারা জামায়াতের লোক। আপনাদের বাইরে নিতে পারলে খুন করে ফেলবে। আপনারা এখান থেকে বেরিয়ে আসুন। আমি আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। আমি ও শহিদুল্লাহ বুড়োকে অনুসরণ করলাম। বৃদ্ধ এক কৌশল করল। সে বেশ কিছুক্ষণ চারদিকে আমাদের ঘোরাল। পরবর্তীকালে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। তার দেয়াল ঘরের একপাশে কিছু কাঠ ছিল। সেই কাঠ সরিয়ে নিয়ে আমাদের একটি পাটি বিছিয়ে দিল। বলল, রাত শেষ হওয়ার আগে এখান থেকে চলে যাবেন। আমাদের ঘুম হলো না। রাত চারটার দিকে উঠে পড়লাম। বুড়োর সঙ্গে কথা না বলেই বলধাবাজারে এলাম। কিন্তু কোথায় যাব? আমাদের একমাত্র চেনা আগের দিনের নৌকার মাঝি সিদ্দিক ও আলাউদ্দিন। সিদ্দিকের বাড়ি চণ্ডীপুরে। সে বাড়িও আমরা চিনি না। বলধাবাজারে এক মাঝিকে সিদ্দিকের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, আমাদের সিদ্দিকের বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

মাঝি রাজি হয়ে গেল। বলধাবাজার থেকে সিদ্দিকের বাড়ি এক ঘণ্টা পথও নয়। কিন্তু সিদ্দিকের বাড়ি পর্যন্ত নৌকা পৌঁছাবে না। চারদিকে পাটক্ষেত। নৌকা থামিয়ে ওই পাটক্ষেতের মধ্যে দিয়ে সিদ্দিকের বাড়ি রওনা হলাম। কিছুদূর যেতেই সিদ্দিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে তো আমাদের দেখে অবাক। তার ধারণা আমি মুক্তিবাহিনীর মেজর জেনারেল। যে কোনো কারণেই হোক তাদের ওখানে এসেছি। একথা গোপন রাখতে হবে। সিদ্দিকের বাড়ি যাওয়ার পথে অনেকেই জিজ্ঞাসা করল আমাদের পরিচয়। সিদ্দিক বলল আমরা তাদের আলীর চরের আত্মীয়। এ পরিচয় দিয়েই সিদ্দিকের বাড়িতে ঢুকলাম।

সিদ্দিকের ঘর বলতে কিছু নেই। একখানা ঘরেই রান্না এবং শোওয়ার কাজ চলে। বাড়িতে স্ত্রী ও একটি বোন। ১৪/১৫ বছরের বোনটি অপূর্ব সুন্দরী। আমাদের দেখে তার আনন্দের সীমা নেই। মেয়েটি মুক্তিবাহিনীর লোকদের ভালোবাসে। আর আমার চিন্তা ছিল যাদের বাড়ি এলাম, তাদের খাবার সঙ্গতি আছে কিনা। সিদ্দিক নৌকা চালায়। সীমান্তে গোলাগুলি হওয়ার ফলে নৌকা চালানো বন্ধ। অর্থাৎ সিদ্দিকের কোনো রোজগার নেই। আমি শহিদুল্লাকে বাজারে পাঠালাম। চাল, ডাল, তেল সব কিনে আনবার জন্যে। এমনি করে প্রথম দিকে ভালোই কাটল। রাতে সিদ্দিকের বোন নাফিয়া চিৎকার

www.nagorikpathagar.com

করে। সীমান্তে গোলাগুলির শব্দ। ও বলে এবার থ্রি নট থ্রি তারপরে এলএমজি। তারপরে এইচএমজি। তারপরে মর্টার, তারপর পাঞ্জাবরা সব শেষ। নাফিয়া গুলির শব্দ শুনেই যন্ত্রের নাম বলতে পারে।

কিন্তু আমি কী করবো? ভারতে যেতে পারছি না। ঢাকা আসাও সহজ নয়। যেখানে আছি সেখানে প্রতিদিন সন্দেহ বাড়ছে। নাফিয়া বলছে, ভাই তুমি বাইরের লোক সামলাও, আমি ঘর সামলাব। চারদিকে ছড়িয়ে গেছে, মুক্তিবাহিনীর একজন জেনারেল এখানে আছে। তাই বিভিন্ন এলাকার তরুণরা আসছে সারা দিনরাত। আর ভয় পাচ্ছে মানুষ। বাড়ির লোক রাজি হচ্ছে না আমাকে রাখতে।

এমন সময় নাফিয়াদের এক আত্মীয় এল আড়জঙ্গল থেকে। আড়জঙ্গল সীমান্ত এলাকায়। আড়জঙ্গল পার হতে পারলে আগরতলা যাওয়া যাবে। কিন্তু আড়জঙ্গল যেতে মাঠের পর মাঠ পানি। পাকবাহিনীর ভয়ে নৌকা চলাচল বন্ধ। সাঁতার কেটে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। সাঁতার কেটে যেতে হলেও সীমান্তে একটি সেতু আছে। ওই সেতুতে রাজাকার পাহারা দেয়। সিদ্ধান্ত হলো, কৃষ্ণপক্ষের রাতে ওই সেতু পর্যন্ত সাঁতরে যাব। তারপর ডুব দিয়ে সেতু পার হব। কিন্তু রাজি হলো না শহিদুল্লাহ। সে কান্নাকাটি শুরু করল। তার কথা হচ্ছে ওখানে আপনি গুলিতে মারা গেলে লাশটা কোথায়ও নিয়ে যেতে পারব না। কেউ জানবে না আপনার মৃত্যুর কথা। আমরা কেউ ফিরতে পারব না। সুতরাং সে সিদ্ধান্ত বাতিল হলো।

এবার ঠিক হলো বুড়িচং থানার কাছে দিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিতে হবে। আমি আর সিদ্দিক রেকী করার জন্যে বের হলাম। ভাবখানা এমন আমরা কোথাও মেয়ে দেখতে যাচ্ছি। রাস্তায় এমন ধরনের কথা বলেই এগুচ্ছিলাম। বুড়িচং যাওয়ার আগেই বুঝলাম কাজ হবে না। কারণ বুড়িচং সীমান্তে সেদিন মুক্তিবাহিনী বারো জন পাকবাহিনীকে মেরে ফেলেছে। তাদের কবর দেয়া হচ্ছে বুড়িচং-এ। আমরা এবার বলধাবাজার হয়ে বাড়ি ফিরলাম। রাতে সিদ্ধান্ত নিলাম এবার ঢাকা ফিরতে হবে। ওই পথে আর সীমান্তে যাওয়া হচ্ছে না। আমরা চলে যাব। নাফিয়ার মোটেই ভালো লাগছিল না। তাই সে ঘুমে থাকতে ভোর রাতেই আমরা ঘর থেকে বের হলাম। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের কাছে কোনো ছাতা নেই। সিদ্দিক আমাদের গোমতীর পাড় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। বলে গেল নাফিয়ার কথা। সে কাহিনীতে পড়ে আসছি।

কলকাতায় এসে বিপদে পড়ে গেলাম। আগেই লিখেছি কলকাতা আগরতলা নয়। আগরতলার পথে সারাদিন মুক্তিযোদ্ধাদের দেখা যায়। তাদের

www.nagorikpathagar.com

সঙ্গে কথা বলা যায়। বাংলাদেশের খবর পাওয়া যায়। খবর পাওয়া যায় ঢাকা শহরে। কলকাতায় সে সুযোগ নেই। প্রথম সংবাদপত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। নইলে যেতে হয় মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে। সাতক্ষীরা সীমান্তে ৯ নম্বর সেক্টরের সদর দপ্তর। সেখানে গেলে খবর পাওয়া যায়। প্রতিদিন মুক্তিবাহিনীর এলাকা থেকে কোলকাতার তরুণরা আসে। আমি ৩৭ নম্বর রিপন স্ট্রিটে ক্রান্তি প্রেসে থাকি। ক্রান্তি প্রেস থেকে আরএসপির মুখপত্র গণবার্তা প্রকাশিত হয়। ওই প্রেসের ভবনেই আরএসপির কেন্দ্রীয় নেতারা থাকেন। সর্বভারতীয় নেতাদের মধ্যে আছেন আরএসপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড ত্রিদিব চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড মাখন লাল, কেন্দ্রীয় নেতা ননী ভট্টাচার্য, মৃন্ময় চক্রবর্তী, প্রধান নেতা মনি চক্রবর্তী প্রমুখ। এরা এক সময় সকলেই অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। জেলখানায় তাঁরা মার্কস ও লেনিনের বই পাঠ করেন এবং সাম্যবাদে দীক্ষিত হন। কিন্তু স্ট্যালিনের নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁদের দ্বিমত ছিল। তাঁরা মনে করতেন স্ট্যালিনের পথে ভারতবর্ষে বিপ্লব করা যাবে না। ত্রিশের দশকে জেলখানায় থাকতেই তাঁরা নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এঁরা তখনো অনুশীলন সমিতির সদস্য হলেও প্লাটফর্ম হিসেবে কংগ্রেসের কাজ করতেন।

ত্রিশ দশকের শেষ দিকে কংগ্রেসের মহাত্মা গান্ধী বনাম নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বিরোধ দেখা দেয়। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পথে। সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছিলেন, যুদ্ধের সুযোগে ব্রিটিশকে আঘাত করতে হবে। কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ব রাজি হলেন না। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত গান্ধীর প্রার্থীকে হারিয়ে সুভাষ বস জয়লাভ করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন নিয়ে সুভাষ বসুর সঙ্গে গান্ধী গ্রুপের আবার মতান্তর হয়। এবার সুভাষ বসু ভোটে পরাজিত হন। সুভাষ বসুকে একমাত্র সমর্থন করেন ফরোয়ার্ড ব্লক এবং অনুশীলন সমিতির সদস্যরা (যাঁরা পরবর্তীকালে আরএসপি গঠন করেন)। ভোটে নিরপেক্ষ থাকে জয় প্রকাশের সিএসপি ও কমিউনিস্ট পার্টি।

এই পরাজয়ের পর সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৪০ সালের ১৯ মার্চ বিহারের রামগড়ে আপোষ বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেরনে অনুশীলনের অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যোগদান করেছিলেন। রামগড়ে অনুশীলনের বিপ্লবীরা নতুন দল গঠন করেন। দলের নাম Revolutionary Socialist Party—R.S.P অর্থাৎ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল। তবে দল গঠনের পর তাঁরা তেমন ভূমিকা রাখতে পারেননি। পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে নেতৃস্থানীয় সকল সদস্যই

www.nagorikpathagar.com

গ্রেফতার হয়ে যান এবং এক নাগাড়ে ৫ থেকে ৬ বছর জেলে থাকেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কারাগারে থাকতে হয়।

ছাত্রজীবনে বরিশাল জেলার কলসকাঠি স্কুলে পড়তাম। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় কলসকাঠি ডাকঘর ও স্টিমার স্টেশন পুড়িয়ে দেয়া হয়। মুখ্যত এ আন্দোলন পরিচালনা করেছিল আরএসপি। তখন থেকে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। স্কুল জীবন শেষে বরিশালের বিএম কলেজে পড়তে এলাম। ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। কোলকাতায় মিছিলে পুলিশের গুলিতে মারা যায় রামেশ্বর বন্দোপাধ্যায়। সেও ছিল আরএসপির ছাত্র ফ্রন্টের সদস্য। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরএসপির নেতারা মুক্তি পেতে থাকেন। তারা সবাই মুক্তি পান ১৯৫৬ সালে। তারপর ১৯৪৭ সাল। সংগঠন হিসেবে আরএসপির বিস্তার লাভের পূর্বেই দেশ ভাগ হয়ে যায়। অধিকাংশ নেতৃত্ব হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির হওয়ায় তারা প্রায় সকলেই দেশান্তর হয়। তাদের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কলকাতায়। আমি ঢাকায় ফিরে গ্রেফতার হয়ে যাই ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে। জেলখানা থেকে বের হতে হতে ১৯৫৩ সাল। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার আমাকে পাসপোর্ট দেয়নি। তাই ৭১-এর পূর্বে কলকাতার আরএসপির কোনো বন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

দেখা হলো ১৯৭১ সালের এপ্রিলে। সীমান্ত পার হয়ে আগরতলা গিয়েছি। আগরতলা থেকে কলকাতা। আমার থাকার ব্যবস্থা হলো আরএসপির নেতাদের সঙ্গে ক্রান্তি প্রেসে। ক্রান্তি প্রেসে ঢুকে বুঝলাম বিপ্লব কথার কথা নয়। যাদের নিজের আচার আচরণে বিপ্লবের কোনো ছাপ নেই তাদের পক্ষে বিপ্লব করা সম্ভব নয়। ক্রান্তি প্রেসে ভাত খেতে গিয়ে বুঝতে পারলাম ভিন্ন জগতে এসেছি। খাবার সময় কমরেড মাখন পাল বললেন—কমরেড, খাবার পর থালা কিন্তু আপনাকেই ধুতে হবে। এখানে থালা ধোয়ার জন্যে কোনো মানুষ নেই। সবাই এখানে স্বাবলম্বী। দেখলাম ত্রিদিব চৌধুরীসহ সকলেই থালা নিয়ে কলতলায় যাচ্ছেন। পরের দিন দেখলাম মাখন পাল ভোরবেলা উঠেই কাপড় কাচতে শুরু করেছেন। এখানে কাপড় পরিষ্কার করার সকল প্রক্রিয়া নিজেকে সম্পাদন করতে হবে। শুধুমাত্র ইস্ত্রি করার জন্যে কাপড় লন্ড্রিতে পাঠানো যায়। আমাদের ঘরে বাইরের কাউকে এক কাপ চা খাওয়াতে হলেও কোথা থেকে পয়সা আসবে তা আগে থেকে ঠিক করতে হয়। কারণ সাধারণ মানুষের সাহায্য সহযোগিতায় রাজনৈতিক দল চলে। তাদের সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত বিলাসিতার সুযোগ নেই। এ

www.nagorikpathagar.com

অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল প্রথমেই। প্রথমবারের অভিজ্ঞতা নিয়ে দ্বিতীয়বার ক্রান্তি প্রেসে গিয়ে আমার তেমন অসুবিধা হয়নি। অন্তত বুঝতে পেরেছি এ রাজনীতির টাকা যেনতেনভাবে খরচ করা যায় না।

এছাড়াও একটি ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম এপ্রিল মাসে কলকাতায় গিয়ে। ক্রান্তি প্রেস থেকে বিকেলে লেনিন সরণিতে আরএসপির দফতরে গেলাম। সেখানে ত্রিদিব চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। কথায় কথায় শুনলাম বাংলাদেশের বিভিন্ন দলের নেতারা ইতোমধ্যে আরএসপি অফিসে এসেছেন। অনেক কথাবার্তা হয়েছে। তবে সেসব কথা তেমন এগোয়নি। তাঁরা সকলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন বাংলাদেশের সঠিক পরিস্থিতি জানার জন্যে।

ত্রিদিব বাবুর কক্ষে ঢুকতেই তিনি আমাকে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের দেশে কি আত্মগোপনকারী চরমপন্থী কোনো দল আছে? গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকলেও এরা প্রকাশ্যে আসে না। এরা চরম জাতীয়তাবাদের শ্লোগান দেয়।

ত্রিদিব বাবুর কথা শুনে আমি খানিকটা বিস্মিত হলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আমাকে এ প্রশ্ন কেন করছেন? তিনি বললেন, অধুনা তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। চরম জাতীয়তাবাদী শ্লোগান দিয়ে দল উপদল গঠিত হচ্ছে। এরা কিছুতেই প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে রাজি নয়। আমাদের খবর হচ্ছে এ ধরনের দল উপদল মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী সিআইএ-এর সৃষ্টি। দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের আন্দোলন ব্যাহত করার জন্যে সিআইএ-এর ভূমিকা দীর্ঘদিনের।

তখন বাংলাদেশের অনেক ঘটনাই আমার মনে পড়েছিল। আমাদের দল গঠনের পর আমরা প্রথম জনসভা করেছিলাম ১৯৭০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে। সভা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই খবর এল প্রেস ক্লাবের সামনে পাকিস্তান কাউন্সিলে বোমা হামলা হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ পর দৈনিক মর্নিং নিউজের একজন রিপোর্টার আমাদের জনসভায় এল। আমাকে দূরে নিয়ে গেল। বলল, জনসভা ভেঙে দিয়ে কোথাও পালিয়ে যাও। কারণ বোমা হামলা করতে গিয়ে যারা ধরা পড়েছে তারা তোমার নাম বলেছে। সুতরাং তুমি গ্রেফতার হয়ে যেতে পার। আমরা তাড়াতাড়ি জনসভা শেষ করলাম। কিন্তু আমি আত্মগোপন করলাম না।

সাংবাদিক বন্ধুর কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। একথা সত্যি যে একটি আত্মগোপনকারী দল তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলেছিল। তাদের

www.nagorikpathagar.com

একটি সম্মেলনের জন্যে আমি একটি ছোট বক্তব্য লিখে দিয়েছিলাম। সেই বক্তব্যের মধ্যে তিনটি স্লোগান ছিল। স্লোগান তিনটি হচ্ছে—আমার নাম তোমার নাম—ভিয়েতনাম। আমার বাড়ি তোমার বাড়ি—নকশালবাড়ি। আমার দেশ তোমার দেশ—বাংলাদেশ।

ত্রিদিব বাবুর প্রশ্ন শুনে আমার এই কথাগুলো মনে হলো। তবে আমি সরাসরি ত্রিদিব বাবুর প্রশ্নের জবাব দিলাম না। শুধু বললাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এখন একান্তই বাস্তব। এর পেছনে কারো ষড়যন্ত্র আছে কিনা তা একান্তই গৌণ।

এ ছিল ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের কথা। জুন মাসে কলকাতা থেকে আগরতলার ফিরে গিয়েছিলাম। জুলাইয়ের প্রথম দিকে গিয়েছিলাম বাংলাদেশে। আগস্টের শেষে বাংলাদেশ থেকে আগরতলায় ফিরেছি। অক্টোবরে আবার কোলকাতায়। আবার ক্রান্তি প্রেস। এবার ক্রান্তি প্রেসে অনেক বাংলাদেশের তরুণ দেখলাম। মুখ্যত এই তরুণরা এসেছে বরিশাল জেলা থেকে। বরিশালে এককালে আরএসপির শক্তিশালী সংগঠন ছিল। তরুণদের কাছে আরএসপির নাম পরিচিত। তাই ওরা খুঁজে খুঁজে আরএসপির প্রেসে এসেছে। আমার নাম করেছে। প্রেস থেকে ছাপিয়ে নিচ্ছে তাদের মুখপত্র।

১৯৭১ সালের সংগ্রামের কালে অসংখ্য সাপ্তাহিক বের হয়েছে সারা পশ্চিমবঙ্গে। এই পত্রিকাগুলো বের করত বাংলাদেশের তরুণরা। এতে মুক্তিযুদ্ধের খবর থাকত। বিপ্লবী বাংলাদেশসহ এ ধরনের অনেক সাপ্তাহিক ক্রান্তি প্রেসে ছাপা হতো। পত্রিকা ছাপার জন্যেই প্রতি সপ্তাহে তরুণদের ক্রান্তি প্রেসে আসতে হতো। আমার মনে হতো তারাই ছিল যুদ্ধের সঠিক সংবাদদাতা। তারা মুক্তিবাহিনীর তরুণদের মনের কথা জানত। শরণার্থীদের মনের কথা জানত। জানত বড় বড় নেতাদের মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা।

বিপ্লবী বাংলাদেশের তরুণরা আসত বসিরহাটের টাকী থেকে। তাদের এলাকার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মরহুম এমএ জলিল। জলিল সাহেবকে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তেমন পছন্দ করত না। পছন্দ করতেন না জেনারেল ওসমানী। বারবার তাঁকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জলিল সাহেব সরেননি। আমার যতদূর মনে হয় জলিল সাহেব কাউকে তোয়াক্কা করতেন না এবং তাঁর সেক্টরেই একমাত্র সংখ্যাধিক্য ছিল বামপন্থীদের। অন্যান্য সেক্টরে তখন বামপন্থীদের রিক্রুট প্রায় বন্ধ।

জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর। তিন মাসে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। এই তিন মাসের ঘটনার সঙ্গে আমার তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। জুলাইয়ে

www.nagorikpathagar.com

আগরতলা থেকে ঢাকায় চলে যাই। ঢাকায় যাওয়ার লক্ষ্য ছিল বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলা। যুদ্ধের জন্যে লোক সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ এবং আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ করা। ভেবেছিলাম আগস্টের মধ্যে ভারতে ফিরতে পারব। কিন্তু তেমনটি হলো না। ফিরতে ফিরতে সেপ্টেম্বর। এই তিন মাসের মধ্যে মুজিববাহিনী গঠিত হয়েছে। গঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলা সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। আর ভারতে স্বাক্ষরিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি। ৭১-এর যুদ্ধের ইতিহাসে এ তিনটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুজিববাহিনী গঠন সম্পর্কে অনেক বিতর্ক আছে। অনেকের ধারণা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে না জানিয়ে। তাজউদ্দিনকে নিয়ে নানা প্রশ্ন ছিল। অনেকের ধারণা তিনি বামপন্থী। মার্কিন বিরোধী। তিনি শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে তা নিয়ে ভারত সরকার চিন্তিত ছিল। ভারত সরকার কিছুতেই চাইবে না যে, তার পূর্বাঞ্চলে একটি বাম সরকার গঠন হোক।

এছাড়া প্রশ্ন ছিল পাকিস্তানে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে। পাকিস্তান থেকে শেখ সাহেব আদৌ ফিরবেন কি না, তা ছিল একান্তই অনিশ্চিত। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে শেখ সাহেব কী ভূমিকা নেবেন তাও ছিল বিতর্কিত। এছাড়া প্রশ্ন উঠেছিল শেখ সাহেব যদি আদৌ না ফিরে আসেন তাহলে বাংলাদেশের ভবিষ্যত রাজনীতির চিত্র কী হবে, নেতৃত্ব কে করবে। এদিকে বামপন্থী তাজউদ্দিন, অপরদিকে চরম কমিউনিস্ট বিরোধী তৎকালীন ছাত্রলীগের নেতৃত্ব। অনেকের ধারণা, এই বিবেচনা থেকেই ছাত্রলীগের নেতৃত্বে মুজিববাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। আগরতলায় সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে মুজিববাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনেছি। শুনেছি মুজিববাহিনীকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে না। শুনেছি মুজিববাহিনীর দায়িত্ব হচ্ছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজাকার, শান্তিবাহিনী এবং বামপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করা। একথাটা এমনভাবে প্রচারিত ছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেক বামপন্থী নেতাকেই গা ঢাকা দিয়ে বাংলাদেশে ফিরতে হয়েছে। আমাদের দলের একমাত্র আমিই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সড়ক পথে দেশে ফিরেছি। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের ভিন্নপথে বাংলাদেশে ঢুকতে হয়েছে। রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মতে, মূলত মুজিববাহিনী গঠিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশে বামপন্থীদের ঠেকাতে এবং

www.nagorikpathagar.com

আওয়ামী লীগের চিরাচরিত ডানপন্থী রাজনীতি অব্যাহত রাখার জন্যে। এ লক্ষ্যে ভারতের শাসক শ্রেণি ভারতে এই বাহিনী গড়ে তুলেছিল। আমি কলকাতায় গিয়ে একথাও শুনেছি যে, মুজিববাহিনী গঠনের বিরুদ্ধে তাজউদ্দিন প্রতিবাদ জানাবার পর নতুন রিক্রুট বন্ধ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ভিন্নমত আছে ভিন্ন মহলের। দেশ স্বাধীন হওয়ার ২৬ বছর পরেও মুজিববাহিনী গঠন সম্পর্কে সঠিক কোনো মূল্যায়ন হয়েছে বলে আমার চোখে পড়েনি।

এই সময়ে দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে স্বাধীন বাংলা সরকারের উপদেষ্টা কমিটি গঠন। এই উপদেষ্টা কমিটিতে আওয়ামী লীগ ব্যতিত আরো ৪টি দলের সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন—ভাসানী ন্যাপের মওলানা ভাসানী, ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মনি সিং এবং জাতীয় কংগ্রেসের মনোরঞ্জন ধর। এই কমিটি গঠনেই প্রতিভাত হয়, সব মহল মিলে একটি আপোষ করার চেষ্টা হয়েছে। সেকালে পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ ছিল না। মোজাফফর ন্যাপও সোভিয়েতপন্থী বলে পরিচিত ছিল। সকলেরই ধারণা '৭১-এর যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের অন্যতম বড় সহায়ক শক্তি ছিল বলে তাদের প্রভাবেই কমিউনিস্ট পার্টি এবং ন্যাপকে উপদেষ্টা কমিটিতে নেয়া হয়েছিল। আমি শুনেছি ভারত সরকারের কাছেও প্রথমে এ প্রস্তাবনা গ্রহণযোগ্য হয়নি। উপদেষ্টা পরিষদে শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নপন্থীদের প্রভাব তাদের চোখেও ভালো লাগেনি। তাই উপদেষ্টা কমিটিতে ভারসাম্য বিধানের জন্যেই নাকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী উপদেষ্টা কমিটিতে মওলানা ভাসানী ও মনোরঞ্জন ধরের নাম প্রস্তাব করেন। অথচ ভারতে আমরা যারা ছিলাম আমাদের জানানো হয়েছিল, মওলানা ভাসানী নজরবন্দি আছেন। তাঁর স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অনুমতি নেই। এ ব্যাপারে অনেক লেখালেখি হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এবং পরে।

একটি মহলের মতে, মওলানা ভাসানীকে নজরবন্দি রাখা হয়েছিল তাঁর নিরাপত্তার জন্যে। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি মহলের কাছে তিনি আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। মওলানা ভাসানী সম্পর্কে অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতে অনেক ঘটনাই ঘটেছে যা আদৌ বাঞ্ছিত ছিল না। আওয়ামী লীগের কট্টর সমালোচকদের এ জন্যে অনেক মাশুল দিতে হয়েছে। তুখোড় মুক্তিযোদ্ধা হয়েও আওয়ামী লীগের কট্টর সমালোচক বলে কলকাতায় অনেকের জীবন

www.nagorikpathagar.com

বিপন্ন হয়েছে। এই মহলের মতে, এই বিবেচনায় মওলানা ভাসানীকে নিরাপত্তা দেয়া ছিল ভারত সরকারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। মওলানা ভাসানীকে কেন্দ্র করে কোনোকিছু ঘটলে তার সব দায়িত্বই ভারত সরকারকে বহন করতে হতো। তাই তাঁর ব্যাপারে উদাসীন থাকা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর বাংলাদেশের রাজনীতিতে মওলানা ভাসানী যে কত গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ হয়েছে তাঁকে উপদেষ্টা কমিটিতে নেয়ার পর।

আগরতলায় পৌঁছে এই কমিটি গঠনের সংবাদ পেয়ে আমার মনে হলো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কোন্দল কিছুটা থামবে। ভারতের মাটিতে এটা স্পষ্ট ছিল, আমরা সকলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক হলেও আমরা এক রাজনীতির লোক নই। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক তফাৎ আছে। ভারতের মাটিতে দেখেছি, মস্কোপন্থীদের যুক্তফ্রন্ট গঠনের দাবিতে সভা সমাবেশ করতে। পিকিংপন্থীদের দেখেছি মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ভিন্ন কমিটি গঠন করতে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদেরও নিজস্ব দলীয় ভূমিকা ব্যাখ্যা করার জন্যে কলকাতায় গিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করতে হয়েছে। তবে উপদেষ্টা পরিষদ যে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল থামাতে পারেনি তার প্রমাণ হচ্ছে মুজিববাহিনী গঠন।

এ সময়ের তিন নম্বর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়নের ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি। এ নিয়ে অনেক কথা আছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জারের চীন সফরের পর। ৭১-এর সংগ্রামের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও কিসিঞ্জার ছিলেন চরম ভারত বিরোধী। এই দুই ব্যক্তি সংগ্রামের সময় পাকিস্তানকে সকল পকার সাহায্য করেছিলেন। তার মাশুলও তারা আদায় করেছে পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে।

তখন বিশ্ব রাজীতিতে মস্কো এবং পিকিং মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মস্কোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালো ছিল। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো পাকিস্তানের। আর চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক তখন সবচেয়ে খারাপ। যোগাযোগই নেই। তাই নিক্সন ও কিসিঞ্জারের সিদ্ধান্ত ছিল ৭১-এর যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থনের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানের মারফত চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করা এবং এ কাজটি ভালোভাবেই করেছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার। তিনি পাকিস্তান সফরে এসে গোপনে চীনে চলে যান। চীনা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে ফিরে আসেন। জানানো হয়, এ সফর ছিল সন্তোষজনক এবং এ আলোচনার ভিত্তিতেই চীন-মার্কিন সম্পর্ক উন্নত হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.com

তবে এ সম্পর্কোন্নয়নের একটি ভিন্ন প্রেক্ষিত ছিল। সে কথাও সকলের কাছেই খুব স্পষ্ট ছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় চীন-মার্কিন সম্পর্ক উন্নয়ন ভারত সরকারকে বিব্রত করে। আমাদেরকেও শঙ্কিত করে তোলে। কারণ তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এ যুদ্ধে চীন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ করলে ভারত এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিপদ। সুতরাং চীনকে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এ পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো দিল্লি সফরে আসেন। ভারত সোভিয়েত ইউনিয়ন ২৫ বছরের শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বলা হয়, কোনো তৃতীয় পক্ষ এই চুক্তিবদ্ধ দু'টি দেশের কোনো একটিতে আক্রমণ করলে এ দু'টি দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সে আক্রমণ মোকাবেলা করবে। অর্থাৎ ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে চীন অংশগ্রহণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন বসে থাকবে না। এই চুক্তির পর স্পষ্ট হয়ে উঠল, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এ যুদ্ধ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

যদিও এ যুদ্ধ সম্পর্কে ভারত সরকার কোনো উচ্চবাচ্য করছিল না। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বারবার বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি জানানো হচ্ছিল। কিন্তু ভারত সরকার রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু কেন?

সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ৭১-এর যুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাস। এই তিন মাসে যুদ্ধ তীব্র হয়েছে। আবার তীব্র হয়েছে ষড়যন্ত্র। এ মাসগুলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। ইতোমধ্যে অসংখ্য তরুণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। এক সময় ছিল যখন ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিতে হতো। অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হতো। মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের শিকার হতে হতো।

সে পরিস্থিতি এখন আর নেই। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন বাহিনী গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশেই তারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। দেশে থেকেই তারা অস্ত্র সংগ্রহ করছে। গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছে শহরে গ্রামে গঞ্জে। এদের অনেকের সঙ্গে বাইরের কারো কোনো সম্পর্ক নেই। এদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বা সরকারিভাবে স্বীকৃতি মুক্তিবাহিনীর। অর্থাৎ ৭১-এর যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধে পরিণত হতে যাচ্ছিল। এর প্রতিক্রিয়াও হচ্ছিল বিভিন্ন মহলে।

www.nagorikpathagar.com

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তখন নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রচণ্ড প্রভাব। সশস্ত্র সংগ্রামের শ্লোগান তখন তরুণদের মুখে মুখে। বিভিন্ন মহলের আশঙ্কা ছিল যে এই সংগ্রামের সঙ্গে বাংলাদেশের সংগ্রামের যোগাযোগ হলে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। ৭১ এর সংগ্রাম পরিণত হবে সত্যিকারের মুক্তিযুদ্ধে।

৭১-এর সংগ্রামে এই মোড় পরিবর্তনের ফলে শঙ্কিত হয় দু'টি মহল। একটি হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা পকিস্তানি এজেন্ট। অপরটি হচ্ছে নয়াদিল্লির ভারত সরকার।

পাকিস্তানি মহলটির ধারণা ছিল আন্তর্জাতিক চাপের ফলে ভারত বাংলাদেশের এই যুদ্ধকে সার্বিক সহযোগিতা দেবে না। এক সময় আপোষের প্রশ্ন উঠবেই। তখন খুব সুচতুরভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন বা বাংলাদেশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করা হবে। যুদ্ধ তীব্রতর হওয়ার ফলে এই মহলটি প্রমাদ গুণতে থাকে। তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে এবার তাদের সাধের পাকিস্তান থাকছে না। এ পরিস্থিতি ঠেকাবার জন্যে তারা বিভ্রান্তিমূলক প্রচার শুরু করে। তারা বলতে শুরু করে যে, এভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে শেখ সাহেবকে জীবিত পাওয়া যাবে না। পাকিস্তান সরকার তাকে ফাঁসিতে লটকাবে। তাই শেখ সাহেবকে বাঁচাতে হলে ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাদের প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা কি চান? জীবিত শেখ মুজিবুর রহমান না বাংলাদেশ। জীবিত শেখ সাহেব এবং স্বাধীন বাংলাদেশ এক সঙ্গে পাওয়া যাবে না। তারা ভেবেছিল এ ধরনের প্রচার করতে পারলে মুক্তিযোদ্ধারা বিভ্রান্ত হবে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসায় পৌঁছানো যাবে। এই প্রচারের মূল নেতা ছিলেন মোশতাক আহমদ। তার এক সহযোগী আগরতলায় এ ধরনের কথা আমাকে বলেছিলেন। সেই ভদ্রলোক এক সময় আমার সঙ্গে ছাত্রলীগ করতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন নির্মল, তুমি একসময় ছাত্রলীগ করতে। সেই সুবাদে তোমার সঙ্গে আসম আবদুর রব ও শেখ ফজলুল হক মনির সুসম্পর্ক আছে। তুমি তাদের বুঝাতে পার যে এক সঙ্গে স্বাধীনতা ও জীবিত শেখ মুজিবকে পাওয়া যাবে না। সুতরাং যেভাবেই হোক পাকিস্তানের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় পৌঁছতে হবে। আমি অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম। আমি ষড়যন্ত্র আঁচ করতে পেরেছিলাম। তবুও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম রব ও মনির সাথে এ নিয়ে আলোচনা করবার। ক'দিন পর সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্যের বাসায় মনির সঙ্গে আমার দেখা হয়। মুক্তিযোদ্ধা মহলে অনিল ভট্টাচার্য অনিল দা হিসেবে বিশেষ পরিচিতি। তার মেলার মাঠের বাসা প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের বাসায় পরিণত

www.nagorikpathagar.com

হয়েছিল। সেই বাসায় আমি মনির কাছে প্রশ্নটি তুললাম। মনির জবাব হচ্ছে, মামা-বাবার জীবনের জন্যে যুদ্ধ করছি না। যুদ্ধ করছি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাবাও বেঁচে থাকবেন। কিছুদিন পরে শ্রীধর ভিলায় রবের সঙ্গে দেখা হলো। তাকে একথা বলায় সে প্রায় চিৎকার করে উঠল। বলল, পাকিস্তানি এজেন্টরা এখন নতুন পথ ধরেছে। মোশতাক সাহেবের সেই সহযোগীকে আমি এই কথা জানালাম না। শুধু বললাম, তুমি আমার কাছে একথা বলছ কেন? যদি তোমার সাহস থাকে এ প্রস্তাব নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থী শিবিরে যাও। ওরা তোমাকে ছিঁড়ে খাবে। এরপর আমি এ নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখি। নিবন্ধটি কোলকাতায় আরএসপির মুখপত্র সাপ্তাহিক গণবার্তায় প্রথম সংবাদ হয়ে ছাপা হয়েছিল। লেখার শিরোনাম ছিল 'সাহস থাকে তো এ প্রস্তাব নিয়ে মুক্তিবাহিনী ও শরণার্থী শিবিরে যান।' কোলকাতা থেকে একই ধরনের খবর পাওয়া গেল। মোশতাক সাহেবের এক সাগরেদ এক মার্কিন কূটনীতিকের সঙ্গে দেখা করেছে। এ নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে স্বাধীন বাংলা সরকারের মহলে। খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল।

এ ব্যাপারে আমি একেবারেই অনেক দূরের লোক। স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে ভারতে গিয়েছি। বাংলাদেশে ফিরেছি বারবার। ঢাকায় যাতায়াত করেছি। আগরতলা এবং কোলকাতায় গিয়েছি। তবে স্বাধীন বাংলা সরকারের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

একদিন বালিগঞ্জে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। পরে শুনেছি এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রেও নাকি বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট হয়। নেতাদের মধ্যে কলকাতায় ফনী মজুমদার এবং অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আগরতলায় দেখা হয়েছে খন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে। কারো কথায় কোনো মিল খুঁজে পাইনি। কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ সাংবাদিক শিক্ষক এবং সংস্কৃতি কর্মীদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কখনো কখনো মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে আবার কখনো শরণার্থী শিবিরে গিয়েছি। আমার কাছে সবকিছুই অগোছালো মনে হয়েছে। মনে হয়েছে এ যুদ্ধের যেন কোনো পূর্ব প্রস্তুতিই ছিল না। কে যেন আমাদের ওপর এ যুদ্ধটা চাপিয়ে দিয়েছে।

তবে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের সঙ্গে দেখা হলে খুব ভালো লাগত। কলকাতায় গিয়ে শুনেছি আমাদের ছেলেরাই ভারতের মাটিতে প্রথম মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প গঠন করেছে। এ ক্যাম্প ছিল নদীয়া জেলার গেদে

www.nagorikpathagar.com

সীমান্তে। যুদ্ধের প্রথম দিকে এ যুদ্ধ সম্পর্কে আমার সংশয় থাকলেও সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে পরিষ্কার হয়ে আসছিল যে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। আমি আগেই বলেছি যে এই সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে যুদ্ধ তীব্র হতে শুরু করে। দিশেহারা হয়ে যায় পাকিস্তানের দালালেরা।

শঙ্কিত হয়ে ভারতের নয়াদিল্লি সরকার। প্রায় এক কোটি শরণার্থী। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র নকশালদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের যোগাযোগ। বামপন্থীদের একটি প্রচণ্ড প্রভাব দিল্লি সরকারকেও শঙ্কিত করে তুলছিল। এ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে পশ্চিমবাংলা থেকে নাগাল্যান্ড পর্যন্ত এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে পারে। সৃষ্টি হতে পারে এক বৃহত্তর মুক্তিযুদ্ধের পরিবেশ। ভারত সরকারের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয় এবং এই পরিস্থিতিতে '৭১-এর যুদ্ধ যতো শিগগিরই সম্ভব শেষ করে দেয়াই ছিল ভারত সরকারের লক্ষ্য এবং এ বিবেচনা থেকেই আমি বাড়িতে জানিয়েছিলাম, বছর শেষে আমি বাড়ি ফিরবই।

কিন্তু ইচ্ছে হলেই ভারত সরকারের পক্ষে যুদ্ধ শেষ করা সম্ভব ছিল না। তাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে। ভারত সরকার আদৌ নিশ্চিত হতে পারছিল না যে পাকিস্তান সরকার শেখ সাহেবকে নিয়ে কী করবে বা শেখ সাহেব মুক্তি পেলেও কি ভূমিকা গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কেও সন্দেহ ছিল। এ সন্দেহ ছিল শেখ সাহেব সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের চরম অজ্ঞতার জন্যে। স্বাধীনতা যুদ্ধের ৯ মাসে আওয়ামী লীগের কোনো নেতাই শেখ সাহেবের চিন্তা-ভাবনা এবং সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আদৌ কোনো তথ্য দিতে পারেননি। এমনকি তাজউদ্দিনের সঙ্গে ভারত সরকারের প্রতিনিধির প্রথম সাক্ষাতকারের সময় তাজউদ্দিন সাহেব শেখ সাহেব সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। তখন শেখ সাহেব পাকিস্তান সরকারের হেফাজতে। এ খবর ভারত সরকার জানলেও তাজউদ্দিন সাহেবদের জানা ছিল না। ফলে প্রথম থেকেই ভারত সরকার বাংলাদেশের নেতৃত্ব সম্পর্কে খুব একটা আশ্বস্ত ছিল না। এরপর ছিল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল। তাজউদ্দিন সাহেবের প্রধানমন্ত্রী হওয়া অনেক নেতাই ভালোভাবে নেননি। ছাত্রলীগ নেতারা প্রকাশ্যেই তাজউদ্দিন সাহেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এ পরিস্থিতি আমাদের ভালো লাগেনি। কোলকাতায় পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। ভারতের নেতাদের মনেও সংশয় দেখা দিয়েছে। এই দ্বিধা বিভক্ত আওয়ামী লীগের কোনো উপদলটি শেখ মুজিবের কাছের এবং অনুরক্ত। আমার মনে হয়েছে শেখ সাহেবের ভূমিকা ও আওয়ামী

www.nagorikpathagar.com

লীগের নেতৃত্বের কোন্দলকে কেন্দ্র করে দিল্লি সরকারের যে সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত সে সংশয় দূর হয়নি।

শুনেছিলাম জুলাই মাসে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের সাংসদদের সঙ্গে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর অনেক কথা হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে স্বাধীন বাংলা সরকারকে স্বীকৃতি দানের দাবি উঠেছিল। ভারত সরকার তখন সে ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি। কারণ তখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হয় এবং ভারত সরকারের এই পদক্ষেপ জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্যের কাছে গ্রহণযোগ্য হতো না। এমনিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন বা মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক দেশগুলো পাকিস্তানের পক্ষে ছিল।

এ পরিস্থিতিতে শুনেছি শ্রীমতি গান্ধী পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, বাংলাদেশের সাংসদদের। তার প্রশ্ন ছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়া হলে তিনি কী ভূমিকা নেবেন সে সম্পর্কে কেউ কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারে? অথচ তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত নেতা। কোনো পদক্ষেপ নিতে হলে ভারত সরকারকে শেখ সাহেবের ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, ওই বৈঠকে শেখ সাহেবের ভূমিকা সম্পর্কে কেউই নাকি ভারত সরকারকে কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারেনি এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারকে নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। তবে এ সবই আমার শোনা কথা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এ সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে তাঁর দু'টি বক্তব্য ছিল। তিনি বলেছিলেন এক কোটি শরণার্থী ভরণ-পোষণ করা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো ভারতকে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়া হোক। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান করা হোক। এটাই ভারত সরকারের একমাত্র আবেদন।

এ বক্তব্য নিয়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন। সাধারণ মানুষের সমর্থন পেলেও কোনো সরকারের কাছ থেকেই তিনি সুস্পষ্ট কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারেননি। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকালে প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমবারের জন্যে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে বাংলাদেশ ব্যবহারে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট পদগর্নির আলজিরিয়া সফরকালে যে যুক্ত ইশতেহার

www.nagorikpathagar.com

প্রকাশিত হয়, সেই ইশতেহারে পূর্ব পাকিস্তান শব্দই ব্যবহৃত হয। অর্থাৎ একমাত্র রুশ-ভারত ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি ছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো কিছুই ভারতের পক্ষে ছিল না। এই পটভূমিতে ভারতকে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

অক্টোবর পর্যন্ত আমি আগরতলায় ছিলাম। তখন আমাদের দলের আহ্বায়ক বাংলাদেশ হতে আগরতলা পৌঁছেছেন। আমার সঙ্গে আসা মোসাদ্দেক হোসেন স্বপন কমরেড মিসির আহমেদের সঙ্গে কলকাতায় চলে গেছেন। কোলকাতায় দলের পক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেছেন এবং বিভিন্ন এলাকা সফর করছেন। কুমিল্লার কমরেড আলী আব্বাস সোনামুড়াতে আছেন। তিনি কুমিল্লার বাগমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষক সমিতির নেতা। তাঁর এলাকা আলীশ্বরে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষ হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁরা সবাই আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতের ত্রিপুরায়। ভারতের ত্রিপুরায় তখন কী এক ভিন্ন রূপ। সকলেই বাঙালি। একদল বাঙালি ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। তাদের অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজনই থেকে গিয়েছিল বাংলাদেশে। সেই আত্মীয়-স্বজনই একাত্তর সালে আশ্রয় নিয়েছে ত্রিপুরায়। ত্রিপুরার ভাষা একান্তভাবে কুমিল্লা ও নোয়াখালীর ভাষা। সকলের কাছেই মুক্তিযোদ্ধার আদরের ধন। বাংলাদেশ থেকে যাওয়া মানুষগুলোকে তারা সাগ্রহে জায়গা দিয়েছে। তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করেছে প্রতিদিনের দুঃখ ও কষ্ট। তাদের মনেও ক্ষীণ আশা জেগেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে হয়তো আবার দেশে ফিরতে পারব।

কিন্তু এ চিত্র যেন কিছুটা চির খেল অক্টোবরে। তখন আগরতলায় বোঝা যাচ্ছিলো যুদ্ধ এগিয়ে আসছে। দিনে দুপুরে ট্যাংক চলছে রাজপথে। অশ্বারোহী সৈন্য মার্চ করছে। সীমান্তে যুদ্ধের তীব্রতা বাড়ছে। মাঝে মাঝে পাকিস্তানি গোলা আগরতলা শহরে এসে পড়ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আগরতলা শহর। বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। আট মাস কেটে যাচ্ছে। আগরতলাবাসী অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। দীর্ঘদিন পরে তাদের হয়তো মনে হচ্ছে, এ যুদ্ধ তো তাদের নয়। অন্যের যুদ্ধের জন্যে তারা সবকিছু হারাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। শহরে থাকার জায়গা নেই। পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মৃত্যুর ভয়। লক্ষ করা গেলো আগরতলা শহরে পাকিস্তানি গোলা পড়ার পর সকলেই যেন ভীত।

এমন পরিস্থিতিতে এক সন্ধ্যায় আবার পাকিস্তানি গোলা এসে আগরতলা শহরে একটি এলাকা বিধ্বস্ত করল। শহরে তখন নিষ্প্রদীপ মহড়া। আমার

www.nagorikpathagar.com

মনে হলো ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় একবার যাওয়া উচিত। আমাদের জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীরা অতিষ্ঠ। তাদের সহানুভূতি দেখানো প্রয়োজন। রাজপথে নেমে দেখলাম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকেরা সকলেই একই ধরনের চিন্তা করছে। তারাই এই গোলাগুলির মধ্যে সাহস করে রাজপথে নেমেছে। রাজপথ তখন লোকে লোকারণ্য। দীর্ঘক্ষণ রাজপথে ঘোরাঘুরি করে আমরা আশ্রয়ে ফিরলাম।

নভেম্বরের প্রথমে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে যুদ্ধ আসন্ন। এই যুদ্ধ নিয়ে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হবে কোলকাতায় অর্থাৎ স্বাধীন বাংলা সরকারের সদর দফতরে। সুতরাং আমাদের পক্ষে আগরতলায় থাকার কোনো অর্থ হয় না। আগরতলার সব দায়িত্ব কমরেড মিসির আহমেদকে বুঝিয়ে দিয়ে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমরা কলকাতা যাত্রা করলাম।

বিচিত্র এক দেশ ভারত। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাওয়া সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় সাপেক্ষ। আগরতলা থেকে বিমানে এবং সড়কপথে কলকাতায় যাওয়া যায়। আবার আগরতলা থেকে একশ' আটাশ মাইল সড়ক পথে গিয়ে ট্রেনে মেঘালয় এবং আসাম ঘুরে কলকাতায় যাওয়া যায়। আবার আগরতলা থেকে পণ্যবাহী ট্রাকের যাত্রী হয়ে গৌহাটি পৌঁছে ট্রেনে কলকাতায় যাওয়া যায়। বিমান যাত্রা ব্যয় সাপেক্ষ। আর একশ' আটাশ মাইল দুরে ধর্মনগর গিয়ে ট্রেনে কলকাতায় যাওয়াও অনিশ্চিত। গৌহাটী যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম ট্রাকে। আমরা যাত্রী তিনজন— আমি, খান সাইফুর রহমান এবং ইঞ্জিনিয়ার চন্ডী চক্রবর্তী। এক সময় চন্ডী চক্রবর্তীর বাড়ি ছিল বাংলাদেশের কুমিল্লায়। তাদের পরিবারের সকলেই আরএসপির সদস্য বা সমর্থক। সেই সূত্রে চন্ডীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। চন্ডী আগরতলার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক। চন্ডীর মা বাবা কোলকাতায় থাকেন। চাকরির জন্যে চন্ডী থাকে আগরতলায়। চন্ডী আমাদের সঙ্গে থাকায় আমাদের অনেক সুবিধা হলো।

যতদূর মনে আছে সেদিন ছিল শনিবার। বেলা দু'টোর দিকে আমরা ট্রাকে উঠলাম। ড্রাইভারের পাশে আমাদের বসার জায়গা। বসতে কোনো অসুবিধা নেই। দূর পাল্লার ট্রাকের ড্রাইভারের পাশে বসে যাতায়াত ভারতে স্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষ করে আগরতরা গৌহাটী রুটে এটা প্রতিদিনের দৃশ্য। তাই ট্রাকে দীর্ঘপথ যাওয়া আমাদের কাছে তেমন অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। এ পথে জুন মাসে আমি একবার চড়ইবাড়ি এবং করিমগঞ্জ হয়ে কলকাতায় গিয়েছিলাম।

www.nagorikpathagar.com

এ তো যাত্রা নয়, যেন এক অভিযান। যাত্রা পথ অসমতল। ট্রাক পাহাড়ে উঠছে আর নামছে। ওঠা নামার যেন শেষ নেই। গভীর রাতে আমরা একটি বাজারে পৌঁছলাম। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে রাতে ঘুমাতে হলো। ভোররাতে যাত্রা শুরু হলো নতুন পথে। এবার বদরপুরের পাহাড়। পাহাড়ের পাশে একটি মাত্র সড়ক। মুষলধারে বৃষ্টি হলে মাটির পাহাড় ভেঙে পড়ে সড়কে। সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। এ সড়কে দু'টি গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে না। এ সড়কে ঢুকতে গেলে প্রবেশ পথে একদিকে বিরাট উঁচু পাহাড়। আর একদিকে হাজার হাজার ফুট নিচে খাদ। এই খাদের দিকে তাকানো যায় না। দূরে বাংলাদেশ সীমান্তের তামাবিল। খাদের দিকে তাকালে মনে হয় যে কোনো সময় গাড়ি হয়তো খাদে পড়ে যাবে।

তবে সে সময় গাড়িতে এত কথা ভাববার অবকাশ ছিল না। সহযাত্রী হিসেবে অপূর্ব ব্যক্তিত্ব কমরেড খান সাইফুর রহমান। তাঁর জানার এবং কৌতূহলের কোনো সীমা নেই। সবকিছু যেন তার নখদর্পণে। মাঝপথে আমাদের ট্রাকে একজন যাত্রী উঠেছিল। খান সাহেবের ধারণা ওই যাত্রী মিজোরামের বিদ্রোহীদের কোনো লোক হবে। তখন মিজোরামেও বাংলাদেশের মতো অগ্নিগর্ভ। মিজোরামও স্বাধীনতা চাচ্ছে। এ ব্যাপারে খান সাহেব খুব কৌতূহলী। তার ইচ্ছে ওই যাত্রীর নিকট হতে অনেক কিছু জানা যাবে। কিন্তু ওই যাত্রী নিরব। সে কোনো কৌতূহলই দেখাল না। এক সময় গন্তব্যস্থলে নেমে গেল।

তবে এরা যে কী চায় সন্ধ্যার দিকে আমরা হাড়েহাড়ে টের পেয়েছিলাম। আর মেঘালয়ের জেলা শহর জুয়াইতে একটি ঘটনা আমাদের বিস্মিত করেছিল। জুয়াই-এর পথে সামরিক বাহিনীর এক জোয়ান আমাদের ট্রাকে উঠেছিল। বসেছিল আমাদেরই পেছনে রাখা পণ্যের ওপর। কারণ ড্রাইভারের পাশে তার আসন হয়নি। তার সঙ্গে কোনো কথা হওয়ার সুযোগ ছিল না। জুয়াই শহরে ঢুকতে দূরে ট্রাফিক পুলিশ দেখে সেই জোয়ান তড়িঘড়ি করে ট্রাক থেকে নেমে গেল। সে বললো এভাবে ট্রাক যাওয়া ট্রাফিক আইন বিরোধী। এ অপরাধে ট্রাফিক পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারে। তাই সে নেমে দাঁড়িয়েছে।

আমরা অবাক বিস্ময়ে তার কথা শুনছিলাম। আমরা ভাবতেই পারছিলাম না যে একজন সামরিক বাহিনীর জোয়ান ট্রাফিক পুলিশকে ভয় পেতে পারে। পাকিস্তানে বছরের পর বছর আমরা সামরিক আইন দেখেছি। আমরা দেখেছি ভয়ের শাসন। কাউকে তোয়াক্কা না করবার আস্ফালন। সেই সামরিক বাহিনীর

www.nagorikpathagar.com

জোয়ান একজন ট্রাফিক পুলিশকে দেখে ভয় পাচ্ছে। এ ধরনের আইনের শাসনের কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম।

জুয়াই শহরে ঢুকতে শোনা গেল, ওই শহরে সান্ধ্য আইন জারি হয়েছে। সব দোকানপাট বন্ধ। খাসিয়াদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে বাঙালি অসমিয়াদের। এ ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক। আমাদের ড্রাইভার বাঙালি। ড্রাইভার একটি বাঙালি হোটেল খুঁজবার চেষ্টা করে। ভুলে আমরা একটি খাসিয়া হোটেলে ঢুকেছিলাম। তারা আমাদের পত্রপাঠ বিদায় দিল। বলল, পাশে বাঙালি হোটেল আছে।

আমরা বাঙালি হোটেলের সন্ধান পেলাম। বাঙালি হোটেলগুলো কিছুতেই দুয়ার খুলছে না। অনেক ডাকাডাকির পর ওরা দুয়ার খুলেই বলল, তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকুন। দুয়ার খোলা রাখলেই বিপদ। খাসিয়ারা সুযোগ পেলেই হোটেলে ঢুকবে। সারারাত মদ খাবে, মাতলামি করবে, পয়সা দেবে না। ওদের কিছু বলতে গেলে দাঙ্গা বেঁধে যাবে। সুতরাং হোটেলে ঢুকলেই দরজা বন্ধ করা হবে।

রাতে ওই হোটেলেই কাটিয়েছি। ভেবেছি এ কোন জীবন! এই বাঙালিদের অধিকাংশই এককালের বাংলাদেশের লোক। দীর্ঘদিন পূর্বে এরা বৃহত্তর আসামে এসেছিল। বন কেটে বসতি গড়েছিল। স্কুল কলেজ করেছে। স্থানীয় অধিবাসীরা একদিন শিক্ষিত হয়ে দেখেছে সবকিছুর দখলদার বিদেশি বাঙালি। তাই শ্লোগান উঠেছে 'বাঙালি হটাও'। আমরা বাংলাদেশে শ্লোগান দিয়েছি 'অবাঙালি হটাও'। এই দুই শ্লোগানের সুর অভিন্ন হওয়ায় আমাদের সংগ্রামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক সময় সংকটে পড়তে হয়েছে।

কারণ আগের আসাম নেই। আসাম এখন ছয় ভাগে বিভক্ত—অসম, মিজোরাম, অরুণাচল, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়। এই ছয় ভাগের মানুষই তখন স্বাধীনতার দাবি করছে। তাদের সংগ্রাম বাঙালিদের বিরুদ্ধে।

সুতরাং তারা আমাদের সুনজরে দেখবে না তা বলাই বাহুল্য। তার প্রমাণ গৌহাটিতেও মিলেছিল।

গৌহাটি গিয়ে আর এক বিপদে পড়ে গেলাম। উঠেছিলাম এক রাজনৈতিক বন্ধুর বাসায়। বিপদ হলো দোকানে খেতে গিয়ে। অসমিয়ারা অদ্ভুত প্রকৃতির। ওরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলে। কিন্তু বাঙালিরা এলেই কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। নিখাদ অসমিয়ায় কথা বলতে শুরু করে। অসম্ভব হিংসে করে বাঙালিদের। নিজেদের ভাষায় যা খুশি তা বলতে শুরু করে। আমাদের সঙ্গে ইন্ডিয়ার চন্ডী। চন্ডী এক সময় আমাদের কাছে

www.nagorikpathagar.com

ওদের সম্পর্কে কটূক্তি করে। অসমিয়ারা মারমুখী হয়ে আসে। কোনোমতে, খাওয়া শেষ করে হোটেল থেকে আমাদের পালাতে হলো।

কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। ওরা আমাদের বাসা পর্যন্ত ধাওয়া করল। প্রতিবেশিদের ডাকতে হলো মীমাংসার জন্যে। আমরা পরিস্থিতি এড়াবার জন্যে বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম। চলে গেলাম গৌহাটি স্টেশনে। কোনোমতে ট্রেনে চেপে হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ট্রেন ছাড়বার পর মনে হলো, এ কোন পরিবেশে এসে পৌঁছলাম। আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে ভারতে এসেছি। আমরা তাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছি। সর্বত্রই স্নেহ এবং ভালোবাসা পেয়েছি। কিন্তু এমন পরিবেশের মুখোমুখি হইনি। আগের রাতে জুয়াইতে খাসিয়াদের আক্রমণ এবং পরের দিন গৌহাটিতে অসমিয়াদের আক্রমণ আমাকে ভাবিয়ে তুলল। আমরা এসেছি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাংলাদেশ স্বাধীন করতে। আর ওরা যুদ্ধে নেমেছে বাঙালিদের বিরুদ্ধে। ওদের আন্দোলন, বাঙাল খেদাও আন্দোলন। আমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে—ওরা তাহলে বাঙালিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে কেন? তাহলে ওদের কাছে কি বাঙালিরা আমাদের কাছে পাকিস্তানীদের মতো। বাঙালিরা কি এখানে শোষক? নাকি বহিরাগত এবং ভিন্ন ভাষাভাষি বলে ওই এলাকায় বাঙালিরা অবাঞ্ছিত?

ভারতের পূর্বাঞ্চলে এ পরিস্থিতির একটি তাৎপর্য আছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতি স্বাধীনতা আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনের সঙ্গে কখনো বামপন্থী ছাপ আবার কখনো ডানপন্থী নেতৃত্ব আছে। আমার মনে হয়েছে এই আন্দোলনে ডানপন্থী প্রভাব থাকার ফলে শোষণবিরোধী আন্দোলন জাত-পাত সম্প্রদায় এবং কখনো বহিরাগত বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আমার সেদিন মনে হয়েছে এ আন্দোলন সঠিক নেতৃত্ব না পেলে ভারতের সমগ্র পূর্বাঞ্চলে নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে চলে যাবে এবং বিদেশীরা সে সুযোগ নেবে।

সারারাত আমাকে ট্রেনে এ ধরনের একটি চিন্তা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। কখন ঘুমিয়েছি কখন আবার জেগেছি। এক সময় চোখ খুলে দেখলাম, আমার সামনে অনেক তরুণ বসে আছে। পরনে লুঙ্গি এবং জামা। বড্ড ক্লান্ত, শ্রান্ত এবং বিপর্যস্ত। দেখেই মনে হলো ওরা মুক্তিবাহিনীর সদস্য। বলল, তারা তরঙ্গপুরে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ওদের দলটি যাবে ঈশ্বরদী বিমানবন্দর অকেজো করে দেয়ার জন্যে। কিন্তু ওদের তেমন অস্ত্র দেয়া হয়নি। বলা হয়েছে স্থানীয়ভাবে ওরা সাহায্য এবং সহযোগিতা পাবে। ওদের দিকে

www.nagorikpathagar.com

তাকিয়ে তাকিয়ে এক সময় বুঝতে পারলাম, ওরা ফ্রিডম ফাইটার্স অর্থাৎ এফএফ গ্রুপের লোক। ওরা বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট বিএএফ অর্থাৎ মুজিববাহিনীর লোক নয়। মুজিববাহিনীর লোক হলে এমন বিপর্যস্ত হতে হতো না। ওরা অস্ত্র পেত। ওদের কোনোই অসুবিধা হতো না।

আগরতলা থাকতেই শুনেছি মুজিববাহিনীর কথা। শুনেছি এফএফের কথা। এফএফ-এ অনেক আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের কর্মী থাকলেও অন্যান্য দল এবং সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারাই ছিল এফএফের সদস্য। মুজিববাহিনী ছিল একান্তভাবে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের সদস্য দ্বারা গঠিত। এই দুই বাহিনীর তফাৎ ছিল আসমান জমিন। আগরতলায় থাকতে এই অভিযোগ শুনেছি। এবার নিজের চোখে দেখলাম।

সামনে তরঙ্গপুর থেকে আসা এই মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার এবং চলবার মতো পয়সা পর্যন্ত নেই। এদের মধ্যে অনেকেরই বয়স ১৫ থেকে ২০। এরা কোনোদিন দেশের বাইরে যায়নি। আবেগের তাড়নায় মুক্তিযুদ্ধে এসেছে। জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে নেমেছে। আমি ওদের প্রায় সকলের সঙ্গে কথা বললাম। ট্রেনে খাওয়ালাম। ওরা গভীর রাতে ফারাক্কা স্টেশনে নেমে গেল। আর ওই স্টেশনের নামটি আমাকে চমকে দিল। এখান থেকেই গঙ্গা কিছু দূরে গিয়ে পদ্মা নাম ধারণ করে বাংলাদেশে ঢুকেছে। এখানেই সেই ফারাক্কা ব্যারেজ। আমাদের জীবন-মরণ সমস্যার অঙ্গ।

ফারাক্কায় মুক্তিযোদ্ধারা নেমে গেলে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম এই বাচ্চারা কী করবে! কিন্তু দু'দিন পরে কোলকাতা পৌঁছে ঈশ্বরদি বিমানবন্দরে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের খবর পেয়েছিলাম। তারপর আর ওদের খোঁজ নিইনি। আজ ২৬ বছর পর বলতে লজ্জা নেই যে, যাদের খোঁজ নেয়ার একান্তই প্রয়োজন ছিল, তাদের খোঁজ কোনোদিনই নিলাম না। তবে সেদিন কোলকাতায় পৌঁছানো তেমন সহজ হয়নি। পশ্চিম বাংলায় তখন নকশাল আন্দোলন তুঙ্গে। গ্রামে গ্রামে পুলিশ। বীরভূমে নকশালদের প্রচণ্ড প্রভাব। এক সময় ট্রেন রামপুরা স্টেশনে থামল। একদল পুলিশ এসে আমাকে ঘেরাও করল। বলল তাদের সঙ্গে আমাকে যেতে হবে। আমার পরনে পাজামা পাঞ্জাবি এবং মুখ ভর্তি দাড়ি। পুলিশের কথায় আমি নাকি একজন নকশালদের নেতা। আমাকেই তারা খুঁজছে। তারা একান্তভাবেই নিশ্চিত, এই কক্ষে আমি উঠেছি এবং আমিই সেই লোক। পুলিশের কথা শুনে প্রথম খানিকটা চমকে গেলাম। বন্ধুরা অনেক যুক্তি দিল। আমিও অনেক কথা বললাম। কিন্তু পুলিশ নাছোড়বান্দা। ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে। পুলিশ বলল সামনের স্টেশনের

www.nagorikpathagar.com

তাদের সঙ্গে আমাকে নেমে যেতে হবে। আমি সামনের স্টেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। এবার ট্রেন থামলে একজন অফিসারসহ আরেক দল পুলিশ উঠল। তারাও আমার কাছেই এল। তবে আমরা সবাই মিলে পুলিশকে বোঝাতে পারলাম, আমি সেই ব্যক্তি নই। আমি বাংলাদেশের লোক। নেমে যাবার আগে পুলিশ অফিসার বলল এই চেহারা এবং পোশাকে পশ্চিমবঙ্গে ঘোরাফেরা করা একান্তই ঝুঁকিপূর্ণ। পরবর্তী স্টেশনে পুলিশ নেমে যেতেই দেখলাম টয়লেট থেকে ঠিক আমার চেহারার এক যুবক বেরিয়ে এল। সবাই তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। দেখলাম সে যুবক সব খবরই জানে। সে আমার কাছে এসে বলল, আমার জন্যেই আপনার অসুবিধা হয়েছে। আপনাকে আমার বলার কিছুই নেই। আমি অবাক বিস্ময়ে তরুণের দিকে তাকালাম। তার খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করিনি। সে তরুণ চারু মজুমদারের দলের সদস্য। সে কৃষি বিপ্লব করতে চায়। শ্রেণিশত্রু খতম করতে চায়। শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে চায়।

আমিও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু তরুণের এই পথ নিয়ে আমার সঙ্গে মতান্তর আছে। আমি মনে করি কৃষি বিপ্লব ক্ষমতাসীন সরকার উচ্ছেদের আন্দোলন থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কৃষি বিপ্লব করতে গেলে জোতদারের পক্ষে ক্ষমতাসীন সরকারের পুলিশ আসবে লাঠি, বেয়োনেট এবং গুলি নিয়ে। তাই ওই সরকারকে উচ্ছেদ করতে না পারলে জোতদারদের উচ্ছেদ করা যাবে না। সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাটাকে হত্যা করতে না পারলে একজন জোতদারকে হত্যা করে সমাজ ব্যবস্থাকে পাল্টানো যাবে না।

এ হচ্ছে আমার বিশ্বাস। এ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও আমি ওই তরুণের দিকে তাকিয়েছি। বারবার তাকিয়েছি। ভাবতে চেষ্টা করেছি। কী তাড়নায় ঘর ছেড়েছে। বাড়ি ছেড়েছে। সংসার ছেড়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজপথে নেমেছে।

এই কথাগুলো চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর আমি বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গের কমরেডদের লিখে পাঠিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, দীর্ঘদিন আপনারা আন্দোলন করছেন। কিন্তু চারু মজুমদারের মতো এমন করে তরুণদের নাড়া দিতে পারেননি। উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি এমন করে জীবন যুদ্ধে নামার জন্যে। চারু মজুমদারের পথ ভুল হতে পারে। ভ্রান্ত পথে গিয়ে অসংখ্য তরুণ প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু একথা সত্য, চারু মজুমদার তরুণ সমাজের দুঃখ, বেদনা, ক্ষোভ এবং বিক্ষোভের কারণ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি স্বল্পকালে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছিলেন। আমাদের অন্যান্য বামপন্থী বন্ধুরা তত্ত্বের ব্যাখ্যায় সঠিক হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে

www.nagorikpathagar.com

সেই তত্ত্বের প্রয়োগ করতে পারেননি। জীবন দেয়া নেয়ার নেশা সৃষ্টি করতে পারেননি তরুণদের মনে। তাই সকল সমালোচনা সত্ত্বেও চারু মজুমদারকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান এবং মর্যাদা দিতে হবে। সেকালে আমার বক্তব্য বিভিন্ন মহলে আলোচিত এবং সমালোচিত হয়েছে।

সে অনেক দিন আগের কথা। স্বাধীন হওয়ার অনেক পরেই একথা লিখেছিলাম, চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর। একাত্তরের নকশালপন্থী ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করার পর এ ধরনের একটি ধারণা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। তবে সে ধারণার সঙ্গে আমার সেদিনের ট্রেনযাত্রা কিংবা রামপুরার ঘটনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। রামপুরার ঘটনার দীর্ঘক্ষণ পর কলকাতায় পৌঁছেছিলাম।

কলকাতায় আমার অনেক রকমের বিপদ। ২৩ বছর পর কলকাতায় গিয়েছি। মা, ভাই, বোনদের ধারণা ছিল আমা সঙ্গে তাদের কোনোদিন দেখা হবে না। পাকিস্তান সরকার আমাকে পাসপোর্ট দেবে না। জীবনটা জেলখানায়ই কাটবে। আমি ভারতে গিয়েছি এ খবর কারও বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাদের কাছে আমি খরচের খাতায়। একদিন মধ্যম গ্রামে গিয়েছিলাম। পথের মাঝখানে এক খুড়তুতো বোনের সাথে দেখা। ২৫ মার্চের পর তিনি আমাদের খবর পাচ্ছিলেন না। ২৭ মার্চ থেকে তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বড় সড়কের পাশে বসে থাকেন। বাংলাদেশের কোনো লোক পেলে আমাদের কথা জিজ্ঞেস করেন। এমনি করে বসে থাকতে হয়েছে পরপর তিন মাস। মে মাসে আমি পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছলে খবর পেয়েছিলেন যে আমি এবং আমরা ভালো আছি। ঢাকুরিয়ায় আমার বড় বোনের বাসায় গিয়েছিলাম। প্রথমে তিনি আমাকে চিনতেই পারেননি। প্রায় বিদায় নিচ্ছিলেন দোরগোড়া থেকে। শেষ পর্যন্ত আমাকে চিনেছিল আমার এক ভাগ্নে। দিদির কথা হলো তিনি নাকি শুনেছেন আমি রাশিয়া চলে গেছি।

আমার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু বড় প্রকৌশলী। বরিশালে আমার সাথে এক কলেজে পড়ত। রাজনীতি করত বলে তার মায়ের আক্ষেপ ছিল। তার মায়ের ধারণা আমার জন্যে তার ছেলে রাজনীতি করে। তার ছেলে বোমার মামলায় পড়েছিল বরিশালে। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর তারা সপরিবারে ভারত চলে যায়। এবার দেখলাম আমার বন্ধুর মা ভিন্ন মানুষ। আমার জন্যে নিদারুন সহানুভূতি। ছেলেকে ডেকে বললেন— নির্মলকে বল, এবার কোলকাতায় থেকে যেতে। যে দেশে গেলে জেলে থাকতে হয়, সে দেশে গিয়ে ওর লাভ নেই। আমি বললাম, আমি তো থেকে

www.nagorikpathagar.com

যেতে আসিনি। আমার শিকড় তো আমার জন্মভূমিতে। আমাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে।

কাকুড়গাছিতে কাকার বাসায় গিয়েছিলাম। কাকীমা কেঁদে আকুল। তাঁর ধারণা ছিল আমার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে না। বাগুইআটিতে ছোট কাকা থাকেন। দেখা হতেই বললেন, মুজিবর কোথায়? আমার কাকারা শেখ সাহেবকে মুজিবর বলে ডাকতেন। শেখ সাহেবের কথা বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেললেন। টুঙ্গীপাড়ায় শেখ বাড়ির সাথে আমার এই দুই কাকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এরা ডাক্তারি করতেন টুঙ্গীপাড়া থানার পাটগাতীতে।

তাদের প্রথম প্রশ্ন, শেখ সাহেব কোথায় আছেন, কেমন আছেন? তাঁর বাড়ির অবস্থা কি? শেখ সাহেবের বাবা-মা কোথায়? তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছি কি না? এই পরিবারের খোঁজ নিতেই আমি ২৫ মার্চের পর পাটগাতী গিয়েছিলাম। বন্ধুরা জোর করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাই তাদের সব প্রশ্নের জবাব আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব ছিল না।

আমার বড় ভাই থাকেন কোলকাতা থেকে ৯০০ কিলোমিটার দূরে মধ্য প্রদেশে। ওই সময় তার কাছে যাবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। মা থাকেন দুই ভাইয়ের সাথে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে। আমার খবর পেয়ে মা দুই ভাইকে কোলকাতা পাঠিয়েছিলেন আমাকে নেয়ার জন্যে। ভাইদের সাথে দেখা হবে না। আমাকে যুদ্ধের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরতে হবে। তোমার সাথে দেখা হলে তুমি আমাকে বাংলাদেশে ফিরতে দেবে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ সাহেব আমার বাগুইআটির কাকাকে আনবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কাকা ছিলেন টুঙ্গীপাড়ার শেখ বাড়ির পারিবারিক ডাক্তার। আমি একমত হইনি। আমি বলেছিলাম কাকা ভারতীয় নাগরিক। বাংলাদেশে এলে অসুবিধায় পড়বেন। আর দেশের যে অবস্থা তাতে আমার মনে হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করা খুব কঠিন হবে। শেখ সাহেব কলকাতায় লোক পাঠিয়েছিলেন ছোট কাকার কাছে। ছোট কাকা আসেননি।

বারাসাতে আমার কাকাদের অনেক ছেলে-মেয়ে বসবাস করে। সেখানে গিয়ে বিপদ হয়ে গেল। সকলের কাছেই আমি গল্প। এদের সকলের জন্ম ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর। ওরা পূর্ব-পুরুষের ভিটির গল্প শুনেছে। আমার কাছে তারা অনেক কিছু জানতে চায়। সকলেই থাকতে চায় কাছাকাছি। কিন্তু আমার সময় কোথায়।

একদিন এক কাণ্ড ঘটল কোলকাতার কাছে যাদবপুরে। এক আত্মীয়ার সাথে বাসে যাচ্ছিলাম। মাঝখানে এক তরুণী ওই বাসে উঠল এবং কিছুক্ষণ

www.nagorikpathagar.com

পর নেমে গেল। আমার আত্মীয় বললেন, এই মেয়েটিকে আপনি চেনেন? ওই মেয়েটি আপনার এক কাকার কন্যা। অর্থাৎ আপনার বোন। আপনাদের কারো কাউকে চিনবার কথা নয়। আগে খেয়াল করলে আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতাম।

মাঝখানে একদিন শিয়ালদহ থেকে বাসে কাকুরগাছি যাচ্ছিলাম। বাসে একটি কণ্ঠ শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। কণ্ঠ আমার এক সতীর্থের। ওর নাম দেবু। দেবব্রত মুখার্জি। বরিশাল জেলার কলসকাঠিতে আমার সাথে সপ্তম শ্রেণিতে পড়তো। সপ্তম শ্রেণির পর দেবু আর ক্লাসে আসেনি। ১৯৪২ সালে আমি নবম শ্রেণির ছাত্র। তখন কংগ্রেসের আহ্বানে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়। কলসকাঠির ডাকঘরের সামনে জনসভা হয়। জনতা ডাকঘর পুড়িয়ে দেয়। তাকিয়ে দেখলাম প্রথম সারিতে দেবু। আমাদের দায়িত্ব ছিল তখন স্কুলে ধর্মঘট করা এবং পুলিশের খবর নেয়া। দেবু গ্রেফতার হয়ে গেল। কাগজে পড়েছি দেবুকে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। ১৯৪৪ সালে আমি বরিশাল কলেজে পড়তে গেলাম। দেবু তখন জেলে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ চলে যাবার আগে দেবুরা জেলখানা থেকে মুক্তি পায়। দেবু আর দেশে থাকেনি। দেবু দেশান্তরী। যে দেশ স্বাধীন করার জন্যে দেবুর দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল সেই দেবু নিজের দেশে থাকেনি। দেবু ভিন্ন দেশে দেশান্তরী। সেই দেশে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম ১৯৭১ সালে। দীর্ঘদিন পরে হলেও দেবুর কণ্ঠ আমার কানে বাজছিল। বাসে দেবু বাংলাদেশের পক্ষে তর্ক করছিল। দেবুর সে কণ্ঠ আমার বড্ড চেনা। কিন্তু দেবুর সাথে আমার কথা বলা হয়নি। হঠাৎ একটি স্ট্যান্ডে দেবু নেমে গেল। বলি বলি করেও দেবুর সাথে আমার কথা বলা হয়নি।

ভারত বিভক্তির ৫০ বছর। আর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ২৬ বছর পর এ কাহিনী। সেকালের মন না হলে একালের মানুষ আমার লেখায় আদৌ আকৃষ্ট হবে না। আজকের প্রজন্ম সেকালের কাহিনী জানে না। ১৯৪০ সালে যে শিশু জন্মেছে তারও স্মরণে নেই ৪৭-এর দাঙ্গা আর দেশান্তরী হওয়ার কথা। আজ পাকিস্তানের করাচিতে লাখ লাখ বাংলাদেশের বাঙালি। বনগাঁও সীমান্ত থেকে শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত দেশান্তরী বাঙালি হিন্দুদের একের পর এক কলোনি। পশ্চিম আর পুর্ব পাঞ্জাবে এপার আর ওপারের লোক। লাখ লাখ পরিবার বিভক্ত এবং ধর্মান্তরিত।

সেদিনের কথা। পাকিস্তানের পাঞ্জাব থেকে একটি পরিবার ১৯৪৭ সালে শরণার্থী হয়ে ভারতের পাঞ্জাবে এসেছিল। ফেলে এসেছিল বাচ্চা শিশুকে। ৫০

www.nagorikpathagar.com

বছর পর সে বাচ্চাও প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে। দেশ ভাগের ৫০ বছর পর মাতা ও পুত্রের মিলন হয়েছিল। পাড়া প্রতিবেশি বলেছিল তোমার ছেলে তো মুসলমান হয়ে গেছে। মায়ের জবাব হচ্ছে—ওর ধমনীতে প্রবাহিত রক্ত তো আমার।

এত কথা আজকে ভাবলেও ১৯৭১ সালে ভাবিনি। ভাবিনি বলেই মাকে বলেছিলাম দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই তোমার সাথে দেখা হবে।

অনেক আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা না করেই ১৯ জুলাইতে যুদ্ধের মধ্যে ফিরেছিলাম বাংলাদেশে। তারপর নভেম্বরে আবার কলকাতায়। কলকাতায় গিয়ে এবারেও সকলের সাথে দেখা করা যাচ্ছে না। মন খুবই বিব্রত। আরএসপির আস্তানায় থাকি। রাজনীতিকরা জিজ্ঞেস করে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে তো। নাকি আপনাদের পাকিস্তানে ফিরে যেতে হবে। সব কথার জবাব দিতে পারিনি। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে গেলেও একই কথা জিজ্ঞেস করে। তাদের আশা যুদ্ধ বেশি দিন চললে হয়তো আমার আর যাওয়া হবে না। আমি হয়তো চিরদিনের জন্যে ওদের কাছে থেকে যাব।

আমার দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব অন্যত্র। আমার মনে প্রশ্ন এই যুদ্ধ শেষ হবে কী করে? ভারত সরকারের শ্রেণি চরিত্র আমি জানি। ভারত একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতা করবে কোন স্বার্থে? আমরা এ যুদ্ধকে বলছি মুক্তিযুদ্ধ। আমরা বলেছি শোষণমুক্ত বাংলাদেশের কথা। আমার দ্বন্দ্ব হচ্ছে—ভারত শোষণমুক্ত বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্যে সাহায্য করবে কেন? এ যুদ্ধ ক্রমাগত ভিন্ন রূপ নিচ্ছে। এলাকায় এলাকায় নিজস্ব বাহিনী গড়ে উঠেছে। এ বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই কঠিন হবে। এ সকল বাহিনী হয়তো একদিন মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করবে। সত্যিই সেদিন হয়তো শুরু হবে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সংগ্রাম।

কিন্তু ভারত সরকার ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কী করে দূরে বসে এ ছবি দেখবে। এ পরিস্থিতি নিশ্চয়ই তাদের কাছে কাম্য নয়। তাই এদের পাকিস্তানের সাথে একটি সমঝোতায় পৌছতে হবে। হয়তো সমঝোতার ভিত্তিতে আমাদের দেশে ফিরতে হবে যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে। কলকাতায় গিয়ে মোশতাক সাহেবদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনে এ কথাই আমার বারবার মনে হয়েছে। সকলকে মুখে বলেছি দেশ স্বাধীন করেই বাড়ি ফিরব। কিন্তু নিজে কষ্ট করে বুঝতে বা বোঝাতে পারিনি সেটা কিভাবে সম্ভব হবে। আমাদের বই পুস্তকে বুর্জোয়াদের এ ধরনের ভূমিকা তেমন উল্লেখ নেই। এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি কোনো দেশে। তাই বারবার মনে হয়েছে এবার আমরা স্বাধীন হলেও কোথায় যেন একটা কিন্তু থেকে যাবে।

www.nagorikpathagar.com

একাত্তরের যুদ্ধ নিয়ে কোলকাতায় তখন তুমুল বিতর্ক। পশ্চিমবাংলায় তখন ভিন্ন রাজনীতি। নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে গেছে। সিপিআই (এম) থেকে বের হয়ে গিয়ে চারু মজুমদার ও কঙ্গল সাঁওতালের নেতৃত্বে সিপিআই (এমএল) গঠিত হয়েছে। এদের শ্লোগান কৃষি বিপ্লব। এদের কর্মসূচি শ্রেণিশত্রু খতম। এদের খতম অভিযানে ইতোমধ্যে অসংখ্য জোতদার নিহত হয়েছে। এদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। আহ্বান জানান হয়েছে সারা ভারতবর্ষে নকশালবাড়ির লাল আগুন ছড়িয়ে দেয়ার।

নকশাল আন্দোলনের প্রভাব তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও পড়েছে। এই আন্দোলন নিয়ে পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি শতধা বিভক্ত। এদের মধ্যে একটি উপদল নকশালবাড়ির অনুকরণে আন্দোলন গড়ে তুলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শ্লোগান লেখা হচ্ছে দেয়ালে দেয়ালে।

পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে। কংগ্রেস এই আন্দোলনকে দমনের জন্যে বদ্ধপরিকর। সিপিআই এ ব্যাপারে কংগ্রেসের সাথে একমত। আরএসপির বক্তব্য হচ্ছে নকশালবাড়ির পন্থা সঠিক নয়। বিচ্ছিন্নভাবে কৃষি বিপ্লব করা যাবে না। কৃষি বিপ্লব মূল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে জড়িত। তবে নকশালবাড়ি আন্দোলনে যোগ নিয়ে যারা প্রাণ দিচ্ছে সেই তরুণদের লাল সংগ্রাম জানাতেই হবে। কারণ ভুল পথে হলেও ওরা সমাজতন্ত্রের আন্দোলনেই প্রাণ দিতে নেমেছে।

তবে এই আন্দোলনের সময় সবচেয়ে বিপদে পড়েছে সিপিআই (এম)। পশ্চিমবাংলায় তখন যুক্তফ্রন্ট সরকার। কংগ্রেস বিরোধী এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি। এই সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু। অর্থাৎ নকশাল আন্দোলন দমনের দায়িত্ব জ্যোতি বসুর। অথচ রাজনৈতিক কারণে জ্যোতি বসুর পক্ষে নকশালদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়া সম্ভব ছিল না। এ পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাংলার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। কংগ্রেস নতুন সরকার গঠন করে। কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী তখন সিদ্ধার্থশংকর রায়। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের নেতৃত্বে নির্মমভাবে নকশাল বিরোধী অভিযান শুরু হয়। তবে শুধু নকশাল নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে তখন ত্রাসের রাজত্ব। তখন কোনো বামপন্থী কর্মী ঘরে থাকতে পারছে না। গভীর রাতে এলাকার পর এলাকা ঘেরাও করা হচ্ছে। তরুণদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। সেই তরুণরা আর বাড়ি ফিরছে না। সারা পশ্চিমবঙ্গে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ (সিআরপি) নামানো হয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে সিআরপির নাম শুনলে শিশুরাও নাকি ভয়ে ঘুমিয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.com

পশ্চিমবাংলার হাজার হাজার বামপন্থী তরুণ পুলিশের ভয়ে পশ্চিম বাংলা ছেড়ে গেছে। বামপন্থীদের বিরুদ্ধে এ অত্যাচার চালাচ্ছেন কংগ্রেস সরকার। আর এ কংগ্রেস সরকারের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আছেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। লাখ লাখ মানুষ পশ্চিম বাংলায় ও ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। অসংখ্য তরুণ পাকিস্তান সরকারকে হটানোর জন্যে ভারতে যায়। তাদের লক্ষ্য তারা অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেবে। মুক্তিবাহিনী গঠন করবে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন করবে। তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবে ভারত সরকার।

ভারতের বামপন্থীদের কাছে এ বক্তব্য ছিল একান্তই অবিশ্বাস্য। পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস সরকার নির্বিচারে বামপন্থীদের হত্যা করছে। সমাজতন্ত্রীদের নিশ্চিহ্ন করছে। সেই কংগ্রেস সরকার বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেবে এবং বাংলাদেশের একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে, এ ধরনের বক্তব্য পশ্চিমবাংলার বামপন্থীদের কাছে ছিল একান্তই অবাস্তব।

তাই প্রথমদিকে বামপন্থীরা দূর থেকে এই আন্দোলন দেখার চেষ্টা করেছে। নিজেদের তেমন সংশ্লিষ্ট করেনি। শরণার্থীদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনো সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়নি। বিশেষ করে তাদের বিস্মিত করেছে অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের আচার-আচরণ এবং নিত্যদিনের জীবন যাপন। বলা হচ্ছে এদের নেতৃত্বেই নাকি বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। এদের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো কথা বলতে পারে না। তারা জানে না তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন, কেন গ্রেফতার হয়েছে এবং আদৌও তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা চান কি না। এছাড়া আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সাথে ছাত্রলীগ নেতৃত্বের কোন্দলের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ভারতের মাটিতে। কোনো কোনো ছাত্রনেতা বেসামাল অবস্থায় সাধারণ নাগরিকদের হাতে প্রহৃত হয়েছে। একসময় পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের মধ্যে বলাবলি হয়েছে, এই নেতাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হবে। তরুণদের প্রশিক্ষণ দেয়া হোক। তাহলে হয়তো বা কোনো দিন বাংলাদেশের নতুন কিছু ঘটতে পারে। মোট কথা ভারত সরকারের সহযোগিতায় আর বাংলাদেশের এই নেতাদের নেতৃত্বে শোষণমুক্ত বাংলাদেশ হবে, এই ধরনের কথাবার্তা বামপন্থীদের কাছে ছিল একান্তই হাস্যকর। তাই প্রতি পদে পদে ওদেশের বামপন্থীরা আমাদের সমালোচনা করেছে। বলেছে, আপনারা দেশ ছেড়ে কেন এসেছেন? কেন নিজের দেশ থেকে মুক্তির সংগ্রাম গড়ে তোলেননি? ভারত একটি পুঁজিবাদী

www.nagorikpathagar.com

রাষ্ট্র। ভারতের নেতৃত্ব পুঁজিবাদী। এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আপনাদের শোষণমুক্ত রাষ্ট্র করে দেবে, এই তত্ত্ব আপনারা কোথায় পেলেন? মার্কস, লেনিন, মাও সেতুং বা চে-গুয়েভারার কোন বইতে এ ধরনের কথা আছে। আপনারা এখানে বসে ভারত সরকারের লেজুড়বৃত্তি করছেন। আবেগতাড়িত বাঙালি আপনাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে আর এই সুযোগে কংগ্রেস নিজের আসন পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করছে।

তাদের এই বক্তব্যে আদৌ ভুল ছিল না। ত্রিপুরা বা পশ্চিমবাংলায় বাঙালিরা না থাকলে আমাদের বুঝতে হতো কত ধানে কত চাল হয়। আমাদের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তে ত্রিপুরা ও পশ্চিবাংলায় কোটি কোটি বাঙালির জন্মভূমি। পূর্ব পাকিস্তান নামক বাংলাদেশ। অনেক চোখের জলে তারা পিতার ভিটি ছেড়ে গিয়েছে। তারা অনেক কিছু হারিয়েছে। তাদের নতুন নাম শরণার্থী বা উদ্বাস্তু। অর্থাৎ তারা অন্যের আশ্রয় চায় এবং যাদের নিজের কোনো বাসভূমি নেই। অধিকাংশ শরণার্থী উদ্বাস্তু পরিবার বিভক্ত হয়েছে দেশ বিভাগের ফলে। তাই তাদের কাছে পুঞ্জিভূত আবেগ। নিজের জন্মভূমির প্রতি টান। সেই জন্মভূমি আক্রান্ত হলে তারা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। কোনো যুক্তি তাদের মাথায় আসেনি। ওপারের লাখ লাখ বাঙালিকে তারা বুকে জড়িয়ে ধরেছে। নিজের বাড়িতে স্থান দিয়েছে। ভাগ করে খাবার খেয়েছে। নতুন প্রজন্মের শিশু স্কুল কলেজ ছেড়ে বের হয়েছে সাহায্যের সন্ধানে। নতুন স্বজনদের জন্যে। পৃথিবীতে এ ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি। একটি আবেগের পরিবেশে এবং তুখোড় বামপন্থী ও সকল যুক্তি ভুলে বাঙালি হয়ে গেছে! এ পরিস্থিতির সৃষ্টি না হলে এ যুদ্ধের রূপ ভিন্নতর হতো।

আমাদের অনেক লেখক, অনেক গবেষক এবং অনেক নেতারা সেদিনের এ আবেগের দিকটি ভুলে গিয়ে যুদ্ধ মূল্যায়ন করতে চান এবং মূল্যায়ন করে থাকেন। তাঁদের কথায় মনে হয় ভারতবর্ষে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল স্বাভাবিক। ভারত সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের সাহায্যে এসেছেন। তাঁরা উল্লেখ করতে চান না ত্রিপুরা ও পশ্চিমবাংলার বাঙালিদের আবেগ এবং ভারত সরকারের ওপর সেই আবেগ ও সমবেদনার ভিত্তিতে সৃষ্ট চাপের কথা। এ আবেগের জন্যেই আমরা দিনের পর দিন বিতর্ক করতে পেরেছি। যে বাঙালি তরুণ আমাদের সংগ্রাম সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিয়েছে, আমাদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছে সেই তরুণই পারিবারিক পরিবেশে ফিরে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে। সে তখন মার্কসবাদী, লেনিনবাদী বিপ্লবী নয়, একান্তই ভাত এবং মাছের বাঙালি।

www.nagorikpathagar.com

এ দৃশ্য আমি ক্রান্তি প্রেসে দেখেছি। ক্রান্তি প্রেসের আরএসপির নেতারা থাকেন। এক সময় অনুশীলন সমিতি করতেন। বছরের পর বছর জেল খেটেছেন। ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার সহ্য করেছেন। ঘর করেননি। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নেই। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ক্ষীণ। তাঁরা আমাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতেন এ যুদ্ধে জয়লাভ করলেও আপনাদের ভালো হবে না। কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতি গান্ধীর নেতৃত্বে শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা গঠিত হতে পারে না। আপনাদের নেতৃত্ব একান্তই সুবিধাবাদী। দেশে ফিরে গিয়ে আপনাদের শোষণমুক্ত সমাজের জন্যে যুদ্ধ করতে হবে। আজকের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে। ক্রান্তি প্রেসে সামনের কক্ষে এই বিতর্কের মাঝখানে হঠাৎ পেছন থেকে মনি দা চিৎকার করে উঠলেন। মনি দা হচ্ছে মনিন্দ্র চক্রবর্তী। বাড়ি কুমিল্লায়। আরএসপির নেতা। আরএসপির কমিউন পরিচালনা করেন। মনিদা সারাদিন রেডিও শোনেন। মুক্তিবাহিনীর খবর রাখেন। মুক্তিবাহিনীর জয়লাভের খবর শুনলে চিৎকার করে উঠেন। উল্লাসে সবাইকে চা খাওয়ান। হয়তো মনে ভাবেন বাংলাদেশ স্বাধীন হলে জন্মভূমি কুমিল্লায় আবার ফিরে যেতে পারবেন। ওই কুমিল্লায় তার রাজনৈতিক হাতেখড়ি। ওই কুমিল্লা তাকে শিখিয়েছিল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম। ব্রিটিশ চলে গিয়েছে। কিন্তু সে দেশ স্বাধীন করার জন্যে যিনি জীবনে সবকিছু হারিয়েছেন সেদেশে তার থাকা হয়নি। মনিদা দেশান্তরী। মনিদা আমাদের বিতর্ক শোনেন আর সারাদিন শোনেন রেডিওর খবর। আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠেন।

১৯৭১ সালের সংগ্রামে এই ছিল এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব। আমি বাঙালি। আমি বাংলাদেশ চাই। আমি চাই বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধে জয়লাভ করুক। কিন্তু আমি জানি এ যুদ্ধে বাঙালির মুক্তি আসবে না। এ যুদ্ধে শোষণমুক্ত বাংলাদেশ হবে না। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে এ যুদ্ধ সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু আমি এপারের বাঙালি। ওপারের স্বজনেরা বহু প্রত্যাশা নিয়ে এপারের আশ্রয় প্রার্থী। ওরা যেন এপারে এসে আমার মতো শরণার্থী আর উদ্বাস্তু না হয়। ওরা যেন সম্মান নিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারে। সুতরাং বাংলাদেশের যুদ্ধের ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিত্ব দ্বিধা বিভক্ত। আমার জন্মভূমির টান আমাকে আবেগমথিত করে। আমার যুক্তি ও প্রজ্ঞা আমাকে বিপরীত কথা বলে।

১৯৭১ সালের সংগ্রাম তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জীবনের মাঝখানে ছিল এক পর্বতপ্রমাণ দেয়াল। আমি তত্ত্ব দিয়ে বুঝেছি এ সংগ্রাম সঠিক নয় বলে ব্যাখ্যা দিয়েছি। কিন্তু নিত্যদিনের জীবনে এ সংগ্রাম সফল করার জন্যে সর্বস্ব দেয়ার

www.nagorikpathagar.com

প্রস্তুতি নিয়েছি। তবুও বিতর্কের শেষ হয়নি। এ বিতর্ক তুঙ্গে উঠল ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হবার পর।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে বোঝা গেল যুদ্ধ এগিয়ে আসছে। সংবাদপত্রের খবরে বলা হলো ৪ ডিসেম্বর শ্রীমতি গান্ধী কলকাতায় আসছেন। তিনি ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ভাষণ দেবেন। অনেকে বলতে থাকলেন ওই জনসভা থেকে তিনি যুদ্ধের ঘোষণা দেবেন।

ক'দিন পরের খবর হলো শ্রীমতি গান্ধীর ৪ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ৩ ডিসেম্বর কলকাতায় জনসভায় ভাষণ দেবেন। এছাড়া অদ্ভুতভাবে আরেকটা কথা ছড়িয়ে গেল সারা কলকাতায়। বলা হতে থাকল পাকিস্তান ৩ তারিখ ভারত আক্রমণ করবে। এ কথা জেনে শুনেই শ্রীমতি গান্ধী কলকাতায় আসছেন। আগে নাকি জানা ছিল পাকিস্তান ৪ তারিখ আক্রমণ করবে। পরবর্তীকালে জানা গেল পাকিস্তানের ধারণা ভারত সরকার এ খবর পেয়ে গেছে। সুতরাং আক্রমণের তারিখ পরিবর্তন হয়েছে। আরো জানা গেল, পাকিস্তান ভারতের পশ্চিম সীমান্তের সাতটি বিমানবন্দরে হামলা চালাবে। এ খবর জানতে পেরে ভারত সরকার নাকি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। এ সকল বিমানবন্দর থেকে বিমান সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাখা হয়েছে নকল বিমান।

তখনো ভাবতেও চেষ্টা করিনি যে এত কথা আমরা কী করে জানতে পারলাম। আমরা সব কিছু জানতে পারছি আর পাকিস্তান কিছুই জানে না সে কেমন কথা। এ পরিবেশেই শ্রীমতি গান্ধী ৩ ডিসেম্বর কলকাতায় এলেন। শ্রীমতি গান্ধীর জনসভায় ভাষণ শুনতে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে গেলাম। জনসভার অধিকাংশ লোকই বাংলাদেশের। আমি ভেবেছিলাম আরো লোক হবে। জনসভায় গিয়ে মনে হলো বাংলাদেশের যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ হলেও শ্রীমতি গান্ধী তখন তত জনপ্রিয় নন।

বিকেলের দিকে জনসভা শুরু হলো। খুব ধীরে শ্রীমতি গান্ধী বক্তৃতা শুরু করলেন। কিছুক্ষণ বক্তৃতার পর একজন বার্তাবহ শ্রীমতি গান্ধীকে কী যেন একটা খবর জানালেন। শ্রীমতি গান্ধী বক্তৃতা সংক্ষেপ করলেন। জনসভা শেষ হলো।

পরের দিন খবরে কাগজে দেখলাম যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। শ্রীমতি গান্ধী কলকাতার জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার সময়ই তাঁর কাছে খবর আসে যে পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতীয় বিমান বন্দরে হামলা চালিয়েছে। জনসভা সংক্ষিপ্ত করে শ্রীমতি গান্ধী সামরিক বাহিনীর একটি বিমানে নয়াদিল্লি ফিরে

www.nagorikpathagar.com

যান। গভীর রাতে ভারতীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে। বৈঠকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ এনে ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সংবাদপত্রের পাতায় কলকাতা তখন খুব গরম। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। কিন্তু ওই শহরে বাঙালিরা সংখ্যালঘু। তাই ব্যবসা বাণিজ্যে কলকাতায় বাংলাদেশের যুদ্ধের তেমন খবর নেই। খবর হচ্ছে পত্রিকার পাতায় এবং সন্ধ্যা বেলা সেনাবাহিনীর দফতরে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর সদর দফতর কলকাতায়। যুদ্ধের নেতৃত্বে আছেন লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা। সরকারিভাবে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত ও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সমবায়ে গঠিত মিত্র বাহিনী যুদ্ধ করছে। এই মিত্র বাহিনীর নেতৃত্বে আছেন আরোরা। তাঁর নির্দেশে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীও যুদ্ধ করছে। এই আরোরার দফতরে সন্ধ্যার দিকে সাংবাদিকরা জড়ো হচ্ছে। এই দফতর থেকেই সকল খবর জানানো হচ্ছে।

ক্রান্তি প্রেসে সকলে তখন উদ্বিগ্ন। মনিদা রেডিও নিয়ে বসে আছেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি খবর নিচ্ছেন। রেডিওর খবর নিতে দেরি করলে মনিদার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। শ্রীমতি গান্ধী পার্লামেন্টে এই ঘোষণা দেন। ভারত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে পাকিস্তান ভারতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

অপরদিকে নতুন খেলা শুরু হয় জাতিসংঘের সদর দফতরে। আর্জেন্টিনার পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এই প্রস্তাবে ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে নিজ নিজ দেশে সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা বলা হয়। এরপর আরো আটটি প্রস্তাব করে বলেন যে ভারত থেকে অবিলম্বে শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হোক। মার্কিন প্রতিনিধি জর্জ বুশ এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়। বলা হয় যে, পাকিস্তানিরা যখন নির্বিচারে বাংলাদেশীদের হত্যা করছিল তখন জাতিসংঘ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এখন পাকিস্তান বিপদে পড়ায় জাতিসংঘে এ প্রস্তাব উঠেছে। এ প্রস্তাব গৃহীত হলে পাকিস্তান লাভবান হবে। বাংলাদেশ এ প্রস্তাব মানবে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রয়োগ করে। ফলে প্রস্তাব দু'টি বাতিল হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.com

ইতোমধ্যে বিভিন্ন সেক্টরে বাংলাদেশের বিজয়ের খবর আসতে থাকে। আর ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান একটি গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান জানান পাকিস্তান বাহিনীকে আত্মসমর্পণের জন্যে। এই আহ্বানে বলা হয়—'তোমাদের বাঁচার কোনো পথ নেই। বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্যে তোমাদেরকে ঘিরে রেখেছি। তেমরা যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে তারা তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। অনেক দেরি হওয়ার আগেই তোমরা আত্মসমর্পণ করো। তোমাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা ও যুদ্ধাস্ত্রের শক্তি অকেজো হয়ে গেছে। এমনকি বাইরে থেকে বিমানের সাহায্য আসার সম্ভাবনা নেই। অতএব তোমরা অস্ত্র ত্যাগ করো। তোমাদের বাঁচার কোনো পথ নেই। একমাত্র পথ হচ্ছে সম্মিলিত বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করা।'

ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেকশ-এর আহ্বান বারবার বেতারে প্রচারিত হতে থাকে। তাঁর এই আহ্বানে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। পাকিস্তান বাহিনীর মনোবল ভেঙে পড়তে থাকে। ঢাকায় পাকিস্তান বাহিনীর প্রধানরা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার ছিলেন চরম ভারত বিদ্বেষী। তারা ন'মাসের যুদ্ধের সময় প্রতি পদে পদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ করে গেছেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে বাংলাদেশের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বৃহৎ দুই শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে উঠেছিল অবশ্যম্ভাবী। ঢাকার পাকিস্তান বাহিনীর পক্ষ থেকে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেয়া হলেও যুক্তরাষ্ট্র সরকার তা নাকচ করে দিয়েছে। কখনো ইয়াহিয়া খানকে হুমকি দিয়েছে। পাকিস্তান বাহিনীকে বাধ্য করেছে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। ১৯৭১ সালে যুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা ছিল বাংলাদশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যে কোনো মুল্যে প্রতিহত করার।

যুদ্ধ শুরু হবার পর নতুন করে বিপদে পড়লাম। বিতর্ক শুরু হলো যুদ্ধের চরিত্র নিয়ে। এ যুদ্ধ কাদের যুদ্ধ? ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আদৌ হতে পারে কিনা। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমরা শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রচার করেছিলাম। বিবৃতিতে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এবং বাংলাদেশের জনগণকে ভারতীয় বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পর আরএসপির তরুণ কর্মীদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তাদের সুস্পষ্ট মন্তব্য হচ্ছে ভারতীয় বাহিনী কোনো দেশের মুক্তিদাতা হতে

www.nagorikpathagar.com

পারে না। যুদ্ধে আপনাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে কিন্তু সে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্বে অর্জিত হতে পারে না। মুক্তির দিক থেকে তাদের কথা ফেলে দেয়া যায় না। বক্তব্যের জবাবে আমার একটি ভিন্ন জবাব ছিল। আমরা বক্তব্য ছিল ৭১-এর যুদ্ধে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু এ যুদ্ধ আদৌ মুক্তিযুদ্ধ ছিল না। সঠিকভাবে বলতে গেলে এ যুদ্ধ ছিল পাকিস্তান থেকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যুদ্ধ। এ যুদ্ধের শ্লোগান ছিল আমরা বাঙালি। বাঙালির জন্যে স্বাধীন রাষ্ট্র চাই। অবাঙালি আমাদের শত্রু। তাই তাদের খতম করো। অবাঙালি হানাহানি করে অসংখ্য মানুষের জীবনহানি ঘটিয়েছে। এ যুদ্ধ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার যুদ্ধ বলেই এ যুদ্ধের কর্মসূচির মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের কথা ছিল না। এ যুদ্ধের নেতৃত্বের কল্পনা ছিল দেশ। তাই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। অবাঙালির পরিবর্তে আমরা বাঙালিরা শোষণ ও শাসন করার জন্যে একটি রাষ্ট্র চাই। সেই রাষ্ট্রের নাম হবে বাংলাদেশ। আমার কাছে স্পষ্ট ছিল যে অবস্থা যেমন দাঁড়িয়েছে তাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতা ব্যতীত আপাতত এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় দেশ স্বাধীন করে দেশে ফিরতে হবে। এ মুহূর্তে বামপন্থীদের এককভাবে সংগ্রাম চালিয়ে নেয়ার শক্তি বা প্রস্তুতি নেই। এছাড়া বামপন্থীরা হাজার ভাগে বিভক্ত। তত্ত্ব দিয়ে যে যতই বোঝাক না কেন বামপন্থীরা কোনো অর্থেই তখন ঐক্যবদ্ধ ছিল না বা আদৌ কোনো নিয়ামক শক্তি ছিল না। অনেকেই বলে থাকেন এ যুদ্ধ দীর্ঘদিন চললে বামপন্থীদের হাতে এ যুদ্ধের নেতৃত্ব চলে যেত। অথচ তারা কেউই ভেবে দেখতে চান না যে পরিস্থিতি কখনো তেমন ছিল না। এ ধরনের একটা ধারণা সকল মহলেই ছিল। ভয়ও ছিল শাসক মহলে। কিন্তু কেউই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তৎকালীন পরিস্থিতি ভেবে দেখতে চেষ্টা করেননি। অসংখ্য গ্রামের ছেলে মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়েছিল। এলাকাভিত্তিক অনেক মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল। বামপন্থীদের ঐক্য, শক্তিশালী সংগঠন ও প্রস্তুতি থাকলে বিকল্প কিছু ভাবা যেত। চারদিকে ভারত বেষ্টিত বাংলাদেশের একই সাথে ভারতীয় ও পাকিস্তান বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে যুদ্ধে জয়লাভ করার পরিস্থিতি তখন আদৌ ছিল না।

আমার এ বক্তব্যে অনেকে খুশি হননি। পরবর্তীকালে বামপন্থী মহলেও আমার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়নি। আমার বক্তব্য এখনো বিতর্কিত। কিন্তু আমি এখনো মনে করি যে ৭১-এর যুদ্ধ ছিল অবাঙালির বিরুদ্ধে বাঙালির সংগ্রাম। শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিতদের সংগ্রাম নয়। এ যুদ্ধে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল। নেতৃত্বের কাছে অনেক প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সে প্রত্যাশা ছিল একান্তই

www.nagorikpathagar.com

আবেগভিত্তিক। এ যুদ্ধ মুখ্যত আবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ায় কেউ ৭১-এর যুদ্ধকে স্বাধীনতা যুদ্ধ, আবার কেউ বলেছে মুক্তিযুদ্ধ। কেউ ৭১-কে বলেছে হিড়িকের বছর, আবার কেউ বলেছে গণ্ডগোলের বছর। এই বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা নিয়েই ৯ মাস যুদ্ধ চলেছিল ১৯৭১ সালে। সেই যুদ্ধের শেষ অংশে এসে হাজারো প্রশ্ন উঠেছিল বিভিন্ন মহলে।

এ যুদ্ধের শেষ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি নতুন চাল চেলেছিল। হঠাৎ একদিন শোনা গেল মার্কিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করছে। ওয়াশিংটন থেকে সরকারিভাবে বলা হলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আটকেপড়া মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধারের জন্যে সপ্তম নৌবহর বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় যাচ্ছে।

সপ্তম নৌবহরের খবরে সকল মহলই শঙ্কিত। এ যুদ্ধের সময়ই সপ্তম নৌবহর নিয়ে একটি বৈঠকের খবর শুনলাম ক্রান্তি প্রেসে। এ বৈঠক বসেছিল নয়াদিল্লিতে। বৈঠক ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। বৈঠকে ডেকেছিলেন লোকসভার প্রবীণ সদস্যদের। আরএসপির সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড ত্রিদিব চৌধুরী এ বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কমরেড ত্রিদিব চৌধুরী ১৯৫২ সাল থেকে ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য। তিনি গোয়া মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সালাজারের জেলে ১৯ মাস ছিলেন। তিনি বিরোধীদলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি পদেও নির্বাচন করেছিলেন। ত্রিদিব চৌধুরীর ভাষ্য অনুযায়ী সেই বৈঠকে সেনাবাহিনীর প্রধান মানেকশকে ডাকা হয়েছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মার্কিন সপ্তম নৌবহরের কথা। জেনারেল মানেকশ বলেছিলেন সপ্তম নৌবহরের আক্রমণের মুখে মিত্রবাহিনীর টিকে থাকবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তবে সপ্তম নৌবহর আক্রমণ চালালে রুশ নৌবহরও বসে থাকবে না এবং রুশ নৌবহর মার্কিন সপ্তম নৌবহরকে অনুসরণ করছে। অর্থাৎ বিশ্ব তখন তৃতীয় মহাযুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়াবে।

একথা আমি আগেই লিখেছি এবং এ সত্যই প্রমাণিত হলো যে রুশ নৌবহরের জন্যে মার্কিন সপ্তম নৌবহর কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ পাকিস্তান বাহিনীর প্রধান জেনারেল নিয়াজী মিত্রবাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরার কাছে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আত্মসমর্পণ করেন।

কলকাতায় তখন উৎসবের বন্যা। ক্রান্তি প্রেসেও উৎসব। কিন্তু আমার মন ভালো ছিল না। আমি বুঝতে পারছিলাম না—এরপর কী হবে। এ

www.nagorikpathagar.com

যুদ্ধের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। রাজনৈতিক বা মানসিকভাবে সংগঠিত ছিল না। তবুও ৯ মাসের মধ্যে অসাধ্য সাধন করেছে আমাদের তরুণরা। কিন্তু আমাদের সামনে আছে পর্বতপ্রমাণ সমস্যা। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে শিল্পায়ন হয়নি। যে শিল্প কারখানা ছিল তাও যুদ্ধের কারণে বিধ্বস্ত। এই বিধ্বস্ত দেশটিকে উদ্ধার করতে হলে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দরকার। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দরকার। অথচ প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগই ঐক্যবদ্ধ নয়। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ক্ষত-বিক্ষত। সৎ ও সাহসী হিসেবে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সুনাম থাকলেও সকলের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য নন। ডানপন্থীদের কাছে তিনি বাম ঘেঁষা এবং মার্কিন বিরোধী। তাই আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাঁকে নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে। এ ধরনের নানা চিন্তায় আমি বিপর্যস্ত। বন্ধুরা বলছিল, আপনাদের দেশ স্বাধীন হলো। আপনি বাইরে ঘুরে আসুন। আমি সেদিন বাইরে যাইনি। ক্রান্তি প্রেসে শুয়ে দিন কাটিয়েছি। কোনো কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। বাড়ির অবস্থা কিছুই জানি না। ঢাকায় গিয়ে চাকরি করতে হবে। চাকরির ভবিষ্যতও জানি না। সবার আগে মায়ের সাথে দেখা করতে হবে। ২৩ বছর পর ভারতে এসেছি। এই ২৩ বছর মায়ের সাথে দেখা হয়নি। গত কয়েক মাস কলকাতায় আছি। কিন্তু বর্ধমানের আসানসোলে মাকে দেখতে যাইনি। বলেছি, দেশ স্বাধীন হলে মাকে দেখে দেশে ফিরব। স্থির করলাম নতুন ঝামেলা শুরু হওয়ার আগে আসানসোলে যাব। আসানসোলে দিন দুয়েক থেকে কলকাতা ফিরব। কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরব এক সপ্তাহের মধ্যে।

গোমতীর তীরে পৌঁছতে পৌঁছতে সকাল হয়ে গেল। গোমতীর ওপারে কংসনগর। আবার সেই পুরান পথ। ফুলতলী ইমিসিং হয়ে দীঘিরপাড় যেতে হবে। পুরান পথে ফিরতে হবে ঢাকায়। গোমতীর কাছে এসে সিদ্দিক ফিরে যাবে। আমরা ফেরিতে পার হয়ে কংসনগর যাব। সিদ্দিক অনেক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু কোনোদিন আমার নাম জিজ্ঞেস করেনি। জিজ্ঞেস করেনি ঠিকানা। হয়তো শহিদুল্লাহর কাছে শুনেছে। আমি আজো জানি না শহিদুল্লাহ কী পরিচয় দিয়েছিল সিদ্দিকের কাছে। কিন্তু আমার জানার কৌতূহল হলো নাফিয়া সম্পর্কে। নাফিয়াকে না বলে চোরের মতো পালিয়ে এসেছি। তাই জানতে ইচ্ছে হলো ওদের কাহিনী। ওদের জমিজমা নেই জানি। কিন্তু কখনো বুঝতে পারিনি নাফিয়ার বিয়ে হয়েছিল কিনা। মোটামুটিভাবে আমাদের

www.nagorikpathagar.com

দেশের এ বয়সের মেয়েরা তখন এত প্রগলভ ছিল না। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে এমন অসন্তোষও কারো দেখিনি।

তাই সিদ্দিককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নাফিয়াকে বিয়ে দাওনি কেন? আমার কথায় সিদ্দিক মলিন হলো। বললো, ওকে আলীর চরে বিয়ে দিয়েছিলাম। ওর বর কাজ করত কক্সবাজারে। একাত্তরের অসহযোগের পর নাফিয়ার বর আলী আকবর আর ফিরে আসেনি। তাই মানুষের কাছে পরিচয় দিয়েছিলাম আপনারা আলীর চরের কুটুম্ব। নইলে আপনাদের বাঁচাতে পারতাম না। আলী আকবর ফিরে না আসায় নাফিয়া একটু পাগলাটে হয়ে গেছে। যে কোনো মুক্তিযোদ্ধা এলে আদর করে খাওয়ায়। রাত বাড়তে থাকলে তার পাগলাটে ভাব বাড়তে থাকে। চিৎকার করে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। ১৯৭১ সালে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ সেই ভোরে গোমতী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নাফিয়ার কাহিনী শুনছিলাম। তারপর আবার গোমতী পাড়ি দিয়েছিলাম ২৫ বছর পর। দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। কারো কথাই মনে থাকলো না। কারো জন্যেই কিছু করিনি। আমাদের এই আচরণের আরেক নাম অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাজারবার কুমিল্লা গিয়েছি। কখনো ভাবতে চেষ্টা করিনি গোমতী তীরের চন্ডীপুরের কথা।

তারপর ২৫ বছর। হঠাৎ বোধ হয় একদিন মনে হলো গোমতীর তীরে চন্ডীপুরে একটি দরিদ্র পরিবার ছিল। তারা আমাদের কোনোদিন চিনতে চেষ্টা করেনি। খোঁজ নেয়নি। মুক্তিযোদ্ধা বলে আশ্রয় দিয়েছিল। ২৫ বছর পরে মনে হলো আমাদের একটা দায়িত্ব ছিল। জানতে চেষ্টা করা উচিত ছিল নাফিয়ার স্বামী আলী আকবর বাড়ি ফিরেছিল কিনা। ইতিমধ্যে দৈনিক বাংলায় নাফিয়ার নাম করেই আমি নিবন্ধ লিখেছি। সে নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু কখনো জানতে চেষ্টা করিনি সিদ্দিক বা নাফিয়া কোথায় আছে। কেমন আছে। খেয়ে পরে আছে কিনা। আমি উচ্চমহলে একেবারে অপরিচিত ছিলাম না। আমার কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই এমনো নয়। তবুও কোনো কিছু করিনি ওই সব পরিবারের জন্যে।

তারপর ১৯৯৬ সাল। ঠিক ২৫ বছর পর। এক দুপুরে গোমতী নদী পাড়ি দিলাম। সঙ্গে দেবিদ্বারের দুটি ছেলে। গোমতী পাড়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমার সঙ্গে আমার দলের ছেলে মনির এবং তার এক আত্মীয়। ব্রাহ্মণপাড়া থানার চন্ডীপুর গ্রাম অতবড়ো তা আমার জানা ছিল না। ১৯৭১ সালে প্রাণের ভয়ে ছুটেছি। তখন মনে হয়েছে সিদ্দিকদের বাড়ি ১০ থেকে ১৫ মিনিটের পথ। আর তখন কেউ চেনাও ছিল না। এবার ভিন্ন পরিস্থিতি। কথায়

www.nagorikpathagar.com

কথায় জানাজানি হয়ে গেল আমি চণ্ডীপুর যাচ্ছি। আমার নাম মোটামুটিভাবে পরিচিত।

নতুন সড়কে হাঁটছি আর হাঁটছি। চৈত্রের রোদ্দুর তখন মাথার উপরে। আমার মনের কোণে এই বাড়ির একটি ছবি ছিল। পাটক্ষেত পার হয়ে একটি পুকুর। পুকুরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি মসজিদ। তারপর সিদ্দিকের বাড়ি। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অনেক লোক জমে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঠিকই আমি বাড়িটি চিনতে পারলাম। আমি সিদ্দিকের ঘরে ঢুকতেই সিদ্দিক চিৎকার করে উঠল। বলল, আপনি সেই লোক। আপনি ৭১ সালে আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। আমি অবাক হয়ে সিদ্দিকের দিকে তাকাচ্ছিলাম। ২৫ বছর আগে লুঙ্গি, হাওয়াই শার্ট আর একমুখ দাড়ি নিয়ে আমি সিদ্দিকের বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন একটি চুলও আমার পাকেনি। ৯৪ পাউন্ডের ছিপছিপে এক তরুণ। আমি ভাবছিলাম সিদ্দিক আমাকে চিনল কী করে? সিদ্দিকের বাড়িতে তখন এক বিদেশি মেহমান। তিনি বললেন, তারা নাকি আমার কথাই আলোচনা করছিলেন। তাদের ধারণা, আমি কোনো একজন বড় লোক হবই। আমাকে তারা বছরের পর বছর খুঁজছে। কিন্তু আমার নাম ধাম জানে না। কী করে খোঁজ করবে?

সারা বাড়িতে তখন আমার কথা রটে গেছে। ছেলে-মেয়ে, বুড়ো সবাই ভিড় জমিয়েছে। সকলের বাড়িতেই যেতে হবে। সকলের ঘরেই খেতে হবে। চারদিকে ভিড় আর ভিড়। বুঝলাম আমি দীর্ঘদিনের এক গল্প হয়ে আছি ওই এলাকায়।

কিন্তু আমার তখন সেদিকে তেমন মন ছিল না। আমি ২৫ বছর পূর্বের এক তরুণীকে খুঁজছিলাম। ভাবছিলাম ওরা আমাকে খোঁজ করেছিল কেন। তাহলে নাফিয়ার স্বামী আলী আকবর কি ফিরে আসেনি? আমি বারবার নাফিয়ার কথা জিজ্ঞেস করলাম। কেউ কোনো জবাব দিল না। আমি বললাম, সিদ্দিক, আমি নাফিয়ার বাড়ি যেতে চাই। সিদ্দিক কোনো জবাব দিল না। তার চোখে তখন জল নেমেছে।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু নাফিয়ার স্বামী আলী আকবর আর ফিরে আসেনি। ১৯৭২ সালে নাফিয়া টিবিতে আক্রান্ত হয়। গরিব সিদ্দিকের পয়সা ছিল না বোনের চিকিৎসার। তাই সে হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজছিল। বাধ্য হয়ে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি আলীর চরে। ১৯৭৩ সালে প্রায় বিনা চিকিৎসায় নাফিয়া আলীর চরে মারা গেছে।

১৯৭১ থেকে ১৯৯৬। স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী। আমি একজন সিদ্দিক

www.nagorikpathagar.com

ও নাফিয়ার খোঁজে গিয়েছিলাম। দেশে তখন অসংখ্য অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। কিন্তু সিদ্দিককে খুঁজে পেলেও নাফিয়াকে পাইনি। এ নিয়ে সিদ্দিকের খুব অভিযোগ ছিল না। দুঃখ ছিল। তারা ভেবেছিল আমাকে পেলে হয়তো নাফিয়ার মৃত্যু হতো না। এর চেয়ে বড় সত্য কথা হতে পারে না। স্বাধীন বাংলাদেশে নাফিয়ার চিকিৎসার অসুবিধা হতো না। টাকার কোনো অভাব হতো না। অভাব ছিল আমাদের মতো রাজনীতিকদের কৃতজ্ঞতার এবং মানবিক আচরণের। আমরা সব কিছু পেতে চাই। সবকিছু দখল করতে চাই। আর যাদের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে সবকিছু দখল করি তাদের একদিন লাথি মেরে পিছু হটিয়ে দিই। শুধু নাফিয়া কেন? একই আচরণ করেছি ইয়াকুবের সঙ্গে। ১৯৭১ সালের আগস্টে নাফিয়ার কাহিনী শুনতে শুনতে গোমতী পাড়ি দিয়েছিলাম। দুপুরে দীঘিরপাড় বাজারে এসে পৌঁছলাম। দুপুরে দীঘিরপাড় বাজারে মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন ভিড় থাকে না। বাজার মোটামুটি ফাঁকা। ওখান থেকে আমাদের নৌকায় যেতে হবে। নৌকায় যেতে হবে গৌরীপুর।

খাবার জন্যে হোটেলে ঢুকলাম। হোটেল মালিক আগেরই চেনা। জিজ্ঞেস করল, ফিরে এলেন কেন? আমি বললাম কুমিল্লা সীমান্ত দিয়ে ওপারে যাওয়া যাবে না। সব সীমান্ত পাকিস্তান বাহিনীর দখলে। আবার ঢাকা ফিরছি। ঢাকা থেকে রায়পুর লক্ষ্মীপুর হয়ে ওপার যাবার চেষ্টা করব। হঠাৎ হোটেল মালিক বলল—স্যার, আপনাকে ঘোষগাতি যেতে হবে। সেদিন আপনার সঙ্গে গাইড হিসেবে ইয়াকুব গিয়েছিল। ইয়াকুব কিন্তু আর ফিরে আসেনি। ওর বাড়িতে লোকজন কান্নাকাটি করছে।

আমি চমকে গেলাম। আমি বলদা বাজারে ইয়াকুবকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তাকে ২০ টাকা দিয়ে বলেছিলাম বাড়ি চলে যাও। সকলের ধারণা ইয়াকুব টাকা নিয়ে তাড়াল্লার হাটে গিয়েছিল। সেদিন ভাড়াল্লার হাটে বিকেলের দিকে পাকিস্তান বাহিনী হামলা চালিয়েছিল। হয়তো ইয়াকুব প্রাণ হারিয়েছে।

আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। কী করে গোষগাতি যাবো। কী তাদের গিয়ে বলব। আর ঘোষগাতির কাছাকাছি কুমিল্লার ক্যান্টনমেন্ট। শহিদুল্লাহও রাজি হলো না। তার ভয় ঘোষগাতি গেলে আমরা দু'জনেই মারা পড়ব। ২৬ বছর আগের কথা লিখছি। এই ২৬ বছরে অনেকবার ইয়াকুবের কথা মনে হয়েছে।

মুখটা যেন আবছা আবছা মনে পড়ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ঘোষগাতি যাওয়া হয়নি। হোটেল মালিককে কথা দিলাম ঢাকা গিয়ে ব্যবস্থা করব।

www.nagorikpathagar.com

তারপর দীঘিরপাড় থেকে গৌরীপুর। গৌরীপুর থেকে নৌকা বদল করে আবার বেলতলী। কিন্তু বেলতলীতে আবুল হোসেনের বাড়িতে জায়গা হলো না। সে বাড়িতে অনেক লোক। সে রাতে খাওয়া জুটল না। আমাদের যেতে বলা হলো ল্যাংটা ফকিরের মাজারে। সেখানেই ঘুমাবার ব্যবস্থা। একেবারে মাজারের পাশেই ঘুমাতে হবে। মাজারে একজন মাত্র খাদেম। দুপুর রাতে সে আমাকে ডেকে তুলল। বললো হুজুর আমিও মুক্তিযোদ্ধা। আমার বাড়ি হাজীগঞ্জ। আমি কলিমুল্লাহর লোক। সাম্যবাদী দলের নেতা কলিমুল্লাহ হাজীগঞ্জে বিশেষভাবে পরিচিত।

ভোরে মাজার থেকে বেলতলী বাজারে এলাম। সেখান থেকে লঞ্চে মুন্সীগঞ্জ হয়ে ঢাকা। আবার রায়েরবাজারের মোহাম্মদ হোসেনের বাড়ি থেকে বেরিয়েছি এপ্রিল মাসে। আগস্ট মাস পর্যন্ত কোনো খবর পাইনি। এদিকে অতীন দার পুত্রবধু অজন্তা একা আছে কুমিল্লায়। কেমন আছে কে জানে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম মায়ের সাথে দেখা করে ঢাকায় ফিরব। যতদূর মনে আছে তারিখটি ১৯৭১ সালের ২৩ ডিসেম্বর। সন্ধ্যার দিকে আসানসোল পৌছুলাম। কার সাথে গিয়েছিলাম মনে নেই। আমার অদ্ভুত লাগছিল। ১৯৪৮ সালে মার সাথে শেষ দেখা হয়েছিল। তারপর ২৩ বছর আমার ভারত যাওয়া সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে অনেক জল গড়িয়েছে পদ্মা-গঙ্গা-ভাগিরথীতে। আমাদের পরিবার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাংলাদেশে আমাদের যৌথ পরিবার ছিল। দেশ বিভাগের পর সে পরিবার শতভাগে বিভক্ত। ভারতের পূর্বে আজকের বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে শুরু করে পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় সব এলাকায় আমার স্বজনদের খুঁজে পাওয়া যাবে। আমি কোথায় যাব তা জানি না। এদেশে থাকতে সবাই মিলেমিশে ছিলাম। আমাদের পরিবারের অধিকাংশ সদস্য ভারতে চলে গেছে। শুধু ভাগ হইনি আমি। ১৯৭১ সালে কলকাতায় গিয়ে আমি এই সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলাম। কলকাতায় আমার অসংখ্য আত্মীয়। কিন্তু আমি কার ভাগে পড়েছি জানি না। তাই অনেক ভেবে চিন্তে আমি কোনো আত্মীয়ের বাসায় উঠিনি। উঠেছি রাজনৈতিক মিত্রের আশ্রয়ে। কলকাতায় আরএসপির কমিউনে।

যারা দেশ ভাগের শিকার হয়নি তারা এই মর্মান্তিক জ্বালা বুঝতে পারবেন না। রাজনৈতিক বিভাজন যে কত দুঃখ-বেদনার সৃষ্টি করতে পারে তা তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। দেশে আমি সকলের সাথে একা ছিলাম। বিদেশে সকলে বিচ্ছিন্ন। আমি কোন ভাগে জানা নেই। কোলকাতা শহরে আমার

www.nagorikpathagar.com

অসংখ্য আত্মীয় আছে। কিন্তু কাকে বাদ দিয়ে কার বাড়ি উঠব সে প্রশ্নের তখনো মীমাংসা হয়নি। আমার তখন অন্নদাশঙ্করের সেই বিখ্যাত কবিতাটি মনে পড়ত। যে কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, অবিভক্ত বাংলার সব ভাগ হয়ে গেছে, শুধু ভাগ হয়নি নজরুল। আমারও মনে হতো আমার সেই ঐতিহ্যবাহী যৌথ পরিবার ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। শুধু আমি ভাগ হইনি।

২৩ বছর পর প্রথম কোলকাতায় পৌঁছেছিলাম। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস। তখনো আমি মার সাথে দেখা করিনি। কারণ আমাকে বাংলাদেশে ফিরতে হবে। তখন বাংলাদেশ যুদ্ধ আর যুদ্ধ। ভেবেছি মায়ের সাথে দেখা হলে মা আমাকে বাংলাদেশে ফিরতে দেবে না। তাই বলেছিলাম দেশ স্বাধীন হলে মার সাথে দেখা হবে।

মা থাকেন বর্ধমানের আসানসোলে। কলকাতা থেকে দুশো কিলোমিটার। যতদূর মনে আছে ট্রেনের নাম কোলফিল্ড। অর্থাৎ কয়লার খনি। এ ট্রেন হাওড়া থেকে বিহারের ধানবাদ যায়। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ এ ট্রেনে যাতায়াত করে। ভোররাতে ধানবাদ থেকে রওনা হয়ে ২৫০ কিলোমিটার দূরে কলকাতায় এসে অফিস করে। আবার সন্ধ্যায় একই ট্রেনে ফিরে যায়। তাই এ ট্রেনে ডেইলি পেসেঞ্জারের ভিড়।

ভিড়ের মধ্যেই আমি ভাবছিলাম আমার কথা। ২৩ বছর পর মার সাথে দেখা হবে। দেখা হবে দুই ভাইয়ের সাথে। বড় ভাই থাকেন মধ্যপ্রদেশের কয়লাখনি এলাকায়। জায়গার নাম মনীন্দ্রগড়। আরেক ভাই থাকে বিহারের বোকারো। ইস্পাত কারখানার ইঞ্জিনিয়ার। তাদের সাথে এবার দেখা হবে না। কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমার পক্ষে বেশিদিন ভারতে থাকা সম্ভব নয়।

সন্ধ্যার পর ট্রেন আসানসোল পৌঁছলো। ভাইয়ের বাসায় পৌঁছে মনে হলো আমি একটি দর্শনীয় বস্তু। চারদিকে মানুষের ভিড়। এ ভিড় আমাকে দেখতে নয়। বাংলাদেশের কথা জানতে। বাংলাদেশে কী হয়েছে সকলে জানতে চায়। তাদের প্রথম প্রশ্ন, শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়? আদৌ তিনি জীবিত কি না? তিনি কেমন দেখতে? আমি তাকে চিনি কি না? আমার ভাই শেখ সাহেবকে ভালোভাবে চেনেন। আমার ভাইও এক সময় টুঙ্গীপাড়া স্কুলে পড়তেন। কিন্তু তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করে না। তাঁর কথা বাসি হয়ে গেছে। সবাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চায় বাংলাদেশে কী হয়েছে। যারা এ কথা জানতে চায় তাদের নাড়ির টান আছে। মাত্র কয়েক বছর আগে তারা বাংলাদেশ ছেড়েছে। পিতার ভিটি তারা ভুলতে চেয়েছিল। কিন্তু সবকিছু ওলট-পালট

www.nagorikpathagar.com

করে দিয়েছে ৭১-এর যুদ্ধ। তারা ভাবতেই পারেনি যে এমন একটি ঘটনা ঘটবে। তাদের স্বপ্ন কোনোদিন বাংলাদেশ ছিল না। ৭১-এর সংগ্রাম তাদের মনে করিয়ে দিয়েছে একান্তভাবেই তারা পূর্ব বাংলার লোক। তারা পশ্চিমবাংলার লোক নয়।

তাদের এই জানার ইচ্ছায় ঐকান্তিকতা ছিল। দীর্ঘদিন পরে তারা ভাবতে চেয়েছিল তারা উদ্বাস্তু নয়। তাদেরও একটি দেশ আছে। সে দেশের নাম বাংলাদেশ। কিন্তু আমার তাদের কথা ভালো লাগছিল না। হয়তো আমি তাদের অনুভূতি অনুধাবন করতে পারিনি। তাই আমার শুধু মনে হতো—এতটাই যদি ভালোবাসা ছিল তাহলে দেশ ছেড়ে চলে এলেন কেন? আপনারা সকলে মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে হয়তো এ ঘটনা ঘটত না। আমি লক্ষ করেছি ভারতে গিয়ে আমার এ মানসিকতা নিদারুণভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছে। এমনো হতে পারে যে আমি তাদের দুঃখ বেদনা অনুভব করতে পারিনি। পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছর পর আমি জেলে গেছি। তারপর একটানা প্রায় ৫ বছর জেলে থেকেছি। এ সময় উভয় বঙ্গে ভয়াবহ দাঙ্গা বেধেছে। মানুষ ভিটা ছেড়েছে। প্রাণে বাঁচার জন্যে কোনোদিক তাকায়নি। ইচ্ছা থাকলেও নিজের জন্মভূমিতে থাকতে পারেনি। এ সময়টা আমি জেলে ছিলাম। তাই তাদের এ সময়ের দুঃখ কষ্টের কাহিনী আমি অনুধাবন করিনি। কোটি কোটি মানুষ এপার থেকে ওপারে গিয়েছে। শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করেছে। জলাভূমি আবাদ করে বসতি স্থাপন করেছে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে সকল বাঁধন। প্রেম, ভালোবাসা, মায়া, মমতা সবকিছু বিক্রি হয়েছে টাকার বিনিময়ে। দীর্ঘদিন পর এসে আমি বুঝতে পেরেছি এই উদ্বাস্তুদের সংসারে একান্তভাবেই আমি বেমানান। আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথে আমার কথাবার্তা ধ্যান-ধারণার কোনো মিল নেই। সর্বত্রই যেন আমি এক আগন্তুক।

বাসার সামনের ভিড় ঠেলে আমি এক সময় ঘরে ঢুকে গেলাম। আস্তে আস্তে মা আমার দিকে এগিয়ে এলেন। মা'র চেহারা তেমন বদলায়নি। সবাই চুপচাপ তাকিয়ে ছিল। কেউ ভাবেনি তাদের সাথে আমার আর কোনোদিন দেখা হবে। কেউ জানত না বাংলাদেশের সৃষ্টি হবে। সবারই ধারণা পাকিস্তান সরকার কোনোদিন আমাকে পাসপোর্ট দেবে না। সুতরাং এ জীবনে কারো সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই—এ বিষয়ে সবাই নিশ্চিত ছিল।

মা বললেন, তোর চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে। আমি বললাম, তুমি বুঝলে কী করে। ১৯৪৮ সালে তুমি আমাকে শেষ দেখেছ। তখন আমার দাড়ি

www.nagorikpathagar.com

গোফ গজায়নি। এখন আমার মুখভর্তি দাড়ি। পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। আমার সব কিছু পাল্টে গেছে। মা হঠাৎ আমার পকেটে হাত দিলেন। আমি বললাম, পকেটে হাত দিচ্ছ কেন? মা বললেন, এক সময় তোর রুমালটা খুব অপরিষ্কার থাকত। তাই দেখলাম তোর রুমালের অবস্থা কী। আমি বললাম—সে যুগ কেটে গেছে। তখন তোমাদের সাথে থাকতাম। স্কুল কলেজে পড়তাম। তারপর ২৩ বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘদিন একান্তই একা জীবন কাটিয়েছি। কখনো জেলে, কখনো আত্মগোপন করে, আবার কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে। এখন আমি স্বাবলম্বী। নিজের কাজ নিজে করতে হয়।

তারপর রাত বাড়তে থাকল। আমাদের কথা তেমন জমল না। ফেলে আসা ২৩ বছরের কথা যেন হারিয়ে গেল। সেদিন অনেক কথা বলার ছিল। মনে হচ্ছিল যেন কেউ কোনো কথা স্মরণ করতে পারছি না। সব কথা ছিল আবেগের, দুঃখ এবং বেদনার। কোনো কথাই সেদিন সুস্পষ্ট রূপে বলা হলো না। শুধু এক সময় মা জিজ্ঞেস করলেন—কবে যাবি? কিছুদিন থাকবি তো? ২৩ বছর পর কোলকাতায় এলি। কিন্তু আমাদের সাথে দেখা করলি না। এখন কিছুদিন থেকে যা। শরীরটা ভালো হোক। তারপর বাংলাদেশে যাবি। আমরা তোকে বাংলাদেশে যেতে বাধা দেব না।

আমি বললাম, আমি পরশু চলে যাব। কোলকাতায় কয়েকদিন থাকব। রাজনৈতিক বন্ধুদের সাথে আলাপ করব। তারপর দেশে ফিরে যাবো। আমার কথা শুনে সবাই যেন অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। কেউ কোনো কথা বলল না। অনুরোধ জানাল না একটি দিনও বেশি থাকার জন্যে। মা জানতেন, তার এ ছেলেটি শৈশব থেকেই কারো কথা শুনতে অভ্যস্ত নয়। কোনো অনুরোধই তাকে ঠেকাতে পারবে না। সেদিন আমার যে আদৌ খারাপ লাগেনি তা নয়। কিছুটা দুঃখও পেয়েছিলাম। ভাবছিলাম নিজেকে এমন করে তৈরি করেছি যে আমাকে দ্বিতীয়বার কেউ কোনো অনুরোধও করবে না। কখনো কখনো ইচ্ছে থাকলেও আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সাধ্য থাকে না।

দু'দিন পরে দুপুরের দিকে আবার আসানসোল স্টেশনে এলাম। বাসায় সকলেই চুপচাপ। মা বললেন, বাড়ি পৌঁছে চিঠি দিস। স্টেশনে আমাকে তুলে দিতে এল আমার ছোট ভাই। সে বলল, ঢাকায় ফিরে চিঠি লিখবেন। তার এই ঢাকা শব্দটি ট্রেনের কক্ষে একটি অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করল। সকল যাত্রী তখন আমার দিকে তাকাচ্ছে। তাদের প্রশ্ন, ঢাকা যাচ্ছে এ লোকটি কে? সকলেরই তখন কথা বলার পালা। পাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তার পাশে ২২/২৩ বছরের এক তরুণী। তাদের কৌতূহলের শেষ নেই। তরুণীর পিতার বাড়ি

www.nagorikpathagar.com

বরিশাল জেলায়। বরিশালে স্টিমারে কাজ করতেন তার বাবা। ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় তার বাবা নিহত হন। তরুণীর বয়স তখন দেড় বছর। সেই দেড় বছর বয়স থেকেই সে দেশ ছাড়া। বাংলাদেশের সাথে তার পরিচয় ভূগোলের মানচিত্রে। আর ৭১-এর যুদ্ধে। তাই তার চরম কৌতূহল বাংলাদেশ ও বরিশাল সম্পর্কে। ট্রেনের সমগ্র কক্ষের সকলের কৌতূহল হলো আমাকে নিয়ে। আমার মা আসানসোলে থাকে। কিন্তু আমি ঢাকায় থাকি কেন। কিভাবে আছি ঢাকায়। ঢাকায় ফিরে নতুন বিপদ আসবে না তো?

সেদিন ট্রেনের কক্ষে এ কথার জবাব দিতে পারিনি। তবে কলকাতায় পৌঁছে মনে হলো যুদ্ধে আমরা জিতেছি সত্য কিন্তু পরিবেশ আমাদের অনুকূলে নয়। পরদিন ভোরে আনন্দবাজার পড়ে মনে হলো কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আনন্দবাজারে বলা হয়েছে, ভারত থেকে আইএএস অফিসার বিআর গুপ্তের নেতৃত্বে ১৩ জন আমলা বাংলাদেশে যাবে। তারা বাংলাদেশের ভেঙে পড়া প্রশাসন গড়ে তুলবে। এ খবর আমি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারলাম না। আমার দুঃখ হলো আমাদের বন্ধুরা বুঝতে পারছেন না যে এ খবরে বাংলাদেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। কেউ বুঝতে পারছে না যে আমরা একটি ভিন্ন জাতি। কারো খবরদারি আমাদের পছন্দ নয়। এ জন্যেই আমরা পাঞ্জাবি অর্থাৎ অবাঙালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমরা বলেছি আমাদের দেশ আমরাই গড়ব। আমরা অন্যের সাহায্য সহযোগিতা চাই কিন্তু খবরদারি চাই না। খবরদারি চাইলে পাঞ্জাবিদের সাথেই থাকতাম। মনে রাখতে হবে ধর্মের দিক থেকে বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষই মুসলমান। স্বাভাবিক কারণেই পাকিস্তানের মুসলমানদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক থাকারই কথা। কিন্তু শাসন-শোষণ ও খবরদারির প্রশ্নে বাঙালি মুসলমান অবাঙালি মুসলমানদের মানতে চায়নি। এটাই ছিল ১৯৭১ সালের যুদ্ধের মূল কারণ। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর যদি লক্ষ করা যায় যে আরেকটি দেশ সাহায্যের নামে আমাদের ওপর খবরদারি করছে তাহলে একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

এছাড়া পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক ছিল না। এ সময় ভারতের সাথে পাকিস্তানের কাশ্মীর নিয়ে দু'বার যুদ্ধ হয়েছে। ২৩ বছরের এই বৈরী সম্পর্কের ইতিহাস নিশ্চয়ই ন'মাসেই মুছে যায়নি। যারা দেশ চালান এবং দেশ চালাতে সহযোগিতা করেন তাদের এ অপ্রিয় সত্যটি প্রথম থেকেই অনুধাবন করা উচিত ছিল। কিন্তু আনন্দবাজারের খবরে মনে হলো কেউ যেন এই অপ্রিয় সত্যটি মেনে নিতে চাইছে না। বাংলাদেশে ভারতীয়

www.nagorikpathagar.com

কর্মকর্তাদের উপস্থিতি আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না তারা যেন তাও মেনে নিতে পারছে না।

দেশ বিভাগের ফলে ভারত ও পাকিস্তানের অসংখ্য পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমিও তার শিকার ছিলাম। এখন কোটালীপাড়ায় আছি আমরা একটি ভগ্নাংশ মাত্র। আমাদের বিভাগপূর্ব কালের যৌথ পরিবার এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা ভারতে। দেশ বিভাগের এক বছরের মধ্যে আমি গ্রেফতার হয়ে যাই। জেলখানা থেকে ফিরতে ফিরতে প্রায় ৫ বছর। বাড়ি ফিরে দেখলাম আমার এক কাকা ছাড়া আর সবাই দেশান্তরে। বাড়িতে ফিরলাম কিন্তু মায়ের সাথে দেখা হলো না। মা দেশান্তরী। মায়ের সাথে দেখা হলো ১৯৭১ সালের ২৩ ডিসেম্বর। দেশভাগ হওয়ার ২৩ বছর পর বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর।

বড় ভাইয়ের সাথে দেখা হয়নি। তিনি থাকেন মধ্য প্রদেশে। বড় ভাইয়ের সাথে দেখা হলো ১৯৭৮ সালে। ত্রিশ বছর পর। এ ঘটনার উল্লেখ করে আমি বলেছিলাম যারা দেশ বিভাগের শিকার হননি, তাঁরা এ মর্মান্তিক জ্বালা বুঝতে পারবেন না। তাঁরা বুঝতে পারবেন না ছিড়ে যাওয়া নাড়ির বন্ধন। বছর তিনেক আগে বড় ভাইকে দেখে এসেছিলাম। ভারতের মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে। একটি দেশের রাজনৈতিক বিভাজন একজন মানুষকে কিভাবে শেষ করে দিতে পারে আমার বড় ভাই তার প্রতিকৃতি।

আমার বড় ভাই কল্লোল যুগের শিল্পী। সেকালের প্রখ্যাত হাতে লেখা পত্রিকা ঝরণার সম্পাদক। এ ঝরণা ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পত্রিকা। বড় ভাইয়ের সমসাময়িক হচ্ছেন—বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রণব রায়, কমল দাশগুপ্ত, গিরীন চক্রবর্তী, অখিল নিয়োগী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, আমাদের পল্লীকবি জসিমউদ্‌দীন, রাধারাণী, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ। তিনি ঘনিষ্ঠ ছিলেন দেশ সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে।

কিন্তু সব কিছু শেষ হয়ে যায় দেশ ভাগের সঙ্গে সঙ্গে। জীবিকার সন্ধানে যেতে হয় মধ্যপ্রদেশের কয়লাখনিতে। আত্মীয়-স্বজনহীন পরিবেশে এক মর্মান্তিক জ্বালা অবসর জীবনের। তার সব আছে, কিন্তু কিছু নেই। কথায় কথায় স্মৃতিচারণ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কাহিনী, নরেন্দ্র দেব ও রাধারানীর বিয়ের কাহিনী, নবনীতার কাছে চিঠি লেখার কাহিনী। তিনি অবসর জীবনটা যেন কাটাতে চাচ্ছেন স্মৃতির অন্তরালে। কোথায় বাংলাদেশে বাড়ি ছিল। কোথায় কোনো গাছ ছিল। কোন সড়কের পাশে বাড়ি ছিল। এটাই যেন জীবনের একমাত্র চর্চা। তার এই স্মৃতির মধ্যে ভারত নেই। আমার বড় ভাই

www.nagorikpathagar.com

শিশির সেনগুপ্ত বাঁচতে চেয়েছেন বাংলাদেশের স্মৃতি নিয়ে। কিন্তু ১৯৪৮ সালের পর ফিরতে পারেননি উপমহাদেশের এ অংশে।

এবার নিজের কাহিনী নিয়ে লিখছি। এ লেখার একটা পটভূমি আছে। বড় ভাইয়ের কথা উল্লেখ করেছি। জানতাম না, তার সাথে আমার আর দেখা হবে না। দীর্ঘদিন পাকিস্তান সরকার পাসপোর্ট দেয়নি আমাকে। দেশ স্বাধীন হবার পর ভারত সরকার ভিসা দেয়নি সাত বছর। সে পর্যায় কাটিয়ে উঠে সাম্প্রতিককালে মাঝে মাঝে ভারত যেতে পারতাম। তবে সব সময়ই ভয় ছিল কখন সে সুযোগ হারাই। আমার কাছে সর্বশেষ খবর হচ্ছে বড় ভাই মারা গেছেন ২১ সেপ্টেম্বর। খবরটা আমার কাছে বিলম্বে পৌঁছেছে। তখন আমার কিছু করার ছিল না।

এ কথাগুলো একটা বিশেষ কারণে আমি লিখছি। আমাদের দেশে অনেক বিহারী আছে। ওরা এক সময় ভারত থেকে এসেছিল। জীবন জীবিকার সন্ধানে এসেছিল পাকিস্তানে। সে পাকিস্তান নেই। কিন্তু বিহারীরা আছে। ওরা বাংলাদেশে আছে। জেনেভা ক্যাম্পে। ওরা পাকিস্তানে যেতে চাচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তান তাদের নিচ্ছে না। ওরা বাংলাদেশে থাকছে কিন্তু ওরা বাংলাদেশের নাগরিক নয়। বাংলাদেশ ওদের রাখতে চাচ্ছে না। পাকিস্তান ওদের নিচ্ছে না। ওরা না ঘাটকা, না ঘরকা। ভারতবর্ষ ভাগের ৬০ বছর চলে গেল। ওদের ঠিকানা ঠিক হলো না। পাকিস্তানের করাচিতেও এমন এক শ্রেণির মোহাজের আছে। প্রতি মুহূর্তে বেঁচে থাকার জন্যে তাদের সংগ্রাম করতে হয়। পৃথিবীতে ওদের কোনো নিজস্ব দেশ নেই। আমার ধারণা আমার ভাইয়েরও নিজস্ব কোনো দেশ ছিল না। ভারত নামক একটি দেশে থাকতেন। পশ্চিমবাংলা থেকে অনেক দূরে। নিজের ভাষায় কথা বলা যেত না। তাই বেঁচে থাকতে চাইতেন স্মৃতিতে। কিন্তু স্মৃতি কখনো ঠিকানা হয় না। স্মৃতি রোমন্থন করা যায়। কিন্তু স্মৃতি ভিত্তি করে বেঁচে থাকা যায় না। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যায়। আমার ভাইও তেমন করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিলেন। বেঁচে ছিলেন না দীর্ঘদিন ধরে। সে প্রেক্ষিতে আমার একটা অনুরোধ আছে। অনুরোধ হচ্ছে, যদি কোনো সময় কেউ ঢাকার মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পের কাছে যান, যদি কেউ সৈয়দপুর বা পার্বতীপুর যান। তখন এ মানুষগুলোর জন্যে একটু ভাববেন। যারা আমাদের ভাষায় কথা বলে না— কিন্তু ওদের নিজেদের ভাষায় কথা বলার দেশ ছিল, বসতবাটি ছিল। ঐতিহ্য আর উত্তরাধিকার ছিল। ওরা সব কিছু হারিয়েছে। একটি দেশ রাজনৈতিকভাবে বিভাজনের জন্যে।

মায়ের সাথে দেখা করে কোলকাতায় ফিরে দেখলাম নতুন পরিস্থিতির

www.nagorikpathagar.com

সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তখনো ভারতের মাটিতে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা ঢাকায় পৌঁছেনি। চারদিকে এক অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তা। বোঝা যাচ্ছে সবকিছু ঠিক নেই। যুদ্ধের প্রেক্ষিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকলেও যুদ্ধ শেষেই সে ঐক্যে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভারতের মাটিতে তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী থাকলেও বাংলাদেশের মাটিতে তাঁকে অনেক সঙ্কট মোকাবেলা করতে হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় না আসায় সমালোচনার ঝড় উঠল। কড়া মন্তব্য করলো কোলকাতার ইংরেজি দৈনিক দি স্টেটসম্যান। যতদূর মনে আছে দেশ স্বাধীন হওয়ার ৯ দিন পর ২৫ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় ফিরে এল।

আমি তখনো কলকাতায়। আগরতলার বন্ধুরা বাংলাদেশে ফিরে গেছে। ফিরে গেছে উত্তরবঙ্গের কমরেডরা। কিন্তু সমস্যার দেখা দিয়েছে পরিচিত নেতাদের নিয়ে। কলকাতায় খবর হচ্ছে, একটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে মুজিব বাহিনী সৃষ্টি হয়েছে। এদের প্রথম কাজ হবে রাজাকার ও শান্তিবাহিনীর লোকদের নিঃশেষ করা। আর দ্বিতীয় কাজ হবে বামপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করা। তাই অনেকেরই ধারণা সড়ক পথে আমাদের বাংলাদেশ আসা হবে ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে নেতাদের সতর্ক হতে হবে। সম্ভব হলে আসতে হবে বিমানে। কিন্তু ইচ্ছে হলেই বিমানের টিকেট পাওয়া সম্ভব নয়। স্বাভাবিক কারণেই তখন বিমানের টিকেট নিয়ে সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। সবশেষে সিদ্ধান্ত হলো আমি সড়ক পথেই যাব। আমার গায়ে হয়তো কেউ হাত দেবে না। অন্যসব নেতাদের ঢাকায় আসতে হবে বিমানে।

কিন্তু কী করবো ঢাকায় গিয়ে? আমরা মুসলিম লীগ নেতাদের চিনতাম। আওয়ামী লীগ নেতাদেরও চিনি। এদের সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা আছে। নতুন কোনো কিছু করতে না পারলে ৯ মাসের সংগ্রামই অর্থহীন হয়ে যাবে। তাই সিদ্ধান্ত হলো—ঢাকায় ফিরে সংবাদ সম্মেলন করতে হবে। একাত্তরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলকে নিয়ে বিপ্লবী সরকার গঠনের দাবি জানাতে হবে। সুস্পষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে সরকার গঠন করতে হবে। আর আমাদের এ প্রস্তাব গৃহীত না হলে, এ কর্মসূচিতে আন্দোলন করতে হবে।

কলকাতায় রাজনৈতিক বন্ধুদের বললাম—আপনাদেরও সতর্ক হতে হবে। আমরা দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানের উপনিবেশ ছিলাম। আমরা এখন ভারতীয় উপনিবেশ হতে চাই না। আপনাদের দাবি তুলতে হবে—বাংলাদেশ থেকে মাড়োয়ারি ও মহাজন হাত গোটাও। বাংলাদেশে মাড়োয়ারি ও

www.nagorikpathagar.com

মহাজনদের তাণ্ডব শুরু হলে আর এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। কারণ আমরা ৯ মাস কঠিন সংগ্রাম করেছি সত্য। কিন্তু সে সংগ্রামে সমাজ পাল্টায়নি। আমরা বামপন্থীরা সফল হইনি। আর আমাদের সফল হওয়ারও কথা ছিল না। তাই সে পুরনো সমাজটাকে নিয়েই নতুন সংগ্রাম শুরু করতে হবে।

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমি সড়ক পথে কলকাতা ছেড়ে এলাম। আসার আগে আত্মীয়-স্বজন কারো সাথে তেমন দেখা হয়নি। মন আদৌ ভালো ছিল না। বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে কোনো কিছু ভাবতে পারছিলাম না। কলকাতার বন্ধুরা সকলেই খুশি। সবার ধারণা আমারও খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু আমি খুশি হতে পারিনি। অনেকেই আমার সাথে সীমান্ত পর্যন্ত এলো। আমি সীমান্তে পৌছে বাসে করে খুলনা পৌছলাম। তারপর স্টিমার। ওই স্টিমারেই দেড় দিন বসে ঢাকা। স্টিমারে অসংখ্য মানুষ। প্রায় সবাই ভারত থেকে ফিরছে। তাদের অনেকের মুখেই হাসি। কিন্তু কারো সাথে আমার কথা জমল না। এমনি করে ঢাকায় পৌছলাম।

কলকাতায় ২৩ বছর পর বড় বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল জুন মাসে। তিনি প্রথম আমাকে চিনতে পারেননি। মাত্র কিছুদিন আগে তাঁর মেঝ ছেলের বিয়ে হয়েছে বরিশালের গৌরনদী থানার মাহিলারা গ্রামে। বিয়ের পরপরই শুরু হয়েছে ৭১-এর সংগ্রাম। দিদির দাবি হচ্ছে তুমি যখন বাংলাদেশেই ফিরছ তখন এই পরিবারের খবর নিয়ে আসতে হবে। আমি মনে মনে হাসছিলাম। ১৯৭১ সালের জুন মাস। আমাকে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করতে হবে। অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। আবার সকলের খবরও নিতে হবে।

নিজের বাড়ি গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া। এপ্রিল মাসে বাড়ি ছেড়েছি। বাড়িতে যারা আছেন তাঁরা প্রায় সবাই বৃদ্ধ। দুই ভাই, তাদের স্ত্রী, এককালের খুব বড় বাড়ি। কিন্তু একালের ছোট সংসার। এপ্রিলের বাড়ি ছাড়ার সময় বলে এসেছিলাম কেউ দেশ ছেড়ে যাবেন না। তারপর তিন মাস কেটে গেছে। সঠিক কোনো খবর জানি না। বিদেশি খবরে শুনেছি এলাকাটি তখনো মোটামুটি নিরাপদ। স্থানীয়ভাবে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছে।

তবু মনে হলো বাড়ির একটা খোঁজ নেয়া দরকার। শহিদুল্লাহকে বললাম, তুমি মাহিলারা হয়ে কোটালীপাড়া চলে যাবে। যে কোনো উপায় হোক বাড়ির খবর নিয়ে ঢাকায় পৌছবে। শহিদুল্লাহর কোনো ব্যাপারে আপত্তি ছিল না। শহিদুল্লাহ ঢাকা থেকে বরিশাল চলে গেল। শহিদুল্লাহর ফিরতে সপ্তাহখানেক হয়ে গেল। তার খবর হচ্ছে ঘাঘর বন্দর পুড়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে তেমন

www.nagorikpathagar.com

ক্ষতি হয়নি। এক কাকা এবং এক ভাই ভারতে চলে গেছে এবং অন্য সকলে এখনো নিরাপদ আছে। কিন্তু শহিদুল্লাহ কিছুতেই মাহিলারা ঢুকতে পারেনি। বরিশাল থেকে বাটাজোড়, মাহিলারা, গৌরনদী হয়ে মাদারীপুর পর্যন্ত পাকা সড়ক। এ সড়কে সারাদিন সামরিক বাহিনীর গাড়ি চলাচল করছে। শহিদুল্লাহ মাহিলারা গিয়েছিল। কিন্তু কোনো হিন্দু বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করার সাহস তার হয়নি। তার ধারণা সকলেই বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে।

এবার শহিদুল্লাহর ঢাকা থেকে কুমিল্লা যাবার পালা। কুমিল্লা বাগিচা গাঁওয়ে অতীন রায়ের বাড়ি। আগেই লিখেছি অগ্নিযুগের বিপ্লবী অতীন রায় দু'বার কুমিল্লা পৌরসভার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। ২৬ মার্চ তাঁর একমাত্র পুত্র অসীমকে পাকিস্তান বাহিনী ধরে নিয়ে গেছে। অতীন দা আগরতলা চলে গেছেন। বাড়িতে একমাত্র পুত্রবধু অজন্তা। অজন্তাকে পাহারা দিচ্ছে পাকিস্তান বাহিনী। কখনো কখনো পাশের এক অ্যাডভোকেটের বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছে। ঢাকায় শুনেছি অজন্তা নাকি তার স্বামীর উদ্ধারের জন্যে কুমিল্লা আদালতে মামলা দায়ের করেছে। শুনে আমি অবাক হয়েছি। তবুও ভেবেছি যে কোনো উপায়ে হোক অজন্তাকে আগরতলা নিয়ে যেতে হবে এবং এ জন্যে শহিদুল্লাহকে কুমিল্লা পাঠালাম।

শহিদুল্লাহ ভোরের দিক কুমিল্লা রওনা হয়ে গেলো। অনেক রাতে ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। বললো, স্যার বড় বিপদ। নিজেই ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। ঢাকা থেকে কুমিল্লায় বাসে নামলে শহিদুল্লাহসহ আরো কয়েকজন যাত্রীকে সামরিক বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। প্রায় বিকেল পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের হাঁটু এবং কনুই পরীক্ষা করে দেখে ক্রলিং-এর কোনো দাগ আছে কিনা। শহিদুল্লাহ বেঁচে যায় কারণ পকেটে একটি আইডেনটিকার্ড ছিল। ওই কার্ডে লেখা ছিল সে একটি ইলেট্রিক দোকানের ম্যানেজার। শহিদুল্লাহর বক্তব্য ছিল তার দোকানের কর্মচারীরা গ্রামে পালিয়ে গেছে। সে তাদের ফিরিয়ে নেবার জন্যে গ্রামে যাচ্ছিল। কথায় কথায় জোহরের নামাজের সময় হয়ে যায়। শহিদুল্লাহ কৌশল করে নামাজ পড়বার জন্যে সেনাবাহিনীর কাছে একটি টুপি চায়। এতে সেনাবাহিনীর বিশ্বাস জন্মে যে শহিদুল্লাহ মুক্তিবাহিনীর লোক নয়। নামাজ পড়ার পরপরই অন্য সবাইকে রেখে সেনাবাহিনী শহিদুল্লাহকে ছেড়ে দেয়। তাকে একটি টুপি উপহার দেয়। শহিদুল্লাহ ঢাকায় ফিরে এসে বলে এখন আর ঢাকায় এভাবে থাকা নিরাপদ নয়। যে কোনো উপায়ে হোক আমাদের সীমান্ত পাড়ি দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু কোন পথে যাবো। ঠিক করলাম ১৪ আগস্ট ঢাকা ছেড়ে যাবো। ১৪ আগস্ট পাকিস্তান দিবস। সকলে নানা অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকবে। ওই দিন তেমন কেউ খেয়াল করবে না। ১৪ আগস্ট আমি আর শফি নোয়াখালীর রায়পুরের লঞ্চে উঠলাম। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে ঢাকা থেকে রায়পুর, রায়পুর থেকে লক্ষ্মীপুর, লক্ষ্মীপুর থেকে চৌমুহনী হয়ে আমাদের অন্যতম নেতা রুহুল আমিন কায়সারের বাড়ি যাব। তার বাড়ি বেগমগঞ্জ থানার হোসেনপুর। ওখানে আমাদের ছাত্র সংগঠন সমাজবাদী ছাত্র জোটের কিছু সদস্য আছে। তাদের নিয়ে আমি আগরতলা চলে যাব। শফি আমাকে হোসেনপুরে পৌঁছে দিয়ে ঢাকা চলে গেল। শফি হোটেল পূর্বাণীতে কাজ করে আমাদের দলের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু আমাদের হোসেনপুর পৌঁছা খুব সহজ হলো না। ঢাকা থেকে লঞ্চে অসম্ভব ভিড়। রায়পুরের নদীতে দেখলাম অসংখ্য লাশ ভাসছে। রায়পুর নেমে দেখলাম সকলই যেন পাকিস্তানি। প্রায় সকলের বুকে লাগানো পাকিস্তানি পতাকা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাহারা দিচ্ছে। মনে হলো সবাই মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র। তারা সকলের পরিচয় জিজ্ঞেস করছে। আমি সামনে হাঁটছি। আমার পেছনে শহিদুল্লাহ। তার হাতে একটি কালো ব্যাগ। পথে একটি মাদ্রাসার ছাত্র আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করল। আমার দাড়ি এবং লুঙ্গি আমাকে বাঁচিয়ে দিল। প্রায় চারদিক থেকে প্রশ্ন উঠল এই হুজুরকে নিয়ে হইচই কেন হচ্ছে।

আমরা রায়পুর থেকে লক্ষ্মীপুর এলাম। লক্ষ্মীপুর থেকে বাসে চৌমুহনী যেতে হবে। আমাদের বাসের যাত্রী প্রায় সকলেই রাজাকার। শফি বলল, দাদা, আপনি আদৌ কথা বলবেন না। আপনার কথায় পশ্চিমবঙ্গের টান আছে। আপনি কথা বললে বিপদে পড়ে যাবেন। আমি চুপচাপ থাকলাম। চৌমুহনী পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল।

এবার আমরা কোথায় যাব। আমরা হোসেনপুর চিনি না। সন্ধ্যা থেকে নাকি চৌমুহনীতে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

একজন যাত্রী বলল, আপনারা মসজিদে গিয়ে রাতটা কাটান। ভোরবেলা চলে যাবেন। আমি বললাম, প্রস্তাবটি ভালো। কিন্তু ভোরে ফজরের নামাজের সময় যখন আমি নামাজ পড়ব না তখন সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে। তাই চলো আমরা ভিন্ন পথ ধরি।

কিছু দূর যেতেই আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তার চোখেমুখে সন্দেহ। বললো, নিশ্চয়ই আপনারা ভিনদেশী। বলল, আপনাদের কোনো অসুবিধা নেই। সোজা এগিয়ে গেলে মাঝে একটু পানি বাধবে। ওই পানি পার

www.nagorikpathagar.com

হলেই একটা বাড়ি আছে। ওই বাড়িতে আপনারা আশ্রয় পাবেন। আমরা সরল বিশ্বাসে ওই ভদ্রলোকের কথা শুনে সামনে এগোলাম। কিছুদূর যেতেই পেছন থেকে এক ভদ্রলোক চিৎকার করতে করতে এলেন। তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছেন? ওটা তো রাজাকারের বাড়ি। ওখানে আপনাদের নিয়ে শেষ করে ফেলবে। আমি নাটেশ্বর যাচ্ছি। পানি ঝাঁপিয়ে আমার সঙ্গে যেতে হবে। নাটেশ্বর গিয়ে নৌকা পেলে আপনাদের হোসেনপুর পাঠিয়ে দেব।

সেদিন সন্ধ্যায় কেন যে ওই ভদ্রলোককে বিশ্বাস করেছিলাম তা আজ আর মনে নেই। আমি আর শফি তার সঙ্গে পানি ঝাঁপিয়ে নাটেশ্বর পৌঁছলাম। নাটেশ্বরে নৌকা পেলাম। হোসেনপুরে পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল।

কিন্তু এবার কী করে সীমান্ত পাড়ি দেব। এবার নতুন সঙ্গী নিতে হবে। হোসেনপুর থেকে যেতে হবে গুণবতীর কাছে সাতবাড়িয়া আটগাঁও। ওখানে থাকতে হবে। খোঁজ নিতে হবে গুণবতী রেলস্টেশনের কাছাকাছি পাকিস্তান বাহিনী আছে কিনা।

দীর্ঘদিন পরের কথা। আজ অনেক কিছু মনে নেই। এক তরুণের কথা মনে আছে। নাম রুহুল আমিন। ডাক নাম পচা। পচা নোয়াখালীর ভাষায় বড্ড তাড়াতাড়ি কথা বলে। বারবার বলে, দিন রাত তার পার্টি আসছে। সকল পার্টিকে পার করতে হবে। সকল পার্টিই ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসছে। যতোদূর মনে আছে সীমান্তে যাবার কালে উঠেছিলাম বনি আমিনদের বাড়ি। পরে আর কোনোদিন তার খোঁজ নিইনি। শুনেছি পচা যুদ্ধে মারা গেছে।

তবে আমার যাওয়া তেমন সহজ ছিল না। আমার সঙ্গে যাবে রুহুল আমিন কায়সারের বড় ভাইয়ের ছেলে স্বপন। বর্তমানে শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোসাদ্দেক হোসেন স্বপন। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কিন্তু সমগ্র বাড়ি অপ্রসন্ন। কেউ চাচ্ছে না স্বপন আমার সঙ্গে যাক। আর কেউই জানত না যে আমি ওই বাড়িতে গিয়ে আগস্ট মাসে হাজির হতে পারি। কিন্তু সে আমার সঙ্গেই যাবে। আমরা প্রথমবার সীমান্তে গিয়ে ফিরে এলাম। সীমান্তে পাকবাহিনী মোতায়েন। স্বপনদের বাড়ির লোক খুশি। তাদের ধারণা আমাদের বুঝি যাওয়া হচ্ছে না। আমাদের যেতেই হবে। তবে দ্বিতীয় দিন গিয়েও আটকে গেলাম। সাতবাড়িয়ায় একটি ঘরে অপেক্ষা করলাম। কারণ পথ পরিষ্কার নয়। সিদ্ধান্ত হলো দূর গ্রামের নিরাপদ এলাকায় ঘুরতে যাব। গ্রামের নাম ডুমুরিয়া। নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় ডৌবা। বিকেলের দিকে সে গ্রামে দেখি অবাক কাণ্ড। একদল তরুণকে বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হচ্ছে। ওরা মুক্তিবাহিনীতে যাবে। মুক্তিযুদ্ধে

www.nagorikpathagar.com

যাওয়ার জন্যে দলের পর দল তরুণ আসছে। সকলে নির্বাচিত হচ্ছে না। যারা নির্বাচিত হচ্ছে তাদের মুখে হাসি। যারা সুযোগ পাচ্ছে না তারা কাঁদছে। জানি না কেন দেশের কোনো বিপ্লবে এ এমন ঘটনা ঘটছে কিনা। আমি সেই পড়ন্ত বেলায় তাকিয়ে তাকিয়ে সেই হাসি আর কান্না দেখলাম। ওরা কেউ আমাকে চিনত না—আজো কেউ চিনবে না। অথচ আমি সেই দৃশ্যের এক সাক্ষী আজো বেঁচে।

পরদিন বিকেলে খবর এল পথ পরিষ্কার। কিন্তু নিজেদের উদ্যোগেই যেতে হবে। গুণবতী স্টেশনের দক্ষিণে রেললাইন পার হতে হবে। ওই রেললাইনে সন্ধ্যাবেলায় সান্ধ্য আইন জারি। এবার আমরা রওনা হলাম চারজন। আমি, স্বপন এবং কুমিল্লার লালমাইয়ের কাছে মগবাড়ির দু'ভদ্রলোক।

আমরা কিছুদূর যেতেই পিছন থেকে এক বুড়ি ছুটতে ছুটতে এলেন। পরনে সাদা থান। বললেন, বাবা রেললাইনে পাক সেনাবাহিনী। ও পথে যাবে না। আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি চলো।

বুড়ি তাঁর বাড়িতে আমাদের বসিয়ে চলে গেলেন। দশ মিনিট পর ফিরে এলেন। দেখলাম দূর রেল লাইনে একদল ১০/১২ বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা পাহারা দিচ্ছে। দেখছে পাকবাহিনী আসছে কিনা। এই কিশোরদের পাহারার মধ্যে দিয়ে আমরা রেল লাইন পার হলাম। বুড়ি বললেন, বাবা জানি না তোমরা কার পুত্র। দিনমানে এ পথে আর লোক পাঠাবে না। বুড়ির সে কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজছে।

কিন্তু বিপদ শেষ হলো না। আমরা কোনো পথ চিনি না। কারো কাছে জিজ্ঞেস করাও বিপজ্জনক। শুনেছি চৌদ্দগ্রামের কাছে সীমান্ত পাড়ি দিতে হবে। ওপারে ভৈরব টিলায় রাতে আশ্রয় মিলতে পারে।

বিপদে পড়ে গেলাম, চৌদ্দগ্রামের কাছে গিয়ে। কাছে একটি স্কুল। ওই স্কুলের পাশে সড়ক। ওই সড়ক দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে উঠতে হবে। তারপর একটি ছোট খাল। ছোট খাল পার হয়ে কাদামাটির জমি। তারপর ভারতীয় সীমানা।

স্কুলের পাশে যেতেই একদল লোক বলে উঠল উত্তরে দেওয়ান বাড়ি যান। আশ্রয় পাবেন। আমরা দেওয়ানবাড়ির দিকে মোড় নিতেই আর একজন বলে উঠল সাবধান ওদিকে যাবেন না। ওটা রাজাকারদের বাড়ি। ইতোমধ্যে সামনে একটা রিকশা এসে দাঁড়াল। রিকশাওয়ালা বলল, তাড়াতাড়ি সড়কে উঠে খাল পার হয়ে ওপারে যান। দূরে আর্মি দেখা যাচ্ছে।

www.nagorikpathagar.com

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বৃষ্টি পড়ছে। ওই বৃষ্টির মধ্যে কাদামাটিতে ছুটতে ছুটতে এক সময় ভৈরব টিলায় পৌঁছলাম। ভয় কমল। কিন্তু স্বস্তি পেলাম না। আবার বাংলাদেশ ছেড়ে ভারত। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বাংলাদেশে তো নেইই।

ভৈরব টিলায় নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। আমরা চারজন—আমি, স্বপন ও কুমিল্লার দু'জন সঙ্গী। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ভৈরব টিলায় নতুন কিছু চালাঘর দেখলাম। ওই চালাঘর তৈরি করেছে বাংলাদেশের শরণার্থীরা। তারা আমাদের রাতে খেতে এবং থাকতে দিতে রাজি হলো। তবে পয়সা দিতে হবে। বাংলাদেশে এ অভিজ্ঞতা ছিল না। পয়সা দিয়ে রাতে খেলাম এবং ভৈরব টিলায় থাকলাম। টিলার অধিবাসীরা জানাল ভোরের দিকে আমাদের টিলা থেকে নেমে একিনপুর যেতে হবে। একিনপুর গেলে আগরতলা যাবার পথ যাওয়া যাবে।

ভোরে একিনপুর গিয়ে আটকে গেলাম। ভারতের সীমান্ত বাহিনী আমাদের তাদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল। আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো। তাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কোন রাজনৈতিক দল করি। আমাদের জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি বা ন্যাপ করি কিনা। তাদের প্রশ্নে মনে হলো, এই তিনটি দলই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। আমি আমার রাজনীতি ও সাংবাদিকতার পরিচয় দিলাম। কিন্তু খুব একটা কাজ হলো না। শুনলাম তারা কর্নেল ভট্টাচার্য নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে কথা বলছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো আমি বাংলাদেশের কোনো নেতাকে চিনি কিনা। আমি বললাম, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে বামপন্থী নেতা কমরেড মনি সিং এবং তোয়হাসহ সকলকেই আমি চিনি। কিছুক্ষণ পর আমাদের ছেড়ে দেয়া হলো। কিন্তু আমাদের সঙ্গীদের ওখানেই আটকে রাখা হলো।

এবার একিনপুর থেকে চোত্তাখোলার পথে রওনা হলাম। চোত্তাখোলায় আওয়ামী লীগ নেতা খাজা আহম্মদ আছেন। ভাবলাম তাঁর কাছে থেকে একটি পরিচয় নিতে পারলে আর বিপদে পড়ব না। সেদিন আকাশে ছিল মেঘ রৌদ্রের খেলা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার রোদ উঠছে। পাহাড়ি পথ। কখনো নামছে আবার কখনো উঠছে। চোত্তাখোলায় পৌঁছে খাজা আহম্মদের দেখা পেলাম। তিনি আমাদের পরিচয়পত্র দিলেন। এবার আমরা রাজনগরের দিকে রওনা হলাম। রাজনগরে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প আছে। রাজনগর পৌঁছাবার আগে সাদা পোশাকের গোয়েন্দা আমাদের আটক করল। খাজা আহম্মদের পরিচিতি পত্র গ্রাহ্যই করল না।

www.nagorikpathagar.com

আমার ভয় হলো স্বপনকে নিয়ে। শুনেছি এখন ত্রিপুরায় পাকিস্তানি এজেন্ট গ্রেফতার করা হচ্ছে। আমি ভাবলাম শত হলেও আমার বাংলায় নাম। আমি কোনোমতে এড়িয়ে যেতে পারব। কিন্তু স্বপনের প্রকৃত নাম মোসাদ্দেক। এই আরবি নামটি জানতে পারলে স্বপনকে যে পাকিস্তানি এজেন্ট হিসেবে ধরা হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? আমার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। স্বপনকে নোয়াখালীর বাড়ি থেকে যখন নিয়ে আসি তখন সে বাড়ির কেউই আমার প্রস্তাবে রাজি ছিল না। এখন স্বপনের কিছু হলে আমি তাদের কী জবাব দেবো। তাই ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর লোকদের আমি শুধু হাত পা ধরতে বাকি রেখেছিলাম। আমার লক্ষ্য ছিল যেকোনো মূল্যে স্বপনকে বাঁচাতে হবে। কিছুক্ষণ পর আমাদের ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ক্যাম্পের এলাকায় নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদের মাঠের মাঝখানে দাঁড় করানো হলো। চারদিকে ঘিরে থাকল সামরিক বাহিনীর লোক। এ পরিবেশেও ভারতীয় বাহিনীর একজন জোয়ান অদ্ভুত একটা কথা বলল। তার কথা হচ্ছে ইধার তো হিন্দু-মুসলমান ফারাক নেহি হায়। তাহলে তোমাকে আটক করল কেন? আমার তখন পরনে লুঙ্গি, গায়ে হাওয়াই শার্ট এবং মুখভর্তি দাড়ি। ঘণ্টাখানেক পর একজন ক্যাপ্টেন ছুটতে ছুটতে এল। সে বলল, আমরা খুবই দুঃখিত। তুমি বাংলাদেশে খুবই পরিচিত একজন ব্যক্তি। তোমরা চলে যেতে পার।

এবার কিছুদূরে এগোতেই মুক্তিবাহিনীর কিছু ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। তারা আমাকে চিনত। তারা বললো আপনাকে আটক করা হয়েছে শুনে আমরা এসেছি। তারা ক্যাপ্টেনকে ডেকে বলল, কোনোদিন ঢাকা গেলে নির্মল সেনের সঙ্গে দেখা করতে আপনাদের অনুমতি লাগবে। আপনারা কাকে ধরেছেন? কিন্তু এরপরও বিপদ কাটল না। সন্ধ্যার দিকে শান্তিবাজারে পৌঁছলাম। পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদের পরিচয়পত্র কোনো কাজে এলো না। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর আমাদের ছেড়ে দেয়া হলো। আমি থানার দারোগাকে বললাম, একটি সার্টিফিকেট লিখে দিন। কারণ সারাদিন এই হেনস্তা আদৌ ভালো লাগছে না। দারোগা রাজি না।

থানা থেকে ছাড়া পেলাম। কিন্তু কোথায় যাব? এ অবস্থায় আগরতলা যাওয়া যাবে না। ভাবলাম উদয়পুর যাব। উদয়পুরে ধীরেন দত্ত আছেন। পঞ্চাশের দশকে আমাদের সঙ্গে ঢাকা জেলে ছিলেন। শুনেছি উদয়পুরে তিনি একটি স্কুল দিয়েছেন পিতার নামে। ধীরেন বাবু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই-এর লোক। তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং ভালো লোক হিসেবে পরিচিত। এই ভেবে উদয়পুরের বাসস্ট্যান্ডে গেলাম। দেখলাম একটি

www.nagorikpathagar.com

ট্যাক্সি উদয়পুর যাচ্ছে। ড্রাইভার আমাদের অসুবিধা বুঝল। বলল, ধীরেন বাবুকে আমরা চিনি। তাঁর বাসায় আপনাদের আমি পৌঁছে দিতে পারব। কিন্তু তাতেও বিপদ কাটল না। কিছুদূর যেতেই সামরিক বাহিনীর লোক ট্যাক্সি থামাল। বললো ট্যাক্সিতে বাংলাদেশের কেউ থাকলে তাদের নামতে হবে। আমি বললাম, আমি বাংলাদেশের লোক কিন্তু নামব না। যা খুশি করতে পারেন। এবার ড্রাইভার নিজেই নেমে গেল। গিয়ে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কথা বলল। আমাদের আর গাড়ি থেকে নামতে হলো না। গভীর রাতে উদয়পুর গিয়ে পৌঁছালাম। আমাদের দেখে ধীরেন বাবু অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা ১৯৫২ সালে ঢাকা জেলে। তারপর দেখা হলো ১৯ বছর পর ১৯৭১ সালে। রাতে ওই বাসায়ই থাকলাম। উদয়পুরে আরএসপির সংগঠন আছে। সকালবেলা ধীরেন বাবু আরএসপির বন্ধুদের খবর দিলেন। এবার বাসা পরিবর্তন করতে হলো। আমরা আরএসপির তৎকালীন শিক্ষক নেতা মোহিত ধরের বাসায় উঠলাম। তখন চারদিকে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। এদিকে পথের ক্লান্তিতে স্বপন অসুস্থ হয়ে গেছে। তার জ্বর হয়ে গেল। হাতের তালু ফুলে গেল। শেষ পর্যন্ত তার হাত অপারেশন করতে হলো; তাই বেশ কিছুদিন থাকতে হলো উদয়পুরে। আর বন্ধুদের কথা হচ্ছে আপনাদের আর একা একা পথে ছেড়ে দেয়া যাবে না। কাউকে সঙ্গে করে আগরতলা যেতে হবে। নইলে আবার বিপদে পড়তে পারেন। তাই আগরতলা পৌঁছতে পৌঁছতে আগস্ট মাস কেটে গেল। আর আগরতলা পৌঁছে দেখলাম পুরো পরিস্থিতি পালটে গেছে। সর্বত্রই যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি।

আগরতলা পৌঁছে বাড়ির খবর পেলাম। শুনলাম রাজাকাররা বৃদ্ধ কাকা ও তার ছেলেকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হচ্ছে যে ছেলেটি কাকাকে ধরেছিল তার জন্ম হয়েছিল কাকারই হাতে। আমার কাকা এবং কাকার ছেলে দু'জনেই ডাক্তার। তবে দেশি রাজাকাররা খারাপ ব্যবহার করলেও ভালো ব্যবহার করেছিল বালুচ বাহিনীর লোকেরা। ডাক্তার বলে তাড়াতাড়ি তারা দু'জনকেই ছেড়ে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে কোলকাতা থেকে চিঠি লিখেছে কাকার ছোট ছেলে। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে পৌঁছে জানতে চেয়েছে যুদ্ধের খবর। আমি তাকে জবাব দিয়েছিলাম এ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আর কেউ না গেলেও ফেব্রুয়ারির শহীদ দিবসে আমি ঢাকায় থাকবই। ভয় নেই।

www.nagorikpathagar.com

আমার জবানবন্দি আমার জীবনী নয়। তবুও কখনো কখনো জবানবন্দিতে আমার জীবনের ছাপ পড়ছে। তবে তাও সাজানো গোছানো নয়। অনেক ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা থাকছে না। আমার কথা হচ্ছে—জবানবন্দি যেহেতু জীবনী নয়, তাই সর্বক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা থাকবে না।

আমার জবানবন্দির প্রথম পর্ব ছিল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সে পর্বে অনেক কথা বলা হয়ে গেছে। তবে দ্বিতীয় পর্বে সে পর্বেরও কিছু উল্লেখ থাকবে। হয়তো পুনরাবৃত্তি হবে। এ ব্যাপারে আমি নিরূপায়।

প্রথম পর্বের শেষ দিকে আমি কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছিলাম। সেই ঘটনায় মধ্যে আছে ভারত থেকে আমাদের বাংলাদেশে ফেরার কথা। এখানে আমাদের অর্থ হচ্ছে আওয়ামী লীগ গোষ্ঠীর বাইরে রাজনীতিকদের কথা। ১৯৭১ সালের সংগ্রামে অনেক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল। তবে ভারতে তিনটি দলই সরকারিভাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই তিনটি দল হচ্ছে—আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ এবং কমিউনিস্ট পার্টি। মওলানা ভাসানী স্বাধীন বাংলা সরকারের উপদেষ্টা মনোনীত হন। কিন্তু আমাদের প্রতি ভারত সরকার বা স্বাধীন বাংলা সরকারের তেমন সুনজর ছিল না। আমাদের দলের ছেলেরাই বাংলাদেশ সীমান্তে নদীয়া জেলার গেদেতে প্রথম ভারতের মাটিতে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। এই শিবির পরিদর্শনে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন এসেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের শিবির স্বাধীন বাংলার সরকারের সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ আমাদের অপরাধ ছিল আমরা শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের সদস্য। আর ঐ শিবিরটি পরিচালনা করেছেন ভারতে আমাদের বন্ধুপ্রতিম দল বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল অর্থাৎ আরএসপি। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্ট করে ঐ শিবিরটি আমাদের চালু রাখতে হয়েছিল।

একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতে মুজিববাহিনী গঠিত হয়। শোনা গিয়েছিল মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলা সরকারের কোনো অনুমতি না নিয়ে। মুজিববাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন ছাত্রলীগের নেতারা। আরো শোনা গিয়েছিল বাংলাদেশ স্বাধীন করা ছাড়াও মুজিব বাহিনীর আরো কিছু দায়িত্ব ছিল। সে দায়িত্ব হলো বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর রাজাকার, আলবদর, আল শামস, এবং শান্তি কমিটির সদস্যদের খতম করা। আর একই সঙ্গে বামপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করা। এ খবর একটি আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল

www.nagorikpathagar.com

বামপন্থী মহলে। আমি আগরতলা থাকাকালে এক নেতৃস্থানীয় আমলা আমাকে বলেছিলেন, আপনি ভারতের পূর্বাঞ্চলে থাকবেন না। এটা উপদ্রুত এলাকা। আপনার রাজনীতি ভারত সরকারের পছন্দ নয়। গ্রেফতার এড়াতে হলে কোলকাতায় চলে যান।

একথা যে কতটা সত্য তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম আগস্টে দ্বিতীয়বার ভারতে ঢুকবার কালে। আমি এপ্রিলের শেষ দিকে প্রথমে বাংলাদেশ থেকে ভারত যাই। অর্থ ও মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহের জন্যে জুলাইয়ের প্রথম দিকে বাংলাদেশে আসি। আগস্টের শেষের দিকে আবার ভারতে যাই। তখন ভারতে যাবার সব পথ বন্ধ। ঢাকা থেকে লঞ্চে রায়পুর। রায়পুর থেকে লক্ষ্মীপুর। তারপর বেগমগঞ্জ। বেগমগঞ্জ থেকে গুণবতী হয়ে চৌদ্দগ্রাম দিয়ে ভারতে প্রবেশ করি। কিন্তু বিপাকে পড়ে যাই ত্রিপুরা সীমান্তে গিয়ে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ আমাকে আটক করে এবং থানায় নিয়ে জেরা করতে শুরু করে। থানায় প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে—'আপনি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, বা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কিনা।' আমার পূর্বের লেখায় এ প্রসঙ্গে আমি অবতারণা করেছি। অনেক জবাবদিহির পর যে আমাকে উদয়পুরে পৌঁছাতে হয়েছে, তাও লিখেছি।

আমার নিজের জীবনের এ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে মুজিব বাহিনী গঠনের খবর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল বামপন্থী মহলে। তাই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রশ্ন উঠেছিল দেশে ফিরব কোন পথে। সড়ক পথে। সড়ক পথে আদৌ ফেরা নিরাপদ কিনা। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছিল আমি একা সড়ক পথে বাংলাদেশে ফিরব। আমার কোলকাতার বন্ধুরা আমাকে প্রায় যশোর পৌঁছে দিয়ে গেল। আর যশোর পৌঁছেই একটি পোস্টার আমার চোখে পড়ল। পোস্টারটি মোজাফফর ন্যাপের। পোস্টারে লেখা তিনটি স্লোগান—গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র। স্লোগান তিনটি দেখে আমি চমকে গেলাম। অথচ স্বাভাবিক নিয়মে এই তিনটি স্লোগানে আমার আপত্তি থাকার কথা নয়। যদিও ৭১-এর সংগ্রামে এই তিনটি স্লোগান লক্ষ্য ছিল বলে সুনির্দিষ্টভাবে কখনো বলা হয়নি। সে সংগ্রামের লক্ষ্য গণতন্ত্র ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্রের অঙ্গ তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার ধারণা, গণতান্ত্রিক সমাজ কায়েম হলে ঘোষণা দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলতে হয় না। তবে এই ধর্ম নিয়ে এই উপমহাদেশে সমস্যা থাকায় ধর্মনিরপেক্ষতা একটি বিতর্কিত শব্দ। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত উপমহাদেশে অনেক রক্তপাত হয়েছে। তাই এ শব্দটি একান্তভাবে স্পর্শকাতার। ধর্মনিরপেক্ষতার

www.nagorikpathagar.com

কথা বলেও ভারতে ধর্মভিত্তিক দাঙ্গা কমানো যায়নি। পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা বলে গালাগালি দেয়া হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি। তাই আমার মনে হয়েছিল এ শ্লোগানটি বাংলাদেশে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে না তো?

আমাদের ৯ মাসের সংগ্রাম সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছায়নি। এ সংগ্রাম নিয়ে বিতর্ক ছিল না তাও বলা যাবে না। এটাও সত্য, একটি গোষ্ঠী এ শ্লোগান নিয়ে আমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে। ধর্মের নামে লুটতরাজ, রাহাজানি করেছে। এর মধ্যে সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং আমলাদের একটা বড় অংশ জড়িত ছিল। এক শ্রেণির রাজনীতিক আদর্শের নামে এ সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিল। ন'মাসের সংগ্রামে তারা নিশ্চিহ্ন হয়নি। মুছে যায়নি তাদের ধ্যান ধারণা। তাই আমার ধারণা পরবর্তীতে এ শ্লোগানটি নতুন বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। আমার মতে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশ সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়।

ন্যাপের পোস্টারে সমাজতন্ত্র শব্দটিও আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। আমরা জাতিগতভাবে ১৯৭১ সালের সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তেমন রাজনৈতিক প্রস্তুতিও ছিল না। সংগ্রামের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কথাও কোনোদিন জোরে সোরে উচ্চারণ করেনি। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে এ সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে, এ কথাও উচ্চারিত হয়নি ৭১-এর সংগ্রাম চলাকালে। আর আমার বিশ্বাস পোস্টারে লিখে দিলেই কোনো শ্লোগান অর্থবহ নয়। তাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কোন আদর্শে বিশ্বাস না করে সে আদর্শ বাস্তবায়নের কথা বললে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। অথবা আদর্শ পরিণত হয় নিছক ভাওতাবাজিতে। আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে এটা স্পষ্ট ছিল, আওয়ামী লীগ কোনো শ্রেণি-সংগ্রামে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল নয় এবং তাদের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কায়েম করার কথাও স্বাভাবিক নয়। তবে নিঃসন্দেহে দল হিসেবে ন্যাপের এ শ্লোগান দেবার অধিকার আছে। তবুও আমার কাছে বাস্তবসম্মত মনে হয়নি। আমার ভয় ছিল ঘর পোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাবার কথা।

সন্ধ্যার দিকে খুলনা পৌঁছলাম। বাসেই ক'জন শ্রমিক আমার হাতে কিছু কাগজ গুঁজে কাগজগুলো খুলনার ড. কাহার সাহেবের কাছে পৌঁছে দিতে বলে। সে কাগজেও সমাজ বদলের আহ্বান। কোনোমতে কাগজগুলো আগে পড়ে মার ঘাটের দিকে ছুটলাম। লক্ষ্য করেছিলাম কাহার সাহেব লোকটি ভীতু এবং সন্ত্রস্ত। মনে হচ্ছিল সে যেন কোনো একটি নিষিদ্ধ কাজ করছে। আমার

www.nagorikpathagar.com

খটকা লেগেছিল। তা হলে কি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার শুরুতেই আবার আত্মগোপন করতে হবে নাকি।

স্টিমারে অসম্ভব ভিড়। ভারত থেকে মানুষ ফিরছে দেশে। অসংখ্য বরিশালের যাত্রী। পরে জানলাম ভাড়া দিতে হবে না। পৌঁছাতে ৩৬ ঘণ্টা লেগে গেল। কিন্তু কোথায়। যুদ্ধের পূর্বে সেগুনবাগিচা মরহুম কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের বাড়িতে ছিলাম। যুদ্ধের সময় একবার সেখানে এসে ফিরে গেছি। পরে শুনেছি আমার বইপত্রের কক্ষটি অন্য কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানে স্থান নেই আমার। বন্ধুরা কে আছে জানি না। স্টিমারে দৈনিক বাংলার সুপারেনটেনডেন্ট রংপুরের নজরুল সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। শুনেছি চাকরিতেও অসুবিধা। পাকিস্তান আমলের দৈনিক পাকিস্তান নাম পাল্টে দৈনিক বাংলা হলো। যুদ্ধের ন'মাস যারা চাকরিতে ছিল না এ সময় শূন্য পদে পদোন্নতি অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে আমি সিনিয়র সাব-এডিটর ছিলাম সে পদটি ঐ ন'মাসে পদোন্নতি করা হয়েছে। এমনটি ঘটেছিল বার্তা সম্পাদক তোয়াব খানকে নিয়ে। তিনি ন'মাসে স্বাধীন বাংলা বেতারে ছিলেন। ঢাকায় ফিরে দেখলেন তার পদ শূন্য নেই। ফলে অনেক ঝামেলার পর তিনি হলেন নির্বাহী সম্পাদক।

এমন ঘটনা ভিন্নভাবে হলেও পাকিস্তান আমলে আমার ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তখন তোয়াব খান দৈনিক পাকিস্তানের বার্তা সম্পাদক। জনাব ফজলুল করিম প্রধান সহসম্পাদক। তার পরে আমি এবং গোলামুর রহমান চৌধুরী শিফট ইনচার্জ। এক সময় বেতন বোর্ডের মিটিংয়ে জনাব তোয়াব খান পশ্চিম পাকিস্তান গেলেন। ফজলুল করিম গেলেন লন্ডনে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্যে। প্রশ্ন দেখা দিল পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক কে হবেন। সাধারণ নিয়মে আমারই ভারপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক হওয়ার কথা। কিন্তু তেমনটি ঘটল না। একদিন অন্যতম সহ-সম্পাদক সৈয়দ আব্দুল কাহার আমাকে বললেন, নির্মল দা, আপনাকে কিন্তু দায়িত্ব দেয়া হলো না। দায়িত্ব দেয়া হলো—গোলামুর রহমান চৌধুরীকে। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আহসান আহমেদ আসক গোলামুর রহমান চৌধুরীকে বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব দিলেন। হয়তো হিন্দু বলেই আপনাকে টপকে যাওয়া হলো।

এ ঘটনাকে আমি খুব গুরুত্ব দিলাম না। ভিন্ন কিছু ঘটবে তাও আমি মনে করিনি। শুধু ভেবেছি আমার সহকর্মী গোলামুর রহমান চৌধুরী যদি আমাকে বাদ দিয়ে দায়িত্ব নিতে পারে তাহলে আসক সাহেবের কী দোষ। আমি কাউকে বুঝতে দিলাম না, আমি দায়িত্বে নেই। এমন ভাব করলাম যেন আমিই

www.nagorikpathagar.com

ভারপ্রাপ্ত বার্তা সম্পাদক। এমনকি গোলামুর রহমানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভিয়েতনাম নিয়ে একটি টেলিগ্রাম বের করলাম। খবরটি ছিল হ্যানয়ে বিমান হামলা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট জনসনের নির্দেশ। যদিও সব কাজই গোলামুর রহমান সাহেবই করেছিলেন। তবে অনেকের ইচ্ছা ছিল না এ ধরনের টেলিগ্রাম বের করার।

এ ছিল পাকিস্তান আমলের কথা। বাংলাদেশে এমন অবস্থা হবে তা বুঝতে পারিনি। প্রথম দিন দৈনিক বাংলায় গিয়ে হাজিরা দিয়ে চলে এলাম। কেউ তেমন উচ্চবাচ্য করলেন না। দৈনিক বাংলার সম্পাদক পরিবর্তন হয়েছে। আবুল কালাম শামসুদ্দিন বিদায় নিয়েছেন। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান। আমি সকলের সঙ্গে কথা বলে দেখলাম কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারছেন না। তবে কিছু কিছু বন্ধুকে আমি ফিরে আসায় খুব খুশি হতে দেখলাম। এদের মধ্যে আছেন হেদায়েত হোসেন মোরশেদ এবং মেসবাহউজ্জামান। তারা বলল, গণবাংলার নামে একটি নতুন পত্রিকা বের হচ্ছে। আপনাকে বার্তা সম্পদাক হতে হবে। আমি বললাম, না। আমার পেশা রাজনীতি, সাংবাদিকতা নয়। সুতরাং যতদিন চাকরি করি দৈনিক বাংলায় থাকব। বিকেলে আস্তানায় ফিরলাম। আস্তানা হচ্ছে রায়েরবাজার। রায়েরবাজার উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন কায়সার হচ্ছে আমাদের দলের নেতা। ভারত থেকে ফিরে তাঁর বাসায় উঠেছিলাম। সেই বাসায়ই একদিন ভোরবেলা একটি অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হলাম। এ বাসায় প্রতিদিন এক লোক দুধ দিয়ে যায়। সে হঠাৎ আমাকে বলল, স্যার একটি রেডিও কিনবেন? রেডিওটির দাম সাতশ' থেকে আটশ' টাকা। আমি সত্তর টাকা বলেছি। আপনি আশি টাকা হলে নিতে পারেন। রেডিওর মালিক একজন বিহারী। মোহাম্মদপুরে থাকে। তাদের এখন বড্ড ভয় ও অভাব। দুধওয়ালা ওদের দশ হাজার টাকার ফার্নিচার এক হাজার টাকায় কিনেছে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমি দুধওয়ালাকে বললাম, যারা আটশ' টাকার রেডিও আশি টাকায় বিক্রি করে তাদের রেডিও বিনা পয়সায় আনলে কী হয়। তুমি আমার নাম করে ঐ বিহারীকে একটি ধমক দাও। তাহলে বিনা পয়সায় ঐ রেডিও দিয়ে দিবে। আমার কথায় দুধওয়ালা উৎসাহিত হলো। এবার আমি বাসার কাজে লোককে ডাকলাম। বললাম—ঐ ব্যাটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধো এবং মোহাম্মদপুর থানায় দিয়ে এসো। আমার কথা শুনে লোকটি ছুটে পালিয়ে গেল। ঐ বাসায় থাকতে সে লোক কোনোদিন আমার চোখে পড়েনি।

www.nagorikpathagar.com

প্রকৃতপক্ষে ঢাকায় ফিরে আমি হতচকিয়ে গিয়েছিলাম। ৭১ সালে আমি বারবার ঢাকায় এসেছি। সীমান্ত অতিক্রম করেছি। মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে গিয়েছি। শরণার্থীদের শিবিরে গিয়েছি। তখন সবকিছু আঁচ করতে পারিনি। শুধু বুঝেছি একটা যুদ্ধ হচ্ছে। এ যুদ্ধে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হবে। দেশ স্বাধীন করতে না পারলে দেশে ফেরা যাবে না। এ নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার ভারতের মাটিতে। শরণার্থীদের শিবিরে একটি অদ্ভুত মনোভাব দেখেছি। হিন্দুরা স্বাধীনতার পক্ষে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভাবছে, দেশ স্বাধীন হলে হয়তো তারা ভারতের মাটিতেই থেকে যাবে। মুসলমানদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। তাদের দেশ স্বাধীন করতেই হবে। সকলেরই চিন্তা দেশ কী করে স্বাধীন হবে? কবে হবে? কারা করবে? কোন বাংলাদেশ আমরা পাব। সেখানে গিয়ে দাঁড়ানো যাবে কি? এ প্রশ্নের মীমাংসা ভারতের মাটিতে হয়নি।

অসংখ্য তরুণ যুদ্ধে গিয়েছে। কেউ প্রাণ দিয়েছে। কেউ প্রাণ দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর। কিন্তু ভবিষ্যৎ তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কোন বাংলাদেশে ফিরবে তারা। সকলের সঙ্গে একটি মাত্র চিত্র আছে। চিত্র হচ্ছে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। আওয়ামী লীগেরই সরকার গঠন করার কথা। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। কিন্তু পাকিস্তান সরকার নির্বাচনের রায় মেনে নেননি। পরিবর্তে ইতিহাসের জঘন্যতম অত্যাচার চালাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে। সকলকে ঘর ছাড়তে হয়েছে। ঘরে থাকা যায় না বলে। কেউ অস্ত্র হাতে নিয়েছে নিজ দেশে থেকে। কেউ ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়েছে। জানতে পেরেছে ভারত সরকার সহযোগিতা করছে। কারও মনে প্রশ্ন জাগেনি ভারত কেন সাহায্য করবে। কেন আমরা ভারত যাব। ভারতের সহযোগিতায় স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে। কারও মাথায় এমন কোনো চিন্তাই আসেনি। সাধারণ স্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের এটাই ছিল মানসিক অবস্থা। তারা কখনো ভাবতে চেষ্টা করেনি যুদ্ধ পরবর্তীকালে তাদের কী ভূমিকা হবে। হয়তো একমাত্র মুজিব বাহিনী ছাড়া আর কোনো বাহিনীকে তেমনি করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের কিছু উদ্যোগ থাকলেও সাধারণভাবে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা ছিল দলবিচ্ছিন্ন। তাদের কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল না।

দেশ স্বাধীন হবার পর এ চিত্রটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল ঢাকায় ফিরে। কলকাতায় থাকতে শুনেছি ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হবার

www.nagorikpathagar.com

সপ্তাহখানেক পর স্বাধীন বাংলা সরকারের সদস্যরা ঢাকায় এসেছেন। কেউ নির্দিষ্টভাবে জানে না কোথায় কী হচ্ছে। কেন হচ্ছে। কিভাবে হচ্ছে।

ঢাকায় তখন অস্ত্রের ঝনঝনানি। বড় চুল, কাঁধে এসএলআর হচ্ছে একজন মুক্তিযোদ্ধার ছবি। অনেকের আবার এক মুখ দাড়ি। পাড়ায় পাড়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। বিভিন্ন ইউনিটের নামে সাইনবোর্ড। কোথাও দাদা গ্রুপ। কোথাও মামা গ্রুপ। এমনি গ্রুপের কোনো হিসাব নেই। মুক্তিযোদ্ধা অর্থ হচ্ছে সমাজের একটি শক্তিশালী ব্যক্তি। সমাজের যা কিছু সে করতে পারে। চাকরি দখল করতে পারে। আমার কাছে সব চিত্রটাই গোলমেলে মনে হতে লাগল। এর মধ্যে একদিন আমার একজন ছাত্রের স্ত্রী আমার কাছে এসে হাজির। মেয়েটি অবাঙালি। আমার ছাত্র বাঙালি। সে বলল, মাস্টার মশাই আমি মেনে নিচ্ছি অবাঙালিরা ভালো নয়। তারা অনেক খারাপ কাজ করেছে। খুন করেছে। ভেবেছিলাম মুক্তিযোদ্ধারা ভালো। এখন দেখছি তাদের চরিত্রও তেমন প্রশংসা করার মতো নয়। বন্দুকের জোরে ওরা আমাদের বাড়ি কেড়ে নিচ্ছে। প্রতিরাতে নিয়ে যাচ্ছে তরুণীদের। মেয়েটির কথা আমার অবিশ্বাস হলো না। বললাম, এতবড় ঘটনার মধ্যে অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতে পারে। তবে এটাই পুরো চিত্র নয়। কিন্তু নিজের মনকে বোঝাতে পারছিলাম না। আমি নয়াপল্টন এলাকায় থাকি। খোঁজ নিয়ে নিজেই জানলাম অনেক বাড়ি হস্তান্তরের কাহিনী।

মনটা বিক্ষিপ্ত। শুধু ভালো লাগছিল তাজউদ্দিন সাহেবের কিছু ঘোষণা। তিনি ঘোষণা করলেন, কারো বেতন দু'হাজার টাকার বেশি হবে না। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কোনো সাহায্য আমরা নেব না। আবার ভেবেছি তাজউদ্দিন সাহেব বুঝে কথা বলছেন কিনা।

আমার সামনে সমস্যা তিনটি— ১. দলের রাজনীতি, ২. দৈনিক বাংলায় চাকরি, ৩. সাংবাদিক ইউনিয়ন। দল সম্পর্কে পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। দল হচ্ছে শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল। আমরা দলের পক্ষ থেকে একটি প্রচারপত্র বিলি করেছিলাম ১৯৭১ সালের ২৪ ডিসেম্বর এবং তার ভিত্তিতে সংবাদ সম্মেলন করেছিলাম জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে। আমরা আমাদের প্রচারপত্রে ১১ দফা কর্মসূচি দিয়েছিলাম। যে কর্মসূচিতে বলা হয়েছিল—

১. মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি গণপ্রতিষ্ঠানের সমবায়ে বিপ্লবী সরকার গঠন করতে হবে।
২. সকল পর্যায়ে গণকমিটি গঠন করতে হবে।
৩. শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্যে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

৪. স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবার এবং যারা মানসিক কিংবা শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়েছেন তাঁদের সুস্থ জীবনধারণের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
৫. ভিটামাটি ছাড়া প্রতিটি মানুষের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. সমস্ত বৃহৎশিল্প এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত জাতীয় সম্পদ জাতীয়করণ করে জাতীয়করণলব্ধ উপস্বত্ত্ব ব্যাপক সামাজিক উন্নয়ন এবং পুনর্গঠনে নিয়োজিত করতে হবে।
৭. যুদ্ধবাজ ও মানবতাবিরোধী বন্দি খান সেনাদের ও তাদের সহযোগিদের গণআদালত গঠনের মাধ্যমে বিচার করতে হবে। বাংলাদেশে অবস্থানকারী পাকিস্তানি তথা পশ্চিম পাকিস্তানি নাগরিক এবং পাকিস্তানে অবস্থানকারী বাংলাদেশের নাগরিকদের নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে বিশ্বজনমত গঠন করতে হবে।
৮. সকল বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী ও পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজি ও সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করতে হবে।
৯. সকল কর্মক্ষম নাগরিকের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে এবং ভিক্ষাবৃত্তি বেআইনী ঘোষণা করতে হবে। কর্মে অক্ষম সকল নাগরিক এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল পরিবার পরিজনদের ভরণ পোষণের সম্পূর্ণ ভার রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে।
১০. সামাজিক ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শ্রমজীবী মানুষের কার্যকর প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা দিতে হবে।
১১. সামাজিক ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে জমির পরিমাণ বেঁধে দিতে হবে এবং উদ্বৃত্ত জমি গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করতে হবে।

আমরা আরো বলেছিলাম শুধুমাত্র বিপ্লবী সরকার গঠন নয়, বিপ্লবী সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে ইউনিয়ন হতে জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানকারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমবায়ে গণকমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটিই শরণার্থীদের পুনর্বাসন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সম্পর্কে বিপ্লবী সরকারের নিকট সুপারিশ করবে এবং বিপ্লবী সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সহযোগিতা করবে।

বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে দেশি ও বিদেশি মালিকানায় সমস্ত বৃহৎ শিল্প সংস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে। পূর্বের মতো শিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের উদ্যোগে শিল্পসংস্থা গড়ে তুলতে

www.nagorikpathagar.com

ব্যক্তি মালিকানায় স্থানান্তর করা চলবে না। একদিকে যেমন বেসরকারি উদ্যোগে বৃহৎ শিল্প গঠনের সুযোগ প্রদান ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠন একই সঙ্গে চলতে পারে না, অন্যদিকে তেমন রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে গণস্বার্থ বিরোধী কোনো বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারের সকল সম্ভাবনার অবলুপ্তি না ঘটলেও প্রকৃত শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে উঠতে পারে না।

আজকে অনেকের ধারণা, স্বাধীনতার পর বিপ্লবী সরকার গঠনের আহ্বান জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) জানিয়েছিল। সে তথ্য সঠিক নয়। ১৯৭১ সালের ২৪ ডিসেম্বর এ ঘোষণা আমরা দিয়েছিলাম। জাসদের জন্ম তখনো কারো কল্পনায়ও ছিল না। আমাদের এ ঘোষণা বিশেষ করে ছাপা হয়েছিল দৈনিক বাংলায়।

আমার দ্বিতীয় সমস্যা, চাকরি ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন দেখা গেল। তখন গণবাংলা নামে একটি নতুন দৈনিক প্রকাশিত হতে যাচ্ছিল। দৈনিক বাংলা থেকে অনেক সাংবাদিক সে সংবাদপত্রে যোগ দেয়। অন্যতম সহকারি সম্পাদক জনাব সানাউল্লাহ্ নূরী গণবাংলার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ফলে দৈনিক বাংলার সহকারি সম্পাদকের একটি পদ শূন্য হয়। ঐ শূন্য পদে আমি নিযুক্ত হই। দীর্ঘদিন পর শেষ হয় আমার সহ-সম্পাদকের পালা। এবার আমি সহকারি সম্পাদক। এর আগে অনেক কলাম লিখে থাকলেও এবার শুরু হলো নিয়মিত কলাম লেখা। কিন্তু সঙ্কট দেখা দিল সাংবাদিক ইউনিয়ন নিয়ে। যে সঙ্কট স্বাধীনতার পরবর্তী দশ বছর আমাকে বিব্রত করেছে।

আমরা অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল প্রচারপত্র বিলি করলাম। বললাম বিপ্লবী সরকার গঠনের কথা। কিন্তু জনমনে তেমন ছাপ ফেলতে পারলাম না। সকলের একটি আশা। ভাবছে একটা কিছু হবে। কিন্তু কী হবে কার কোনো ধারণা কারো মাথায় এলো না। সবচেয়ে মুশকিল হলো শত্রু মিত্র চিহ্নিত করা। পৃথিবীর কোনো দেশে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়নি সে সমস্যার সৃষ্টি হলো বাংলাদেশ। মুখ্য হয়ে দেখা দিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের বিপক্ষের শত্রু নিয়ে আলোচনা। এমনটি ৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় ঘটেনি। সকলেই ব্রিটিশের বিপক্ষে ছিল। অনেকেই পাকিস্তান চায়নি। আবার অনেকেই অখণ্ড ভারত পায়নি। কিন্তু স্বাধীনতার পক্ষ এবং বিপক্ষ তখন বিভাজন হয়নি। একথা সত্য ৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর ভারত পাকিস্তান উভয় দেশেরই সংখ্যালঘুরা নিগৃহীত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ দেশান্তরী হয়েছে। তাদের কষ্টের সীমা ছিল না। তবুও ৪৭ সালের ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনার তফাৎ ছিল।

www.nagorikpathagar.com

৭১ সালে দেশের লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। পাকিস্তানি বাহিনীর হামলার ফলে প্রায় কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। বাকি সকলেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে গিয়েছিল এবং এদের মধ্যে অধিকাংশই নিয়ত শঙ্কা এবং ভীতির মুখোমুখি হয়েছে। মৃত্যুর প্রহর গুনেছে। তাদের কোথাও বলার সাধ্য বা সুযোগ ছিল না। এদের অনেকের সন্তান হাজার হাজার তরুণ ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে। যুদ্ধ করেছে। আবার অনেক স্বজন পূর্ব পাকিস্তান থেকেছে। কেউ বিশ্বাসে, আবার অনেকে বাধ্য হয়ে পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগিতা করেছে। পাকিস্তান বাহিনী তাদের নির্যাতন চালাবার জন্য গ্রামে গ্রামে রাজাকার, শহরে শহরে আলবদর ও আল শামস সৃষ্টি করেছে। এ কাজে সহযোগিতা করেছে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ একাধিক রাজনৈতিক দল। গ্রামে শান্তি বাহিনী তৈরি করা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের রুখবার জন্যে। এই রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করেছে। লুটপাট করেছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছে। এদের অনেক আত্মীয় তখন মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শত্রু মিত্র শনাক্ত করা কঠিন ছিল। এটা ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম ছিল না। এটা ছিল পাকস্তিান থেকে স্বাধীন হবার সংগ্রাম। পাকিস্তান শব্দটির সঙ্গে সাধারণ মুসলমানদের একটা ধর্মীয় অনুভূতির টান ছিল। অনেকে মনে করতো পাকিস্তান ইমানের অঙ্গ। পাকিস্তান আল্লাহর সৃষ্টি। মসজিদের যেমন ইমাম পরিবর্তন করা গেলেও মসজিদ ভাঙা যায় না, তেমনি পাকিস্তানের শাসক পরিবর্তন করা যায় কিন্তু পাকিস্তান ভাঙা যায় না। এ মানসিকতাও গ্রাম-গ্রামান্তরে ছিল।

এ পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের সংগ্রাম এসেছিল। সে সংগ্রামের প্রথম কথা ছিল বাঙালি নির্বাচনে জিতেছে। বাঙালি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। সুতরাং বাঙালিকে পাকিস্তান শাসন করতে দিতে হবে। না দেয়া হলে আমরা স্বাধীন হয়ে যাব। আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকব না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বুঝতে পারেনি এই স্বাধীন হবার অর্থটা। তাদের ধারণা ছিল একটা আপোষ হবেই। এক শ্রেণির তরুণ ছাড়া অনেকেই মনে করেছিল আপোষ হয়ে যাবেই। অন্তত ২২ মার্চ পর্যন্ত আলোচনা থেকে মনে হচ্ছিল একটা মীমাংসা হয়ে যাবে। কারণ আমাদের নেতারা তখনো মীমাংসা টেবিলে বসছেন। আলোচনা করছেন একটি সমঝোতার জন্যে। এই পরিবেশে আর যাই হোক অন্তত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না।

www.nagorikpathagar.com

অথচ এমনটিই ঘটেছিল ১৯৭১ সালে। ২২ মার্চ যাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম, মীমাংসা হচ্ছে বলে সরকারকে জানালাম তারা ২৫ মার্চ রাতে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনো দিক থেকেই আমরা তখন প্রস্তুত ছিলাম না। রাজধানী ঢাকাসহ কিছু শহরে কিছু সোরগোল আর গ্রাম-গ্রামান্তরে ছাত্রদের কিছু প্রচারধর্মী কর্মকাণ্ড ব্যতীত এ যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। এ যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো রাজনৈতিক মানসিক প্রস্তুতি ছিল না।

কিন্তু একটি যুদ্ধ এসে গেল। অথছ কেউ জানে না এ যুদ্ধ কে চালাবে। যার নেতৃত্ব দেবার কথা প্রথমে তার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। পরে জানা গেল তিনি গ্রেফতার হয়েছেন। পরবর্তী স্তরের সকল নেতাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল নিজেদের বাঁচাবার এবং আশ্রয় খুঁজে বের করবার। সাধারণ মানুষের জানা ছিল না ভারতে যেতে হবে। তাদের জানারও কথা নয় যে ভারত আশ্রয় দেবে। নির্যাতিত হিন্দুরা বাঁচার গরজে সীমান্তের দিকে ছুটেছিল। তাদের একটি ভরসা ছিল। কিন্তু মুসলমানেরা কেন ভারতে যাবে। কী করে যাবে। তারা ভারতে গেলে যে আশ্রয় পাবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়। কিন্তু এক পর্যায় দেখা গেল ভারত সকলের জন্যে দরজা খুলে দিয়েছে। আমি এপ্রিল মাসে আগরতলা গিয়ে এক কংগ্রেস নেতাকে এ প্রশ্ন করেছিলাম। বলেছিলাম পাকিস্তান আপনাদের এক নম্বর শত্রু। সে দেশের মানুষকে আপনারা আশ্রয় দেবেন কেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন দিল্লি গিয়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে জিজ্ঞেস করুন। ভারতে বেশ কিছুদিন ছিলাম। সে প্রশ্ন কাউকে আর জিজ্ঞেস করিনি। অনেক তরুণকে দেখেছি ভারতের মাটিতে। তাদের যুদ্ধ করতে দেখেছি। তারাও যুদ্ধ শেষে দেশের মাটিতে আমার মতো ফিরে এসেছে। তারাও দেশে ফিরে বিভ্রান্ত হয়েছে। ভেবেছে দেশের শত্রু-মিত্র চিহ্নিত হবে কোনো মাপকাঠিতে। চিহ্নিত কিছু পরিবার ছাড়া অনেক পরিবারেই পাকিস্তানের বিপক্ষে ছিল বাবা আর পক্ষে ছিল মা। অনেক পরিবারে অনেকে পাকিস্তানের বিপক্ষে ছিল। আবার অনেকে যুদ্ধ করে প্রাণও দিয়েছে। একজন সাধারণ তরুণ প্রশিক্ষণ ছাড়া যুদ্ধে গিয়েছিল। সে জানত দেশ স্বাধীন না হলে দেশে ফেরা যাবে না। যুদ্ধের জীবন স্বাধীন বাংলাদেশের পরবর্তী জীবনটি তার চোখের সামনে ছিল না। তাই সে দেশে ফিরে আমার মতো হতচকিয়ে গেল।

এর মধ্যে দেখা গেল চিরাচরিত নিয়মে জাঁদরেল পাকিস্তানপন্থিরা বেঁচে যাচ্ছে। নেতাদের সার্টিফিকেট কিনছে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। আত্মীয়-স্বজন মুক্তিযোদ্ধা বলে পার পেয়ে যাচ্ছে। ধরা পড়ছে ছা-পোষা রাজাকার। যে পুলিশ তাকে রাজাকার হিসেবে রিক্রুট করেছিল তারাই তাদের রাজাকার বলে

www.nagorikpathagar.com

গ্রেফতার করছে। পুলিশ দারোগা থাকছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সচিবালয়ে যাদের মন্ত্রণালয়ে পাকিস্তান সরকার চলেছে তাদের যাচাই করা হলো না। কারণ তারা উপরের তলার লোক। অভিজাত, শিক্ষিত। তাদের বেলা সবাই হলো পরিস্থিতির শিকার। আর ৫ টাকার রাজাকার গ্রেফতার হলো নির্বিচারে। এর মধ্যেই শুরু হলো দখল। জাঁদরেল নেতা এবং তাদের আত্মীয়রা কল-কারখানা থেকে শুরু করে পাকিস্তানিদের বাড়ি ঘর সকল দখল করল। তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বায়তুল মোকাররম থেকে শুরু করে সকল এলাকায় দোকানপাটের মালিক হলো বাঙালি কর্মচারিরা। কারণ অবাঙালি মালিক পলাতক।

এর প্রতিফলন অনিবার্যভাবে পড়ল অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনে। তারা প্রথমে চেয়ে চেয়ে দেখল নেতাদের কাণ্ডকারখানা। নেতাদের মতো তাদেরও হাতিয়ার আছে। তারা সেই হাতিয়ার ব্যবহার শুরু করল। দখল করতে শুরু করলো নারী, গাড়ি আর বাড়ি। এ অভিযোগই করেছিল আমার বাঙালি ছাত্রের অবাঙালি স্ত্রী। এদের সঙ্গে যোগ দিল এক শ্রেণির নতুন মুক্তিযোদ্ধা। এরা অধিকাংশই পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী। তারা ১৬ ডিসেম্বর অস্ত্র হাতে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেল। এদের বলা হতো ষোড়শবাহিনী (Sixteenth Division)। পাড়ায় পাড়ায় এরা হলো বড় মুক্তিযোদ্ধা।

এ পরিস্থিতির একটি চিত্র আছে সেকালের সংবাদপত্রে। তখন প্রতিদিন দৈনিক বাংলায় নিখোঁজ মুক্তিযোদ্ধার ছবি ছাপা হতো। কিছুকাল পরে প্রতিবাদ আসতে শুরু করল। প্রকৃতপক্ষে ওই ছবিগুলো ছিল রাজাকার আলবদরের। ওদের মুক্তিযোদ্ধা বানাবার জন্যে এই ছবি ছাপানো হতো। ওরা ওই ছবি ছাপাবার পর নিরুদ্দেশ জগৎ থেকে ফিরে আসত। আবার যারা ফিরত না তাদের মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে তাদের আত্মীয়-স্বজন ফায়দা লুটবার চেষ্টা করত।

এ সময় একদিন রাতে অজস্র গুলির শব্দ শুনলাম। সারা ঢাকা শহর চমকাচ্ছিল। রাতের আকাশ রঙ পাল্টাচ্ছিল প্রতি মুহূর্তে। খবর এসেছে শেখ সাহেব নাকি মুক্তি পেয়েছেন। সারা শহরে উল্লাস। আমি কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। আমি বুঝতে পারছিলাম না দেশে কী হচ্ছে। সারাদেশে অস্ত্র। সকলের হাতে অস্ত্র। অস্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়েছে। এ অস্ত্রের ব্যবহার কারো কাছে বাঞ্ছিত নয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কেউ সে কথা শুনছে না। ছাত্রনেতা আ স ম আব্দুর রব বলেছেন, তাঁরা অস্ত্র জমা দেবেন না। তাদের নাকি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত

www.nagorikpathagar.com

করার জন্যে আবার অস্ত্র ধরতে হতে পারে। তাঁরা নাকি পাকিস্তান অভিমুখী অভিযান করতে পারেন। এ ধরনের কথাবার্তা আমার কাছে ছিল অর্থহীন বাগাড়ম্বর। কিন্তু কোথায় জানি একটা ভিন্ন অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম এরা কী চায়! ভারতের মাটিতে এদের ভূমিকা দেখেছি। ছাত্রলীগ নেতারা প্রকাশ্যেই তাজউদ্দিন আহমদের বিরোধিতা করেছে ভারতে। ভারতে স্বাধীন বাংলা সরকারের সঙ্গে একটি সমান্তরাল নেতৃত্ব ছিল ছাত্রদের। এই ছাত্রদের নেতৃত্বেই মুজিববাহিনী গঠিত হয়েছিল। এই মুজিববাহিনীর দায়িত্ব ছিল রাজাকার ও বামপন্থীদের চিহ্নিত করা। এ মুজিববাহিনী গঠিত হয়েছিল ভারতের মেজর জেনারেল ওবানের নেতৃত্বে। এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের অজ্ঞাতে এবং শেষ পর্যন্ত তাজউদ্দিন আহমদ মুজিব বাহিনীর বিরোধিতা করেছিলেন। এখানটাতেই আমার খটকা লেগেছিল।

আমার প্রশ্ন ছিল, তাহলে ভারত সরকার কী চায়? তাজউদ্দিন সরকারের পেছনে ভারত সরকার আছে। আবার তাজউদ্দিনের অনুমতি না নিয়ে মুজিব বাহিনী গঠন করেছে ভারতের সেনাবাহিনী। তাহলে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সামরিক নেতৃত্বের কি কোনো পার্থক্য ছিল কৌশল নিয়ে?

কলকাতায় শুনেছি একটি নির্দিষ্ট লক্ষে মুজিববাহিনী গঠিত হয়েছে। ভারতের শাসক শ্রেণির কোনো কোনো মহলের ধারণা ছিল শেখ সাহেব শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ফিরবেন না। শেখ সাহেব স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে না এলে এক অভাবনীয় শূন্যতার সৃষ্টি হবে। সেই শূন্যতায় হাল ধরার জন্যেই মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছে। এই মহলের ধারণা এই শূন্যতায় মুজিববাহিনী হাল না ধরলে বামপন্থীদের হাতে ক্ষমতা চলে যাবে। এই বামপন্থীদের নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও মোজাফফর ন্যাপ। এ মহলের ধারণা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সবচে' লাভবান হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি ও মোজাফফর ন্যাপ। পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে মাত্র একটি আসন পেয়েছিল মোজাফফর ন্যাপ। ছাত্র ফ্রন্টে তাদের কিছু প্রভাব থাকলেও কৃষক বা শ্রমিক ফ্রন্টে তাদের কোনো প্রভাব ছিল না। ৭১-এর যুদ্ধের সময় ভারতের মাটিতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে আসে। প্রয়াত কমরেড মনি সিং ও মোজাফফর ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ স্বাধীন বাংলা সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হন। অপরদিকে ভারতের সরকারি মহলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ সিপিআই-এ সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব ডিপি ধর এবং পিএন হাসকার দুই ক্ষমতাসীন ব্যক্তিত্ব। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এদের

www.nagorikpathagar.com

সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ফলে ভারত সরকারের কাছে এই দুটি দলের গুরুত্ব অনেক। হয়তো এ কারণেই আগস্টে আমার ভারত প্রবেশকালে ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাকে সীমান্তে আটক করে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি বা মোজাফফর ন্যাপের সদস্য কিনা। আমি যতদূর জেনেছি অনেক দেন দরবারের ফলে ন্যাপ এবং কমিউনিস্ট পার্টি বিশেষ ট্রেনিং-এর সুবিধা পেয়েছে ভারতের মাটিতে। অপরদিকে পিকিংপন্থী বা অন্যান্য চরম বামপন্থী বলে কথিত দলের সদস্যরা প্রশিক্ষণ নিয়েও শেষ পর্যন্ত সরকারিভাবে মুক্তিযোদ্ধা বলে স্বীকৃতি পায়নি। অর্থাৎ ভারতের মাটিতে ভারত সরকারের বাংলাদেশ সম্পর্কনীতির একাধিক রূপ দেখেছি :

১. সরকারিভাবে দৃশ্যত ভারত সরকার স্বাধীন বাংলা সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে।
২. সেনাবাহিনীর একটি অংশ তাজউদ্দিন সরকারবিরোধী ছাত্রলীগকে মদদ দিচ্ছে।
৩. দিল্লির একটি রাজনৈতিক আমলামহল বাংলাদেশের মস্কোর অনুসারি বামপন্থীদের সাহায্য সহযোগিতা করেছে।

বাংলাদেশে ফিরে তেমন একটি চিত্র আমার চোখে পড়েছিল। দেশে তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে সরকার চলছে। ছাত্রলীগ নেতৃত্ব সে সরকারের তোয়াক্কাই করছে না। কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। আর তখন লক্ষণীয় ছিল ভারতীয় দূতাবাসে কূটনীতিক নির্বাচন। এই দূতাবাসের অধিকাংশ কূটনীতিক ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একসময় ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা। ভারতের দূতাবাসের চেহারা দেখে মনে হতো শেখ সাহেব দেশে ফিরুক আর না ফিরুক বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে মস্কোপন্থীরাই নিয়ামক শক্তি হয়ে দাঁড়াবে। যেন সেই প্রস্তুতি নিয়েই ভারত তার বাংলাদেশের দূতাবাস সাজিয়েছে। এ কথাগুলো ছিল তখন আমার একান্ত চিন্তা। কাউকে বলতে পারছিলাম না। তবে মনে হচ্ছিল তাজউদ্দিন সাহেব বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। ছাত্রলীগ তাঁকে বরদাস্ত করবে না। তাঁকে বরদাস্ত করবে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কারণ ছাত্র জীবনে তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা সকলেরই জানা ছিল। তবে আমি এতো কথা ভাবলেও সব কিছু গুছিয়ে নিতে পারছিলাম না।

জীবনে দু'বার স্বাধীনতা দেখেছি। প্রথম স্বাধীনতা দেখেছিলাম ১৭ বছর বয়সে। দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা দেখলাম ৪১ বছর বয়সে। প্রথম স্বাধীনতার ভয়াবহ স্মৃতি তখনও মন থেকে মুছে যায়নি।

www.nagorikpathagar.com

১৯৪৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা এসেছিল সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশ বিভাগের মাধ্যমে। উপমহাদেশের দুই রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের কাছে স্বাধীনতা ছিল ভয়, ত্রাস এবং শঙ্কার। কোটি কোটি মানুষের জীবনে সে স্বাধীনতা ছিল অমানবিক এবং দানবীয়। সেই স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভেবেছি এই স্বাধীনতার অর্থ কী। যে স্বাধীনতা মানুষকে ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে, সেই স্বাধীনতার শিকার সাধারণ মানুষকে দেশান্তরী হতে দেখেছি। দেখেছি ভিন দেশ থেকে আরো একদল মানুষকে সর্বশান্ত হয়ে আমার দেশে আসতে। ওদের কারো চোখে কোনো আশা বা ভাষা নেই। সবই অনিশ্চিত। নিজের জননীকে দেখেছি দেশান্তরী হতে।

তবে সে দৃশ্য বেশিদিন দেখতে হয়নি। আমার স্বাধীন দেশটির নাম পাকিস্তান হওয়ায় আমার জেলে যাওয়া হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। স্বাধীন পাকিস্তানের মুক্ত বায়ুতে আমাদের থাকার অধিকার ছিল না। ১৯৪৭ সালের পর যারা জন্মেছেন তাদের সে পরিস্থিতি বোঝার কথা নয়। আমি ওই বয়সেও বুদ্ধি দিয়ে বুঝতাম যে ভারতবর্ষ নামক উপমহাদেশটি ভাগ হয়েছে ব্রিটিশের নেতৃত্বে। একটি ভাগের নাম ভারত। ওই ভাগটিতে কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান লুটেপুটে খাবে। অপর ভাগের নাম পাকিস্তান। সেখানে লুটেপুটে খাবে মুসলিম লীগ নামক একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই দু'টি প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশের সঙ্গে মিলেমিশে ভারত শাসন করেছে। এই উপমহাদেশে মানুষ নামে কোনো প্রাণী নেই। মুখ্যত হিন্দু মুসলমান নামে কোটি কোটি জীব আছে। এদের একটি অংশে শাসক ও শোষণ করার দায়িত্ব ব্রিটিশ দিয়েছে কংগ্রেসকে। অপর অংশের দায়িত্ব পেয়েছে মুসলিম লীগ। আমার রাজনীতিক জ্ঞান আমাকে শিখিয়েছিল এই শোষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। লড়তে গেলে বেশিদিন বাইরে থাকা যাবে না। ওই পাকিস্তান সৃষ্টির পর মাত্র বছরখানেক জেলের বাইরে ছিলাম। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের সৃষ্টি। আর আমি গ্রেফতার হলাম ১৯৪৮ সালের ২০ আগস্ট। জেল থেকে বের হতে ১৯৫২ সাল কেটে গেল, অর্থাৎ জেলের বাইরে রাজনীতির ঝামেলা আমাকে পোহাতে হয়নি বছর চারেক।

তবে জানতাম যে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিতে নতুন কিছু ঘটবে না। ব্রিটিশ ধাঁচেই একটি রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা হবে। নেতৃত্ব থাকবে দুর্জন এবং দুর্বল ব্যক্তিদের হাতে। মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।

কিন্তু ১৯৭১ সাল তো ১৯৪৭ নয়। এই সংগ্রামের একটি ভিন্ন উত্তরাধিকার আছে। একটি ভিন্ন স্বপ্ন ও একটি ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা আছে। সেই

www.nagorikpathagar.com

স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ৭১-এর সংগ্রামের জন্ম। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে দেশ স্বাধীন হলেই ওই সমস্যার সমাধান হবে তার স্বপক্ষে কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। কারণ এই যুদ্ধের নেতারা আমার চেনা। অসম্ভবভাবে জানা। ৭১ সালের ৯ মাসে আরো জানা হয়ে গেছে তাদের চরিত্র। ভিন্ন দেশের মাটিতে থেকে যারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ক্লেদাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, তারা বাড়ি ফিরে কী করতে পারে তা বুঝতে বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। অথচ সেই অপ্রিয় সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করলে ৭১-এর যুদ্ধের কোনো অর্থ থাকে না। তবু আশা। ব্যাখ্যা এবং যুক্তিহীন স্বপ্ন। তবুও ভেবেছি দেখি শেখ সাহেব দেশে ফিরলে কী হয়। এমন সময় খবর এল শেখ সাহেব মুক্তি পেয়েছেন। ঢাকায় আসছেন ১০ জানুয়ারি।

শেখ সাহেব এলেন দশ তারিখে। রেসকার্সের জনসভায় তাঁর ভাষণ শুনতে গেলাম। শেখ সাহেবের দিকে তাকিয়ে চমকে গেলাম। শরীরটা দারুণ ভেঙে গেছে। মুখে নিদারুণ ক্লান্তির ছাপ। চারদিকে উদ্বেলিত জনতা যেন তাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। খুব মনযোগ দিয়ে তাঁর ভাষণ শুনলাম। মানুষ কান পেতে শুনল। মনে হলো মানুষ তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত ভাষণ পায়নি। তাঁর কাছে যেন অনেক পাওয়া ছিল। ৯ মাস শেখ সাহেবের অনুপস্থিতিতে তারা সংগ্রাম করেছে। অনেক কিছু হারিয়েছে। ভেবেছে ৭ মার্চের মতো একটি অগ্নিঝরা ভাষণ তাঁর কাছ থেকে শুনবে। সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

আমি কিন্তু তেমনটি ভাবিনি। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ অগ্নিঝরা হলেও আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। সেদিনের জনতা ক্ষুব্ধ ছিল। শেখ সাহেব সমালোচিত হয়েছিলেন স্বাধীনতা ঘোষণা না দেয়ার জন্যে। আমার কথা ছিল—৭ মার্চ ওর চেয়ে বেশি কিছু বলার তাঁর ছিল না। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'—ওই সময় এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব বা স্বাভাবিক ছিল না। যাঁরা বলতে চান তিনি স্বাধীনতা চাইতেন না কিংবা স্বাধীনতার নামে ভাওতা দিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। একটা কথা সবাইকে মেনে নিতে হবে, শেখ সাহেব যে কোনো অর্থেই ওই ভাষণ দিয়ে থাকুন না কেন, ওই ভাষণ থেকে পিছু হটবার তাঁর কোনো উপায় ছিল না। আমি তর্কের খাতিরে সমালোচকদের বক্তব্য মেনে নিতে রাজি—যাঁরা বলেন, তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন বা সমঝোতা করে প্রধানমন্ত্রী হলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হতোই। ইতিহাসের কোনো আন্দোলনই শুধুমাত্র নেতারা নির্ধারণ করে না। আন্দোলনের গতিপথে একসময় জনতাই নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। সে জনতাকে

www.nagorikpathagar.com

নেতৃত্ব দিতে না পারলে একসময় নেতৃত্বই ছিটকে পড়ে যায়। জনতা নতুন নেতৃত্ব গড়ে তোলে।

যাঁরা বলেন, ৭ মার্চ রেসকোর্সে শেখ সাহেবের স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়া উচিত ছিল, তারা কি পরবর্তী চিত্রটি ভেবে দেখেছেন? ধরা যাক, শেখ সাহেব রেসকোর্স ময়দানেই স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো পাকিস্তান বাহিনীর হামলা এবং সে হামলায় নিশ্চয়ই রেসকোর্সেই লাখ খানেক মানুষ মারা যেত। তারপর কি আপনারা অভিযোগ করতেন না শেখ মুজিবুর রহমান হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? তাই আমার সেদিন মনে হয়েছিল ওর চাইতে বেশি কিছু বলার অবকাশ সেদিন ছিল না।

এ পটভূমিতে আমি নিজেই বিভ্রান্ত ছিলাম। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কি ভাষণ শেখ সাহেব দেবেন ১০ জানুয়ারি। ১০ জানুয়ারি ৭ মার্চ নয়। ৭ মার্চ যে আন্দোলনের শুরু ১৬ ডিসেম্বর সে আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে। নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। নতুন নেতৃত্ব নিতে হবে। নেতার প্রতিটি কথা দেশে বিদেশে পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন করা হবে। বুঝতে চেষ্টা করা হবে তাঁর মন মানসিকতা এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নীতি। দেশে এসে তিনি ৯ মাসের বিস্তারিত বিবরণ শুনতে পারেননি। সার্বিকভাবে জানেন না স্বাধীন বাংলা সরকারের কার্যাবলি। তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনো নীতি চূড়ান্ত হয়নি। চূড়ান্তকরণের প্রশ্নই ওঠেনি। সবকিছু যেন নতুনভাবে শুরু হতে যাচ্ছে। মানুষ ভেবেছে শেখ সাহেব ফিরে এলে কি স্বাধীন বাংলার নতুন নীতি নির্ধারিত হবে? স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা শোনা যাবে? এ আশা নিয়েই সেদিন লাখ লাখ মানুষ রেসকোর্স ময়দানে এসেছিল। কিন্তু সে আশা পূরণ করার অবকাশ কি সেদিন ছিল?

৭ মার্চের শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১০ জানুয়ারির শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক অর্থে একই ব্যক্তি নন এমন একটি ধারণা নিয়েই আমি জনসভায় গিয়েছিলাম। সেদিনের শেখ সাহেবের ভাষণ শুনেছিলাম এবং লক্ষ করেছিলাম সাধারণ মানুষ যেন আরো কিছু চাইছে। শেখ সাহেব দীর্ঘ ভাষণ দিলেন না। শুধু তাঁর ভাষণের একটি বাক্য আমার কানে বাজল। তিনি বললেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে আমি প্রশংসা করতে পারলাম না। জনতা এ বাক্যটি ইতিবাচক হিসেবে নিয়েছিল। তারা চেয়েছিল সরাসরিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করা হোক। কারণ ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সহায়তা না করলে এত রক্তপাত আর এত মৃত্যু বাংলাদেশে হতো না। সবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সপ্তম নৌবহর

www.nagorikpathagar.com

পাঠিয়েছিল বাংলাদেশে। জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ করতে চাইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধা দিয়ে যুদ্ধকে দীর্ঘ করেছে। আর ওই সময় আলবদর বাহিনী হত্যা করেছে বাংলাদেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৩, ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর। আর তার একমাস না যেতেই ১০ জানুয়ারি শেখ সাহেব ভাষণ দিলেন রেসকোর্স ময়দানে। সে ভাষণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জোরালো কথা না থাকায় সাধারণ শ্রোতারা যেমন ক্ষুব্ধ হলো, আমারও মনে হলো কিছুদিনের মধ্যেই নতুন কিছু ঘটতে যাচ্ছে আমাদের রাজনীতিতে। মন্ত্রিসভায় নিশ্চয়ই এবার মতানৈক্য দেখা দেবে। কারণ স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন বাংলাদেশে ফিরে ঘোষণা করেছেন—সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেয়া হবে না। তাজউদ্দিন সাহেবের মার্কিনবিরোধী ভূমিকা ছিল খুবই স্পষ্ট। এ ভূমিকা নিয়ে মন্ত্রিসভায় বিরোধিতা ছিল। তাঁর নীতির বিরোধিতা করেছেন খন্দকার মোস্তাক আহমদ। তৎকালীন ছাত্রলীগ তাজউদ্দিনকে বিরোধিতা করেছে পদে পদে। শেখ সাহেবের ভাষণ থেকে আমার মনে হলো সরকারের নেতৃত্বে তাজউদ্দিন থাকছেন না।

কিভাবে নতুন সরকার গঠিত হবে, কে প্রধানমন্ত্রী হবেন এ চিন্তা তখনো আমার মনে আসেনি। শুধু এটুকু মনে হলো, মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব পরিবর্তিত হবে। তাজউদ্দিনের নীতির পরিবর্তন হবে এবং কিছুদিন পরে সে ঘটনা ঘটল। শেখ সাহেব প্রধানমন্ত্রী হলেন। প্রেসিডেন্ট হলেন আবু সাঈদ চৌধুরী। তাজউদ্দিন থাকলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন একটি অধ্যায় সূচিত হলো।

এ সময় বাস্তব কারণে আমার নিজের ভূমিকা পরিবর্তন হলো। এ পরিবর্তনের কেন্দ্র হচ্ছে জীবিকার জন্যে গ্রহণ করা সাংবাদিকতা পেশা।

মুখ্যত রাজনীতি আমার পেশা। নিজের সিদ্ধান্ত ছিল কোনকালে কারো অধীনে চাকরি করব না। আর চাকরি বা আমাদের কে দেবে। ছাত্র পড়ানোই ছিল আমার একমাত্র পেশা। ১৯৫৮ সালে এ পেশা নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। দেশে সামরিক শাসন জারি হয়েছে। অধিকাংশ রাজনীতিক আত্মগোপন করেছেন। অনেকেই জেলে। বন্ধুদের বক্তব্য হচ্ছে কোনো চাকরি নিলে হয়তো গ্রেফতার এড়ানো যাবে। নইলে সামরিক সরকার একদিন গ্রেফতার করবেই। বন্ধু আহমেদুর রহমান তখন দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক। তিনি বললেন, ইত্তেফাকে চাকরি নিন। আমি ব্যবস্থা করব। ইত্তেফাকের তখন অন্যতম সহকারী সম্পাদক আব্দুল আউয়াল। আউয়াল এক

www.nagorikpathagar.com

সময় ছাত্রলীগের সম্পাদক এবং আমি দপ্তর সম্পাদক ছিলাম। আমার চাকরি হবার এক সপ্তাহের মধ্যে ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন গ্রেফতার হয়ে গেলেন। আমি গ্রেফতার হলাম একমাসের মধ্যে। জেল থেকে বের হলাম ১৯৬২ সালের জুন মাসে। ইত্তেফাকে সকলের চাকরি হলো। আমার চাকরি হলো না। চাকরি হলো জেহাদে। জেহাদ বন্ধ হয়ে গেল ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে। দৈনিক পাকিস্তান অর্থাৎ দৈনিক বাংলা প্রকাশিত হলো ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে। দৈনিক পাকিস্তানে চাকরি হলো সহসম্পাদক হিসেবে। দেশ স্বাধীন হবার পর আমার পদে আর ফিরতে পারলাম না। তখন কাগজের নাম দৈনিক বাংলা। শেষ পর্যন্ত সহকারী সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হলাম। সহকারী সম্পাদক ছিলেন শামসুর রাহমান, আহমেদ হুমায়ুন, মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ, ফজল শাহাবুদ্দিন প্রমুখ। তাঁরা সবাই ছদ্মনামে উপসম্পাদকীয় লিখতেন। আমি নিজের নামে উপসম্পাদকীয় লিখতে শুরু করলাম। মাঝখানে একদিন একটি ঘটনা ঘটে গেল। এক তরুণ এসে দাবি করলো তার লেখা আমাদের ছাপাতে হবে। আমরা বললাম বাইরের কোনো লেখা ছাপা হয় না। সে দাবি করল আপনি নির্মল সেন নিজের নামে লিখতে পারলে আমি কেন নিজের নামে লিখতে পারব না। আর সেদিন থেকে নির্বাহী সম্পাদক তোয়াব খান আমাকে ছদ্মনামে লেখার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু নতুন নাম কোথায় পাব। পাশে সহ-সম্পাদক সাদেকীন কাজ করছিল। সে বলল আমি একটি নাম দিচ্ছি। নাম হচ্ছে, অনিকেত। অর্থাৎ যার কোনো নিকেতন নেই—উদ্বাস্তু।

সে থেকেই অনিকেত নামে আমার লেখা শুরু দৈনিক বাংলায়। অনিকেত নামে এ লেখা প্রথম বন্ধ হয়েছিল ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাকশাল গঠনের পর শেখ সাহেবের নির্দেশে। তবে তার আগেই আমার লেখা নিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে পদ্মা-মেঘনা-যমুনায়।

দৈনিক বাংলায় জানুয়ারিতে আমার লেখা নিয়ে প্রায় তোলপাড় হয়ে গেলো। তখন আমি নির্মল সেন নামেই লিখছি। আমার লেখা শিরোনাম ছিল 'আমি ভয় পাই'। আমার বক্তব্য ছিল আমাদের কাছাকাছি অনেক লোক এখন ঘুরছে। অনেক লোককে দেখছি নতুন পোশাকে। অনেকে সরকারের অনুগ্রহ পাচ্ছে। কিন্তু এরা তো চেনা মুখ। আমি স্বাধীনতা যুদ্ধের ৯ মাসে বেশ কয়েকবার ঢাকায় এসেছি। টেলিভিশনে এদের মুখ দেখেছি। কণ্ঠ শুনেছি বেতারে। মিছিল দেখেছি ঢাকা শহরে। এরা তখন তাণ্ডব নৃত্য করেছে সারা বাংলাদেশে। সারা দেশে এক মৃত্যুর রাজত্ব। এই মানুষগুলো এ রাজত্বের নেতৃত্ব করেছে। কণ্ঠ দিয়েছে বেতারে। নাটক লিখেছে। অভিনয় করেছে

www.nagorikpathagar.com

স্বাধীনতাবিরোধী নাটকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমার শেষ কথা ছিল—এদের দেখে আমি নতুন করে ভয় পাচ্ছি। এদের আমি বিশ্বাস করব কীভাবে। তাই আমি ভয় পাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার দু'মাসের মধ্যে ভয় আমাকে আঁকড়ে ধরেছে।

প্রতিপক্ষের ভাষ্য হচ্ছে—নির্মল সেন আবার পরিস্থিতি ঘোলাটে করে দিচ্ছে। একদল মানুষ ভয় ভীতিতে বাধ্য হয়ে ওই ৯ মাসে অনেক কিছু করেছে। তারা গান গেয়েছে। নাটক করেছে। নেহাৎ বাঁচার জন্যে তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে ওই ভূমিকা নিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে এমনি নতুন করে উসকে দেয়া আদৌ সঠিক কি? এতে ঘরে ঘরে বিবাদ দেখা দেবে। বেতার টেলিভিশনের শিল্পীদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। নতুন করে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে।

এ ব্যাপারে আমার ভিন্ন বক্তব্য ছিল। আমি লিখেছিলাম দেশে আটকেপড়া মানুষগুলোর খবর আমরা জানি। ৯ মাসের যুদ্ধকালে আমি অন্তত ৫ বার ঢাকা শহরে ঢুকেছি। ভারতে গিয়ে আবার ফিরে এসেছি। অসংখ্য মানুষের খোঁজ নিয়েছি। এদের জন্যে আমার সহানুভূতি ছিল। কারণ এরা নিত্য মৃত্যুর শিকার। কখন মৃত্যুর পরোয়ানা আসবে কেউ জানে না। সীমান্তের ওপারে যারা গিয়েছেন তাদের জীবনে এই আশঙ্কাটি ছিল না। তাদের প্রতি মুহূর্তে পাকিস্তানি হামলার ভয় ছিল না। কিন্তু ঢাকায় ভয়টি ছিল প্রতিদিন। সুতরাং ভয়ের মুহূর্তে সবকিছুই করে ফেলা সম্ভব।

তবু আমার প্রশ্ন ছিল রচিত গান এবং ইতিহাসের সন্ধান সম্পর্কে। অবাঙালিরা বাঙালির ইতিহাসের সকল খবর জানত না। তাদের পক্ষে খুঁজে খুঁজে ইতিহাসের নোংরা আবর্জনা বের করা সম্ভব ছিল না। এ নোংরা এবং আবর্জনা আমাদের লোকেরাই অনুসন্ধান করে বের করেছে। গান লিখেছে, নাটক করেছে। সবকিছুই মিথ্যা নির্ভর। তারা না করলে বা অসহযোগিতা করলে হয়তো বা ৭১-এর সংগ্রামকালে তৎকালীন পাকিস্তান বেতার থেকে ঐ অশ্লীল গান এবং নাটক আমাদের শুনতে হতো না। আমার বক্তব্য ছিল এই মানুষগুলোকে নির্বিচারে সব সুযোগ দিলে পুরনো ঐতিহ্য বহাল থাকবে। কোনোদিন এরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারবে না। বলবে, বন্দুকের নলের ভয়ে এরা এসব কিছু করতে বাধ্য হয়েছে। নিজের করার কিছু ছিল না। এরা বারবারই বিশ্বাসঘাতকতা করে বেঁচে যাবে। আর একথাও মেনে নিতে হবে, এরা সকলেই বন্দুকের ভয়ে করেছে তা সত্য নয়। অনেকেই নিজের ইচ্ছেয় এবং নিজের বিশ্বাসে এই ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যে কোনো কারণেই হোক

www.nagorikpathagar.com

এ ঘটনা নিয়ে তেমন পর্যালোচনা হলো না। যারা ক্ষমতার কাছাকাছি আছে, তারা যেমন ছিল তেমন থাকল। মাঝখান থেকে কিছু চুনোপুটি রাজাকার আলবদর হিসেবে বেতার ও টেলিভিশনের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেল। নতুন যারা ক্ষমতায় এলেন তারাও প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে দালালিতে তারাও কম যান না। পূর্বতন সরকারের সবকিছু খারাপের মতো বর্তমান সরকারের সবকিছু ভালো বলেও তাঁরা তীব্রস্বরে চিৎকার শুরু করলেন।

লেখাটি নিয়ে কোনো কোনো মহল আমাকে অভিনন্দন জানালেন। অনেকেই বিরূপ হলেন। পাকিস্তান আমলে এরা পাকিস্তানের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। তাদের বক্তব্য—অবস্থা এমন দাঁড়ালে তাদের চিরদিনই ভুগতে হবে। আর ক্ষমতাসীনদের বক্তব্য হচ্ছে—অবস্থা এমন দাঁড়ালে সুস্থভাবে সরকার চালানো যাবে না।

ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো আমার আরেকটি লেখা নিয়ে। তখন আমি অনিকেত নামে লিখছি। আমার লেখার বিষয় ছিল সরকারের একটি ঘোষণা ও বাংলাদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যের দাম। সরকার ঘোষণা দিলেন হিন্দুদের সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী ফেরত দিতে হবে। আমি লিখলাম, ঘোষণাটি ভালো কিন্তু এ ঘোষণা কার্যকর করা সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালের লুটপাটের পণ্য কেউ তার ঘরে জমা করে রাখেনি। ফরিদপুরের টিন বিক্রি হয়ে চলে গেছে দিনাজপুরে। আমার বাড়ির রেডিওটি আমার পাশের বাড়ির লোক নিয়ে থাকলেও নিশ্চয়ই লজ্জায় সে আমাকে রেডিওটি ফেরত দেবে না। অনেক এলাকায় ঘর পুড়েছে। সেই পোড়া ঘরে ছাই ব্যতীত ফিরিয়ে দেয়ার মতো কিছুই নেই। কিন্তু সবকিছু ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলে আইন আদালতের প্রশ্ন উঠবে। এক্ষেত্রে অভিযোগকারীদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন হবেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক। এই মামলাকে ভিত্তি করে আরেকটি প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক চিন্তা ভাবনা সমান্তরালভাবে জন্ম নেবে। একদিন ভয়ে এবং শঙ্কায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা মামলা করলেও সাক্ষ্য দিতে যাবে না। মামলায় একতরফা সিদ্ধান্ত হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি বেকসুর খালাস পাবে। তারপর একদিন বুকটান করে এসে বলবে, কিরে ব্যাটা মালাউন, দেখি তোরে এখন কে রক্ষা করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমার সুপারিশ ছিল লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করা হোক। পুলিশকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হোক।

আমার এ লেখা নিয়ে আমার সুহৃদ মহলেও বিতর্কের সৃষ্টি হলো। তারা অভিযোগ করলো আপনি কি লুটেরাদের বিচার চান না। আপনি কি চান না যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের সকল লুণ্ঠিত দ্রব্য ফিরে পাক। আপনার লেখায়

www.nagorikpathagar.com

তো মনে হচ্ছে আপনি রাজাকার ও হামলাকারীদের বাঁচিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আমার সে কালের এ ধরনের লেখাগুলো নিয়ে এখনো আমাকে অভিযুক্ত করা হয়। আমি সেদিনও যে জবাব দিয়েছি, আজকেও আমার সেই জবাব দিতে হবে।

একথা সত্য, নয় মাসের সংগ্রামে বাংলাদেশের মানুষ অসাধ্য সাধন করেছে। একটি মানচিত্র পাল্টে দিয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা এবং বিশ্বাস হচ্ছে ৭১-এর আন্দোলনে তীব্রতা ছিল আবেগের। রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের প্রশ্ন ছিল একান্তই গৌণ। প্রথমে কেউ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। পাকিস্তান বাহিনী হামলা শুরু করার পরে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনেকেই কোনো কিছু না জেনে শুনেই ভারতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেজেছে। তার কাছে কোনো সামগ্রিক চিত্র ছিল না। রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ না থাকার ফলে দেশ স্বাধীন করার প্রশ্নটিই ছিল মুখ্য। দেশের পরবর্তী রাজনৈতিক চিত্র আদৌ স্পষ্ট ছিল না কারো কাছে। আর ইতোমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় প্রতিটি ঘরে। আমরা বাঙালির শাসন চাই কিন্তু সে জন্যে পাকিস্তান ভাঙতে হবে সে প্রশ্নটি মুখ্য ছিল না। আমি আগেও বলেছি এ প্রশ্নে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বিভাজন ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা বাড়ি ফিরে দেখল তাদের অনেকের আপনজনই রাজাকার এবং শান্তি কমিটির সদস্য। অথচ তাদের সঙ্গেই তাদের ঘর করতে হবে। এদের সঙ্গে কী আচরণ করা হবে এই কথা কেউ বলল না। পাকিস্তানের সহযোগিতার জন্যে কিছু লোককে গ্রেফতার করা ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো না। যে ছেলেটি বাড়ি ফিরে দেখল তার মা রাজাকারের সহযোগিতা করেছে, সেই মায়ের কাছেই তার আশ্রয় নিতে হলো। অনেক মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা যুদ্ধের উন্মাদনায় কিছুদিনের জন্যে হলেও তার রাজাকার আত্মীয়-স্বজনকে ক্ষমা করতে চাইল না। অনেকেই নিজের স্বজনকে খুন করল। আবার কাউকে জেলে পৌঁছে দিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা সামাজিকভাবে প্রতিরোধের কর্মসূচি বা সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচি কোনো তরফ থেকেই দেয়া হলো না। মাঝখান থেকে আরেকটি প্রশ্ন বড় করে দেখা দিল। মুসলমান সমাজে জাত-পাতের বিভেদ গৌণ। চাচাতো বা মামাতো ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে হয়। লক্ষ করা গেলো এ জন্যেই রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ না থাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের মনে এক সময় সেই রাজাকার স্বজন হয়ে দেখা দিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তীব্র না হওয়ায় সে সেই রাজাকার স্বজনের সঙ্গেই সহাবস্থান শুরু করল। এক সময় এটাই হয়ে দাঁড়াল সবচেয়ে বড় যুক্তি। অর্থাৎ রাজাকার হলেও আমার স্বজন বলেই তাকে

www.nagorikpathagar.com

মুক্তি দিতে হবে। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে কেউ মুক্তিযুদ্ধে গেলে তার ভবিষ্যৎ কর্মপথ বেছে নিতে অসুবিধে হতো না। দুঃখজনক হলেও সত্য, আওয়ামী লীগসহ কোনো রাজনৈতিক দলই মুক্তিযুদ্ধের এ দিকটি কখনোই ভেবে দেখেনি। কেউ ভাবতে চেষ্টা করেনি, সামগ্রিকভাবে সমাজে মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্যতা গ্রহণযোগ্য করতে না পারলে শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের লুট করা দ্রব্য ফেরত দিতে বললে সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে সঙ্কট আরো গভীর হবে বলেই আমার ধারণা ছিল এবং আমার লেখার শেষ পর্যন্ত একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো।

একই সময় আমি ভারতীয় পণ্যের দাম সম্পর্কে একটি লেখায় উল্লেখ করেছিলাম। তখন কোলকাতায় সাপ্তাহিক দেশ-এর দাম ছিল ষাট পয়সা। ঢাকায় দেশ বিক্রি হতো এক টাকায়। আমি বলেছিলাম এ প্রবণতা ভালো নয়। মানের দিক থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মুদ্রা মান তখন এক ছিল। এ সত্ত্বেও কেন ভারতের পণ্য বাংলাদেশে বেশি দামে বিক্রি হবে, এটাই ছিল আমার প্রশ্ন। আমার ভয় ছিল অন্যত্র। আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয়ার সময় বলতাম করাচির তিন টাকার চাল আমাদের ঢাকায় ৬ টাকায় কিনতে হয়। সুতরাং ওই পাকিস্তান আমরা চাই না। ওই পাকিস্তানে আমরা থাকব না। একই ধারায় যদি প্রশ্ন ওঠে ভারতীয় পণ্য এদেশে বেশি দামে বিক্রি হলে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। ওরা পাকিস্তানের মতোই আমাদের ঠকাচ্ছে।

আমার এই লেখা নিয়ে প্রশ্ন উঠল বিভিন্ন মহলে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁকে সঠিকভাবে আমার কথা বোঝাতে পেরেছিলাম। কিন্তু রাজাকারদের গ্রেফতার করা বা মুক্তিযোদ্ধাদের সুযোগ-সুবিধা দেয়া নিয়ে আমার লেখা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

একদিন খবর পেলাম জহির রায়হান মিরপুরে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। আমি হতভম্ভ হয়ে গেলাম। জহির আমার খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। জহিরের বড় ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারের সঙ্গে দীর্ঘদিন এক সঙ্গে জেল খেটেছি। সাংবাদিক ইউনিয়ন করেছি। তবে জহিরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ভিন্ন ধরনের। আমি যখন ছাত্রলীগ করতাম তখন আব্দুল গাফফার চৌধুরী ও জহির রায়হান ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত জহির সিনেমায় চলে গেল। সব নিয়েই জহিরের সঙ্গে আমার আলাপ হতো। তার সিনেমা নিয়ে একমত হতাম না। পাকিস্তান আমলে সর্বশেষ জেল খেটে বের হয়েছিলাম ১৯৬২ সালের জুন মাসে। পরদিন জহিরের কায়েতটুলির বাসায়

www.nagorikpathagar.com

গিয়েছিলাম। তর্ক বেধে গেল জহিরের ছবি 'সঙ্গম' নিয়ে। জহির বলল, উপায় নেই। আপনারা সাধারণ দর্শকের রাজনৈতিক চেতনা উন্নত করতে না পারলে ওরা বোম্বে মার্কা ছবিই দেখবে। আমাদের মতো মানুষের পক্ষে বারবার লোকসান দিয়ে ভালো ছবি করে টিকে থাকা সম্ভব হবে না।

সেই জহির অর্থাৎ জহির রায়হান ৭১-এর যুদ্ধের সময় কলকাতায় গিয়েছিলেন। তাঁর পেশা ছাড়েননি। স্টপ জেনোসাইড ছবি করেছিলেন। আমার প্রশ্নের কঠিন জবাব দিয়েছিলেন অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের নির্যাতিত জনতার চিত্র ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জহির কোলকাতায় গেলেও শহীদুল্লাহ কায়সার ঢাকা ছাড়লেন না। কেন ছাড়লেন না আমি জানি না। ৭১ সালে আমি বারবার ঢাকা এসেছি। সকলের পরিবারের খবর নিয়েছি। শুনেছি শহীদুল্লাহ সাহেব ভালো আছেন। সর্বশেষ শুনেছি যুদ্ধের শেষ পর্বে আল. বদরের হাতে খুন হয়েছেন শহীদুল্লাহ কায়সার। সেই শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে গিয়েছিলেন জহির রায়হান। কে নাকি ফোন করে জানিয়েছিলেন শহীদুল্লাহ কায়সাকে মিরপুরে খুঁজে পাওয়া যাবে। পাগলের মতো ছুটে গিয়েছিলেন জহির রায়হান। মিরপুর থেকে জহির রায়হান আর ফেরেননি।

কেন এমন হলো? কেন এমন হয়? সে প্রশ্ন তখন আমি ভাবতে চেষ্টা করিনি। হাতে কলম ছাড়া কিছু ছিল না। নিজেকে দারুণ অসহায় মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এ কোন স্বাধীনতা, কাদের স্বাধীনতা। কারা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও কলকাঠি নাড়াচ্ছে। জহির রায়হানের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে সভা, সমিতি, মিছিল, কমিটি হয়েছে। কোনো ফায়দা হয়নি। সে প্রশ্নে পরে আসছি।

তাহলে জহির রায়হান কোথায় হারিয়ে গেলেন? কেন ফিরলেন না? কারা তাঁকে মিরপুরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল? সে রহস্যের সমাধান আজো হয়নি। এ নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। কেউ কেউ বলতে চায় জহির রায়হানের কাছে আল-শামস, আল-বদর ঘাতকদের তালিকা ছিল। জহির রায়হান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা তদন্তের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সে জন্যেই পাকিস্তানের সহচরেরা তাকে খতম করেছিল। মিথ্যা টেলিফোন করে নিয়ে গিয়েছে মিরপুরের দুর্গম এলাকায় এবং সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

আজকের মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের একটি ভিন্ন ইতিহাস আছে। এ দু'টি এলাকা মোহাজেরদের পুনর্বাসনের কলোনি হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এ মোহাজেরেরা অধিকাংশ অবাঙালি। এরা ভারতের বিহার, উড়িষ্যা এবং উত্তর প্রদেশ থেকে এসেছে ভারত বিভাগের পর। এদের মধ্যে অনেকে চাকরিজীবী।

www.nagorikpathagar.com

এরা দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানে কাজ করার জন্যে অপসন দিয়েছিল। সে অপসন ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হয়েছিল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। বলা হয়েছিল—হিন্দু মুসলমান দু'টি স্বতন্ত্র জাতি। এদের পক্ষে পাশাপাশি বসবাস করা সম্ভব নয়। তাই ভারতবর্ষ ভাগ করতে হবে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে গঠিত হবে ভারত। আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান। দেশ ভাগ হলেই নাকি সব সমস্যার সমাধান হবে। দু'সম্প্রদায় দু'টি রাষ্ট্রে শান্তিতে বসবাস করবে।

কিন্তু দ্বি-জাতি তত্ত্ব দেশ ভাগের আগেই হোঁচট খেল প্রথম পদক্ষেপে। কারণ নতুন গঠিত ভারত ও পাকিস্তান থেকে সামগ্রিকভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের এক রাষ্ট্র থেকে অপর রাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হলো না। অর্থাৎ ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরা থেকে গেল। আর পাকিস্তানে থেকে গেল হিন্দুরা। অর্থাৎ মুসলমান মুক্ত ভারত বা হিন্দু মুক্ত পাকিস্তান গঠিত হলো না। নিশ্চয়ই তখন প্রশ্ন তোলা যেত, ৬ কোটি মুসলমান যদি ৩০ কোটি হিন্দুর সঙ্গে ভারতে থাকতে পারে তাহলে অবিভক্ত ভারতের ত্রিশ কোটি হিন্দুর সঙ্গে দশ কোটি মুসলমান কেন থাকতে পারবে না। একই যুক্তিতে বলা যায় যদি পাকিস্তানের আড়াই কোটি মুসলমানের সঙ্গে দেড় কোটি হিন্দু বসবাস করতে পারে তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি কেন বাস করতে পারবে না?

কিন্তু তখন যুক্তির পরিবেশ ছিল না। ছিল সংশয় সন্দেহ আর ষড়যন্ত্রের যুগ। ব্রিটিশ বেনিয়া, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত বিভাগের। ভারতে কংগ্রেস, পাকিস্তানে মুসলিম লীগ আর সবার ওপরে রাজত্ব করছে ব্রিটিশ। এ তিন দল মিলে সুনিপুণভাবে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল। আর এ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে সমগ্র ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। মানুষ হিসেবে মানুষের পরিচয় মুছে গিয়েছিল। এ উপমহাদেশে মানুষের প্রথম পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল হিন্দু, মুসলমান ও শিখ। সুস্থ মানবতার কোনো চিহ্ন আদৌ ছিল না। সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস চরমে উঠেছিল। এ পটভূমিতেই গঠিত হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান।

কিন্তু এ তত্ত্ব যে কত অলীক তা প্রমাণ হলো সরকার গঠন ও সরকারি কর্মচারিদের নিয়ে। সরকার গঠন করবে ভারতে কংগ্রেস এবং পাকিস্তান মুসলিম লীগ। এ দু'সরকারের কর্মকর্তা হওয়ার জন্যে পাকিস্তান থেকে হিন্দু নেতারা ছুটলেন ভারতে আর ভারত থেকে মুসলমান নেতারা ছুটলেন

www.nagorikpathagar.com

পাকিস্তানে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য হলো পূর্ববঙ্গের লোক। আজকের বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদভানিও ভারতে এসেছিলেন পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ থেকে। আর ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে মুসিলম লীগ নেতা লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী হলেন। পাকিস্তানের হিন্দু নেতারা কোটি কোটি হিন্দুদের পাকিস্তানে রেখে নিজের আখের গোছাতে গেলেন ভারতে। একইভাবে ভারতের মুসলমান নেতারা কোটি কোটি অসহায় মুসলমানদের ভারতে ফেলে পাকিস্তানে গেলেন। এক অভূতপূর্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো সরকারি কর্মচারিদের ব্যাপারে। তাদের বলা হলো—তাদের পছন্দমতো তারা ভারত এবং পাকিস্তানে চাকরি করতে পারবে। এ ব্যবস্থাটিকে বলা হতো অপসন। অর্থাৎ ইচ্ছে হলে ভারতের মুসলমান সরকারি কর্মচারিরা অপসন দিয়ে পাকিস্তানে আসতে পারে। আবার পাকিস্তানের হিন্দুরাও একইভাবে ভারতে যেতে পারে।

চাকরিতে অপসন দিয়ে লাখ লাখ হিন্দু যেমন সেকালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে গিয়েছিল তেমনি লাখ লাখ মুসলমান ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল। অপসন দিয়ে যারা পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন তাদের বলা হতো মোহাজের। মোহাজেররা অধিকাংশ অবাঙালি। তৎকালীন পাকিস্তানে তাদের কোনো সহায় সম্পত্তি বা আত্মীয়-স্বজন ছিল না। তাদের দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। ফলে তাদের জন্যে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিতে হয়। সৈয়দপুর, খালিশপুর, পার্বতীপুর, পাকশী, খুলনা, যশোর এবং ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুরে এদের জন্যে মোহাজের কলোনি নির্মিত হয়। স্বাভাবিক কারণে এ কলোনির অবাঙালি অধিবাসীরা একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরোধিতা করেছে। নির্বিচারে মুক্তিযোদ্ধাদের খুন করেছে। লুটপাট করেছে এদের সম্পদ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত ওরাই ছিল ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী।

আমার নিজের ধারণায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করাই এদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এরা দেশ ভাগের পর বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তানে এসেছিল। দেশ ভাগ না হলে তাদের ভিটে-মাটি ছাড়তে হতো না। পাকিস্তান তাদের অস্তিত্ব। পাকিস্তান না থাকলে তাদের অস্তিত্ব থাকে না। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ২৪ বছর বাঙালিরাও তাদের এক করে নিতে পারিনি। শুধুমাত্র ধর্মই যে সব কিছু নির্ধারণ করে না—প্রতি পদে পদে তা প্রমাণিত হয়েছে পাকিস্তানের ২৪ বছরে। তারই বিস্ফোরণ হয়েছিল ১৯৭১ সালে। কিন্তু অবাঙালিরা যাবে কোথায়? পাকিস্তান না থাকলে তাদের পূর্বপুরুষের ভূমি

www.nagorikpathagar.com

ভারতে ফিরে যেতে হয়। কিন্তু ভারতে ফিরে যাওয়া অনিবার্য কারণে সম্ভব নয়। তাহলে তাদের যেতে হয় পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে। কিন্তু সেখানেও তাদের থাকার কোনো জায়গা নেই। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে তারা অনাহূত। তাই পাকিস্তান থাকলে তাদের অস্তিত্ব বহাল থাকে। এ চিন্তা থেকেই সেদিন তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪০ বছর পরের চিত্র হচ্ছে এখনো হাজার হাজার মোহাজের বাংলাদেশের বিভিন্ন শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। তারা পাকিস্তানে যেতে চায়। অথচ পাকিস্তান তাদের নিচ্ছে না। পাকিস্তানের করাচি শহরে প্রতিদিন মোহাজেরদের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে। কারো জীবনে কোনো নিশ্চয়তা নেই। বেশ কয়েক বছর আগে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ ঢাকায় এসেছিলেন। তিনি বাংলাদেশে আটকেপড়া পাকিস্তানিদের অর্থাৎ মোহাজেরদের পাকিস্তানে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে প্রতিশ্রুতি আদৌ পালিত হবে কি না তাও নিশ্চিত নয়।

এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মধ্যে একটি মিনি পাকিস্তান ছিল বিশেষ করে মিরপুরে। দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পরেও মিরপুরে কেউ ঢুকতে পারছিল না। মোহাজেররা নাকি তখনও সশস্ত্র প্রতিরোধ করেছিল। আর এ পরিস্থিতিতেই নাকি কে বা কারা জহির রায়হানকে সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। ফোনে নাকি বলা হয়েছিল—মিরপুরে গেলে শহীদুল্লাহ কায়সারের খবর পাওয়া যাবে। সে ফোন পেয়ে জহির রায়হান মিরপুর ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আর ফিরে এলেন না।

পরবর্তীকালে জহির রায়হান নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। একটি তদন্ত কমিটি নাকি একটি রিপোর্টও পেশ করেছিল। এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন প্রয়াত চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবীর। জহির রায়হানের নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে আমরা অনেকেই লেখালেখি করেছি। সভা-সমাবেশ করেছি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কোনো রিপোর্ট পাওয়ার কথা অস্বীকার করা হয়েছে।

তবে স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও একটি প্রশ্নের জবাব আমি পাইনি। প্রশ্নটি হচ্ছে—জহির রায়হানের ব্যাপারে বিভিন্ন মহলের নিস্পৃহ আচরণ। একটি মানুষ যে এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কেউ যেন তার খোঁজ রাখল না। আমরা ঘাতক দালাল নির্মূলের কথা বলি, গণআদালত করে গোলাম আযমের ফাঁসি দাবি করি। অথচ জহির রায়হানের নামটি চলচ্চিত্র জগৎ ছাড়া আর কোথাও উচ্চারিত হয় না। কেন হয় না, সে প্রশ্নের জবাব দেয়ার মতো কেউ এদেশে নেই।

www.nagorikpathagar.com

সাম্প্রতিককালে জহির রায়হান নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে নতুন তথ্য শোনা গেছে। বলা হয়েছে—পাকিস্তানি হানাদার বা অবাঙালিরা নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশই জহির রায়হানকে খুন করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের এ অংশটির লক্ষ্য ছিল—বাংলাদেশকে স্বাধীন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীসহ সামগ্রিকভাবে বামপন্থী শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়া। এরা নাকি বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের হত্যার একটা তালিকা প্রণয়ন করেছিল। এদের ধারণা এ তালিকাটি জহির রায়হানের হাতে পড়েছিল। জহির রায়হানও জানত তার জীবন নিরাপদ নয়। তবুও সে ছিল ভাইয়ের শোকে মূহ্যমান। তাই শহীদুল্লাহ কায়সারের নাম শুনেই সে ছুটে গিয়েছিল মিরপুরে। তারপর আর ফিরে আসেনি। এ মহলই তাকে ডেকে নিয়ে খুন করেছে। তাহলে কোনটি সত্য? জহির রায়হানকে কারা গুম করেছে? পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা, আল বদর, আলশামস্, না রাজাকার? নাকি মুক্তিবাহিনীর একটি অংশ? স্পষ্ট করে বললে বলা যায়—মুক্তিবাহিনীর এ অংশটি মুজিববাহিনী। ১৯৭১ সালে প্রবাসী স্বাধীন বাংলা সরকারের অজান্তে গড়ে ওঠা মুজিববাহিনী সম্পর্কে অনেক পরস্পরবিরোধী তথ্য আছে। বিভিন্ন মহল থেকে বারবার বলা হয়েছে, এ বাহিনী গড়ে উঠেছিল ভারতের সামরিক বাহিনীর জেনারেল ওবান-এর নেতৃত্বে। এ বাহিনী নাকি মিজোরামে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে মিজোদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। এদের নাকি দায়িত্ব ছিল—রাজাকার, শান্তি কমিটিসহ বাংলাদেশের সকল বামপন্থীদের নিঃশেষ করে ফেলা। মুজিব বাহিনী সম্পর্কে এ কথাগুলো বারবার লেখা হচ্ছে। কোনো মহল থেকেই এ বক্তব্যের প্রতিবাদ আসেনি। অথচ দেশে মুজিববাহিনীর অনেক নেতা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আছেন। তারা কোনো ব্যাপারেই উচ্চবাচ্য করছেন না। তাদের নীরবতা তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত করছে এবং সর্বশেষ জহির রায়হানের নিখোঁজ হবার ব্যাপারেও মুজিব বাহিনীকেই দায়ী করা হচ্ছে।

১৯৭২ সালে এত কথা ভাবিনি। দুঃখ পেয়েছি জহির নিখোঁজ হওয়ায়। বেশি কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিছুদিন পরে আমিই বিব্রত হয়ে গেলাম। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম গুলি হলো আমাদের সংগঠন হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের মিছিলে।

মুজিব বাহিনী নিয়ে এ বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখিতে আমি আবেদন জানিয়েছিলাম যে মুজিববাহিনী সম্পর্কে যারা জানেন তাদের মুখ খোলা উচিত। কারণ তাদের সম্পর্কে নানা

www.nagorikpathagar.com

কথা বলা হচ্ছে। আমার এক লেখায় এই দাবিরই পুনরুক্তি করেছিলাম। তবে মুজিববাহিনীর জীবিত নেতাদের মধ্যে কেউই এ প্রসঙ্গে কথা বলেননি। কথা বলেছেন মুজিব বাহিনীর স্রষ্টা, ভারতের অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এসএস উবান। তিনি একটি স্মৃতিচারণমূলক বই লিখেছেন। বইয়ের নাম 'ফ্যান্টম অব বাংলাদেশ'—'দি ফিফথ আর্মি ইন বাংলাদেশ'। ক'দিন আগে ঢাকার একটি দৈনিকে এই বইয়ে মুজিববাহিনী সংক্রান্ত অধ্যায়টির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এই বইয়ে মুজিববাহিনী গঠন প্রক্রিয়া ও রাজনীতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণে সেকালের চারজন যুব নেতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই চারজন তরুণ নেতা হচ্ছেন শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ এবং আব্দুর রাজ্জাক। জেনারেল উবান বলেছেন, চার নেতা এসে তাঁর কাছে একটি সমস্যা তুলে ধরেন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে—মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং নিতে বিভিন্ন ধরনের যুবক আসছে। এর মধ্যে দুষ্কৃতকারীরা আছে, তেমন ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক কর্মীরাও আছে। চার নেতার মতে, এদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অস্ত্র হাতে দিলে এসব অস্ত্র পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে না বরং স্বাধীনতার পর নকশাল আন্দোলনের অনুরূপ কিছু করার জন্যে বাংলাদেশে লুকিয়ে রাখা হবে। তাঁরা আরো অভিযোগ করেন, মুক্তিবাহিনীতে কর্মরত বাংলাদেশের কিছু সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে সম্পর্কিত চীনাপন্থী কমিউনিস্ট নেতাদের নাম তাঁরা উল্লেখ করেন। এই নেতাদের মতে, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের, অনুমোদনক্রমে বিপুল সংখ্যক কমিউনিস্ট ক্যাডারকে রিক্রুট করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে অভিযোগ করেও ফলাফল কিছুই হয়নি বলে যুবকরা জানান। এই তরুণ নেতাদের মতে, এ কারণেই একটি নতুন বাহিনীর গঠন প্রয়োজন। যে বাহিনী এ সমস্যা মোকাবেলা করতে পারে। জেনারেল উবানের মতে, এই নেতারা ছিল সাহসী, বিচক্ষণ, দেশপ্রেমিক এবং শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠজন। এ নেতারা আরো অভিযোগ করেছিলেন, ভারতের অভিজাত হোটেলে ভারতের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের নকশালপন্থী নেতাদের গল্প-গুজব করতে দেখা যায়। যুব নেতাদের মতে, পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসন আমলে এরাই ছিল তাদের নিকৃষ্টতম শত্রু। তাদের সন্দেহ বাংলাদেশে শক্ত ভিত্তির ওপর একটি কমিউনিস্ট পার্টি দাঁড় করানোই ভারত সরকারের উদ্দেশ্য। তারা এ খবরও পেয়েছে, মওলানা ভাসানীর অনুসারীদের আলাদা প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দেয়া হচ্ছে। নেতাদের মতে,

www.nagorikpathagar.com

বাংলাদেশে সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্টদের উত্থান তারা মানতে পারে। কিন্তু চীনাপন্থী কমিউনিস্টরা কেন!

জেনারেল উবানের ভাষায়, এই নেতারা ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের চরম বিরোধী। তারা তাজউদ্দীনকে সহ্য করতে পারত না। তাদের অভিযোগ তাজউদ্দীন আহমেদ মিথ্যাচার করে ক্ষমতায় বসেছেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হবার কথা ছিল না। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল নজরুল ইসলামের। ভারতের বিভিন্ন মহলে এ খবর কারো অজানা ছিল না। কিন্তু ভারত সরকার ওই সময় তাজউদ্দীনকে পরিবর্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তারা মনে করত, এ ধরনের কোনো মতানৈক্য মুক্তিযুদ্ধে ফাটল ধরাবে। পাকিস্তান তার সুযোগ নেবে। আর এ পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের এ তরুণ নেতাদের পক্ষ থেকে একটি নতুন বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এ তরুণদের দাবি হচ্ছে এ বাহিনী হবে একান্তই স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং মুক্তিবাহিনীর বাইরে। এদের কর্মকাণ্ড বা গতিবিধি মুক্তিবাহিনী জানতে পারবে না।

কিন্তু এ ধরনের বাহিনী গঠনে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আদৌ একমত ছিলেন না। একমত ছিলেন না ভারতের সেনাপ্রধান মানেকশ। এ প্রস্তাবের চরম বিরোধিতা করেছেন জেনারেল আরোরা। তিনি ছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার এবং ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর প্রধান। সেনা কর্মকর্তাদের বক্তব্য ছিল যুদ্ধে দুই বাহিনী হতে পারে না। যে কোনো বাহিনী হোক না কেন সকল বাহিনীকেই একই কমান্ডের অধীনে থাকতে হবে। একই যুদ্ধে দুই কমান্ড থাকতে পারে না।

কিন্তু যুব নেতারা অনড়। শুধুমাত্র ভিন্নবাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে নয়, এ বাহিনীর নামকরণ সম্পর্কেও তাদের সুনির্দিষ্ট মতামত ছিল। সকল মহলের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তারা মুজিববাহিনী নামে একটি বাহিনী গঠনের প্রস্তাব দেন। এ বাহিনীর নামের ব্যাপারে জেনারেল উবানও আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু যুব নেতাদের বক্তব্য ছিল কারো কথায় কিছু আসে যায় না। এ বাহিনীর নাম মুজিববাহিনীই হবে এবং শেষ পর্যন্ত ৭১-এর যুদ্ধে মুজিববাহিনী একটি ভিন্ন বাহিনী হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

মুজিববাহিনীর ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে জেনারেল উবান তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন—শেখ ফজলুল হক মনি তার কাছে অভিযোগ করেছেন, তাজউদ্দিনের ইচ্ছা হচ্ছে ক্ষমতায় থেকে যাওয়া এবং একটি বামপন্থী বাহিনী গঠন করা। এমনকি শেখ ফজলুল হক মনি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের

www.nagorikpathagar.com

চত্বরে জেনারেল উবানকে মাথায় কালো কাপড় বাঁধা সশস্ত্র কমিউনিস্ট যুবকদের দেখান।

জেনারেল উবানের স্মৃতিচারণের এক জায়গায় বলা হয়, অস্ত্র সমর্পণের ব্যাপারে শ্রী ডিপি ধর এবং শেখ মনির মধ্যকার এক তপ্ত বাদানুবাদের সাক্ষী হই। মনি শ্রী ধরকে বলেন, তাঁরা অস্ত্র সমর্পণ করবেন না। প্রয়োজনে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হবেন। মনির সাহস ছিল প্রশংসনীয়। শ্রী ধর দৃশ্যত বিচলিত হলেন। মনি আমাকে পরে বলেন, তাঁর আগেকার পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করেছে, শ্রী ধর তার দেশের চরম শত্রু। এটা পরবর্তীকালে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের ওপর প্রতিক্রিয়া ফেলে। শেখ মুজিব ক্ষমতা দখলের পর তাঁর সরকারের কাছে ডিপি ধর অবাঞ্ছিত ব্যক্তিতে পরিণত হন।

জেনারেল উবানের এই তথ্য কতদূর সত্য সে কথা মুজিববাহিনীর নেতারাই বলতে পারেন। তবে সবকিছুর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় এই জেনারেল উবান কে? তাঁর স্মৃতিচারণে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনিই মুজিব বাহিনীর স্রষ্টা। সবকিছুই তাঁর একক কৃতিত্ব। সকলের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি চার যুবনেতার পরামর্শে মুজিববাহিনী গঠন করলেন কোন সাহসে? তিনি লিখেছেন তাজউদ্দীন ও কর্নেল ওসমানী এই বাহিনী গঠনের বিরুদ্ধে ছিলেন। জেনারেল মানেকশ, অরোরা এই বাহিনী গঠনের চরম বিরোধিতা করেছেন। তারপরেও জেনরেল উবান ওই বাহিনী গঠন করলেন কীভাবে! তার পেছনে কারা ছিল? তাহলে কি সেকালের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সমান্তরাল দু'টি স্রোত বা দু'টি কেন্দ্র ছিল? নইলে একই যুদ্ধে দুই নেতৃত্ব এবং দুই কেন্দ্র সৃষ্টি হলো কীভাবে? জানি না জেনারেল উবানের বইতে এর কোনো ব্যাখ্যা আছে কিনা। কারণ পুরো বইটা আমার পড়া হয়নি।

আমি আগেও লিখেছি, কলকাতায় থাকতে মুজিব বাহিনীর কথা শুনেছি। তাদের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আর মুজিব বাহিনী গঠনের পর প্রমাণ হয়েছে, ৭১-র সংগ্রামে আদৌ কোনো সাংগঠনিক বা মানসিক প্রস্তুতি কোনো মহলের ছিল না। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলের একই ধারণা। লজ্জাজনকভাবে তাই সঠিক নেতৃত্ব দেয়ার দাবিদার চার যুব নেতাকে ভারতে এক জেনারেলের কাছে গিয়ে হাত পাততে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে একটি বাহিনী গঠনের। অথচ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং প্রস্তুতি থাকলে বিদেশে গিয়ে উচ্চবৃত্তি করতে হতো না। দেশের স্বাধীনতা নয়, কমিউনিস্ট দমনের জন্যে এ ধরনের ন্যক্কারজনক উদ্যোগ নিতে হতো না। তাহলে কি এ সংগ্রাম ছিল কমিউনিস্টদের

www.nagorikpathagar.com

বিরুদ্ধেও। মুজিববাহিনীর জীবিত নেতারা এ প্রশ্নের জবাব দিলে খুশি হব।

তবে ১৯৭২ সালে বিস্তারিতভাবে অনেক কথাই জানতাম না। হঠাৎ একদিন রাজপথে ছাত্রলীগের মিছিলের একটি স্লোগান শুনলাম। স্লোগানটি হলো—'বিশ্বে এল নতুন বাদ, মুজিববাদ মুজিববাদ' এবং প্রথম আঘাত আমাদের ওপরই এল। বই খুঁজতে থাকলাম এ বাদ-এর আদিপর্ব জানার জন্যে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের সাথে আমাদের অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠল। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এককভাবে বিশেষ করে চটকল এলাকায় আমাদের আধিপত্য ছিল। আমাদের সংগঠিত সংগঠন ছিল পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন। ফেডারেশনের নেতৃত্বে ১৯৬৪ সালে সামরিক শাসনামলে পরপর তিনবার চটকল শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে। আমাদের সাফল্য অন্যান্য শিল্প এলাকায় আমাদের সংগঠনের বিস্তার ঘটায়। ঢাকা শহরের সমস্ত হোটেল শ্রমিক মোটামুটিভাবে আমাদের নেতৃত্বে আন্দোলন করত। এ পরিস্থিতি অনিবার্য কারণে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কাছে সহনীয় ছিল না। আমাদের দল শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল তখন গঠিত হয়নি। আমরা অর্থাৎ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল অর্থাৎ আরএসপি মনে করতাম—লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের নেতৃত্বে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলো ভুল পথ অনুসরণ করছে। কমিউনিস্ট পার্টির বিকল্প হিসেবেই আরএসপি গঠিত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর অকিাংশ আরএসপি কর্মী ও নেতা দেশান্তরী হয়। যারা পাকিস্তানে ছিলেন তাদেরও নির্যাতনের মুখে প্রকাশ্যে কাজ করা সম্ভব ছিল না। ষাটের দশকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে শ্রমিক এলাকায় কাজ শুরু করে এবং গঠন করে পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। কিন্তু তখনো আওয়ামী লীগের কোনো শ্রমিক সংগঠন ছিল না। আওয়ামী লীগের একটি অংশ (যারা পরবর্তীকালে জাসদ গঠন করে) তারা আমাদের সংগঠন দখলের প্রয়াস পায়। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমানের তরফ থেকে শিল্প এলাকায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রস্তাব দেয়া হয়। আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন নামে একটি নতুন শ্রমিক সংগঠন গঠন করি। অপরদিকে আওয়ামী লীগ গঠন করে জাতীয় শ্রমিক লীগ। আমাদের কিছু কিছু নেতা শ্রমিক লীগে চলে যায়। এ ঘটনা ঘটে ছ'দফা ভিত্তিক আন্দোলন শুরু হওয়ার পর। এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে ১৯৭১ সালের সংগ্রামের পূর্ব পর্যন্ত।

www.nagorikpathagar.com

৭১-এর সংগ্রামে পূর্বে আর একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটে। একটি মহল থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে হোটেল শাহবাগকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হবে। নাম হবে পোস্টগ্রাজুয়েট হাসপাতাল অর্থাৎ পিজি হাসপাতাল। হোটেল শাহবাগে শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এ সময় '৭১-এর সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। সাময়িককালের জন্যে হলেও হোটেল শ্রমিকদের আন্দোলন স্তিমিত হয়। তৎকালীন পিজি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ছিল জেনারেল টিক্কা খানের একান্ত বংশধর। আমাদের শ্রমিক নেতাদের কাছে গেলে তাদের জানানো হয় যে তোমরা প্রয়োজনে তোমাদের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান বা মাতা শ্রীমতি গান্ধীর কাছে যেতে পার। আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে না। হোটেল শাহবাগ হাসপাতালে পরিণত হবেই। এ পরিস্থিতিতে দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু লক্ষণীয় যে পিজি হাসপাতালের কর্মকর্তারা যেমন ছিলেন তেমনই থাকেন। তাঁরা পোশাক বদলে একেবারে বাঙালি হয়ে যান একটি কৌশল অবলম্বন করে। বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মেডিকেল চেকআপের নামে হাসপাতালে ভর্তি করান। তৎকালে চার খলিফা নামে পরিচিত আ স ম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, নূরে আলম সিদ্দিকী ও আব্দুল কুদ্দুস মাখনও মেডিকেল চেকআপের নামে পিজি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং তাঁরা সবাই শাহবাগ হোটেলকে পিজি হাসপাতালে পরিণত করার পক্ষে বিবৃতি দিতে থাকেন। এ পরিস্থিতিতে হোটেল শ্রমিকরা মিছিলের সিদ্ধান্ত নেয়। ওই মিছিল পিজি হাসপাতাল ও আজকের শেরাটন হোটেলের মাঝামাঝি পৌঁছলে শেরাটন হোটেল থেকে মিছিলে গুলি করা হয়। গুলিতে আহতদের সংখ্যা জানা গেলেও নিহতদের সংখ্যা কোনোদিন জানা যায়নি। তৎকালে নতুন প্রকাশিত দৈনিক গণবাংলায় বিস্তারিতভাবে হতাহতদের সংবাদ পরিবেশন করা হয়। মিছিলে গুলিবর্ষণ আমাদের হতচকিত করে দেয় এবং একই সময় অপর একটি ঘটনা ঘটে।

আমাদের সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন আদমজীর শ্রমিক নেতা মাওলানা সাইদুর রহমান। ঢাকায় শ্রমিক দফতরে যাওয়া পথে তাকে কিডন্যাপ করে আওয়ামী লীগ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে বাধ্য করা হয় সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন থেকে পদত্যাগ করতে। তিনি সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন থেকে পদত্যাগ করলে সাথে সাথে শ্রমিক লীগ সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। ওই সাথে শ্রমিক লীগের সভাপতি নোয়াখালীর নূরুল হক সাহেবও পদত্যাগ করেন।

www.nagorikpathagar.com

আমাদের তখন ছিল অবাক হওয়ার পালা। দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা গণতান্ত্রিক অধিকারই ফিরে পাব। সকলের আকাঙ্ক্ষা দেশে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। কিন্তু তার পরিবর্তে আমাদের সভাপতি কিডন্যাপ হয়ে গেল। পরবর্তীকালে একের পর এক আমাদের ইউনিয়নগুলো হাইজ্যাক করা হতে লাগল। এক সময় নরসিংদী, কাঞ্চন, ঘোড়াশাল, মুড়াপাড়া, আদমজী, মদনগঞ্জ এলাকার সকল চটকলের শ্রমিক ইউনিয়ন আমাদের দখলে ছিল। কিন্তু একের পর এক সবই হাতছাড়া হতে থাকল। শ্রমিক ইউনিয়ন করা দুঃসাধ্য হয়ে গেল।

এমন সময় আঘাত আসল ভিন্নদিক থেকে। আমাদের নেতা রুহুল আমিন কায়সার এবং সিদ্দিকুর রহমান রায়েরবাজার এলাকায় থাকতেন। ওই এলাকার বিভিন্ন শিল্পকারখানায় আমাদের ইউনিয়ন ছিল। আমাদের ইউনিয়ন ছিল একটি ওষুধ শিল্প কারখানায়। এ কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের বিরোধ চলছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকে। মনে হলো মালিক দীর্ঘদিন থেকে আমাদের ঘায়েল করার পাঁয়তারা করছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীকালে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী সন্ধ্যা রাতে রুহুল আমিন কায়সারের বাড়িতে হামলা চালাল। তিনি বাসায় ছিলেন না। তাঁকে বাসায় না পেয়ে তাঁর কমরেড সিদ্দিকুর রহমানের বাসায় যান এবং তাকে গুলিবিদ্ধ করেন। অনেক কষ্টে সিদ্দিকুর রহমান বেঁচে যান। এখনো সেই সন্ত্রাসীর গুলি তাঁর শরীরে। সেদিন আমরা কোনো থানারই সহযোগিতা পাইনি।

দলের এ অবস্থায় সাংবাদিক ইউনিয়ন নিয়ে আমার সাথেও সরকারের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ সময় শেখ সাহেব কলকাতায় গিয়েছিলেন কলকাতায় তাকে বিরাট সংবর্ধনা দেয়া হয়। কলকাতার জনসভার ভাষণে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি ঘোষণা করেন। এ চারনীতি হচ্ছে—জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। তাঁর এ ঘোষণার পূর্বে দেশবাসী তিনটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির কথাই জানত। সে তিনটি মূলনীতি ছিল গণতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। শেখ সাহেবের এ ঘোষণার পর আমি এক জনসভায় ভিন্ন মন্তব্য করি। আমার বক্তব্য ছিল—ভাঙা বাংলার কোনো জাতীয়তাবাদ হয় না। জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হলে তার প্রভাব হতে পারে সুদূরপ্রসারী। উপমহাদেশে কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় বাঙালি জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সুতরাং বাঙালি জাতীয়তাবাদ এদের বাদ দিয়ে হতে পারে না। তবে কথাবার্তা, আচার আচরণ, সভ্যতা সংস্কৃতিতে এবং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে

www.nagorikpathagar.com

আমরা বাঙালি। সে প্রশ্নে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তাই জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি খুব সতর্কভাবেই বিবেচনা করতে হবে। নইলে ষড়যন্ত্রকারীরা এদের খতম করতে পারে।

আমার বক্তৃতা পড়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে ডেকে পাঠালেন। দীর্ঘক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ হলো। শুধু বলতে পারি যে গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি আমার কথা শুনছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এই একটি মানুষের আমলেই লিখে বা কথা বলে সাড়া পাওয়া যেত। পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের লেখা বা বক্তব্য মনে হয় তিনি খুটে খুটে পড়তেন। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে আমার প্রতিটি লেখা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল। সে লেখার ভিত্তিতে নির্দেশ গিয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একথা ঠিক, তাঁর আমলে শেষের দিকে তিনিই নির্দেশ দিয়ে আমার লেখা বন্ধ করেছিলেন। তবুও বলব তাঁর আমলে লেখায় সুখ ছিল। লিখলে ফল হতো। তারপর অনেকেই ক্ষমতায় এসেছেন। আজকেও ক্ষমতায় আছেন। আমার মনে হয় কেউ যেন আর আমাদের লেখা বিশ্বাস করতে চান না। একটা অবিশ্বাস নিয়ে আমাদের লেখা পড়তে শুরু করেন অথবা আদৌ পড়েন না। তাই আজ লক্ষ করা যায় সাংবাদিকদের লেখার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করে সাংবাদিকদের বক্তব্য সঠিক নয় বলে প্রমাণ করার চেষ্টাও এখন মুখ্য।

তবে আমি বলব না, সাংবাদিক মাত্রেই সৎ বা সত্যনিষ্ঠ। আমি বলব না সকল খবরই সত্য বা তথ্যভিত্তিক। সমাজের আর পাঁচটি পেশার মতো আমাদের পেশায়ও দুর্নীতি ঢুকেছে। আমরা নিশ্চয় নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা নই। কিন্তু আমাদের লেখা অসত্য বা শুধুমাত্র মিথ্যাচার বলে উড়িয়ে দিলে কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না। আমার জীবনে ওই একটি মানুষের কালেই একটি ভরসা অন্তত ছিল যে কোনো কিছু লিখলে তা তাঁর চোখে পড়বে। তিনি পড়বেন এবং এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত দেবেন। আমার এ ধারণার একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট আছে। সে প্রেক্ষাপটের কথা পরে বলব।

১৯৭২ সালে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ—এ তিন মাসেই যেন সমস্ত পরিস্থিতি আমার কাছে ঘোলাটে হয়ে উঠল। নিজের মনে প্রশ্ন দেখা দিল—এ কোন স্বাধীনতা। সেকালের কতগুলো তারিখ আজো আমার মনে জ্বলজ্বল করছে। সে তারিখ হচ্ছে—৮ জানুয়ারি, ১০ জানুয়ারি, ১২ জানুয়ারি, ১৭ মার্চ, ১৯ মার্চ ও ২৬ মার্চ।

www.nagorikpathagar.com

৮ জানুয়ারি বেতারে শুনলাম—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়েছেন। সে দিন ঢাকার আকাশে-বাতাসে রাজপথে এক অকৃত্রিম উল্লাস দেখলাম। রাজধানী ঢাকা এসএলআর, স্টেনগান এবং বন্দুকের গুলিতে কাঁপছে। গুলিতে গুলিতে আকাশ প্রকম্পিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। ১০ জানুয়ারি শেখ সাহেব ঢাকায় পৌছালেন। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে ঢাকা রেসকোর্স (আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে পৌছাতে তার সময় লেগেছিল দু'ঘন্টার বেশি। সেদিন বোকার মতো ভেবেছিলাম উচ্ছ্বাসের এ অভিব্যক্তি ৯ মাস যুদ্ধকালের অনেক বিভ্রান্তির অবসান ঘটাবে। বিভ্রান্তি সরকারি দল এবং ভারতকে নিয়ে।

১২ জানুয়ারি শেখ সাহেব প্রধানমন্ত্রী হলেন। তাজউদ্দিন আহমেদ সরে গেলেন। প্রেসিডেন্ট হলেন আবু সাঈদ চৌধুরী। সকলেই ভাবল এটা অনিবার্য ছিল। ঠুঁটো জগন্নাথ প্রেসিডেন্ট হয়ে ক্ষমতায় থাকার লোক শেখ মুজিবুর রহমান নন। সে ক্ষেত্রে সংঘর্ষ অনিবার্য। এ সংঘর্ষ এড়াতেই নাকি তাজউদ্দিন আহমেদ সরে গিয়েছিলেন। আবার অনেকের কথা হচ্ছে—তাজউদ্দিন আহমদের প্রধানমন্ত্রী থাকার কোনো উপায় ছিল না। অপর একটি মহলের মতে, শেখ সাহেব জাতির পিতা হিসেবে প্রেসিডেন্ট থাকলে ভালো করতেন। তিনি সবাইকে শাসন করতে পারতেন। কিন্তু নিজে শাসনকর্তা হয়ে অন্যকে শাসন করা যায় না। তাতে সংশয় এবং ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

আর আমার মনে হলো ভিন্ন কথা। কথাটি হচ্ছে—বাংলাদেশের চলার পথ সংকটপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। আমাদের সংগ্রাম পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্র সাধারণভাবে সমর্থন করেনি। আমাদের চাওয়া-পাওয়া এবং আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্যে পৃথিবীর কোনো সরকারই আমাদের বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির মুক্তি আন্দোলনে নির্ভেজাল সাহায্য দেয়নি। দেয়ার কথাও নয়। সব দলের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থ থাকে।

আর কিছুদিন যেতেই আমার মনে হলো স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের সমাজ জীবনে বিভাজন বড্ড গভীর। আমাদের স্বাধীনতা চাওয়া সকলের কাছে নির্ভেজাল ছিল না। তেইশ বছর আমরা পাকিস্তানে ছিলাম। পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে হাজার মাইল ব্যবধান থাকলেও একটি সংযোগসূত্রও ছিল। তেইশ বছরের জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্য আত্মীয় এবং চাকরির সুবাদে অনেক নৈকট্য গড়ে উঠেছিল। সে নৈকট্য বিশেষ করে ছিল উপরের মহলে। আমরা বঞ্চিত বলে আমাদের ক্ষোভ ছিল। আমাদের মতোই বঞ্চিত ছিল সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানের লোক। আমরা বামপন্থীরা একথাগুলো সামনে

www.nagorikpathagar.com

এনেছি। আমরা কখনো বলিনি—পাকিস্তানের কোনো একটি অঙ্গ স্বাধীন হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। আমার অভিজ্ঞতা বলে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পর্যন্ত আমরা বড্ড বেশি পাকিস্তানি ছিলাম। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আমাদের শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন। সাহিত্যিকেরা গল্প লিখেছেন। কবিরা কবিতা লিখেছেন। প্রতিদিন রচিত নতুন নতুন গান বেতারে পরিবেশিত হয়েছে। আমি নিজে অনুভব করেছি আমার অকৃত্রিম অনুগত ছাত্রটি পর্যন্ত ১৯৬৫ সালের ওইদিনগুলোতে আমাকেও বিশ্বাস করেনি। জাত-পাতের ভিত্তিতে আমাকে ভারতীয় চরই ভেবেছে। আমার সেই ছাত্ররা নির্বিঘ্নে আমাকে একথা বলেছে। আমি দুঃখ পাইনি। কারণ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তানের এটাই উত্তরাধিকার। আমার একান্ত অনুগত ছাত্রটি হঠাৎ করে এ ধরনের চিন্তার অধিকারী হয়নি। সে তার পরিবারের সূত্রে এ চিন্তার অধিকারী হয়েছে। মানুষকে চিনেছে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে।

লক্ষণীয় যে, আজকে যারা ১৯৪৮ বা ১৯৫২ সালে স্বাধীনতা বাংলা গঠনের স্বপ্নের কথা বলেন, তাদের এ স্বপ্নের স্বাক্ষর কিন্তু সাহিত্যের পাতায় নেই। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে আমাদের আজকের বাঘা বাঘা কবি সাহিত্যিক এবং গল্পকাররা ১৯৬৫ সালের পূর্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়—এ লক্ষ্য নিয়ে কোনো সাহিত্য রচনা করেননি। আমাদের প্রথম সারির আজকের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে লেখকের মধ্যে অনেকেই সেদিন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। ১৪ আগস্ট উপলক্ষে রচনা লিখেছেন। আদমজী ও দাউদ পুরস্কার পাবার জন্যে আকাশ-পাতাল তদ্বির করেছেন। আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে পুস্তক রচনা করেছেন। কেউ আবার আইয়ুব খানের 'প্রভু নয় ভৃত্য' এ বইয়ের অনুবাদ করে সরকারের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেছেন।

অর্থাৎ খুব স্পষ্ট করে বলা যায়—আমাদের ষাটের দশকের সাহিত্যেও আমাদের স্বাধীনতার তেমন ছাপ নেই। এখানটায়ই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে ৭১-এর সংগ্রামের মৌলিক পার্থক্য। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের একটি দীর্ঘ সাহিত্য ছিল। সে সাহিত্য প্রেরণা যুগিয়েছে। একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে। সাহিত্যের এ ইতিহাসটি কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেই। অনেক হয়তো বলবে—১৯৫২ সালের পর থেকে আমাদের সাহিত্যের একটি অংশ বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ভূমিকা আছে। আমাদের সাহিত্যে বাঙালি আকাঙক্ষা বাস্তবায়নের একটি জোরালো দাবি আছে। আর আমার অভিজ্ঞতা

www.nagorikpathagar.com

হচ্ছে—সে সাহিত্যে স্বাধীনতার প্রশ্নটি আদৌ সোচ্চার ছিল না। সোচ্চার থাকলে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের নামে আমরা একটি আন্তর্জাতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সাহিত্য রচনা করতাম না।

তবে এ কথা ঠিক, ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর একটি নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ যুদ্ধে প্রমাণিত হয় যে—পাকিস্তানের অঙ্গ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত। আমরা আক্রান্ত হলে আমাদেরই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেউ আমাদের রক্ষা করতে আসবে না এবং আমাদের রক্ষা করতে গেলে আমাদের নিজস্ব শক্তি থাকতে হবে। এ নিজস্ব শক্তির জন্যে চাই স্বাধীনতা। এ প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। আমাদের সামরিক বাহিনী এবং আমলাদের একটি অংশ আগরতলা ষড়যন্ত্র বলে কথিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন। অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে—সাহিত্যে কবিতায় প্রবন্ধে জীবনাচরণে বা আকাঙ্ক্ষায় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বা মুক্তিযুদ্ধের চিত্র ফুটে ওঠে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর। তারপর মাত্র ছ'টি বছর। এ ছ'টি বছরে একটি জাতিকে একটি দেশের স্বাধীনতার জন্যে সামগ্রিকভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। এছাড়া এ প্রশ্নের কোনো সহজ প্রকাশ ছিল না। বাস্তব কারণে ছয় দফার নেতারা ছয় দফাকে স্বাধীনতার দলিল বলে ব্যাখ্যা করতে রাজি ছিলেন না। ছয় দফা সম্পর্কে আজকে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে কথিত শিবিরেও বিভ্রান্তি এবং মতানৈক্য কম ছিল না। ছয় দফা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই ছ'দফার সম্প্রসারিত রূপ হয় এগারো দফা। একটি বিরাট সংগ্রামের প্রস্তুতি না নিয়েই ছয় দফা ও এগারো দফাকে সামনে নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। প্রতিপক্ষ পাকিস্তান সরকার বারবারই বলেছে—ছ'দফা বিচ্ছিন্নতার দলিল। এরা দেশদ্রোহী। এরা পাকিস্তান ভাঙতে চায়। এরা বাংলাদেশ স্বাধীন করতে চায়। অপরদিকে, একমাত্র ছাত্রলীগের একটি অংশ এবং বিচ্ছিন্নভাবে কতিপয় বামপন্থী গ্রুপ অবিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলতে থাকে।

কিন্তু তাও প্রকাশ্যে নয়। এরপরে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের পর পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে সংশয় আরো গভীর করে তোলে। সাধারণ গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষের কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছাড়াই একটি ভয়াবহ সংঘর্ষের দিকে দেশ এগিয়ে যায়। এ বিভ্রান্তি এবং সংশয়ের জন্যেই ৭১-এর সংগ্রামের নাম স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, হিড়িকের বছর বা

www.nagorikpathagar.com

গণ্ডগোলের বছর। কোনো কারণ না থাকলে কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এমন নাম বিভ্রাট হয় না।

এ বিভ্রান্তির কারণ খুঁজতে গিয়ে ৭১ এবং ৭২ এ দু'টি পরস্পরবিরোধী চিত্র আমাদের পীড়িত করেছে। ভয় পেয়েছি স্বাধীনতাযুদ্ধের পরে। আমি লক্ষ্য করেছি কেউ সঠিকভাবে সব কিছু বুঝে-শুনে এ যুদ্ধ সমর্থন করছে না। তাদের সমর্থন সাময়িক, স্বতঃস্ফূর্ত এবং আবেগের। অপরপক্ষে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি অত্যন্ত সচেতন, ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের এ অবিচল শক্তি থেকে তারা খুব সচেতনভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে। অন্যদিকে, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দেখেছি অসম্ভব বিভ্রান্তি।

১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে আগস্টের মধ্যে আমি পাঁচবার ঢাকা শহরে ঢুকেছি। মাঝখানে প্রতিটি এলাকায় একই কথা শুনেছি। সকলেররই এক প্রশ্ন 'ভারতীয় বাহিনী কবে আসবে? ইন্দিরা গান্ধী কবে সৈন্য পাঠাবেন। ইন্দিরা গান্ধী সৈন্য পাঠাচ্ছেন না কেন? তিনি কি আমাদের মেরে ফেলতে চান?'

ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার এমএলএদের হোস্টেলে দেখা হয়েছিল আমাদের একজন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যের সঙ্গে। আমার ছাত্রলীগের বন্ধুর নাম আব্দুল আউয়াল। চাঁদপুরের কচুয়া থেকে পরিষদ সদস্য। আউয়াল জন্ডিসে ভুগছিল। আমাকে দেখে কেঁদে ফেলল। বলল, 'নির্মল, শ্রীমতী গান্ধী আমাদের মেরে ফেলবেন। তিনি কি পাকিস্তান আক্রমণ করবেন না?' আমি আউয়ালের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের কথা। মনে হয় সে প্রেক্ষাপটেই ত্রিপুরার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকলে বাঙালিরা ক্ষুব্ধ হবে না তো? কী প্রতিক্রিয়া হবে সে কথা কি আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন?

আমি তাঁর এ প্রশ্নের জবাব দিতে সময় নিয়েছিলাম। বলেছিলাম—এ মুহূর্তে বাংলাদেশের মানুষ ভারতীয় বাহিনীকে বুকে টেনে নেবে। ভবিষ্যতে কী হবে তা আমি জানি না। তবে সেদিন যে প্রশ্নের আম জবাব দিতে পারিনি সে প্রশ্নের জবাব দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের মাটিতে পা ফেলেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ন'মাসের সংগ্রামে দীর্ঘদিনের ক্লেদ, সংশয় এবং ভয় দূর করা আদৌ সম্ভব নয়। ঢাকায় ফিরে যে কথাগুলো প্রথম শুনলাম তার মর্মার্থ হচ্ছে—চরম ভারত বিরোধিতা। কোনো কৃতজ্ঞতা নয়। কোনো মুক্তিযুদ্ধের গল্প নয়। সর্বত্রই শুধু লুটপাটের কাহিনী। একদিকে লুটপাটকারী মুক্তিবাহিনী। সে পরিপ্রেক্ষিতেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ১৭ মার্চ।

www.nagorikpathagar.com

১৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে আসেন। আর ২৬ মার্চ দেশের কলকারখানা রাষ্ট্রায়াত্ত করা হয়।

১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঢাকা সফরে আসেন। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখ লাখ লোক তাঁকে সংবর্ধনা জানায়। ১৯ মার্চ ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদী বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি নিয়ে পরবর্তীকালে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বেই ভারত বিরোধী মানসিকতা দানা বাঁধতে থাকে। সর্বত্রই আলোচিত হতে থাকে, ১৯ মার্চের পূর্বেও জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ ভারত সরকারের সঙ্গে সাত দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। ২৫ বছরের চুক্তি তারই বর্ধিত রূপ।

জনাব অলি আহাদ তাঁর 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৫' নামক গ্রন্থের ৪৪০ পাতায় জনাব তাজউদ্দিনের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির বিবরণ দিয়েছেন। সে চুক্তি হচ্ছে নিম্নরূপ—

১. ভারতীয় সমরবিদদের তত্ত্বাবধানে আধা সামরিক বাহিনী গঠন করা হবে। গুরুত্বের দিক থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং সংখ্যায় বাংলাদেশের মূল সামরিক বাহিনী থেকে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ হবে।
২. ভারত থেকে সমর উপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র কিনতে হবে। এ ব্যাপারে ভারতীয় সব বিশারদদের পরামর্শ নিতে হবে।
৩. ভারতের পরামর্শেই বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে।
৪. বাংলাদেশের বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ভারতের পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
৫. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অনুরূপ হতে হবে।
৬. ভারত-বাংলাদেশ চুক্তিগুলো ভারতীয় সম্মতি ব্যতীত বাতিল করা যাবে না।
৭. ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত যে কোনো সময় যে কোনো সংখ্যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে এবং বাধাদানকারী শক্তিকে চুরমার করে অগ্রসর হতে পারবে।

জনাব অলি আহমেদের পুস্তকে উল্লিখিত ৭ দফা চুক্তি সম্পর্কে প্রকাশ্যে তেমন কোনো বিতর্ক হয়নি। একটি মহল হতে প্রথম থেকেই এমন একটি চুক্তির কথা বলা হচ্ছিল। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে কোনো

www.nagorikpathagar.com

উচ্চবাচ্য করেননি। অপরদিকে সেকালের বিরোধী দলগুলো এ চুক্তির কথা উল্লেখ করলেও প্রকাশ্যে লিখিতভাবে এ চুক্তির কথা কেউ বলেনি। তবে প্রচারণার ফলে একটি বিশ্বাস জন্মেছিল, এমন একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও হতে পারে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী মহল এ চুক্তির প্রশ্নে সংশয় সৃষ্টির প্রয়াস পায়। বলা হতে থাকে, তাজউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এ সময় বাংলাদেশ সরকারের আর একটি ঘোষণা জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

পাকিস্তান আমলে ভারতের তুলনায় আমাদের মুদ্রার মূল্য বেশি ছিল। ৭১-এর যুদ্ধের সময় আমরা কলকাতায় ১০০ টাকা নিয়ে গেলে ১৩০ টাকা পেতাম। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে দু'দেশের মুদ্রার মান সমান বলে ঘোষণা করা হয়। কোন প্রেক্ষিতে এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল সাধারণ মানুষ তা জানতে চায়। অর্থনীতির সাধারণ নিয়মেই আমাদের মুদ্রার মান হ্রাস হওয়ায়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলাম। এ ঘটনা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল। আর এ পটভূমিতেই ১৯ মার্চ ২৫ বছর মেয়াদী ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, ফলে জনমনে সংশয় এবং বিভ্রান্তি আরো গভীর হয়।

কিন্তু এ চুক্তি কেন করা হয়েছিল? মজার কথা হচ্ছে, কেউ চাক বা না চাক ১৯৭২ সাল থেকে ২৫ বছর অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের ১৮ মার্চ পর্যন্ত চুক্তি বহাল ছিল। চুক্তির বিরুদ্ধে জিয়াউর রহমান থেকে বেগম জিয়া পর্যন্ত সকলেই কথা বলেছেন। ক্ষমতার বাইরে থাকতে সকলেই এ চুক্তি বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে কেউ এ চুক্তি বাতিল করেননি। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে বড় দু'টি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি খুব জোরেশোরে এ চুক্তি নবায়ন না করার ঘোষণা দিয়ে হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। কারণ সকলেরই জানা ছিল ১৯৯৭ সালের ১৮ মার্চ এ চুক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটবে। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে এ চুক্তি নবায়নের কোনো অবকাশ নেই। চুক্তি নবায়ন না করার প্রতিশ্রুতি এক ধরনের শূন্য কুম্ভের ঢক্কা নিনাদের মতোই মনে হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ওই ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তিতে কী ছিল। কেন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং কেনই বা আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ প্রতিটি দল এ চুক্তির বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিতে বাতিল করতে পারেনি। তাহলে কি সকলেই ভারতের ভয়ে ভীত ছিল। জিয়াউর রহমান থেকে শুরু করে বেগম জিয়া পর্যন্ত কেউ এ চুক্তি বাতিল করলেন না কেন? আজও তাঁরা এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি।

www.nagorikpathagar.com

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল প্রথম দিকে এ চুক্তিটি পড়বার। এ চুক্তিটি বাংলায় অনুবাদ হওয়ার পূর্বে আমার হাতে পড়েছিল। আমি লক্ষ করেছিলাম চুক্তিটি যেন ৭১-এর যুদ্ধের সময় ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত ২৫ বছরের চুক্তির কার্বন কপি। ভারতের এককালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেএন দীক্ষিত বলেছেন, বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগেই এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। জেএন দীক্ষিত ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার ছিলেন। তিনি একাধিকবার বলেছেন, চুক্তি ভারত চাপিয়ে দেয়নি। বাংলাদেশের অনুরোধে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। দীক্ষিতের এ মন্তব্য সম্পর্কে সরকারিভাবে আওয়ামী লীগ মহল থেকে কোনো উচ্চবাচ্য করা হয়নি। তবে বলা হয়েছে, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার এ ধরনের চুক্তির উদ্যোগ নিয়েছিল। কারণ তখনো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বন্ধুর সংখ্যা তেমন ছিল না। গণচীন এবং মুসলিম বিশ্ব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। চীনের ভেটোর ফলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ পায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয় মেনে নিতে পারেনি। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব বিশেষ করে কিউবার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষুব্ধ করেছে। এ পরিস্থিতিতে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার ভারতের সাথে ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি করার উদ্যোগ নেয়।

তবে একথা সত্য, আজকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একথা বলা হলেও বাংলাদেশ-ভারত চুক্তির স্বপক্ষে আওয়ামী লীগ কোনোদিনই জোরালো যুক্তি দিতে পারেনি। তাদের এই অক্ষমতা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে নিয়ে সংশয় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। প্রতিপক্ষ প্রচার করেছে, সব কিছুই ভারত চাপিয়ে দিয়েছে। আমার মনে হয়েছে প্রথম থেকেই তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিপক্ষের শক্তি খাটো করে দেখতে চেষ্টা করেছেন। কেউই বুঝতে চেষ্টা করেননি, ৭১ সালেও বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে মতানৈক্য ছিল। এক ভাই স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করেছে, আর এক ভাই রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা কম ছিল না। আর আমাদের এক শ্রেণির নেতা ব্যক্তিস্বার্থে প্রথম থেকেই এই রাজাকারদের আশ্রয় এবং প্রশ্রয় দিয়েছেন। ফলে প্রথম থেকেই ভারত বিরোধী প্রচারণা হালে পানি পেয়েছে। কেউই বুঝতে চাননি, সেকালের ভারত বিরোধী মুখ্যত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী ছিল এবং এ পরিস্থিতিতে বুঝবার অক্ষমতার জন্যে সেকালের একটি ঘটনা আজো স্বাধীনতার চেতনার দাবিদার একটি মহল গর্বভরে উচ্চারণ করে।

www.nagorikpathagar.com

ঘটনাটি হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যাহার। একটি কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে এলে প্রথমে সবাই খুশি হলেও পরবর্তীকালে কী ঘটবে তা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। কারণ প্রথম থেকে আমার সন্দেহ ছিল, যুদ্ধের কারণে আমরা ভারতীয় অনুরাগী হলেও ঐতিহ্য এবং ১৯৪৭ সালের উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা ভারত বিরোধী। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ৭১ সাল পর্যন্ত ২৩ বছর আমাদের বোঝানো এবং শেখানো হয়েছে, আমাদের দুঃখ-কষ্ট এবং দারিদ্র্যের জন্যে দায়ী হিন্দুরা এবং হিন্দুস্তান অর্থাৎ ভারত।

ন'মাসের স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের সে চিন্তা ও চেতনা মুছে ফেলতে পারার কথা নয়। ফলে ভারত এবং ভারতীয় বাহিনী তাদের আচরণে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলে আমরা রাতারাতি ভারত বিরোধী হয়ে যাই। ভারতীয় বাহিনী আমাদের মুক্তিদাতা বাহিনী না হয়ে দখলদার বাহিনী হয়ে যাবে এবং দেশের মানুষ এ বাহিনীকে সহ্য করবে না। দীর্ঘদিন ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে অবস্থান করলে স্বাধীনতার বিরোধীতা এ বাহিনীকে দখলদার বাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পাবে এবং সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করবে।

আর কেউ বুঝতে না পারলেও এই অপ্রিয় সত্যটি প্রথমে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাই পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন থেকে ফেরার পথে নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধীর সামনে ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশে অবস্থান সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ সাহেব বলেছিলেন, বাংলাদেশ চাইলেই ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে চলে যাবে।

একথা বলে শেখ সাহেব জিজ্ঞাসু চোখে শ্রীমতি গান্ধীর দিকে তাকিয়েছিলেন। শ্রীমতি গান্ধী উচ্চবাচ্য করেননি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহার করায় মানুষ ভাবতে থাকে শেখ মুজিব বাপের বেটার মতো কথা বলেছেন। তাঁর এক ধমকেই ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের এ মন্তব্য তখন আমার কাছেও খারাপ লাগেনি। কিন্তু সাথে সাথে নিজের মনেই প্রশ্ন জেগেছে—ভারতীয় বাহিনী নিয়ে এ মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে কেন? তাহলে কি ভারতীয় বাহিনীকে আমরা দখলদার বাহিনী হিসেবেই দেখেছি। নইলে শেখ মুজিবের ধমকে তাদের যেতে হয় কেন? তারা কেন সাধারণভাবে তাদের দায়িত্ব শেষ করে? তাহলে কি তখনই আমাদের ধারণা ছিল, ভারতীয় বাহিনী দখলদার বাহিনী হিসেবে থেকে যাবার

www.nagorikpathagar.com

চেষ্টা করতে পারে? নইলে স্বাধীনতার দু'মাসের মধ্যেই আমরা এমনভাবে ভাবতে শুরু করলাম কেন?

এ সময় সকলের অলক্ষ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। তৎকালীন বাংলাদেশে অধিকাংশ কলকারখানার মালিক ছিল অবাঙালি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা দেশ ত্যাগ করে। সমস্যা দেখা দেয় তাদের ফেলে যাওয়া ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সম্পত্তি নিয়ে।

ইতোমধ্যে একটি চক্র এই সম্পত্তি গ্রাস করতে চেষ্টা করে। অবাঙালিদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ও দোকানের বাঙালি কর্মচারিরা রাতারাতি সকল কিছুর মালিক হয়ে যায়।

সে ছিল এক লজ্জাজনক পরিস্থিতি। কিছুদিন পরে দেখা গেল ঢাকা শহরে সমস্ত অবাঙালিদের ব্যবসা আবার চালু হয়েছে। মালিক হয়ে বসেছে বাঙালিরা। এমনকি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অবাঙালিদের ফেলে যাওয়া ভবনে দলীয় অফিস স্থানান্তর করেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, টঙ্গী, খুলনা শিল্প এলাকায় অবাঙালিদের ছোটখাটো কারখানা দখল করেছে বাঙালিরা। রাজধানী ঢাকায় রাতের অন্ধকারে এক শ্রেণির বাঙালি তাদের ভবন ও সহায়-সম্পত্তির মালিক হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ লুটপাটের নেতৃত্ব দিয়েছিল এক শ্রেণির তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা। এদের বলা হতো ষোড়শ বাহিনী। প্রকৃতপক্ষে এরা মুক্তিযোদ্ধা ছিল না। অনেকে একাত্তরে যুদ্ধের সময় পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগিতা করেছে। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা বোল পাল্টিয়েছে। বন্দুক কাঁধে নিয়ে পরের সম্পত্তি দখলে নেমেছে। আমি আগেই বলেছি স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই এই যুদ্ধে নেমেছিলেন। তাঁদের চোখের সামনে কোনো সামগ্রিক চিত্র ছিল না। তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেননি, একটি অসংগঠিত রাজনৈতিক প্রশিক্ষণহীন বাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধ করলে তার ফলাফল কী হতে পারে। তাদের চোখের সামনে বাংলাদেশকে স্বাধীন করা ছাড়া কোনো আদর্শ ছিল না। যুদ্ধের পর তারা দেশে ফিরে দেখেছে তাদের যুদ্ধকালীন নেতারা প্রতিপক্ষের গাড়ি-বাড়িসহ সবকিছুই দখল করেছে। ফলে তারাও নির্দ্বিধায় তাদের নেতাদের অনুসরণ করেছে এবং এমনি করে বেদখল হয়েছে অবাঙালিদের সকল সহায় সম্পত্তি। আমি হলফ করে বলতে পারি বাংলাদেশের নব্য পুঁজিপতিদের প্রাথমিক মূলধন এসেছে এই লুটপাট থেকে। এখনো নিরপেক্ষ জরিপ হলে দেখা যাবে, আমাদের অধিকাংশ কোটিপতিদের এই ধনসম্পদের মালিক হওয়ার উৎস সেকালের লুণ্ঠন। হিন্দু আর অবাঙালিদের সম্পত্তি।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু এই লুটপাটেরও একটা সীমা ছিল। এ লুটপাটকারীরা অবাঙালিদের ছোটখাটো শিল্প কারখানা বাড়ি গাড়ি জবর-দখল করলেও বড় বড় শিল্প কলকারখানায় স্বাভাবিক কারণে তারা হস্তক্ষেপ করেনি। কারণ এই কারখানাগুলো দখল করা গেলেও এই কারখানা চালাবার শক্তি বা সামর্থ্য তাদের ছিল না। এই বড় কারখানার মধ্যে ছিল পাটকল ও বস্ত্রকল। এই পাটকল ও বস্ত্রকলের মালিক ছিল আদমজী, বাওয়ানী ও ইস্পাহানী গোষ্ঠী। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখা গেল এই কারখানার মালিক দেশান্তরী হওয়ায় এগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ সকল কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়নগুলো খবরদারি করার চেষ্টা করলেও তাদের পক্ষে কারখানা সচল রাখা সম্ভব ছিল না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়—পরিত্যক্ত কারখানা সম্বন্ধে। ইতোমধ্যে এই কারখানা সম্বন্ধে বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন সুপারিশ করা হচ্ছিলো। অনেক মহল থেকে বলা হলো—বাংলাদেশের অন্যতম রাষ্ট্রনীতি সমাজতন্ত্র। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা থেকেই এই শিল্প কারখানাগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করা হোক। কোনো ব্যক্তি মালিককে এই কারখানা দেয়া সঠিক হবে না। শুধু পাটকল, বস্ত্রকল নয়, এ সমস্যা দেখা দিলো ব্যাংক ও বীমা নিয়ে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ পাটকল, বস্ত্রকল এবং ব্যাংক, বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করার ঘোষণা দেয়া হলো। বাঙালি ও অবাঙালি মালিকদের চা বাগানও রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলো। রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলো না বিদেশি মালিকদের ব্যাংক, বীমা ও চা বাগান।

আমাদের আওয়ামী লীগের বন্ধুরা চিৎকার শুরু করল। দেশে সমাজতন্ত্র এসে যাচ্ছে এবং সেই লক্ষ্যে সমস্ত শিল্প কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হচ্ছে। আমাদের দল অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল থেকে বলা হলো এটা পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমাজতন্ত্র (Abandoned Properties Socialism) অর্থাৎ আমরা বলতে চেয়েছি প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ কোনো সমাজতন্ত্রের দল নয়। আবার কোনো দেশে সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই দেশটি সমাজতন্ত্রী হয় না। ব্রিটেনের শ্রমিক দল ক্ষমতায় এসে মূল ও ভারি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করে। তার ফলে কোনোদিনই ব্রিটেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়নি। শ্রমিক দলের পরে রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় এসে আবার এই সম্পত্তি বেসরকারি খাতে দিয়ে দেয়। ফলে ব্রিটেনের সমাজে কোনো মৌলিক রূপান্তর হয় না। সমাজতন্ত্র একটি আদর্শগত বিশ্বাস। আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হয় একটি রাষ্ট্র। ওই আদর্শে বিশ্বাস না থাকলে সমাজতন্ত্রের ভিত রচনা করা যায় না। অথচ সমাজতন্ত্রের বিশ্বাস থেকে নয়, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ সরকারকে

www.nagorikpathagar.com

অনেক সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হয়েছিল। এই সম্পত্তির আবার তিনটি ভাগ ছিল।

১. পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি, ২. পাকিস্তানের বাঙালি দালালদের সম্পত্তি, ৩. রুগ্ন শিল্প কারখানা। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে এই তিন ধরনের শিল্প মালিকানা সরকারকে নিতে হয়। এতে সমাজতন্ত্রের নাম গন্ধ ছিল না।

তবে এই শিল্প কারখানাগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করার সময় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। প্রশ্ন দেখা দেয় অন্তর্বর্তীকালের জন্যে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলোর তত্ত্বাবধায়ক কে হবে। বিস্ময়ের সাথে দেখা গেল, তৎকালীন সরকার বাঘের কাছে গরু রাখালি দিলেন। অবাঙালি শিল্প কারখানায় দলীয় আত্মীয়-স্বজনদের প্রশাসক করা হলো। আর বাঙালি বস্ত্রকল ও পাটকলের মালিকদেরই দায়িত্ব দেয়া হলো তাদের কল কারখানা দেখাশুনার। স্বাভাবিক নিয়মে আত্মীয়-স্বজন ও দলের লোকেরা রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা লুটপাট করে ছাড়লেন। আর বাঙালি মালিকরা তাঁদের মালিকানায় কারখানার সবকিছু আত্মসাত করে ব্যাংক ঋণসহ বাজারে কোটি কোটি টাকার ঋণ সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। এই লুটপাটের খাতের নাম হলো রাষ্ট্রায়ত্ত খাত। একদল উৎসাহী বুদ্ধিজীবী ও ষড়যন্ত্রকারী এই খাতকে সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিরাট পদক্ষেপ বলে সমাজতন্ত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন।

সে পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলেছি ১৯৭২ সালে ২৬ মার্চ একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল জাতীয় জীবনে। সমাজতন্ত্রকে চিরতরে নির্বাসন দেয়ার জন্যে সেদিন পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নাম দেয়া হলো সমাজতন্ত্র। এক শ্রেণির সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী এ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে সমাজতন্ত্রের সাথে সমার্থক করে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষ উদগীরণ শুরু করল। সেই ষড়যন্ত্র আজো চলছে। আজো তারা সেদিনের রাষ্ট্রায়ত্ত করাকে সমাজতন্ত্রের সমার্থক বলে প্রচার করার চেষ্টা করছে। এ সুবাদে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে দিনের পর দিন লেখালেখি করে যাচ্ছে। প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় লেখা হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে দুর্নীতি ও লোকসানের কথা। বেসরকারি খাত নিয়ে এ মহলটির কোনো মাথাব্যথা নেই। বেসরকারি খাতের মালিকেরা যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে এ ব্যাংকগুলোকে পথে বসিয়েছে, সে ব্যাপারে ঋণ গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বিরুদ্ধেই কথা বলা হচ্ছে বেশি। লুটপাট করছে। পৃথিবীর দেশে দেশে বেসরকারি খাতের এটাই যে চিরায়ত চিত্র, সে নিয়ে এরা আদৌ উদ্বিগ্ন নয়।

www.nagorikpathagar.com

সমাজতন্ত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে লুটপাটের সমস্ত দায়িত্ব সমাজতন্ত্রের উপরই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ থেকে এ পর্বের শুরু। সমাজতন্ত্রের নামে ধাপ্পাবাজি শুরু হয় তথাকথিত রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি লুটপাটের মধ্য দিয়ে। সেই লুটপাটের সকল দায়িত্ব শুধু সেকালের সরকারের নয়। সেকালের সরকার সমাজতন্ত্রের নামে লুটপাট কায়েম করেছিল। পরবর্তীকালে জিয়া, এরশাদ, বেগম জিয়া এবং আজকের শেখ হাসিনা সেই রাষ্ট্রায়ত্ত খাত নিয়ে একই খেলা খেলছেন।

কেউ বলছে না যে, ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ এমনি বিশেষ কারণে বস্ত্রকল, পাটকল, ব্যাংক, বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। পাকিস্তানি ব্যতীত অন্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়নি। এ পদক্ষেপ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে হলে প্রথমেই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হতো বিদেশিদের কারখানা। এর কারণ নিহিত ছিল ১৯৭১ সালে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগের শ্রেণি চরিত্রে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেও দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। বাঙালি অবাঙালি অধিকাংশ শিল্পপতি ছিল মুসলিম লীগ পন্থী। সুতরাং আওয়ামী লীগ সদস্যেদের শিল্প কারখানা সম্পর্কে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। ওই শিল্প কারখানা কেনার মতো মূলধনও তখন আওয়ামী লীগ সদস্যদের ছিল না। ফলে এ শিল্পগুলো বেসরকারি খাতে বিক্রি করে দেয়ার প্রশ্ন আদৌ আসেনি। নিজেদের পকেটে বিনিয়োগ করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় তৎকালীন সরকার পুঁজি বিনিয়োগের অংক বেঁধে দেন। এক শ্রেণির জ্ঞানপাপী স্বল্পমূল্যে এই কলকারখানার মালিক হতে না পেরে এর বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে। আর এক শ্রেণির আওয়ামী লীগের ভাই-ব্রাদারও পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক মোক্তার হয়ে সবকিছু আত্মসাৎ করে এবং এটাকেই সমাজতন্ত্র বলে প্রচার করে নিজেদের লুটপাট জায়েজ করার চেষ্টা করে। পরবর্তীকালে বাকশাল কায়েম করে সবকিছু সমাজতন্ত্রের জন্যে করা হচ্ছে, এ বক্তব্যকে আর এক দফা যৌক্তিকতার ভিত্তি দেয়া হয়। আর প্রতিপক্ষকে সুযোগ দেয়া হয় সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জঘন্য প্রচারণার।

আমার কাছে রাজনীতিটা গোলমেলে মনে হচ্ছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী হামলা শুরু করেছিল। এই হামলার কথা সকলের জানা থাকলেও সংগঠিত প্রতিরোধের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। ব্যক্তি বা সমষ্টিগতভাবে কেউই জানত না এ যুদ্ধ কী রূপ নেবে। এ ব্যাপারে

www.nagorikpathagar.com

সাংগঠনিকভাবে আওয়ামী লীগেরও কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। ছাত্রলীগের সঙ্গে কোনো সমন্বয় ছিল না। একটি মাত্র দল এবং সেই দলের একমাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান হওয়ায় কারো কিছু করার বা বলার ছিল না।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হামলার আগে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাজউদ্দিনের দেখা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে পালিয়ে যাওয়ার কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা শেখ সাহেব বলেছিলেন, তাজউদ্দিন সাহেব তা কোনোদিনই বলেননি। অর্থাৎ সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রতি শেখ সাহেবের কোনো নির্দেশ ছিল না। সাম্প্রতিককালে সে কালের কিছু ছাত্রলীগ নেতা শেখ সাহেবের কিছু নির্দেশের কথা উল্লেখ করেছেন। এমনকি পত্রিকায় এমনো লেখা হচ্ছে যে, শেখ সাহেব নাকি জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে চিকিৎসার জন্যে লন্ডন গিয়ে লন্ডনের ভারতীয় হাইকমিশনার থেকে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে কথা বলেছিলেন। তখন তিনি নাকি মুক্তিবাহিনী গঠনের কথাও বলেছিলেন। অথচ সাংগঠনিকভাবে ভবিষ্যৎ যুদ্ধ সম্পর্কে আওয়ামী লীগ যে একেবারেই অন্ধকারে ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এর ছাপ আছে পরবর্তী ঘটনায়। পরবর্তীকালে তাজউদ্দিন আহমেদের প্রধানমন্ত্রী হওয়া, মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় মুজিবনগর স্থাপন, স্বাধীন বাংলা সরকার গঠন—সব কিছুই ছিল স্থান কাল পাত্র হিসেবে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফল। সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু করা হয়েছিল সে কথা যেমন সত্য নয়, তেমন একথাও সত্য যে তখন সবকিছু গুছিয়ে করা সম্ভব ছিল না।

এ অবস্থা চলছিল যুদ্ধের ন'মাস। যুদ্ধ শেষে প্রশ্ন দেখা দিল—স্বাধীন বাংলার নেতৃত্ব কে করবে? কেউই তখন নিশ্চিত নয় যে—পাকিস্তান জেল থেকে শেখ সাহেব আদৌ ফিরবেন কিনা। এমন একটি কথা যুদ্ধকালে খন্দকার মোশতাক চাউর করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, শেখ মুজিব আর স্বাধীনতা দুটো পাওয়া যাবে না। শেখ মুজিবকে জীবিত চাইলে অধিক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে পাকিস্তানেই থাকতে হবে। আর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে শেখ সাহেবকে জীবিত পাওয়া যাবে না। খন্দকার মোশতাক আহমদের এ ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং শেখ সাহেব তখনো জীবিত। তবুও সন্দেহ সংশয় আছে যে, শেখ সাহেব আদৌ ফিরবেন কিনা, আর আদৌ ফিরলে কিভাবে ফিরবেন। একটি মহলের বক্তব্য হচ্ছে, এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল ভারতের মাটিতেই। এবারে ভারত সরকারও শঙ্কিত ছিল। সেকালের একটি ঘটনা এ ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু

www.nagorikpathagar.com

হওয়ার আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তিনি একটি কথাই বলেন যে, শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হোক। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হোক। ভারতের পক্ষে লাখ লাখ শরণার্থীর বোঝা বহন করা আদৌ সম্ভব নয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে শরণার্থীদেরকে নিজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শ্রীমতী গান্ধীর কথা খুব পরিষ্কার। সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু শেখ মুজিবুর রহমান। এ প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল শেখ সাহেবের ফিরে না আসার প্রশ্নটি এবং শঙ্কিত হয়েছিল ভারত সরকার। সকলেরই প্রশ্ন ছিল—শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের রূপ কী হবে? ভারত সরকারের একটি মহলের মতে, তাজউদ্দিন আহমেদ সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসারী। তাঁর নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ সরকার একটি বামপন্থী সরকার হবে। উপমহাদেশে ভারসাম্য বিপর্যস্ত করবে। অনেকেরই ধারণা, এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যেই ভারতের সেনাবাহিনী মুজিববাহিনী গঠন করেছিল। মুজিববাহিনী স্পষ্টতই কমিউনিস্ট বিরোধী ছিল। মুজিববাহিনী দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে ফিরে অস্ত্র সমর্পণ করতে রাজি হয়নি। তারা বলেছে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা অস্ত্র সমর্পণ করব না। মুজিব বাহিনীর অন্যতম নেতা শেখ ফজলুল হক মনি মুজিব বাহিনীর স্রষ্টা জেনারেল ওবানকে বলেছিলেন—ভারত সরকারের মস্কোপন্থী আমলা ডিপি ধর বাংলাদেশে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের চেষ্টা করছে (উল্লেখ্য যে পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল)। ৭১ এর সংগ্রামের সময় ভারতের মাটিতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে কার্যক্রম শুরু করে।

প্রসঙ্গত আর একটি সমস্যাও ছিল। সত্যি সত্যি শেখ মুজিব ফিরে না এলে মুজিববাহিনীর পক্ষে পরিস্থিতি মোকাবেলা কি আদৌ সম্ভব হবে? আমার মনে হয় সে প্রেক্ষিতেই ভারত সরকার আর একটি পদক্ষেপ নিয়েছিল। লক্ষ করলে দেখা যাবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত বাংলাদেশে যে কূটনীতিকদের পাঠিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই ছিল এককালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ী। রাজনৈতিক দিক থেকে সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলার উদ্যোগ নিয়েছে ভারত সরকার। অর্থাৎ শেখ সাহেব যদি ফিরে না আসেন, যদি বামপন্থীরাই ক্ষমতায় যায় সে পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রস্তুতিও ভারত সরকারের ছিল। এটা হচ্ছে একান্তই আমার মত। তবে এসময় স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী

www.nagorikpathagar.com

প্রায় সকল মহলই বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি। কেউ বুঝতে চাইলেন না, বাংলাদেশ ভিয়েতনাম জার্মানি কিংবা কোরিয়া নয়। ওই তিনটি দেশ ভাগ হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক কারণে নয়। এখানে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষার একটি জাতিগত দিক আছে। কিন্তু বাংলাদেশ ভাগ হয়েছিল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। একটি সংশয়, বিভ্রান্তি ও প্রতিহিংসার পরিবেশ। পাকিস্তানের পর ২৩ বছর সেই বিভক্তিকে যৌক্তিক বলে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। অপরদিকে অমুসলমানের ধন-সম্পদ জমিজমা দখল করে একটি নতুন শ্রেণি গড়ে উঠেছে। মোটামুটিভাবে তারাই সমাজের নেতা। ১৯৭১ সালের ঘটনা এই মহলেরও একটি প্রতিক্রিয়া ঘটায়। স্বাভাবিকভাবেই এ মহলটি ভীত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের আশঙ্কা দেশ স্বাধীন হলে দেশত্যাগী হিন্দুরা ফিরে আসবে। তাদের পৈত্রিক জমি ফেরত দিতে হবে। পরের সম্পদ লুণ্ঠন করে গড়ে তোলা তাদের সাধের সংসার ছারখার হয়ে যাবে। এ আশঙ্কা অস্বাভাবিক নয় এবং বাস্তবে এমন ঘটনা না ঘটলেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অসংখ্য মানুষ বাংলাদেশে ফিরল আসাম, পশ্চিম বাংলা ও ত্রিপুরা থেকে। কেউ এল স্বপ্নের জন্মভূমি দেখতে। আবার কেউ এল ফেলে যাওয়া সহায় সম্পদ ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে। গ্রাম-গ্রামান্তরে একটি নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। ওপারে বাঙালিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেও কোথায় যেন একটা ক্ষত ছিল। এ ক্ষত নিরাময় করার কোনো চেষ্টা কোনো মহল থেকে হলো না। ফিসফিস করে বলা হতে থাকল, ভারত বাংলাদেশকে গ্রাস করবে। এ পটভূমিতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি। পরবর্তীকালে ২৬ মার্চ জাতীয়করণ করা হলো পাটকল, বস্ত্রকল। একটি মহল থেকে প্রচার করা হলো—আমাদের পাটকল, বস্ত্রকল শেষ করা হচ্ছে ভারতীয় বেনিয়াদের স্বার্থে। এমনো বলা হলো যেন পাটকল ও বস্ত্রকলের যন্ত্রপাতি মেশিন সবই ভারতে পাচার করা হচ্ছে। আমি আগেই বলেছি—দেশ স্বাধীন করার প্রশ্নটি শুধুমাত্র স্লোগান হিসেবে ব্যবহার না করে তার গতি-প্রকৃতি এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা বা প্রস্তুতি থাকলে এ ঘটনা ঘটত না। তখন এ ঘটনা আমাকে পীড়িত করত। কিন্তু করার কিছু ছিল না। কারণ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং তাদের সহযোগী বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদের নেতৃত্বে ন্যাপ যেন তাদের ৭১-এর সংগ্রামের স্বপ্নেই বিভোর। সবার মনে একই চেতনা এবং চিন্তা যে আমরা বিরাট একটা কাজ করেছি। কেউ ভাবলাম না যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

www.nagorikpathagar.com

ক্ষেত্রে আমাদের শত্রু অনেক শক্তিশালী। প্রস্তুতি ছাড়া একটি সংগ্রামকে লক্ষ্যে পৌঁছানো খুব কঠিন। কেউই বুঝতে চাইলাম না যে আমাদের নিজস্ব শক্তি থাকলে আমরা ভারতের উপর নির্ভর করতাম না, ভারতের ওপর নির্ভরতা প্রমাণ করে যে, আমাদের দেশি ও বিদেশি শক্তি আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, তাই আমাদের স্বাধীনতার পরে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সঙ্কট মোকাবেলা করাই ছিল একমাত্র কাজ। কিন্তু সে কাজটি কেউ করলাম না। তিনটি দল দাবি করতে শুরু করল যে তারাই একমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী। আর এ সময় শুরু হলো—আওয়ামী লীগের প্রধান শক্তি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব। আর আমার মনে হচ্ছিল—এবার আর এক বিস্ফোরণের দিকে এগুচ্ছে। সবাই বড্ড গোলমেলে। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি এ সমস্যা বিবেচনায় না নিলেও প্রতিপক্ষ এর সুযোগ নিল। একাত্তরের যুদ্ধের পরাজিত শক্তি ভারত বিরোধী প্রচারণা শুরু করল। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যে কোনো আন্দোলন এই পরাজিত শক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা পেতে থাকল।

পাকিস্তান আমলের শেষ দিক থেকেই ছাত্রলীগের নেতৃত্ব সম্পর্কে আমার মনে নানা প্রশ্ন ছিল। আমি এক সময় ছাত্রলীগের দফতর সম্পাদক ছিলাম। সভাপতি ছিলেন আব্দুল মোমিন তালুকদার। সম্পাদক ছিলেন আব্দুল আউয়াল। আমাদের কালে ছাত্রলীগের স্বতন্ত্র নেতৃত্ব ছিল—'যাহা আওয়ামী লীগ তাহাই ছাত্রলীগ' নয়। ১৯৫৬ সালে নীতিগত প্রশ্নে ছাত্রলীগের নেতৃত্বের বিপরীত একটি অংশের সঙ্গে আমাদের মতানৈক্য হয়। তখন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তিনি সুয়েজ খাল সংঘর্ষের সময় মিশরের বিরুদ্ধ ব্রিটেন ও ফরাসির পক্ষে অবস্থান নেন। তাঁর আমলে একের পর এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রতিটি চুক্তি ছাত্রলীগ সমর্থন করতে থাকে। প্রতিবাদে ছাত্রলীগের নেতৃত্বের একটি বড় অংশ ছাত্রলীগ থেকে পদত্যাগ করে। এ পদত্যাগকারীদের মধ্যে আমি ব্যতীত ছিলেন এনায়েতুল্লাহ খান, আবদুল হালিম, জহিরুল ইসলাম, আহমদ হুমায়ুন, ময়মনসিংহের কাজী আব্দুল বারী, নোয়াখালীর নুরুল হক চৌধুরী (মেহেদী) প্রমুখ। আমাদের পদত্যাগের পর ছাত্রলীগ একেবারেই আওয়ামী লীগের লেজুড়ে পরিণত হয়।

কিন্তু এর একটি পরিবর্তন লক্ষ করা গেলো ষাটের দশকে। আমাদের দল অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল তখন গঠিত হয়নি। আমরা আরএসপি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের নামেই গোপনে কাজ করতাম। আমাদের কাজ ছিল

www.nagorikpathagar.com

শিল্প এলাকায়, শ্রমিক সংগঠনের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন। আমাদের আমলেই আইয়ুব খানের সামরিক শাসন লঙ্ঘন করে সারা পূর্ব পাকিস্তানে তিনবার চটকল ধর্মঘট হয়। আমাদের প্রভাব ছিল খুলনা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত।

এ সময় ছাত্রলীগের নেতারা আমাদের সঙ্গে বারবার বৈঠকে বসে। তাদের বক্তব্য ছিল বাংলাদেশ স্বাধীন করতে হবে এবং এ জন্যে আপনাদের সহযোগিতা চাই। আমাদের বক্তব্যও ছিল স্পষ্ট। আমরা বলতাম—বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা আছি, কিন্তু আগেই জানা প্রয়োজন বাংলাদেশ নামে আমরা কোনো রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে চাচ্ছি। একবার ভারতবর্ষ ভেঙে পাকিস্তান হয়েছে। আমরা আর একটা পাকিস্তান করতে চাই না। ছাত্রলীগ নেতাদের বক্তব্য ছিল, সে প্রশ্ন এখন নয়। সে প্রশ্ন পরবর্তীকালে বিবেচনা করা যাবে। এ মুহূর্তের প্রশ্ন বাংলাদেশ স্বাধীন করা।

এ আলোচনায় আমি খুব বিশেষ অংশগ্রহণ করতাম না। এ আলোচনা নিয়ে আমার সংশয় ও বিভ্রান্তি ছিল। আমি দীর্ঘদিন ছাত্রলীগের সদস্য ছিলাম। আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকেই আমি ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। এই নেতারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে চায়, এ বিশ্বাস আমার আদৌ ছিল না। তাহলে এরা কী চায়? এদের পেছনে কারা আছে? আওয়ামী লীগের কোন অংশ এদের সমর্থক? আমার কাছে কোনো কিছু স্পষ্ট ছিল না। শুধু এটুকু বুঝতাম যে শেখ মুজিবুর রহমানের সায় না থাকলে কারো এ ব্যাপারে কথা বলা সম্ভব না। পরবর্তীকালের আর একটি ঘটনা আমাকে বিভ্রান্ত করল। ঘটনাটি ছিল ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবি করে প্রস্তাব উত্থাপন নিয়ে। এ প্রস্তাব নিয়ে মতান্তর হয়। একদিকে আ স ম আব্দুর রব, শাজাহান সিরাজ এবং অপরদিকে নূরে আলম সিদ্দিকী ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন চট্টগ্রামের স্বপন চৌধুরী। এ প্রস্তাব উত্থাপনের পর স্বপন চৌধুরী ছুরিকাহত হয়।

আমার মনে গভীর সংশয় দেখা দেয়। তাহলে সত্যি সত্যি শেখ সাহেব কোন দিকে? আমি যতদূর শুনেছি শেখ ফজলুল হক মনি, নূরে আলম সিদ্দিকী ও মাখনের পক্ষে। তাহলে শেখ সাহেবের ভূমিকা কী? আবার একথাও শুনেছি যে সকলেই স্বাধীনতার পক্ষে হলেও এই সময় স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ সময়োচিত ছিল না। ছিল না বলেই এই প্রস্তাব নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। তবুও আমার মনে হয়েছে—ছাত্রলীগের একটি অংশ অন্তত আমাদের কালের মতোই স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছে।

www.nagorikpathagar.com

এ পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের সংগ্রাম শুরু হয়। সংগ্রামের সময় দেখেছি ছাত্রলীগের যৌথ নেতৃত্ব। যৌথভাবেই তারা তাজউদ্দিন আহমেদের বিরোধিতা করেছে। মুজিববাহিনী গঠন করেছে। ৭১-এর সংগ্রামে নিজস্ব নেতৃত্ব চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছাত্রলীগের কোনো অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কথা শোনা যায়নি। কিন্তু পুরনো কোন্দল দেখা দিল মার্চ মাসের পর থেকে। সেই কোন্দলে বিভক্ত হলো বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। পরবর্তীকালে গঠিত হলো জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—জাসদ। কিন্তু কেন?

আজ স্বাধীনতার ২৭ বছর পর কল্পনাকাহিনী বা গল্প লেখার অবকাশ নেই। অথচ এটাই সত্য, সাম্প্রতিককালে ৭১-এর যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সকলেই রণাঙ্গণের ইতিহাস লিখছেন। লিখছেন নিজের অভিজ্ঞতার কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখালেখি হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সেকালের যুদ্ধের কোনো তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হচ্ছে না। কেন সেই যুদ্ধ হয়েছিল? কারা এর উদ্যোক্তা? কারাই বা সহযোগী? সে প্রশ্ন সকলেই এড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব একদিন দিতেই হবে।

একটি মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে, এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব বামপন্থীরা নিল না কেন? তাদের কথা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত সমাজকে ১৯৭১ সালে জাতীয়তাবাদের কথা বলেই ঐক্যবদ্ধ করা হলো। অথচ বামপন্থীরা জাতীয়তাবাদের কথা বলল না। তারা প্রথমেই সমাজতন্ত্রের স্লোগান দিল। অবৈজ্ঞানিকভাবে তারা জাতীয়তাবাদের পর্বটি এড়িয়ে যেতে চাইল। কিন্তু পারল না। সেই জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম হলো, কিন্তু বামপন্থীদের নেতৃত্বে নয়। নেতৃত্ব দিল বুর্জোয়া শ্রেণি। তারা ধ্বনি তুলল জয় বাংলা। বামপন্থীরা বলল—জয় সর্বহারা। কিন্তু জয় সর্বহারার ধ্বনি জয় বাংলা স্লোগানের আবেগে তলিয়ে গেল। কেন এমন হলো?

প্রশ্নটি প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু সাদামাটা কথায় ব্যাখা করা অতো সহজ নয়। কারণ বামপন্থীরা কথা বলতে গেলে বামপন্থীদের মধ্যকার বিভাজন মেনে নিতে হবে। বামপন্থী হিসেবে তৎকালীন পূর্ববাংলায় বৃহৎ দল হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। এ কথা সকলেরই জানা যে লেনিনের মৃত্যুর পর যে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছে। তখন স্ট্যালিনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক দুনিয়া কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিত। একই কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি ও কৌশল নির্ধারিত হতো। লক্ষ

www.nagorikpathagar.com

করলে দেখা যাবে মস্কোনীতি অনুসরণ করতে গিয়ে ১৯৪৬ সালের আগে জন্মের পর থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শরিক হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর বা গদর পার্টির সদস্য হিসেবে অনেক নেতাই জেল খেটেছেন, ব্রিটিশের নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়ার পর বড় ধরনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে তাঁরা দূরে থেকেছেন। ত্রিশের দশকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করেনি। কারণ তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে কংগ্রেসকে বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠান বলে তাদের নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে বারণ করা হয়। পরবর্তীকালে ফ্যাসিবাদের উত্থানের পর আবার কংগ্রেস নেতৃত্বকে মেনে নেয়ার নির্দেশ দেয় তৃতীয় আন্তর্জাতিক। আবার তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করে। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করে। নেতাজী সুভাষ বসু ও তাঁর নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে ফ্যাসিবাদী বলে আখ্যায়িত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ সমর্থন করে। অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলা সম্পর্কে তাদের কোনো ভিন্ন কর্মসূচি ছিল না।

এর মাঝখানে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে আর একটি ঘটনা ঘটে। ১৯৪৮ সালে কোলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে বিডি রণদিভে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সেই কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বলা হয়, ব্রিটিশ চলে গেলেও ভারত বা পাকিস্তান স্বাধীন হয়নি। এ আজাদী ঝুটা। লাখ লাখ মানুষ অনাহারে আছে। সুতরাং আঘাতের পর আঘাত করে ক্ষমতাসীন সরকারের উচ্ছেদ ঘটাতে হবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের এ সিদ্ধান্ত শুধু ভারত নয়, পাকিস্তানের জন্যেও প্রযোজ্য ছিল। প্রযোজ্য ছিল বলেই পূর্ব বাংলায়ও একই ধরনের আন্দোলন হয় এবং এ আন্দোলন করতে গিয়েই ইলা মিত্র নির্যাতিত এবং গ্রেফতার হয়েছিলেন। অর্থাৎ ইলা মিত্র শুধু তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন না। এ ইতিহাস থেকে আমি বোঝাতে চাচ্ছি, লেনিনের মৃত্যুর পর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে ধারা রচিত হয়েছিল সেই ধারায়ই পরিচালিত হয়েছে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। তাই

www.nagorikpathagar.com

তাদের আন্দোলনের কথা বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে। সুতরাং তাত্ত্বিক দিক দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না। প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে অন্য বামপন্থীরাই বা কী করেছিল?

তৎকালীন পূর্ব বাংলায় আরো দু'টি বামপন্থী দল ছিল—বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল আরএসপি ও ফরোয়ার্ড ব্লক। ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হয়েছিল ১৯৩৯ সালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে। নেতাজী দেশান্তরী হলে ফরোয়ার্ড ব্লক সুভাষপন্থী ও মার্কসবাদী নামে বিভক্ত হয়ে যায়। অপরদিকে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হয় ১৯৪০ সালের ১৯ মার্চ। এ দলটির সকল নেতারা ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে গ্রেফতার হয়ে যান। সকল নেতাদের মুক্তি পেতে পেতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়। এ দলটির লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্র। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিকল্প হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিল। এদের সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল—লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ভুল পথে চলেছে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে নতুন দল দরকার। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন অনুশীলন সমিতির অগ্নিযুগের নেতারা। কিন্তু এ দলের গঠন পর্বেই নেতাদের জেলে যেতে হয় এবং ভারত বিভক্ত হয়। তবুও ফরোয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি দেশ ভাগের চরম বিরোধিতা করেছিল। শেষ পর্যন্ত শরিক হয়েছিল—সার্বভৌম বাংলা গঠনের আন্দোলনে।

মোটামুটিভাবে এটাই ছিল বামপন্থী দলগুলোর ইতিহাস। যদি আমি ধরে নিই যে কমিউনিস্ট পার্টি, আরএসপি এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের তৎকালীন দায়িত্ব ছিল সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় তাদের পক্ষে এ আন্দোলন করা আদৌ স্বাভাবিক ছিল কি? অনেকে বলেন, ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়, এ আন্দোলনের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভ্রূণ ছিল। তবে এ ব্যাপারে আমার কিছুটা দ্বিমত আছে।

একথা মনে রাখতে হবে যে—প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলনের প্রবক্তা কোনো বামপন্থী দল ছিল না। প্রবক্তা ছিল তমুদ্দিন মজলিশ। যারা খোলাফায়ে রাশেদিন-এর সমাজ কায়েমের প্রবক্তা ছিল। তারাই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি প্রথম জানিয়েছিল। আমার মতে, তাদের এ দাবির সাথে পাকিস্তান গঠনের দাবি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। পাকিস্তান না হলে মুসলমানের উন্নতি হবে না। হিন্দুদের সাথে সহযোগিতায় টিকে থাকা যাবে না। ঠিক সেই যুক্তিতেই তারা বলেছিল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হলে বাঙালি মুসলমানরা চাকরি পাবে না।

www.nagorikpathagar.com

প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে অবাঙালিদের কাছে। পাকিস্তান সৃষ্টি হবে অর্থহীন। তাই লক্ষ করা যায়, প্রথম বাংলাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবি করা হয়। পরে বলা হয়, বাংলা হবে উর্দুর সঙ্গে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা। সারা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন নাগরিক বাঙালি হলেও কেউ কিন্তু বাংলাকে একক রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করল না। পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলেই ভাষা নয় এমন একটি ভাষা অর্থাৎ উর্দুকে বাংলার সাথে স্থান দেয়া হলো! এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের চেয়ে অগ্রাধিকার পেয়েছিল বাংলা ভাষাভাষীদের সুযোগ-সুবিধার প্রশ্ন।

তবে এ প্রশ্ন আমি বাদ দিতে রাজি আছি। বলা যেতে পারে, সবকিছু বাদ দিয়ে বামপন্থীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করাই ছিল শ্রেয়। কিন্তু সম্ভব ছিল কি? যারা এ ব্যাপারে তত্ত্ব দিচ্ছেন তারা কি কোনোদিন সেকালের বাস্তব পরিস্থিতি ভেবে দেখেছেন? আমি সেকালের তিনটি বামপন্থী দলের কথা উল্লেখ করেছি। লক্ষ্যণীয় যে, এ তিনটি দলের নেতৃত্ব এসেছে মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় থেকে। এ দলগুলোর শতকরা ৯৫ থেকে ৯৯ জন সদস্য হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। দেশভাগের পরে তাদের পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত। তারা দেশান্তরী হবে কিনা সে সমস্যার সমাধান হয়নি। অনেক পরিবারে সদস্যই ইতোমধ্যে দেশান্তরী হয়েছে। তাদের ভারতভিত্তিক মূল রাজনৈতিক দল সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। কখনো মুসলমান কমরেডদের ভারত থেকে পাকিস্তানে আসতে বলা হচ্ছে। হিন্দু কমরেডদের বলা হচ্ছে পাকিস্তান থেকে ভারত যেতে—অর্থাৎ সিদ্ধান্তই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে।

এ পরিস্থিতিতে সমাজেও সংশয় ও বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। একজন মুসলমান কমরেড জানে না তার পাশের হিন্দু কমরেডটি তার পাশে থাকবে কিনা। কোনো দাঙ্গা দেখা দিলে তাকে রক্ষা করা যাবে কিনা এবং এ পরিস্থিতি চরমে উঠল ১৯৫০ সালে। ভয়াবহ দাঙ্গা হলো পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায়। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী। এ দু'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক অভূতপূর্ব চুক্তি হলো। এ চুক্তির ফলে ভারতের দাঙ্গা দুর্গত মুসলমানদের পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের দাঙ্গা দুর্গত হিন্দুদের ভারতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। পরিবহনের ব্যবস্থা করল উভয় সরকার। দু'টি দেশের মানুষ দেশান্তরী হলো শুধুমাত্র তাদের ধর্মীয় পরিচয়ের জন্যে।

আজকে ৪৮ বছর পরে লেখালেখি করে এ পরিস্থিতি কাউকে বোঝানো যাবে না সেদিনের হিন্দু কমরেডদের পক্ষে সেদিনের পূর্ব বাংলায় ইচ্ছে

www.nagorikpathagar.com

থাকলেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করা সহজ ছিল না। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছাড়াও ছিল সরকারি নির্যাতন। কথাগুলো ছিল এমন—কমিউনিস্ট মানে হিন্দু, কমিউনিস্ট মানে নাস্তিক আর হিন্দু মানে পাকিস্তানের বিপক্ষে। সুতরাং এদের জেলে পাঠাতে হবে। সম্ভব হলে জেলে পাঠাবার আগেই তাদের শেষ করতে হবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি যেনো জন্ম নিয়েছিল কমিউনিস্ট ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার জন্যে। এর এই বাস্তব পরিস্থিতিতে হিন্দুদের নেতৃত্বে যতটুকু সম্ভব চালু ছিল বামপন্থী কর্মকাণ্ড। আত্মগোপনের জন্যে প্রত্যেক নেতাকেই একটি আরবি নাম দিতে হয়েছিল। এ বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই আমার ধারণা সেকালে বামপন্থী কর্মসূচিতে জাতীয়তাবাদ আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দেয়া হলেও পরিস্থিতির তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন হতো না।

এ পটভূমি সামগ্রিক বিচার বিবেচনা করলে অনেক কথাই বেরিয়ে আসবে এবং বোঝা যাবে যে, আমরা যারা সে আমলের স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখার কথা বলি তাদের অনেক স্বপ্নই বোধ হয় সঠিক ছিল না। সে স্বপ্ন ছিল একান্তইভাবেই মনগড়া। এখানে উল্লেখযোগ্য যারা ষাটের দশকের আগ পর্যন্ত তীব্র ভারতবিরোধী, পাকিস্তানপন্থী ছিল তাদেরই দেখা গেলো ষাটের দশকে এসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতা হিসেবে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের যে অংশটি এতদিন পর্যন্ত কমিউনিস্টদের বিদ্রূপ করে স্লোগান দিত—হো হো মাও চীনে যাও ব্যাঙ খাও, তারাই যেন আন্তর্জাতিক হয়ে গেলো। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা তুলছে খুব কঠোর এবং কঠিনভাবে। ছাত্রদের এ অংশটির আন্দোলনে বিপর্যস্ত হয়েছে আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিবুর রহমান এমনকি মওলানা ভাসানী পর্যন্ত। আমার লেখায় অনেকে হয়তো ক্ষুব্ধ হবেন। আমি লিখেছি পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবির আন্দোলনের সাথে বাঙালিত্বের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ছিল পাকিস্তান দাবির মতোই একটি দাবি। এই দাবির পেছনে যুক্তি ছিল—আমরা বাঙালিরা উর্দু জানি না। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে আমরা চাকরি পাব না। অখণ্ড ভারতে আমরা প্রতিযোগিতায় হিন্দুদের সঙ্গে পারিনি। সুতরাং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা হচ্ছে ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত বাঙালিয়ানার দাবি তেমন তীব্র ছিল না। এই প্রসঙ্গে আমি বারবার একটি গানের কথা উল্লেখ করেছি।

এ গানটি রচিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। এ গানের প্রথম চরণ ছিল—ওরে বাঙালি, ঢাকা শহর রক্তে রাঙালি। পরবর্তী চরণে বলা হয়েছিল—যারা

www.nagorikpathagar.com

হইত পূর্ব বাংলার জিন্নাহ লিয়াকত/বেছে বেছে মারা হইল জাতির ভবিষ্যত। এই গান গেয়েই ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করেছিল। আমার ধারণা ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বাধীন করার কোনো স্বপ্নের অবকাশ ছিল না। তখনো স্বপ্ন ছিল স্বপ্নের পাকিস্তান। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় হয়। প্রথমবারের জন্যে ধাক্কা খায় পাকিস্তানি চেতনা। পরবর্তীকালে পূর্ববাংলার বাঙালি সবিস্ময়ে দেখল—নির্বাচনে জয়লাভ করলেও ক্ষমতা পাওয়া যায় না। কেন্দ্রে মুসলিম লীগ সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে টিকতে দিল না। মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা নিয়ে নিল। শুরু হলো নতুন করে বাঙালিদের বঞ্চিত করার একের পর এক ষড়যন্ত্র। সীমিত ক্ষেত্রে হলেও এক নতুন চেতনার উন্মেষ হলো। সে চেতনা হচ্ছে—আমরা বাঙালি বলে নির্যাতিত, বাঙালি বলেই বঞ্চিত। পাকিস্তানে নিজেদের গঠনের চেতনা গভীর হয়নি। তবে এর আগে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির আর একটি প্রসঙ্গ আলোচনা করা দরকার। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৭ সালে। ১৯৪৬ সালে জুন মাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে ভারত-পাকিস্তান দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হচ্ছে। সাথে সাথে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হচ্ছে। বাংলার এই বিভক্তি মুসলিম লীগের একটি অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই অংশের নেতা ছিলেন তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাশিম। এঁরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুললেন। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মেজো ভাই শরৎচন্দ্র বসু। এছাড়া বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শরিক ছিল বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আরএসপি) এবং ফরোয়ার্ড ব্লক।

এই সার্বভৌম বাংলার আন্দোলন নিয়ে প্রথম থেকেই আমার মনে বিভিন্ন প্রশ্ন ছিল। নানা যৌক্তিক কারণেই বলা হয় যে, শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেই সোহরাওয়ার্দী হঠাৎ করে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের বাইরে সার্বভৌম বাংলা কেন চাইলেন? তিনি তো বলতেন হিন্দু-মুসলিম দু'টি স্বতন্ত্র জাতি। এদের আলাদা সংস্কৃতি। এরা পাশাপাশি বাস করতে পারে না। এই যুক্তিতেই তিনি পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এখন তিনি ভিন্ন কথা বলছেন কেন? তাঁর কথিত সার্বভৌম বাংলায় হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় থাকে। তাহলে সারা ভারতবর্ষে থাকতে পারবে না কেন? হঠাৎ করে তিনি বাঙালি হলেন কেন? এ

www.nagorikpathagar.com

ব্যাপারে অনেক ব্যাখ্যা আছে। অনেকে বলেন, আজকের স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন সেদিন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সার্বভৌম বাংলার মধ্যেই দেখেছিলেন। আমি এই ব্যাখ্যার সাথে একমত নই। আমি মনে করি পাকিস্তান আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক। হিন্দু বেনিয়াদের সাথে প্রতিযোগিতায় পারা যাবে না। তারা অনেক আগে চলে গেছে। সুতরাং মুসলমান বেনিয়াদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাই। সেই রাষ্ট্রে তারা কোনো প্রতিযোগিতা ছাড়াই ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। নিজের মতো করে বাঁচবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরাজিত মুসলিম মধ্যবিত্তকে এই বক্তব্য নতুন আশার আলো দেখিয়েছিল। কিন্তু বাংলা বিভাগের প্রস্তাবে সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেলো যে, বাঙালি এবং অবাঙালি মুসলিম বেনিয়ারা কলকাতা পাচ্ছে না। কলকাতা না পেলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিপর্যস্ত হবে এবং এই পটভূমিতেই কলকাতাবাসী মুসলিম বেনিয়াদের প্রতিনিধি হিসেবে শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার দাবি তুলেছিলেন। যে বাংলার রাজধানী হবে কলকাতায়। আবার একই যুক্তিতে কলকাতাবাসী হিন্দু বেনিয়াদের প্রতিনিধি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সার্বভৌম বাংলার দাবি প্রত্যাখ্যান করে। যে কংগ্রেস ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। বলেছিল—মায়ের অঙ্গচ্ছেদ চাই না। সেই কংগ্রেসই ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ করার জন্যে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করল। অর্থাৎ প্রমাণিত হলো শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান চাননি। চেয়েছিলেন মুসলমান বেনিয়াদের জন্যে। আর প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশ কখনো কারো মা ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল দখলে রাখার। তাই ভাগ করে হলেও বাংলাদেশের কিছুটা অংশ দখলে রেখেছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। অর্থাৎ আমার বক্তব্য হচ্ছে বাঙালিয়ানা নয়, একশ্রেণির হিন্দু-মুসলিম বেনিয়াদের স্বার্থেই ১৯৪৬-৪৭ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার দাবি উঠেছিল।

প্রসঙ্গত বিচার করে দেখা প্রয়োজন, পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাবের সাথে ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাবে বাংলা ও বৃহত্তর আসাম নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সার্বভৌম বাংলায় কিন্তু আসামের কোনো স্থান ছিল না। শুধুমাত্র বাংলাদেশই ছিল তার সার্বভৌম বাংলার মানচিত্রে। সুতরাং পাকিস্তান প্রস্তাবের সাথে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের সার্বভৌম বাংলার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

আজকে অনেকে বলতে চেষ্টা করেন, আজকের বাংলাদেশ মুসলিম লীগের ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবেরই পরিণতি। ১৯৪০ সালে

www.nagorikpathagar.com

পাকিস্তান প্রস্তাবে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ার কথা ছিল। এর একটি অংশ হবে সিন্দু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে গঠিত। অপরটি হবে—বাংলা ও বৃহত্তর আসাম নিয়ে গঠিত। সকলেরই জানা, ১৯৪৬ সালে এ প্রস্তাব সংশোধিত হয়েছিল। মুসলিম লীগের সাংসদের বিশেষ অধিবেশনে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। অর্থাৎ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবের ফলেই মূল পাকিস্তান প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমবায়ে পাকিস্তান গঠনের পরিবর্তে এককেন্দ্রিক পাকিস্তান গড়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপরেও আজকে একজন লেখক বলতে চান, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্বপ্নে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার চিত্র ছিল। সে স্বপ্নের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সার্বভৌম বাংলা গঠনের দাবি তুলেছিলেন ১৯৪৭ সালে এবং ১৯৭১ সালে সেই ভিত্তিতেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে, যাঁরা বাংলাদেশ চাননি, যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের চরম বিরোধীতা করেছেন, তাঁরাই আজকে আগ বাড়িয়ে বলতে চাচ্ছেন—পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না এবং লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা কেউ আর স্বীকার করতে চান না, মূল লাহোর প্রস্তাবের আদৌ অস্তিত্ব ছিল না পাকিস্তান গঠনকালে। পাকিস্তান লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে গঠিত হয়নি। সুতরাং লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাংলাদেশ গঠনের কোনো প্রশ্নই আসে না। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা এবং লাহোর প্রস্তাবের নতুন মূল্যায়ন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তাহলে কি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে পাকিস্তান প্রস্তাবের কোনো সম্পর্ক ছিল না? লাহোর প্রস্তাব কি বাংলাদেশের আন্দোলনে কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি? এ পশ্নের জবাব ইতিবাচক। আমি ইতিপূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের একটি অংশের অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছি। আমি একথাও বলার চেষ্টা করেছি, এ অংশের অনমনীয় ভূমিকা শেখ মুজিবুর রহমান এবং মওলানা ভাসানীকে বিপর্যস্ত করেছিল। এই দুই নেতা পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলন তাঁদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। তাঁরা পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে বেড়ে উঠেছিলেন। এ আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের আত্মিক সম্পর্ক ছিল। সেই পাকিস্তানকে এক তুড়িতে না করে দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর

www.nagorikpathagar.com

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের এ অংশের নেতৃত্বের সাথে পাকিস্তান আন্দোলনের সম্পর্ক ছিল পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যক্রমে। আর পাকিস্তান ছিল তাদের কাছে শোষণ ও বঞ্চনার প্রতীক। তাই পাকিস্তান ভাঙার প্রশ্নে তাদের আত্মার আত্মীয়তার কোনো সংযোগ ছিল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরনো নেতৃত্বের সাথে নতুন নেতৃত্বের এ দ্বন্দ্ব পরবর্তীকালে প্রতি পদে পদে ফুটে উঠেছে এবং বারবার মনে হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান এবং মওলানা ভাসানী হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতাই চাননি। অনেকের কাছে মনে হতে পারে আমার লেখায় এ প্রশ্নগুলো প্রাসঙ্গিক নয়। আমার জবানবন্দির প্রথম পর্বেই একথা আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি ইচ্ছা করেই এ কথাগুলো পরে লিখছি। কারণ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন কোনো ধরাবাঁধা ছকে হয়নি। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে মতানৈক্য ছিল। সে মতানৈক্যের ফলেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্পর্কে নেতৃত্ব নিয়ে এখন প্রশ্ন ওঠে। এখনো বিতর্ক হয়। বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, অনেক সময় মনে হয় যে, ৭১-এর সংগ্রামটাই বোধ হয় সঠিক ছিল না। এ মনে হওয়ার কারণ খুঁজে বের করতে না পারলে অনেক প্রশ্নই অমীমাংসিত থেকে যাবে। বোঝা যাবে না—কেন মওলানা ভাসানী ২৫ মার্চের পূর্বরাত পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশের কথা না বলে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কথা বলেছিলেন। কেন শেখ সাহেব ৭ মার্চের ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলার পূর্বে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম' বলেছিলেন। আমার মতে, কোনো কিছুই হঠাৎ করে ঘটেনি। ঘটেনি বলেই সেদিনের ঘটনার প্রেক্ষাপট জানা দরকার।

একটা প্রশ্ন বিভিন্ন পত্রিকায় বারবার আলোচিত হয়েছে। প্রশ্নটি হচ্ছে—মওলানা ভাসানী কেন স্বাধীন বাংলাদেশের কথা না বলে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কথা বলেছিলেন। ১৯৬৮ সালে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা গঠনের দাবি জানানো হয়। ছাত্রদের এ গ্রুপটি তাঁর অনুগত হলেও তিনি দাবি মেনে নেননি। তিনি বলেছেন, আমার লাশের ওপর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হবে।

শেখ সাহেব ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন—এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। কেন তিনি শুধু স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা বলেন না! সে প্রশ্নে আমি পরে আসছি।

স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলার ব্যাপারে আমার একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে, জানি এ ব্যাখ্যায় অনেকে আমার সঙ্গে একমত হবেন না।

www.nagorikpathagar.com

আমার এ ব্যাখ্যা একান্তভাবেই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত। আমি ভিন্ন প্রসঙ্গ থেকে আমার এ ব্যাখ্যায় আসব।

ষাটের দশকের কথা। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী ছিল। এ বার্ষিকী পালন নিয়ে অনেক অঘটন ঘটে। তখন আইয়ুব খানের সামরিক শাসন চলছে। সরকার কিছুতেই শতবার্ষিকী পালিত হতে দেবে না। কিন্তু যুবকরা এ ব্যাপারে একাট্টা। শতবার্ষিকী পালন নিয়ে অনেকে গ্রেফতার হলো। অনেককে আত্মগোপন করতে হলো। শতবার্ষিকী পালন তাই একটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিণত হলো। তবুও শতবার্ষিকী পালিত হলো। পরিস্থিতি চরমে উঠল ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর। তখন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন। তিনি এক নির্দেশ দিয়ে বেতার-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করলেন। চারদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। বুদ্ধিজীবীরা বিভক্ত হয়ে গেলেন। এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী বিবৃতি দিয়ে দাবি করলেন—রবীন্দ্রনাথ আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। আমরা তাঁর উত্তরাধিকার বহন করছি। অপরদিকে চল্লিশজন বুদ্ধিজীবী ভিন্ন সুরে বিবৃতি দিলেন। তাঁরা বললেন—রবীন্দ্রনাথ আদৌ আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ নয়। এ চল্লিশজন বুদ্ধিজীবীর মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি সাংবাদিক হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর বাসায়ও আমার যাতায়াত ছিল। তার নাম মোহাম্মদ মোদাব্বের। মোদাব্বের সাহেব আমাকে একদিন ডেকে বললেন—তুমি আমার সংসারে ভাঙন ধরিয়েছ। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার সাথে আমার পরিবারের কেউ-ই একমত নয়। এ জন্যে তুমিই দায়ী। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, বললেন— তোমার সাথে হয়তো আমি ভিন্নমত হব না। তুবও ধৈর্য ধরে তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে। আমি মুসলিম লীগ করলেও রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে রায়পন্থী অর্থাৎ মানবেন্দ্র রায়ের অনুসারী। মানবেন্দ্র রায় ছিলেন কমিউনিস্ট জগতের প্রথম শ্রেণির চিন্তানায়ক। তাঁর লেখায় তিনি পাকিস্তান আন্দোলনকে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন। তাই রায়-পন্থী হয়েও আমরা মুসলিম লীগ করেছি এবং পাকিস্তান চেয়েছি। তবে ব্যক্তিগত জীবনে আমি বিশ্বাস করি রবীন্দ্রনাথ আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। আমরা তাঁর উত্তরাধিকারী। কিন্তু এ বৃদ্ধ বয়সে আর পেছনে তাকাতে ইচ্ছা করছে না। সত্য জেনেও অতীতের ভুল স্বীকার করার মতো মানসিকতা আজ নেই। খুব অন্তর দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলাম! কিন্তু আজ দ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছি।

www.nagorikpathagar.com

অথচ ১৯৭১ সালে আমি এই মোদাব্বের সাহেবের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব দেখিনি। ১৯৭১ সালের জুন মাসে আমি ভারত থেকে ঢাকায় ফিরে আসি মুক্তিযোদ্ধা ও অর্থ সংগ্রহের জন্যে। আমি একরাতে মোদাব্বের সাহেবের বাসায় ছিলাম। মোদাব্বের সাহেব তখন জুনিয়র রেডক্রসের কর্মকর্তা। আমি লক্ষ করলাম—তাঁর বাসা থেকে জুনিয়র রেডক্রসের সমস্ত কিছু মুক্তিযুদ্ধের এলাকায় পাঠানো হচ্ছে। এমনকি মানিকগঞ্জে ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরী যে স্পিডবোটটি ব্যবহার করতেন সে স্পিডবোটটিও জুনিয়র রেডক্রসের। মোদাব্বের সাহেব ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরীকে এ স্পিডবোটটি দিয়েছেন। আমি ১৯৭১ সালের জুন-জুলাই মাসে মোদাব্বের সাহেবের মনে কোনো দ্বন্দ্ব দেখিনি। যে দ্বন্দ্বে তিনি বিব্রত ছিলেন মাত্র বছর দু'তিন আগে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। আমার মনে হয় এরকম দ্বন্দ্ব শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানীর জীবনেও ছিল। এক সময় পাকিস্তান তাঁদের অস্তিত্ব ছিল। পাকিস্তান অর্জনে তারা শরিক ছিলেন। পাকিস্তান তাঁদের স্বপ্ন ছিল। সেই পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলা বা এ এলাকা থেকে সেই পাকিস্তানের নামটি একেবারে মুছে ফেলা তাঁদের পক্ষে সহজ বা সরল ছিল না। যে কথাটি সেকালের তরুণরা স্পষ্ট করে বলতে পেরেছে, সে কথাটি তাঁদের পক্ষে বলা আদৌ সহজ ছিল কি? এ প্রশ্ন তুলে আমি তাঁদের বাংলাদেশ স্বাধীন করার প্রশ্নে ভিন্নমত পোষণ করার কথা বলছি না। আমি বলছি যে, ঐতিহাসিক কারণে তাঁদের কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিল। কিছুটা পিছুটান ছিল।

মওলানা ভাসানী কাগমারী সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের কথা কোনোদিনই বলেননি। বলেছেন, স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কথা। আর সে সময় শেখ সাহেব ছিলেন এই আসসালামু আলাইকুম বলার বিরুদ্ধে এবং এ প্রশ্নে সেই সময় ছাত্র ইউনিয়ন-ছাত্রলীগ মারামারি হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়। ইত্তেফাকের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে মওলানা ভাসানী ভারতের এজেন্ট। সুতরাং স্বাধীন বাংলাদেশ দাবি করার মানসিক প্রস্তুতিই তখন ছিল না। চিন্তা ছিল পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে সবকিছু সমাধান করে মিলেমিশে থাকা। কিন্তু ষাটের দশকে এসে পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে। ১৯৪৭ সালে যে তরুণ পাকিস্তানের জন্যে স্লোগান দিয়েছে, ১৯৫২ সালে সে দেখেছে ভাষার দাবিতে বাঙালি ছেলেকে গুলি খেতে। ১৯৫৪ সালে অভিজ্ঞতা হয়েছে, নির্বাচনে জিতলেও ক্ষমতা পাওয়া যাবে না। এ উঠতি বয়সের তরুণদের তেমন পাকিস্তান প্রীতি ছিল না। জিন্নাহ-লিয়াকত অনেক

www.nagorikpathagar.com

আগেই রাজনীতির মঞ্চ থেকে চলে গিয়েছেন। বাঙালি যুবকের কাছে তাঁরা কোনো উচ্চ ধারণা রেখে যেতে পারেননি। এছাড়া তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে বাঙালি সামরিক এবং বেসামরিক আমলাদের মধ্যে। তারা তিক্ত অভিজ্ঞতায় বুঝেছে—বাঙালি বলেই তারা বঞ্চিত এবং শোষিত। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি বেঁচে থাকলে তাদের পদোন্নতি বন্ধ। চাকরিতে তারা কোনো সুযোগ সুবিধা পাবে না। এ পরিবেশেই সেকালের পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক জীবনে বাঙালিয়ানার জন্ম হয়। এ নতুন প্রজন্মের কাছে পাকিস্তান একটি অভিশাপ। এ অভিশাপের কবল থেকে বাঁচতে হলে স্বাধীন হতে হবে। বাঙালির রাজত্ব কায়েম করতে হবে। লক্ষণীয়, পাকিস্তানে আগরতলা ষড়যন্ত্র নামে কথিত বিদ্রোহের চেষ্টায় নেতৃত্বে ছিল সামরিক ও বেসামরিক আমলা। কোনো রাজনীতিক নয়। এ বিদ্রোহকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার জন্যে সামরিক এবং বেসামরিক আমলারা শেখ সাহেবকে নেতৃত্বে বসিয়েছিল। আওয়ামী লীগের কোনো সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগরতলা ষড়যন্ত্র নামে অভিহিত বিদ্রোহের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার, রাজনৈতিক নেতৃত্বের তুলনায় নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমলারা অনেক বেশি পাকিস্তানবিরোধী হয়েছিল। তারা একটি পরিবর্তন চেয়েছিল, যে পরিবর্তন পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোতে সম্ভব নয়। তবে সেই পরিবর্তনের চিন্তাধারার মধ্যে সমাজ বদলের কোনো কথা ছিল না। মুখ্য কথা ছিল সমাজের রূপান্তর হোক বা না হোক বাঙালিরাই বাঙালিকে শাসন করবে। আমাদের সংগ্রাম অবাঙালিদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিকভাবে মূল নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে আসেনি। সেখানে একটি প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব এবং দ্বিধা ছিল। কারণ স্বাধীনতার প্রশ্নটি কোনো দলীয় স্তরেই সামগ্রিকভাবে উত্থাপিত হয়নি। ফলে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান বা স্বাধীন বাংলাদেশ হবে, এ প্রশ্নের বিতর্কও শেষ পর্যন্ত ছিল এবং সেক্ষেত্রে আমার সুস্পষ্ট ধারণা হচ্ছে—পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সম্পর্কের কারণে শেখ মুজিবুর রহমান বা মওলানা ভাসানী কোনোদিনই একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। আমার ধারণা শেষ পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন পরিস্থিতির শিকার। তাঁরা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। প্রসঙ্গত ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর একটি ভাষণ এখনো আমার কানে বাজছে। তখন মওলানা ভাসানীকে কৃষকের নয়নমণি বলা হতো। শেখ সাহেবকে বলা হতো বঙ্গবন্ধু এবং জাতির পিতা। মওলানা ভাসানী তাঁর পল্টনের ভাষণে বললেন, বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা আর কৃষকের নয়নের মনি

www.nagorikpathagar.com

ভাসানী, কোনো কিছুই কাজে আসবে না। মুজিব তোমাকে পষ্ট করেই বলি—পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন না হলে তোমার বা আমার গায়ের চামড়া থাকবে না। অর্থাৎ মওলানা সাহেবের সুর একান্তই পরিষ্কার—পরিস্থিতি তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। অপরদিকে শেষ কথাও বলতে পারছেন না। প্রশ্ন উঠতে পারে, কৌশল হিসেবেই মওলানা সাহেব স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি নিশ্চয়ই জবাব দিতে পারেন যে—১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান দুই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নিয়েই পাকিস্তান গঠনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই মূল প্রস্তাব গ্রাহ্য না করে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল এবং সেই পটভূমিতেই স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তান দাবি করা যায়। কারণ এ দাবি যুক্তিসঙ্গত এবং আইনসঙ্গত।

কথার পিঠে কথা হিসেবে এ যুক্তি মেনে নেয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি তা ছিল না। তাই মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান এই দুই নেতাকে পাকিস্তান শব্দটির প্রশ্নে বারবার ইতস্তত করতে দেখা গেছে। ৭১-এর মার্চের আলোচনার শেষ মুহূর্তে পাকিস্তান সরকার বারবার অভিযোগ করেছে—শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান ভেঙে ফেলতে চাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা ওয়ালী খান ও এয়ার মার্শাল আজগর খান বারবার তার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান ভাঙছেন না। তাঁদের বর্ণনায় শেখ সাহেবের কথা ছিল—আমি মুসলিম লীগের কর্মী ছিলাম। আমি পাকিস্তান আন্দোলন করেছি। আমি পাকিস্তান ভাঙতে পারি না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানী একই ধরনের কথা বলেছেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর লন্ডনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব বলেছেন—আমি নই, ইয়াহিয়া খানই পাকিস্তান ভাঙার জন্যে দায়ী। ঢাকায় মওলানা ভাসানী বলেছেন—পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তান ভাঙেনি। পাকিস্তান ভেঙেছে পশ্চিম পাকিস্তানের জমিদার, জোতদার ও শোষক গোষ্ঠী। তাঁদের এ দু'জনের বক্তব্য ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়—পাকিস্তান শাসকেরা সঠিক আচরণ করলে পাকিস্তান ভাঙত না এবং সেক্ষেত্রে আমার ধারণায় বাংলাদেশের জন্ম ঐতিহাসিকভাবে সত্য বলে ধরে নেয়া যেত না। তবে আমি বলব—বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় লাহোর প্রস্তাবের দুই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নিয়ে পাকিস্তান গঠনের কথা কাজে লেগেছে। লাহোর প্রস্তাবের কাঠামোয় এ কথাগুলো বলা হলে কারো দেশপ্রেম নিয়ে সন্দেহ করা যায়নি। ১৯৪৭ সালের ভুল শোধরাবার নাম করে

www.nagorikpathagar.com

অত্যন্ত সন্তর্পণে স্বাধীনতার কথা বলে গেছে। এদিক থেকে লাহোর প্রস্তাব কাজে এসেছে নিঃসন্দেহে। তবে স্বাধীন বাংলাদেশ লাহোর প্রস্তাবের অনিবার্য পরিণতি, এ তত্ত্ব মানতে হলে বাংলাদেশ থাকে না। আর পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে শেখ সাহেব ও মওলানা সাহেব একটি ভিন্নতর মানসিকতার শিকার হয়েছিলেন, তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। এ মানসিকতা থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমরা শুনেছি পাকিস্তান হচ্ছে একটি মসজিদ। ইমাম খারাপ বলে মসজিদ তো ভাঙা যায় না। অর্থাৎ শাসনকর্তাদের তাড়াও। কিন্তু পাকিস্তান ভেঙো না।

কিন্তু পাকিস্তান শব্দটি প্রবীণদের মনে যত দাগ কাটুক না কেন নতুন প্রজন্মকে তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি। যার ফলে ষাটের দশকে সামরিক ও বেসামরিক আমলার পাশাপাশি ছাত্রদের মনেও স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন দানা বাঁধতে থাকে। এর সাথে জড়িত হন বিদেশ প্রত্যাগত একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী। তাঁরা বিদেশে গিয়ে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র গঠনের অযৌক্তিকতা ও অবাস্তবতা। তবে তরুণদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজনের জন্যে এ আন্দোলন দানা বাঁধতে সময় লাগে। আগরতলা ষড়যন্ত্র নামক বিদ্রোহের প্রস্তুতি তরুণদের এই আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে তোলে। আগরতলা ষড়যন্ত্র নামে বিদ্রোহই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি করে। এ গণঅভ্যুত্থানের নায়ক হিসেবে ছাত্রদের চিহ্নিত করা হলেও বা এ অভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুললেও অস্বীকার করা যাবে না, আগরতলা ষড়যন্ত্র নামক বিদ্রোহ না হলে বা এর সাথে শেখ সাহেবকে জড়ানো না হলে পরিস্থিতি এত শিগগিরই বিস্ফোরণোন্মুখ হতো না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমার লেখা ছিল সামরিক বেসামরিক আমলা ও আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগকে কেন্দ্র করে। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে, এ আন্দোলনে কি বামপন্থীদের কোনো ভূমিকা ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে বামপন্থীদের প্রকাশ্যে কাজ করার কোনো সুবিধা ছিল না। তবুও ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের কোনো অবদান ছিল, এ ধরনের ইতিহাস খুঁজে বের করা কঠিন। কিন্তু কেন এমন হলো?

বাংলাদেশের বামপন্থী বলতে তখন শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিকেই বোঝাত। আমরা যারা আরএসপি অর্থাৎ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য হিসেবে কাজ করতাম তারা ছিলাম ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। জেলে যেতে যেতেই অনেকের জীবন ফুরিয়ে গেছে। নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.com

ষাটের দশকে একেবারেই আমাদের রাজনীতি শিল্প এলাকাকেন্দ্রিক হয়ে যায়। আমরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বেছে নিই। সত্যি কথা বলতে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার কথা তখনো আমাদের মনে আসেনি। এমনিতেই হিন্দু, নাস্তিক এবং ভারতীয় এজেন্ট বলে আমরা নানা আখ্যায় ভূষিত। চাল-চলন কথাবার্তা সব ব্যাপারেই আমাদের সতর্ক থাকতে হয়। আত্মগোপন করলে আরবিতে নাম নিতে হয়। রাজনৈতিক কোনো পরিবর্তন হলে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতাম—জেলে যেতে হবে। তবে এ সময় শুনেছিলাম মস্কোতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্টদের আশি জাতি সম্মেলনে নাকি বাংলাদেশের দলিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। তবে সে প্রস্তাবের ভিত্তিতে কোনো কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে বলে শুনিনি।

তখনো কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়নি। তখনো বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি মাত্র কেন্দ্র এবং সে কেন্দ্রটি হচ্ছে মস্কো। তাত্ত্বিক জগতে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান শত্রু ছিলাম আমরা। কারণ আমরা বলতাম—লেনিনের পর স্ট্যালিন ভুল নীতি অনুসরণ করেছেন। আমরা বলতাম, কোনো একটি দেশে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয় হতে পারে না। অথচ ত্রিশের দশকে স্ট্যালিন বলেছিলেন—সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্যবাদের পথে এগুচ্ছে। আমরা বলতাম—রুজভেল্ট ও চার্চিলের চাপের ফলে ১৯৪৩ সালে স্ট্যালিন তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভেঙে দেন। আমাদের মতে স্ট্যালিনের আমলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সূত্রপাত হয়। আমাদের কমিউনিস্ট বন্ধুরা বলতেন আমরা ট্রটস্কি অনুসারী। আমাদের রাজনীতি ও ট্রটস্কির বক্তব্য সম্পর্কে আমার বন্ধুদের সম্যক ধারণা থাকলে এ বক্তব্য তাঁরা দিতেন না। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুরা তাত্ত্বিক দিক থেকে আমাদের চরম বিরোধিতা করতেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের জন্মের সময় থেকে এ প্রতিষ্ঠানটির সাথে আমরা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ছাত্রলীগে আমাদের টিকে থাকতে কষ্ট হয়েছে। ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ছেড়ে আমি ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার যোগদানের প্রশ্নেই ছাত্র ইউনিয়নের কাউন্সিলে ভোটাভুটি হয়। তবে ওই বিরাট কাউন্সিলে আমার বিপক্ষে ভোট পড়ে ২টি। এরপরেও আমার ছাত্র ইউনিয়নে থাকা হয়নি। ১৯৫৯ সালের সামরিক শাসনামলে আমি জেলে চলে যাই। ১৯৬২ সালে আমি মুক্তি লাভ করি। একদিন শুনলাম রাজধানী ঢাকার স্বামীবাগে ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন হচ্ছে ফরহাদ সাহেবের নেতৃত্বে। সেই সম্মেলনে আমাকে ডাকা হয়নি। সম্মেলনে প্রশ্ন উঠেছিল আমাকে না ডাকা

www.nagorikpathagar.com

সম্পর্কে। সম্মেলন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন ছাত্র ইউনিয়ন নামে তাঁরা নাকি একটি নতুন প্রতিষ্ঠান করেছেন। এ প্রতিষ্ঠান পুরনো ছাত্র ইউনিয়নের উত্তরাধিকারী নয়।

তবে আমাদের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধ চরমে উঠল ১৯৬৪ সালে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের চটকল শ্রমিকদের নেতৃত্ব আমাদের হাতে। আমাদের সংগঠনের নাম পূর্ব পাকিস্তান চটকল শ্রমিক ফেডারেশন। তখন দেশে সামরিক শাসন চলছে। ওই সামরিক শাসনের মধ্যেই ১৯৬৪ সালের ২ জুলাই আমরা চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট আহ্বান করি। তখন কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক সংগঠন ছিল পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক পরিষদ। সভাপতি ছিলেন তোয়াহা। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সিরাজুল হোসেন খান। আমাদের সহযোগিতার নামে তাঁরা আমাদের প্রচণ্ড অসহযোগিতা করলেন। তবুও ২১ দিন ধর্মঘটের পর আমরা জয়লাভ করি।

চটকল মালিকদের সাথে আমাদের চুক্তি হয়। মালিকরা চুক্তি লঙ্ঘন করলে ১৯৬৫ সালে আমরা পুনরায় ধর্মঘট আহ্বান করি। এবার আমার কমিউনিস্ট বন্ধুরা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাদের তখন রাজনৈতিক তত্ত্ব হচ্ছে—জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব স্তরে জাতীয় বুর্জোয়াদের সহযোগিতা করা যায়। তাদের ব্যাখ্যায় জাতীয় বুর্জোয়া হচ্ছে চটকল মালিক ইস্পাহানি এবং ইয়াহিয়া বাওয়ানী। অথচ তাদের বিরুদ্ধে আমরা ধর্মঘট করছি। কমিউনিস্ট পার্টির চটকল নেতা হচ্ছেন—মোহাম্মদ তোয়াহা এবং আবুল বাশার। চট্টগ্রামও চটকল ধর্মঘটের অন্তর্ভুক্ত। তখন চট্টগ্রামের ডিসি ছিলেন রাশেদ খান মেননের মেজ ভাই আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ। তোয়াহা এবং আবুল বাশার আবু জাফর ওবায়দুল্লার বাসায় মালিকদের সাথে বৈঠক করে এক চুক্তি সম্পন্ন করেন এবং চটকল ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন। কিন্তু সে প্রত্যাহার কোনো কাজে আসেনি। এ চুক্তির হাস্যকর দিক হচ্ছে, ধর্মঘট ডেকেছিলাম আমরা আর সে ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন তোয়াহা এবং আবুল বাশার। আমরা সে চুক্তি মানলাম না। কোনো চুক্তি না করেই আমরা কাজে যোগ দিলাম। এ হচ্ছে সে কালের বাম ঐক্যের একটি চিত্র। তবে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের প্রভাবের জন্যেই পরবর্তীকালে যশোরের কমিউনিস্ট নেতা ড. মারুফ হোসেনের সহযোগিতায় আমাদের সাথে এক সময় বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্পর্কে আলোচনা করতে আসেন। এ ধরনের আলোচনায় মূল কমিউনিস্ট পার্টির কাউকে আমি অংশগ্রহণ করতে দেখিনি। প্রসঙ্গত বলা যায়, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের একটি

www.nagorikpathagar.com

অংশ এবং বামপন্থীদের এ অংশটি ছাড়া আমরা কাউকে বাংলাদেশ স্বাধীন করা নিয়ে আলোচনা করতে শুনিনি।

এই পরিবেশে কমিউনিস্ট শিবিরের সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে মস্কো-পিকিং দ্বন্দ্ব। ১৯৪৯ সালে চীনে বিপ্লব হয়। ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যু হয়। ক্ষমতায় আসেন ক্রুশ্চেভ। ক্রুশ্চেভ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০ কংগ্রেসে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উত্থাপন করেন। ক্রুশ্চেভ বলেন, স্ট্যালিনের ব্যক্তিগত কারণে লাখ লাখ কমিউনিস্ট কর্মী নিহত হয়েছে। স্ট্যালিনের আমলে কারো স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার ছিল না। ক্রুশ্চেভের অভিযোগে সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায়। বাম মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। ক্রুশ্চেভ তাঁর বর্ণনায় স্ট্যালিনকে ভয়ঙ্কর দানব হিসেবে চিত্রিত করেন। আর তারই সাথে তিনি এক নির্ভেজাল তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এ নির্ভেজাল তত্ত্ব হচ্ছে পুঁজিবাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুঁজিবাদী বিশ্বকে পরাজিত করা।

স্ট্যালিন সম্পর্কে ক্রুশ্চেভের মূল্যায়ন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্ব সমগ্র পৃথিবীকে মুখ্যত সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। চীনের এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করে আর শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি মস্কোপন্থী অপরটি পিকিংপন্থী।

সেকালের পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়ে। এককালে সবাই মিলে যারা মস্কোপন্থী বলে অভিহিত হতো তারা মস্কো ও পিকিং এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে যে অপবাদ ছিল যে—তারা দেশীয় রাজনীতির ভিত্তিতে কোনো কিছু নির্ণয় করে না। আন্তর্জাতিক নীতিই তাদের সবচেয়ে বড়ো নিয়ামক শক্তি। সেই অপবাদই আবার প্রমাণিত হলো। দেশের সমস্যার নিরিখে নয়, বিদেশের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে গেলো। এককালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্কের নিরিখে দেশীয় কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্ব সরকার সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করত। এবার সে রূপ পাল্টে গেল। পাকিস্তানের শাসন কর্তা আইয়ুব খানের সঙ্গে সমর্থন জানাল। মস্কো সরকারের সাথে আইয়ুব খানের সম্পর্ক ভালো নয় তাই মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি আইয়ুব বিরোধী হয়ে গেল।

তবে এ ক্ষেত্রে ভারতও একটি ফ্যাক্টর। ভারত সরকার তার জন্মলগ্ন থেকে রাজনৈতিক কারণে নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখে

www.nagorikpathagar.com

এ নিরপেক্ষ থাকার অর্থ হচ্ছে—সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে থাকা। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যেই ভারতের বিরোধিতা করত। আর ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু বলে নিশ্চয়ই চীনের বন্ধু নয় এবং পাকিস্তানেরও বন্ধু নয়। আর এ তত্ত্ব অনুসারে বাংলাদেশের মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি কিছুটা ভারতপন্থী আর পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি কিছুটা ভারত বিরোধী। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশের আন্দোলন ষাটের দশকের প্রথম দিকে মস্কোপন্থী কোনো কোনো মহলে হালে পানি পেলেও পিকিংপন্থীরা মনে করতো বাংলাদেশ স্বাধীন করার আন্দোলন হচ্ছে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র ষড়যন্ত্র। তাই ছয় দফা সম্পর্কে তীব্র প্রতিক্রিয়া ছিল বামপন্থী মহলে।

তবে সেকালের প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষ বা পাকিস্তান ভাঙার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা ছিল না তা হলফ করে বলা যাবে না। তবে আমাদের বামপন্থীদের অসুবিধা হচ্ছে—আমরা কোনোদিনই কোনো ঘটনাকে নিজস্ব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে চাই না। আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না যে কোনো ষড়যন্ত্রই উর্বর ভূমি না থাকলে সফল হয় না। পাকিস্তান আন্দোলন সম্পর্কে আমরা বলতাম—এটা ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র। অথচ কেউ ব্যাখ্যা করিনি, আপামর মুসলিম জনসাধারণ কেন পাকিস্তানের পক্ষে চলে গেল। কেন আমাদের পক্ষে এল না। এ সত্যটি অনুসন্ধান করে জানতে পারলে এ উপমহাদেশের ইতিহাস ভিন্নরকম হতো।

একই ধরনের মনোভাব আমরা ছয় দফা নিয়ে দেখিয়েছি। শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দিলেন। আমরা বললাম সিআইএ'র দলিল। অথচ সাধারণ মানুষ তাঁর কথা গ্রহণ করল। কেন গ্রহণ করল এ সত্যটি বুঝবার চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই এ আন্দোলনে আমরা নেতৃত্ব দিতে পারতাম। আমার ধারণা এ প্রশ্নে আমার কমিউনিস্ট বন্ধুরা আন্তর্জাতিক তত্ত্বের শিকার হয়েছেন। আন্তর্জাতিক শত্রু-মিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় শত্রু-মিত্র নিরূপণের চেষ্টা হয়েছে। কখনো জাতীয় সমস্যা চোখের সামনে আসেনি। জাতীয় সমস্যা দেখা দিয়েছে আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে। তাই প্রতিটি সমস্যার কালে ইংরেজিতে বলা যায়—আমরা ইর্ড করিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও বামপন্থীদের তেমন ভূমিকা ছিল না। ছিটেফোটা উপদল ছাড়া কেউ ১৯৭১ সালের ১ মার্চের আগে এ প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দেয়নি।

তবে এর পরেও প্রশ্ন থাকে। প্রশ্নটি হচ্ছে ১৯৬২ সালে ছাত্রলীগ বাংলাদেশ স্বাধীন করার সিদ্ধান্ত নিলেও আওয়ামী লীগ তার ছয় দফা দাবি

www.nagorikpathagar.com

পেশ করতে আরো চার বছর কেন দেরি করল? ছাত্রলীগের এ চিন্তা-ভাবনায় কি ছিল? লক্ষণীয়, ছাত্রলীগের এ অংশটি ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে তেমন ভূমিকা নেয়নি। আবার এরাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ গঠন করে। তাহলে কি জাসদ গঠনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ষাটের দশকে? আমি এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করব পরবর্তী লেখায়।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে চীন আবির্ভূত হওয়ার পরে কমিউনিস্ট মহলে একটি নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমরা অর্থাৎ আরএসপির সদস্যরা ব্যতীত এক সময় সকলেই ছিল মস্কোর অনুসারী। কমিউনিস্ট। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ অর্থাৎ সোশ্যাল ডেমোক্রেসি পৃথিবীর এ অংশে তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব সম্পর্কে আমাদের এই এলাকায় ধ্যান-ধারণা তখন তেমন স্বচ্ছ ছিল না। মনে করা হতো কমিউনিস্ট মাত্রই মস্কোপন্থী। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসারী। অজ্ঞতা ছিল একান্তই গভীর। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৮ সালে বরিশালে মে দিবস পালনের জন্যে পুলিশের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়েছিল। পুলিশ লিখে দিয়েছিল, দিবসটি রাশিয়ার। সুতরাং এ দিবস পালনের অনুমতি দেয়া যাবে না। ১৯৫০ সালে আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক পুলিন দে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ছিল তাঁর হাতে ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' বইটি ছিল! পুলিশের কাছে ম্যাক্সিম অর্থ মার্কসসিজম অর্থাৎ কমিউনিজম। সুতরাং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে এ পুস্তক বহনকারীকে গ্রেফতার করা একান্তই কর্তব্য।

জেলখানায় আবার উল্টো গল্পও শুনেছি। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন ঢাকার কমরেড গোপাল বসাক। ১৯৪৯ সালে তিনি গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি আগে কোনোদিন গ্রেফতার হয়েছিলেন কি? অর্থাৎ সে এক অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারের যুগ। আর এ সুবাদে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিতে কমিউনিস্ট বা সমাজতন্ত্রী অর্থে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুদেরই বোঝাত। তবে এ সুযোগ আমার কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুরাও নিয়েছেন। তাঁরা বলতেন, তারাই একমাত্র সাচ্চা কমিউনিস্ট। আর সবাই সাম্রাজ্যবাদের দালাল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে বলা মানে সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে বলা। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে যাঁরা বলেন, তাঁরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট। সে অর্থে কমিউনিস্ট বন্ধুদের ভাষায় আমরা ছিলাম সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট। আমরা

www.nagorikpathagar.com

যেমন লেনিন পরবর্তী স্ট্যালিনের নীতি ভুল বলতাম। যেমন বলতাম যে পূর্ব ইউরোপে আদৌ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জয়ের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল ফৌজ দেশে ফিরে যাবার পথে পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, চেকোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া এবং আলবেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে উপর থেকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়ে গেছে। শুধুমাত্র রুমানিয়া যুগোশ্লাভিয়ায় বিপ্লবের পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু লাল ফৌজের হস্তক্ষেপে সেখানে বিপ্লব হওয়ার পরিবর্তে তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই আমরা বলতাম, পূর্ব ইউরোপে কোনো বিপ্লব হয়নি এবং প্রতিবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কমিউনিস্ট বন্ধুরা বলতেন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে এ সকল রাষ্ট্রে। তবে তৎকালীন কোনো তাত্ত্বিকই বলতে পারেননি যে সেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উত্তরণের পথ কী। আমাদের এ সমালোচনার জবাব দিতে না পেরে আমাদের নির্ভেজাল মার্কিন দালাল বলে অভিহিত করা হয়।

চীনের বিপ্লব সম্পর্কেও আমাদের ভিন্ন বক্তব্য ছিল। চীন কখনো দাবি করেনি যে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে। এ নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়ারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। আমাদের সমালোচনা ছিল এই বিপ্লবও বিপদে পড়বে। বিপ্লবের সহযোগী বলে কথিত জাতীয় বুর্জোয়ারা ষড়যন্ত্র করবে। দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সহযোগিতায় প্রতি বিপ্লব ঘটাতে চাইবে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। শ্রেণি সমন্বয়কারী জোটের নেতৃত্বে শ্রেণিসংগ্রাম করা যায় না।

আমরা এখনো বিশ্বাস করি পূর্ব ইউরোপ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য সঠিক ছিল। চীন সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য যে সঠিক ছিল তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন প্রয়াত কমরেড মাও সে তুং। শ্রেণি সমন্বয়ের রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেছিলেন। কিন্তু সফল হননি। সেকালে আমাদের এ সমালোচনার জন্যেও আমরা মার্কিন দালাল বলে অভিহিত হতাম।

তবে আগেই বলেছি সব কিছুর একটা পরিবর্তন আসে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব শুরু হলে। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের কাছে তাদের বিরোধী সকলের ছিল সাম্রাজ্যবাদের দালাল। তারাই ছিল একমাত্র সাচ্চা বিপ্লবী। তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বললে বলা হতো নিশ্চয়ই এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থ পেয়েছে।

চীন-রাশিয়া দ্বন্দ্ব শুরু হলে এ চিত্রের পরিবর্তন হয়। কমিউনিস্ট আন্দোলন মুখ্যত মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী হিসেবে ভাগ হয়ে যায়। তাদের নিজেদের মধ্যকার গালিগালাজ মুখ্য হয়ে ওঠে। কতটুকু সাচ্চা বিপ্লবী সে তত্ত্ব

www.nagorikpathagar.com

প্রমাণেই সকলে গলদঘর্ম এবং আমাদের বিরুদ্ধে ছুড়ে দেয়া মন্তব্যগুলোই তাদের ঝগড়ার হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল। একটি বড় ধরনের সর্বনাশ হয়ে গেল পৃথিবীর কমিউনিস্ট আন্দোলনে। দল ভাগাভাগির নামে যে কেউ এখন দলের সদস্য পদ পেতে শুরু করল। নতুন নেতৃত্ব এল যাদের জ্ঞানের পরিধি একান্তই সীমিত। রাতারাতি মস্কোপন্থী পিকিংপন্থীতে পরিণত হল। আবার অনেক পিকিংপন্থী পরিণত হলো মস্কোপন্থীতে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল। নেতৃত্ব রক্ষাই বড় হয়ে উঠল।

সেকালের সে সর্বনাশা চিত্রের একটি আবছা আদল আজকের জাতীয় রাজনীতিতে আছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে সেকালে যারা পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট বলে পরিচিত ছিল তাদের মধ্যে অনেকে এখন বিএনপি নামক রাজনৈতিক দলের সদস্য। মস্কোপন্থী বলে পরিচিত অনেকে আওয়ামী লীগের সদস্য।

লক্ষণীয় যে আজকের এ পরিণতির ইতিহাস শুরু হয়েছিল ষাটের দশকে। ষাটের দশকেই মস্কো-পিকিং দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বে কমিউনিস্ট পার্টি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আর এ ষাটের দশকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বাহ্যত দানা বাঁধতে শুরু করে। তাই আমার নিজের ধারণা ব্যক্তি বা উপদল হিসেবে বামপন্থীদের কিছু নেতা ও কর্মী বিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে ভাবলেও মস্কোপন্থী বা পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট বলে পরিচিত দলগুলোর পক্ষে তখন বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্পর্কে স্থির কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব ছিল না।

এছাড়া মনে রাখতে হবে যে আমি যে ধরনের পিকিংপন্থী বা মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির কথা বলেছি সে ধরনের কোনো পার্টি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করত না। দু'টি দলকেই ভাসানী, ন্যাপ ও মোজাফফর ন্যাপ নামে কাজ করতে হতো। ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপকে বলা হতো পিকিংপন্থী। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে পরিচালিত ন্যাপকে মস্কোপন্থী বলা হতো। এ দু'টি দল কোন অর্থেই কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। এ দু'টি দলে বিভিন্ন মত শ্রেণি ও পেশার লোক ছিল। ফলে এ দু'টি দলের সাধারণভাবে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আন্দোলন পরিচালনা করা আদৌ সম্ভব ছিল না। এ দু'টি দলের পেছনের শক্তি ছিল আত্মগোপনকারী মস্কোর অনুসারী কমিউনিস্ট পার্টি আর পিকিং অনুসারী বহুধা বিভক্ত কমিউনিস্ট দল ও উপদল। এই উপদলের মধ্যে একমাত্র মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়নে পক্ষ থেকেই ১৯৬৮ সালে স্বাধীন

www.nagorikpathagar.com

জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের আহ্বান জানানো হয় প্রকাশ্যে। এর কিছুদিন পর থেকে অথবা একই সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের আহ্বান জানিয়েছে সিরাজ সিকদারের পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি। তবে দল হিসেবে এরা কোনোদিনই প্রকাশ্যে আসেনি। তাই প্রথমেই আমি বলতে চেয়েছি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বয়স যতই হোক না কেন, এ আন্দোলন প্রথম দিকে কোনো রাজনৈতিক দলই সুসংগঠিতভাবে শুরু করেনি। প্রথম নেতৃত্ব এসেছিল বিক্ষুব্ধ সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের পক্ষ থেকে। তারাই আগরতলা ষড়যন্ত্র নামক বিদ্রোহের নেতা। আর প্রায় একই সময় ষাটের দশকের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের একটি অংশ গোপনে হলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলতে শুরু করে।

তবে সে আন্দোলনও তখন তেমন জোরদার ছিল না। কারো মনে তেমন রেখাপাত করেনি। এবং সে আন্দোলন যে কত ঠুনকো তা প্রমাণিত হয় ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়। আমি তখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কিভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। পরবর্তীকালে যারা দারুণ বাঙালি হয়েছে স্বাধীনতার পর অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছে বা এখনো পাচ্ছে, আমি তাদের দেখেছি পাকিস্তান বেতারে যেতে। দেখেছি গান লিখতে। গানে সুর দিতে। নিজেরা গান করতে। ঢাকা শহরে মিছিল করতে। গাড়িতে 'ক্রাশ ইন্ডিয়া' স্টিকার লাগিয়ে শহরময় ঘুরে বেড়াতে। যারা স্টিকার লাগাইনি তারা হয়েছি তাণ্ডবের শিকার। আমাদের এককালের সকলের পরিচিত বন্ধু খালেকদাদ চৌধুরী এর মধ্যে একদিন প্রেস ক্লাবে এসে বললেন, নির্মল বাবু, এক আন্তর্জাতিক রায়টের ছবি দেখছি প্রতিদিন। আমরা দু'টি রাষ্ট্রের মানুষ সকলে হিন্দু-মুসলমান হয়ে গেছি। আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে কথা বলছি। বিহার থেকে আসা শরণার্থী বিমানবাহিনীর আলম এখন আমাদের জাতীয় নেতা। কারণ সে ভারতের ১১টি বিমান ধ্বংস করেছে। অর্থাৎ সমগ্র দেশে ১৯৪৭ সালের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সে যেন 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর পরিবেশ।

আমি কিন্তু খুব অবাক হইনি। আমি নিজেও তখন আশ্রয় খোঁজার জন্যে অস্থির। পাক-ভারত যুদ্ধ হচ্ছে। আমার বাবার নাম বাংলায়। আমি রাজনীতি করি। তাই আমাকে তো জেলে যেতেই হবে। পরদিন খবরের কাগজে দেখলাম কমিউনিস্ট, অ-কমিউনিস্ট সকল হিন্দু নেতাকেই গ্রেফতার করা হচ্ছে। আমি প্রখ্যাত সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বেরকে ফোন করলাম। বললাম, দেখুন ছাত্ররাজনীতি করে দীর্ঘদিন জেল খেটেছি। হিন্দু হিসেবে জেল

www.nagorikpathagar.com

খাটতে রাজি নই। আমি তখন দৈনিক পাকিস্তানের সহসম্পাদক। আমি তাঁকে বললাম, আমি যাতে গ্রেফতার না হই তার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিভিন্ন কারণে মোদাব্বের সাহেব তখন সকল মহলে বিশেষ প্রভাবশালী। তিনি জানালেন, তুমি এ সময় ঢাকা ছেড়ে কোথাও যাবে না। দেখি কী করা যায়। তখন দৈনিক পাকিস্তানের বার্তা সম্পাদক তোয়াব খান। আমি তাঁকে বললাম, আমি রাতের শিফটে কাজ করব প্রতিদিন। তখন রাতে যখন তখন সাইরেন বাজত। রাতে কেউই কাজ করতে চাইত না। সুতরাং আমি রাতের শিফটে বহাল হয়ে গেলাম।

কিন্তু দেখলাম, আমার এই রাতের শিফটের কাজও আমাকে বিপদে ফেলে দিবে। আমি সাংবাদিকতা ছাড়াও বিভিন্ন বাড়িতে তখন শিক্ষকতা করতাম। উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বাড়ি পর্যন্ত শিক্ষক হিসেবে আমার অবাধ যাওয়া-আসা ছিল। আমি দেখলাম, আমার রাতে চাকরি করা নিয়ে সর্বত্রই সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। আমার এক তরুণ ছাত্র একদিন বলেই বসল, স্যার, আপনাকে সত্যি সত্যি কেউ বিশ্বাস করে না। সবাই বলে রাতে দৈনিক পাকিস্তান থেকে আপনি ভারতে খবর পাঠিয়ে দেন। তাদের অজ্ঞতা আমার হাসি যোগাত। আমার এক প্রিয় ছাত্রী, যে বেতারে গান গেয়ে পাকিস্তানকে বাঁচাবার জন্যে সকাল-সন্ধ্যা পরিশ্রম করত, যুদ্ধের পর সেও একদিন আমাকে বলে বসল, স্যার যুদ্ধের সময় আপনাকে কখনো বিশ্বাস করিনি। আর এখন মনে হচ্ছে আপনার কথাই ঠিক। পৃথিবীতে একটি অনন্য যুদ্ধ হলো। যে যুদ্ধে দুই দেশই দাবি করে বসল যে, উভয়ই জিতেছে এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হলো। এ ভাওতাবাজির তুলনা নেই।

আমি তখন এ সকল বিতর্কে যোগ দিতাম না। আমার কাছে ছিল সে এক বিরাট অভিজ্ঞতা। ছাত্র-যুবক রাজনৈতিক দলের সেকালের ভাষণ বিবৃতি আমার আজকেও মনে আছে। আমরা তখন নিখাদ পাকিস্তানি। মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা বিভ্রান্ত। সাহস করে কথা বলতে চাচ্ছে না। পিকিংপন্থীদের মুসলিম লীগের সাথে পৃথক করে দেয়া অসম্ভব হয়ে উঠত। অনেকের কাছে বিতর্কিত হলেও মওলানা ভাসানীকেই তখন আমার কিছুটা মনে হয়েছে তিনি জনগণের মন বুঝতেন। তিনি চেষ্টা করেছেন ওই সঙ্কটের সময়ও কিছুটা নেতৃত্ব দিতে। আমার কথা হচ্ছে—এর পরের ইতিহাস কি খুব চমকপ্রদ নয়? ১৯৬৫ সালে আমরা ভারতের সাথে যুদ্ধ করলাম। ভারতকে ধ্বংস করার শ্লোগান দিলাম। একটা নতুন পাকিস্তানি পরিবেশ সৃষ্টি করলাম। আবার বছর না যেতেই ছয় দফা দাবি পেশ করা হলো। তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে

www.nagorikpathagar.com

পারে এটা কি ভোজবাজি? ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ রাতারাতি কি পাকিস্তানবিরোধী হয়ে গেল। পাকিস্তান রক্ষার জন্যে জান কোরবান করে আবার বছর না ঘুরতেই পাকিস্তান ভাঙতে চাইল।

আমার এ লেখা একান্তভাবে আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত। আমি সমসাময়িক খবরাখবরের ওপর ভিত্তি করে আমার বক্তব্য বলার চেষ্টা করেছি। আমার বিবেচনায় পাকিস্তানের জন্মের পর একাত্তর সালের সংগ্রাম পর্যন্ত আমাদের দেশের রাজনীতি অনেক বাঁক ও মোড় নিয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নটি পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে আসেনি। এমনকি আমার ধারণা হচ্ছে—১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালিদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এ আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। আমি শুনেছি, পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেই মুসলিম ছাত্রলীগের একটি অংশ কলকাতা থাকতেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার চিন্তা করেছিল। তবে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় এ দাবি প্রথম তুলেছিল তমুদ্দিন মজলিশ, যারা শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। আমার এ ধরনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বহু কথায় আমি ইতোপূর্বে লিখেছি। সেই সকল ব্যাখ্যা একের পর এক সাজালে নিম্নরূপ দাঁড়ায়। আমার মতে—

১. ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালিয়ানার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

২. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ভাষাভিত্তিক মানসিকতার একটি প্রাথমিক স্তর সৃষ্টি হয়।

৩. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেও ক্ষমতা না পাওয়ায় বাঙালিদের মনে একটা স্বতন্ত্র ধারণা সৃষ্টি হয় এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ২১ দফায় স্বায়ত্তশাসনের কথা প্রথম উচ্চারিত হয়।

৪. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পরে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের ফলে স্বতন্ত্র দেশ গড়ার আন্দোলন পিছিয়ে যায়। ১৯৫৬ সালের সমঝোতার মাধ্যমে একটি সংবিধান তৈরি হয়। সেই সংবিধানে দুই ইউনিটের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে ভাগ করা হয়। দুই ইউনিট অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সব ব্যাপারে সমান সুযোগ দেয়ার বিধান রাখা হয়। অথচ পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন ছিল বাঙালি। সংবিধানে এ ধারার বিরুদ্ধে জনমনে বিক্ষোভ ছিল। ধারণা করা হয়েছিল ১৯৫৮ সালে সাধারণ নির্বাচন হবে এবং এ নির্বাচনের পর হয়তো সমস্যার একটা সমাধান হবে। কিন্তু সে নির্বাচন এল না। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলো। গণতন্ত্র নির্বাসিত হলো সমগ্র পাকিস্তান থেকে

www.nagorikpathagar.com

এবং তার প্রথম শিকার হলো নতুন গড়ে ওঠা বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ। বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আঘাত এলো। একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, বাঙালি হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে একটা কিছু করতে হবে। কিন্তু তখনো রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের চিন্তা দানা বেঁধে ওঠেনি।

৫. সামরিক শাসনামলে বাঙালি সরকারি বেসরকারি আমলারা অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে শিখল যে, পাকিস্তানের কাঠামোয় তাদের জীবনের কোনো নতুন কিছু ঘটবে না। কর্মজীবনে কোনো উন্নতি করতে হলে বাঙালির শাসন প্রয়োজন।

৬. এই মানসিক পরিস্থিতিতে ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ হলো। এ যুদ্ধ চলেছিল ১৭ দিন। এ যুদ্ধের সময় প্রমাণিত হলো যে, ভৌগোলিক অর্থে আমরা পাকিস্তানের অঙ্গ নয়। আমরা পূর্ব পাকিস্তান ছিলাম একান্তই অরক্ষিত। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমাদের রক্ষা করা সম্ভব নয় এবং সম্ভব ছিলও না। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় যে কোনো মুহূর্তে আমাদের ধ্বংস্তূপে পরিণত করতে ভারতের কোনো অসুবিধা ছিল না। সবচেয়ে মজার হচ্ছে—১৯৬৫ সালের যুদ্ধ সকলকে কট্টর পাকিস্তানিতে পরিণত করেছিল। সে যুদ্ধে 'ভারতকে ধ্বংস করো' এটাই ছিল আমাদের একমাত্র শ্লোগান। সে যুদ্ধের পরপরই সব কিছু পাল্টে গেল। যুদ্ধে প্রমাণিত হলো আমরা অরক্ষিত এবং সকলের মনে অনিবার্য সিদ্ধান্ত হলো যে, আমাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে। আমাদের কেউ বাঁচাতে আসবে না। অর্থাৎ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র চাই। আর এই পরিবেশেই যৌক্তিক হয়ে দেখা দিল ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব। এ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে। দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হলে তার নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে। অথচ ১৯৪৭ সালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়নি। দু'টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে পাকিস্তান নয়, পাকিস্তান একটি এককেন্দ্রিক সরকারে গঠিত হয়েছিল। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকার আদৌ প্রশ্ন ছিল না। সেই প্রশ্নই বাস্তব হয়ে দেখা দিল ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর এবং আমার ধারণা ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ধারণা পূর্ণতা লাভ করে। কারণ রাষ্ট্র স্বাধীন না হলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও স্বাধীন হয় না।

৭. আমি বলার চেষ্টা করেছি যে, জাতীয়তাবাদী এ আন্দোলনের নেতৃত্ব বামপন্থীদের গ্রহণের কথা থাকলেও পাকিস্তানের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের এ সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণের আদৌ কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

www.nagorikpathagar.com

৮. আমি আরো বলতে চেয়েছি যে, সর্বশেষ বিচারে শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাইলেও পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের সম্পৃক্ততা ও গভীর আত্মিক যোগাযোগ থাকার কারণে তাঁরা পাকিস্তানের কাঠামোতে একটি সমাধান বের করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই তাঁরা সফল হননি।

৯. আমার ধারণা ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর খুব দ্রুত গতিতে ঘটনা পাল্টাতে থাকে। বিশেষ করে বিক্ষুব্ধ সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের একটি অংশ নিজেদের উদ্যোগেই একটা কিছু করার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সাংগঠনিক কিংবা মানসিক দিক থেকে তেমন প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে আগরতলা ষড়যন্ত্র নামক বিদ্রোহের ঘটনা সাধারণ মানুষকে যেমন স্তম্ভিত করে দেয় তেমনি রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও বিপদে ফেলে দেয়। আজকে হয়তো অনেকেই স্বীকার করবেন না যে, তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা প্রকাশ হওয়ার পরে জনসাধারণ কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রথমেই এ মামলাকে সমর্থন জানায়নি। এ মামলা নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ছিল। অথচ রাজনৈতিক জীবন থেকে এ মামলাকে মুছে ফেলা যাচ্ছিল না। এ মামলার পাশাপাশি ছয় দফা ও এগারো দফা আন্দোলন ছাত্ররা গড়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে ছয় দফা ও এগারো দফা বাস্তবায়নের একটি ছোটোখাটো মডেল হিসেবে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ সেদিন যা কল্পনায় ছিল তা যে বাস্তবায়ন করা যায় তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিল তার একটা নজির। এ মামলা মানুষের কাছে পরিষ্কার করে দেয় যে, আমরা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে সামরিক বাহিনীরও সমর্থন পাব। আর দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ পরিস্থিতির জন্যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ছয় দফা এগারো দফার আন্দোলন মুখ্যত ছিল আবেগ নির্ভর এবং স্বতঃস্ফূর্ত। এ ছাড়া ছয় দফা, এগারো দফা নিয়ে ডান ও বাম রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। সুতরাং ছয় দফা ও এগারো দফার আন্দোলনকে স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত করা যাবে ঠিক তার কোনো সত্যিকার ছবি কারো মাথায় ছিল না। সীমিত ক্ষেত্রে কেউ কেউ স্বাধীনতার কথা চিন্তা করলেও তাদের চোখের সামনে বাধা ছিল হিমালয় পরিমাণ।

১০. প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করলে আমাদের সহায়ক শক্তি কে হবে? এ প্রশ্নে কারো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, দেশ স্বাধীন হলে কোন ধরনের বাংলাদেশ গঠিত হবে? কোন সমাজ কাঠামো আমরা পাব? আমি যতোটুক জানি, ৭১-এর সংগ্রাম শুরু করার পূর্বে

www.nagorikpathagar.com

এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার কোনো অবকাশ ছিল না। আবার আলোচনা হলেও মতানৈক্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। তাহলে আমরা কী সংগ্রাম করলাম? কোন যুক্তিতে সংগ্রাম করলাম? কাকে বন্ধু ভেবে সংগ্রাম করলাম? কোন সমাজের জন্যে সংগ্রাম করলাম? এ ধরনের কোনো প্রশ্নের জবাব না খুঁজেই আমরা কি ৭১-এর সংগ্রাম শুরু করেছিলাম না? এর পরিবর্তে বলা যায়, আমাদের ওপর হঠাৎ করে সংগ্রাম চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ সংগ্রামের জন্যে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। তাই কথাটা এভাবে বলা যায় যে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের কর্ণধাররা পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের হিসেবের খাতা থেকে খারিজ করে দিয়েছিল। তাদের পূর্ব পাকিস্তানের কাছ থেকে পাওয়ার মতো তেমন কিছু ছিল না। তাদের শোষণে পূর্ব পাকিস্তান তখন রিক্ত। পূর্ব পাকিস্তানকে যেনতেন প্রকারে ছুঁড়ে ফেলে দেয়াই তাদের একমাত্র কাজ ছিল। হয়তো তারা ভেবেছিল ১৯৭০-এর নির্বাচনে তাদের তাঁবেদাররা জয়লাভ করবে। তাদের তাঁবেদাররা জয়লাভ করলে হয়তো আরো কিছুদিন পূর্ব পাকিস্তানকে দাবিয়ে রাখা যাবে। কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাদের দালালরা পরাজিত হয়। একটি নতুন শক্তির উন্মেষ ঘটে। পাকিস্তানি শাসকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন বা শোষণ চলবে না। আজ হোক, কাল হোক এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাদের বিদায় নিতে হবে। তাই তাদের সিদ্ধান্ত ছিল শেখ সাহেবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার। বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক, এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। ৭০-এর নির্বাচনের পর এ ধরনের নীতি গ্রহণ করা না হলেও কিছুতেই ইয়াহিয়া কিংবা ভুট্টোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যাখ্যা করা যায় না গঙ্গা নামক একটি ভারতীয় বিমানকে ছিনতাই করে লাহোরে ভস্মীভূত করা। এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে যুদ্ধটা পাকিস্তান সরকারই এগিয়ে এনেছে। এ যুদ্ধে জড়িয়েছে ভারতকে। আমাদের বিক্ষুব্ধ করেছে প্রতিদিনের ঘটনা। আজ সেকালের ঘটনার হিসেব দিলে দেখা যাবে আমরা সকলে প্রতিদিন সমঝোতার কথা বলেছি। আপোষের কথা বলেছি। আমাদের দাবি মেনে নেয়ার কথা বলেছি। কিন্তু আমাদের কোনো দাবি মেনে নেয়া হয়নি। আজকের অনেক রাজনৈতিক ভাষ্যকার বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কিছু করার ছিল না। তিনি সামরিক বাহিনীর হাতে বন্দি ছিলেন। ৭১-এর নাটকে খলনায়ক ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। কিন্তু এ ভাষ্যকাররা কিছুতেই বলতে চায় না যে, ওটাই ছিল পাকিস্তানের রাজনীতি। ইয়াহিয়া, ভুট্টো, সেনাবাহিনী বা পাকিস্তানের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের এ ব্যাপারে ঐকমত্য

www.nagorikpathagar.com

ছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমার ধারণা ৭১-এর যুদ্ধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমাদের মধ্যে অনেকে এটা আঁচ করলেও নেতৃত্ব পর্যায়ে এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না। জনসাধারণ ছিল একেবারে অন্ধকারে। নইলে ২৫ মার্চ রাতে লাখো লাখো মানুষ বেঘোরে প্রাণ হারাত না। একটি মুক্তিযুদ্ধের জন্যে যে জাতি প্রস্তুতি নেয়, তারা এভাবে কোনোকালে কোনোদিন প্রাণ দেয় না। আজকে সাহস করে বলতে হবে যে, সে রাতে হানাদার পাকিস্তানিদের হাতে লাখ লাখ সচেতন মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়নি। মারা গেছে নিরীহ নির্বিরোধ সাধারণ নাগরিক। এ মৃত্যুর জন্যে রাজনীতিকদের দায়িত্ব অস্বীকার করা যাবে না।

আমার এ লেখা দেখে মনে হতে পারে ৭১-এর সংগ্রামকে আমি একটি নেতিবাচক জায়গায় দাঁড় করাচ্ছি। যেন সবকিছুর জন্যেই দায়ী ছিল পাকিস্তান সরকার। পাকিস্তানই যেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে বাধ্য করেছিল। আমার লেখা সম্পর্কে এ ধরনের ব্যাখ্যা সঠিক হবে না। আমি বলতে যাচ্ছি যে—তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের উদাত্ত কামনা ছিল পাকিস্তানের শাসন বাঙালিদের হাতে থাকতে হবে। বাঙালিরা শাসন ক্ষমতায় না গেলে সকল ক্ষেত্রে আমরা বঞ্চিত এবং শোষিত হব এবং এ লক্ষ্যেই বাঙালিরা নৌকায় ভোট দিয়েছিল। প্রার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো চিন্তা তারা করেনি এবং সে নির্বাচনে বাঙালিরা জয়লাভ করেছিল। কিন্তু বাঙালির হাতে ক্ষমতা এল না এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন মুখ্য হয়ে উঠল। প্রশ্নটি হচ্ছে—বাঙালির হাতে যদি ক্ষমতা দেয়া না হয় তাহলে বাঙালিরা কী করবে? নির্বাচনের বিকল্প কী? বাঙালি কি হাতে অস্ত্র নেবে? বাঙালি কি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করবে? মিছিলে-সমাবেশে এবং জনসাধারণ এ ধরনের স্লোগান উঠলেও সারাদেশের মানুষের কাছে সংগ্রামের এ অধ্যায়টি স্পষ্ট ছিল না। এ ধরনের অভিজ্ঞতা তাদের থাকারও কথা নয়। তাদের বলা হয়েছিল, নৌকায় ভোট দাও। বাঙালির প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে সব দুঃখের অবসান হবে, সকল বঞ্চনার শেষ হবে।

কিন্তু ক্ষমতায় না গেলে কী হবে? ১৯৫৪ সালের মতো বাঙালিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলে কী হবে? স্লোগানে স্লোগানে বলা হতো ছয় দফার শেষ কথা স্বাধীনতা স্বাধীনতা। কিন্তু সেই স্লোগানের স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার কোনো রাজনীতি বা কৌশল ছিল না। তাতে মনে হচ্ছিল এ স্লোগান ছিল শুধুমাত্র স্লোগানের জন্যে। এ স্লোগান ছিল দর কষাকষির হাতিয়ার এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী একটি মহলের ধারণা ছিল আপাতত সব

www.nagorikpathagar.com

আন্দোলনের মূল কথা ছিল আপোষ। আপাতত আপোষে ক্ষমতা দখল। আর একবার ক্ষমতা দখল করতে পারলে পরবর্তীকালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার চেষ্টা হবে। এ প্রেক্ষাপটে নিশ্চই প্রশ্ন উঠতে পারে সেকালে বামপন্থীরা সর্বশেষ পর্যায়ে এসেও কেনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারল না। সে প্রশ্নের জবাবে পরে আসছি।

৭১-এর সংগ্রামে বামপন্থীদের কী ভূমিকা ছিল? এ প্রশ্ন আমি বারবার আলোচনা করেছি। তবুও প্রশ্ন উঠেছে ১৯৭০ সালে নির্বাচনের পর বামপন্থীরা কেন নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হলো? কেন তারা বুঝতে পারল না, কেন্দ্রের পাকিস্তান সরকার এ নির্বাচন মেনে নেবে না। ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা হয়ে উঠবে অবশ্যম্ভাবী।

এ ধরনের প্রশ্ন খুব প্রাসঙ্গিক হলেও বামপন্থীদের পক্ষে তখন এ ধরনের নেতৃত্ব নেয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। আমি আগেই বলেছি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির জন্মলগ্ন থেকেই বাপমন্থী রাজনীতি ছিল নিষিদ্ধ। আইন দিয়ে নিষিদ্ধ না করে প্রতিটি বামপন্থী দলকে নির্যাতন চালিয়ে প্রায় অকেজো করে দেয়া হয়েছিল। দলের নামে কোনোদিনই তারা প্রকাশ্যে কাজ করতে পারেনি। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি বা আমাদের শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল মুখ্যত এককালে যাঁরা আরএসপি করতেন তাঁদের পক্ষে এ ধরনের নেতৃত্ব দেয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল মস্কো-পিকিং দ্বন্দ্বের পর। মস্কো কেন্দ্রিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূলধারা বিভক্ত হয়ে যায়। মতানৈক্য দেখা দেয় রণনীতি ও রণকৌশল নিয়ে। আমরা আন্দোলনের স্তরকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর বললেও মস্কোপন্থী কমিউনিস্টদের কাছে এ আন্দোলনের স্তর ছিল জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। পিকিংপন্থীদের কাছে ছিল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। আমাদের তত্ত্ব অনুযায়ী এই স্তরে জাতীয় বুর্জোয়াদের কোনো ভূমিকাই ছিল না। মস্কোপন্থীদের তত্ত্ব অনুযায়ী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে জাতীয় বুর্জোয়াদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। শ্রমিক শ্রেণির দলের সাথে তাদের নেতৃত্বের ভূমিকা থাকলেও বিপ্লবের নিয়ামক ভূমিকা পালন করে শ্রমিক শ্রেণির দল। অপরদিকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে জাতীয় বুর্জোয়াদের সহযোগী ভূমিকা থাকে গৌণ। মুখ্য ভূমিকা পালন করে শ্রমিক শ্রেণির দল।

এ তিন তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই তিন তত্ত্বের দলগুলো জাতীয় বুর্জোয়াকে আদৌ তেমন দাম দেয়নি। এছাড়া প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আকাঙ্ক্ষায় বুর্জোয়া থাকলেও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির অস্তিত্ব

www.nagorikpathagar.com

ছিল না। তাই বামপন্থীদের কাছে এই শ্রেণির কোনো স্বাধীন-স্বনির্ভর ভূমিকা ছিল না। মনে করা হতো এদের সকল নীতি এবং কৌশলই বিদেশিদের দ্বারা প্রভাবিত। তাই আওয়ামী লীগের ৬ দফাকে প্রথমে সিআইএর দলিল বলে সকল বামপন্থী প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তবে এরও একটি প্রেক্ষাপট ছিল। এ পটভূমির সৃষ্টি হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি বড় শক্তিতে পরিণত হয়। ইউরোপের একটি বড় অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বলয়ে চলে যায়। সৃষ্টি হয় সমাজতান্ত্রিক শিবির। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঔপনিবেশিক কবল থেকে স্বাধীনতা পায়। ১৯৪৯ সালে চীনের বিপ্লব হয়। এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক শিবিরে চলে যায়। পৃথিবী দু'টি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবির। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের শিবির। এই দুই শিবিরের সংঘাত ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই সংঘাত বড় যুদ্ধে পরিণত হয়নি। তাই এই সংঘাতের কালটাকে স্নায়ু যুদ্ধ বা ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাল বলে অভিহিত করা হয়। এই ঠাণ্ডা যুদ্ধের অর্থ হচ্ছে আমরা আমরা এবং তোমরা তোমরা। অর্থাৎ আমরা যদি হই সমাজতন্ত্রী, তাহলে তোমরা সাম্রাজ্যবাদী। আমরা ছাড়া সবাই সাম্রাজ্যবাদী বা সাম্রাজ্যবাদীর এজেন্ট। মাঝখানে কোনো কিছু নেই।

এই দুই শিবিরের তত্ত্ব পৃথিবীর দেশে দেশে এক সর্বনাশা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। বামপন্থীরা জাতীয়তাবাদী শক্তিকে বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদীর এজেন্ট বলে অভিহিত করতে থাকে। যার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন হয় আমাদের দেশে। ৬ দফার মধ্যে আমাদের দেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা থাকলেও আমাদের দেশের বামপন্থীরা তাকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর দলির বলে প্রত্যাখ্যান করে।

তবে এখানে একটি ভিন্ন প্রশ্নও ছিল এবং সে প্রশ্নে বামপন্থীরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলেই আমার ধারণা। প্রশ্নটি হচ্ছে ৬ দফা আদায় নিয়ে। ৬ দফার শেষ কথা যে স্বাধীনতা, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব কে দেবে? পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি বুর্জোয়াদের একটি অসংগঠিত দল আওয়ামী লীগ। এ দল স্বাধীনতার নেতৃত্ব দেবে, এ বিশ্বাস কোনো বামপন্থীর থাকার কথা নয়। এটাও লক্ষণীয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে কোন্দল ছিল। ওই সংগঠন নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন করা যাবে, এ বিশ্বাস কারো থাকার কথা নয়। বামপন্থীদের বিচারে এ ক্ষেত্রে আপোষ অবশ্যম্ভাবী ছিল।

www.nagorikpathagar.com

সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবেশেও ভারতবর্ষের নেতারা ব্রিটিশের সাথে আপোষ করেছে। সে ক্ষেত্রে ভারতের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের শ্রেণিস্বার্থই ছিল মুখ্য। তাদের জনসমর্থন, অভিজ্ঞতা ও আন্দোলনের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও তারা শুধুমাত্র শ্রেণিস্বার্থে ব্রিটিশের সাথে আপোষ করেছিল। তাদের ভয় ছিল অগ্নিগর্ভ ভারত এবং বামপন্থীদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের হাতে ক্ষমতা আসত না, যার কারণে ব্রিটিশের সাথে আপোষ। তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে কী হবে। আওয়ামী লীগ বুর্জোয়াদের সংগঠন হিসাবেও কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের মতো শক্তিশালী নয়। আওয়ামী লীগও চাইবে না বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসুক। ফলে এই যুদ্ধে আওয়ামী লীগের সহায়ক শক্তি কে হবে? রাজনৈতিক ভূগোলের কারণে ভারত এ যুদ্ধের সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু ভারত একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। ভারত নিশ্চয়ই একটি শোষণমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের জন্যে বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতা করবে না। ভারতের সহযোগিতায় যে দেশ স্বাধীন হবে সেই দেশের কাঠামোর সাথে পাকিস্তান নামক দেশটির কাঠামোর সাথে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে এ পরিবর্তন কাদের স্বার্থে? তাহলে নিঃসন্দেহে ভারত বা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এ আন্দোলনের বামপন্থীদের সহযোগিতা ভালো চোখে দেখবে না। তাদের খবরদারি কিছুতেই মানবে না।

যদিও ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সহযোগিতা সকলের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। এমনকি অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল না। অর্থাৎ সামগ্রিক বিচারে ১৯৭১ সালে পরিস্থিতির কোনো পুরো ছবি বামপন্থীদের চোখের সামনে ছিল না। এ সংগ্রাম কোথায় যাবে কেউ জানে না। কিভাবে হবে তারও কোনো প্রস্তুতি ছিল না। কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই সকলে পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। সংগ্রামের রূপরেখা জানা থাকলে যে কাজটি আগে করা উচিত ছিল সে কাজটি করা হলো অনেক পরে। অর্থাৎ বামপন্থী কমিউনিস্ট নেতারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্যে আবেদন জানাতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে পেল অনেক পরে। তখন অনেক জল গড়িয়েছে। আমাদের সংগ্রামের নেতৃত্ব তখন ভারত সরকার তথা মুজিবনগর সরকারের হাতে।

ঐতিহাসিক কারণেই এ ঘটনা ঘটেছে। সেদিক থেকে বলা যায়, তৎকালীন বামপন্থীদের এর চেয়ে বড় কোনো ভূমিকা পালন করা সম্ভব ছিল না। তবে এ কথা সত্য, যুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা সম্পর্কে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের একটি অংশ আবছা আবছা হলেও কিছুটা ধারণা ছিল। অধুনা তাঁরা

www.nagorikpathagar.com

বলছেন, শেখ সাহেব নাকি ফেব্রুয়ারি মাসে তাদের ভারতের সহযোগিতার কথা বলেছেন এবং সেভাবেই তাঁরা কাজ করেছেন। তাঁদের এ ব্যাপারে কোনো সুখ-দুঃখ নেই। যাঁরা এ কথাগুলো বলেছেন তাদের আমি অবিশ্বাস করি না। তবে তাঁরা যেভাবে কথাগুলো বলছেন, তাতে মনে হয় তাঁরা পরিস্থিতিরই সঠিক অনুধাবন করতে পারেননি। অথবা ভেবেছিলেন ভারতের সহযোগিতা ছাড়া আপোষেই সব রফা হয়ে যাবে। নইলে সমগ্র দেশবাসীকে অন্ধকারে রেখে দলে মাত্র কিছু সদস্যকে গোপনে খবরাখবর দিয়ে একটি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে করা যায় না তা বলাই বাহুল্য। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে এটাই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং এ খবরাখবর যারা জানতেন স্বাধীনতার পর তাঁদের ভূমিকা অন্য সকলের চেয়ে ভিন্নতর ছিল। অন্য কেউ না জানলেও এ মহলটি অন্তত কিছুটা হলেও জানতেন ভবিষ্যৎ সংগ্রামের কথা।

আমার এ পর্যায়ে লেখায় প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে ৭১-এর সংগ্রাম কারা করল? আমি বলেছি সামরিক-বেসামরিক আমলাদের নেতৃত্বে আগরতলা ষড়যন্ত্র নামক বিদ্রোহ হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে এ বিদ্রোহে রাজনীতিকদের কোনো ভূমিকা ছিল না। এ বিদ্রোহকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার জন্যে শেখ সাহেবকে এ বিদ্রোহে জড়িত করেছিল।

আমি বলেছি, রাজনৈতিক স্তরে মওলানা ভাসানী ও শেখ সাহেব শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাইলেও পাকিস্তানি কাঠামোতে এর একটা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন।

আমি বলেছি, রাজনৈতিক বিশ্বাস, ব্যাখ্যা এবং বাস্তব কারণে তখন বামপন্থীদের এ ধরনের আন্দোলনের নেতৃত্বে নেবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

আমি বলেছি, ১৯৬৯-এ অভ্যুত্থানের সময় স্বাধীনতার প্রশ্নটি সামনে আসে। তবে মুখ্যত সে প্রশ্নটি সামনে নিয়ে আসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের একটি অংশ।

আমি বলেছি, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নির্দেশে চললেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে ছাত্রলীগ যেমন দ্বিধাবিভক্ত ছিল তেমনি দ্বিধাবিভক্ত ছিল আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব। ছাত্রলীগের একটি অংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাইলেও কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্বাধীনতার দাবিতে প্রস্তাব উত্থাপন নিয়ে মতানৈক্য হয়। তবুও স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

www.nagorikpathagar.com

এই স্বাধীনতার ব্যাপারে বারবার শেখ সাহেবের দ্বৈত ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, শেখ সাহেব ছাত্রলীগের স্বাধীনতাপন্থীদের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে স্বাধীনতার পক্ষে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ যুক্তিযুক্ত মনে করেননি।

উপরের বর্ণিত আমার কথা থেকে আমিই অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়েছি। তাহলে দেশে কী হলো বা কী হতে যাচ্ছে? একটি দেশকে স্বাধীন করা সহজ নয়। একটি দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব হতে পারে। ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম হতে পারে। কিন্তু নতুন মুক্তি সংগ্রাম না করে একটি দেশ ভাগ করে স্বাধীন হওয়ার প্রশ্নটি একান্তই ভিন্নতর। মুক্তি সংগ্রামের শ্রেণি সমন্বয় ও নেতৃত্বের সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেণি সমন্বয় নেতৃত্বের ফারাক আসমান-জমিনের। এ ধরনের সংগ্রাম স্লোগান মুক্তির সংগ্রামে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এ সংগ্রামে সহযোগিতা করে না। এ সংগ্রামে তাদের নেতৃত্বের প্রশ্নই ওঠে না। অথচ এমন একটি সংগ্রামই ১৯৭১ সালে আমাদের সামনে হাজির হয়েছিল। যে সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষায় শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষা আছে। এ সংগ্রামের নেতৃত্ব আদর্শিকভাবে আদৌ শোষণমুক্তির পক্ষে নয়। অথচ একটি সংগ্রাম একান্তই আসন্ন। আমরা সকলেই সংগ্রামের কথা বলছি। ৭ মার্চ শেখ সাহেব স্বাধীনতা ঘোষণা না দেয়ায় তাঁর তীব্র সমালোচনা করছি। আবার সাথে সাথে তত্ত্ব হাজির করছি, শেখ সাহেবের মতো বুর্জোয়া নেতার পক্ষে এ ধরনের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। পৃথিবীর কোনো আন্দোলনে এ ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অথচ এ রকম বিভ্রান্তির মধ্যেই ২৫ মার্চ এল। আর ২৫ মার্চ পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যাশা দেওয়া হলো, যে কোনো মুহূর্তে পাকিস্তান সরকারের সাথে আপোষ রফা হতে পারে।

কিন্তু হলো না। একটা চরম গণহত্যা নেমে এল। লাখো লাখো অপ্রস্তুত মানুষ জীবন দিল। এক সময় আশ্রয়ের আশায় সীমান্ত পাড়ি দিল। তবে নির্জলা সত্য, সীমান্ত পাড়ি দিতে কেউ কাউকে নির্দেশ দেয়নি। অধিকাংশ মানুষ সীমান্তের ওপারে গিয়ে আশ্রয় নিল। আর এক সময় ভারতের সহযোগিতায় যুদ্ধ শুরু করল বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্যে।

এ যুদ্ধের সময় আমিও ভারতে গিয়েছি। বারবার আসা যাওয়া করেছি। আমাদের ছেলেরাও ট্রেনিং নিয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে। যে কথাটি আমি আগে বুঝিনি, ভারতে গিয়ে আমাকে সে কথাটি বুঝতে হয়েছে। ২৫ মার্চের পূর্বে আমার ধারণা ছিল শেখ সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কিছুতেই বাংলাদেশ

www.nagorikpathagar.com

স্বাধীন করতে পারবে না। কারণ নীতিগতভাবে আওয়ামী লীগ সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী কোনো সংগঠন নয়। অথচ সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্ভব নয়। সে সত্য ছিল যখন দিনের সূর্যের মতো স্পষ্ট। ভারতে গিয়ে বুঝলাম আমার ব্যাখ্যা সঠিক হলেও আমি জানতাম না, এ যুদ্ধের আর একটি দিক আছে। সে দিক ভারতের সহযোগিতা। ভারতের সহযোগিতার দিকটি আমার জানা ছিল না। ভারতে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে গেল, এ যুদ্ধের নিয়ামক শক্তি আমরা নই।

আমার ধারণা, এ যুদ্ধ নিয়ে প্রথম দিকে আওয়ামী লীগসহ প্রায় সকল মহলে বিভ্রান্তি ছিল। এ যুদ্ধ কারা করবে, কোনো দল করবে। এ যুদ্ধের যে মিত্র তা আদৌ স্থির ছিল না। এপ্রিলে আগরতলায় পৌঁছে এ বিভ্রান্তির চরম রূপ দেখলাম। ভারতের মাটিতে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরম রূপ নিয়েছে। ছাত্রলীগ তাজউদ্দিন সরকারকে সমর্থন করছে না। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আত্মপ্রকাশ করেছে। মুজাফফর (ন্যাপ) সভা সমাবেশ করছে যুদ্ধের জন্যে যুক্তফ্রন্ট গঠনের দাবিতে। পিকিংপন্থীরা মওলানা ভাসানীকে সামনে রেখে সংগ্রামের জন্যে কমিটি গঠন করেছে। বিপদে পড়েছি আমরা। আমরা পিকিংপন্থী নই, মস্কোপন্থীও নই। নিজেদের লেনিনপন্থী বলে দাবি করি। আমাদের ছেলেরাই বাংলাদেশ সীমান্তে নদীয়ার গেদেতে প্রথম মুক্তিবাহিনী শিবির স্থাপন করে। আমাদের শিবির জেনারেল ওসমানী ও তাজউদ্দীন পরিদর্শন করেন। কিন্তু আমাদের সাথে ভারতের আরএসপির সম্পর্ক থাকায় মুজিবনগর সরকার ওই শিবিরে সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করে। তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, এ যুদ্ধ কোথায় যাচ্ছে এবং কাদের নেতৃত্বে শেষ হচ্ছে! শেষ পর্যন্ত সমস্যার জোড়াতালি দিয়ে এক সমাধান করা হয়। মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। সেই পরিষদে স্থান হয় কমরেড মনি সিং, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, মনোরঞ্জন ধর এবং মওলানা ভাসানীর অর্থাৎ দেখাবার চেষ্টা করা হয়, সর্বদলীয় এবং জাতীয় ভিত্তিতে এ যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে এবং এই পরিবেশে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর যুদ্ধ শেষ হয়।

আমি বাড়ি ফিরলাম ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। ১০ জানুয়ারি শেখ সাহেব ফিরলেন। ছাত্রলীগে তখন বিতর্ক তুঙ্গে। বাংলাদেশে তখন একটি নতুন স্লোগান শোনা গেলো। স্লোগানটি হচ্ছে—বিশ্বে এসেছে নতুনবাদ, মুজিববাদ, মুজিববাদ। খোন্দকার ইলিয়াস মুজিববাদ সম্পর্কে একটি বই লিখে ফেললেন। বইয়ের দাম ৩০ টাকা। মুজিববাদের স্লোগান শুনে আমার যেন চমক ভাঙল।

www.nagorikpathagar.com

এ ধরনের রাজনৈতিক আদর্শের কথা পৃথিবীর কোনো অভিধানে নেই। ছাত্রলীগের যে অংশটি এই শ্লোগান দিল তারা গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী বলে জানতাম। তত্ত্বের দিক থেকে বিশ্ব প্রধানত দু'টি ভাগে বিভক্ত বলে জানি। একটি পুঁজিবাদ অপরটি সমাজবাদ। তবে সমাজতন্ত্র লক্ষ্য হলেও সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথ নিয়ে অনেক বিভক্তি আছে। মোটামুটিভাবে যারা গণতান্ত্রিক উপায়ে সংসদের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের গণতান্ত্রিক সমাজবাদী বলে অভিহিত করা হয়। যেমন ব্রিটেনসহ বিভিন্ন দেশের শ্রমিক দল বা ভারতের এক সময় জয় প্রকাশের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রী দল। সমাতন্ত্রে বিশ্বাসী অপর অংশটি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করতে না পারলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। বিশ্বাস ও আদর্শের জগতে এ পরিস্থিতিতে মুজিববাদের শ্লোগান আমাকে কৌতূহলী করে তুলল। অন্তত আমার মনে হলো ৭১-এ সংগ্রামের মধ্যে একটি স্রোত অন্তত ছিল যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলেছে। স্বাধীনতা চেয়ে এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বতন্ত্র প্রমাণের জন্যে মুজিববাদের কথা বলেছে। কী বা কেন সেই মুজিববাদ আমার ধারণা শেখ সাহেব এ মুজিববাদ সম্পর্কে তেমন অবহিত ছিলেন না। এখানটাই ছিল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের আর এক সঙ্কট।

এ পরিস্থিতিতে সকলে চমকে গিয়েছিল—১৯৭১ সালের ১ মার্চ। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সেই দিন জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আদৌ এ পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারেনি। ফলে ১ মার্চের পর নাম পাল্টাবার হিড়িক পড়ে যায়। দলের নামের পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান শব্দটি তুলে বাংলাদেশ বসানো হলো। শুধু আমাদের তেমন কোনো সমস্যা ছিল না। আমাদের দলের নাম ছিল শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল। দল গঠনকালে আমরা পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছিলাম। দাবি করেছিলাম পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের স্বাধীন স্বত্ব স্বীকার করে নিয়ে একটি কনফেডারেশনে রূপান্তর করা। কিন্তু সে আন্দোলন গড়ে তোলার আগেই একাত্তরের সংগ্রাম এসে গেল। অন্য সকলের মতোই সে যুদ্ধে আমরা জড়িয়ে পড়লাম। যুদ্ধ সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা হলো। ইতোপূর্বে সে ইতিহাস আমি লিখেছি। আমার সুস্পষ্ট ধারণা হচ্ছে, কেউ কোনো প্রস্তুতি না নিয়েই এ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। কোনো দলের কোনো স্থির সিদ্ধান্ত ছিল না। ব্যক্তি হিসেবে অনেকের বাংলাদেশকে স্বাধীন করার আকাঙ্ক্ষা ছিল। গোষ্ঠী হিসেবে কেউ কেউ হয়তো কাজ করেছে। কিন্তু কোনো দল সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা

www.nagorikpathagar.com

নিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করে রণকৌশল কিংবা রণনীতি নির্ধারণ করে এ সংগ্রামে যোগ দেয়নি। দেশকে স্বাধীন করার আকাঙ্ক্ষা থাকতেও কেউ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে সংগ্রামে নামেনি বা এ সংগ্রাম সংগঠিত করেনি।

কলকাতায় গিয়ে শুনেছি—স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখা নিয়ে ভাবছেন। অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে কমিটিও গঠন করেছিল। কিন্তু সে হচ্ছে অনেক পরের কথা। তাই সুস্পষ্ট করে বলা যায়, নেতা থেকে কর্মী পর্যন্ত সকল মহলকেই ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানি হামলা আমাদের এ যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছিল। সবাই স্বাধীনতা যুদ্ধটাকে একটি শ্লোগান বা কথার কথা বলে মনে করেছিল। কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতার সিদ্ধান্ত বা প্রস্তুতি না থাকার জন্যেই ২৫ মার্চের রাতে অসংখ্য মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

এ পরিস্থিতিতে দেশ স্বাধীন হওয়ার বেশ কয়েক মাস পর মুজিববাদ শ্লোগানটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ শ্লোগান ছিল বাংলাদেশ ছাত্রলীগের। ছাত্রলীগের এককালীন প্রভাবশালী নেতা শেখ ফজলুল হক মনি তখন দৈনিক বাংলার বাণীর সম্পাদক। তিনি বাংলার বাণীতে একটি উপ-সম্পাদকীয় লেখেন। তাঁর লেখার শিরোনাম ছিল আইনের শাসন নয়, মুজিবের শাসন চাই। তাঁর এ লেখার তীব্র বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল ভিন্ন কথা। আমার মনে হচ্ছিল ছাত্রলীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করছে। দর্শনের জগতে সমাজ পরিবর্তনের জন্যে দু'টি তত্ত্বই প্রচলিত ছিল। একটি হচ্ছে পুঁজিবাদ অপরটি সমাজবাদ। পুঁজিবাদী সমাজে মুক্তি নেই। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের সংগ্রামে একটি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র পাকিস্তান থেকে বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নয়, শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষাও। সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের সংগ্রামে সেই স্বপ্ন দেখেছিল। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে সমাজতন্ত্রের কথা বলতে হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের শ্রেণি চরিত্রের পরিপন্থী। ফলে অবস্থাটা দাঁড়াল এমন যে শোষণমুক্তির কথা বলতে হবে আবার সমাজতন্ত্রের কথা বলা যাবে না। আমার ধারণা এ পরিস্থিতিতে জোড়াতালি দেয়ার জন্যে মুজিববাদের কথা বলা হয়েছিল। রাজনৈতিক বিচারে প্রথম দিকে মুজিববাদ ছিল গণতান্ত্রিক সমাজবাদেরই আর এক সংস্করণ। অর্থাৎ আমরা সমাজতন্ত্রের কথা বলব কিন্তু বৈপ্লবিক সমাজ পরিবর্তনের কথা বলব না। সমাজ যেমন আছে তেমনই থাকবে। যদিও পরবর্তীকালে মুজিববাদ উচ্চারিত হয়নি।

www.nagorikpathagar.com

সংবিধানে সমাজতন্ত্র সমাজ পরিবর্তনের সমাজতন্ত্র নয়। এ সমাজতন্ত্র ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কোটি কোটি মানুষকে ভাওতা দেয়ার জন্যে এবং সমাজতন্ত্রের নামে স্বপ্ন দেখাবার লক্ষ্যে।

তবুও আমার মনে হয়েছে—যে গ্রুপের পক্ষ থেকেই এ শ্লোগান দেয়া হোক না কেন, তাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে দীর্ঘদিনের সংযোগ ছিল। তাদের কেউ এ ব্যাপারে ভেবেছে। শ্লোগান দিয়েছে। গল্প, কবিতা লিখেছে। মিছিল করেছে। এবং বালকসুলভ চপলতায় কখনো এ সংগ্রামের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি। নির্ণয় করতে পারেনি স্বাধীনতা সংগ্রামের শত্রু ও মিত্র। তারা ভাবতেই চায়নি, জাতিসংঘের জন্মের পর বিপ্লবাত্মক রাজনীতি ছাড়া আলাপ-আলোচনা ও নির্বাচনের রাজনীতি দিয়ে একটি দেশ স্বাধীন করা যায় না এবং সে ক্ষেত্রেও পরাশক্তিকে উপেক্ষা করা যায় না।

এছাড়া ওলন্দাজের হাত থেকে ইন্দোনেশিয়ার মুক্তি কিংবা ফরাসির কবর থেকে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যে সহজে আসেনি একথা মেধা ও বুদ্ধিসম্পন্ন নেতাদের বোঝানোর প্রয়োজন যে হয় না তা বলাই বাহুল্য। অথচ সবকিছু জেনে শুনেই সেকালের নেতৃত্ব আলোচনা ও কথার মারপ্যাঁচে একটি দেশ স্বাধীন করার চেষ্টা করেছে। সেই চেষ্টার রূপরেখা বা পরিণতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগসহ কোনো দলেরই সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। একটি মাত্র সংগঠনের মুজিববাদ ও পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগান ছাড়া কেউ দাবিও করতে পারেন না, পঁচিশে মার্চের আগে দলগতভাবে আমরা দেশ স্বাধীন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করেছিলাম। নেতা ও কর্মীদের সচেতন করেছিলাম। একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণের মানসিকতা গঠন করেছিলাম। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বলা যায় ২৫ মার্চের হামলার পূর্বে কোনোদল বা কোনো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, আমরা এ সংগ্রামকে স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত করব। এ সংগ্রাম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম, ইতিহাসে তেমন কোনো স্বাক্ষর নেই বলে আমার দৃঢ় ধারণা।

জানি আমার এ বক্তব্যে অনেকে একমত হবেন না। আমার তীব্র সমালোচনা করবেন। আমি তাই এ প্রশ্নটি ভবিষ্যতের জন্যে রেখে যেতে চাই। উৎসাহী গবেষকদের জন্যে এ প্রশ্নটি উত্থাপন করলাম। যাঁরা প্রতিদিন ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে বলে শোরগোল করছেন তাঁদের বলব আমার এ কথাগুলো ভেবে দেখুন। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই ২৫ মার্চের ঘটনার পূর্বে হয়তো তাত্ত্বিকভাবে অনেকে বলেছেন, এবারই দেশ স্বাধীন হবে, এর কোনো বিকল্প

www.nagorikpathagar.com

নেই। কিন্তু তবুও কেউ বা কোনো দলও এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হলে জনসাধারণের সবকিছু জানা থাকলে ন্যূনতম প্রস্তুতি থাকলেও স্বাধীনতার ২৭ বছর পরে আজো গ্রামবাংলায় ৭১ সালকে হিড়িক বা গণ্ডগোলের বছর বলা হতো না।

এবার ভিন্ন আলোচনায় আসা যাক। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের অন্যান্য সমস্যার মতো সাংবাদিকদেরও এক নতুন সমস্যায় পড়তে হয়। সেকালে জামাতে ইসলামের মুখপত্র 'সংগ্রাম' ব্যতীত কোনো পত্রিকাই পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন দেয়নি। এমনকি পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্ট পরিচালিত দৈনিক পাকিস্তান বা মর্নিং নিউজের অধিকাংশ বাঙালি সাংবাদিক কর্মচারী বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলার সুযোগ ছিল না। অনেকেই সংগ্রামের ৯ মাস কাজে আসেনি। অনেকে সীমান্তের ওপারে গিয়েছে। আবার অনেকে দেশে থেকেছে। কিন্তু কাজে যোগ দেয়নি।

সেকালে পাকিস্তানে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল সাংবাদিকদের। সংগঠনের নাম পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন। সেকালের পূর্ব পাকিস্তানে তার দু'টি অঙ্গসংগঠন ছিল। একটি ঢাকা কেন্দ্রীয় পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন। অপরটি চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইউনিয়নে সমস্যা দেখা দিলো। পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন থাকল না। আমি ভারত থেকে ঢাকা ফিরতে ফিরতে পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের নাম বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়ন হয়ে গেল। পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আলী আশরাফ বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হলেন। পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক গিয়াস কামাল চৌধুরী হলেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক। কারণ সাধারণ সম্পাদক কামাল লোহানী যুদ্ধকালে স্বাধীন বাংলা বেতারে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সুবাদে তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ বেতারে চলে গেলেন। এ সময় আমি ঢাকায় ফিরে দেখলাম এক ভিন্ন অবস্থা। আনুষ্ঠানিকভাবে আমি ইউনিয়নের কোনো নেতৃত্বের পদে ছিলাম না। তবুও স্বাধীনতার পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দলীয় রাজনীতি থেকে সাংবাদিক ইউনিয়ন করাই আমার কাছে মুখ্য হয়ে উঠল। দেশ স্বাধীন হয়েছে। পত্রিকার জগতে বেসামাল অবস্থা। পত্রিকা বলতে ছিল দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক আজাদ, পাকিস্তান অবজারভার, দৈনিক পাসবান, দৈনিক মর্নিং নিউজ, দি পিপলস ও দৈনিক পয়গাম।

www.nagorikpathagar.com

২৫ মার্চের হামলা শুরুর পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী দৈনিক ইত্তেফাক, দি পিপলস ও দৈনিক সংবাদ পুড়িয়ে দেয়। পরবর্তীকালে ইত্তেফাক সামরিক সরকারের সহযোগিতা নিয়ে যুদ্ধের ৯ মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। সংবাদ, দি পিপলস যুদ্ধকালে আর বের হয়নি। পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ ওই ৯ মাসে চালু ছিল। অবজারভার ও পূর্বদেশের মালিক হামিদুল হক চৌধুরী ও আজাদের মালিক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করে। পাসবান উর্দু দৈনিক। দৈনিক পয়গাম তৎকালীন গভর্নর মোনেম খানের মালিকানায়। তাই পত্রিকাও চালু ছিল। তবে এই বন্ধ ও খোলা থাকার ভিত্তিতে তৎকালে এ পত্রিকা সাংবাদিক কর্মচারীদের সেকালের ভূমিকা ব্যাখ্যা করা যায় না। চাকরি করতে গিয়ে মারা পড়েছেন ইত্তেফাকের সিরাজউদ্দিন হোসেন। মর্নিং নিউজের আবুল বাশার, পূর্বদেশের আনম গোলাম মুস্তফা। অবজারভারের লাড্ডু ভাই। চাকরি না করে মারা গেছেন সংবাদের শহীদুল্লাহ কায়সার। ফলে দেশ স্বাধীন হবার পর সংবাদপত্র জগত ছিল এক শোকের জগত-বিদ্বেষের জগত, অনিশ্চিত জগত। কী হবে পত্রিকা জগতে কারো জানা ছিল না।

আমি দেশে ফিরতে ফিরতে কিছুটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। দৈনিক পাকিস্তান ও পাকিস্তান অবজারভারের শক্তিশালী ইউনিয়ন থাকায় তেমন অসুবিধা হয়নি। পাকিস্তান অবজারভার নাম পরিবর্তন করেছে। নেতৃত্বে এসেছে পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি খোন্দকার গোলাম মুস্তফা। সম্পাদক হিসেবে এসেছেন আবদুস সালাম। নতুন নাম হয়েছে বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক পাকিস্তান নাম নিয়েছিল দৈনিক বাংলাদেশ। প্রতিবাদ এলো বগুড়া থেকে। বগুড়ায় দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই এ নামে একটি দৈনিক পত্রিকা ছিল। তাই দৈনিক বাংলাদেশ-এর পরিবর্তে দৈনিক পাকিস্তান হলো দৈনিক বাংলা। সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে সরিয়ে দেয়া হলো। প্রধান সম্পাদক হলেন হাসান হাফিজুর রহমান, নির্বাহী সম্পাদক হলেন তোয়াব খান। তবে প্রথমে তোয়াব খানই সম্পাদক হয়েছিলেন। মর্নিং নিউজ থেকে গেল। আজাদ পয়গাম-এ প্রকাশক দেয়া হলো। পয়গামের নাম হলো স্বদেশ।

আমি কখনো তেমনভাবে সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছিলাম না। কখনো কখনো ইউনিয়নের সহসভাপতি কিংবা কোষাধ্যক্ষ ছিলাম। ১৯৬২ সালে জেলখানা থেকে বেরুবার পর বরাবরই আমি নির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলাম। আমি বারবার নির্বাচিত হতাম। কিন্তু কোনো দলে কোনো প্যানেলে

www.nagorikpathagar.com

সদস্য ছিলাম না। আমি স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবেই দাঁড়াতাম। তবে দীর্ঘদিন কোষাধ্যক্ষের পদে থাকায় এই পদটিতে তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো না।

এককালে সাংবাদিক ইউনিয়নে তেমন নির্বাচন হতো না। পত্রিকার সংখ্যা ছিল কম। সদস্য সংখ্যাও তেমন নয়। সর্বজনীন ভোটাধিকারও ছিল না। বিভিন্ন ইউনিট থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করত। পরবর্তীকালে সে পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। সর্বজনীন ভোটে নির্বাচনের পদ্ধতি চালু হয়। শুধুমাত্র ফেডারেল ইউনিয়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচন হওয়ার পদ্ধতি বহাল থাকে।

ইউনিয়নের প্রথম দিকে তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো না। সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল। তাদের প্যানেলই জয় লাভ করতো। কখনো কখনো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন হয়ে যেতো।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়। কমিউনিস্ট পার্টিতে মস্কো বনাম পিকিং দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সাংবাদিক ইউনিয়নেও আওয়ামী লীগের রাজনীতি আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। জামাতে ইসলামের পত্রিকা দৈনিক সংগ্রাম আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া সেকালে কিছু ছিল সরকারপন্থী এবং মালিকপন্থী সাংবাদিক। ফলে ষাটের দশকের শেষ দিকে ইউনিয়নের নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচন হয়। নির্বাচনে আলী আশরাফ সভাপতি ও কামাল লোহানী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। আমি নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই।

ইউনিয়নের দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত নেতা ছিলেন খোন্দকার গোলাম মুস্তফা, সিরাজউদ্দীন হোসেন, খন্দকার আবু তালেব, আতাউস সামাদ, এবিএম মুসা নেতৃত্বে থাকলেও ইউনিয়নের চেয়ে তারা প্রেস ক্লাবকেই বেশি পছন্দ করতেন।

একাত্তরের সংগ্রামে সব চিত্র পাল্টে গেল। সিরাজউদ্দীন হোসেন নেই, খন্দকার আবু তালেব নেই, শহীদুল্লাহ্ কায়সার নেই, আতাউস সামাদ আছেন তবে তাঁর নেতৃত্ব নিতে অনীহা। খোন্দকার গোলাম মুস্তফা কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের নেতা হিসেবে ইউনিয়নকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু এই ইউনিয়নে তাঁর পক্ষে আসা তখন সম্ভব ছিল না। এছাড়া দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি চাচ্ছিলেন কোনো দেশের রাষ্ট্রদূত হতে। তিনি রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন। কিন্তু সরকারি চাকরিতে যাবার আগে যতদূর সম্ভব ইউনিয়নকে চালু রাখতে

www.nagorikpathagar.com

সক্রিয়ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। অর্থাৎ দেখা গেল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইউনিয়নের পূর্বতন নেতৃত্বের কেউই আর নেই। এর মধ্যে আর একটি কাণ্ড ঘটালেন ইউনিয়নের সভাপতি আলী আশরাফ। সরকার তাঁকে দৈনিক বাংলার প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। একজন প্রশাসক ইউনিয়নের সদস্য হতে পারেন না। ফলে ইউনিয়নের সদস্যপদ থেকে তাঁকে সরে দাঁড়াতে হলো। ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হলেন সহসভাপতি গিয়াস উদ্দীন আহম্মদ। তিনি অবজারভারের রিডিং সেকশনে ছিলেন। অর্থাৎ ইউনিয়নেরই খোল-নলচে পাল্টে গেলো। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক দু'জনেই ভারপ্রাপ্ত। আর এ ভারপ্রাপ্তের খেলায় আমি যে কী করে ঢুকেছিলাম সে কথা এখন আর আমার মনে নেই। তবে সব দায়িত্ব যেন আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। হয়তো বা কারো ধারণা থাকতে পারে, আমি গোপালগঞ্জের অধিবাসী বলে প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি লোক হব এবং আমাকে সামনে নিয়ে এগোলে লাভ হবে। সেই লাভ-লোকসানের হিসাব মিলল না রাজনীতি করা নির্মল সেন-এর বেলায়।

বন্ধু আহমেদুর রহমান তখন প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক। ভীমরুল ছদ্মনামে কলাম লিখতেন ইত্তেফাকে। তাঁর কলাম মিঠেকড়া সেকালে খুবই জনপ্রিয় ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুরোধেই ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক হয়েছিলাম। তবে জেলে যাওয়া ঠেকানো যায়নি। আমি ইত্তেফাকে যোগদানের এক সপ্তাহের মধ্যে ইত্তেফাকের সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া গ্রেফতার হয়ে যান। আমি জেলে যাই এক মাস পর।

বছর তিনেক পর জেলখানা থেকে এসে ইত্তেফাকের মাসিক একশ' টাকার চাকরিটা আর হয়নি। দৈনিক জেহাদে চাকরি দিয়েছিলেন মোজাম্মেল হক। সেই জেহাদও বন্ধ হয়ে গেলো ১৯৬৩ সালে। শেখ সাহেবের অনুরোধে যোগ দিয়েছিলাম সোনার বাংলায়। সোনার বাংলা থেকে মোজাম্মেল দা টেনে এনেছিলেন দৈনিক পাকিস্তানে। তবে সে চাকরির পটভূমি আরো বড়। ইতোপূর্বে সে কথা আমি লিখেছি।

সেই দৈনিক পাকিস্তানে একাত্তরের ৯ মাস আমি চাকরি করিনি। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দেখলাম আমার চাকরিটি নেই। অর্থাৎ আমার শূন্য পদে ইতিমধ্যে লোক নেয়া হয়ে গেছে। এ সময় দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদক সানাউল্লা নূরী, নতুন পত্রিকা দৈনিক গণবাংলার সম্পাদক হয়ে গেলেন। ওই শূন্য পদে দৈনিক বাংলায় আমি সহকারী সম্পাদক রূপে চাকরি পেলাম। এই ধারাবাহিক চাকরির সুবাদে আমার রাজনৈতিক পরিচয়টা যেন স্মৃতির আড়ালে

www.nagorikpathagar.com

চলে গেল। বড়ো হয়ে দেখা দিল সাংবাদিক পরিচয়। তখন অনিকেত ছদ্মনামে দৈনিক বাংলায় আমি কলাম লিখতাম। এ কলাম লেখাও সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে আমাকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। একটি দেশ স্বাধীন হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কথা বলা হচ্ছে। বেসরকারি খাতের হাল কী হবে কেউ জানে না। ইতোমধ্যে গোটা পাঁচ ছয়েক পত্রিকা এবং দু'টি সংবাদ সংস্থার দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। পত্রিকা কয়টি হচ্ছে বাংলাদেশ অবজারভার, পূর্বদেশ, দৈনিক বাংলা, মর্নিং নিউজ, দৈনিক স্বদেশ ও আজাদ। সংবাদ সংস্থা হচ্ছে এপিপি ও পিপিআই। এপিপি অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েট অব প্রেস পাকিস্তান আর পিপিআই হচ্ছে পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল। এ ছয়টি পত্রিকা এবং দু'টি সংবাদ সংস্থার মূল মালিক নেই। অপরদিকে উর্দু দৈনিক পাসবান বন্ধ হয়ে গেছে। পাসবান অফিস দৈনিক বাংলার বাণী অফিসে পরিণত হয়েছে। আর এ সময় অনিবার্য কারণে সাংবাদিক ইউনিয়নের পুরনো নেতাদের মধ্যে কেউই নেই।

বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলাম যে, আমার বন্ধুরা ভেবেই নিয়েছেন যে দেশে একটি সমাজতান্ত্রিক কাঠামো হতে যাচ্ছে। তাই তাদের প্রস্তাব হচেছ দেশের সকল সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাগুলোকে সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত করা হোক। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এমন কি ইত্তেফাক, সংবাদ, বাংলার বাণীও শ্রমিক সমবায়ের হাতে তুলে দেয়ার কথা বলা হয়।

আমার ধারণা একটি ভিন্ন বিবেচনা থেকেও সাংবাদিক ইউনিয়ন এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। বিবেচনাটি হচ্ছে তাদের চাকরির শর্ত এবং মালিকদের সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা। পৃথিবীর এই এলাকায় শিল্প হিসেবে সংবাদপত্র গড়ে ওঠেনি। কেউ রাজনৈতিক লক্ষ্যে এবং সেই অর্থে ব্যবসায়িক স্বার্থে পত্রিকা বের করেছে। একমাত্র আজাদ ও মর্নিং নিউজই পাকিস্তান সৃষ্টির আগে জন্ম নিয়েছে। এদের একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল। ইত্তেফাক, সংবাদও রাজনৈতিক বিবেচনায়ই জন্ম নিয়েছিল। অবজারভার, পূর্বদেশ হামিদুল হক চৌধুরী তার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যেই প্রকাশ করেছিলেন। এর কোনো পত্রিকায়ই সাংবাদিক ও কর্মচারিরা বেঁচে থাকার মতো বেতন পেত না। এই পটভূমিতে পাকিস্তান সরকার একটি বেতন বোর্ড গঠন করেছিল। এই বেতন বোর্ডের সুপারিশ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় কোনো সংবাদপত্রেই এই বেতন বোর্ডের সুপারিশ কার্যকর করা হলো না। এই নিয়ে বারবার তাদের আন্দোলন করতে হয়েছে। তখন অধিকাংশ সাংবাদিক কর্মচারীর বেতন ছিল ৫০ থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে।

www.nagorikpathagar.com

সেই বেতনও নিয়মিত দেয়া হতো না। ৪/৫ কিস্তিতে এক মাসের বেতন নিতে হতো। সাংবাদিক শব্দটি ছাড়া এ পেশায় তেমন মর্যাদা ছিল না। আমিও ১৯৫৯ সালে ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম ১০০ টাকা বেতনে।

১৯৬১ সালে বেতন বোর্ড সুপারিশের পর কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয়। নতুন পত্রিকাগুলো বেতন বোর্ডের রোয়েদাদ অনুযায়ী বেতন দিতে শুরু করে। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত দৈনিক জেহাদ বা ৬৪ সালে প্রকাশিত দৈনিক পাকিস্তান বেতন বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন দিতে শুরু করে। তবুও সংবাদ-আজাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এর মধ্যে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে নতুন বেতন বোর্ড গঠনের দাবি উঠতে থাকে। বলা হয় যে, ১৯৬১ সালে প্রণীত বেতন বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী নির্ধারিত বেতনে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই নতুন বেতন বোর্ড ও নতুন বেতন কাঠামো চাই। ১৯৬১ সালে প্রথম বেতন বোর্ডের সুপারিশে ৫ বছর পর নতুন বেতন বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের কোনোই উদ্যোগ ছিল না। ফলে পাকিস্তানব্যাপী আন্দোলন হয় এবং আমার যতদূর মনে আছে ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান সরকার দ্বিতীয় বেতন বোর্ড গঠন করে। নতুন নতুন বোর্ডের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু কোনো মালিকই সেকালে এই ভাতা দিতে রাজি হয়নি। ফলে ১৯৭০ সালের প্রথমদিকে সাংবাদিকদের এই অন্তর্বর্তীকালীন ভাতার জন্যেই দীর্ঘদিনের জন্যে ধর্মঘটে যেতে হয়। সেই ধর্মঘটের অবসান হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বেতন বোর্ডের সুপারিশ তো দূরের কথা, প্রথম বেতন বোর্ডের সুপারিশও তখন কোনো কোনো পত্রিকায় কার্যকর হয়নি। এর মধ্যে স্বাধীনতার সংগ্রাম এগিয়ে আসে। দেশ স্বাধীন হয়। দু'টি সংবাদ সংস্থা ও ৬টি পত্রিকা মালিকবিহীন হয়ে যায় এবং স্বাভাবিকভাবে সাংবাদিক ও কর্মচারীর মধ্যে ভয় ও শঙ্কার সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে ভবিষ্যতের কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা ছিল না। এদের মধ্যে দৈনিক বাংলা, মর্নিং নিউজ প্রেস ট্রাস্টের কাগজ ছিল। ফলে এ দু'টি পত্রিকার সাংবাদিক ও কর্মচারীর বেতনের কোনো অসুবিধা হয়নি। পূর্বদেশ ও অবজারভারের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত ছিল। ফলে সেখানেও বেতন হয়েছে। এপিপি-এর পরিবর্তিত নাম বিএসএস। পাকিস্তান আমলে এপিপি সরকারি সংস্থা ছিল। সেই সুবাদে বিএসএস-এর সাংবাদিক ও কর্মচারীদের বেতনের একটি হিল্লে হয়ে যায়। কিন্তু আজাদ, স্বদেশ এবং পিপিআই ছিল বেসরকারি মালিকানায়। এখানে কোনোদিনই সাংবাদিক কর্মচারীদের বেতনের

www.nagorikpathagar.com

নিশ্চয়তা ছিল না। তাই এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক ও কর্মচারীদের বেতন হচ্ছিল না। সে এক অস্বস্তিকর ও দুঃখজনক পরিস্থিতি।

এ অবস্থায় আমি দেশে ফিরেছি এবং আমার মনে হয়েছে এ তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নতুন প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে সমস্ত সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থা সমবায়ী মালিকানায় নেয়ার জন্যে। আমি দেশে ফিরে আর একটি ঘটনাও লক্ষ করলাম। লক্ষ করলাম যে শুধুমাত্র সাংবাদিক ইউনিয়ন নয়। সংবাদপত্রের শিল্পের সাথে জড়িত তিনটি ইউনিয়ন যৌথভাবেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই তিনটি ইউনিয়নের যৌথভাবে বসে আন্দোলনের একটি পটভূমি আছে। এ নিয়ে এখন অনেক বিতর্ক আছে। অনেক সময় এ বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু আমি। বিতর্ক হচ্ছে সংবাদপত্রের সকল কর্মচারীদের জন্য একই বেতন বোর্ড গঠন এবং সংবাদপত্রের সংশোধনী বিভাগের অর্থাৎ প্রুফ রিডারদের সাংবাদিক করা নিয়ে। আমার অনেক বন্ধুরা বলে থাকেন এ জন্য নাকি আমিই দায়ী। পৃথিবীর কোনো দেশেই নাকি প্রুফ রিডাররা সাংবাদিক নন এবং সংবাদপত্রের সকল কর্মচারীদের জন্যে একটি মাত্র বেতন বোর্ড নেই। সর্বত্রই সাংবাদিকদের জন্যে পৃথক বেতন বোর্ড। এ ক্ষেত্রে আমি বিতর্কে যাব না। শুধু সেকালের কিছু ঘটনা তুলে ধরব। ষাটের দশকের কথা। আমি তখন জেলে। সাংবাদিক ইউনিয়ন সম্পর্কে তখন আমার বেশি কিছু জানা নেই। জেলের বাইরে এসে শুনলাম আমাদের ইউনিয়নে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে প্রুফ রিডারদের সাংবাদিক করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন তৎকালীন ইউনিয়ন নির্বাচনে জিতবার জন্য প্রুফ রিডারদের সদস্যপদ দিয়েছেন। আমি কোনো দিন এ বিতর্কে যাইনি। লক্ষ্য করলাম এ ব্যাপারে তীব্র মতানৈক্য আছে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রুফ রিডারদের সাংবাদিক করা হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। পশ্চিম পাকিস্তানে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ উর্দু পত্রিকার প্রুফ রিডারদের সাংবাদিক বলে গণ্য করতে রাজি নয়। তাই পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের দুই অংশে দুই রীতি চালু আছে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রুফ রিডাররা সাংবাদিক কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে প্রুফ রিডার সাংবাদিক নয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত কোনো মীমাংসাই হয়নি। পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সর্বশেষ বৈঠক বসেছিল ১৯৬৯ সালে ইসলামাবাদে। ওই বৈঠকে কে জি মুস্তফা সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক হন মিনজাহ বার্না। ওই সম্মেলনে এই সঙ্কট সমাধানের জন্যে আমি একটি প্রস্তাব তুলেছিলাম। আমাকে সমর্থন করেছিলেন কে জি মুস্তফা। পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এ

www.nagorikpathagar.com

প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়। তাঁদের পক্ষ থেকে বলা হয়, এ ব্যাপারে তাঁরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তাঁদের আরো এক বছর সময় দেয়া হোক। সে সময় অতিবাহিত হওয়ার আগেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রুফ রিডাররা পূর্ব পাকিস্তানে সাংবাদিক এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সাংবাদিক নয় এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচন হয়েছে। সে নির্বাচনে প্রুফ রিডাররা সাংবাদিক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে। তাই তাদের বাদ দেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। পরবর্তীকালেও বারবার এ প্রশ্নে আমাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। অথচ ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছু করার ছিল না।

এবার আমি দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিতে চাই। বলা হয়ে থাকে ১৯৬১ সালে প্রথম বেতন বোর্ড শুধুমাত্র সাংবাদিকদের জন্যে হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্যে পাকিস্তানের দ্বিতীয় বেতন বোর্ড আমাদের জন্যে কার্যকর ছিল না। ফলে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বেতন বোর্ড গঠনের দাবি ওঠে। উল্লেখ্য, প্রথম বেতন বোর্ডে প্রেস শ্রমিক ও সাধারণ কর্মচারীদের সম্পর্কে কোনো সুপারিশ ছিল না। ফলে তারা ছিল সব ব্যাপারে বঞ্চিত। অথচ এ কথা সত্য, বিশেষ করে প্রেস শ্রমিকদের সহযোগিতা ছাড়া অন্তত সংবাদপত্রে ধর্মঘট করা যায় না। তারা মালিকদের সাথে সহযোগিতা করলে মালিকরা পত্রিকা বের করতে পারে। এ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন ভাতার আন্দোলন নিয়ে। আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে তাদের সাথে সহযোগিতা না করলে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করা যাবে না। তাই ১৯৭০ সালে অন্তর্বর্তীকালীন ভাতা আন্দোলনের সময় আমার পূর্বসূরি সেকালের ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দ্বিতীয় বেতন বোর্ড হবে সংবাদপত্রের সম্পাদক থেকে দারোয়ান পর্যন্ত সকল শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে। সাংবাদিকদের জন্যে পৃথক বেতন বোর্ড হবে না। ১৯৭২ সালে আমি যখন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের এবং ১৯৭৩ সালে আমি ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হই তখন আমার ওপরই ওই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবি বর্তায়। তবে সে ক্ষেত্রেও অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। স্বয়ং সেকালের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের ভিন্ন কথা বলেছিলেন। সে কথায় আমি পরে আসব।

সংবাদপত্র জগতে কী হবে আমাদের ঠিক মাথায় আসছিল না। আমি বার বার লিখেছি—তখন সবকিছু আমার গোলেমেলে মনে হতো। স্বাধীনতার

www.nagorikpathagar.com

পরবর্তীকালটা কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে আমি মেলাতে পারতাম না। তখন আমার মুক্তিযুদ্ধের সময়কার এক সহযোগী আমার সাথে থাকত। তার বাড়ি ভোলা। দৈনিক পূর্বদেশে চাকরি করতো। তার অসীম সাহস। বারবার আমার সাথে সীমান্ত পারাপার করেছে। আমাকে সব সময় সতর্ক পাহারায় রেখেছে। তার সে ভূমিকা ভুলবার নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে পূর্ব দেশেই চাকরি পেয়েছিল। চাকরির পূর্বে বহু চেষ্টা করেও সে প্রবেশিকা পরীক্ষার চৌকাঠ পার হতে পারেনি।

একদিন সে রাতে আমার কক্ষে এল। বলল—স্যার, আমি যদি ম্যাট্রিকে প্রথম হই তাহলে কি সংবাদপত্রে আমার ছবি ছাপা হবে? সাংবাদিকরা কি আমার সাক্ষাৎকার নিতে আসবে? তার কথা শুনে আমি অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কী করে তুই পরীক্ষা দিলি? তুই আমার বাসায় থাকিস অথচ আমি জানি না যে তুই ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। সে হেসে ফেলল। বলল—স্যার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছি। পরীক্ষা দেবে দু'জনে। দু'টি অ্যাডমিট কার্ড জোগাড় করেছি। একটি আমার নামে, অপরটি আমার বন্ধুর নামে। আমার বন্ধু বিএ পাস। পরীক্ষার হলে সে আমার খাতায় লিখবে আর আমি তার খাতায় লিখব। তাই আমার ভয় হচ্ছে—আমার বন্ধু আমার বদলে পরীক্ষা দিলে সে নিশ্চয়ই প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবে। কিন্তু সকলে জানবে যে আমি প্রথম বা দ্বিতীয় হয়েছি। তখন আমি বিপদে পড়ে যাব। তখন সাংবাদিকরা আমার খোঁজে আপনার বাসায় আসবে। আপনার সুবাদে সকলেই আমাকে চেনে। আমরা দু'জনেই বিপদে পড়ে যাব। তার কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ কী কথা আমি শুনছি। ছেলেটি কী বলছে। এই ছেলেটি একাত্তর সালের ন'মাস আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে। সামরিক বাহিনীর হাতে পড়ে পালিয়ে এসেছে। আমার জন্য সব কিছু করেছে। ঢাকার বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে আমার জন্য টাকা সংগ্রহ করেছে। ভিন্ন নামে পত্রিকা বের করেছে। আমি কখনও ওর চোখেমুখে মৃত্যুর ভয় দেখিনি। মুক্তিযুদ্ধের কালের সেই ছেলে এখন অবৈধভাবে পরীক্ষায় পাস করতে চাচ্ছে? আমার বাসায় থাকে অথচ ঘুণাক্ষরে আমি কিছু জানতে পারিনি। তাহলে এ ছেলে মুক্তিযুদ্ধে কেন গিয়েছিল? কোন লক্ষ্যে? কোন আশায়? সে কোন স্বপ্ন দেখেছিল মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে? কথাগুলো আমি বারবার বলতে চেষ্টা করেছি আমার পূর্বের লেখায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মুক্তিযুদ্ধ এদের কাছে ছিল সাময়িক উত্তেজনা। সেই উত্তেজনা কেটে গেছে। তারা আবার পূর্ব জীবনে ফিরে গেছে। ওদের আমরা আদর্শ দিতে পারিনি। ওদের অনুপ্রাণিত করতে পারিনি। সামরিক উত্তেজনায় জীবন দিতে

www.nagorikpathagar.com

শিখিয়েছিলাম। আমি সাংবাদিক এবং রাজনীতিক। আমার চোখের সামনে ঘটনাগুলো এমনি করেই প্রতিভাত হচ্ছিল। কেউ লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করিনি।

দেশ স্বাধীন হলো। মুক্তিযোদ্ধা তরুণেরা ঘরে ফিরে এল। যুদ্ধের জন্যে তাদের পড়া হয়নি। অনেকে পরীক্ষা দিতে পারেনি। তাই সকল মহল থেকেই এ দাবি উঠল, আমাদের বিশেষ পরীক্ষার সুযোগ দিতে হবে। আমরা জীবন হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছি। সুতরাং আমরা পাস করতে চাই। সরকার সম্মত হলো। অদ্ভুত এক বিধান করল। সকলকে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিল। বার বছরের তরুণ থেকে শুরু করে সত্তর বছরের বৃদ্ধ পরীক্ষার্থী হলো। পরীক্ষার হলে নকলই হয়ে উঠল বৈধ কাজ। স্বামী-স্ত্রীকে নকল দিচ্ছে। পিতা পুত্রকে নকল দিচ্ছে। ভাই বোনকে নকল দিচ্ছে। সে এক নকলের মহোৎসব। পরীক্ষায় পাসের হার হলো ৯৮%, ৯৯%। প্রায় সকলের বাড়িতে আনন্দ এবং উচ্ছ্বাস। কেউ ভাববার চেষ্টা করল না দেশটাকে আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। আজো সে ট্রাডিশন চলছে।

অথচ ভাবনা হওয়া উচিত ছিল ভিন্ন ধারার। ভাবনা হওয়া উচিত ছিল দেশ গড়ার। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশকে গড়তে হবে। দেশ গড়ার জন্যে কারিগর চাই। ভালো ছাত্র চাই। দক্ষ কর্মী চাই। দক্ষ প্রকৌশলী, চিকিৎসক চাই। কিন্তু কারো যেন মাথায় এ কথাটি এল না। আমার ব্যাখ্যা ছিল এটাই স্বাভাবিক। কারণ কেউ ভেবে চিন্তে মুক্তিযুদ্ধে যায়নি। কেউ ধারাবাহিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন লালন করেনি। তার চোখের সামনে কোনো পরিকল্পনা ছিল না। নতুন সমাজ গঠনের কোনো স্বপ্ন ছিল না। যুদ্ধে নেতৃত্বেরও একই অবস্থা। যারা স্বাধীন বাংলা সরকার গঠন করেছিলেন, যারা সরকারের উপদেষ্টা হয়েছিলেন বা যারা এ সংগ্রামের সহযোগী বা সাহায্যকারী ছিলেন, কারো মাথায় এ সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্ন ছিল না। সবার মাথায় এ যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাই তাদের কাছে সমস্যা ছিল কোনোমতে এ যুদ্ধে জিতে দেশে ফিরে যাওয়া। পূর্ব পাকিস্তান নামক যে দেশটি ফেলে এসেছি তার নাম পাল্টে বাংলাদেশ করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। এ ধরনের লক্ষ্য বা বিবেচনা না থাকলে এভাবে ঢালাও পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ বা নকল করার সুযোগ দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কেউ ভাবলেন না যে, এ ধরনের পরীক্ষার সুযোগ দেয়ার ফলে পরীক্ষার্থীরা সমাজের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। পরবর্তীকালে অবৈধভাবে পরীক্ষায় পাসের মতোই জীবনের সর্বত্রই অবৈধভাবে কাজের অনুসারী হবে। সবকিছুই পেতে চাইবে অবৈধভাবে। আমি তখন দৈনিক বাংলার পাতায়

www.nagorikpathagar.com

বারবার লিখতে চেষ্টা করেছি। আর ভীষণভাবে বিতর্কের সৃষ্টি করেছি এবং বিতর্কিত হয়েছি। সে সময় আর একটি দুঃখজনক ছবি আমি দেখেছি মুক্তিযোদ্ধা মহলে। সবাই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কিছু পেতে চাচ্ছে। সকলেই মুক্তিযোদ্ধাদের নামে সংগঠন করার চেষ্টা করছে। সকলেরই দাবি আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি সুতরাং আমাকে চাকরি দিতে হবে। আমি বাড়ি চাই, গাড়ি চাই, আমি সবকিছু চাই। আর এই দাবি নিয়েই চেনাচেনা বড় মুক্তিযোদ্ধারা বাড়ি আর গাড়ি দখল করতে শুরু করলেন।

এ সময়ে একটি মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মেলনে আমাকে ডাকা হয়েছিল। বহু আশা করেই আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেই সভায় গিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম সেখানেও একই দাবি, আমাদের সব চাই। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। সুতরাং সবকিছু আমাদের প্রথম পেতে হবে। আমি বলেছিলাম—একথা জানা থাকলে টেন্ডার দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করা উচিত ছিল। তাহলে দর কষাকষি করা যেত। টেন্ডার দিয়ে সংগৃহীত মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ শেষে সবকিছু দাবি করতে পারত না। আমার কথা কারও মনে ধরেনি এবং অবাঞ্ছিত হয়ে আমাকে সভা ত্যাগ করতে হয়।

দীর্ঘদিন পরে আজ আমি এ কথাগুলো লিখছি একটি বিশেষ পটভূমিতে। তখন এ পরিস্থিতি সামাল দেবার দায়িত্ব ছিল রাজনীতিকদের। বিশেষ ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল সাংবাদিকদের। কিন্তু কেউ-ই সেই ভূমিকা পালন করলেন না। প্রথমদিকে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগই দাবি করতে থাকল যে তারাই একমাত্র মুক্তিযুদ্ধ করেছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের পর সব সুযোগ-সুবিধাই তাদের প্রাপ্য। কিছুদিন পর এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছিল। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি মিলে গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট 'গজ' গঠন করেছিল। এবার তিনটি দল ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধের দাবিদার হলো। আর সবাই হলো ব্রাত্য।

এসময় সাংবাদিকরা বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারত। কিন্তু সাংবাদিক জগতেও দেখা গেলো ভাঙন। কেউ আর সাংবাদিকতা করতে চাচ্ছে না। সকলেই যুদ্ধ শেষে প্রাপ্য চাচ্ছে এবং সে সুযোগ সীমিত ক্ষেত্রে হলেও অনেকেই গ্রহণ করল এবং মোটামুটিভাবে এরাই ছিল এককালে সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা। তাই দেশের এ বেসামাল অবস্থার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে? পাকিস্তান আমলের অভিজ্ঞতা ছিল—কোনো কিছু হলে দু'টি মহল থেকে প্রথমে বাধা উঠত। একটি ছাত্র, অপরটি সাংবাদিক। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে কোনোকালেই কোনো সরকার সাংবাদিকদের সমর্থন পায়নি। সাংবাদিকরা শুধু কলমই ধরেনি; রাজপথে মিছিল করেছে। পুলিশের লাঠি খেয়েছে। জেলে

www.nagorikpathagar.com

গিয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাংবাদিক ইউনিয়নে সেই পুরনো নেতৃত্বকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

নতুন নেতৃত্ব তখন অপরিচিত। সংবাদপত্র জগতে তখন নিদারুণ সঙ্কট। দেশে ৯টি কাগজ। ছ'টি কাগজের ব্যবস্থাপনা সরকারের হাতে। দেশে দু'টি সংবাদ সংস্থা। তার দায়িত্বও সরকারের ওপর ন্যস্ত। এই মুহূর্তে সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বা সরকারের সমালোচনা করা আদৌ সম্ভব ছিল না। এর মাঝখানে ছিল আবার কিছু কিছু নতুন সাপ্তাহিকের দায়িত্বহীন সাংবাদিকতা, কিছু কিছু রাজনৈতিক সাপ্তাহিকের চূড়ান্ত হঠকারিতা। এই দায়িত্বহীন সাংবাদিকতা এবং হটকারী সাংবাদিকতার জন্যে সেকালের সাংবাদিকদের তিন পা এগুলে পাঁচ পা পিছাতে হয়েছে।

এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল সাপ্তাহিক গণশক্তি নিয়ে। পত্রিকাটি সাম্যবাদী দলের (এমএল) মুখপত্র। সাম্যবাদী দল তখনো বাংলাদেশ মেনে নেয়নি। তারা বাংলাদেশের পরিবর্তে পূর্ববাংলা শব্দই ব্যবহার করে। পত্রিকাটির সম্পাদক প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা। এ পরিস্থিতিতে একদিন তোয়াহা সাহেবের সাথে আলাপ করার জন্যে তার যোগীনগরের বাসায় গেলাম। পরের দিন গণশক্তি বের হওয়ার কথা। আমি তোয়াহা সাহেবকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম বাস্তবতাকে মেনে নিতে। বাংলাদেশকে পূর্ববাংলা লিখবেন না। বিদেশের বহু রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আপনাদের স্বীকৃতি দিতে আপত্তি কোথায়? তিনি আমার সাথে একমত হলেন। আমি নিশ্চিন্তে বাসায় ফিরলাম। পরের দিন দেখলাম গণশক্তিতে বাংলাদেশের পরিবর্তে পূর্ববাংলাই লেখা হয়েছে। আমি হবাক হলাম। সরকার পত্রিকাটি বাজেয়াপ্ত করলেন। প্রেস বন্ধ করলেন। উভয়পক্ষের কাছেই দায়ী হলো সাংবাদিক ইউনিয়ন।

আর একদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সবাইকে ডেকে পাঠালেন। আমি একটু দেরিতে পুরনো গণভবনের বৈঠকে পৌছালাম। সেখানে গিয়ে শুনি সিদ্ধান্ত হয়েছে সকল সাপ্তাহিক কাগজের কাছে নাকি ৫শ' টাকা করে জামানত দাবি করা হয়েছে। কারণ সাপ্তাহিক হক কথায় লেখা হয়েছে নৌবাহিনীতে বিদ্রোহের কথা। আর এক সাপ্তাহিক লিখেছে কে নাকি কিশোরগঞ্জ থেকে লিচু এনে প্রধানমন্ত্রীকে খাইয়েছে। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বললাম, দেশে এ ধরনের কোনো আইন নেই। আপনি এভাবে পত্রিকায় জামানত চাইতে পারেন না। আর এ ধরনের লেখালেখি বিবেচনা করতে হলে দেশ চলে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী উড়িষ্যার জনসভায় ভাষণ দিতে গেলে তাঁকে ঢিল মারা হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.com

তাঁর নাক দিয়ে রক্ত ঝরেছিল। কিন্তু এ জন্যে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি বা সে সভায় পুলিশ লাঠিচার্জ করেনি। প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। বললেন, ঠিক আছে। এবার কিছু বলা হলো না। পত্রিকাগুলোকে সংযত হতে বলবেন।

সাংবাদিকদের এখনো অভিযোগ—স্বাধীনতার প্রথম দিকে নাকি একটু নরম হলে অনেক কিছুই পাওয়া যেত। আমি নাকি কোনোদিনই সরকারের সাথে সমঝোতায় রাজি হইনি। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। সাংবাদিকদের অদেয় কিছুই তাঁর ছিল না। শেখ সাহেব সম্পর্কে এ মন্তব্য ভুল তা আমি বলতে চাই না। কিন্তু পাওয়া যায় বলেই একজনের কাছে সব কিছু চাইতে হবে এ তত্ত্বে আমি বিশ্বাসী নই। আমার ধারণা এভাবে চাইতে গেলে আমরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। মনে হয় সাংবাদিকরা একটা ভিন্ন জাত। এরা বিশেষ সুবিধার অধিকারী। আমি এই ধারায় কোনোদিন বিশ্বাসী ছিলাম না। আমি জানতাম শেখ সাহেবের কাছে চাইলে অনেক কিছুই পাওয়া যেত কিন্তু সে চেষ্টা আমি করিনি। আবার সাংবাদিকদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কেও আমি কোনোদিন একমত ছিলাম না। এ ব্যাপারে কখনো আমি তাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছি। আবার কখনো তদের মতো করেই সাংবাদিকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছি।

এ ধরনের দু'টি ঘটনা আমার মনে আছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার বেশ পরের কথা। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। এ উপলক্ষে একটি সভা ছিল জোনাকী সিনেমা হলে। আমি সেই সভায় যাইনি। প্রেস ক্লাবে বসে ছিলাম। তাদের অভিযোগ, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হয়নি। তাদের বসবারও জায়গা ছিল না। তাই তারা চলে এসেছে। তাদের দাবি—ওই সভার কোনো ছবি বা খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হবে না। আমি একমত হলাম না। আমি বললাম সংবাদ সংগ্রহ করা সাংবাদিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কোথায় বসতে দেয়া হলো বা না হলো এটা আদৌ মুখ্য বিষয় নয়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে বার্লিনের পতন হচ্ছিল। মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন জেনারেল আইসেন হাওয়ার। সোভিয়েত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন মার্শাল জুকভ। বার্লিন পতনের ছবি তুলতে চল্লিশজন আলোকচিত্রী গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল। তারা কিন্তু দাঁড়াবার বা বসার জায়গার জন্যে বিতর্ক করেনি। আমরা ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং দুর্ঘটনার ফলে এ ধরনের সুযোগ-সুবিধার পরোয়া করি না। এটাই সাংবাদিকতার নীতিমালা। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সভার বিবরণ যাবে কি যাবে না এ নিয়ে

www.nagorikpathagar.com

সাংবাদিক ইউনিয়নের কিছু বলবার নেই। এ ব্যাপারে সকল দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের। সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকরা বিপর্যস্ত হলে নিশ্চয়ই ইউনিয়ন পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু কোনো সভা কিংবা বৈঠকে গিয়ে সাংবাদিকরা চেয়ার বা চা-নাস্তা পেল কিনা এ প্রশ্ন একান্তই অপ্রাসঙ্গিক।

তবে শেখ সাহেবের আমলে ভিন্ন ভূমিকাও ইউনিয়ন পালন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দাউদকান্দি যাবেন। সেখানে তিনি এক জনসভায় ভাষণ দেবেন। সাংবাদিকদের অভিযোগ টেলিভিশন, বেতার, বিএসএস, এনা'র প্রতিনিধি ব্যতীত আর কাউকেই হেলিকপ্টারে নেয়া হবে না। সকলকে যেতে হবে সড়ক পথে। তখন সড়ক পথে দু'টি খেয়া ছিল। মেঘনা ও দাউদকান্দিতে সেতু নির্মিত হয়নি। সাংবাদিকদের দাবি তাদের হেলিকপ্টারে নিতে হবে। অন্যথায় সবাইকেই যেতে হবে সড়ক পথে। এ দাবির কথা আমি গণভবনে জানিয়ে দিলাম। আমি বললাম, যাওয়া-আসার ব্যাপারে দু'ধরনের ব্যবস্থা হতে পারে না। সকলে একইভাবে যেতে হবে। গণভবন থেকে পাল্টা ফোন এল। বারবার অনুরোধ জানানো হলো তাদের ব্যবস্থা মেনে নেয়ার। আমি রাজি হলাম না। গণভবনকেই রাজি হতে হলো। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সহযোগীদের নিয়ে হেলিকপ্টারে চলে গেলেন। আর সবাই গেলেন সড়ক পথে। এই গণভবনের রাজি হওয়ার পেছনে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। আমি এখনও মনে করি সেই মানুষটির পক্ষেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব ছিল। আর আমি আজো মনে করি যে সেদিন ইউনিয়নের নেতা হিসেবে আমার দাবি সঙ্গত ছিল না। সরকারি হোক বেসরকারি হোক যে কোনো অনুষ্ঠানে সংবাদ সংগ্রহ করা পত্রিকা বা সংবাদ সংস্থার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। তাতে অন্য কারো কিছু করবার নেই। অথচ আমাদের দেশে একটি বিপরীত ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছি যে সভা, সেমিনার ও মিছিলের সংগঠকরা আমাদের ভাষায় আমাদের খুশি করতে চায়। এমনকি অনেক সংগঠন আমাদের আনা নেয়ার ব্যবস্থা করে। অথচ সাংবাদিকদের বেতন বোর্ডের রোয়েদাদে সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহের জন্যে বিশেষ ভাতা দেয়ার নিয়ম আছে। অনেক সংবাদপত্র এই ভাতা দিয়েও থাকেন। অথচ এর পরও আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে যতদূর সম্ভব সরকারি বেসরকারি সংস্থার কাঁধে চেপে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেন।

ফলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আজকের সমাজের সাংবাদিকরা কেনাকাটার পণ্যে পরিণত হয়েছে। সবার একটা ধারণা জন্মেছে, এমনকি প্রেস

www.nagorikpathagar.com

ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করলেও সাংবাদিকদের জন্যে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সংবাদপত্র অফিসে প্রেস রিলিজের সাথে বেশ কিছু টাকার অঙ্কের নোটও এসে পৌঁছে। সবচেয়ে ন্যক্কারজনক হচ্ছে—আমরা যারা সংসদে যাই তাদের সংসদে সংবাদ সংগ্রহের জন্য সকল পত্রিকা অফিস থেকে একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা দেবার কথা। অনেক পত্রিকা দিয়েও থাকে। তবুও দেখা যায় সাংবাদিকদের সংসদে যাওয়া-আসার জন্যে প্রেস ক্লাবে একটি সরকারি গাড়ি রাখা হয়। এটা যে সাংবাদিকতা নীতিমালার বিরোধী সে কথাও যেন আমরা সবাই ভুলে গেছি। এ কথাও সত্যি, বাংলাদেশের সব পত্রিকায় বেতন বোর্ডের রোয়েদাদ কার্যকর হয়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে সপ্তম বেতন বোর্ডের রোয়েদাদ প্রকাশিত হলেও ঢাকার অনেক দৈনিক কোনো বেতন বোর্ডের রোয়েদাদ-ই কার্যকর হয়নি। মালিকপক্ষ বেতন বোর্ডের রোয়েদাদের তোয়াক্কাই করেন না। অপরদিকে বাজারে অসংখ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। নতুন নতুন সাংবাদিক সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের কোনো নিয়োগপত্র নেই। বেতন কাঠামো নেই। ছুটি-ছাটা নেই। চাকরির শর্ত নেই। আজকে নিযুক্তি পেয়ে কালকে চাকরি যাওয়া বাংলাদেশে আজ খুব অস্বাভাবিক নয়। নতুন সাংবাদিকরা বলতে পারেন—এ পরিস্থিতিতে আমাদের কোনো কিছুই করার নেই। দরকষাকষির অবস্থায় আমরা নেই। আর আমাদের আজকের পূর্বসূরিদেরও তেমন কোনো নেতৃত্ব নেই। সবকিছুই মুক্তবাজার অর্থনীতির মতো। নীতি বা নীতি মানার প্রশ্নটি একান্তই উহ্য।

এ কথাগুলো মেনে নিয়েও একটি কথা অস্বীকার করা যাবে না, আমরা আজ আর তেমন জনগণের আস্থাভাজন নই। আমাদের কোনো খবরই পুরোপুরি সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে না। এর জন্যে একমাত্র সাংবাদিকরা দায়ী আমি বলব না। আমার দুঃখ হচ্ছে—আজকের পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে তেমন নিম্নতম প্রতিবাদ পর্যন্ত নেই।

এবার আমি পুরনো কথায় ফিরে আসি। আমি কথা শুরু করেছিলাম শেখ সাহেবকে কেন্দ্র করে। বলেছিলাম আজো অনেকে অভিযোগ করে থাকেন—সেকালে আমার জন্যেই অনেক কিছু সুযোগ-সুবিধা থেকে সাংবাদিকরা বঞ্চিত হয়েছে। শেখ সাহেবের কাছে চাইলে অনেক কিছু পাওয়া যেত। শেখ সাহেব তখন প্রধানমন্ত্রী, তাজউদ্দিন আহমেদ অর্থমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক গিয়াস কামাল চৌধুরী। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, দৈনিক আজাদ তখন মালিকহীন। প্রশাসক

www.nagorikpathagar.com

নিয়োগ করে কাগজটি চালানো হচ্ছে। কাগজটির নিদারুণ অর্থ সঙ্কট। কাগজ চলছে না। আমি তখন সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাহী সদস্য। গিয়াস কামাল এসে বলল—আপনাকে আমাদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। টাকা আনতে হবে তাঁর কাছ থেকে। আজাদ ইউনিয়নের নেতৃত্বে আছেন সৈয়দ জাফর, আব্দুর রহিম, আজাদ ও ফকির আশরাফ। আমরা কোনো খবর না দিয়েই প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে পুরনো গণভবনে গেলাম। গণভবনের গেটে গিয়ে খবর দিলাম, আমরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে চাই।

তারপর আমরা সবাই অবাক বিস্ময়ে চুপ হয়ে গেলাম। সামনে দেখি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দাঁড়িয়ে। আমি বললাম, আপনি এখানে! প্রধানমন্ত্রী বললেন, এ কী কথা বলছেন? আপনারা আসবেন, আমি গেটে আসব না? আপনারা একটা খবর দিয়ে আসবেন তো। আমি কিছুই জানব না অথচ আপনারা আসবেন আমার সাথে দেখা করতে। গণভবনের গেটে তখন তেমন আঁধার নামেনি। সন্ধ্যার বিজলী বাতি জ্বলছে। অদ্ভুত বিস্ময়ে তাঁর পেছনে আমরা হাঁটতে থাকলাম। প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইলেন আমার আত্মীয়-স্বজনের খবর। আর কথায় কথায় বললেন, আমি সব জানি।... আমি সব জানি।

তাহলে আপনারা কেন এসেছেন? গণভবনে বৈঠকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন প্রধানমন্ত্রী। গিয়াস কামাল বলল, আজাদের মালিক পালিয়েছে, কাগজটির দায়িত্ব সরকার নিয়েছে। অথচ চালাবার টাকা নেই। কারো বেতন হচ্ছে না। এভাবে তো চলতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী বললেন, নির্মল সেন, বলুন, এবার কী করা যাবে? আমি একটি অদ্ভুত প্রস্তাব দিলাম। আমি বললাম, আজাদ পত্রিকা ইউবিএল অর্থাৎ বর্তমান জনতা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিল। সে ঋণ পরিশোধ করেনি। জনতা ব্যাংককে বলুন পত্রিকাটির ঋণের দায় গ্রহণ করতে এবং সাংবাদিক কর্মচারীদের টাকা দিতে। এরপর অদ্ভুত একটা কণ্ঠ আমার কাছে এল। প্রধানমন্ত্রী ফোন তুললেন। চাইলেন জনতা ব্যাংকের এমডি জনাব খায়রুল কবিরকে। বললেন, কবির ভাই, নির্মল সেন ও গিয়াস কামাল এসেছে। নির্মল সেন তো বিপ্লবী, ওকে তো কথা শোনানো যাবে না। গিয়াস কামাল আমাদের লোক। ওরা বলছে, আজাদ পত্রিকা নাকি আপনাদের কাছে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেনি। আপনারা ঋণের দায়ে ওই পত্রিকাটি টেকওভার করেন। ওদের কিছু টাকা দেন।

আমি বললাম, প্রধানমন্ত্রী, এ তো হয় না। এ ব্যাপারে আইন করতে হবে তো। আইন না করে আজাদ তো টেকওভার করতে পারবেন না। আপনি

www.nagorikpathagar.com

আপাতত কবির ভাইকে আমাদের কিছু টাকা ধার দিতে বলুন। প্রধানমন্ত্রী আমাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন—আইনের কথা পরে হবে। আগে আপনাদের বাঁচাতে হবে। ঠিক আছে, কবির ভাইকে বলে দিচ্ছি আপনাদের কিছু টাকা দেয়ার জন্য। প্রধানমন্ত্রীর কথামতো আজাদ পত্রিকায় কিছু টাকা দেয়া হয়েছিল। যাদের টাকা দেয়া হয়েছিল, তাদের আমি চিনি। আজাদ কর্তৃপক্ষ কোনোদিন সে টাকা পরিশোধ করেছেন বলে আমার মনে হয় না। আর আজাদ পত্রিকা নিয়ে পরবর্তীকালে কাহিনী অনেক দীর্ঘ। সে কাহিনীতে আমি আরো পরে আসব। আর নিশ্চয়ই আমি মেনে নেব, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে সেকালে চাইলে অনেক কিছুই পাওয়া যেত। সে চেষ্টা আমি করিনি। কেন করিনি সে কথা আমি আগেই বলেছি।

সমস্যা শুধু আজাদ পত্রিকা নিয়ে নয়। সমস্যা ছিল দৈনিক পয়গাম নিয়েও। পয়গাম ছিল পূর্ব পাকিস্তানের এক সময়ের গভর্নর মোনায়েম খানের পত্রিকা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পত্রিকাটি মালিকবিহীন হয়ে যায়। সরকারি তত্ত্বাবধানে আসে। পরিবর্তিত নাম হয়—স্বদেশ। কিন্তু এ পত্রিকা চালাবে কে? এ পত্রিকার সাংবাদিক কর্মচারীদের বেতন কোথা থেকে আসবে? পয়গাম কোনোদিন লাভজনক পত্রিকা ছিল না। সরকারি বিজ্ঞাপনে চলত। পয়গামের প্রচার সংখ্যাও তেমন বেশি ছিল না। এ পরিস্থিতিতে দেশ স্বাধীন হবার পরে ওই কাগজের দায়িত্ব সরকারের ওপর বর্তায়। আজকে যারা আমার লেখা পড়ছেন—তাদের পক্ষে সেদিনের পরিস্থিতি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আমি সেদিন ভেবেছি আজকেও ভাবছি, তখন সরকারের কী করার ছিল? দৈনিক পাকিস্তান, মর্নিং নিউজ, পাকিস্তান অবজারভার, পূর্বদেশ, আজাদ ও স্বদেশ চালাবার দায়িত্ব সরকারের ওপর পড়েছে। দৈনিক পাকিস্তান দৈনিক বাংলা হয়েছে। পাকিস্তান অবজারভার হয়েছে বাংলাদেশ অবজারভার। দৈনিক বাংলা, মর্নিং নিউজ, বাংলাদেশ ও পূর্বদেশে নিজেদের চলবার মতো কিছু সঞ্চয় ছিল। কিন্তু আজাদ ও স্বদেশে তেমন কোনো সঞ্চয় ছিল না। তাহলে এ দায়িত্ব কে নেবে? দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এ ধরনের সমস্যার কথা কেউ নিশ্চয় ভাবেনি। কেউ ভাবেনি যে পত্রিকা চালাবার দায়িত্বও সরকারের ওপর ন্যস্ত হবে। ফলে এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত কোনো মহলে ছিল না। তাই সাধারণ বিবেচনায় এই পত্রিকাগুলো পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হলো তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর। কোনো নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা হলো না। এ পত্রিকাগুলোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো চিন্তা-ভাবনা হলো না। তাৎক্ষণিকভাবে খবরদারি দেয়া হলো তথ্য মন্ত্রণালয়কে। কিন্তু পত্রিকাগুলোকে অধিক হারে

www.nagorikpathagar.com

বিজ্ঞাপন দিলেও রাতারাতি বিজ্ঞাপনের টাকা পাওয়া যাবে না। অর্থ সাহায্যের জন্যে যেতে হবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়কে বোঝানো অত সহজ নয়। তখন অর্থমন্ত্রী মরহুম তাজউদ্দিন আহমদ। তাঁকে কথায় ভোলানো যায় না। যুক্তিগ্রাহ্য না হলে কোনো কথাই তিনি শুনবেন না। তাঁর কাছ থেকে পত্রিকার জন্য টাকা আনা আদৌ সহজ নয়। তাঁর প্রথম কথা হলো—এ অর্থ কেন দেব? অর্থের মালিক আমি বা সরকার নয়। এ অর্থের মালিক রাষ্ট্রের জনগণ। এ অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার সাধ্য আমাদের ছিল না। কারণ ওই পত্রিকাগুলো নিয়ে কী করা হবে, আদৌ এ পত্রিকাগুলো চালু রাখা হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই সরকারকে নিতে হবে। এ ব্যাপারে ইউনিয়নের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। ইউনিয়নের দায়িত্ব হচ্ছে সাংবাদিক কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষা করা। কোনো শিল্প কারখানা বা সংবাদপত্র বন্ধ হলে কর্মচারীদের পাওনা আদায়ে নিশ্চয়তা বিধান এবং সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানটি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা।

কিন্তু পাকিস্তানে তখনো সংবাদপত্র শিল্প হিসেবে গড়ে ওঠেনি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পত্রিকাগুলো ছিল ব্যক্তি মালিকানায়। মাত্র দৈনিক বাংলা ও মর্নিং নিউজ-এর মালিক ছিল পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্ট। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই মালিকানার প্রশ্নই মুখ্য হয়ে দেখা দিল। সঙ্কট দেখা দিল পত্রিকাগুলো চালু রাখা নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে আজাদ পত্রিকার জন্যে কিছু টাকা পেলেও শেষ রক্ষা হলো না। অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এ ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্ত চাইলেন। জানতে চাইলেন পত্রিকাগুলোর ভবিষ্যৎ। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো কিছুই বলার সুযোগ ছিল না।

সরকারের পক্ষে দৈনিক স্বদেশের প্রশাসক নিযুক্ত হলেন প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা কোরবান আলী। কোরবান আলীর বিরুদ্ধে স্বদেশের সব সম্পদ বিক্রি করে দেয়ার অভিযোগ উঠল। শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেলো স্বদেশ। আমাদের শুধুমাত্র দেখা ছাড়া কোনো কিছু করার অবকাশ ছিল না। তবে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল সাংবাদিকদের পুনর্বাসনের। আজাদ পত্রিকার সমস্যাও মিটল না। আজাদ পত্রিকার মালিকানা নিয়ে বিরোধ ছিল। সমস্যার সাময়িক সমাধান হিসেবে আজাদের মালিকদের একটি অংশের হাতে আজাদের মালিকানা দিয়ে দেয়া হয়। শেষ হলো সরকারি নেতৃত্ব। কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না। সংবাদ সংস্থা বিপিআই অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রেস ইন্টারন্যাশনাল নতুন নাম নিল। নাম হলো ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি এনা। এ

www.nagorikpathagar.com

প্রতিষ্ঠানটিও দীর্ঘদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলল। সেই এনাও পরবর্তীতে নিজগুণে বন্ধ হয়ে গেল।

পত্রিকা জগতের এই পরিস্থিতিতে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচন হলো। আমি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি হলাম। সাধারণ সম্পাদক হলেন গিয়াস কামাল চৌধুরী। একটি অস্থির পরিবেশে আমি ইউনিয়নের সভাপতি হলাম। চারদিকে অস্থিরতা। একাত্তরের সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই সর্বত্রই অস্ত্র ছড়িয়ে গেছে। সকলেই মুক্তিযোদ্ধা এবং সশস্ত্র। সকলেই নিজের সংবাদ ছাপাতে চায়। সংবাদ না ছাপালে এসএলআর নিয়ে অফিসে হাজির হয়ে যায়। প্রকাশ্যে জীবননাশের হুমকি দেয়। এর মাঝখানে অধিকাংশ পত্রিকায় অনিশ্চয়তা। একাত্তরের সংগ্রামের কালে সংবাদ বন্ধ ছিল। সংবাদ তখনো সে বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠেনি। পাকবাহিনী ইত্তেফাক পুড়িয়ে দিয়েছিল। একাত্তরে সংগ্রামের সময় ইত্তেফাক প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইত্তেফাক যুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রচার সংখ্যার দিক থেকে তখন দৈনিক বাংলা এগিয়ে। যুদ্ধ শেষে দৈনিক বাংলায় আমার চাকরির পরিবর্তন হয়েছে। দৈনিক পাকিস্তানে চাকরি নিয়েছিলাম সহসম্পাদক হিসেবে। দৈনিক বাংলায় আমি সহকারী সম্পাদক। আমি ঢাকায় ফিরেছি। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেছি জানুয়ারিতে। আমি অনিকেত ছদ্মনামে উপসম্পাদকীয় লিখছি দৈনিক বাংলায়। আমার লেখা তখন একান্তই বিতর্কিত। আমার লেখায় সরকার পক্ষ কিছুতেই খুশি নয়। আর এই সময়েই আমি ইউনিয়নের সভাপতি হলাম। তখন সাংবাদিকদের জাতীয়ভিত্তিক কোনো সংগঠন ছিল না। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নই জাতীয়ভিত্তিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিত। ফলে আমার অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠল।

অপরদিকে রাজনৈতিক দিক থেকেও আমি তখন মার খাচ্ছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আমাদের অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের প্রভাবশালী শ্রমিক সংগঠন ছিল। দেশের সমস্ত চটকলে ছিল আমাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। ঢাকা শহরের হোটেল কর্মচারীদের ইউনিয়ন আমাদের হাতে ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমাদের হোটেল শ্রমিক প্রতিষ্ঠান শাহবাগ হোটেল ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে মিছিল করেছি। সে মিছিলে গুলি হয়েছিল। এটাই ছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোনো মিছিলে প্রথম গুলি।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের উপর হামলা নেমে এল। সরকারি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান শ্রমিক লীগ একের পর এক আমাদের ইউনিয়ন হাইজ্যাক করতে শুরু

www.nagorikpathagar.com

করল। আমাদের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে নতুন রেজিস্ট্রেশন দেয়া হতে থাকল। আমাদের সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মওলানা সাইদুর রহমানকে হাইজ্যাক করে শ্রমিক লীগের সভাপতি করা হয়।

এ সময় আমি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। সারাদেশে তখন এক ধরনের নৈরাজ্য। মুক্তিযোদ্ধা নামে পরিচয় দিয়ে এক শ্রেণির যুবক সবকিছু দখল করছে। এর বিরুদ্ধে লেখা যাচ্ছে না। সরকারি কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা আছে সন্ত্রাসীদের। সেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস থাকা খুব সহজ ছিল না।

অপরদিকে বামপন্থী মহলে তখন বিভাজন চরম। মস্কোর অনুসারী কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে সরকারের সাথে সহযোগিতা করছে। পিকিংপন্থী বলে পরিচিত রাজনীতিকরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে সর্বহারা পার্টি ক্ষমতা দখলের ডাক দিচ্ছে। একের পর এক থানা লুট হচ্ছে। ১৬ ডিসেম্বর অর্ধ দিবস হরতাল ডেকেছে সর্বহারা পার্টি। বিজয় দিবসের এ হরতাল হঠাৎ সমর্থন জানালেন মওলানা ভাসানী। কেন জানালেন, কোন ভিত্তিতে জানালেন সে ব্যাখ্যা আজো আমার কাছে পরিষ্কার নয়। শুধু একটি ব্যাখ্যাই পরিষ্কার ছিল যে, ডান-বাম রাজনীতির অঙ্গনে নৈরাজ্য বিরাজ করছিল।

ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ। সহযোগিতা করছে কমিউনিস্ট পার্টি এবং একতা পার্টি। এ সহযোগিতার ভিত্তি কখনো আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। তাদের স্লোগান হচ্ছে—দেশ স্বাধীন করেছি। এবার দেশ গড়তে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। কমিউনিস্ট পার্টির এ ঐক্যের স্লোগানটি আদৌ পরিষ্কার নয়। প্রশ্ন হচ্ছে—ঐক্য কার সাথে। কোনো শ্রেণির সাথে। সমাজতন্ত্রের কথা বলা হলে আওয়ামী লীগের সাথে কি ঐক্য করা যায়! আওয়ামী লীগ কি সমাজতন্ত্রের দল? তাহলে আওয়ামী লীগের শ্রেণি চরিত্র কি? আওয়ামী লীগের সাথে কমিউনিস্ট পার্টি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পূর্বে এ প্রশ্নগুলো আলোচিত হতো বিভিন্ন অঙ্গনে। তবে এ কথা ঠিক যে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও একতা পার্টির রাজনীতির একটি উত্তরাধিকারের ঐকমত্য ছিল। এরা মস্কোর অনুসারী ছিল এবং মস্কোর তত্ত্ব অনুযায়ী খুব সোজা হিসেব ছিল মস্কোর সাথে দিল্লির ভালো সম্পর্ক। দিল্লি সরকারের সাথে ঢাকা সরকারের ভালো সম্পর্ক। ঢাকা সরকারে আছে আওয়ামী লীগ। সুতরাং আওয়ামী লীগের সাথে বাংলাদেশের মস্কোপন্থীদের ঐক্য হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এ ঐক্য নিয়ে মতান্তর ছিল আওয়ামী লীগেই দীর্ঘদিন। এই মতান্তরের শিকার আমিও

www.nagorikpathagar.com

হয়েছিলাম ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে, সে কাহিনীতে পরে আসছি।

আমি ঢাকা সংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হলাম জুলাই মাসে। মনে হলো ওই মাস থেকে আমার শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি একটি সুন্দর ভাষণও দিয়েছিলেন। উল্লেখ করেছিলেন পাকিস্তান যুগে সাংবাদিকদের আন্দোলনের কথা। সেই আন্দোলনে তাঁর সমর্থনের কথা। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্বে নতুন সভাপতি হিসেবে আমি ভাষণ দিয়েছিলাম। আমার কণ্ঠে ছিল ক্ষোভের সুর। আমাদের সভার প্রথম সারিতে পত্রিকার সম্পাদকেরা বসেছিলেন। এক সময় আমি তাঁদের উদ্দেশে বললাম, আপনারা সকলে সরকারের স্তুতি গাইছেন কেন? সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছেন সাংবাদিকদের মাথায়। নিজেরা কোনো ভূমিকা পালন করছেন না। প্রবীণ সাংবাদিকরা সুযোগ খুঁজছে উঁচু পদ পাওয়ার জন্যে। অবস্থা এমন হলে এ দেশের সাংবাদিকতাই থাকবে না।

সাধারণ শ্রোতারা খুশি হলেও রুষ্ট হলেন সম্পাদকেরা। আব্দুল গাফফার চৌধুরী সম্পাদিত দৈনিক জনপদে আমার নাম করেই চিঠি বের হলো। কিছু কিছু উপদেশ দেয়া হলো সম্পাদকীয় ও সাংবাদিকতা সম্পর্কে। এই সময় বিপদ দেখা দিল দৈনিক গণকণ্ঠ নিয়ে। গণকণ্ঠ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের মুখপত্র। মাত্র কিছুদিন আগে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠিত হয়েছে। এই দলটির নেতৃত্ব দিয়েছেন ছাত্রলীগের এককালের নামিদামী নেতারা। আমার আগের লেখায় ছাত্রলীগের এই গ্রুপটি সম্পর্কে আমি লিখেছি। আমি বলতে চেয়েছি ৭১-এর সংগ্রামের মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে ছাত্রলীগের এই অংশটি। তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা কিংবা সাহস সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবার অবকাশ নেই।

আমার প্রশ্ন ছিল এরা কারা। এরা কী চায়? একটি ছাত্র সংগঠন দিয়ে বিপ্লব করা সম্ভব নয়। তাই আওয়ামী লীগের আশ্রয়ে থেকেই এদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলতে হয়েছে। প্রথম থেকে আমার ধারণা ছিল দেশের স্বাধীনতা এদের কাছে শেষ কথা নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্থবহ করতে হলে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলতে হয়। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এমন কথা তারা বলতে রাজি হননি। আমি আগেই লিখেছি ৭১-এর সংগ্রামের আগে এই গ্রুপটির সাথে আমাদের দলের বারবার আলোচনা হয়েছে। আমরা বলেছি, আমরা স্বাধীনতা চাই। সাথে সাথে স্বাধীন

www.nagorikpathagar.com

বাংলাদেশের একটা রূপরেখাও চাই। আমরা পাকিস্তানের মতো আর একটি শোষণমূলক রাষ্ট্র গঠনে রাজি নই। এই প্রশ্নটি ছাত্রলীগের নেতারা বারবার এড়িয়ে গেছেন। স্বাধীনতার পরে মনে হলো ছাত্রলীগের এ গ্রুপটি প্রচণ্ড শক্তিশালী। কিন্তু এ শক্তির ভবিষ্যৎ কী? প্রথমে লক্ষ করলাম এ গ্রুপটি মুজিববাদের স্লোগান দিচ্ছে। পরবর্তীকালে শুনলাম এরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলছে। প্রথম প্রথম সেই শব্দটা আমার মনে কৌতুক সৃষ্টি করত। আমার বোধগম্য হতো না সমাজতন্ত্রের সাথে তারা এ বৈজ্ঞানিক বিশেষণটি কেন লাগিয়েছে। একদিন শুনলাম ওরা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে কমরেড শেখ মুজিব বলে সম্বোধন করছে। ওদের স্লোগান হচ্ছে, কমরেড শেখ মুজিব লও সালাম, লও সালাম। আমি বুঝতে পারিনি কোন ভিত্তিতে ওরা শেখ সাহেবকে কমরেড বলছে। তাহলে ওরা কি ভাবছে যে দেশে সমাজতন্ত্র হবে এবং সেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের নেতা হবেন শেখ মুজিব। পরবর্তীকালে আমার মনে হয়েছে ভিন্ন কথা। দুঃখ হয়েছে এই ত্যাগ এবং সাহসী তরুণদের জন্যে এবং মনে হয়েছে যে কোনো মহল থেকেই হোক এ তরুণদের নিদারুণভাবে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। এদের বলা হয়নি, পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না। বলা হয়নি আওয়ামী লীগ সমাজ পরিবর্তনের রাজনৈতিক সংগঠন নয়। এও বলা হয়নি যে অন্য দেশের সহযোগিতায় স্বাধীনতা অর্জন করলে আমরা পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ব। আমার যতদূর ধারণা এদের কাছে স্বাধীনতার একটি রঙিন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। হয়তো এও বলা হতে পারে, ছাত্রলীগ থেকে যেভাবে আওয়ামী লীগকে ৭১-এর সংগ্রামে ঠেলে দেয়া গেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তেমনিভাবে আওয়ামী লীগকে ঠেলে দেয়া যাবে সমাজ পরিবর্তনের দিকে। এ ধরনের ধারণা ছাড়া শেখ সাহেবকে কমরেড বলার কোনো অর্থ আছে বলে আজো আমার মনে হয় না। আমার আর ধারণা হচ্ছে—এ কাজটি যারা করেছেন তাঁরা ভীষণ ধুরন্ধর। অথচ একেবারেই নির্বোধ। ধুরন্ধর না হলে একের পর এক এমন মিথ্যা তত্ত্ব সাজিয়ে একটি বিরাট সাহসী তরুণ গোষ্ঠীকে এমন বিভ্রান্ত করা সম্ভব হতো না। এমনো হতে পারে, এই ধুরন্ধর গোষ্ঠীটি জানত যে আজ হোক কাল হোক পাকিস্তান ভাঙবেই। এই পাকিস্তান ভাঙার আন্দোলন বামপন্থীদের হাতে গেলে দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিপর্যস্ত হবে। অশান্তপূর্ব ভারতের বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু হবে স্বাধীন বাংলাদেশ। লক্ষণীয় যে তখন এই অঞ্চলের কতিপয় দল স্বাধীন বাংলা গঠনের স্লোগান দিচ্ছিল।

www.nagorikpathagar.com

সেকালের পূর্ব পাকিস্তানের পঞ্চম আন্দোলন সীমান্তের বিরাট এলাকা জুড়ে শুরু করেছিল নকশালপন্থীরা। সে পটভূমিতে কেউ যদি মনে করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন নিজেদের কব্জায় রাখতে হবে, এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে হবে যেখানে সমাজ ব্যবস্থা অটুট থাকবে, সেকালের পরিস্থিতিতে এমন ধারণা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু ইতিহাস কারো আঙ্গুলি হেলানে চলে না। ইতিহাসের গর্ভেই নতুন শক্তির সৃষ্টি হয়। এমনি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতের সাহায্যে হলেও এই স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলাদেশের একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। ৭১-এর যুদ্ধে সাধারণ মানুষ যোগ দেয়। নিজের বাঁচার তাগিদে অস্ত্র ধরে। যুদ্ধ শেষে তাদের মনে একটি প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়। প্রত্যাশা হচ্ছে জীবনে সুদিন আসবে। পাকিস্তান আমলের মতো দুঃখ-বেদনা থাকবে না। অনাচার, অবিচার, স্বজনপ্রীতি থাকবে না। ৭১-এর যুদ্ধ তরুণদের নতুন সমাজ গঠনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে।

আর এখানেই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় সেই ধূরন্দর নেতৃত্বের সাথে সাহসী ত্যাগী, তরুণদের। এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পুরানো কথায় কাজ হবে না। সমাজ পরিবর্তন এবং সমাজতন্ত্রের কথা বলতে হবে, নইলে এ তরুণদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। অথচ যে নেতৃত্ব এদের অনুপ্রাণিত করেছিল, এদের মৃত্যু হাতে নিয়ে জীবন যুদ্ধ ঠেলে দিয়েছিল, সে নেতৃত্ব আদৌ সমাজতন্ত্র বা সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিল না। আমার মতে সেই পটভূমিতেই তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র আবিষ্কার করেছিল এবং শেখ সাহেবকে কমরেড বলে সম্বোধন করেছিল। আমি মনে করি তরুণদের বিভ্রান্ত করার জন্যে তারা এ পথ নিয়েছিল। অন্যথায় যে কথা আমি আগেই বলেছি তা হচ্ছে—এই মহলটি একেবারেই নির্বোধ ছিল। রাজনীতির ব্যাকরণে নিম্নতম জ্ঞান যাদের আছে তারা নিশ্চয়ই শেখ সাহেবকে কমরেড বলবে না। তরুণদের বোঝাবার চেষ্টা করবে না যে, শেখ সাহেব বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবেন।

তবে যে ব্যাখ্যায়ই হোক দেখা গেলো ছাত্রলীগের এই অংশটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্লোগান দিচ্ছে। একই দিনে ছাত্রলীগের দু'টি অংশের সম্মেলন হচ্ছে। এই পক্ষ থেকেই বলা হচ্ছে যে, শেখ সাহেব তাদের সম্মেলনে যাবেন। কিন্তু শেখ সাহেব তাঁর শ্রেণি চরিত্রে বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি পল্টন ময়দানে আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজের সম্মেলনে না গিয়ে পল্টন ময়দানে নূরে আলম সিদ্দিক, আব্দুল কুদ্দুস মাখনের সম্মেলনে যোগ দিলেন। রব-সিরাজের সম্মেলনে নতুন ছাত্রলীগ গঠিত হলো। যার লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। পরবর্তীকালে দল হিসেবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ আত্মপ্রকাশ করল।

www.nagorikpathagar.com

বিস্ময়ে দেখলাম মেজর এমএ জলিল এই দলের সভাপতি হয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক দল হিসেবেই গঠিত দলটি একটি বিভিন্ন শ্রেণির সমন্বয়ে দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। বিশ্বাস বা আদর্শের কোনো বালাই থাকল না এই দলের। আর এই দলের মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হলো দৈনিক গণকণ্ঠ। এই দলটি তখন চরমভাবে নির্যাতিত। আর এদের হঠকারিতার কোনো শেষ নেই। তারা প্রায় প্রতি সপ্তাহে সরকারকে আলটিমেটাম দিচ্ছে। কখনো কখনো থানা, পুলিশ ফাঁড়ি দখল করছে। প্রাণ দিচ্ছে। আহত হচ্ছে তার যেন কোনো হিসাব নেই। পুলিশ এদের তাড়াচ্ছে আর তাড়াচ্ছে। গ্রেফতারের খবরটি পত্রিকায় ছেপে দিন। পত্রিকায় ছাপা না হলে এই ছেলের আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। অদৃশ্য হয়ে যাবে এই পৃথিবী থেকে। আমি দিনের পর দিন এই খবর ছাপাতে চেষ্টা করেছি। এদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছি। এই ত্যাগী এবং সাহসী তরুণদের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করা যায় কিন্তু সহমর্মিতা প্রকাশ না করে পারা যায় না। আমার মনে আছে রব-সিরাজ ছাত্রলীগের সম্মেলনে আবুল হাশেম ও আমি গিয়েছিলাম। যাননি শেখ সাহেব। তাই তত্ত্বের দিক থেকে চরম বিরোধিতা থাকলেও এই তরুণদের সাথে অজান্তে একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমার। আর ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের পত্রিকা গণকণ্ঠ নিয়ে সমস্যা মোকাবেলা করতে হলো।

গণকণ্ঠ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার অনমনীয়। এ ব্যাপারে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভা ডাকা হলো। সবাই চুপচাপ। শেখ সাহেবের সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধান্বিত। সকলেই প্রতিবাদ করছেন কিন্তু কোনো সুস্পষ্ট প্রস্তাব দিলেন না। সকলের সাথে আলাপ হলো। সাংবাদিক এমএন হারুন পরামর্শ দিলেন একটি সীমিত কর্মসূচি নিতে। কর্মসূচি হচ্ছে সকল পত্রিকায় দু'ঘণ্টার ধর্মঘট। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সরকার বিব্রত হলেন। পরের দিন তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আমাদের ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, আপনাদের সব দাবি মেনে নেয়া হবে। কিন্তু তার আগে আপনাদের ধর্মঘট তুলে নিতে হবে। আমরা বললাম তা হয় না। এ প্রস্তাব পাল্টাতে হলে ইউনিয়নের বৈঠক করতে হবে। সে সময় এখন আর নেই। আমি তখনো বুঝতে পারিনি আমাদের সাথে আলাপের জন্যে যুগ্ম সচিবকে প্রতি মুহূর্তে নির্দেশ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

আমরা সরকারি প্রস্তাবের সাথে একমত হলাম না। ইউনিয়নের প্রবীণ সদস্যদের মত, জরুরি ভিত্তিতে ইউনিয়নের সাধারণ সভা ডাকা হোক। তখন ইউনিয়ন তেমন বড় ছিল না। বিকেলে প্রেস ক্লাবের আমতলায় সাধারণ সভা

www.nagorikpathagar.com

বসল। একজন মাত্র সদস্য ইউনিয়নের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল। তাই ভোটাভুটির প্রয়োজন হয়নি।

গণকণ্ঠের দু'ঘণ্টা ধর্মঘট হয়ে গেল। সরকার সব দাবিই মেনে নিলো। কিছুদিন পরে একটি অদ্ভুত প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন প্রধানমন্ত্রী। শেখ সাহেব বললেন, আপনাদের দাবি তো মানলাম। কিন্তু কোনো দেশের কোনো সরকার কি এ ধরনের দাবি মানে?

গণকণ্ঠ জাসদের পত্রিকা। গণকণ্ঠ ছাপা হয় জনতা প্যাকেজিং-এ। প্রকৃতপক্ষে এ প্রেসটি ছিল দৈনিক সংগ্রামের। দেশ স্বাধীন হবার পর এই প্রেসটির মালিকানা সরকার গ্রহণ করে। প্রশাসক নিযুক্ত হন জাসদের এক নেতা। ওই নেতাই আবার গণকণ্ঠের পরিচালক। তিনি গণকণ্ঠের পরিচালক হিসেবে ওই প্রেসের পরিচালকের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে বলা হয়েছে, গণকণ্ঠ ওই প্রেসে ছাপা হবে। সে জন্যে প্রেসকে গণকণ্ঠ কর্তৃপক্ষ মাসে পাঁচ হাজার টাকা দেবে। ঘটনাটি দু'দিক থেকেই অভিনব। প্রথম হচ্ছে, একই ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক হিসেবে অপর একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দুই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি চুক্তি করেছেন। উভয় প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষরদানকারী একই ব্যক্তি। দ্বিতীয় হচ্ছে একটি দৈনিক পত্রিকা ছাপার জন্যে প্রেসকে মাত্র মাসে ৫ হাজার টাকা দেয়া হবে।

তবে খবরের শেষ এখানেই নয়। শেখ সাহেব বললেন, গণকণ্ঠের জন্যে বাড়ি দেব, পানি দেব, ফোন দেব, টেলিপ্রিন্টার দেব, নিউজপ্রিন্ট দেব—এ বাবদ তারা কোনো পয়সাই পরিশোধ করবে না। পরিবর্তে তারা শুধু আমাদের সরকারের সমালোচনা করবে। আপনাদের এ দাবি পৃথিবীর কোনো দেশের সরকার মানবে কি? প্রকৃতপক্ষে সেদিন আমার কাছে এ প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না। এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে জড়িত আছি। অনেক সময়ই অনেক কাজ করেছি, যা আমার মনপুত ছিল না। আর আমার করারও কিছু ছিল না।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছি জুলাই মাসে। আগস্ট মাসে আমন্ত্রণ এল পূর্ব জার্মানি অর্থাৎ (জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান) জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। সেকালের কমিউনিস্ট জার্মানির পক্ষ থেকে। পূর্ব জার্মানের লাইপজিগ শহরে প্রতি বছর শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেই শিল্পমেলায় আমাদের আমন্ত্রণ। পূর্ব জার্মানি তখনও জাতিসংঘের সদস্য নয়। তাই জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের নিতে তাদের বেশি আগ্রহ।

www.nagorikpathagar.com

এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তারা অকুণ্ঠ সমর্থন করেছে। সাহায্য করেছে অঢেল। সেদিক থেকে আমাদের আমন্ত্রণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

সিদ্ধান্ত হলো ইউনিয়নের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল পূর্ব জার্মানিতে যাবে। ইউনিয়নের সভাপতি আমি, যুগ্ম সম্পাদক শামসুল হক, আল নূর ও অন্যতম সদস্য মোজাম্মেল হোসেন। প্রশ্ন দেখা দিলো আমার যাওয়া নিয়ে। পাকিস্তান আমলে আমি কোনোদিন পাসপোর্ট পাইনি। এ আমলেও পাওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না। ১৯৬২ সালের কথা। আইয়ুব খানের আমল। জেল থেকে এসেছি। তখন পাসপোর্টের অন্যতম কর্মকর্তা কাজী বাহাউদ্দিন আহমেদের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে দেখে বলেছিলেন, আপনি এসেছেন কেন? আমাদের কাছে ৫ ব্যক্তির একটি নামের তালিকা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জিজ্ঞেস না করে তাদের পাসপোর্ট দেয়া বারণ। এর মধ্যে আপনি একজন। এ তালিকায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ বড় নেতাদের কারো নাম নেই। আমি বললাম, আমি নিজের পাসপোর্টের জন্যে আসিনি। এসেছি আমার কাকার পাসপোর্টের জন্যে। বাহাউদ্দিন সাহেব বললেন, এ পাসপোর্টও দেয়া হবে না। ওই দরখাস্ত আপনি বহন করছেন। মাস কয়েক পর অন্য কাউকে দিয়ে একটি দরখাস্ত পাঠিয়ে দেবেন। আপনার কাকাকে পাসপোর্ট দেয়া হবে। বাহাউদ্দিন সাহেব কথা রেখেছিলেন। আমার কাকাকে পাসপোর্ট দিয়েছিলেন তাও মাত্র দু'মাসের জন্য।

দেশ স্বাধীন হলো ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু এ ধরনের কোনো ঘটনাই আমি ভুলতে পারিনি। আমি ও আলী নূর পাসপোর্টের জন্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গেলাম। স্বরাষ্ট্র সচিব টি আহমেদ। আমি বললাম, আমাদের দরখাস্তে একটি সই করে দিন। তিনি প্রথমে কোনো কথা বললেন না। তিনি আমার কথায় খানিকটা বিস্মিত হলেন। বললেন, দরখাস্তটা রেখে যান। পরে জানাব। আমি বললাম, তা হবে না। পাকিস্তান আমলে অনেক জ্বালিয়েছেন। এবার আমি আপনাকে কোনো সময় দিতে রাজি নই। আমাদের ব্যাপারে তদন্তের কোনো অবকাশ নেই। তখন দুপুর একটা। আমি বললাম, আপনাকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সময় দিলাম। আলী নূর এখানে থাকবে। আমি প্রেস ক্লাবে অপেক্ষা করব। তিনটার মধ্যেই আলী নূর স্বরাষ্ট্র সচিবের সই নিয়ে এসেছিল। খুশি হয়েছিলেন বাহাউদ্দিন সাহেব। পাসপোর্টের জন্যে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি হাসলেন।

বললেন, আজ বড্ড ভালো লাগছে। আমার চাকরিকালেই আপনাকে আমি পাসপোর্ট দিতে পারলাম।

www.nagorikpathagar.com

সেপ্টেম্বরে প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বার্লিন যেতে হবে। ঢাকা থেকে দিল্লি। দিল্লিতে একরাত হোটেলে। পরদিন ভোরে তেহরান হয়ে মস্কো। মস্কো থেকে পূর্ব বার্লিন। জীবনের প্রথম বিদেশ যাত্রা। ইতিপূর্বে শৈশবের স্বদেশ, যৌবনের বিদেশ ভারতে গিয়েছি। গিয়েছি যৌবনের স্বদেশ ও পরবর্তীকালে বিদেশ পাকিস্তান। পাকিস্তান গিয়ে তুরখাম সীমান্তে আফগানিস্তানে পা রেখেছি। ওটাই আমার বিদেশ পদার্পণ। সে অর্থে এবারই আমার বিদেশে পদার্পণ। শুধু বিদেশ নয়, সমাজতান্ত্রিক দেশ। ঠিক হয়েছে শুধু পূর্ব জার্মানি নয়, ফেরার পথে হাঙ্গেরি ও সোভিয়েত ইউনিয়নে যাব। তাই দীর্ঘদিন ধরেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলাম।

আমি মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, শ্রেণিসংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাস করি এবং সেই রাজনীতিই করি। কিন্তু রাজনীতির হাতেখড়ি থেকে অনেক প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আমি একমত নই। আমি মনে করি লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিন ভুল পথে চলেছে। আমাদের দলের ব্যাখ্যা হচ্ছে স্ট্যালিনের জন্যেই বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের দলের ব্যাখ্যা হচ্ছে পূর্ব ইউরোপের পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া বা হাঙ্গেরি কোনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সোভিয়েত বাহিনী এই সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে জগাখিচুরির এই সরকারগুলোকে বলা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সরকার। আমার দলের বক্তব্য হচ্ছে—পূর্ব ইউরোপের এই সকল দেশে প্রতি বিপ্লব অনিবার্য। আমার সঙ্কট হচ্ছে এই ধারণা এই বিশ্বাস নিয়েই আমি বাংলাদেশের প্রথম সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের নেতা হয়ে ওই দেশ সফরে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস তারা আমার খবর রাখে। সেখানে কমিউনিস্টদের ভাষায় আমি ট্রটস্কিপন্থী মার্কিন দালাল। আর আমি হলাম স্বাধীন বাংলাদেশের সাংবাদিক প্রতিনিধিদের নেতা।

ফলে এই সকল দেশগুলোতে প্রতি মুহূর্তে আমার সাথে বিতর্ক হবে। জানি না সেই বিতর্ক কতদূর গড়াবে। এছাড়া ভয় ছিল নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পর্কে। আগে এ ধরনের সফরে যাইনি। আমি একটি দেশের প্রতিনিধিত্ব করব। সেখানে দলবাজি ছেড়ে দেশের কথা বলতে হবে। আবার নিজের আদর্শকেও পরিহার করা চলবে না।

পূর্ব জার্মানির রাত ১২টায় বার্লিন বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। আমাদের ঘড়িতে তখন ভোর ৫টা। নয়াদিল্লি থেকে যাত্রা করেছিলাম আমার ঘড়িতে

www.nagorikpathagar.com

বেলা সাড়ে ন'টায়। বিমানবন্দরের ভেতরেই পূর্ব জার্মানির সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ গাড়ি নিয়ে এলেন। আমার পোশাক দেখে নেতৃবৃন্দ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছ? সেপ্টেম্বরে সেখানে কিছু শীত পড়লেও আমার পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি, পায়ে স্যান্ডেল। ওদের তাই চিনে নিতে অসুবিধা হয়নি যে আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। যারা নিতে এসেছিলেন তাদের মধ্যে একজন পূর্ব জার্মানির বিদেশ দফতরের ভদ্রমহিলা ছিলেন। বিমানবন্দরে চা খেতে খেতে তাঁর সাথে আলাপ হলো। খানিকটা স্বস্তি পেলাম। নিজের কাছে মনে হলো জ্ঞানের গভীরতায় পাল্লা দেয়া আদৌ কোনো অসুবিধা হবে না। মনে হলো সাম্প্রতিক অনেক ঘটনা ওদের জানা নেই, বিশেষ করে পশ্চিম জগতের।

আমাদের একটি সুন্দর বাড়িতে থাকতে দেয়া হলো। আদৌ কোনো হোটেল নয়, কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে এক ধনবান ব্যক্তির বাড়ি ছিল। এ বাড়িতে সাধারণত বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের থাকতে দেয়া হয়। আমাদের বার্লিনের অবস্থান ছিল স্বল্পকালীন। তাই হোটেলে নেয়া হয়নি। পরদিন আমাদের যেতে হবে লাইপজিগ। সেখানে প্রথম অনুষ্ঠান আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলন। আমাদের দোভাষী গানথার লিন্ডে। ষাট বছরের বৃদ্ধ। সাংবাদিক। রান্নার উপর বই লেখেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের বন্দিশিবিরে ছিলেন। পালিয়ে গিয়ে লন্ডনের বিবিসিতে কাজ করেছেন। পটাসডাম কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। লিন্ডে শিশুর মতো সরল। স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র নিয়ে তাঁর সংসার। লিন্ডে প্রকাশ্যে তাঁর সরকারের সমালোচনা করেন। গভীর রাতে লিন্ডে ফিরে গেলেন। ভোরবেলা এক বাঙালির কণ্ঠস্বরে চমকিত হলাম। বাঙালি রামুদা নামে পরিচিত। নাম সুনীল দাশগুপ্ত। এককালের বাড়ি বরিশালের গৌরনদী থানার গৈলা। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। ভারত থেকে গিয়েছিলেন পশ্চিম জার্মানি, সেখান থেকে পূর্ব জার্মানি। বিয়ে করেছেন জার্মানির এক মহিলাকে। নাম বারবারা দাশগুপ্ত। থাকেন কোপেনেকে। বার্লিনের বাঙালি সমাজে রামুদা বিশেষ পরিচিত। সকলের সুখে-দুঃখে আছেন। পূর্ব জার্মানিতে গেলে সকলেরই তাদের বাড়ি যেতে হয়। সেই রামুদা ভোরবেলা আমাদের কাছে এলেন। খাঁটি বরিশালের ভাষায় বললেন, কোনো ভয় নেই। আমিও লাইপজিগে যাব। সংবাদ সম্মেলনে আপনাদের সাথে আমি যাব। সংবাদ সম্মেলনে ইচ্ছে হলেই প্রশ্ন করা যায় না। আমি সব ব্যবস্থা করব। আর এই সংবাদ সম্মেলন থেকে আমার সাথে বিতর্কের শুরু। মনে হলো আমি একাই

স্বতন্ত্র। আর কেউ যেন এমন প্রশ্ন করছে না। সবাই এসেছে যেন খেয়েদেয়ে ঘুরে ফিরে চলে যাবার জন্যে।

জীবনের প্রথম বিদেশ সফর সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব জার্মান ও হাঙ্গেরি। এই তিন রাষ্ট্রেরই কমিউনিস্ট পার্টি সরকারে। এই কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সাথে আমার রাজনৈতিক মতানৈক্য ছিল। তাই বিতর্ক হয়েছিল তিনটি দেশেই। ১৯৭৪ সালে আবার ওই এলাকায় গিয়েছিলাম। সেবার সফর করেছি পূর্ব জার্মান, হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়া। দ্বিতীয় বারও আমার সাথে বিতর্ক হয়েছে। তবে সে বিতর্কের ধারা ভিন্ন। এই বিতর্ক সম্পর্কে আমার লেখা একটি বই আছে। বইটির নাম 'বার্লিন থেকে মস্কো'। সেই বইতে এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণ আছে। তবুও সেই বইতে তৎকালীন বাস্তব কারণে অনেক কিছু লেখা হয়নি। আমি সে বিশদ বিবরণে যাব না। শুধু কিছু কিছু ঘটনা তুলে ধরব। পূর্ব ইউরোপের এ দেশগুলোতে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সফর শেষে ঢাকায় ফিরে আমি দীর্ঘদিন দৈনিক বাংলায় আমার সফরগুলো লিখেছিলাম। এই দেশগুলো সম্পর্কে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা লিখেছিলাম। লিখতে লিখতে তৎকালীন চিলির সালবেদর আলেন্দের কথা লিখেছিলাম। বিতর্ককালে আমি পূর্ব জার্মান, হাঙ্গেরি এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার নেতাদের বলেছিলাম, তোমাদের দেশে প্রতি বিপ্লব হতে পারে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট বন্ধুরা আমার লেখার সমালোচনা করেছিলেন। আমাকে মার্কিন দালাল বানানোর চেষ্টা করেছিলেন। সেকালের সেই বিতর্কের কিছু কিছু অংশ নিয়েই হবে আমার এই লেখা।

পূর্ব বার্লিন পৌঁছুবার পরের দিন লাইপজিগ পৌঁছেছিলাম। পরের দিন আন্তর্জাতিক সংবাদ সম্মেলন। লাইপজিগে একটি ভালো হোটেলেই আছি। বিকেলে দোষাভী লিন্ডে আমার কক্ষে এলেন। বললেন, তুমি কী প্রশ্ন করতে চাও তা লিখে দাও। আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলাম না। পরের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে দেখলাম রামুদা প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রথমেই হাত তুলেছেন। রামুদা আমাকে বললেন, এবার আপনি প্রশ্ন করুন। আমার প্রশ্ন ছিল, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের সাহায্য নিয়ে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমরা দাবি করছ তোমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠন করেছ। আমাদের সরকারও সমাজতন্ত্রের কথা বলছে। তোমরা আমাদের সাহায্য করবার জন্যে বাংলাদেশে গিয়েছিলে। বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রশ্নে তোমাদের কোনো সিদ্ধান্ত আছে কি? তোমরা কিছু ভেবেছ কি? তোমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে আদৌ প্রযোজ্য কি? আমার প্রশ্নের তেমন

www.nagorikpathagar.com

কোনো সদুত্তর পেলাম না। বলা হলো, তোমার সাথে পরে আলোচনা করা হবে। আমার পরে ভারতসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা প্রশ্ন করল। ঘন্টাখানেক পরে সংবাদ সম্মেলন শেষ হলো। মনটা খুবই ভালো ছিল না। সংবাদ সম্মেলন শেষ হলেই ভারতের প্রতিনিধিরা আমাকে ঘিরে ধরলেন। বললেন, দাদা জবাব কিছু পেলেন? এদেশে সব কিছুর জবাব পাওয়া যায় না। তাই বুঝেশুনে প্রশ্ন করতে হয়। যতদূর মনে হয় ভারতীয় প্রতিনিধিরা প্রশ্ন করেছিলেন মূলত প্রিন্টিং প্রেস সম্পর্কে। পরে চা খাবার পালা।

পাশের কক্ষে চাসহ অন্যান্য খাবার দেয়া হচ্ছিল। দেখলাম কতিপয় তরুণ বিভিন্ন প্রতিনিধিদের কাছে সংবাদ সম্মেলন সম্পর্কে মতামত জিজ্ঞেস করছে। খাতায় টুকে নিচ্ছে। আমার পাশে দাঁড়ানো ভারতীয় প্রতিনিধি দল। শুনলাম ভারতীয় দলনেতা সংবাদ সম্মেলনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছেন। আমি অবাক হলাম। কারণে এই ভদ্রলোক এইমাত্র কিছুক্ষণ আগে আমার সাথে ভিন্ন সুরে কথা বলেছেন।

এবার আমার পালা। তরুণরা আমার কাছে এল। আমি বললাম, এখনো সংবাদ সম্মেলন সম্পর্কে আমি ভেবে উঠতে পারিনি। আর তোমরাও বা এ ধরনের প্রশ্ন করছ কেন? কী জানতে চাচ্ছ আমাদের কাছে? তোমরা তো দেখছি পুঁজিবাদী দেশের সরকারের মতোই আচরণ করছ। পুঁজিবাদী দেশে জরিপের শেষ নেই। ওই সকল দেশে কথায় কথায় জরিপ হয়। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজস্ব শ্রেণি স্বার্থে ওই জরিপ দিয়ে জনমনে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। আমি বুঝছি না তোমরাও কী চাও। সংবাদ সম্মেলন শেষ হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তোমরা কী জানতে চাও? আমাদের এই প্রতিক্রিয়া তোমাদের কোনো কাজে আসবে কি? আর এভাবে প্রতিক্রিয়া দিতে আমি অভ্যস্ত নই।

তরুণরা চুপ হয়ে গেল। দেখলাম দূর থেকে এক ভদ্রলোক আমাদের লক্ষ্য করছেন। এবার তিনি কাছাকাছি এলেন। বললেন, তিনি পূর্ব জার্মান সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের লোক। নাম কার্ল মার্ক। তিনি বললেন, তুমি কী জানতে চাচ্ছ। আমি বললাম, দেখো প্রথমে তোমাদের এ প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে। এ ধরনটি একেবারেই পুঁজিবাদী দেশের মতো। চা খেতে খেতে প্রশ্ন করে জবাব নিয়ে কোনো কাজ হয় তা আমি অন্তত বিশ্বাস করি না। এগুলো হচ্ছে লোক দেখানো ভড়ং। দ্বিতীয়ত সংবাদ সম্মেলনে তোমাদের উত্থাপিত বক্তব্য নিয়েই আমার আপত্তি আছে। তোমাদের বক্তব্য শুনে মনে হয়েছে—তোমরা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির দেশ। এ বক্তব্য কিন্তু সঠিক নয়। তোমরা কমিউনিস্ট সাধারণ বাজার কমিশনের সদস্য।

www.nagorikpathagar.com

আদৌ স্বনির্ভর নয়। তোমাদের চারদিকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। তাই তোমাদের পরিস্থিতি একটু ভিন্ন ধরনের। কার্ল মার্ক আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। বললেন, পরে তোমার সাথে আলাপ হবে, এখন নয়। চা খেয়ে আমি হোটেলে ফিরে গেলাম। শুনলাম বিকেলে একটি সমবায় দেখতে যেতে হবে। এই সমবায়ের নেত্রী নাকি লেনিন পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর সাথে আমাকে আলাপ করতে হবে। দুপুরের খাবার পর কিছুটা বিশ্রাম। দোভাষী লিন্ডে এল গাড়ি নিয়ে। লাইপজিগ শহর থেকে সেই সমবায় খুব দূরে নয়। সেই সমবায়ের দিকে যতো এগুচ্ছিলাম, চারদিক তাকাতে তাকাতে ততোধিক মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। চারদিকে মাঠ আর মাঠ। জমিতে আল নেই। সবুজের ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে সারি সারি আপেলের গাছ। আকাশের সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। শীতের গরম। আদৌ উত্তাপ নেই। সেই সমবায়ে গিয়ে আবার একই বিতর্কে জড়িয়ে গেলাম। আমি বললাম, তোমরা সমবায় খামার করবে, যৌথ খামার করবে, কৃষকেরা মাঠে খাটবে, প্রচুর ফসল ফলাবে। এমনকি শিল্প শ্রমিকের চেয়ে মজুরিও বেশি পাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের অভিজ্ঞতায় বলে শিল্প শ্রমিকদের সাথে কৃষি শ্রমিকের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। কৃষক জমি বড্ড ভালোবাসে। ভালোবাসে জমির ফসল। জমিতে ধানের চারা বাড়তে থাকলে সেই চারার গায়ে সে সোহাগে হাত বুলায়। আমাদের দেশের কৃষক স্ত্রীর চেয়ে গরুকে বেশ ভালোবাসে। ওদের মাটির জন্য দরদ। কৃষককে এই দরদমুক্ত করা কঠিন ব্যাপার। এ কাজটি তোমরা কী করে করবে। তোমাদের দেশে ব্যক্তি মালিকানা নেই। কোনো কৃষকই জমির মালিক নয়। তত্ত্ব হিসেবে এ কথা বলা সহজ। কিন্তু কার্যকর করা বড্ড কঠিন। তোমরা এ কাজটি কী করে করলে?

আমার দোভাষী বা সমবায়ের সেই প্রখ্যাত মহিলা আমার কথার জবাব দিতে পারলেন না। অথবা আমি তাদের বোঝাতেই পারলাম না আমার কথা। তাঁরা আমাকে দৈনিক নয়া জার্মানি পত্রিকায় যাবার অনুরোধ জানালেন। বললেন, ওই পত্রিকার কৃষি বিভাগ আমাকে তথ্য দিতে পারে। পরবর্তীকালে ওই পত্রিকায় গিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমাকে কৃষি মন্ত্রণালয়ে যেতে হয়নি। সে অনেক কথা এবং অনেক পরের কথা।

তবে এ প্রশ্নের জবাব পেয়েছিলাম হাঙ্গেরিতে। হাঙ্গেরির কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আলোচনাকালে একই প্রশ্ন তুলেছিলাম। প্রশ্নটি শুনে তারা যেন চমকে গেলেন। বললেন, এ জমি নিয়ে আমরা বিপাকে পড়েছিলাম। কৃষক জমি দিতে চায়নি। এর ফলে ১৯৫৬ সালে আমাদের দেশে বিপ্লব হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.com

শেষ পর্যন্ত আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম—সকলের সকল জমি প্রথমেই নিয়ে নেয়া হবে না। যে সকল পরিবারের পুরান যুগের মানুষ আছে, যাদের সাথে জমির এক ধরনের আত্মীয়তা আছে—সে সকল পরিবারের কিছু জমি রেখে দেয়া হবে ব্যক্তি মালিকানায়। ওই বৃদ্ধদের মৃত্যু হলে সে জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে।

সমবায় খামারে সন্তোষজনক জবাব মিলছে না। সকালে সংবাদ সম্মেলনের তেমন জবাব পেলাম না। সারাক্ষণ আর একদফা বিতর্ক করেছি একটি সংবাদ সংস্থার সাথে। এই সংস্থাটি পূর্ব জার্মান সংস্থাকে বিভিন্ন তথ্য প্রচার করে। সংস্থার নাম প্যানরোমা। সংবাদ সম্মেলনের পর সেখানে গিয়েছিল সকল দেশের প্রতিনিধি। প্যানরোমার পথ থেকে জানতে চাওয়া এক পূর্ব জার্মান সম্পর্কে আপনার ধারণা কী। সকল দেশের প্রতিনিধি গড়গড় করে জবাব দিচ্ছিল। আমি বললাম, মাত্র দু'দিন হলো পূর্ব জার্মানিতে। তেমন কিছু দেখিনি, শুনিনি। আলোচনা হয়নি কারো সাথে। কী করে তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেব? এ মুহূর্তে এ ব্যাপারে আমার কোনো জবাব নেই। প্যানরোমার প্রধান এলেন। বললেন, তুমি কী বলতে চাও? আমি বললাম যা জানি না সে সম্পর্কে কী করে বলব? তুমি আমাকে তোমাদের প্রচারপত্রগুলো দাও। আমি পড়ব। তোমাদের লোকদের সাথে আলোচনা করব। সম্ভব হলে আমার মতামত লিখে পাঠাব তোমার কাছে। আজ কোনো কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই তিন দফা মতান্তরের পরে চতুর্থ দফা মতান্তর হলো সন্ধ্যায়। সন্ধ্যায় এক হোটেলে এক পার্টি। আমাকে বলা হয় তোমার দোভাষী লিন্ডে আর থাকছে না। পরিবর্তে আসবে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী বারবারা পাফ। বারবারা এক সময় ক্যাস্ট্রো এবং এনজেলা ডেভিসের দোভাষী ছিল। তোমার সাথে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। তাই তোমার দোভাষী পরিবর্তন করা হলো।

আমি বললাম, তা হবে না। সাংবাদিক লিন্ডে আমার সাথে থাকবেই। অনেক বলার পর ঠিক হলো আমার জন্যে দু'জন দোভাষী থাকবে। ইতিমধ্যে আর এক ভদ্রলোক এলেন। বললেন, সংবাদ সম্মেলনে তুমি আমাদের বিপদে ফেলেছ। তোমার সাথে কথা বলবেন ভদ্রলোক, তিনি পূর্ব জার্মান সরকারের তথ্য দফতরের প্রধান। পরে সাথে এলেন অর্থ দফতরের আর এক ভদ্রলোক।

এবার দোভাষী লিন্ডে নয়, বারবারা। আলোচনা নয়, বিতর্ক। এবার বিতর্ক লেনিন নিয়ে। প্রায় তিন ঘণ্টা দেখলাম দোভাষী বারবারা শ্রান্ত। আমি জার্মান বন্ধুদের বললাম, দেখো লেনিন সম্পর্কে তোমাদের সাথে আমি একমত

www.nagorikpathagar.com

নই। লেনিন মৃত। তাই তোমাদের সাথে বিতর্কের শেষ হবে না। এসো, আমরা একমত হই যে লেনিন সম্পর্কে আমাদের ঐকমত্য নেই। এর বেশি কিছু নয়। আলোচনা শেষ হলো। হোটেলে ফিরতে ফিরতে দোভাষী বারবারা বলল, তুমি আচ্ছা লোক দেখছি। তুমি কি ভেবেছ ওদের তুমি বোঝাতে পারবে? ওরা কোনোদিন তোমার সাথে একমত হবে না।

পরবর্তীকালে আমার প্রধান দোভাষী বারবারা পাফ। দীর্ঘ সময় কারো সাথে বিতর্ক হলে বারবারা হাসত। সে বলত, এই আলোচনায় কোনো লাভ নেই। তুমি তাদের বুঝতে পারবে না। শুধু শুধু পণ্ডশ্রম করছো। পরে জেনেছিলাম বারবারা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থনও করে না। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি পশ্চিম জার্মানি চলে যাচ্ছ না কেন? তোমার মতো দোভাষী সে দেশে হাজার হাজার ডলার কামাতে পারবে। বারবারা বলত পশ্চিম জার্মানিতে গেলে আমি হাজার হাজার ডলার পাব। কিন্তু আমার পরিবারের অন্য সদস্যদের কী হবে। আমি কৃষক পরিবারের মেয়ে। বাবা-মা বৃদ্ধকালীন ভাতা পাচ্ছেন। আমার ভাই বোন বিনে পয়সায় লেখাপড়া করছে। পরীক্ষায় পাস করলে ওরা চাকরি পাবে। আমি বিয়ে করলে বার্লিন শহরে ফ্ল্যাট পাব। সন্তান হলে এককালীন সাহায্য পাব সন্তান বড় করার জন্যে। এ সুযোগ তো পশ্চিম জার্মানিতে পাওয়া যাবে না। তাই দেশ ছেড়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

এই দেশ ছেড়ে যাবার প্রশ্ন তুঙ্গে উঠল একদিন বার্লিন দেয়ালের কাছে গিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানি ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব জার্মানি এবং পশ্চিম জার্মানির সৃষ্টি হয়। পশ্চিম জার্মানি তত্ত্বাবধান করত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং ব্রিটেন। পূর্ব জার্মানির কর্তৃত্ব ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে। পঞ্চাশের দশকে ক্রুশ্চেভের আমলে পূর্ব পশ্চিম সংঘর্ষ চরমে ওঠে। তখন বার্লিন শহরের মাঝখানে দেয়াল দেয়া হয়। এই দেয়ালই ঐতিহাসিক বার্লিনের প্রাচীর নামে খ্যাত। এই দেয়াল ভেঙে ফেলা হয় নব্বই-এর দশকে। যখন একের পর এক সমাজতান্ত্রিক শিবিরের রাষ্ট্রগুলোর পতন হতে থাকে। এই দেয়াল সম্পর্কে পূর্ব জার্মানির ব্যাখ্যা হচ্ছে—দেয়াল না থাকলে পশ্চিমা শক্তিবর্গ দিনের পর দিন নাশকতামূলক কাজ চালাবে। পাশ্চাত্যের পচা গলা সংস্কৃতি দিয়ে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যাবে আমাদের তরুণ-তরুণীদের।

বার্লিন দেয়ালের কাছে গিয়ে এমন কথাই শুনলাম। আমার পাশে দোভাষী বারবারা। আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সামরিক বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন। দেয়ালের কাছে উঁচু একটি টাওয়ার আছে। ওই টাওয়ারে একটি

www.nagorikpathagar.com

রেস্টুরেন্ট আছে। লিফটে ওই রেস্টুরেন্টে পৌঁছাতে ৩৬ সেকেন্ড লাগে। রেস্টুরেন্টটি ঘুরছে। চা খেতে খেতে কখনো রেস্টুরেন্ট থেকে পূর্ব বার্লিন এবং পশ্চিম বার্লিন দেখছি। এক সময় নিচে নেমে এলাম। ক্যাপ্টেনকে বললাম, তোমাদের এই রেস্টুরেন্ট কিন্তু তোমাদের একদিন সর্বনাশ করবে। আর তোমাদের দেয়াল দিয়ে সমাজতন্ত্র রক্ষার তত্ত্ব আমি বিশ্বাস করি না। মনে হলো ক্যাপ্টেন একটু উষ্ণ হলেন।

আমি বললাম, জার্মান ভাগ হলেও তোমরা কিন্তু একই জাতি। তোমাদের ধর্ম, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য সবই এক। তোমাদের মানুষ যখন ওই টাওয়ারে উঠে পশ্চিম বার্লিনের কাছাকাছি যাবে তখন সে কিন্তু আবেগমথিত হবে। ওপারের আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে হবে। এই আবেগ কিন্তু দেয়াল দিয়ে ঠেকাতে পারবে না।

এরপর কথা আছে তোমাদের দেয়াল তত্ত্ব নিয়ে। তুমি বলছো গত কয়েক দশকে তোমাদের লাখ লাখ তরুণ ডাক্তার ও প্রকৌশলী নাকি দেয়াল টপকে পালিয়ে গেছে। তোমরা বলছ এটা নাকি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র। তোমাদের কথা সত্য হলে এর একটি উল্টো দিকও আছে। উল্টো দিক থেকে বলা যায় যে তোমরা দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও এই তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে পারনি। সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রই সফল হচ্ছে। এছাড়া তুমি বলছো বারবনিতাদের লোভে নাকি তোমাদের তরুণেরা ওপারে চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই যুক্তি খুব ধোপে টেকেনি। এক রাত ঘুমাবার জন্যে তোমাদের দেশে মেয়ে পাওয়া কি খুবই দুর্লভ? আমার পাশের দোভাষীকেই জিজ্ঞেস করো না কেন। সে-ই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। এবার মনে হলো ক্যাপ্টেন সাহেব রেগে গেলেন। তিনি বললেন, তুমি আমাদের নেতাদের সাথে কথা বলতে পার। আমার কাছে এর বেশি জবাব নেই। এবার আমার আলোচনায় ক্ষুব্ধ হলো বারবারা। তার অভিযোগ হচ্ছে সে অনেক প্রতিনিধি দলের দোভাষী ছিল। কিন্তু আমার মতো নাকি উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন করতে শোনেনি। এ পর্ব এখানেই শেষ হলো।

সন্ধ্যার দিকে পূর্ব জার্মানের সাংবাদিক ইউনিয়ন ও সরকারি নেতাদের সাথে বৈঠক শুরু হলো। বুঝতে পারলাম আমার সকল মন্তব্যই তাদের কানে পৌঁছেছে। এক সময় কথায় কথায় আমি আমার কথা বলতে শুরু করলাম। আমি বললাম, আমার রাজনীতির সাথে তোমাদের রাজনীতির মৌলিক তফাৎ আছে। তবুও সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কে আমাদের একটা স্বপ্ন আছে। দীর্ঘদিন সে স্বপ্ন আমরা লালন করেছি। সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কে আমাদের অনেক প্রশ্ন আছে। কারণ এদেশগুলো সম্পর্কে পশ্চিমাদের প্রচার আমাদের

www.nagorikpathagar.com

কাছে অপপ্রচার বলে মনে হয়। তাই এদেশগুলো সফরে এলে আমরা তোমাদের নাজেহাল করার জন্যে এ ধরনের প্রশ্ন করি। আমরা ভাবি, তোমারা আমাদের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছ। তোমাদের পছন্দের জায়গাগুলো আমাদের দেখিয়ে এবং ভালো ভালো কথা বলে আমাদের বিদায় দিতে চাও। এ ব্যাপারে আমি একটি সুস্পষ্ট ঘটনার উল্লেখ করতে চাই।

এর আগে আমি কোনোদিন কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে যাইনি। প্রথমে এলাম তোমাদের বার্লিন শহরে। বড্ড ভালো লাগল। বড্ড ছিমছাম, পরিষ্কার। কোথাও বিশৃঙ্খলার চিহ্ন মাত্র নেই। এক রাত থেকে পরের দিন গেলাম লাইপজিগ শহরে। পড়ন্ত রোদের বিকেলে লাইপজিগের রাজপথে অসংখ্য তরুণ-তরুণী দেখলাম। তারা নাচছে-গাইছে। জড়াজড়ি করে হাঁটছে। হিপ্পিদের মতো তালি দেয়া জামা-কাপড় তাদের অঙ্গে। তারা দেদার চুমু খাচ্ছে। আমি খানিকটা বিপর্যস্ত হলাম। দোভাষী লিন্ডেকে বললাম এটা কি তোমাদের সমাজতন্ত্র? এটা তোমাদের সংস্কৃতি? তাহলে পশ্চিম জার্মানির সাথে তোমাদের তফাৎটা কী? তোমাদের এ সমাজতন্ত্র থাকবে না। বিকল্প সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে না পারলে দেয়াল দিয়ে সমাজতন্ত্র বাঁচাতে পারবে না। লিন্ডে বিষণ্ন হলো। বৃদ্ধ লিন্ডের মুখে তখন মলিন হাসি। সে বলল, আমি তোমার সাথে একমত। কিন্তু করার কিছু নেই। নেতাদের আমি আরো বললাম, আমি ক'দিন ধরে তোমাদের সাথে আলোচনা করে এ কথাগুলো বলেছি। তোমরা তেমন পাত্তা দাওনি।

এবারও তেমনই ঘটল। সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং পূর্ব জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তেমন কথা বললেন না। প্রকৃতপক্ষে আমার সাথে কথা আর তেমন জমল না। অন্যান্য কথা বলেই আলোচনা শেষ হলো।

তবে ভিন্ন চিত্র দেখেছিলাম ১৯৭৪ সালে। ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে ওই লাইপজিগ মেলায় গিয়েছিলাম। তখন আমি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। আমার সাথে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কামাল লোহানী।

একদিন হঠাৎ করে আমন্ত্রণ এল সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতাদের পক্ষ থেকে। আমাদের সাথে আলোচনা করতে চায়। সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নিজেই প্রশ্ন তুললেন। তিনি বললেন, তুমি গতবার বিকল্প সংস্কৃতির কথা বলেছিলে। প্রকৃতপক্ষে আমরা বিপদে আছি তরুণদের নিয়ে। এখন সুইচ টিপলেই পশ্চিম জার্মানির টেলিভিশন দেখা যায়। এদের প্রভাব পড়ছে ব্যাপকভাবে আমাদের তরুণদের ওপর। সমস্যাটি ভাবিয়ে তুলেছে সকলকে।

www.nagorikpathagar.com

এ নিয়ে আমার নতুন কিছু বলার অবকাশ ছিল না। এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল এবং প্রথমবারের জন্যে ভালো লেগেছিল। পূর্ব জার্মানিতে যে কোনো আলোচনা প্রথমবারের জন্যেই একটি প্রশ্নে তাদের সাথে একমত হতে পেরেছিলাম।

তবে অন্যান্য কোনো ব্যাপারেই তাদের বক্তব্যের মিল হচ্ছিল না। তাই আমার সফর সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন জানানো হলো আমার হাঙ্গেরি যাবার টিকেট হয়ে গেছে। আমাকে দু'দিন পরেই বার্লিন ছেড়ে বুদাপেস্ট যেতে হবে। তবে এর একটি পটভূমি আছে।

আমি আগেই বলেছি পূর্ব জার্মানি তখনও জাতিসংঘের সদস্য হতে পারেনি। তাই তাদের একটি ইচ্ছে হচ্ছে জাতিসংঘের সদস্য একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য এবং সে সাথে নতুন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই পূর্ব জার্মানির সাংবাদিক ইউনিয়নের একটি সিদ্ধান্ত এবং ইচ্ছা ছিল আমাদের সাংবাদিক ইউনিয়নের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা এবং সে জন্য লিন্ডের পরিবর্তে বারবারা পাফকে আমাদের দোভাষী নিযুক্ত করা হয়েছিল। পূর্ব জার্মানির সাংবাদিক ইউনিয়নের এ প্রস্তাব প্রথমেই আমাকে দিয়েছিল। বারবারাও বলেছিল, তোমরা এ চুক্তি স্বাক্ষর করলে আমার সুনাম হবে। আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশে তখন জাতীয় সাংবাদিক ইউনিয়ন গঠিত হয়নি। আমি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। আমার পক্ষে কোনো ভিন্ন দেশের ইউনিয়নের সাথে চুক্তি করা সম্ভব নয়। এ ধরনের চুক্তি করতে হলে আমাকে বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে। ঢাকার সাংবাদিক ইউনিয়নের সাথে কথা বলতে হবে। সরকারের সাথেও কথা বলতে হবে। মনে হলো আমার এ কথায় জার্মানের বন্ধুরা খুশি হয়নি। জার্মান প্রবাসী বাঙালিরাও আমার যুক্তি ভালোভাবে গ্রহণ করল না। আমার সফরসঙ্গী দুই বন্ধুও আমার বক্তব্য সহজভাবে নিলেন না। তবু আজও আমি মনে করি, সেদিন আমার বক্তব্য সঠিক ছিল। আমার ধারণা আমি চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাজি না হওয়ায় আমার সফরসূচি সংক্ষিপ্ত করা হয়। আমাকে হাঙ্গেরি পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং হাঙ্গেরিতে এই নাটকের শেষ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়। তবে এর পরেও আর একটি ব্যাপারে নিয়ে দুঃখজনক বিতর্ক হয়েছে বার্লিনে। অর্থাৎ সেবারের সফরে আমি কাউকে খুশি করতে পারিনি।

বার্লিনে আমার সর্বশেষ বিতর্ক হলো নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে নিয়ে। আমি জার্মান সাংবাদিক বন্ধুদের জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমরা কি নেতাজী সুভাষ বসুকে চেন? প্রথমে কেউ তাকে চিনতেই পারলো না। আমি বললাম,

www.nagorikpathagar.com

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে ভারতীয় নেতা এখানে এসেছিলেন। তাকে কি কেউই তোমরা চেন না। তিনি জার্মান থেকে জাপান গিয়েছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্যে আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ গঠন করেছিলেন। এবার তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে উঠল। বলল সেই ফ্যাসিস্ট, যে যুদ্ধের সময় ভারত থেকে জার্মানিতে এসেছিল?

তার কথায় আমি খানিকটা উষ্ণ হলাম। বললাম, তোমরা শেখ মুজিবুর রহমানকে চেন। এবার তারা সবাই মিলে চিৎকার করে উঠল। বলল, শেখ মুজিবুর রহমান তোমাদের মহান নেতা। তাকে চিনব না এটা কি হতে পারে। আমি বললাম, তোমরা কি জান যে শেখ মুজিবুর রহমান নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে নেতা বলে মানতেন। আমার কথা শুনে তারা অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকাল। এক সময় মলিন হয়ে চুপ হয়ে গেল। আমি বললাম কিছু মনে করবেন না। ভিন দেশের কোনো নেতা সম্পর্কে কিছু বলতে হলে ভেবেচিন্তে বলা উচিত। তোমরাই একমাত্র সঠিক, এ ধরনের চিন্তাধারা ইতিহাস সম্মত নয়। তোমরা বুঝতে চাও না যে তোমাদের এ ধরনের মন্তব্য অন্যকে আঘাত করতে পারে।

এই ঘটনার পরের দিন আমাকে পূর্ব জার্মান ছাড়তে হয়। তবে তাদের আত্মীয়তা বন্ধুত্ব আদৌ ভুলবার নয়। আমরা বাংলাদেশের প্রথম সাংবাদিক প্রতিনিধি দল। আমাদের আগে অনেকে পূর্ব জার্মানিতে গিয়েছে। কেউ সফরে গিয়েছে, কেউ চিকিৎসার জন্যে গিয়েছে, কেউ পড়াশুনো করতে গিয়েছে। আমাদের মতো খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞেস করতে কেউ হয়তো যায়নি। আমরা এমন দেশে গেলাম, অদ্ভুত আথিথেয়তা পেলাম, মর্যাদা পেলাম। কিন্তু তাদের প্রস্তাবিত চুক্তি স্বাক্ষর না করে চলে এলাম। আমরা চুক্তি স্বাক্ষর না করায় বিপর্যস্ত হলো বারবারা পাফ। সে বলল, তোমার জন্য এ চুক্তি সম্ভব হলো না। তাই বিমানবন্দরে তোমাদের বিদায় দিতে আমাকে যেতে দেয়া হলো না। তবে এত বিতর্ক সত্ত্বেও দু'টি সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। সে আলোচনা ছিল অর্থবহ ১. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার এবং ২. পূর্ব জার্মানসহ অন্যান্য পূর্ব ইউরোপের কথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

আমি পূর্বেই বলেছি সেকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের রাজনীতির সাথে আমার মৌলিক তফাৎ ছিল। পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোতে তারা নয়া গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করতো। আমার বক্তব্য ছিল মার্কস ও লেনিনের পরিভাষায় দু'টি গণতন্ত্রের

www.nagorikpathagar.com

কথাই আমরা জানি। তা হচ্ছে—বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। এর মাঝখানে কোনো গণতন্ত্র আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। সেকালে পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোতে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে গঠিত সরকার ক্ষমতায় ছিল। আমরা বক্তব্য ছিল ওই সমন্বয়ের সরকার টিকবে না। এ নিয়ে বারবার আমার বিতর্ক হয়েছে জার্মান সফরকালে।

তখন পূর্ব জার্মানিতে ক্ষমতায় ছিল পাঁচটি দল। এ পাঁচটি দল হচ্ছে পূর্ব জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ও এককালের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি মিলে সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি। এই সোস্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি মুখ্যত কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে পরিচিত। এছাড়া ছিল লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। ক্রিশ্চিয়ানা ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, ডেমোক্র্যাটিক ফার্মার পার্টি এবং ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এই পাঁচটি দলের সমন্বয়ে পূর্ব জার্মান সরকার গঠিত। প্রতিটি দলেই নাকি ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত। এ দলগুলোর নিজস্ব মুখপাত্র এবং দৈনিক পত্রিকা আছে। পত্রিকার মূল আদর্শ শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র।

লাইপজিগে সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির দৈনিক মুখপাত্রের নাম পিপলস ডেইলি। এই পত্রিকার অফিসেই একদিন সম্পাদকের সাথে আমার বিতর্ক শুরু হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম—আপনাদের পাঁচটি পার্টির সরকার এবং পাঁচটি পত্রিকা আছে। এই পাঁচটি পত্রিকাই কি সমাজবাদে বিশ্বাসী? তাদের সবাই কি দেশপ্রেমিক। এদের মধ্যে কেউ কি জনতার শত্রু নয়।

সম্পাদক আমার প্রতিটি প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিলেন। আমার শেষ প্রশ্ন ছিল আপনাদের পত্রিকাগুলো কি অন্যদলের খবর ছাপিয়ে থাকে।

তিনি বললেন, না। আমি বললাম, কেন এমন হবে? সব দলই যদি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয় এবং দেশপ্রেমিক হয় তাহলে তাদের খবর ছাপাতে বাধা কোথায়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই ঐক্যফ্রন্টের আদর্শগত বিশ্বাস এক হলে আর এক দল অন্যদলের খবর না ছাপালে সংশয় সৃষ্টি হবে না কি। পিপলস ডেইলির সম্পাদক আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না।

তিনি বললেন, আমরা অন্যদলের খবর ছাপাই না সেটাই হচ্ছে আমাদের শেষ কথা।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। বার্লিনে ফিরলাম। আবার দেখা হলো সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতাদের সাথে। আমি বললাম, তোমাদের দেশে তো পাঁচ পার্টির সরকার। মার্কসবাদ লেনিনবাদ আমরা যতদূর পড়েছি তাতে তো আমাদের ধারণা যে শ্রেণি ভিন্ন দল হয় না। প্রতিটি দলই এক একটি শ্রেণির

www.nagorikpathagar.com

প্রতিনিধি। সে অর্থে কি তোমাদের দেশের পাঁচটি দল বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধি না! এবং তাহলে কি তোমাদের সরকার বিভিন্ন শ্রেণির সরকার নয়? তোমাদের সরকার কি বহুদলীয় সরকার নয়? সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ আমার কথার জবাব দিলেন না। শুধু বললেন, এ প্রশ্ন আমাদের দেশে উঠেছে এবং আলোচনা হচ্ছে। একই আলোচনা আবার উঠেছিল। হাঙ্গেরির অর্থনীতিতে তখন নতুন হাওয়া লেগেছে। হাঙ্গেরিতে তখন ম্যানেজারিয়াল অর্থনীতি চালু হচ্ছে। কথা উঠেছে প্রোফিট মোটিভের। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমাদের এই অর্থনীতি কি একটি নতুন শ্রেণির জন্ম দিচ্ছে না। তোমাদের একটি ম্যানেজারিয়াল শ্রেণির জন্ম দিচ্ছে। ফলে একটি আমলাতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠবে নাকি? আমার কথায় তারা একমত হলেন না। তাঁরা বললেন, লাল ফিতার দৌরাত্ম্য থাকবে।

এ মুহূর্তে এ দৌরাত্ম্য আমরা এড়াতে পারব না। তবে একথা ঠিক যে ভুল আমরা প্রথমে করেছিলাম। ১৯৪৫ সালে ফ্যাসিস্টদের পরাজয়ের পর আমরা ক্ষমতায় আসি। আমরা চেষ্টা করেছিলাম সোভিয়েত ইউনিয়নকে হুবহু নকল করতে। তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে ১৯৫৬ সালের প্রতিবিপ্লবে। আমি বললাম—ব্যাপারটা অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। আমি যতটুকু লেনিন পড়েছি তাতে আমার মনে হয় তোমরা আরেক ভুলের দিকে এগোচ্ছ। তোমরা এবার শ্রেণি সমন্বয়ের পথ বেছে নিয়েছ। তোমাদের ম্যানেজারিয়াল অর্থনীতি কেন্দ্র করে নতুন শ্রেণি বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে প্রশাসনে। তাতে শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের পথে বাধা আসবে নাকি। হাঙ্গেরির বন্ধু হাসলেন। বললেন, তোমাদের ভুলটা কি জান, তোমরা পূর্বাপর সম্পর্ক না রেখে লেনিনের উদ্ধৃতি দাও। আমি বললাম—এ অভিযোগ তোমাদের বিরুদ্ধেও আছে। তোমরা সত্যিকার প্রেক্ষিতে লেনিনের উদ্ধৃতি দাও আর আমরা দিই না, এ বিচার করল কে? এবার তিনি আরো স্পষ্ট হলেন। বললেন—লেনিন জীবিত থাকলে তোমার কথাই মানতেন তার নিশ্চয়তা কোথায়? আমি বললাম—তোমার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

সেদিন কথা তেমন জমেনি। লেনিন নিয়ে এ ধরনের কথা পরবর্তীকালেও হয়েছে। বিতর্ক হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কোতে। সে বিতর্কের পর আমার দোভাষী বলেছিলেন—তোমার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সে অনেক পরের কথা।

পূর্ব জার্মানিতে আমার সর্বশেষ আলোচনা হয়েছিল যুদ্ধাপরাধীদের নিয়ে। আমি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে গিয়েছি। আমাদের দেশে তখন হাজার

www.nagorikpathagar.com

হাজার রাজাকার ও আলবদর কারাগারে। তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি ভারতে অবস্থান করছে। এদের ভবিষ্যৎ নিয়ে লেখালেখি এবং জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। তাই আমার কৌতূহল হয়েছিল জার্মানের বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু জানবার। ১৯৪৫ সালে ফ্যাসিবাদী জার্মানি পরাজিত হয়। পূর্ব জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসে। তাদের সামনে সমস্যা ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের। তাই আমার ইচ্ছা ছিল কীভাবে যুদ্ধাপরাধীদের সমস্যা মোকাবেলা করেছে তা জানবার।

যুদ্ধ বন্দিদের সম্পর্কে একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরেছিল জার্মানের বন্ধুরা। তাদের মুখ্য বক্তব্য হচ্ছে—যুদ্ধবন্দি হিসেবে সকলকে এক কাতারে ফেলা যাবে না। সকলে এক প্রকার অপরাধ করেনি। তাই সকলের শাস্তিও একরকম হবে না। মনে রাখতে হবে কোনো দেশের হাজার হাজার সাধারণ মানুষ অপরাধী হতে পারে না। তারা পরিবেশের শিকার। প্রথমে হয়তো তারা তোমাদের পক্ষেই ছিল। পরবর্তীকালে নানা কারণে হয়তো তারা বিপক্ষে যোগ দিয়েছিল। এই আম-জনতাকে রেহাই দেয়াই বাঞ্ছনীয়। ধরতে হবে পালের গোদাকে। যারা এই অপরাধী দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের আদৌ ক্ষমা নেই। তাদের চরম শাস্তি দিতে হবে। জার্মান বন্ধুদের পরামর্শ ছিল—যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে তড়িঘড়ি করে নয়, ধীরে-সুস্থে ব্যবস্থা নিতে হবে। সবাইকে একই দণ্ড দেয়া যাবে না। তাদের কথায় আমি যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলাম। ঢাকায় ফিরে পূর্ব জার্মানের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে আমি দৈনিক বাংলায় উপসম্পাদকীয় লিখলাম। হয়তো আমিই প্রথম স্বাধীন বাংলায় যুদ্ধাপরাধীদের শ্রেণি বিভাগের কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম—আম-জনতাকে ক্ষমতা করে দেয়া হোক। বড় বড় নেতাদের ফায়ারিং স্কোয়াডে নেয়া হোক। কোনো বিচার না করে বছরের পর বছর কাউকে জেলে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। ৭১ সালে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিঘরেই যুদ্ধ নিয়ে মতানৈক্য ছিল। সে মতানৈক্যের পটভূমি বুঝতে হবে। লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দিয়ে একটি বিরাট জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনতা বিরোধীদের শিবিরে ঠেলে দেয়া যাবে না। সুতরাং সবাইকে শাস্তি দেয়া নয়। নেতাদের পৃথক করে শাস্তি দেয়া হোক। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হোক। আমার এ লেখা কোনো মহলকেই খুশি করতে পারল না। একটি মহল ক্ষুব্ধ হলো। কেউ বিস্মিত হলো। কেউ তীব্র প্রতিবাদ জানাল। তাদের বক্তব্য হচ্ছে—আমি রাজাকারদের ক্ষমা করার কথা বলে অন্যায় করেছি। দৈনিক বাংলার বাণীতে আমার বিরুদ্ধে উপসম্পাদকীয় লেখা হলো। লেখা হলো—সরকারি পত্রিকায় চাকরি করে এই ঔদ্ধত্য দেখাবার

www.nagorikpathagar.com

সাহস কোথা থেকে আসে? আজও আমার সেই লেখা উল্লেখ করে একটি মহল থেকে বলা হয়—আমি নাকি রাজাকারদের ক্ষমা করার কথা বলেছিলাম। আমার ধারণা, আমার এ সমালোচক বন্ধুরা কখনো পুরোপুরি আমার লেখাটি পড়ে দেখেনি। বুঝতে চেষ্টা করেনি—আমার লেখার তাৎপর্য ও পটভূমি। আমি আজো মনে করি—আমি সেদিন সাহস সরে সঠিক কথা লিখেছিলাম। সেদিন আমার কথা মেনে নিয়ে ক্ষমা করা হলে তাদের অনুশোচনা থাকত। কিন্তু ১৯৭৪ সালে ক্ষমা পেয়ে তারা ভাবল, স্বাভাবিক নিয়মেই তারা ক্ষমা পেয়েছে। তারা ক্ষমা পেয়েছে—সিমলা স্বাক্ষরিত ভারত-পাকিস্তান চুক্তির শর্তানুসারে। এতে বাংলাদেশ সরকারের কোনো কৃতিত্ব নেই। সেকালের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমা ঘোষণা করলেও সকলেই জানত যে এই ক্ষমা ঘোষণার পেছনের দু'জন ব্যক্তি হচ্ছেন—ভারতের শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো। অর্থাৎ আমাদের নামেই ক্ষমা ঘোষণা করা হলো, কিন্তু সেই ক্ষমা ঘোষণা আমাদের জাতীয় জীবনে কোনো সুফল বয়ে আনল না। আমার আজকের সমালোচক বন্ধুরা একটু সমস্যার গভীরে গেলে আমার সমালোচনায় নামতেন না।

বার্লিন থেকে বুদাপেস্ট এলাম। পূর্ব জার্মানি থেকে হাঙ্গেরি। বুদাপেস্ট ফিটফাট ছিমছাপ সুন্দর শহর। রাতের বুদাপেস্ট লোভনীয়। বলা হয়, সৌন্দর্যের দিক থেকে প্যারিসের পরেই বুদাপেস্ট। বুদাপেস্ট-এ একটি সাংবাদিক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট আছে। এই ইন্সটিটিউটটি চালায় আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংস্থা (International Organization of Journalists)। বিশ্বে তখন মুখ্যত দু'টি প্রধান সাংবাদিকদের সংগঠন। একটি আইওজে, অপরটি আন্তর্জাতিক জার্নালিস্ট ফেডারেশন। প্রথমটি কমিউনিস্ট প্রভাবিত। দ্বিতীয়টি তথাকথিত স্বাধীন বিশ্বের। প্রথমটির প্রধান দফতর প্রাগে। দ্বিতীয়টির প্রধান দফতর বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস শহরে।

বুদাপেস্টে বাংলাদেশের সতের জন সাংবাদিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। আমার বুদাপেস্ট যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাদের সঙ্গে দেখা করা। বুদাপেস্টে পা দিয়েই মনে হয় এক সর্বনাশা দেশে এসেছি। এটা পূর্ব জার্মান বা বার্লিন নয়। পূর্ব জার্মানের সমাজে নিয়মানুবর্তিতা দেখার মতো, অনুকরণ করার মতো। কিন্তু বুদাপেস্টের পরিবেশ একেবারেই উল্টো। এখানে ছেলে মেয়েদের সম্পর্ক অনেক খোলামেলা, অনেক উদার। তাই আমি অনেকটা শঙ্কিত হলাম। তাই মনে হলো কী করে আমাদের সাংবাদিকরা এই পরিবেশের মোকাবেলা করবে।

www.nagorikpathagar.com

সাংবাদিক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের প্রধান হচ্ছেন মিস মার্থা। আমি তাকে প্রথমে প্রশ্ন করেছিলাম তোমাদের দেশে এসে ভয় হচ্ছে। তোমাদের দেশ থেকে বিদায় নেবার সময় আমাদের ছেলেরা কোনো আবেগের টান রেখে যাবে না তো। মার্থা হেসে ফেলল। ইংরেজিতে বলল, Mr. President, you are too much intelligent for this country. Nothing will happen to your boys.

এভাবেই আমার হাঙ্গেরি সফর শুরু হয়েছিল। কিন্তু এ সফরও আমার খুব সুখকর ছিল না। বার্লিনে আমি পূর্ব জার্মান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে রাজি হইনি। দেখলাম এ কথা সবাই জানে। লক্ষ্য করলাম ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে আমাকে দলে টানবার জন্যে। অর্থাৎ তারা সবাই চাইছিল, বাংলাদেশ তাদের সংগঠন আইওজের অন্তর্ভুক্ত হোক।

কিন্তু এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এছাড়া বাংলাদেশ নীতিগতভাবে নির্জোট আন্দোলনের সদস্য।

বাংলাদেশের জন্মলগ্নে সেকালের সরকারের সাথে আলোচনা না করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমি আদৌ সমীচীন মনে করিনি। আমার এ সিদ্ধান্ত ছিল একক এবং এই একক সিদ্ধান্তের কারণেই প্রতি পদে পদে আমাকে হোঁচট খেতে হয়েছে। হাঙ্গেরিতেও তার ব্যতিক্রম হলো না। হাঙ্গেরিতে তখন আইওজে নির্বাহী কমিটির বৈঠক চলছিল। ওই বৈঠকে আমাকে ডাকা হলো আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে। বৈঠকে ঢুকে প্রথমে এক দফা বিতর্ক হয়ে গেল মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিনিধিদের সাথে। আমি বললাম, কোন যুক্তিতে তোমরা বাংলাদেশের সংগ্রামের বিরুদ্ধে গেলে? কেন পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলে ১৯৭১ সালে। তাদের বক্তব্য আমাকে চমকে দিল। তাদের জানা মতে, বাংলাদেশের শতকরা ৮০ জন অধিবাসী মুসলমান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল ভারতের চক্রান্ত। অনেক কষ্টে তাদের বোঝাতে সক্ষম হলাম, তাদের তথ্য ঠিক নয়। এ প্রশ্নে আমাকে সহযোগিতা করেছিলেন সুদান সাংবাদিক ইউনিয়নের একজন মহিলা। তিনি দক্ষিণ সুদানের অধিবাসী। দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতা চাচ্ছে। সুতরাং তাঁর পক্ষে আমাদের সমস্যাটি অনুধাবন করা সহজ ছিল। তবে এরপরও একটি মোক্ষম সমস্যা আমাদের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। তাদের প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের শতকরা ৮০ জন অধিবাসী মুসলিম হলে নির্মল সেন তোমাদের প্রেসিডেন্ট কেন? তিনি তো মুসলমান নন। আমার বন্ধুরা হেসে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল।

www.nagorikpathagar.com

তবে আমার বিপদ হয়েছিল অন্যত্র। আইওজের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হলো একটি যুক্ত বিবৃতি দেবার। আমি বললাম, আইওজের সঙ্গে যুক্ত বিবৃতি দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার দেশে ফিরে বন্ধুদের সাথে আলাপ করে বিবৃতি দেয়া সম্ভব। আমি একক দায়িত্বে কোনো বিবৃতি দেব না। আমি প্রস্তাব করলাম একটি বিবৃতির খসড়া করা হোক। এই খসড়া বিবৃতি নিয়ে আমি ঢাকায় ফিরে যাব। ঢাকায় বন্ধুরা একমত হলে একই দিনে ঢাকা ও বুদাপেস্ট থেকে একটি যুক্ত ইশতেহারে প্রকাশিত হবে। আইওজের বন্ধুরা একমত হলেন। কিন্তু ঘটনা ঘটল ভিন্ন। ইতিমধ্যে হাঙ্গেরির বিভিন্ন এলাকায় সফর করেছি। আলাপ হয়েছে কমিউনিস্ট নেতাদের। হাঙ্গেরিতে দেখলাম নতুন হাওয়া। কমিউনিস্ট মহলে ভিন্ন চিন্তা শুরু হয়েছে। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে যুদ্ধের স্মৃতিফলক হিসেবে নির্মিত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ী সেনা এক মর্মর মূর্তি ভেঙে ফেলেছিল। লক্ষ্য করলাম তরুণরা নিদারুণভাবে সোভিয়েত বিরোধী। অর্থনীতিবিদদের সাথে কথা হলে তারা কিছু নতুন বই দিল। তাদের বইয়ের এক নতুন অর্থনীতির সুপারিশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে মুনাফার কথা। মোটামুটিভাবে ম্যানেজারিয়েল অর্থনীতির নামে একটি বাজার অর্থনীতি গড়ে উঠছে হাঙ্গরিতে। এই অর্থনীতির প্রবক্তা হচ্ছেন আন্দ্রেপভ। তিনি হাঙ্গেরিতে রাশিয়ান দূত। পরবর্তীকালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা হয়েছিলেন। আন্দ্রেপভের শিষ্য হিসেবে ক্ষমতায় এসেছিলেন গর্বাচেভ। সে অনেক পরের কথা। তখন আঁচ করতে পারিনি আদ্রেপভ ও গর্বাচেভ শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয় ডেকে আনবে। তবে হাঙ্গেরিতে গিয়ে মনে হয়েছিল কোথায় যেন বেসুরে বাজছে। সবাই এক সুরে কথা বলছেন। দ্বিতীয়বার হাঙ্গেরিতে গেলাম ১৯৭৪ সালে। এক সাংবাদিক বন্ধুর সাথে তার গ্রামের বাড়ি যাচ্ছিলাম। সড়কের পাশে এক রাশিয়ান ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে। এই সাংবাদিক চিৎকার করে উঠল। বলল, দেখেছ দূরে আমার পিতৃভূমির ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আমাদের রক্ষা করতে এসেছে। আমি অবাক হয়ে তরুণ সাংবাদিকের দিকে তাকালাম। বললাম, এসব তুমি কী বলছ। কিন্তু আমার কথায় তার মুখে কোনো ভাবান্তর হলো না। আগেই বলেছি এ দৃশ্য ১৯৭৪ সালের। ১৯৭২ সালে এমন প্রকাশ্যে কাউকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বলতে শুনিনি। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে তখন একটি প্রবণতা ছিল বিদেশীদের বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের দলভুক্ত করা।

এমন একটি পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলাম আমি ১৯৭২ সালে। হাঙ্গেরির সাংবাদিক জর্জ কলমার, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তিনি ঢাকায় ছিলেন। তখন

www.nagorikpathagar.com

খবর বিশ্বে আদৃত হয়েছিল। তিনি এক রাতে আমাকে এক হোটেলে নিমন্ত্রণ করলেন। ঘণ্টা দুই তার সঙ্গে আলাপ হলো। আ স ম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ থেকে শুরু করে মওলানা ভাসানী পর্যন্ত সকলের কথা শুনতে চাইলেন। তিনি মওলানা সাহেবের কিছু কথায় ক্ষুব্ধ। তিনি বললেন, মওলানা সাহেবের কথা নাকি চীন ও পাকিস্তানের পক্ষে যাচ্ছে। এক সময় বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। আমি বললাম, তুমি যত কথাই বলো না কেন মওলানা ভাসানী একজন জাতীয় নেতা হিসেবে থাকবেন। অর্থাৎ মওলানা ভাসানী সম্পর্কে তোমার সাথে একমত হতে পারলাম না।

এবার তিনি একটি ভিন্ন প্রস্তাব করলেন। বললেন আইওজে ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সম্মেলন করতে চায়। সব খরচ তাদের। ঢাকার সাংবাদিক ইউনিয়নের শুধুমাত্র আয়োজনের দায়িত্ব নিতে হবে। আমি একমত হলাম না। আমি বললাম, কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠনেরই অনুমোদিত সংগঠন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন নয়। আমরা তোমাদের অঙ্গ সংগঠন হলে এ দায়িত্ব নিতে পারতাম। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে এ দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়।

জর্জ কলমার ক্ষুব্ধ হলেন। আমিও দুঃখ পেলাম। আমার সমস্যা হচ্ছে কারো সঙ্গে একমত হতে পারছি না। এমনিতে কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থক বা সদস্য না হওয়ায় মার্কিন দালাল বলে পরিচিত। এরপর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে গিয়ে বিতর্ক করছি এবং তাদের কোনো প্রস্তাবে সায় দিতে পারছি না। ফলে এক সময় নীরবে জর্জ কলমার সাথে আলোচনা শেষ হলো। পরিস্থিতি তুঙ্গে উঠল পরের দিন বিকেলে। বুদাপেস্ট থেকে এক ঘণ্টার পথ। ব্যালটন থেকে আইওজের তাবু। ৮০ কিমি. দীর্ঘ এই লেক। এককালে রবীন্দ্রনাথ এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর নামে একটি সড়কও আছে। আমার দোভাষী অ্যাগনিস একসময় একজন ড্রাইভারকে আমার কাছে হাজির করলেন। সে নাকি বিশ্বকবির গাড়ির ড্রাইভার ছিল। অথচ সে তখন বুঝতে পারেনি যে রবীন্দ্রনাথ একজন বিশ্ববিখ্যাত কবি।

এই ব্যালটন থেকেই শুরু হলো আইওজের অধিবেশন। বিকেলের দিকে আমার সামনে একটি যুক্ত ইশতেহার হাজির করা হয়। বলা হলো এ ইশতেহার স্বাক্ষর করো। আমি খানিকটা হতচকিয়ে গেলাম। আমি বললাম, আমার সাথে কথা ছিল যুক্ত ইশতেহারের একটি খসড়া হবে। সেই খসড়া নিয়ে আমি ঢাকায় যাব। ঢাকার বন্ধুরা সম্মত হলে যুক্ত ইশতেহার প্রকাশিত হবে—নইলে নয়। আমি দেখলাম আমার প্রস্তাব উল্টে দিয়ে তারা চূড়ান্ত

www.nagorikpathagar.com

ইশতেহারটি হাজির করেছে স্বাক্ষরের জন্যে। আমি স্বাক্ষর দিতে রাজি হলাম না। বললাম, তোমরা ভুল করেছ। আমি কিনবার মতো পণ্য নই। আমার প্রস্তাব রাখা না হলে আমি স্বাক্ষর করব না। খসড়া ইশতেহার হিসেবে তোমরা এ ইশতেহার আমাকে দিতে পার। আমি ঢাকায় গিয়ে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব।

তারা রাজি হলেন না। দেখলাম তারাও অনড়। পরে জানতে পেরেছি তারা আমার জন্যে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে তাদের রাজি করিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন আমি তাদের কথা শুনব। কিন্তু তেমনটি ঘটল না। আমি স্বাক্ষর করলাম না। তার প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল রাতে। রাতে আমাকে জানানো হলো, পরদিন ভোরে আমাকে মস্কো যেতে হবে। আমার মস্কো যাবার টিকেট কনফার্ম হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ব জার্মানির মতোই আমাকে হাঙ্গেরি থেকে বিদায় নিতে হলো। তারা আমাকে মস্কো পাঠালেন ভিসা না করেই।

হাঙ্গেরি থেকে দুঃখজনকভাবে বিদায় নিলাম। মস্কো বিমানবন্দরে পৌছে বুঝলাম—সত্যি সত্যি হাঙ্গেরির বন্ধুরা আমার আচরণে সন্তুষ্ট হননি। তাই ভিসা ছাড়াই আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন মস্কোতে। মস্কো বিমানবন্দরে এসে বুঝলাম ভিসা না থাকায় কী বিপদ!

বিমানবন্দরে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান সাংবাদিকরা এসেছিলেন। আমাদের তিনজনের ভিসা না থাকায় তাঁরা বিচলিত হলেন। বললেন, ব্যাপারটা ঠিক হয়নি। তারপরও ভালো আচরণ করলেন তাঁরা। একটি ভিভিআইপি কক্ষে আমাদের নিয়ে গেলেন। বললেন, এ কক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু এবং রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান বসেছেন। তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেল। ভিসার কোনো পাত্তা নেই। এক সময় এক সাংবাদিক বন্ধু উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, আমলাদের জন্যে কোনো কিছুই করা যাবে না। আমরা তোমাদের শহরে নিয়ে যাচ্ছি। মস্কো শহরে পিকিং হোটেলে তোমরা থাকবে। তবে কোথাও বের হবে না। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা তোমাদের ভিসা নিয়ে আসব। ভিসা পাবার পরেই তোমরা বের হতে পারবে। নইলে নয়। এ আলোচনার পরেই আমরা মস্কো বিমানবন্দর ত্যাগ করলাম। গেলাম হোটেলে। সেদিন রাতে তেমন আলাপ হলো না। আমাদের সফর শুরু পরের দিন ভোরবেলা। তবে সে সফরসূচিতে নতুনত্ব কিছুই ছিল না। পূর্ব জার্মান বা হাঙ্গেরির মতোই বিভিন্ন অফিসে যাওয়া, চা খাওয়া এবং আলোচনা করা। সে আলোচনা কখনো বিতর্কে পৌছত না। আমি একবার প্রস্তাব করলাম লেনিনগ্রাদ সফরের। আমার বড্ড ইচ্ছে

www.nagorikpathagar.com

ছিল—লেনিনের নামের সাথে জড়িত এই শহরটি দেখার। আমাকে জানানো হলো—তোমাদের সফরসূচিতে লেনিনগ্রাদ নেই। তোমরা শুধু মস্কো শহরই দেখতে পারবে। কথাগুলো আমার ভালো লাগল না। তবে বুঝলাম যে আমাদের সম্পর্কে সব কথাই ওদের জানা। আমাদের সব খবর ওরা রাখে। হাঙ্গেরি এবং পূর্ব জার্মানিতে আমাদের আলোচনার খবর ওদের কাছে পৌঁছেছে। ওরা জানতে পেরেছে যে তাদের অনেক প্রস্তাবেই আমরা রাজি হইনি।

আমাদের সম্পর্কে তারা যে কত জানে তার প্রমাণ পেয়েছিলাম পরবর্তী সফরে ১৯৭৪ সালে। ১৯৭৪ সালে আমি ও কামাল লোহানী পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় গিয়েছিলাম। আমাদের সম্পর্কে বিস্তারিত খবর পেলাম রাজধানী প্রাগে। সেকালের সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রাগে যেমন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাংবাদিক ইউনিয়ন আইওজের সদর দফতর ছিল তেমনিভাবে অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দফতর ছিল প্রাগে। আন্তর্জাতিক পরিবহন শ্রমিকদের ইউনিয়নের প্রধান দফতর ছিল প্রাগে। এই ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ভারতের দেবু গাঙ্গুলী। এককালে দেবু গাঙ্গুলীর বাড়ি ছিল বাংলাদেশের বরিশালে। তিনি ভারতের সিপিআই-এর সদস্য। দীর্ঘদিন প্রাগে আছেন। ১৯৭৪ সালে প্রাগে গিয়ে প্রথমে তাঁর বাসায় উঠেছিলাম। কথায় কথায় তিনি বললেন, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আমাকে নাকি চেনে। দেবু বাবু বললেন, আপনি নির্মল সেন বরিশাল বিএম কলেজে পড়তেন। আরএসপি করতেন। বিড়ি সিগারেট খান না। আপনার কোনো নেশা নেই। একথা আমরা সকলেই জানি। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন সব দেশেই আপনাকে বিশেষ ধরনের দোভাষী দেয়া হয়েছে। এরা কখনোই আপনার সাথে খেতে বসে তেমন কোনো নেশা করেননি। সুতরাং আপনার ভয় পাবার কারণ নেই।

তবে এই চেকোশ্লোভাকিয়ায় সফরকালেই একটা ভিন্ন ঘটনা ঘটেছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ায় গিয়ে আমার মনে হয়েছিল কোথায় যেন একটা ভয় ভয় আছে। মাত্র কয়েক বছর আগে চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রতিবিপ্লবের চেষ্টা হয়েছিল। সেই প্রতিবিপ্লব ঠেকাতে ট্যাঙ্ক এসেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। হয়তো একথা স্মরণ করেই চেকোশ্লোভাকিয়াকে একটু বিশিষ্ট বলে আমার মনে হতো। আর এ জন্যে আমি প্রাগের বিমানবন্দরে নেমে বন্ধুদের বলেছিলাম, আমি ব্রাতিস্লাভা যাব। সকলেই হয়তো জানেন যে চেক ও ব্রাতিস্লাভা এই দুই রাজ্য মিলেই চেকোশ্লোভাকিয়া। সমাজতান্ত্রিক

www.nagorikpathagar.com

চেকোস্লোভাকিয়ার পতনের পর চেকোস্লোভাকিয়া চেক ও স্লোভাকিয়া নামে এখন দু'টি রাষ্ট্র হয়ে গেছে। চেকোস্লোভাকিয়া সফরে যাবার আগেই আমি জানতাম যে সেখানে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে গোলমাল চলছে। এই গোলমালের কেন্দ্র ব্রাতিস্লাভা। তাই আমার ব্রাতিস্লাভা যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বন্ধুরা রাজি হলো না। তারা জানাল—তোমার সফরসূচিতে ব্রাতিস্লাভা নেই। আমি দশদিন চেকোস্লোভাকিয়ায় ছিলাম কিন্তু ব্রাতিস্লাভায় যেতে পারিনি। তবুও আলোচনা বিতর্ক হয়েছে অনেক।

চেকোস্লোভাকিয়ায় বন্ধুরা কথায় কথায় বলতেন তোমরা যে কোনো প্রশ্ন করো, আমরা জবাব দেব। আমরা বলতাম, সব প্রশ্নের জবাব তোমরা দিতে পারবে না। একদিন এক প্রশ্ন নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। আমি বললাম, এবার আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করব। চেসকালিপার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা বলল, সব প্রশ্নের জবাব তুমি পাবে। আমি বললাম, ঠিক আছে। আমাদের চেকোস্লোভাকিয়া সফরকালে ওয়ারশ প্যাক্ট ও ন্যাটোর সাথে কথা হচ্ছিল। পোলান্ডের রাজধানী ওয়ারশ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের যৌথ সামরিক বাহিনীর সদর দফতর। উষ্ণ আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা অর্থাৎ ন্যাটোর সদর দফতর ব্রাসেলস। কিছুকাল ধরে এ দুই বাহিনীর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিলো সৈন্য সংখ্যা কমাবার। এমনোও কথা হচ্ছিলো যে ন্যাটো বাহিনী ভেঙে দেয়া হলে ওয়ারশ বাহিনীও ভেঙে দেয়া হবে। উল্লেখ্য, ওয়ারশ চুক্তি অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রতিটি দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল ফৌজের সদস্যরা অবস্থান করছে।

এ পটভূমিতে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কয়েক বছর আগে চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রতিবিপ্লবের চেষ্টা হয়েছিল। এই প্রতিবিপ্লব দমনের জন্যে এখনো ওয়ারশ বাহিনী চেকোস্লোভাকিয়ায় অবস্থান করছে। ন্যাটোর সাথে চুক্তি করে ওয়ারশ বাহিনী ভেঙে দেয়া হলে বাইরের সৈন্য তো চেকোস্লোভাকিয়ায় থাকবে না। এ পরিস্থিতিতে প্রতিবিপ্লব কি ঠেকানো যাবে?

আমার প্রশ্নে কমিউনিস্ট বন্ধুরা চুপ করে গেলেন। বললেন, এ প্রশ্ন রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে জড়িত। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় নেতারাই এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন। তুমি প্রাগে গিয়ে প্রশ্ন করে দেখতে পার। জবাব পাবে। যদিও তেমন ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি জানতাম এ প্রশ্নের জবাব তাদের কাছে নেই। বারবার আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সফরকালে।

তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল ভিন্ন রকম। দু'টি দেশ সফর করে সোভিয়েত ইউনিয়নে এসেছি। দেশ দু'টি হচ্ছে পূর্ব জার্মান ও

www.nagorikpathagar.com

হাঙ্গেরি। পূর্ব জার্মানের সর্বত্রই একটা কঠোর নিয়ন্ত্রণ। নিয়মের বাইরে কেউ যায় না। কেউ পছন্দ না করলেও এ চিত্রটি আমার ভালো লেগেছে। পূর্ব জার্মানিতে তেমন প্রাণ খোলা উচ্ছ্বাস কিংবা উল্লাস দেখিনি, আর হাঙ্গেরিতে কিছুটা বিপরীত। সেখানে সবকিছু খোলামেলা। পূর্ব জার্মান ও হাঙ্গেরির পার্থক্যটা বড্ড স্পষ্ট। হাঙ্গেরির সাংবাদিক জর্জ কলমার একটি ঘটনা দিয়ে আমাকে তা বুঝিয়েছিলেন। ঘটনাটি হচ্ছে—সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের পদত্যাগ নিয়ে। ক্রুশ্চেভ পদত্যাগ করলে পরের দিন হাঙ্গেরির সকল কাগজে সে খবর ছাপা হলো। কিন্তু পূর্ব জার্মানির কাগজে ছাপা হলো না। জর্জ কলমার বলেছিলেন, মস্কো থেকে এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশ না আসায় পূর্ব জার্মানির কাগজে এ খবর ছাপা হলো একদিন পর।

এ পটভূমিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমার মনে হয়েছিল অনেক ধীর এবং গম্ভীর। সকলে বড্ড চুপচাপ। যেন মেনে মেনে কথা বলে। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছে প্রথমেই মনটা কেমন হয়ে গেল। এক দুঃখজনক বিতর্ক হয়ে গেলো দ্বিতীয় দিন সংবর্ধনা সভায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংবাদিক ইউনিয়ন এক হোটেলে আমাদের সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল। পরিবেশন করেছিল ভদকাসহ অন্যান্য পানীয়। আমি বললাম, আমি ভদকা খাব না। অন্য কোনো পানীয় দাও। মস্কোর বন্ধুরা যেন কিছুটা ক্ষুণ্ন হলেন। বললেন, তুমি আমাদের অপমান করছ। ভদকা আমাদের জাতীয় পানীয়। সব অনুষ্ঠানে আমরা পরিবেশন করে থাকি। তোমার ভদকা না খাওয়াটা হবে আমাদের অপমানের সামিল। আমি বললাম, আমি কিন্তু একই অভিযোগ করতে পারি তোমাদের বিরুদ্ধে। তুমি নিশ্চয়ই জান আমাদের দেশে সরকারিভাবে কোনো অনুষ্ঠানে এ জাতীয় পানীয় পরিবেশন নিষিদ্ধ। আমার মতে, বিদেশে গিয়েও আমাদের পক্ষে এই নিষিদ্ধ পানীয় গ্রহণ করা সঠিক নয়। তুমি আমাকে কোমল পানীয় দাও। আমি আপত্তি করব না। কিন্তু ভদকা আমি খাব না। আমার কথায় যেন তারা একটু অপ্রস্তুত হলো। বলল, দুঃখিত মনে কিছু করো না। তোমাকে কোমল পানীয় দেয়া হচ্ছে। তবে এর আগে তোমাদের দেশের অনেক প্রতিনিধি দল এদেশে এসেছে। কিন্তু কেউই এ ধরনের কথা তোলেননি।

আমাদের আগে যারা এসেছে তাদের কথা উল্লেখ করেই একদিন চরম বিতর্ক হলো প্রাভদা অফিসে। প্রাভদা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের খবর দেয়া হলো আমাদের প্রাভদার সম্পাদক কমরেড জিমিনিনের সাথে আলাপ করতে হবে। আমাদের

www.nagorikpathagar.com

বলা হলো তোমরা খুবই ভাগ্যবান। তোমাদের সাথে কথা বলবেন সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য যিনি প্রাভদার সম্পাদক। সন্ধ্যার পর আমরা প্রাভদা অফিসে গেলাম। আলোচনা শুরু হলো সম্পাদকের কক্ষে। জানানো হলো আমাদের সাথে আলোচনাকালে উপস্থিত আছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র দফতরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তবে আলোচনা শুরু হবার প্রাক্কালেই সব কিছু যেন গোলমেলে হয়ে গেল। আমার সফরসঙ্গী আলোকচিত্র শিল্পী মোজাম্মেল ও সাংবাদিক শামসুল হক, আলী নূর। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর প্রথম প্রশ্ন করল আলী নূর। আলী নূরের প্রশ্ন হচ্ছে—বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনো সাহায্য দিতে পারবে কিনা। মনে হলো প্রাভদা সম্পাদক এই প্রশ্নটিকে ভিন্নভাবে নিলেন। তিনি যেন একটু রুক্ষ হলেন। বললেন, তোমাদের দেশ থেকে যারা আসছে সকলেই সাহায্যের কথা বলছে। আমাদের দেশের সাধারণ কৃষক শ্রমিক শুধুমাত্র তোমাদের সাহায্য করার জন্যে তো আর কাজ করছে না। প্রাভদার সম্পাদকের উত্তর আমার কাছে অপমানকর মনে হলো। আমি বললাম, দেখুন, আমরা গরিব হতে পারি, আমরা কিন্তু ভিখারী নই। এর আগে কারা আপনাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে জানি না। আমরাই আমাদের দেশকে গড়ে তুলতে পারব। মনে হলো আমার জবাবে প্রাভদা সম্পাদক ক্ষেপে গেলেন। তিনি বললেন—তুমি কি জান, কী করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে মোকাবেলা করতে হয়। আমি বললাম—এ শিক্ষা আপনার কাছে থেকে নেব না। আমরা ন'মাস যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছি। যুদ্ধের শেষের দিকে আপনারা আমাদের সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু কারো সহযোগিতা ছাড়াই আমরা জিততে পারতাম। সারা বিশ্ব আমাদের সমর্থন করত। এবার প্রাভদা সম্পাদক একটু ভিন্ন সুরে কথা বললেন। তিনি বললেন, তুমি কি আন্তর্জাতিকতাবাদ বোঝ এবং জান যে আমাদের বন্ধুরা ভিয়েতনাম এবং হাভানায় যুদ্ধ করছে? তোমাদের কি এ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে? আমি বললাম, অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তোমাদের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার আগে ২৩ বছর আমরাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আমার একটি ভিন্ন ধারণা আছে। আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ ঢাকা থেকে শুরু হয়ে হাভানা যায়। ভিয়েতনাম যায়। ভিয়েতনাম থেকে শুরু হয়ে ঢাকা আসে না। সেদিক থেকেই তুমি বলতে পার এ ব্যাপারে আমি একবারেই গোঁয়ো। আমি জাতীয়তাবাদী বলেই আন্তর্জাতিকতাবাদী। আমার কথার মধ্যে পররাষ্ট্র বিভাগের এক কর্মকর্তা বাধা

www.nagorikpathagar.com

দিলেন। বললেন, আপনি বড্ড সেন্টিমেন্টাল। আমি বললাম, সেন্টিমেন্টাল বলেই আমরা এত বড় শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরেছি। আমাদের প্রচণ্ড আবেগ আমাদের সাহসী করেছে। আমি আবারও বলতে চাই, আমি জাতীয়তাবাদী বলেই আন্তর্জাতিকতাবাদী আর আমি যতদূর জানি এটাই লেনিনের কথা।

এবার মুখ খুললেন প্রাভদার সম্পাদক। বললেন, শুনেছি, তুমি সর্বত্রই লেনিন নিয়ে কথা বলেছ। কারো সাথে তোমার ঐকমত্য হয়নি। আমি বললাম, দেখো লেনিন মারা গেছে। তার সম্পর্কে তোমাদের এবং আমার ব্যাখ্যা এক হচ্ছে না। তাই সর্বত্রই আমি বলেছি লেনিন নিয়ে বিতর্ক করে লাভ নেই। কারণ কেউই চূড়ান্ত কথা বলতে পারবে না।

কমরেড জিমেনিন এবার ভিন্ন কথা তুললেন। বললেন, তোমাদের ইউনিয়ন কি আমাদের ইউনিয়নের সাথে কোনো চুক্তি করতে রাজি। আগামী সপ্তাহে ভারতের সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতারা আসবেন। তারাও চুক্তি করবেন। তোমরা এলে আপত্তি কি? আমি বললাম, আমি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। বাংলাদেশে জাতীয় সাংবাদিক ইউনিয়ন গঠিত হয়নি। তাই আমার পক্ষে কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব নয়। এ কথা আমি প্রথম থেকেই বলেছি।

এ সময় চা এল। পরিস্থিতি অনেক শান্ত হলো। প্রাভদা সম্পাদক জানালেন, আমার সাথে তোমার আলোচনার খবর কাল প্রাভদার প্রথম পৃষ্ঠায় যাবে। আর তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ তুমি ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে কিছু লিখো না। আমি বললাম, এ অভ্যাস আমার নেই। বুঝলাম আমাদের সম্পর্ক জোড়া লাগল না। প্রাভদার সম্পাদকের কক্ষ থেকে বের হতেই আমার দোভাষী বলল, তোমার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের দরজা চিরতরে বন্ধ। তুমি এত তর্ক করবে না। সত্যি সত্যি দোভাষী এ কথা অনুধাবন করেছিলেন ১৯৭৪ সালে। সেবার পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি এবং চেকোস্লোভাকিয়া গিয়েছিলাম। কিন্তু চেষ্টা করেও সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে পারিনি। আমার লেনিনগ্রাদ দেখা হয়নি। আর সে লেনিনগ্রাদ এখন আবার পিটার্সবার্গ।

সমাজতান্ত্রিক শিবির সফর করে এসে এক নতুন বিতর্কে পড়লাম। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে প্রকৃত পক্ষে এক বছরও হয়নি। সংঘবদ্ধ কোনো বিরোধিতাও নেই। সারা দেশে সন্ত্রাস। অপরদিকে সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর নাম হয়েছে ষোলই ডিসেম্বর

www.nagorikpathagar.com

মুক্তিবাহিনী। অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যারা সুযোগ বুঝে মুক্তিবাহিনী সেজেছিল তাদেরই এ নাম দেয়া হয়েছিল। অনেকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই ষোড়শ ডিভিশনের অধিকাংশ লোক এককালে রাজাকার, আলবদর ও আল শামস বাহিনীর সদস্য ছিল। এরা ৯ মাস সশস্ত্র ছিল। নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাট করেছে। ১৬ ডিসেম্বর তারা ভোল পাল্টেছে। মনে হচ্ছিলো তারাই সবচেয়ে বড় মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধার লেবাস লাগিয়ে তারা আরো ভয়ানক হয়ে উঠেছিল।

অপরদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্বও কোনো উন্নতমানের ভূমিকা পালন করেনি। সকলেই যেন কোনো কিছু দখল করতে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে অনেকেই বাড়ি গাড়ি এবং দোকান দখল করেছে। একের পর এক সাইনবোর্ড পাল্টাচ্ছে বিভিন্ন দোকান। বায়তুল মোকাররমে গিয়ে দেখি এককালের অবাঙালিদের দোকানে যারা কর্মচারি ছিল তারাই মালিক সেজে বসেছে। সে এক অদ্ভুত লুটপাটের জগৎ। এ পরিবেশ থেকে আমরাও মুক্ত থাকতে পারিনি। আমরাও অবাঙালিদের ফেলে যাওয়া পরিত্যক্ত ভবন দখল করে দলের অফিস বানিয়েছি। আমাদের কারো কোনো বৈধ কাগজপত্র ছিল না। কিন্তু সকলেই গায়ের জোরে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে বসেছি। খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে সেকালের জোর করে দখল করা অনেক ভবনে এখনোও অনেক রাজনৈতিক দলের অফিস বিরাজ করছে। পরবর্তীকালে এ দখল নিশ্চয়ই বৈধ করা হয়েছে। কিন্তু ৭২-এ যে মানসিকতা নিয়ে আমরা অন্যের বাড়ি দখল করে দলের অফিস বানিয়েছিলাম সে মানসিকতা কোনোক্রমেই সঠিক ছিল না।

এ পরিবেশে শাসক শ্রেণির বিভিন্ন সংগঠন নতুন নতুন বাহিনী গঠন করা শুরু করে। সরকারি শ্রমিক লীগের নেতৃত্বে লালবাহিনী গঠন করা হয়। বলা হয়েছিল এ লালবাহিনী শিল্প এলাকার শান্তি রক্ষা করবে। উৎপাদন ব্যবস্থা দেখাশোনা করবে। পরবর্তীকালে শুনেছি, বিপ্লব উত্তর রাশিয়ার রেডগার্ডের আদলে নাকি বাংলাদেশে লালবাহিনী গঠিত হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের লালবাহিনীর মতো পুনর্গঠন নয়, বাংলাদেশের ঢংয়েই তারা শিল্প এলাকায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল।

তখন শিল্প এলাকায় আমাদের সংগঠন সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের প্রায় একাধিপত্য ছিল। আমাদের এ আধিপত্য সরকার বরদাস্ত করেনি। রাতারাতি একের পর এক ইউনিয়ন তারা জোর করে দখল করে নেয়। শ্রম দফতরের সহযোগিতায় আমাদের ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেয়। নতুন ইউনিয়ন গঠন করতে থাকে। অর্থাৎ সর্বত্রই তখন নৈরাজ্য।

www.nagorikpathagar.com

একদিন লক্ষ্য করলাম রাজপথে নীল পোশাক পরিহিত একদল শ্রমিক ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে। শুনলাম এরা নাকি নীল বাহিনী। এরা তাঁতি লীগের লোক। এরা নীল বাহিনী গঠন করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিয়েছে। কে তাদের এ দায়িত্ব দিয়েছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। এখন সকলেই সার্বভৌম।

এক সময় দেখা গেল—পত্রিকার পাতায় রাজাকাররা একের পর এক শহীদ হয়ে যাচ্ছে। নিখোঁজ রাজাকারদের ছবি ছাপা হচ্ছে নিখোঁজ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। প্রথমে আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। নিখোঁজ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যাদের আমরা ছবি ছাপাচ্ছি তাদের অধিকাংশই নিখোঁজ রাজাকার, আল বদর, আল শামস। তাদের আত্মীয়-স্বজনরা সাংবাদিকদের এ অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছে। ছবি ছাপাবার পেছনের এ তথ্যটি জানতে দীর্ঘদিন কেটে গেছে। এ পরিস্থিতিতে আমি 'অনিকেত' নামে দৈনিক বাংলায় উপসম্পাদকীয় লিখতে শুরু করি। এ ধরনের প্রতিটি ঘটনার বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে আমি অসম্ভব বিতর্কিত হয়ে পড়ি। এ পরিবেশে সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে ফিরে এসে আমি যুদ্ধাপরাধীদের শ্রেণি বিভাগের দাবি তুলি। বলতে চেষ্টা করি, সব অপরাধ এক কাতারে নয়। হাজার হাজার মানুষকে রাজাকার আখ্যা দিয়ে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে বিচার করা সঠিক হবে না। জার্মানির উদাহরণ তুলে ধরে বলার চেষ্টা করি, সাধারণ অপরাধে অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমতা করা হোক। দেশে ফিরে এ কথা লিখে আমি যেন তোপের মুখে পড়ে গেলাম। সে পরিস্থিতিতে আমাকে বাঁচিয়েছে শুধু আমার কলম নয়, আমার রাজনৈতিক দল নয়, আমার পেশা সাংবাদিকতাও।

সাংবাদিকতার জগতে তখন পরিবর্তন এসেছে। ৭১ সালের সংগ্রামের সময় আগুনে পুড়ে যাওয়া ইত্তেফাক সরকারি সাহায্য পেয়ে দাঁড়াবর চেষ্টা করছে। পাসবান অফিস থেকে সরকারি সহযোগিতায় শেখ ফজলুল হক মনি বের করছে বাংলার বাণী। ট্রাস্ট সম্পর্কে তখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তথ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দৈনিক বাংলা, মর্নিং নিউজ ও বিচিত্রা প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলাদেশ অবজারভার, পূর্বদেশ এবং চিত্রালী প্রকাশিত হচ্ছে সরকারি তত্ত্বাবধানে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তখন কিছুটা সক্রিয় সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টি। কখনো রাজনৈতিক খুন, আবার কখনো থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি দখলের অভিযোগ আসছে এই দলের বিরুদ্ধে। রাজনীতিতে মওলানা ভাসানীর ভূমিকাও বিতর্কিত হয়ে উঠছে। এ পরিস্থিতিতে এল ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি।

www.nagorikpathagar.com

ঘটনাটি ছিল অপ্রত্যাশিত। আমরা অনেকেই প্রেস ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম ছাত্র ইউনিয়নের একটি মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে প্রেস ক্লাবের দিকে আসছে। হঠাৎ শুনলাম গুলির শব্দ। মিছিলকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এদিক-ওদিক ছুটে পালাল। একদল মিছিলকারী প্রেস ক্লাবের ভেতরে ঢুকে গেল। পুলিশ প্রেস ক্লাব তাক করেও গুলি ছুঁড়ল। প্রেস ক্লাবের জানালার কাঁচ ভেঙে একটি গুলি বাংলার বাণীর আলোকচিত্রী রফিকুর রহমানকে আঘাত করল। আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমাদের চোখের সামনে ছাত্র ইউনিয়নের মতিউল-কাদের মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল। আমরা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ সভা করলাম এবং মিছিল নিয়ে সচিবালয়ে দিকে গেলাম। আব্দুল গনি রোড হয়ে আমরা সচিবালয়ে ঢুকতে চেষ্টা করলাম। এসময় গেটে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমদ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, আপনি নির্মল সেন এবং গিয়াস কামাল চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রী ডেকেছেন। আপনারা দু'জন আমার সাথে চলুন। আপনাদের স্লোগান বন্ধ করতে হবে। আমরা রাজি হলাম না। বললাম, আমরা সকলেই যাব এবং স্লোগান দিতে দিতেই যাব। তোফায়েল সাহেব আমাদের কথার জবাব দিলেন না। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে পৌঁছে দিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে তখন অনেক মানুষ। আমরা কেউই জানতাম না, তখন মন্ত্রিসভার বৈঠক চলছে। আমি ছিলাম অসম্ভব ক্ষুব্ধ। কোনো দিক না তাকিয়েই প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মান্নান সাহেব কোথায়। আমরা মান্নান সাহেবকে চাই। পাকিস্তানের রাজত্বে তেইশ বছর ছিলাম। ১৯৭১ সালের মার্চের পূর্বে পাকিস্তানিরা প্রেস ক্লাবে গুলি করতে সাহস পায়নি। প্রধানমন্ত্রী, আপনি দেশে ফিরেছেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। আজ ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি। এক বছর না যেতেই আপনারা প্রেস ক্লাবে গুলি চালিয়েছেন। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মান্নান সাহেবকে আমরা দেখতে চাই। প্রধানমন্ত্রী বললেন, ওই তো মান্নান বসে আছে। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। সত্যি সত্যি তো ভাবিনি যে মান্নান ভাই ওখানে থাকবেন। এবার প্রধানমন্ত্রী বললেন, কী ঘটনা ঘটেছে আমি জানি। এবার আপনারা কী চান তা বলুন। গিয়াস কামাল বললেন, নির্মল দা-ই সব বলবেন। আমি বললাম, আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে। গুলিবর্ষণের তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করতে হবে। এসপিকে সাসপেন্ড করতে হবে। তদন্তের পর দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হবে। নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.com

এবার প্রধানমন্ত্রী অদ্ভুত ভঙ্গি করলেন। তিনি হেসে হাতজোড় করে বললেন, এ ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া কি মানায়? আমি কথা দিচ্ছি প্রেসনোট দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করা হবে। এছাড়া আপনাদের বাদ বাকি সব দাবিই মেনে নেয়া হবে। তাহলে আপনারা খুশি তো, কী বলেন?

প্রকৃতপক্ষে তখন আমাদের বলার কিছু ছিল না। আমরা প্রেস ক্লাবে ফিরলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম ছাত্রলীগের একটি মিছিল। মিছিল থেকে স্লোগান উঠছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নানের পদত্যাগ চাই। প্রথমে আমার ব্যাপারটি বোধগম্য হলো না। পরে বুঝলাম—আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ এবারে রাজপথে ঘটতে শুরু করল। ১ জানুয়ারির এ ঘটনা নিয়ে বিকেলে দৈনিক বাংলা ও দৈনিক সংবাদের পক্ষ থেকে দু'টি টেলিগ্রাম বের করা হলো। দৈনিক সংবাদের সাংবাদিকদের ভূমিকা বড় করে তুলে ধরা হলো। পরের দিন দৈনিক সংবাদে সে খবর ছিল অনেক নরম। আর টেলিগ্রাম ছাপাতে গিয়ে বিপদে পড়ল দৈনিক বাংলা এবং দৈনিক বাংলার প্রখ্যাত দুই সাংবাদিক তোয়াব খান ও হাসান হাফিজুর রহমান।

১৯৭৩ সাল। ১ জানুয়ারি প্রেসক্লাবের সামনে গুলি হলো। ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যরা ভিয়েতনামের স্বপক্ষে মার্কিন বিরোধী মিছিল করতে এসেছিল। কোনো সতর্কবাণী ছাড়াই পুলিশ সে মিছিলে গুলি করে। মতিউল ও কাদের নামে দু'জন ছাত্র নিহত হয়। আগের দিনের টেলিগ্রামের মতো সংবাদের সুর তেমন কঠিন নয়। অনেকটা আপোষের সুর।

দেশবাসীর কাছে দৈনিক সংবাদের একটি পরিচয় ছিল। সংবাদের মালিক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অর্থাৎ ন্যাপের সদস্য। ন্যাপের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ। সংবাদের অধিকাংশ সাংবাদিক ও কর্মচারী কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য, সমর্থক অথবা শুভানুধ্যায়ী। তাই একটা সাধারণ ধারণা ছিল সংবাদ ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি ঘেঁষা এবং মোটামুটিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থক। তাই সংবাদ পড়ে আঁচ করা যেত ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ও নীতি। একথা জানা থাকলেও ২ জানুয়ারির সংবাদ পড়ে আমার তেমন কোনো ধারণা হয়নি।

২ জানুয়ারি হরতাল। প্রেস ক্লাবে এসে দেখলাম প্রেস ক্লাবের সামনে সাবেক ইউএসআইএস-এর সামনে অঙ্গনে মতিউল ও কাদেরের নামে একটি স্মৃতিসৌধ হচ্ছে। একদল সাংবাদিক আমাকে ওখানে নিয়ে গেল। ওই স্মৃতিসৌধে আমি মালা দিলাম। প্রেস ক্লাবে গিয়ে তুমুল বিতর্কের সামনে পড়ে গেলাম। সবার অভিযোগ হচ্ছে—আপনি মস্কোপন্থীদের ফাঁদে পড়েছেন।

www.nagorikpathagar.com

যদিও তাতে আমার কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হলো না। কারণ সর্বকালেই আমি এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতেই অভ্যস্ত।

সন্ধ্যার দিকে দৈনিক বাংলা অফিসে গেলাম। সিঁড়িতে উঠতে একজন সহ-সম্পাদককে দেখলাম। সে প্রেসে যাচ্ছে। সে বলল—কিছু কিছু খবর শুদ্ধ করার জন্য প্রেসে যাচ্ছি। ওই দিন বিকালে পল্টন ময়দানে ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিবাদ সভা ছিল। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ অর্থাৎ ডাকসুর ভিপি ছিলেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। সভায় তিনি নাকি ঘোষণা করেছেন, শেখ সাহেবের 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। ডাকসুর তরফ থেকে ১৯৬৯ সালে শেখ সাহেবকে বঙ্গবন্ধু খেতাব দেয়া হয়েছিল। সেই সুবাদেই ডাকসু'র পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু খেতাব প্রত্যাহার করা হলো। আমার দৈনিক বাংলার সাংবাদিক বন্ধু একটি ছবির ক্যাপশন থেকে বঙ্গবন্ধু শব্দটি তুলে দেয়ার জন্যে প্রেসে যাচ্ছিল। আমি তার কাছেই এ কথা শুনলাম। কিন্তু তখনও গভীরভাবে তলিয়ে দেখিনি এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে। আমরা দৈনিক বাংলায় কাজ করি। বরাবরই একটি ট্রাস্ট কিংবা সরকারি মালিকানায় থাকলেও দৈনিক বাংলার সাংবাদিকদের এক ধরনের স্বাধীনতা সর্বকালেই ছিল। যেমন ১৯৭১ সালে কর্তৃপক্ষের সমস্ত চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে দৈনিক বাংলা শেখ সাহেবের ৭ মার্চের ভাষণ দাড়ি, কমা, সেমিকোলনসহ ছেপে দিয়েছিল। আমার ধারণা ছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ ধরনের স্বাধীনতা আরো পাওয়া যাবে। সুতরাং আমি নতুন করে কিছুই ভাবতে চেষ্টা করিনি।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া হলো সরকারি মহলে। শেখ সাহেব তখন ঢাকায় ছিলেন না। আমাদের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান, নির্বাহী সম্পাদক তোয়াব খানকে ডেকে পাঠানো হলো। তাদের অভিযুক্ত করা হলো টেলিগ্রাম বের করার জন্যে।

আমি খবর পেলাম সবচেয়ে শেষে। ইতিমধ্যেই সরকার আর একটি পদক্ষেপ নিয়েছে। হাসান হাফিজুর রহমান ও তোয়াব খানকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি অর্থাৎ ওএসডি করা হয়েছে। নতুন সম্পাদক হয়ে আসছেন ইত্তেফাকের প্রবীণ সাংবাদিক নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী। আমি খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দৈনিক বাংলায় তোয়াব খানের সাথে দেখা হলো। একটি মহল থেকে বলা হলো এ সিদ্ধান্ত নেবার আগে শেখ সাহেব নাকি কথা বলেছেন খন্দকার গোলাম মুস্তফার সাথে। যিনি কে জি মুস্তফা নামে পরিচিত। পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন এবং মোটামুটিভাবে তৎকালীন বাংলাদেশেও সাংবাদিকদের

www.nagorikpathagar.com

স্বীকৃত নেতা। আমি তাঁকে ফোন করলাম। তিনি বললেন প্রধানমন্ত্রী আমাকে ফোন করে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন মাত্র। সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমার মতামত নেননি। এ পরিস্থিতিতে আমাকে বিপদে ঠেলে দিল। কারণ আমি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। আবার দৈনিক বাংলায় চাকরি করি। আমার পক্ষে পিছু হটবার কোনো পথ ছিল না।

আমি দৈনিক বাংলার প্রেস, শ্রমিক ইউনিয়ন ও কর্মচারী ইউনিয়নের দুই নেতাকে নিয়ে পুরনো গণভবনে গেলাম। দুপুরের দিকে প্রধানমন্ত্রী ওখানে বিশ্রাম নিতেন। গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সচিব রফিকুল্লাহ চৌধুরীর সাথে দেখা হলো। তিনি বললেন, প্রধানমন্ত্রী বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমি বললাম, আমার জরুরি কথা আছে। রফিকুল্লাহ চৌধুরীর সাথে দীর্ঘদিন আমার ছাত্রলীগের সম্পর্ক ছিল। আইয়ুব আমলে জেলে যাবার আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে একই হোটেলে থাকতাম। রফিকুল্লাহ চৌধুরীকে বললাম আমার প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে হবেই। তাঁর সাথে আমি একা পুরনো গণভবনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার বামপাশে একটি কক্ষে গেলাম। আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম তিনি খাটে শুয়ে আছেন। মাথার কাছে গাজী গোলাম মুস্তাফা। প্রধানমন্ত্রীর গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি। আমাকে দেখেই তিনি একটি হাওয়াই শার্ট গায়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

আমি সেদিন অবাক হয়ে একজন ভিন্ন মানুষের দিকে তাকাচ্ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরে বললেন, আপনি আমার ভাই, একটা ভুল হয়ে গেছে। সাংবাদিকদের অসাংবাদিক করা ঠিক নয়। হাসান হাফিজুর রহমান ও তোয়াব খানকে ওএসডি করা ঠিক হয়নি। এ ঘটনায় আমি দুঃখিত। এখন আমার করার কিছু নেই। এ ব্যাপারে আপনাকে একটু ভিন্নভাবে ভাবতে হবে। আমি বারবার বলছি, আমি নিরুপায়। আপনি আমার ভাই। আপনাকে ক্ষমা করতে হবে।

কিন্তু আমারও করার কিছু ছিল না। প্রধানমন্ত্রী আমার হাত ছেড়ে দিলেন। আমি বললাম, আমি গোপালগঞ্জের নির্মল সেন নই। আমি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। আমারো করার কিছু নেই। আমি চাই তাদের দৈনিক বাংলায় ফিরিয়ে দেয়া হোক। এ প্রশ্নে আমার আপোষ করার কোনো পথ নেই। এবার দেখলাম—প্রধানমন্ত্রীর মুখমণ্ডল পাল্টে যাচ্ছে। বললেন, চলুন, আপনার সাথে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে কথা বলব। এবার ভিন্ন কক্ষে গেলাম। শেখ সাহেব তার কথা বললেন। তাকিয়ে দেখলাম আমার অপর দুই বন্ধু একেবারে নীরব। তাঁরা কেউ টু-শব্দটি করছে না। দেরিতে হলেও আমি

www.nagorikpathagar.com

বুঝতে পারলাম—আমি ব্যতীত সকলের সাথেই প্রধানমন্ত্রী আগে আলাপ করেছেন এবং তাঁরা সম্মতি দিয়েছেন।

আমি কোনো কিছু ঘুণাক্ষরে জানতে পারিনি। আমার বলার কিছু ছিল না। আমার নির্বাক দুই বন্ধুকে নিয়ে আমি দৈনিক বাংলায় ফিরে এলাম। পরের দিন মিছিল হলো। দৈনিক বাংলার তিনশ' কর্মচারী দৈনিক বাংলা থেকে হেঁটে মিছিল করে পুরনো গণভবনে গেল। সকলের পক্ষ থেকে অনেক আবেদন নিবেদন করা হলো। প্রধানমন্ত্রী কারো কথা শুনলেন না। পরে আমাকে ডেকে বললেন হাসান হাফিজুর রহমানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেস মিনিস্টার করা হবে। আপনাদের মুখ চেয়ে তাঁকে যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদা দেয়া হবে। তোয়াবেরও একটা ব্যবস্থা করা হবে। আপনাকে অতো ভাবতে হবে না।

আমি তখন বিপর্যস্ত এবং বিধ্বস্ত। দীর্ঘদিন ট্রেড ইউনিয়ন করেছি। আইয়ুব আমলে মাসের পর মাস চটকল ধর্মঘট করেছি। কোনোদিন পরাজিত হইনি। এবার আমাকে পিছু হটতে হলো। পরবর্তীকালে শুনতে পেলাম—সরকারও দুই সাংবাদিককে ওএসডি করে খুব নিরাপদ অবস্থানে ছিলেন না। কারণ আইনের দিক থেকে এ দুই সাংবাদিক আদৌ সরকারি কর্মচারি ছিলেন না। তাই তাঁদের সরকারি কর্মচারিদের হিসেবে ওএসডি করাও যায় না।

এর ক'দিন পরে দৈনিক সংবাদের সুর নরম হয়ে যাবার তাৎপর্য বুঝলাম। জানা গেল, ছাত্র ইউনিয়নের এই ভূমিকায় সোভিয়েত ইউনিয়ন খুশি নয়। এর পরবর্তীকালেই আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট (গজ) গঠন করে। একদিন দেখলাম প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে মতিউল-কাদেরের স্মৃতিসৌধ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনের চত্বরে। সেখানে এরশাদের আমলে একটি ফোয়ারা স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল ঘটনা ঘটেছিল পর্দার অন্তরালে। আমি বা আমরা অর্থাৎ সাংবাদিকরা এ ব্যাপারে কোনো কিছুই জানতে পারিনি।

দৈনিক বাংলায় ফিরে এলাম। নতুন সমস্যা দেখা দিল নতুন সম্পাদক নিয়ে। ইত্তেফাকের প্রবীণ সাংবাদিক নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী আমাদের সকলের পরিচিত। আপনজন বললেও বেশি বলা হয় না। হাসান হাফিজুর রহমান ও তোয়াব খানের পরিবর্তে পাটোয়ারী সাহেব এলেন দৈনিক বাংলার সম্পাদক হিসেবে। হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন দৈনিক বাংলার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও প্রশাসক। তোয়াব খান ছিলেন নির্বাহী সম্পাদক। এবার সম্পাদক ও প্রশাসকের পদ নিয়ে এলেন নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী। নির্বাহী সম্পাদকের পদ থাকল না।

www.nagorikpathagar.com

পাটোয়ারী সাহেব আসায় আমাদের সকলেরই অসুবিধা হলো। আমরা হাসান হাফিজুর রহমান ও তোয়াব খানের পক্ষে আন্দোলন করেছি। আমাদের পক্ষে পাটোয়ারী সাহেবকে গ্রহণ করা খুবই মুশকিল। কিন্তু কোনো উপায়ও ছিল না।

এসময় আমার একটি ভিন্ন কথা মনে হতো। পাটোয়ারী সাহেবের তুলনায় আমরা ছিলাম সাংবাদিকতায় নতুন। এক সময় ভাবতাম সাংবাদিকদের তুলনা হয় না। এরা আদর্শ, এরা নমস্য। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সে বিশ্বাসে চির ধরতে শুরু করে। লক্ষ করলাম আমরা একেবারেই সাধারণ মানুষ। আমাদের আদর্শবাদী ও সাহসী বলা হয়ে থাকলেও প্রায় কেউ আদর্শবাদ এবং সাহস দেখাতে পারলাম না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অন্য পেশায় মানুষের মতো আমরাও দৌড়-ঝাঁপ শুরু করলাম। আমরা ভালো চাকরি চাই। আমরা মন্ত্রী হতে চাই। সংসদ সদস্য হতে চাই। কেউ রাষ্ট্রদূত হতে চাই। সাংবাদিকতা পেশা আমাদের কাছে গৌণ হয়ে গেল।

এমন ধারণা আমার ছিল না। পাকিস্তান আমলে যারা সাংবাদিকতা করতেন তাদের একটা ভিন্ন পরিচয় ছিল। এককালে তাদের মধ্যে অনেক প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হয়েছেন। কিন্তু স্বকীয়তা হারায়নি। নিজের পেশাও ছাড়েননি। আমি একমাত্র ব্যতিক্রম দেখেছিলাম করাচির ডন পত্রিকার সম্পাদক মরহুম আলতাফ হোসেনের ক্ষেত্রে। তিনি আইয়ুব মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দেখলাম তিনি খাঁটি আমলা হয়ে গেছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনাও আজকে আমার মনে পড়ছে।

ষাটের দশকের কথা। তখন দৈনিক বাংলার নাম দৈনিক পাকিস্তান। আমি টেবিলে শিফট ইনচার্জ। বার্তা সম্পাদক মোজাম্মেল হক কায়রোগামী বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। নতুন বার্তা সম্পাদক তোয়াব খান। প্রধান সহ-সম্পাদক ফজলুল করিম। পাকিস্তান সরকার ইত্তেফাক নিষিদ্ধ করেছে। প্রতিবাদে ধর্মঘট ডেকেছিল পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন। পরের দিন রাতের পালায় আমি কাজ করছি। গভীর রাতে দৈনিক পাকিস্তানের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আহসান আহমদ ফোন করলেন। বললেন এপিপি (পরবর্তীতে বাসস) একটি খবর পাঠাবে হুবহু ছেপে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পর খবর এল। সে খবরে বলা হয়েছে সাংবাদিক ইউনিয়নের ধর্মঘট আহ্বান সত্ত্বেও সেদিন পূর্ব পাকিস্তান পাঁচটি দৈনিক প্রকাশিত হয়েছিল। পড়ে দেখলাম, সেই খবরে দৈনিক পাকিস্তানের নাম নেই। তাই খবরটি অনুবাদ না করে আমি বসে থাকলাম। এবার ফোন করলেন আলতাফ হোসেন। জানতে চাইলেন ওই খবর

www.nagorikpathagar.com

এসেছে কিনা। আমি বললাম খবর এসেছে। কিন্তু ওই খবরে দৈনিক পাকিস্তানের নাম নেই। তিনি বললেন, আপনি দৈনিক পাকিস্তানের নাম লিখে দিন। আমি বললাম, সংবাদটি এপিপির; আমি সংশোধন করতে পারব না। তিনি বললেন, নতুন করে খবরটি যাচ্ছে। ওই খবরে দৈনিক পাকিস্তানের নাম থাকবে। খবরটি দৈনিক পাকিস্তানে ছাপাতেই হবে। এটা সরকারি নির্দেশ। তখন রাত ১২টা বেজে গেছে। শিফটের সকলে চলে গেছে। আমি একা। এবার নতুন করে খবরটি এল। ওই খবরে দৈনিক পাকিস্তানের নাম ছিল। আমি খবরটি অনুবাদ করলাম না। দৈনিক পাকিস্তানের খবরটি ছাপা হলো না। আমি বার্তা সম্পাদক বরাবরে একটি চিঠি লিখলাম। চিঠিতে লিখলাম এই খবরটি রাত বারোটার পর এসেছে। টেবিলে আমি ব্যতীত কোনো সহ-সম্পাদক নেই। চাকরির শর্ত অনুযায়ী আমার অনুবাদ করার কথা নয়। তাই খবরটি আমি রেখে গেলাম। আমি জানি, এ খবরটি আদৌ সত্য নয়। তবুও এ খবরটি ছাপাবার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

পরের দিন আমার চাকরিতে তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। তখন ইউনিয়ন ছিল শক্তিশালী। মালিক বা সরকার ইচ্ছে করলেই যা কিছু করতে পারত না। আমার কথা হচ্ছে আমি সেদিন হাড়ে হাড়ে একজন আমলা মন্ত্রীকে চিনেছিলাম। যিনি এককালে সাংবাদিক ছিলেন। এদেশের ইতিহাসে সাংবাদিক হিসেবে তাঁর খ্যাতিও ছিল। এছাড়া কোনো সাংবাদিকের আমলা হওয়া বা কোনো সাংবাদিককে উচ্চপদের পেছনে ছুটতে আমি দেখিনি। দু'একজন যারা ভিন্ন পেশায় চলে গেছেন, তাদের মধ্যেই অনেকেই মৌলিক চরিত্র হারায়নি। নিজের পত্রিকায় পদোন্নতির প্রতিযোগিতা দেখেছি। কিন্তু পেশার বাইরে চাকরির জন্যে তেমন দৌড়-ঝাঁপ করতে দেখিনি। তাই আমার ধারণা ছিল হাসান হাফিজুর রহমান কিংবা তোয়াব খানের শূন্যপদে কোনো সাংবাদিক যোগ দিতে রাজি হবেন না। হলে আমরাই জিতে যাবো।

এ প্রশ্নটি আমি ভিন্নভাবেও দেখেছিলাম। তখন স্বাধীনতার পক্ষে ও বিপক্ষে প্রশ্নটি খুবই সামনে এসেছিল। এই বিতর্কে অনেককে চাকরি হারাতে হয়েছে। সে বিতর্কেও আমাদের জিতবার কথা ছিল। কারণ হাসান হাফিজুর রহমান ও তোয়াব খান স্বাধীনতার পক্ষের লোক ছিলেন। তোয়াব খান স্বাধীন বাংলা বেতারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাই ভেবেছিলাম এদের শূন্যপদে স্বাধীনতার পক্ষের কেউ আসবে না। কিন্তু আমার ভাবনা সত্যি হয়নি। আমাদের সাথে কোনো কথা না বলেই নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী দৈনিক বাংলার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন। তখন তথ্যমন্ত্রী ছিলেন

www.nagorikpathagar.com

মিজানুর রহমান চৌধুরী। শুনেছি পাটোয়ারী সাহেব তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তবুও একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি বিশ্বাস করতে চাইনি, শুধুমাত্র আত্মীয়তার সুবাদে কেউ এ ধরনের চাকরি গ্রহণ করতে পারে। অনেকে বলেন, পদটিও কম বড় কথা নয়। পাটোয়ারী সাহেব ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী বার্তা সম্পাদক। সেই চাকরির পরে একটি পত্রিকার সম্পাদক হওয়া কম কথা নয়। হয়তো সেই বিচারেই তিনি পদটি গ্রহণ করেছিলেন। হয়তো তিনি আমার মতো ভাবেননি। আমি ভেবেছিলাম হাসান হাফিজুর রহমান ও তোয়াব খানের পরিবর্তে কাউকে পাওয়া যাবে না। সুতরাং তাঁরাই থেকে যাচ্ছেন।

তবে আরো চমক ভাঙল আর একটি সংবাদে। এ সময় পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের একটি জনসভা হয়। এই জনসভায় দৈনিক বাংলার ঘটনার উল্লেখ করা হয়। সভায় যুবলীগ নেতা ফজলুল হক, শফি মান্নান বলেন, দৈনিক বাংলা থেকে দু'জন স্বাধীনতা বিরোধীকে অপসারণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। এ বক্তব্য আমাকে চমকে দিল। তাহলে স্বাধীনতার পক্ষের লোক কে? স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন সংজ্ঞা দেয়া হচ্ছে কি? এরা একেবারেই শুধুমাত্র নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে দাবি করতে চায়। তাহলে অন্যদের অবস্থান কী? একথা সত্য, হাসান হাফিজুর রহমান ও তোয়াব খান আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন না। আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন না বলেই কি তারা স্বাধীনতা বিরোধী? এ পরিস্থিতিতে পাটোয়ারী সাহেব এলেন দৈনিক বাংলায়। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আমি বিকেল বেলা গণভবনে গেলাম। প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা হচ্ছিল একটি সমস্যা নিয়ে। সেদিন দুপুরে এক ব্যক্তিকে রাজাকার বলে ধাওয়া করে পিটিয়ে হত্যা করা হয় মতিঝিলে। শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম এটা কোন পক্ষের ষড়যন্ত্র?

গণভবনে আমার অবারিত দ্বার। আমি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে চলে গেলাম। ঘটনাটি প্রধানমন্ত্রীকে বললাম। তিনি খাঁটি গোপালগঞ্জের ভাষায় কথা বললেন, আমি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি। রাজাকার, আলবদর, আল-শামসদের যেখানে পাবি মেরে ফেলবি। এদের ক্ষমা নেই।

আমি প্রথম চুপ হয়ে গেলাম। বললাম, আমি একটু কথা ঘুরিয়ে বলি। ধরুন, কামাল ও জামাল মতিঝিল দিয়ে যাচ্ছে। কেউ পেছন থেকে চিৎকার করছে, ওরা রাজাকার ওদের ধর এবং মার। অবস্থা এমন হলে আমিওতো রাজপথে বের হয়ে বাঁচাবো না।

প্রধানমন্ত্রী স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তার বাঁ হাত দিয়ে কপালের একটি পাশ চেপে ধরলেন। ফোন তুললেন, এই দেখিস, রাজাকার-ফাজাকার বলে কেউ

www.nagorikpathagar.com

যেন রাস্তায় কাউকে পিটিয়ে না মারে। আমি অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি বারবার এই মানুষটির কাছে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছি। এত সহজে কথা বলে কোনোকালে কোনো দেশে কেউ একজন প্রধানমন্ত্রীকে কথা শোনাতে পেরেছে বলে আমার জানা নেই। তিনি ফোন করেছিলেন হুইপ প্রধানকে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার অবস্থান তখন চরমভাবে বিতর্কিত। সকলেই জানে আমি রাজনীতি করি। শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। রাজনীতিতে এ দলটির অবস্থান বিরোধী শিবিরে। অবস্থান এমন যে সরকারি সন্ত্রাসীরা আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সিদ্দিকুর রহমানকে তার বাড়িতে হামলা চালিয়ে গুলিবিদ্ধ করেছে। পল্টন ময়দানে আমাদের জনসভা ভেঙে দিয়েছে। দেশের শিল্প এলাকায় চটকলগুলোয় আমাদের শ্রমিক ইউনিয়নগুলো শ্রমিক লীগ একের পর এক হাইজ্যাক করছে। আমাদের কেন্দ্রীয় অফিস তখন ১৬/ক বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে। হঠাৎ একদিন আর সবাইকে বাদ দিয়ে আমাদের এক মাসের মধ্যে বাড়ি ছাড়বার নোটিশ দেয়া হয়েছে। আমাদের শ্রমিক সংগঠন সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতিকে দিনেদুপুরে হাইজ্যাক করে শ্রমিক লীগের সভাপতি করা হয়েছে। তখন আমি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং জড়িয়ে পড়লাম দৈনিক বাংলা নিয়ে সরকারের সাথে সংঘর্ষে।

আমার বিরুদ্ধে প্রচার হচ্ছে আমার বাড়ি গোপালগঞ্জ। কৈশোরে টুঙ্গিপাড়া স্কুলের ছাত্র। আমাদের পরিবারের দীর্ঘদিন ধরেই টুঙ্গিপাড়ার শেখ পরিবারের সাথে সম্পর্ক আছে। এছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে নির্মল সেন হিন্দু হওয়ায় তার তো ভারতীয় এজেন্ট হওয়ার কথা। আওয়ামী লীগ ভারতীয় এজেন্ট সুতরাং নির্মল সেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কেন যাবে?

অপরদিকে সংবাদপত্র জগতেও আমাকে নিয়ে মতানৈক্য আছে। আমি ছাড়া আমার দলের একজন সদস্য তখন সংবাদপত্র জগতে নেই। অথচ পাকিস্তান আমল থেকেই প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচনে আমি কোনোদিন পরাজিত হইনি। প্রেস ক্লাবের নির্বাচনে একাধিকবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছি। সাংবাদিক ইউনিয়নের তখন নেতৃত্বে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি যাদের মনোনয়ন দিত তারাই সেকালের সাংবাদিক ইউনিয়ন ও প্রেসক্লাবে নির্বাচিত হতো। ভিন্নমতের রাজনীতিক হিসেবে আমিই একমাত্র একক দাঁড়িয়ে নির্বাচিত হতাম। এছাড়াও আরো দু'একজন নির্বাচিত হতেন, তবে তাঁদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয়

www.nagorikpathagar.com

ছিল না। ষাটের দশকের মাঝামাঝি কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয় রুশ ও চীনপন্থী হিসেবে। এ সময় থেকে প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে শুরু করে। এ সময়েও আমি এককভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি। আমার নাম কোনো প্যানেলেই থাকত না। তবে এক সময় রুশপন্থীরা আমাকে অপছন্দ করতে শুরু করে। কারণ আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে আমার মতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভুল পথ অনুসরণ করছে লেনিনের মৃত্যুর পর থেকে। আমরা বলতাম, স্টালিন সঠিক নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভুল করছে। ভিন্নভাবে হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের মত ও পথ নিয়ে কমিউনিস্ট বিশ্বের নতুন মতানৈক্য শুরু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির ২০ কংগ্রেসের পথ থেকে স্বাভাবিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমালোচনাকারীদের সাথে আমাদের মতের নৈকট্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেখানেও বিভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। দেখা গেল—যাঁরা স্ট্যালিনের সমালোচনায় নেমেছেন, তারা স্ট্যালিনের চেয়েও অনেক সংশোধনবাদী। ফলে এক নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি হলো। আমাদের মনে হলো অন্তত কিছু কিছু প্রশ্নে চীন কমিউনিস্ট পার্টির অনেক সমালোচনা সঠিক। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও মতানৈক্য সৃষ্টি হলো মাও সেতুং-এর শত ফুল ফুটতে দাও, উৎপাদন উল্লম্ফন এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়ে। অর্থাৎ রুশ বা চীন কোনো পন্থীদের সাথে কৌশলগত ব্যাপারেও আমি একমত হতে পারছি না। এ ঘটনা বিশেষভাবে ঘটেছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ। সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে সংবাদপত্রের জগতে। আমি সেই সংবাদপত্র শিল্পের একজন সদস্য।

সেকালের রাজনীতি আজকের মন নিয়ে তেমন করে বোঝা যায় না। আমার রাজনীতির একাকীত্বের একটি কারণ ছিল। কিন্তু ১৯৭২ ও ৭৩ সালে দেশের রাজনীতির আদৌ কোনো রূপরেখা কারো কাছে স্পষ্ট ছিল না। একটি কথা কোনো মহলই স্বীকার করতে চাইত না, আমাদের স্বাধীনতা স্বাভাবিকভাবে আসেনি। যারা নেতৃত্বের দাবিদার তারাও জানতেন না যে কী হতে যাচ্ছে বা হবে। এমনকি তাজউদ্দিনও জানতেন না শেখ সাহেবের সর্বশেষ কথা। অথচ এ নিয়ে কোনো দিন কোনো মহলে আলাপ করেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোন গ্রুপ ক্ষমতায় যাবে এটাই ছিল লক্ষ্য। তাই ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্যা মোকাবেলা না করে প্রথম থেকেই কোন্দল শুরু হলো আওয়ামী লীগে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনকে সরানো হলো লজ্জাজনকভাবে। তার কোনো ব্যাখ্যা আজো দেয়া হয়নি। সবচেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল

www.nagorikpathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের ব্যাখ্যা নিয়ে। এটা কি আদৌ মুক্তিযুদ্ধ ছিল? মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে হয়? কারা করে? এ মুক্তিযুদ্ধ কি শুধুমাত্র পাকিস্তান থেকে মুক্তি পাওয়া, না শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়ার যুদ্ধ। এ প্রশ্নে কেউ আলোচনা করলেন না। কেউ সঠিক ব্যাখ্যা দিলেন না। সকলে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে ৭১-এর যুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধ বলে ধরে নিয়ে নিজের ছক সাজাতে শুরু করলেন। কিন্তু ইতিহাস তো কারো নির্দেশে চলে না। কেউ নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে ব্যাখ্যা দিলেই আমাদের যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ হয়ে যায় না।

একথা সকলের জানা, শোষণমুক্তির আন্দোলন করতে হলে যারা শোষণ মুক্তির আদর্শে বিশ্বাস করে তারা নেতৃত্বে থাকে। তাদের দলীয় আদর্শ, ঘোষণাপত্র একটি শোষণমুক্ত সমাজের কথাই বলে। বলে সমাজ পরিবর্তনের কথা। কিন্তু ৭১-এর সংগ্রামের প্রধান দল আওয়ামী লীগ এমন কথা কখনো বলেনি। তাদের ঘোষণার সুর ছিল অবাঙালির প্রভুত্ব মানব না। বাঙালি বাঙালিকেই শাসন করবে। কীভাবে শাসন করবে সেটা পরের কথা অর্থাৎ সমাজ যেমন ছিল তেমন রেখেই বাংলার স্বাধীনতার কথা আওয়ামী লীগ বলেছিল। সেখানে শোষণমুক্তির কোনো কথা ছিল না এবং এ ধরনের যুদ্ধকে নির্দ্বিধায় পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংগ্রামকে অভিহিত করা যায়। এককালে যে ধরনের সংগ্রাম চলছিল ভারতের পাঞ্জাব থেকে শুরু করে নাগাল্যান্ড পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে। নাগাল্যান্ডের সংগ্রাম কোনো অর্থেই শোষণমুক্তির সংগ্রাম নয়। ১৯৭১ সালে আমাদের সংগ্রামও তেমন সংগ্রাম ছিল।

কিন্তু বিপদ দেখা দিলো সংগ্রাম শেষ হওয়ার পর। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করা ও শেষ করা এক কথা নয়। এ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন চেতনার জন্ম হয়েছে। নতুন আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। তেমনি একটি চেতনা ও আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়েছিল ১৯৭১ সালের সময়।

সেই সংগ্রামের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল একটি শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন। তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষে এই স্বপ্নকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই সংবিধানে সমাজতন্ত্র শব্দটি স্থান পেয়েছিল। স্বাধীন বাংলার সংবিধান দেখে মনে হতো সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্যেই ৭১-এর সংগ্রাম করা হয়েছিল। কিন্তু এটা ছিল রাজনীতিক মিথ্যাচার। ভারতের সহযোগিতায় এবং ভারতের সাথে গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করে আর যাই হোক সমাজতন্ত্র অভিমুখে সরকার বা সমাজ গঠন করা যায় না এবং এখান থেকেই শুরু হলো আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্কট। অর্থাৎ যা বিশ্বাস করি না তাকেই

www.nagorikpathagar.com

প্রতিপাদ্য হিসেবে ধরে সমাজ গঠনের চিন্তা আদৌ সম্ভব নয়। বলা হলো আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমরাই সমাজতন্ত্র করব। এই বক্তব্য থেকেই কর্মপন্থা প্রণীত হতে থাকল এবং বাস্তবের আঘাতে সব স্বপ্নই ভাঙতে থাকল বছর না ঘুরতেই।

মুক্তিযোদ্ধাদের দাবি হলো, মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি মিলিশিয়া গঠন করা হোক। কর্নেল তাহের জনগণের সামরিক বাহিনী গঠনের সুপারিশ করলেন এবং তিনিও তাঁর কথায় আচরণে তাঁর তত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টা করলেন। কিন্তু কেউই মনে রাখলেন না, আমাদের মূল সেনাবাহিনী ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক কাঠামোতে তৈরি। এদের মধ্যে মনন স্বপ্নের শোষণমুক্ত সমাজের মতো নয়। তাই লক্ষ করা গেলো, সামরিক বাহিনী আর মুক্তিযোদ্ধারা এক হতে পারলেন না।

মিলিশিয়া গঠন করতে গিয়ে মারামারি হলো পিলখানায়। সেই সংঘর্ষ ঠেকাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে পিলখানা যেতে হয়েছিল। বাদ দিতে হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মিলিশিয়া গঠনের কর্মসূচি। পরিবর্তে গঠিত হয়েছিল বিতর্কিত জাতীয় রক্ষীবাহিনী। আর এই রক্ষীবাহিনীভুক্ত ৮০ ভাগই ছিল মুজিববাহিনীভুক্ত মুক্তিযোদ্ধা।

সম্প্রতি আমার এ বক্তব্যের সমর্থন মিলেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতাদের কথায়। জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু লিখেছেন ৭ নভেম্বরের ঘটনা। তিনি লিখেছেন, জেনারেল জিয়া যতক্ষণ তাদের কব্জায় ছিল ততক্ষণ সাধারণ সৈনিকেরা বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা করেছে। আর জিয়া হাতছাড়া হয়ে যাবার পর তারা দুর্বল হয়ে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত জিয়াউর রহমানের নির্দেশেই তারা গ্রেফতার হয়। অর্থাৎ ৭ নভেম্বরের জাসদের ব্যর্থতা আরেকবার প্রমাণ করে ৭১-এর সংগ্রাম আদর্শের ভিত্তিতে কোনো শোষণমুক্তির সংগ্রাম ছিল না। আমাদের সেনাবাহিনীর সদস্যরা বাঙালি বলে বঞ্চিত হবার ক্ষোভে এবং দুঃখে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। এই ক্ষোভ ও বেদনা ছিল তাদের যুদ্ধে যোগদানের ভিত্তি। সমাজ পরিবর্তন বা সমাজতন্ত্রের কোনো কথাই তাদের মনে কখনো জাগেনি। তাই গণবিচ্ছিন্নভাবে তাদের দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রাম করতে যাওয়া হঠকারিতার সামিল এবং এই হঠকারিতার জন্ম হয়েছে ৭১-এর সংগ্রামকে মুক্তিসংগ্রাম হিসেবে ব্যাখ্যা করার জন্যে। এ ব্যাখ্যা যেমন সেকালের সরকারকে বিপর্যস্ত করেছে তেমনি বিপর্যস্ত করেছে বিরোধী শিবিরের এক শ্রেণির বামপন্থীদের।

www.nagorikpathagar.com

৭১-এর যুদ্ধ সম্পর্কে মূল্যায়ন কারো যে খুব স্পষ্ট ছিল না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই মূল্যায়ন নিয়ে বিভ্রান্তির প্রথম শিকার হয়েছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। সমাজতন্ত্র শব্দটি সংবিধানে বসানো হলো। তার কোনো প্রয়োগগত ব্যবস্থা থাকল না। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের বিধি বিধান লঙ্ঘন করা সম্পর্কে কারও কিছু বলার বা করার ঘোষণা ছিল না। সমাজতন্ত্র চাই। সমাজতন্ত্র পৌঁছবার জন্যে কী পথ অবলম্বন করতে হবে সে ব্যাপারে সংবিধানে কোনো নির্দেশনা থাকল না।

এই পটভূমিতে পাটকল, বস্ত্রকল, ব্যাংক, বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলো। এক শ্রেণির লোকের ধারণা হলো এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে। অথচ এ কথা আদৌ সত্য ছিল না। তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারকে বাধ্য হয়ে সে কালের পাটকল, বস্ত্রকল, ব্যাংক, বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হয়। এর কারণ হিসেবে ছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ মালিক পাকিস্তানের অধিবাসী। পাকিস্তানের সহযোগী দালাল। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল একান্তই রুগ্ন। এই মালিকানাবিহীন শিল্প কারখানা ও অন্যান্য সম্পত্তিগুলোকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলা হতো। সেই অর্থেই এই সম্পত্তি সরকারের হাতে নিতে হয়। এর একটা ভিন্ন দিকও ছিল। একাত্তরের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। কিন্তু আওয়ামী লীগ-এর সাথে শিল্প কারখানার কোনো সম্পর্ক ছিল না। মুখ্যত খুব নগণ্য সংখ্যক শিল্প কারখানার মালিক ছিল আওয়ামী লীগ। উৎপাদনের সাথে ক্ষমতাসীন সরকার আওয়ামী লীগ-এর তেমন সম্পর্কও ছিল না। ফলে এ ধরনের সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আওয়ামী লীগ-এর আপত্তি ছিল না। এর পরেও অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতাদেরই পরিত্যক্ত শিল্প কারখানা কিনবার মতো পুঁজিও ছিল না। আমার মতে, এটাই ছিল তৎকালে শিল্প কারখানা, ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণের প্রধান কারণ। কিন্তু সাধারণ মানুষকে ধারণা দেয়া হলো, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে এই কাজগুলো করা হয়েছে। সমাজতন্ত্র বিরোধীদের অপপ্রচারে সুবিধা হলো।

এই রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি চালাবার দায়িত্ব দেয়া হলো একেবারেই অনভিজ্ঞ আত্মীয়-স্বজন এবং দলীয় কর্মীদের। এদের প্রথম এবং শেষ দায়িত্ব হলো লুটেপুটে খাওয়া। এদের সহযোগী হয়েছিলেন সর্বকালের আমলা সম্প্রদায়। একটি হিসেব নিলে দেখা যাবে এই সকল সম্পত্তির যারা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই এখন ঢাকায় কোটি কোটি টাকার সম্পদ আছে। এর সুযোগ নিয়েছে এবং আরো সুযোগ নিচ্ছে সমাজতন্ত্রী বিরোধী মহল। তারা

www.nagorikpathagar.com

এখনো লিখছে বাংলাদেশের সকল সর্বনাশের কারণ সেকালের সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা। তাদের ভাষায় শ্রমিকরাই নাকি সবকিছু লুটপাট করেছে। ওই শিল্পগুলো ব্যক্তি মালিকানায় দিয়ে দেয়া হলে নাকি এমন হতো না।

এ পরিস্থিতিতে পরিষ্কার যে রাষ্ট্রায়ত্ত করার নামে তখন শিল্প এলাকায় এক ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। উৎপাদন বন্ধ হয়। একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে এটা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। সড়ক সেতু কল-কারখানা না থাকলে উৎপাদন বন্ধ হয়েছে। এই বাস্তবতা মেনে নেয়া হলে সেকালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা পণ্যের অভাবের একটি সহজ যুক্তি পাওয়া যেত। কিন্তু ঘটনা ঘটলো ভিন্নরকম। অথচ পাকিস্তান আমলে আমাদের টাকার মূল্য বেশি ছিল। অপরদিকে বিনা বাধায় ভারতীয় পণ্য আমাদের শূন্য বাজার দখল করে নিল এবং স্বাভাবিকভাবেই একটি ভারত বিরোধী মনোভাবের জন্ম নিল। কেউ বুঝতে চাইল না, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান ভাগ হয়েছিল। আমাদের ভারত বিরোধিতার উত্তরাধিকার একাত্তর এর বিশেষ পরিস্থিতিতে থেমেছিল। কিন্তু ন'মাসের সংগ্রামে সমাজের শত শত বছরের কালিমা মুক্ত হতে পারে না। এছাড়া আমাদের প্রতিপক্ষ বসে ছিল না। একাত্তরে আমরা সকলে স্বাধীনতা চাইনি। একটি বিরাট অংশ পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। সুতরাং সুযোগ পেলেই যে তারা মাথাচাড়া দেবে এ কথা কারো না বুঝবার কথা ছিল না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ছিল নির্বিকার। স্বাধীনতার পক্ষে বলে পরিচিত একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী মুর্খের মতো ভাবতে শুরু করলেন, দেশ পাকিস্তান মুক্ত হয়েছে। শুধু বাকি শোষণমুক্ত সমাজ গঠন। আমার নিজের ধারণা একাত্তরের সংগ্রামের চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ন না হওয়ায় এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র আমাদের দল শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল সংবিধান প্রণয়নকালে সংসদের সামনে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমাদের মিছিলের খবর পেয়ে সংসদ মুলতুবি হয়ে যায়।

সংবিধান প্রণয়নের পর ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসন দখল করেছিল। সে নির্বাচন কেমন হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমাদের দলের প্রার্থী কাজী হাতেম আলী নরসিংদী থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। টেলিভিশনে প্রথম দিকে কাজী হাতেম আলী এগিয়ে আছেন বলে বারবার ঘোষণা দেয়া হলো। তারপর এই ঘোষণা বন্ধ হয়ে যায়। পরের দিন ভোরে আমি গণভবনে যাই। প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম একান্ত সচিব নূরুল ইসলামের সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে জানান,

www.nagorikpathagar.com

আপনাদের এই বাচ্চা প্রার্থী কাজী হাতেম আলী সারারাত আমাদের জ্বালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রার্থী অর্থাৎ আওয়ামী লীগের মোসলে উদ্দিন ভূঁইয়াই জয়লাভ করেছে। আর একথা সকলেরই জানা, ওই নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী কাজী হাতেম আলী তেতাল্লিশ হাজার ভোট পেয়েছিল। আওয়ামী লীগ প্রার্থী পেয়েছিল ছত্রিশ হাজার। আর নির্বাচন কমিশনের ঘোষণায় বলা হয়েছিল আওয়ামী লীগ প্রার্থী তেতাল্লিশ হাজার ভোট পেয়েছে। কাজী হাতেম আলী পরাজিত হয়েছে সাত হাজার ভোটে। নরসিংদীতে যারা এই কাজটি করেছেন তারা আমাদের চেনা। পরবর্তীকালে এক সময় আমাদের সাথে তারা শ্রমিক রাজনীতি করত। শুনেছি এখন তারা জাতীয় পার্টিতে আছে। শুধু কাজী হাতেম আলী নয়, সেকালের জাসদ সভাপতি মেজর জলিলকে এমনিভাবে পরাজিত করা হয়েছিল বরিশালের উজিরপুর আসনে। জাসদের রশিদ ইঞ্জিনিয়ারকে হারিয়ে দাউদকান্দির আসনে খন্দকার মোশতাক আহমেদকে বিজয়ী করা হয়েছিল। এটাই ছিল সেকালের আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচনের চিত্র। তখন বিরোধীদল সংগঠিত ছিল না। ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি তখন সরকারের কাছাকাছি। বাদবাকি যারা আন্দোলন করার চেষ্টা করেছিল তারাও আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিরোধীদলকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা যে হয়নি তা নয়। কিন্তু বিরোধীদল বলতে তখন শুধুমাত্র কিছু বামপন্থী দল। মুসলিম লীগ থেকে জামায়াতে ইসলাম পর্যন্ত সকল মৌলবাদ দল নিষিদ্ধ। বামপন্থী দলের মধ্যে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ও মোজাফফর ন্যাপ মোটামুটিভাবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থক। বাদ বাকি আমাদের শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, ভাসানী ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি নামে পরিচিত আরো দু'একটি দল এবং অলি আহাদের জাতীয় লীগ। সবাইকে জড়ো করলেও তাদের শক্তি খুব বেশি নয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তখন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্ব। এ সময় তিনি রহস্যজনক ভূমিকা পালন করেন।

উপরিউক্ত দলগুলোকে নিয়ে ১৯৭৩ সালে নির্বাচনের পূর্বে একটি জোট গঠনের চেষ্টা করা হয়। স্থির হয় ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করা হবে। এ সময় মওলানা সাহেব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যান। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান হাসপাতালে মওলানা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করেন। মওলানা সাহেবের সাথে কী আলোচনা হয়েছিল তা আজো জানা যায়নি। তবে লক্ষণীয় যে মওলানা সাহেব আরোগ্য লাভ করলেন। হাসপাতাল ত্যাগ করলেন। নির্বাচন নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ঢালাও কারচুপির অভিযোগ করলেন। কিন্তু

www.nagorikpathagar.com

তিনি বিরোধীদলের কারো পক্ষে নির্বাচনের প্রচারে গেলেন না। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনে বিরোধীদলের পক্ষে তেমন জোর হাওয়াও ছিল না।

এর মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটে। ১৯৭২ সালের অক্টোবরে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জাসদ গঠিত হয়। জাসদ গঠনের ইতিহাস আজো আমার কাছে রহস্যাবৃত। এ নিয়ে আমি ইতিপূর্বে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। যারা জাসদ গঠন করলেন তাঁরা তৎকালীন ছাত্রলীগের সবচাইতে পোড় খাওয়া কর্মী। তাঁদের সাহস অতুলণীয়। হঠাৎ তাঁরা একদিন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিলেন এবং একটি দল গঠন করলেন; যে দল নিয়ে আদৌ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল একটি বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। এ সংগঠনের বহুদলীয় রাজনীতির কোনো সুযোগ নেই। এ দলের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিত্বেরই থাকার কথা। কিন্তু দেখা গেলো বহুদলীয় দলের ধাঁচে মেজর জলিলকে সভাপতি করে এ দলটি গঠিত হলো। মোটামুটিভাবে এদের সকলেই আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ থেকে এসেছে। এদের আচরণে একই ছাপ আছে। শুধু মুখে আছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা এবং এখানটাই তাদের আওয়ামী লীগের সাথে একমাত্র পার্থক্য। তবুও এ দলটি তাদের কর্মীদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের জন্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কাঁপন সৃষ্টি করেছিল। এদের রাজনীতির একটি বিশিষ্ট ধরন ছিল। এরা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই সরকারের প্রতি চরমপত্র দিত। মিছিল-সমাবেশ করত। ভাঙচুর হতো। এক ভাঙচুরের পরিবেশে আরেক প্রতিবাদ দিবসের ডাক দেয়া হতো। স্বাভাবিকভাবেই তারা রাজনীতির অঙ্গনে একটি বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবার পরিবেশ সৃষ্টি করল।

কিন্তু লক্ষ করা গেলো—নির্বাচনের প্রশ্নে তারা আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে রাজি হলো না। তারা ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেয়ার চেষ্টা করল। তাদের সেকালের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হতো নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করার জন্যেই তারা মাঠে নেমেছে। কারণ তখন নির্বাচনবিরোধী একটি মনোভাবের জন্ম হচ্ছিল। সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল যে অবাধ নির্বাচন হবে না। সুতরাং এ নির্বাচন করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু মুস্কিল হলো জাসদ নির্বাচনের মাঠে থাকলে নির্বাচন বর্জনের অবকাশ কোথায়? অপরদিকে তখন আওয়ামী লীগের মূল সংঘর্ষ হচ্ছিল জাসদের সাথে। জাসদের প্রার্থী হাইজ্যাক হচ্ছিল। আর জাসদ নেতৃবৃন্দ প্রতিদিনই হুমকি দিচ্ছিলেন, এ ধরনের আর একটি ঘটনা ঘটলে তারা হয়তো নির্বাচন করবে না। এ ধরনের বিবৃতি দিয়ে তারা নির্বাচনের পর্ব পার করে দিল। অন্য কেউই নির্বাচন সম্পর্কে চূড়ান্ত

www.nagorikpathagar.com

সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। এ সময় রাজনীতির অঙ্গনে সর্বহারা পার্টির নাম ডাক ছিল। একজন রহস্যময় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সিরাজ সিকদারের নামও সামনে আসছিল। সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি ১৯৭১-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে সেই অংশগ্রহণেরও ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। তখন পশ্চিমবঙ্গে চারু মজুমদার, জঙ্গল সাঁওতাল ও কানু সান্যালের নেতৃত্বে নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তার ছাপ পড়েছিল আমাদের দেশের অনেক বামপন্থী দলের ওপর। তার মধ্যে সর্বহারা পার্টি একটি। এক সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। সে মতানৈক্যের ছাপ বাংলাদেশেও পড়ে। সেকালে নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতাদের চীনপন্থী বলে পরিচিত ছিল এবং সেই সুবাদে আমাদের দেশে চীনপন্থী রাজনীতিকদের বিভিন্ন অংশ নিজেদের চেয়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনের অনুরূপ আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ফলে ৭১-এর সংগ্রামে তাদের মধ্যে কারো কারো বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকলেও নকশালবাড়ি আন্দোলনকে অনুকরণ করতে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা কখনোই সংশয় বিভ্রান্তিহীন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এই পটভূমিতে দেশ স্বাধীন হবার পর সর্বহারা পার্টি আত্মগোপন করেই রাজনৈতিক কর্মসূচি দিতে থাকে। তারা শ্রেণিশত্রু খতমের স্লোগান দিতে থাকে। অথচ সে স্লোগান তখন বিতর্কিত হয়ে গেছে খোদ পশ্চিমবঙ্গে। তবুও শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতি বেশ কিছু দিন হলেও তীব্র প্রভাব ফেলেছিল জনমনে।

মোটামুটিভাবে এটাই ছিল তৎকালীন স্বীকৃত বিরোধীদলগুলোর আন্দোলনের চিত্র। সব দল মিলিয়ে মওলানা ভাসানী ছিলেন বিরোধী আন্দোলনের নেতা। কিন্তু শেখ সাহেবের আমলে কোনোদিনই তার ভূমিকা খুব স্পষ্ট ছিল না। তবুও বিরোধীদলগুলো তাঁর দিকেই চেয়ে থাকত। এই পরিবেশে মওলানা ভাসানী ১৯৭৩ সালের মে মাসে আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। তিনি তখন ভাসানী ন্যাপের মতিঝিল অফিসে অবস্থান করছিলেন। ভাসানী অনশন শুরু করলেও সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করা হলো না। একদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ন্যাপ অফিসে গেলেন। মওলানা সাহেবকে অনুরোধ করলেন অনশন ভাঙতে। শেষ পর্যন্ত অনুরোধ করলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাবার জন্যে। কিন্তু মওলানা সাহেব রাজি হলেন না। তখন আমি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। গিয়াস কামাল চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক। আমরা কয়েকজন সাংবাদিক সঙ্গে নিয়ে মওলানা সাহেবের কাছে গেলাম। বললাম, আপনাকে

www.nagorikpathagar.com

হাসপাতালে যেতে হবে। মওলানা সাহেব বললেন, আমি সাংবাদিকদের কথায় কোনোদিন দ্বিমত করিনি। আমি অনশন ভাঙব না, হাসপাতালে যাব। মওলানা সাহেব হাসপাতালে চলে গেলেন।

মওলানা সাহেব হাসপাতালে গেলেন। মওলানা সাহেবের সমর্থনে হরতালের ডাক দেয়া হলো। হরতালের দিন ছিল শঙ্কা ও ভয়ের এক পরিবেশ। আজকের হাইকোর্টের সামনে শিক্ষাভবনের কাছ থেকে বাংলাদেশ বিমানের কর্মচারী নূর হোসেনকে অপহরণ করা হলো। নূর হোসেন আর ফিরে আসেনি। এ খবর শুনে আমি দৈনিক বাংলায় গেলাম। দেখলাম ইতিমধ্যে সরকার থেকে একটি নির্দেশ এসেছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, হরতাল সম্পর্কিত কোনো খবর যাবে না। তখন আজকের মতো পরিবেশ ছিল না। আজকের সরকারের আদেশ অমান্য করে কোনো কোনো খবর ছাপা যায়। কিন্তু সে সুবিধা তখন ছিল না। তখনো পাকিস্তান আমলের সংবাদপত্র সম্পর্কিত কালাকানুন বহাল আছে। তখন দেশের সকল বিজ্ঞাপনের মালিক সরকার। আর এছাড়া আছে সশস্ত্র ক্যাডার। অধিকাংশ পত্রিকা সরকারের ব্যবস্থাপনায় চলছে। তাই ইচ্ছা থাকলেও সাহস করে লেখা লোকের খুবই অভাব ছিল। আমাকে দৈনিক বাংলার সাংবাদিকরা ঘিরে ধরল। তারা বলল, একটা কিছু করতে হবে। আমি ভাবলাম আমার করার কী আছে। জরুরি ভিত্তিতে সে মুহূর্তে ইউনিয়নের সভা ডাকাও সম্ভব নয়। কোনো প্রস্তাব নিয়ে কার্যকর করাও কঠিন। আমি বন্ধুদের কথা দিলাম। ব্যক্তিগতভাবে হলেও আমি কিছু করব। ঝুঁকিটা আমিই নেব।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার কলামে আমি হরতাল নিয়ে লিখব। সেদিনই আমি লিখেছিলাম আমার বহু আলোচিত উপসম্পাদকীয়। যার শিরোনাম ছিল—হরতাল হয়েছে—হরতাল হয়নি। আমি চেষ্টা করেছি আমার লেখার মধ্য দিয়ে সরকারের নির্দেশ অমান্য করতে। আমি আমার লেখার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি হরতাল হয়েছে। যতটুকু হরতাল হয়েছে ততটুকু খবর দেয়ার অধিকার আমার আছে। আমি লিখতে পারব না যে আদৌ হরতাল হয়নি। সেদিন আমি লিখেছিলাম—রাজধানী ঢাকা শহরে বড় বড় সড়কে কোনো গাড়ি ছিল না। হরতাল হয়েছে। হরতাল হয়নি। আমি লিখেছিলাম সরকারি ও বেসরকারি দফতরে অসংখ্য কর্মচারী উপস্থিত হয়নি। আবার কেউ কেউ হাজির হয়েছে। হরতাল হয়েছে। হরতাল হয়নি। এ ছিল আমার এক ধরনের প্রতিবাদ। সরকারি নির্দেশের ফলে আমি যা দেখেছি তা লিখতে পারছিলাম না। এই মর্মান্তিক জ্বালার কথা আমি কোনোকালেও কাউকে

www.nagorikpathagar.com

বোঝাতে পারিনি। আজও পারছি না। আমি সাংবাদিক হিসেবে রাজপথে দেখে এলাম পুলিশের গুলিতে মানুষ মারা গেল। অফিসে এসে দেখলাম পত্রিকায় ছাপানো যাবে না যে কেউ পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। এ ঘটনার বিবরণ ছাপা যাচ্ছে না, তাও পত্রিকায় উল্লেখ করা যাবে না। অর্থাৎ সরকার বোঝাতে চাচ্ছে—এই মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের জন্যে সাংবাদিকরাই দায়ী। তাদের কোনো দায়িত্ব নেই।

এ এক মর্মান্তিক জ্বালা। কখনো সরকারি নির্দেশ, কখনো মালিকের নির্দেশ, কখনো সন্ত্রাসীর বা কখনো ঋণখেলাপীর হুমকিতে সাংবাদিকদের যে লেখার কথা তা লিখতে পারে না। বলতেও পারে না যে পত্রিকায় এই লেখালেখির ব্যাপারে তাদের ভূমিকা গৌণ। প্রকৃতপক্ষে তারা দায়ী নয়। কিন্তু কে শুনবে এ কথা।

এ পরিস্থিতিতেই আমাকে সেদিন এ উপসম্পাদকীয় লিখতে হয়েছিল। আজো সে কথা শুনতে হয়। অনেকে পরিহাস করেন। কিন্তু অনুধাবন করতে চেষ্টা করেন না আমার সেকালের অবস্থা। আমি নিজে জানি যে নূর হোসেন অপহৃত হয়েছে। সে আর ফিরে আসছে না। আমি জানি অনশনরত ভাসানীর জন্য হরতাল হয়েছে। কিন্তু সে কথা আমি লিখতে পারব না। আমি যে সরকারি নির্দেশে সেকথা লিখতে পারছি না—সে কথাও উল্লেখ করতে পারব না। তাহলে আমার কী করার ছিল?

তবে মওলানা ভাসানীর অনশন নিয়ে ঘটনার এখানেই শেষ নয়। তৎকালীন বিরোধীদলগুলো মওলানা সাহেবের অনশনকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এ দলগুলোর মধ্যে ছিল জাসদ, ভাসানী ন্যাপ, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। সবার সিদ্ধান্ত হয়েছিল ২২ মে বিকেলে এক সর্বদলীয় জনসভা ডাকা হবে। ২৯ মে থেকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে আন্দোলনের কর্মসূচির প্রশ্নে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- জাসদ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র একটি বিবৃতি দিতে সক্ষম হয়। তখন পল্টন ময়দানের জনসভা ডেকেছিল ভাসানী ন্যাপ। সেই জনসভাকেই সর্বদলীয় সভায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু সে জনসভা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা সে জনসভা পণ্ড করে দেয়। পরবর্তীকালে আমাদের অর্থাৎ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের পক্ষ থেকে একটি জনসভা আহ্বান করা হয়। সেকালে ঢাকার প্রায় সব হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নগুলো আমাদের সাথে ছিল। প্রতিদিন এদের নিয়ে গণ্ডগোল হতো। মিছিল হতো। এ সমস্যা নিয়েই আমরা

www.nagorikpathagar.com

পল্টনে জনসভা করতে চেয়েছিলাম। আওয়ামী লীগের সদস্যরা এই জনসভা ভেঙে দেয়।

প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল সেকালের ছবি। কোথাও ১৪৪ ধারা জারি নেই। কিন্তু সভা-সমাবেশ করার কোনো উপায় ছিল না। পত্র-পত্রিকা সরকারি দখলে ছিল। বেতার টেলিভিশনও একই অবস্থা। গণতন্ত্র ছিল সরকারি নেতাদের প্রতিশ্রুতিতে সীমাবদ্ধ। এই পরিবেশে মওলানা সাহেবের অনশনের সময় বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেয়া হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল জনসভার পরে মওলানা সাহেবের কাছে যাওয়া হবে এবং তাকে অনশন ভাঙবার অনুরোধ জানানো হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারোরই হাসপাতালে মওলানা সাহেবের সাথে দেখা করতে যাওয়া হয়নি। মওলানা সাহেব নিজ সিদ্ধান্তেই অনশন ভাঙেন।

এ হচ্ছে ১৯৭৩ সালের প্রথমদিকের কথা। মনে হচ্ছিল পরিবেশ যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে। দেশে হয়তো বা একটা অঘটন ঘটে যাবে। এমন সময় আমরা সাংবাদিক ইউনিয়নের জাতীয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি। পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানের একটি জাতীয় সাংবাদিক ইউনিয়ন ছিল। সে ইউনিয়নের নাম ছিল পাকিস্তান ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রশ্ন দেখা দিলো নতুন করে জাতীয় ভিত্তিতে সাংবাদিক ইউনিয়ন গঠন করা হবে কিনা। পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন কে জি মোস্তফা। সদস্য ছিলেন—পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে শহিদুল হক, ফজলুর রহমান ও তোয়াব খান। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম—জাতীয় ভিত্তিতে বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়ন গঠন করতে হবে। এ জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হলো। নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম হলো বাংলাদেশ সাংবাদিক ফেডারেশন। সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি হলেন কে জি মোস্তফা। সদস্য হলেন—তোয়াব খান, ফজলুর রহমান আতাউস সামাদ, গিয়াস কামাল চৌধুরী এবং আমি। কমিটির আহ্বায়ক হলেন—আতাউস সামাদ। শহীদুল হক তখন পাকিস্তানের থাকায় তাকে সদস্য করা গেলো না। ফজলুর রহমান সম্পর্কে আপত্তি এল। তিনি পাকিস্তান টাইমস-এর চট্টগ্রামের সংবাদদাতা ছিলেন। ৭১-এ যুদ্ধের সময় তার ভূমিকা স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে ছিল না। তাই তাকে বাদ দিতে হলো। তোয়াব খান চাকরি হারালেন দৈনিক বাংলার। প্রধানমন্ত্রী প্রেস সেক্রেটারি হয়ে গেলেন। তার সদস্যপদ থাকল না। আতাউস সামাদ বিএসএস-এর প্রতিনিধি হয়ে নয়াদিল্লি গেলেন। তিনিও সদস্য থাকলেন না। এবার আমি সংগঠনের

www.nagorikpathagar.com

আহ্বায়ক হলাম। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে সভা ডাকলে কেউ উপস্থিত হয় না। কোনো কোনো দিন আমি আর গিয়াস কামাল দু'জনে সভা করেছি। পরবর্তীকালে সকলের স্বাক্ষর নিয়েছি। আমাদের কোনো গণতন্ত্র ছিল না। আমরা পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রই অনুসরণ করতাম। এ পরিস্থিতিতে কে জি মোস্তফা জানালেন—তিনি পেশা পরিবর্তন করতে চান এবং তিনি লেবাননের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সাংবাদিক ফেডারেশনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের প্রথম বৈঠক কে জি মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানে ইউনিয়নের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) রাখার সিদ্ধান্ত হয়। প্রবীণ সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্তকে গঠনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি বিএফইউজের সভাপতি নির্বাচিত হলাম। গিয়াস কামাল সেক্রেটারি জেনারেল। সৈয়দ জাফর সহসাধারণ সম্পাদক। আব্দুর রাজ্জাক চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ। বিএফইউজে গঠনের পর প্রথম অধিবেশন হয় চট্টগ্রামে। সেই অধিবেশনে খসড়া গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। যদিও পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতার আলোকে একেবারে বেআইনিভাবে ওই গঠনতন্ত্র আমি বারবার সংশোধন করেছি এবং ওই গঠনতন্ত্র ছাপাতে শেষ পর্যন্ত পাঁচ বছর লেগেছে।

বিএফইউজে'র প্রথম অধিবেশনেই সরকারের প্রতি একটি চরমপত্র দেয়া হয়। তখন সংবাদপত্রের জগতে পাকিস্তান আমলের কালাকানুন বহাল ছিল। বিএফইউজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে ৩১ আগস্টের মধ্যে এই কালাকানুন বাতিল করা না হলে ১ সেপ্টেম্বর থেকে কোনো কাগজ বের হবে না। তখন সরকারের বিশ্বাস ছিল যে এ আইন বাতিল হবেই। কারণ পাকিস্তান আমলে এ আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হয়েছে। সে আন্দোলন সমর্থন করেছে আওয়ামী লীগ। সুতরাং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এই আইন বাতিল করবেই। এই আইন বাতিল নিয়ে তখন একটি ঘটনা ঘটে। ২৮ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সাংবাদিকতা বিভাগের নবীনবরণ উৎসব ছিল। এ অনুষ্ঠানের আমি ছিলাম বিশেষ অতিথি। প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শেখ আব্দুল আজিজ। টিএসসিতে অনুষ্ঠান হচ্ছিল। তথ্যমন্ত্রী আমার পরে কক্ষে ঢুকলেন। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, নির্মল বাবু, আপনি আমাকে গালি দিতে পারবেন না। আমি কালাকানুন বাতিল করে এসেছি। আমাকে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, কালাকানুন বাতিল না করে আজকের

www.nagorikpathagar.com

সভায় গেলে নির্মল সেন তোমাকে ধোলাই করবে। আগে কালাকানুন বাতিল করো, তারপরে অনুষ্ঠানে যাও। মন্ত্রীর কথা আমার ভালো লাগল। ভাবলাম ইউনিয়নের প্রথম বিজয় হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা হলো না। সকল মহলের দাবি ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাকে কথা বলতে হবে। আর বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রসঙ্গত একটি ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করলাম। উল্লেখিত ঘটনাটি হচ্ছে মাত্র একদিন আগে সরকারি এক প্রেসনোটে বলা হয়েছে—লৌহজং শান্ত। ভালো কথা। কিন্তু অশান্ত থাকার খবরটি আপনারা আমাদের ছাপাতে দেননি। আবার লৌহজং শান্ত থাকার খবর দিয়ে মানুষের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করা হয়েছে লৌহজংয়ের ঘটনা সম্পর্কে। অথচ এ ব্যাপারে আমাদের হাত-পা বাঁধা আমরা কিন্তু লিখতে পারছি না লৌহজং-এ কী ঘটেছিল। আমার যতদূর মনে আছে—লৌহজংয়ের খবরটি ছিল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে। কোন্দল তুঙ্গে ওঠায় সে খবর আসতে দেয়া হয়নি পত্রিকায়।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল—যুবলীগ নেতা মরহুম শেখ ফজলুল হক মনির একটি নির্দেশ নিয়ে। তখন ছাত্রলীগ ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে নূরে আলম সিদ্দিকী ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন। অপরদিকে আসম আব্দুর রব ও শাহজাহান সিরাজ। এ ব্যাপারে মনি ফোন করেছিলেন দৈনিক বাংলায়। তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন রব-সিরাজের খবর না দেয়ার জন্যে। সে প্রসঙ্গ টেনে আমি বললাম—পরিস্থিতি পাল্টে গেলে কেমন হবে? যদি রব-সিরাজ ক্ষমতায় যায় এবং বলে যে নূরে আলম সিদ্দিকী ও আব্দুল কুদ্দুস মাখনের সংবাদ যাবে না, তখন দৈনিক বাংলার সাংবাদিকরা কী করবে? সুতরাং এ ধরনের নির্দেশ দেয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আমার বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী শেখ আজিজ উত্তপ্ত হলেন। উত্তেজিত হয়ে সভা ছেড়ে যেতে চাইলেন। আমাকে থামতে হলো। পরে তিনি মাইকে এলেন এবং পুরো বক্তৃতাটাই দিলেন আমার বিরুদ্ধে। অপরদিকে সরকার প্রেস আইন বাতিল করলেও নতুন নামে আরেক কালাকানুন জারি করল।

কিন্তু বিপদ কাটল না। গণকণ্ঠের পর সমস্যা দেখা দিলো চট্টগ্রামের দৈনিক দেশবাংলা নিয়ে। একদিন দেশবাংলায় প্রথম পাতায় বড় হরফে লেখা হলো, যে কোনো মুহূর্তে রাঙামাটির পতন ঘটতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন। তিনি এক সময় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার প্রতিমন্ত্রী হন। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের একাত্তরের সংগ্রামের ভূমিকা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

www.nagorikpathagar.com

সমস্যাটি ভিন্নরূপ নেয় কিছুদিন পর। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পরে একটি নতুন স্লোগান শোনা যেতে থাকে। এই স্লোগানটি হচ্ছে মুসলিম বাংলা গঠনের। মাঝে মাঝে খবর আসত পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার থেকে। একটি ধারণা জন্মেছিল সত্যি সত্যি কে বা কারা মুসলিম বাংলা গঠনের চেষ্টা করছে। এ নিয়ে তখন খুব লেখালেখি হচ্ছিল। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল আমরা যখন তখন সরকারের বিরুদ্ধে লিখতাম। সরকারের একটি মহল তাদেরও মুসিলম বাংলা সমর্থক বলে অভিহিত করত।

এ ব্যাপারে আমার কাছে কিছু কিছু চিঠিপত্র আসত। চিঠিতে কোনো নাম, ঠিকানা থাকত না। চিঠি হুমকির ভাষায় লেখা হতো। একখানি চিঠি এসেছিল ঢাকায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী পালন নিয়ে। চিঠিতে বলা হয়েছিলে দেশে জাকজমক করে দুর্গা পূজা, সরস্বতী পূজা হচ্ছে। এবার হলো নেতাজী দিবস। দেশটাকে তো ভারতই বানিয়ে ফেলবেন। চিঠির নিচে লেখা থাকত, ইতি পলাতক রাজাকার ও আলবদর।

এ ধরনের চিঠি পেতে পেতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার তেমন কিছু মনে হতো না। অনেক সময় পলাতক আলবদররা তাদের দুঃখের কথা লিখত। অনেকে লিখতেন তাদের নাকি বিনা দোষে হয়রানি করা হচ্ছে। এসময় কিছু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকের কাছ থেকেও চিঠি পেতাম। আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে লিখছি বলে তারা অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করতেন। তাঁরা নাম ঠিকানা দিতেন। কিন্তু সেই ঠিকানায় তাদের কোনোদিন পাওয়া যেত না। আমার বরাবরের অভ্যাস ছিল ঠিকানা থাকলে পত্র লেখকদের চিঠি জবাব দেওয়ার। ঠিকানা না থাকলে বা আমার লেখা ফেরত এলে আমি পত্রিকার পাতায় সে চিঠির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করতাম। তারপরও আমাকে কম গালি শুনতে হতো না।

এই পরিবেশে মুসলিম বাংলার স্লোগান শুনেছি। অনেকই দায়ী করেছেন, কে বা কারা নাকি মুসলিম বাংলার সদস্যদের কক্সবাজার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। কেউ কেউ মুসলিম বাংলার পোস্টারের কথাও বলেছেন। কিন্তু আমার চোখে তেমন কোনো পোস্টার পড়েনি। আমার কাছে সব পরিস্থিতিটাই গোলামাল মনে হয়েছে। যারা পাকিস্তান চাননি তারা ষড়যন্ত্র করছে ঠিকই। কিন্তু সে ষড়যন্ত্র আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার সেই আবেগময় মুহূর্তে কোনো মহল ষড়যন্ত্র করে সফল হবে আমি তা কখনও ভাবিনি। বিদেশি রাষ্ট্রের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া ওই ধরনের ষড়যন্ত্র আদৌ সফল হবে বলে আমার কখনোও মনে হয়নি।

www.nagorikpathagar.com

কক্সবাজার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ষড়যন্ত্র হচ্ছে বা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এই সংবাদের প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি ভিন্ন অবস্থা ছিল। প্রশ্নটি বাংলাদেশের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। মুখ্য প্রশ্ন হচ্ছে বাংলা ভাষাভাষীদের স্বাধীনতা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের ঐক্য সূত্র কোথায়? যে ভাষাগত আবেগের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের সে ধরনের আবেগ থাকাইত স্বাভাবিক নয় কি? পাকিস্তান আমলে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা শহর রাঙ্গামাটিকে ডুবিয়ে দিয়ে লেক সৃষ্টি করা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল বিদ্যুৎ উৎপাদন। পাকিস্তান সরকারের সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোটি কোটি টাকার সম্পদ নিয়ে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে রাঙ্গামাটিকে। নগরের সাথে এলাকার মানুষের শত শত বছরের ঐতিহ্য ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। ছিন্ন হয়েছে অতীতের সাথে ঐতিহ্যের যোগসূত্র। সেই আবেগ মথিত এলাকায় কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি পাকিস্তান আমলে। কেউই বুঝতে চায়নি যে একটি ঐতিহাসিক শহরকে ডুবিয়ে দিয়ে তাদের উদ্বাস্তু অধিবাসীদের অন্যত্র পুনর্বাসিত করলেও আবেগের স্থানটি শূন্যই থেকে যায়। সেই শূন্যস্থান পূরণ সময়সাপেক্ষ। এছাড়া পাকিস্তান সরকার এই অসহায় মানুষগুলোকে পুনর্বাসিত করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের হাজার হাজার অধিবাসী সে সময় পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয় অনেক চোখের জলে। তাদের সেই চোখের জলের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করেনি কোনো বাঙালি। তাদের বাস্তুচ্যুত করে বাঙালিরা একটি লেক পেয়েছে। ওই লেকের জলে কাপ্তাইতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কাপ্তাই-এর বিদ্যুৎ বাংলাদেশকে আলোকিত করছে। কিন্তু আলোকিত করতে পারেনি পার্বত্য এলাকার মানুষকে। এই অনুভূতি ও ক্ষত বড্ড বাস্তব। এই ক্ষত না শুকাতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। যে স্বাধীনতা নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল সকল মহলে। এক শ্রেণির সরকারি মহল বাহাত্তর সাল থেকেই সন্দেহ করতে শুরু করেছিল যে পাহাড়িদের সাথে মিলছে না। মিলবে না। এখানে ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, এ পরিস্থিতি সঠিকভাবে কেউ অনুধাবন করার চেষ্টা করেনি। সকলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ষড়যন্ত্র জুজু দেখেছে। এক শ্রেণির সংবাদপত্রে উল্টাপাল্টা খবর ছাপা হয়েছে। মনে হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের সাথে আসছে না। আর এ সময় চট্টগ্রামের দৈনিক দেশবাংলার প্রথম পাতায় খবর হলো যে কোনো মুহূর্তে রাঙ্গামাটির পতন ঘটতে পারে। এ খবর প্রকাশের পর পত্রিকাটি নিষিদ্ধ হলো। বার্তা সম্পাদকসহ অসংখ্য সাংবাদিক কর্মচারি গ্রেফতার হয়ে গেল। আমরা অর্থাৎ সাংবাদিক ইউনিয়ন আরেক দফা

www.nagorikpathagar.com

বিপদে পড়ে গেলাম। অভিযোগ গুরুতর। এই সাংবাদিক কর্মচারীদের সহজে মুক্ত করা যাবে তা মনে হলো না। শুধুমাত্র ভরসা সেকালের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। আমার বিশ্বাস ছিল তাঁর কাছে কথা বললে হয়তো তাদের মুক্ত করা যাবে।

কিন্তু সহজে কাউকে মুক্ত করা গেল না। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেয়া হলো। বন্দিদের মুক্তি দাবি করা হলো। কিছু কিছু সাংবাদিক কর্মচারীদের মুক্তি দেয়া হলেও বার্তা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তীকে জেলেই থাকতে হলো। এ পরিস্থিতিতে আমি গিয়াস কামাল চৌধুরী পুরাতন গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে গেলাম। তিনি আমাদের দেখে হেসে ফেললেন। বললেন, জানি আপনারা কেন এসেছেন। পৃথিবীর কোনো সরকার এ পরিস্থিতিতে কাউকে জামিনে মুক্তি দেয় না। আমি জামিনের ব্যবস্থা করব। তবে নির্মল সেনের ভাষার পরিবর্তন করতে হবে। তিনি সব ব্যাপারেই ডিমান্ড অর্থাৎ দাবি করেন। কোনো বিবৃতিতেই সরকারের কাছে আবেদন জানান না। এবার আবেদন অর্থাৎ আপিল করতে হবে। আপিল না করলে আমি মৃণালকে মুক্তি দেব না। আমি হেসে বললাম, শুধু একটি শব্দের জন্যে মৃণাল জেলে থাকবে? প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমি প্রধানমন্ত্রী হলেও মানুষ। সেন্টিমেন্ট আছে। আপনাকে বিবৃতি দিতে হবে। বলতে হবে আমি প্রধানন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি। তাহলেই সে মুক্তি পাবে। অন্যথায় নয়।

আমি বললাম, ঠিক আছে। আমি একটি সমঝোতার সূত্র দিচ্ছি। সূত্র হচ্ছে সাংবাদিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি বলা হবে—সাংবাদিক ইউনিয়ন চট্টগ্রামের দেশবাংলার বার্তা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তীর মুক্তি দাবি করছে। মৃণাল চক্রবর্তীর পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর মুক্তির জন্যে আবেদন জানানো হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী হেসে ফেললেন। তাঁর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদকে ডাকলেন। বললেন, চট্টগ্রামের ডিসিকে ফোন করে দাও, মৃণালকে যেন ছেড়ে দেয়। আর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন মুক্তি পেয়ে মৃণালকে ঢাকায় আসতে বলবেন। সে যেন আমার সাথে দেখা করে।

মৃণাল চক্রবর্তী মুক্তি পান। তাঁকে নিয়ে পুরানো গণভবনে গেলাম। শেখ সাহেব মৃণাল চক্রবর্তীকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, জেলে বড্ড কষ্ট, আমি জানি। তোর বাবা মাকে বলবি আমার কোনো দোষ নেই। নির্মল সেন ডিমান্ড না করলে তুই অনেক আগেই মুক্তি পেতি। আমি জেলে ছিলাম। আমি

www.nagorikpathagar.com

জেলের কষ্ট বুঝি। তারপর তিনি তার অন্যতম সচিব মোহাম্মদ হানিফকে ডাকলেন। বললেন, মৃণাল চক্রবর্তীকে কিছু টাকা দিয়ে দিতে। আমি তখন দর্শক মাত্র।

কিন্তু সেকালে পত্রিকার সমস্যাই মুখ্য সমস্যা ছিল না। মূল সমস্যা ছিল রাজনীতির। এক অদ্ভুত অস্থিরতা বিরাজ করছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে এটাই ছিল স্বাভাবিক। তবু আমাকে বিব্রত করল সেকালের অনেক সমস্যা। অনেক সমস্যা আমার বোধগম্য হতো না। আমার কাছে প্রথম এবং প্রধান সমস্যা মনে হতো সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা নিয়ে। লক্ষ্য করেছি যে মানুষটি ১৯৭০ সালে আমার কাছে আসত, আমাকে তার বাসায় নিয়ে যেত। বলত—আমি ঢাকা শহরে একটি হোটেল দেবো। ওই হোটেলের নাম হবে বাঙালি। ওই হোটেলে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী শত রকমের খাবার রান্না হবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখলাম মানুষটিকে সবাই রাজাকার বলছে। সেই মানুষটি কারাগারে যাচ্ছে। অপরাধ তিনি দু'টি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করেছিলেন। তাতে যাচ্ছেতাই আওয়ামী লীগ সরকারকে সমালোচনা করা হতো। আমারও মনে হতো এ ধরনের সমালোচনা সাংবাদিকতার নীতিমালা পরিপন্থী। অনেকদিন সে কথা কাউকে বলিনি। আজ তা বলছি। ভদ্রলোকের নাম ফয়জুর রহমান। যতটুকু মনে আছে তার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ছাত্রজীবনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সদস্য ছিলেন।

এ রাজনীতির একটি ভিন্ন ইতিহাস আছে। ১৯৫৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ থেকে মুসলিম শব্দটি তুলে দেয়া হয়। ছাত্রলীগের একটি অংশ এর বিরোধিতা করে। তাদের মধ্যে ছিলেন আজকের আইনজীবীদের অন্যতম নেতা শামসুল হক চৌধুরী। এদের অফিস ছিল ৯০ মোগলটুলি আর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের অফিস ছিল ১৫৭ নবাবপুর রোড। এই ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন কামারুজ্জামান (শিক্ষক নেতা) আবদুল ওয়াদুদ পাটোয়ারী এবং পরবর্তীকালে আবদুল মোমিন তালুকদার, এমএ আউয়াল।

যারা শামসুল হক চৌধুরীর সাথে থেকে যান তাঁদের সাথে ছিলেন ফয়জুর রহমান সাহেব। যতদুর মনে আছে তিনি সরকারি চাকরি করতেন। যে কোনো উপায়েই হোক ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা প্রকল্প (ডিএনডি) এলাকায় কিছু জমি নিয়ে তিনি একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। এ বাড়ির নাম ছিল খামারবাড়ি। সেকালে ডিএনডি এলাকায় বসতবাড়ি করার কোনো অনুমতি দেয়া হতো না। পরিকল্পনা ছিল এটা হবে ঢাকার পার্শ্ববর্তী সবুজ বলয়। এ সবুজ বলয় থেকে ঢাকা শহরে শাকসবজি আসবে। সে পরিকল্পনা কিভাবে যে ভেস্তে গেল তা

www.nagorikpathagar.com

আজো আমি জানি না। আজ এই এলাকায় জমির দাম আকাশ ছোঁয়া। এর প্রতিযোগিতা আকাশছোঁয়া।

ফয়জুর রহমান সাহেব কী করে ওখানে সেকালে জমি পেয়েছিলেন আমার কাছে আদৌ স্পষ্ট নয়। তার এই খামারবাড়িতে আমাকে তিনি একদিন আমন্ত্রণ জানালেন। সাথে আর এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনিও এখন লোকান্তরিত। ফয়জুর রহমান প্রস্তাব দিলেন—বাংলাদেশ স্বাধীন করতে হবে—তিনি সেই লক্ষ্যে সরকারি চাকরি ছেড়ে দেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করতে যাচ্ছেন। তখন একাধিক ব্যক্তি এবং গ্রুপ আমাদের কাছে আসত। যখন আমরা ছিলাম চটকল শিল্প এলাকায় একচ্ছত্র নেতা তখন শিল্পের অর্থই ছিল মূলত চটকল। তবুও আমি অবাক হলাম এর কথায়। ভাবলাম আমাদের পরীক্ষা করছে না তো? জানতে চাচ্ছে না তো আমাদের মনোভাব। আমরা বললাম—আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করতে রাজি। কিন্তু আগে বলতে হবে—এটা কোন বাংলাদেশ হবে। আর একটি পাকিস্তান হবে না তো? সবকিছুই একই থাকবে—আর পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে বাংলাদেশ নাম হবে—এ ধরনের সংগ্রামের জন্য জান দিতে রাজি নই। ফলে আমাদের সমালোচনা জমল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে তার সাথে কোনোদিন আমার আর দেখা হয়নি। শুধু মনে গেঁথে গিয়েছিল, তার ওই প্রস্তাব। প্রস্তাব হচ্ছে একটি খাঁটি বাঙালি হোটেল খোলার প্রস্তাব। দেশ স্বাধীন হলো। তিনি হোটেল খুললেন না। মুখপাত্র এবং স্পোকসম্যান নামে দু'টি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন। পত্রিকা দু'টি বাজারে কাটছে। একদিন তার পত্রিকায় শিরোনাম হলো—'আমি যদি গ্রেফতার হয়ে যাই।' শিরোনাম পড়ে অবাক হলাম। একদিকে গণকণ্ঠ। মওলানা ভাসানীর হক কথায় যেমন খুশি তেমন লিখছেন। অপরদিকে এ ধরনের পত্রিকার অজুহাত দিয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টায় আমরা চিড়েচ্যাপ্টা। বুঝতে পারছি না মওলানা সাহেবই বা কী চাচ্ছেন এবং করছেন—তিনি শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে কোনো চূড়ান্ত আন্দোলনে যাবেন না। তা খুবই স্পষ্ট। অপরদিকে সর্বহারা পার্টির হরতাল সমর্থন করছেন। এ পরিস্থিতিতে সত্যি সত্যি কেনো রাজনীতিই বোধগম্য হচ্ছিল না। সরকার সবকিছুর মধ্যে ষড়যন্ত্র দেখছেন। আর অন্য সকলে ভাবছে বাংলাদেশ ভারতের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

বিতর্ক তুঙ্গে উঠল সচিবালয়ে। প্রধান বিবেচ্য ১৯৭১ সালে সরকারি কর্মচারিদের ভূমিকা। আমি দৈনিক বাংলায় লিখলাম আর ওপার-এপার সেপার তিন মিলে এই স্পর্শ। বিতর্ক হচ্ছে ১৯৭১ সালে কারা সংগ্রামে ছিল।

www.nagorikpathagar.com

কোলকাতায় মুজিবনগর সরকারের যারা কর্মচারী ছিলেন তাঁরা দেশে ফিরে যেন কেউকেটা হয়ে গেলেন। তারা চেষ্টা করলেন ভালো ভালো পদ দখল করতে। যাঁরা দেশে ছিলেন তাঁরা বলেন, আমরা কম কিসে? আমরা বন্দুকের সামনে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছি। আমাদের জীবন ছিল প্রতিমুহূর্তে হাতের মুঠোয়। সেপার অর্থাৎ যারা পাকিস্তান ছিলেন—তাঁদের কথা হচ্ছে আমরা আসতে পারিনি—এ জন্য আমরা দায়ী হবো কেন। আমরা পাকিস্তানে বদ্ধ জীবনযাপন করেছি। আমরা কম ভুগিনি। তাই আমাদের দোষী করা হবে কেন?

আমার মনে হয় সরকারি কর্মচারিদের সে বিতর্ক আজো শেষ হয়নি। এখন সংগ্রাম চলছে পদোন্নতি নিয়ে। সচিবালয়ে কোনো কাজ হোক বা না হোক, এ বিতর্কের শেষ নেই।

আর এ পরিস্থিতিতে সবচে' বিপদে পড়ল সাংবাদিকরা। এ বিপদ সাংবাদিকদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। সকলেরই ধারণা ছিল সব ব্যাপারেই সাংবাদিকরা কথা বলবে। এ ঘটনার শুরু পাকিস্তান আমলে। পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক শূন্যতার জন্যে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের অনেক সময় রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। মানুষ তাকিয়ে থেকেছে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের দিকে। আর সে যুগে রাজনীতিতে এটি সাধারণ ঐকমত্য ছিল। সে ঐকমত্যের ভিত্তি ছিল বাঙালির স্বার্থের প্রশ্নে। এ স্বার্থের প্রশ্নে পত্রিকাগুলোর এবং সাংবাদিকদের মোটামুটি এক সুর ছিল। মানুষ তৎকালীন সংবাদপত্রে একটি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ইঙ্গিত পেতো। দেশ স্বাধীন হবার পর পত্রিকার সে ভূমিকা থাকার কথা নয়, তা বলাই বাহুল্য। অপরদিকে অধিকাংশ পত্রিকার মালিকই তখন সরকার। তাই আমাদের করার তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু সাংবাদিকদের এ সমস্যা কাকে বোঝানো যাবে। তাই সকল ব্যাপারেই আমাদের জড়িয়ে পড়তে হতো। আর অপরদিকে সাংবাদিকরা এখন নিজেদের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। মনে হতো দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধের নামে সকলেই স্বাধীন। বাড়ি দখল, গাড়ি দখলের মতো অনেক সংবাদপত্র দখল করলেন। কেউ আবার এসএলআর কাঁধে ঝুলিয়ে সংবাদপত্র অফিসে এসে নির্দেশ দিত। সে নির্দেশ পালন করা না হলে জীবন বাঁচা মুশকিল। ফলে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল, দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে। সে স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ নেই। একথা বলার অবকাশ নেই।

এ সময়ে সাংবাদিকদের একটি নিজস্ব আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে হয়। এই আন্দোলন ছিল তাদের বেতন ভাতা নির্ধারণের। পাকিস্তান আমলে

www.nagorikpathagar.com

সাংবাদিকদের বেতন ভাতা নির্ধারণের। পাকিস্তান আমলে সাংবাদিকদের বেতন ভাতা নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৬০ সালে। বেতন ভাতা নির্ধারণ করেছিল সাংবাদিক বেতন বোর্ড। বলা হয়েছিল ১৯৬৫ সালে ষাট বছর কেটে গেলে সাংবাদিকদের জন্যে দ্বিতীয় বেতন বোর্ড গঠন করতে হবে। নতুন করে বেতন ভাতা নির্ধারণ করতে হবে। পাকিস্তান আমলে বেতন বোর্ড গঠনের জন্যে আন্দোলন হয়। পাকিস্তান সরকার দ্বিতীয় বেতন বোর্ড গঠন করেছিল। কিন্তু বেতন বোর্ড রোয়েদাদ ঘোষণা করার পূর্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। ফলে নতুন করে বেতন বোর্ড গঠনের প্রশ্ন দেখা দেয় এবং দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে।

সাংবাদিকতা পেশায় বারবারই একটি প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্নটি হচ্ছে প্রুফ রিডাররা সাংবাদিক হলো কী করে। প্রথম বেতন বোর্ডের সংজ্ঞায় এরা তো সাংবাদিক হতে পারে না। এ প্রশ্নটি বিতর্কিত। পাকিস্তান আমলে এ প্রশ্নের সুরাহা হয়নি। সেকালের পূর্ব পাকিস্তানে এ প্রশ্নের একটি সমাধান হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে হয়নি।

ষাটের দশকে প্রথম দিকে আমি জেলে ছিলাম। ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক হিসেবে জেলে গিয়েছিলাম রাজনৈতিক কারণে। তখন ইউনিয়নের নেতা ছিলেন সালাউদ্দিন মোহাম্মদ। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মোজাম্মেল হক। তাদের সময় প্রুফ রিডারদের সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য পদ দেয়া হয়। সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার সুবাদে প্রুফ রিডাররা সাংবাদিক হয়ে যায়। অনেকে বলেন, নির্বাচনে জিতবার জন্যে প্রুফ রিডারদের ইউনিয়নের সদস্যপদ দেয়া হয়েছিল। সে বিতর্কে আমি যাব না। কারণ সবকিছুর দায়-দায়িত্ব আমার পূর্বসূরিদের। তবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এই সিদ্ধান্ত সহজে গ্রহণযোগ্য হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা যায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানে একটি ভিন্ন সমস্যা ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ সংবাদপত্রের ভাষা হচ্ছে উর্দু। উর্দু পত্রিকায় প্রুফ রিডার নেই। আছে ক্যালিওগ্রাফিস্ট। প্রুফ রিডার ও ক্যালিওগ্রাফিস্ট সমার্থক নয়। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিক পূর্ব পাকিস্তানের এ প্রস্তাব মেনে নিলো না। একটি অসঙ্গতি থেকেই গেলো। অর্থাৎ পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নে দু'ধরনের সদস্য থেকে গেলো। পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের অনুমোদিত শাখা হলেও দু'ইউনিয়নের সদস্য পদের বিভিন্নতা ছিল। অবিভক্ত পাকিস্তানের সাংবাদিক ইউনিয়নের শেষ সম্মেলনে এ ব্যাপারে আমি একটি প্রস্তাব তুলেছিলাম।

www.nagorikpathagar.com

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো ১৯৮৮ সালে ইসলামাবাদে। আমি প্রস্তাব তুলেছিলাম—এ সম্মেলনে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রুফ রিডার ও ক্যালিওগ্রাফিস্টদের সদস্য পদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হোক। প্রস্তাব তুলবার সাথে সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিকরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। আমি জানালাম—আমার প্রস্তাবের সমর্থক খোন্দকার গোলাম মুস্তফা—অর্থাৎ কে জি মুস্তফা। তখন কেজি মুস্তফা ছিলেন সাংবাদিকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। তিনি আমাকে সমর্থন করায় প্রস্তাব উত্থাপন করা গেলো। সিদ্ধান্ত হলো পরবর্তী সম্মেলনে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। অর্থাৎ যা ছিল তা-ই থেকে গেল। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ধরনের এবং পূর্ব পাকিস্তানে অন্য ধরনের সদস্যই থেকে গেল। এ পরিস্থিতিতেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বাংলাদেশের জন্মের পূর্বে প্রুফ রিডার ও ক্যালিওগ্রাফিস্টরা সাংবাদিক হিসেবে পরিগণিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে দৈনিক পাঁসবান নামে একটি মাত্র উর্দু দৈনিক ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই দৈনিকটি বন্ধ হয়ে যায়। সেই দৈনিকের ভবনই পরে বাংলার বাণী ভবন নামে পরিচিত। আমার বক্তব্য হচ্ছে প্রুফ রিডারদের সাংবাদিক হিসেবে গ্রহণ করা উচিত কি অনুচিত সে বিতর্ক আমাদের ক্ষেত্রে পাকিস্তান আমলেই শেষ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আমার কোনো দায়িত্ব ছিল না।

সাংবাদিক পেশায় দ্বিতীয় বিতর্ক হচ্ছে—সাংবাদিক বেতন বোর্ডের পরিবর্তে সংবাদপত্র কর্মচারীদের বেতন বোর্ড গঠন। এ ব্যাপারে আমার কোনো ভূমিকা ছিল না তা সত্য নয়। আমি যতদূর জানি অন্য কোনো দেশে এ ধরনের বেতন বোর্ড নেই। সংবাদপত্র কর্মচারীদের জন্য বেতনের ভিন্ন ভিন্ন সুপারিশ আছে। কিন্তু সাংবাদিকদের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে নয়। প্রেস শ্রমিক ও সাধারণ কর্মচারীদের বেতন ভাতার প্রশ্ন এসেছে সাংবাদিকদের পরবর্তীতে। একটির সাথে অপরটির কোনো সম্পর্ক নেই। আজকের পাকিস্তানেও নেই। কিন্তু বাংলাদেশে এমন কেন হলো?

আমি আগেই বলেছি সাংবাদিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে এক সময় আমাদের বিপাকে পড়তে হয়েছিল। প্রেস শ্রমিক এবং সাধারণ কর্মচারীরা আমাদের আন্দোলনে অসহযোগিতা করতে থাকে। এ পটভূমিতে আমাদের পূর্বসূরিরা কথা দিয়েছিল, প্রেস শ্রমিক ও সাধারণ কর্মচারীদের বেতন বোর্ড গঠনের আন্দোলন হলে আমরা সহযোগিতা করবো। এ প্রশ্নটি সামনে আসে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। আমি তখন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। তখন পরিস্থিতিও পরিবর্তিত। অধিকাংশ পত্রিকা সরকারি

www.nagorikpathagar.com

পরচালনায় এবং আমার মনে হচ্ছিল—এক সময় সব পত্রিকার মালিক সরকারই হবে। এ সময় প্রেস শ্রমিক ফেডারেশনের একটি সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে তারা প্রেস শ্রমিকদের জন্যে প্রথম বেতন বোর্ড গঠনের দাবি জানায়।

সাংবাদিকদের প্রথম বোর্ড গঠিত হয়েছিল ১৯৬০ সালে। সাংবাদিকদের আন্দোলন ছিল দ্বিতীয় বেতন বোর্ড গঠনের। প্রেস শ্রমিকদের সম্মেলনে আমি প্রধান অতিথি ছিলাম। আমি তাদের বললাম, বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন সফল হবে না। আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। পরবর্তীকালে সংবাদপত্রের সাধারণ কর্মচারীদের সাথেও আলাপ হলো। সাংবাদিক ইউনিয়নের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়, সংবাদপত্রের সকল কর্মচারীর জন্য একটি বেতন বোর্ড গঠিত হবে। এই বেতন বোর্ডের সুপারিশ ভিন্ন ভিন্ন পূর্ব থাকবে এবং ভিন্নভাবে নির্ধারিত হবে সাংবাদিক প্রেস শ্রমিক ও সাধারণ কর্মচারীর বেতন ভাতা। তখন কোনো মহলেই এর প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়নি। এই প্রস্তাব নিয়ে আমরা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মজিবুর রহমানের সাথে দেখা করলাম। তিনি একমত হলেন না। তিনি বললেন, অন্যান্য প্রেসের কর্মচারীদের সাথে সংবাদপত্রের প্রেসের কর্মচারীদের কোনো মৌলিক তফাৎ নেই। সাধারণ কর্মচারী অর্থাৎ ম্যানেজার কেরানি বা টাইপিস্টেরও তফাৎ নেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর সাথে। সুতরাং তারা সাংবাদিকদের বেতন বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে কী করে। তিনি প্রস্তাব দিলেন সাংবাদিকদের সরকারি কর্মচারীদের জন্যে নির্ধারিত বেতন কাঠামো মেনে নিতে। তখন রব কমিশনের রিপোর্ট বের হয়েছে। রিপোর্টে সরকারি কর্মচারীদের জন্যে দশটি গ্রেড নির্ধারিত হয়েছে। শেখ সাহেব বললেন, সাংবাদিকরা এই দশ গ্রেডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজস্ব অবস্থান নির্ণয় করে নিক। তাদের জন্য নতুন বেতন বোর্ড করার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমি রাজি হলাম না। আমাদের যুক্তি সাংবাদিকতা ও সরকারি কর্মচারীদের পেশা এক নয়। তারা একই ধরনের কাজ করে না। তাদের সামাজিক অবস্থানও এক নয়। এই যুক্তির ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের জন্যে ভিন্ন বেতন বোর্ড গঠিত হয়। পাকিস্তানেও তাই ছিল। বাংলাদেশেও তাই হবে। এ ব্যাপারে আমাদের নতুন কিছু বলার নেই। শেখ সাহেব রাজি হলেন। আমি জানতাম তাঁকে রাজি হতে হবে। সাংবাদিকদের ব্যাপারে তিনি কোনোদিনই খুব কঠোর ছিলেন না। আর বেশিক্ষণ আমাদের সাথে বিতর্কেও যেতেন না। সুতরাং ১৯৭৪ সালে সংবাদপত্র কর্মচারীদের জন্যে বেতন বোর্ড গঠিত হলো। শেখ সাহেব বলেছিলেন, এ বেতন বোর্ড

www.nagorikpathagar.com

কার্যকর হতে বিলম্ব হবে। আপনারা কিন্তু ঠকবেন। আজ আমার মনে হচ্ছে শেখ সাহেবের কথা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারিনি। তখনো বুঝতে পারিনি, একদিন দেশের সমস্ত পত্রিকা বন্ধ করে মাত্র চারটি পত্রিকা রাখা হবে। দেশের সব দল ভেঙে দিয়ে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে। সব পত্রিকায়ই হবে সরকারি পত্রিকা এবং সরকারের মুখপাত্র। সাংবাদিকরা হবে সরকারি কর্মচারী এবং সে ঘটনা ঘটল সংবাদপত্র কর্মচারীদের জন্য বেতন বোর্ড গঠনের এক বছরের মধ্যেই।

জাতীয় সংসদে সংবাদপত্র কর্মচারী বেতন বোর্ড উপস্থাপিত হলো এবং গৃহীত হলো। তখন আমি কোনো সাংবাদিককে অখুশি হতে দেখিনি। কেউ টুঁ-শব্দটি করেননি। কেউ কোনো প্রশ্নও তোলেননি। সকলেই খুশি হয়েছিলেন। সকলের কাছে মনে হয়েছিল একটা বিজয়।

প্রশ্ন উঠেছিল বেতন বোর্ডের চেয়ারম্যান কে হবেন? পাকিস্তান আমলে চেয়ারম্যান ছিলেন একজন বিচারপতি। তাই একজন বিচারপতির অনুসন্ধান করা হলো। তখন বিচারপতি আবদুস সাত্তার পাকিস্তান থেকে ফিরেছেন। তিনি পাকিস্তান আমলের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন। একাত্তরের যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে আটকা পড়ে যান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আফগানিস্তান হয়ে দেশে ফিরে আসেন। তখন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তাহের উদ্দিন ঠাকুর। তিনি প্রস্তাব দিলেন সাত্তার সাহেবকে চেয়ারম্যান করা হোক। এ ব্যাপারে আলোচনা হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। তিনি অনুমোদন করলেন। কিন্তু আবদুস সাত্তার সাহেব চেয়ারম্যান হলেও সেই বেতন বোর্ড কাজে আসেনি। তখন বুঝতে পারেনি, আওয়ামী লীগ সরকার আদৌ ওই বেতন বোর্ড কার্যকর করবে না। তাদের লক্ষ্য ছিল একদলীয় শাসন চালু করা। একদলীয় সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের সরকারি কর্মচারীতে পরিণত করা। এ পরিস্থিতি বুঝতে আমার দীর্ঘদিন লেগেছিল।

আজ অকপটে বলতে পারি, সেকালের রাজনীতি আমার কাছে পরিষ্কার ছিল না। পরিষ্কার ছিল না একটি প্রস্তুতিহীন যুদ্ধে কীভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। ভারত সহযোগিতা করলেও পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রই প্রথমদিকে আমাদের সহযোগিতা করেনি। পাশের দেশ নেপাল শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের বিরোধিতা করেছে। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো আমাদের সহযোগিতা করলেও সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুরোপুরি আমাদের সমর্থনে আনতে দীর্ঘদিন চেষ্টা করতে হয়েছে। কারো কাছে স্পষ্ট ছিল না বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির চরিত্র কী হবে। কে তার নেতৃত্ব করবে। কোন শ্রেণি ক্ষমতায়

www.nagorikpathagar.com

আসবে। বাংলাদেশের দিকে তাকালে তখন এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া ছিল কষ্টকর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে আওয়ামী লীগ। কিন্তু আওয়ামী লীগ কোনোদিনই প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবি করে দলীয়ভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। আওয়ামী লীগের ছ'দফায় প্রচ্ছন্নভাবে স্বাধীনতা ইঙ্গিত থাকলেও স্বাধীনতার সুস্পষ্ট দাবি ছিল না। শুধুমাত্র সম্বল ছিল শেখ সাহেবের ৭ মার্চের জনসভার ঘোষণা। আমি যতদূর জানি শেখ সাহেবের ৬ দফা ঘোষণার পূর্বে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটিতে পেশ করা হয়নি এবং পাস করাও হয়নি। এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে শেখ সাহেবের আলোচনা হয়েছে ছ'দফা ঘোষণার পর। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ ঘোষণা সঠিক হলো কি? কেউ জানল না অথচ আপনি ঘোষণা দিয়ে ফেললেন? শেখ সাহেব হাসলেন। খাঁটি গোপালগঞ্জের ভাষায় বললেন, সময় সময় এমন করতে হয়। দেখেন না কী হয়। আমি তো বল ছুড়ে দিয়েছি। আমার কিন্তু তখনও মনে হয়নি, তিনি নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আওয়ামী লীগ ব্যতীত কোনো দলেরই এ ধরনের মানসিক প্রস্তুতিও তখন ছিল না। সদ্যগঠিত সর্বহারা পার্টি পূর্ববাংলা স্বাধীন করার স্লোগান দিচ্ছিল। আরো লক্ষণীয়, আওয়ামী লীগ ব্যতীত কোনো দলেরই এ ধরনের মানসিক প্রস্তুতিও তখন ছিল না। কিন্তু তারাও প্রকাশ্যে আসছিল না। আর আমি যতদূর জানি বাংলাদেশের মানচিত্র সম্বলিত জাতীয় পতাকাটি সর্বহারা পার্টিরই সৃষ্টি। ঝালকাঠির কোনো একটি এলাকায় ১৯৭০ সালে ১ জানুয়ারি উত্তোলন করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে কেউ ভিন্ন তথ্য দিতে পারলে আমি মেনে নিতে রাজি আছি।

এ পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ আসে। ৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করেন। সেকালের পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে, রাতারাতি প্রায় সকল রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান শব্দটি কেটে বাংলাদেশ শব্দটি জুড়ে দিতে থাকে এবং সকলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা দাবি জানাতে থাকে। আমার কাছে কোনোদিনই এ পরিস্থিতি স্বাভাবিক মনে হয়নি। রাতারাতি দলের নাম পাল্টালেই জনগণের মন-মানসিকতা উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যের সূত্রে পাওয়া ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হয় তা আমি বিশ্বাস করি না। আমি তাই আমার সেদিনের বন্ধুদের কাছে বলেছিলাম, এভাবে একটি দেশ স্বাধীন হয় না। খুব বেশি হলে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করা যায়। আমি বলেছি, ভারত আমাদের যুদ্ধে সহযোগিতা বা সাহায্য করবে এ ধারণা আমি করিনি। আমি সমাজতন্ত্রের

www.nagorikpathagar.com

রাজনীতি করি। এ রাজনীতি সম্পর্কে যতদূর লেখাপড়া করেছি তাতে আমাদের ধারণা এ ধরনের ঘটনা ঘটার কথা নয়। আমার কাছেও মনে হয় আমার ধারণা একান্তই সঠিক। এ মুহূর্তে সে বিতর্কে আমি যাব না।

তবে আমি আজো বলতে চাই, আমাদের একাত্তরের সংগ্রাম ছিল একেবারেই প্রস্তুতিহীন। চিন্তা ভাবনার স্বাধীনতার কথা থাকলেও মুহূর্তে সংগ্রাম শুরু হবে তা কেউই চিন্তা করেনি। ওই ধরনের চিন্তা-ভাবনা থাকলে প্রস্তুতি থাকত। আঘাত এলে প্রত্যাঘাতের ব্যবস্থা থাকতো। পলায়নই একমাত্র কাজ হতো না। অথচ একাত্তরে তাই ঘটল। সারা পৃথিবী জানল, সমঝোতার জন্যে আলোচনা হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা ভেঙে দেয়া হলো না। হামলা শুরু হলো। আন্দোলনের প্রথম নেতা তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে ধরা দিলেন। অন্যান্য নেতারা কেউ কোনো খবরই পেলেন না। নিজের উদ্যোগে পালাতে থাকলেন। আশ্রয় গ্রহণ করলেন পাকিস্তানের এক নম্বর বৈরী রাষ্ট্র ভারতে। সবাই ভারতে আশ্রয় নিলেন বা কোনো শর্তে ভারত আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল, সে প্রশ্নের জবাব আজো পরিষ্কার নয়। ১৯৭১ সালের মে মাসে আগরতলা গিয়েছিলাম। ত্রিপুরার এককালীন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনারা আমাদের ঢুকতে দিলেন কেন? আমরা তো আপনাদের এক নম্বর শত্রু। এমন হতে পারে, পাকিস্তানে হিন্দুরা নিগৃহীত হচ্ছে এজন্যই হিন্দুদের ঢুকতে দিচ্ছেন । কিন্তু মুসলমানদের ঢুকতে দিচ্ছেন কেন! কেন ঢুকতে দিচ্ছেন রাজনীতিকদের। এটা কি মানবতা, না অন্য কিছু? সুখময় বাবু বলেছিলেন—আমাকে নয়, নয়াদিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধীকে জিজ্ঞেস করুন। প্রশ্ন উঠতে পারে এতদিন পরে এ কথাগুলো লিখছি কেন? আমার লেখার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের জন্মের সময়কার নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তুলে ধরা। আমি বলতে চাচ্ছি কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়া, জাতীয় ভিত্তিতে কোনো ঐকমত্য ছাড়া এবং আদৌ কোনো প্রস্তুতি ছাড়া একটি যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। সে যুদ্ধে আমরা যেমনভাবে পেরেছি—তেমনভাবে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে অংশগ্রহণ করেছি। সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনামাফিক এ যুদ্ধে কেউ যায়নি। সাধারণ মানুষের কাছে একটি কথাই ছিল মুখ্য। সে কথাটি হচ্ছে—যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পারলে বাড়ি ফেরা যাবে না। মা-বোনের ইজ্জত থাকবে না। বাঁচানো যাবে না স্বজনকে। আমি বলতে চাচ্ছি যুদ্ধের হাল এমন হলে বিদেশিরা সাহায্য করতে আসবে কোন ভিত্তিতে। এ যুদ্ধের কোনো নেতা নেই, এ যুদ্ধ পরিচালনার কোনো ব্যবস্থা নেই। এ যুদ্ধে কোনো কিছুই সংগঠিত নেই। পরিস্থিতি এমন

www.nagorikpathagar.com

হলে কোনো দেশ কি সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসে? এ যুদ্ধের একটি মাত্র ইতিবাচক দিক ছিল বাঙালিয়ানা। পূর্ব দিকে ত্রিপুরার বাঙালি, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি। বাঙালিয়ানার জন্যেই প্রাথমিকভাবে তারা আমাদের কোলে টেনে নিয়েছিল। মনে হয় আমাদের গবেষকরা এখনো ভাবতে পারেনি, আমাদের পাশে বিহার কিংবা পাঞ্জাব থাকলে আমাদের সংগ্রামের রূপ কী হতো!

এ পরিস্থিতিতে আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় বিশ্ব জনমতের চাপে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। অনেকে বলতে পারেন আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকাই ছিল নিয়ামক শক্তি। আমরা এই যুদ্ধের নেতা। একথা সর্বৈব সত্য। কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য হচ্ছে—আমাদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। শেষ দিন পর্যন্ত নেতৃত্বের জন্যে আমরা কোন্দল করেছি। কেউ কেউ ষড়যন্ত্র করেছি পাকিস্তানে ফিরে যেতে। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দলবাজি হয়েছে। মুজিববাহিনী হয়েছে বামপন্থীদের শেষ করার জন্যে। স্বাধীন বাংলাদেশে তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্ব নিরাপদ নয়। অথচ আমরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। আমরা সোনার বাংলা গঠনের জন্য যুদ্ধ করেছি। কিন্তু সোনার পাথরবাটি হয় না। তাই সোনার বাংলাও হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। এই ঘটনা সঠিকভাবে অনুধাবন করিনি। কখনো মনে হয়নি যে, বাংলাদেশ গঠিত হয়েছে কতগুলো শকুনী ও গৃধিণীর জন্যে। সবাই সবকিছু পেতে চায়। সবাই বাড়ি, গাড়ি, নারী দখল করতে চায়। এ পরিস্থিতি বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতাম যে, বেতন বোর্ড আন্দোলনে জিতেছি। সংবাদপত্রের কর্মচারীদের জন্যে বেতন বোর্ড গঠিত হয়েছে। সংবাদপত্রের কর্মচারীরা এবার সচ্ছল জীবন-যাপন করতে পারবে। কিন্তু তা হয়নি। দেশের রাজনীতি তখন ভিন্ন মোড় নিয়েছে।

সংবাদপত্র কর্মচারীদের বেতন বোর্ড গঠনের আগেই আমাদের দল-শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল নিয়ে একটি ঘটনা ঘটে যায়। আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। যে বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার হয়ে যায় আমাদের বন্ধুর পত্নী। গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় আমার বন্ধুর পরিবারের বিরুদ্ধে। কিছুদিন পর ওই পরিবারের সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের আরেক বন্ধু গ্রেফতার হয়ে যায়। তিনি আমাদের দলে শ্রমিক ফ্রন্টের সাথে জড়িত ছিলেন।

www.nagorikpathagar.com

আমি এ খবরে শঙ্কিত হয়ে যাই। তখন রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন চলছে সারাদেশে। রক্ষীবাহিনীর কবলে পড়লে অনেকেই ফিরে আসে না। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম আমার বন্ধুর মধ্যে কেউ গ্রেফতার হলে হয়তো তারা ফিরে আসবে না। আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই দেখা করা নিয়েও আমার মনে দ্বন্দ্ব ছিল। আমি তখন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। আমি দৈনিক বাংলায় অনিকেত নামে সরকার বিরোধী কড়া কড়া উপসম্পাদকীয় লিখছি। আমি যদি অস্ত্র মামলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাই তাহলে আমার সমালোচনা হবেই। এর পরেও আমি গোপালগঞ্জের লোক। টুঙ্গীপাড়া স্কুলের ছাত্র। আমাদের পরিবারের সাথে প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের দীর্ঘদিন সম্পর্কের কথা সকলের জানা। এ পরিস্থিতিতে আমার সমালোচনা হবেই। অন্তত সাংবাদিক বন্ধুরা বলবে, সাংবাদিকদের দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে আমি নিজের দলীয় স্বার্থে সরকারের সাথে আপোষ করেছি।

আমার দ্বিতীয় অসুবিধা আমার ওই বন্ধুর পরিবারটি নিয়ে। ১৯৭১ সালে ওই পরিবারটি বারবার আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল। ৯ মার্চ থেকে ঢাকা ছিলাম না। ঢাকায় ফিরেছিলাম মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। তখন সবাই ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছে। আর আমি কোটালীপাড়া থেকে নৌকায়, লঞ্চে এবং হেঁটে ঢাকা পৌঁছলাম সকলের অজান্তে। এপ্রিলে বরিশাল গিয়েছিলাম। বন্ধুদের সাথে আলোচনা হয়েছিল। বলেছিলাম—এ যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলবে। অস্ত্র সংগ্রহ করে রাখতে হবে। প্রশিক্ষণ নিতে হবে। বরিশাল থেকে ফিরে গেলাম টুঙ্গীপাড়ায়। ফিরলাম বাড়িতে। তারপর ঢাকা। আশ্রয় মিলল ওই বন্ধুর বাড়িতে।

তখন পোশাক পাল্টেছি। কিন্তু দাড়ি তখনো বড় হয়নি। রাস্তায় নামলে মানুষ চিনতে পারে। এমন সময় ওই বন্ধুর বাড়ির গৃহশিক্ষক এক মওলানা সাহেব ছুটিতে যেতে চাইলেন। তাঁর বাড়ি লক্ষ্মীপুরে। তার শূন্যপদে আমি নিয়োজিত হলাম। আমার দায়িত্ব কোরআন পড়ানো এবং নামাজ রোজা শেখানো। মওলানা সাহেব কিছুদিন আমার পড়ানো লক্ষ্য করলেন। বললেন—হুজুর আপনি বড় বেশি কথা বলেন। আর নকশালদের মতো গল্প করেন। বুঝলাম, এখানে থাকা নিরাপদ নয়। সিদ্ধান্ত হলো ভারতে চলে যাব। কিন্তু কিভাবে যাব। সেদিন পাকিস্তানি বাহিনী হোমনা-রামচন্দ্রপুর অভিযান চালাচ্ছে। আমাকে যেতে হবে ডেমরা, মাধবদী হয়ে নরসিংদী। সেদিন ঠিক দুপুরবেলা ওই বন্ধুর মোটরসাইকেলে চড়ে ডেমরা ঘাটে

www.nagorikpathagar.com

পৌঁছলাম। ওপারে আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিল নরসিংদীর কাজী হাতে আলী। তার সাথে আগরতলা রওনা হয়ে গেলাম। সে অনেক কথা।

আবার জুলাইয়ের প্রথমে ঢাকায় ফিরলাম। ওই বন্ধুর বাসায়ই আবার উঠলাম। জুলাইয়ের শেষে আবার ভারত যাত্রা করলাম। সীমান্ত পাড়ি দিতে পারলাম না। আবার ফিরলাম ওই বন্ধুর আশ্রয়ে। শুনলাম আমার মতো কেউ আছে জেনে ওই বাড়ি দু'বার তল্লাশি হয়েছে। আমার বন্ধু এককালে সামরিক বাহিনীর লোক ছিলেন। তাই পরিস্থিতি সামলাতে পেরেছেন।

এবার বিপদ এল ভিন্ন দিক থেকে। ওই এলাকায় একটি মসজিদ আছে। ওই মসজিদের ইমাম সাহেব অসুস্থ। পাড়ার লোক আমার আশ্রয়দাতাকে অনুরোধ জানাল। আমি যেন ওই মসজিদে শুক্রবার ইমামের ভূমিকা পালন করি। বন্ধু স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এবারও শেষ রক্ষা হলো। তিনি বললেন, আমাদের মওলানা সাহেব কোথাও ইমামতি করেন না। তাঁর পীর সাহেবের নিষেধ আছে। এ পরিস্থিতিতে আমাকে আবার ঢাকা ত্যাগ করতে হলো। তিনি আমাকে ঢাকার বাইরে যাবার ব্যবস্থা করলেন। আমাদের এক দলীয় কর্মী তার আত্মীয় আমার সাথে ঢাকা থেকে লঞ্চে বৃহত্তর নোয়াখালীর রায়পুরা গেলেন। রায়পুরা, লক্ষ্মীপুর, বেগমগঞ্জ এবং কুমিল্লা জেলার গুণবতী হয়ে আমি দ্বিতীয়বারের জন্য ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে পৌঁছালাম।

এবার সেই বন্ধুর পরিবার বিপর্যস্ত। স্ত্রী গ্রেফতার হয়েছেন অস্ত্র আইনে। আমি এখন কী করবো। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমাকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতেই হবে। তবে আমার দলের অভিযোগ হলেও আমি এ ধরনের ঘটনা আদৌ জানতাম না।

সে এক বিতর্ক ছিল স্বাধীনতার পরবর্তীকালে। সকলের হাতেই অস্ত্র। অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ নয়। যুদ্ধকালে অস্ত্র নিয়েছি হাতে। সে অস্ত্র কেন দেব? কাকে দেব। ফলে শুরু হলো অস্ত্রের ঝনঝনানি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্ত্র ব্যবহৃত হলো বাড়ি গাড়ি জমি দখলে। যে ঐতিহ্য থেকে আজো রেহাই পাওয়া যায়নি।

কিন্তু রাজনীতিকরা কী করবে। অস্ত্র আছে। প্রশিক্ষণ আছে। অস্ত্র জমা দেবো কেন। ভবিষ্যৎ বিপ্লবে কাজে লাগবে এ অস্ত্র। কিন্তু বিপ্লব কবে কখন হবে—এ অস্ত্র ততদিন আদৌ কার্যকর থাকবে কিনা এ বিতর্কের শেষ কোথায়। আমার বক্তব্য ছিল বিপ্লবের জন্য অস্ত্র মজুদ রাখার প্রয়োজন নেই। বিপ্লবের বড় অস্ত্র জনতার ঐক্য। আর বিপ্লবের কালে সামরিক বাহিনী বিপ্লবের শরিক হবে। তাই অস্ত্র মজুদ করে লাভ হবে না। এতে ব্যক্তিগতভাবে সন্ত্রাস হবে। এ সন্ত্রাস দিয়ে বিপ্লব হবে না। গণঅভ্যুত্থান দিয়ে বিপ্লব করতে

www.nagorikpathagar.com

হবে। কিন্তু এ তত্ত্ব শুনতে ভালো হলেও কাজে আসেনি। বারবার ঘটা করে অস্ত্র সমর্পণের নাটক করা হয়েছে। সবাই অস্ত্র জমা দেয়নি। আর এক সময় সরকারি বাহিনী সন্ত্রাস শুরু করলে নিজেদের বাঁচার জন্যে অস্ত্র রাখতে হয়েছে। কারণ শান্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগী কোনো ব্যবস্থা তখন ছিল না। সর্বত্রই একটা সন্দেহ, বিভ্রান্তি, আশঙ্কা। কে মুক্তিযোদ্ধা, কে রাজকার। মা মুক্তিযোদ্ধা, বাবা শান্তি কমিটির লোক। ভাই আলবদর, অপর ভাই মুক্তিযোদ্ধা।

অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিল চরম মতবিবাদ। কেউ এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার্স) গ্রুপ, কেউ মুজিববাহিনী (বিএলএফ)-বেঙ্গল লিবারেল গ্রুপ, কেউ মামা গ্রুপ, কেউ কাদের সিদ্দিকী গ্রুপ-এ নিয়ে বিতর্ক এবং হানাহানির শেষ ছিল না। প্রস্তুতিহীন অপরিকল্পিত অস্ত্র যুদ্ধের অনিবার্য পরিণত মোকাবেলা করতে হলো দেশবাসীকে। তাই অস্ত্র কে কোথায় কেন রেখেছে তার হদিস বোধ হয় আরো মিলবে না। এ পরিস্থিতিতে খবর এল বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার। অঙ্গুলি নির্দেশ করা হতে থাকল আমাদের দলের দিকে।

শেষ পর্যন্ত আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে গেলাম। তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি ঘটনা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। দু'দিন পরে আমাকে আসতে বললেন। আমি এই সময় বিভিন্ন মহলে খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করলাম। বুঝতে পারলাম ওই মামলা থেকে রেহাই পাওয়া খুব কঠিন হবে। কারণ অবৈধ অস্ত্রের বিরুদ্ধে তখন সকলেই সোচ্চার। অপরদিকে রক্ষীবাহিনীর ভয়ে সকলেই তটস্থ। তাই প্রথমে আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রীকে একটি অনুরোধ জানাব। অনুরোধ হচ্ছে—তদন্ত সাপেক্ষে আমাদের দলের কর্মী ও নেতাদের গ্রেফতার বন্ধ রাখার জন্যে। আমার চিন্তা হচ্ছিল আমাদের অন্যতম নেতা কমরেড রুহুল আমিন কায়সার সম্পর্কে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি টিবিতে ভুগছেন। একটি ফুসফুস নেই। অপরটিরও তিনভাগের এক ভাগ গিয়েছে। রায়েরবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। অসাধারণ মনোবলের অধিকারী। শেখ সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। পঞ্চাশের দশকে এক সাথে ছাত্র আন্দোলন করেছেন। আমার ভয় ছিল, তিনি রক্ষীবাহিনীর হাতে পড়লে আর বাঁচবেন না। তাই রুহুল আমিন কায়সারের নাম করে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমার বন্ধুদের হয়রানি না করার জন্যে। প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন দু'দিন পরে আসতে।

www.nagorikpathagar.com

আর আমি ভেবেছিলাম—এ ঘটনা থেকে রেহাই পেতে হলে আমাকে ভিন্ন পথ নিতে হবে। আমি প্রধানমন্ত্রীর নামে একটি দরখাস্ত দিলাম। আমি লিখলাম—যে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে তার জন্যে আমিই দায়ি। আমার বন্ধু বা তার পরিবার আদৌ কোনো কিছু জানে না। ৭১ সালে বারবার আমি ওই বাড়িতে এসেছি, আশ্রয় নিয়েছি। আমার সাথে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা ওই বাড়িতে যাতায়াত করেছে। আমরা কে কখন কী করেছি সে কথা বাড়ির কর্তাদের জানার কথা না। সুতরাং সকল দায়িত্ব আমার। এজন্যে যে কোনো দণ্ড আমি মাথা পেতে নিতে রাজি। দরখাস্তটি লিখে আমি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠিয়ে দিলাম।

দু'দিন পরে পুরোনো গণভবনে গেলাম। প্রধানমন্ত্রী যেন চিৎকার করেই বললেন—আপনি কী করেছেন জানেন? আপনি যে অস্ত্র রেখেছেন সে অস্ত্র দিয়ে ঢাকা দখল করা যায় এবং ঢাকা ধ্বংস করেও দেয়া যায়। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট হচ্ছে—এমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কেউ কোথাও অস্ত্র লুকিয়ে রাখেনি। আমার কিছু বলার ছিল না। প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে চুপচাপ থাকলেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি দরখাস্ত করেছেন কেন? কে আপনাকে বলেছে সব দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে? এ কাজটি কি না করলে চলত না। আমি চুপ করে থাকলাম। প্রধানমন্ত্রী বললেন, ঠিক আছে আদালতে মামলা হোক। কমপক্ষে আপনার পনের বছর সাজা হবে। থাকেন স্বাধীন বাংলার জেলখানায়। সাথে সাথেই প্রধানমন্ত্রী হেসে ফেললেন। বললেন—আদালতের রায়ের পর আমি দণ্ড মাফ করে দেব আপনার দিকে তাকিয়ে। আমি বললাম—আমি কারো কাছে মাফ চাইতে শিখিনি। এই বলে প্রধানমন্ত্রীর কক্ষ থেকে বের হয়ে এলাম। দেখা হলো প্রধানমন্ত্রীর সচিব রফিকুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে। রফিকুল্লাহ আমাদের সাথে ছাত্রলীগ করত। তার সঙ্গে ছিল দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। মাঝখানে তাকে দিয়ে অনেক কাজও করিয়েছি। অনেক কিছুই এখন মনে নেই। তবে কিছু ঘটনা এখনো ভুলতে পারিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর খুন হলেন। এই খুনের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে এখনো কেউ বলতে পারে না। পুলিশ কোনো হদিস করতে পেরেছে বলে আমি জানি না। হুমায়ুন কবিরের স্ত্রী সুলতানা রেবু এক সময় আমাদের দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হুমায়ুন কবীর খুন হয়ে যাওয়ায় পারিবারিকভাবে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। আমি বঙ্গভবনে গেলাম। দেখলামদূরে তার কক্ষে প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন। পাশে দাঁড়িয়ে রফিকুল্লাহ চৌধুরী। রফিকুল্লাহকে বললাম, চেক বইটা নিয়ে আসুন। প্রধানমন্ত্রী, আপনার

www.nagorikpathagar.com

তহবিল থেকে দুই হাজার টাকার একটি চেক লেখেন সুলতানা রেবুর নামে। তার টাকার বড্ড প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী হেসে বললেন, আপনি কি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন নাকি। হুমায়ুন কবীর কি মুক্তিযোদ্ধা? তার পরিবারকে টাকা দেবো কেন। আমি বললাম—টাকা দিতে হবে এটাই শেষ কথা। আমার যুক্তি হচ্ছে—আপনি প্রধানমন্ত্রী। আপনার আমলে হুমায়ুন কবীর খুন হয়েছে। আপনার সরকার এখনো আততায়ীকে ধরতে পারেনি। তাই আপনাকে জরিমানা দিতে হবে দুই হাজার টাকা। প্রধানমন্ত্রী জোরে হেসে ফেললেন। রফিকুল্লাহ চৌধুরী চেক লিখে নিয়ে এল। প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর করলেন। এ ঘটনার কী ব্যাখ্যা হতে পারে সে কথা আমি কোনোদিন ভাবিনি। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমাকে সেই সরকারের খাস দালাল বলা যেতে পারে। বলা যেতে পারে খয়ের খা। খয়ের খা না হলে এ কাজটি করা কি আদৌ সম্ভব এবং সকলেই ধারণা করতে পারে, গোপনে শেখ সাহেবের সাথে সম্পর্ক রেখে আমি প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া কড়া কথা লিখছি। এ অভিযোগ আমি কম শুনিনি। কিন্তু কোনোদিন গায়ে মাখিনি। এ ঘটনার ভিন্ন চিত্রও আছে।

গণভবনে ঢুকলেই রফিকুল্লাহ চৌধুরী আমাকে বলতেন এই যে বিহারিদের দালাল দাদা আবার তদবিরে এসেছেন। আমি সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা। আমাদের পেশায় তখন অসংখ্য অবাঙালি সাংবাদিক ছিলেন। তাদের জীবনের নিরাপত্তা ছিল না। নিশ্চয়তা ছিল না চাকরিতে। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলাম ওরা এদেশে থাকতে চাইলে ওদের চাকরি খতম করা যাবে না। ওরা পাকিস্তানে যেতে চাইলে তাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার সে অনুরোধ প্রধানমন্ত্রী রেখেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর জীবনের এই দিকটি আমার মনে হয় কেউ কোনোদিন আবিস্কার করার চেষ্টা করেননি। আর সেই সুবাদে গণভবনে গেলে আমাকে বিহারিদের দালাল বলা হতো। এ হচ্ছে নানা সময়ের নানা ঘটনার কিছু বিবরণ।

সেদিন প্রধানমন্ত্রীর কক্ষ থেকে তার সচিব রফিকুল্লাহ চৌধুরীর কক্ষে এলাম। বললাম রফিকুল্লাহ একটি কাজ করতে হবে। অস্ত্র উদ্ধারের যে ঘটনাটি নিয়ে হইচই হচ্ছে তার সঙ্গে আমি জড়িত। আপনি উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বলবেন, একটু ধীর গতিতে যেন এ ঘটনার তদন্ত করা হয়। কারণ আমার মনে হচ্ছে এ ঘটনার সঙ্গে অনেক কিছু জড়িত। এই কথাগুলো বলে আমি গণভবন থেকে বের হয়ে এলাম।

পরের দিন গণভবনের ঢুকতেই রফিকুল্লাহ চৌধুরী বললেন, আপনার জন্য আমার বিপদ হয়েছে। আমি পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে আপনার ব্যাপারটি

www.nagorikpathagar.com

বলেছিলাম। এর পরেই উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা দল বেঁধে গণভবনে আসে। তারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী আমাকে ডেকে বেশ কিছু কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন। একথা শুনে আমি প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে ঢুকে গেলাম। বললাম—রফিকুল্লাহ চৌধুরীকে ডাকুন। রফিকুল্লাহ এল, প্রধানমন্ত্রীকে বললাম, আপনি নাকি রফিকুল্লাহকে গালাগাল দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রফিকুল্লাহ নির্দোষ। আমি রফিকুল্লাহকে বলেছিলাম পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে। রফিকুল্লাহ আমার কথা তাদের বলেছে। প্রধানমন্ত্রী বললেন, একথা রফিকুল্লাহ আমাকে বলেনি। তার বলা উচিত ছিল, আপনি তাকে ওই অনুরোধ জানিয়েছেন। এবার রফিকুল্লাহ মুখ খুলল। সে বলল—দাদা, আপনার মামলা নিয়ে অনেক গণ্ডগোল হবে। আমাদের দফতরে অসংখ্য চিঠি এসেছে আপনার বিরুদ্ধে। অভিযোগ করা হয়েছে, আপনার মামলা বলেই কোনো কিছু করা হচ্ছে না। অপরাধীদের ধরা হচ্ছে না। আর আমাদেরও বলার কিছু থাকছে না।

আমার তখন উভয় সঙ্কট। সাংবাদিকদের ব্যাপার নিয়ে সরকারের সাথে মতানৈক্য হচ্ছে। কোনো ব্যাপারেই সরকারের সঙ্গে সমঝোতা হচ্ছে না। তার মধ্যে এ মামলার দেন-দরবারও করতে হচ্ছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থান এমন দাঁড়াচ্ছে, সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে হতেও এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী একদিন আমাকে ডেকে বললেন—তাড়াতাড়ি আপনার মামলার সুহারা করা যাবে না। ভিন্নপথ অবলম্বন করতে হবে।

ঘটনাটি আমিও বুঝতে পারছিলাম। আমার ধারণা হচ্ছিল পুলিশের কর্মকর্তারা তাদের হিসাবে প্রধান আসামীকে তারা গ্রেফতার করতে চান। প্রধান আসামী আমার আশ্রয়দাতা বন্ধু। কেউ গ্রেফতার হোক বা তার বিরুদ্ধে মামলা হোক তাতে আমার আপত্তি করার কথা নয়। অপরাধ করলে শাস্তি পেতেই হবে। কিন্তু আমার ভয় আদালতে বিচারের নয়। আমার ভয় হচ্ছে পুলিশি নির্যাতনের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পুলিশি নির্যাতন তুঙ্গে উঠেছিল। তদন্তের নামে অভিযুক্তদের ওপর এমন অত্যাচার চালানো হতো, অনেক নির্দোষ ব্যক্তিও সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে। অনেকে সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরতে পারেনি। আর এ ব্যাপারে আমিও খুব কম বড় সাক্ষী ছিলাম না।

সেকালে অনেক দল নিষিদ্ধ না হলেও গোপনে কাজ করত। কখনো প্রকাশ্যে আসত না। এরা গ্রেফতার হলে তার খোঁজ পাওয়া যেতো না। এদের অনেকেই আমার বাসায় আসত। অনুরোধ জানাতো তাদের গ্রেফতারের খবর

www.nagorikpathagar.com

পত্রিকায় ছাপিয়ে দিতে। পত্রিকায় ছাপা হলে তাদের আর চির জীবনের জন্য অদৃশ্য হতে হতো না।

এ পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রী জানতেন। তিনি আমার ভয় বুঝতে পেরেছিলেন—কেন আমি বন্ধুকে আদৌ গ্রেফতার করতে দিতে চাচ্ছি না। কারণ তিনি যতো নির্দেশই দেন না কেন তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ যে আমার বন্ধুর হাত-পা ভেঙে দেবে না তার নিশ্চয়তা দেয়া খুবই কঠিন ছিল।

এ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী একটি অদ্ভুত পরামর্শ দিলেন। জানি না কোনো দেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন কিনা। কেন আমার জন্যে নিয়েছিলেন আজও আমার কাছে বোধগম্য নয়। তিনি বললেন, আপনার বন্ধুকে ছ'মাসের জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে দিন। আরএসপির ধর্মতলা স্ট্রিটে আপনাদের এককালের পার্টি অফিস আছে। কোলকাতায় থাকতে আপনার পার্টির সকল নেতারাই আমার পরিচিত ছিল। ওখানে গিয়ে সে ছ'মাস থাকুক। ছ'মাস পরে বাংলাদেশে ফিরুক। তখন পরিস্থিতি অনেক সহজ হবে। পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে তখন একটা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল, এ মানুষটাকে আমি বুঝতে পারছি না। আমি বললাম—আমার বন্ধুর পাসপোর্ট ভিসা কিছুই নেই। সে কী করে যাবে। তাকে কে পাসপোর্ট দেবে। প্রধানমন্ত্রী বললেন, তাকে সিলেট সীমান্ত দিয়ে পাঠিয়ে দিন। ওই সীমান্ত দিয়ে সহজেই ওপারে চলে যেতে পারবে। আমাকে সে কাজই করতে হলো।

বলতে পারেন—কে এই প্রধানমন্ত্রী, কী তার পরিচয়। তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। কী সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। আমার বন্ধুকে তিনি কোনোদিন দেখেননি। তার সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু শুধুমাত্র আমার কথায় যে পরমার্শ তিনি দিলেন তা আইনের চোখে অবৈধ। আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাকে পরামর্শ দিলেন আমার বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য। আমার ধারণা হচ্ছে তিনি তখন কোনো কিছুই করতে পারছিলেন না আমার জন্যে। অথচ তার কিছু করার গভীর ইচ্ছা ছিল। আমার আরো মনে হয়েছে, সেই ইচ্ছার ভিত্তিটি ছিল একান্তই রাজনৈতিক। রাজনীতির সঙ্গে আবেগ এবং মতামত সম্পর্ক বড্ড গভীর। রাজনীতির ধারক ও বাহকেরা যেমন বন্ধুর জন্য জীবনবাজি রাখতে পারে। তেমনি শত্রুর বিরুদ্ধে হতে পারে চরম হিংস্র।

এটাই ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উপনিবেশগুলোর জাতীয় নেতৃত্বের একটি চিত্র। ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ থেকে শুরু করে বার্মার

www.nagorikpathagar.com

অং সান সুচি, ভারতের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু, মিসরের নাসের ও বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমানের একই চরিত্র। এরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে অকুণ্ঠ অহমিকা। এই অহমিকার জন্যে তাঁরা নিজের শ্রেণি চরিত্রের বাইরে গিয়ে কথা বলে ফেলেন। কখনো ধমক দেন পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে। এই চরিত্রগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা না হলে ইতিহাসে তাঁরা কখনো চরম বাম আবার কখনো চরম ডানপন্থী হিসেবে চিত্রিত হন। তাঁদের পক্ষে ভালোবাসা হয় পর্বত প্রমাণ। আর এক সময় বিরুদ্ধবাদিদের ঘৃণা হয় সাগরের মতো অতলান্ত। এই প্রেক্ষাপটে বিচার না হলে আমি মনে করি শেখ সাহেবের সেদিনের ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের পরামর্শে বন্ধুকে ভারতে পাঠালাম। আপাতত এ ব্যাপারে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া গেল। কিন্তু ১৯৭৩ সালে আমার কাছে আদৌ স্বস্তিপূর্ণ ছিল না। শুরু হয়েছিল ভিন্নভাবে। '৭৩ সালের প্রথম দিকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে অখণ্ড এশিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনের উদ্যোগ নিয়েছিল ভারতের জাতীয় সাংবাদিক সমিতি (ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট) এবং আনন্দবাজার পত্রিকা। আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ওই সম্মেলনে। যদিও সাংগঠনিকভাবে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ভারতের জার্নালিস্ট ফেডারেশনের। আনন্দবাজারের দৃষ্টিতে ওই সংগঠনটি ছিল বামপন্থীদের দখলে। একথা আমাকে বলেছিলেন আনন্দবাজারের মালিক সম্পাদক অশোক কুমার সরকার। নয়াদিল্লি সম্মেলনে কোলকাতা থেকে তাঁর সঙ্গে বিমানে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে কমিউনিস্টদের আকৃতি-প্রকৃতি এবং চরিত্র খুব গভীরভাবে বুঝাচ্ছিলেন।

এ সম্মেলনে রওনা হওয়ার আগে ঢাকায় একটি ঘটনা ঘটে। হঠাৎ শুনতে পেলাম প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের ওই সম্মেলনে যেতে বারণ করেছেন। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে—দেশে নির্বাচন আসন্ন। সুতরাং আমাদের যাওয়া ঠিক হবে না। আমাদের অর্থ হচ্ছে—কে জি মুস্তফা ও আমি। তখন আবার প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশ যেতে হলে সরকারি অনুমতি লাগত। আমরা ঠিক করলাম প্রধানমন্ত্রীকে কোনো কিছু জানাব না। আমরা বিমান বন্দরে চলে যাব। কোনো পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি এলে তখন ভেবে দেখা যাবে। আমরা নির্বিঘ্নেই চলে গেলাম।

দিল্লি বিমানবন্দরে আর একটি ঘটনা ঘটল। তখন নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার অর্থাৎ বিএসএস-এর প্রতিনিধি ছিলেন আতাউস সামাদ।

www.nagorikpathagar.com

বিমানবন্দরে তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, দাদা, আপনিও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর সম্মেলনে এলেন? এ সম্মেলন নিয়ে সেকালে আমি দীর্ঘদিন লিখেছিলাম অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলায়। সে ঘটনার আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তবে দুই একটি ঘটনা এখনো আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

সে সম্মেলনে গিয়েছিলাম আর একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে। সে সম্মেলনে এসেছিলেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ গুনার মৃডাল দম্পত্তি। তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল আমার প্রবল। তাঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। তাঁর কথাগুলো আজো আমার কানে বাজছে। তুমি এমন একটি দেশ থেকে এসেছ যাদের নিচে নামবার এখন আর জায়গা নেই। বাঁচতে হলে উপরের দিকে উঠতে হবে। নামবে কোথায়? তোমরা তো শেষ সীমান্তে দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশের সম্পর্কে আর বেশি কিছু তিনি বললেন না। অনেকদিন আগের কথা। এখন স্মৃতিচারণের অঙ্গ। আজ লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে—এশিয়ান ড্রামার লেখক গুনার মৃডাল সঠিক কথা বলেননি। আমাদের নামবার জায়গা ছিল। এখনো নামছি। এ নামার শেষ দেখা না গেলে আর উপরে ওঠা যাবে না।

অখণ্ড এশিয়া সম্মেলনের শেষ দৃশ্যটি ছিল আরো উল্লেখ্যযোগ্য। সংবাদ সম্মেলন হচ্ছিল। সংবাদ সম্মেলনের প্রশ্নে জবাব দিচ্ছিলেন তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। সংবাদ সম্মেলন উপস্থাপনা করেছিলেন জাতিসংঘের ভারতের খ্যাতিমান প্রতিনিধি নেনেগাল রনসীমা রাও। এই সম্মেলনে শেষ প্রশ্ন করেছিলাম আমি। আমি লিখিত প্রশ্নে জানতে চেয়েছিলাম, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অংশগ্রহণ ব্যতীত এ ধরনের অখণ্ড এশিয়া সম্মেলন আদৌ কোনো সাফল্য বয়ে আনবে কি? চীনের সঙ্গে তখন ভারতের শীতল সম্পর্ক চলছিল। আর চীন বাংলাদেশকে তখনও স্বীকৃতি দেয়নি। তাই আমার প্রশ্নটি উত্থাপনের পর হেসে ফেললেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। তিনি বললেন, এ প্রশ্নটি আমাদের থেকে করা হয়েছে? তিনি বললেন, চীন যদি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ না করে আমাদের বলার কিছু নেই। আমার জানা মতে, সে সম্মেলনে চীনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

সংবাদ সম্মেলনের পর শুরু হলো চা-পর্ব। চা-পর্বে দেখা হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংবাদিকদের সাথে। বৃহত্তর এশিয়ার অংশ বলে ওই সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রতিনিধি এসেছিল। তাঁরা আমাকে বললেন, তুমি তো সেই নির্মল সেন। তুমি মস্কো গিয়েছিলে এবং তুমি এ ধরনের আলোচনা করেছিলে মস্কোতে। তোমার নাম পরিবর্তন হয়নি।

www.nagorikpathagar.com

নয়াদিল্লি থেকে ফেরার পথে আসানসোলে গিয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল তখন আমার মা থাকতেন। মায়ের সাথে দেখা করে ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে গেল।

তখন ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশের প্রথম সংসদ নির্বাচনের তোড়জোড় চলছিল। ঢাকায় ফিরে আর একটি খবর পেলাম। খবরটি খুব ভয়ের না হলেও নিঃশঙ্ক হওয়ার মতো নয়। খবরটি দিলেন এক সংবাদিক বন্ধু। এককালে তিনি ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি। তিনি চীনের অনুসারী ছিলেন। বর্তমানে বিএনপি করেন। তিনি বললেন, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। সর্বহারা পার্টির পক্ষ থেকে আপনাকে খুন করার চেষ্টা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সফল হয়নি। যারা আপনাকে খুন করতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে নোয়াখালীর একটি ছেলে ছিল। সে ইত্তেফাকের সাংবাদিক বজলুর রহমান অর্থাৎ বজলু ভাইয়ের বাড়িতে গৃহশিক্ষক ছিল। সে সর্বহারা পার্টির সদস্য। একদিন তাদের একটি দল নাকি আমার নতুন পল্টনের বাসায় যায়। তাদের দলীয় নেতা আমার বাসায় যাওয়ার পর সকলকে জানানো হয়, সেদিনের অভিযুক্ত ছিলাম আমি। আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এই গৃহশিক্ষক নাকি সকলের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। সে বলেছিল, বর্তমান সরকার অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ওই একজন লোকই লিখছে এবং বলছে। সুতরাং তাকে হত্যা করা হবে কেন? তার এই কথায় সেদিনের অভিযান অসমাপ্ত থেকে যায়। শুনেছি ওদের নিয়ম হচ্ছে সকলে একমত না হতে পারলে কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় না। পরবর্তীকালে ওই গৃহশিক্ষক সর্বহারা দল ছেড়ে দেয়। রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার পরেই সে আমার পরিচিত সাংবাদিককে এ কথা জানায়। তার বার্তা ছিল, নির্মল সেনকে সাবধান থাকতে বলবেন। আমার জন্যে তিনি এবার বেঁচেছেন। পরের বার হয়তো তিনি বাঁচবেন না।

আমি এ ব্যাপার নিয়ে তখন খুব একটা হইচই করিনি। আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরাও এ কথা জানতে পারেনি। আর আজ পর্যন্ত আমি এ ঘটনারও কিনারা করতে পারিনি।

প্রকৃতপক্ষে কোনোদিনই এ গোপন বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে আমার তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাদের ভালোবাসার বা বিরোধিতার প্রশ্নও কোনোদিন দেখা দেয়নি। তারাই আমাদের নামে তাদের কাগজপত্র প্রেস ক্লাবে পাঠিয়ে দিত। প্রেসক্লাবে এ কাগজপত্রের প্রাপক ছিলাম আমি ও এনায়েতুল্লাহ খান। সেকালে সাম্যবাদী দলের নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা আত্মগোপন করেছিলেন। তার সন্ধান আমার জানা ছিল। কোনো বাইরের লোক তার সঙ্গে

www.nagorikpathagar.com

দেখা করতে চাইলে সে ব্যবস্থাও কম করিনি। বাংলাদেশের রাজনীতির সুবিধা বা ক্ষতিকর দিক হচ্ছে সেকালের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান থেকে শুরু করে আত্মগোপনকারী বাম নেতা মোহাম্মদ তোয়াহাসহ অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। পর্বতপ্রমাণ রাজনৈতিক মতান্তরের মধ্যেও এ ধরনের সম্পর্ক অটুট ছিল। তাই এদের সকলের সঙ্গে আমাদের একটা সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক বিরাজ করত। আমি আজও বুঝতে অক্ষম সেকালে সর্বহারা পার্টি আমাকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিল। পরবর্তীকালে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের নকশাল নেতা চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন হয়েছে। চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর দৈনিক বাংলায় আমি একটি উপসম্পাদকীয় লিখেছিলাম। আমার সেই লেখা নিয়ে বিতর্ক হয়। লেখা ছাপা হয় সাপ্তাহিক হলিডেতে। ওই সময় আর একটি চিঠি আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। সে চিঠিও সাপ্তাহিক হলিডেতে প্রকাশিত হয়। সে চিঠিতে দাবি করা হয় যে নির্মল সেনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সঠিক।

এর কিছুদিন পর আমি বরিশাল যাই। বরিশালে এক বন্ধুর বাসায় ছিলাম। ওই বাসায় সর্বহারা পার্টির দু'টি ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। আমাকে বলা হলো—রাত বারটায় কোনো একটি জায়গায় তাদের সঙ্গে আমাকে যেতে হবে। তারা চারু মজুমদার সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। আমি রাজি হলাম। তবে আমার শর্ত ছিল আমার সঙ্গে বৈঠককালে সিরাজ সিকদারকে হাজির থাকতে হবে। যদি সিরাজ সিকদার সম্মত হয় তা হলে রাত বারটায় আমি তাদের সঙ্গে যাব। তারা আমার সঙ্গে কথা বলে চলে যায়। কিন্তু আর ফিরে আসেনি।

এমনি করে অসংখ্য ঘটনার মধ্যদিয়ে ১৯৭৩ সাল কেটে যায়। ১৯৭৪ সালে নতুন করে আমন্ত্রণ আসে পূর্ব জার্মান অর্থাৎ জিডিআর-এর পক্ষ থেকে। দীর্ঘদিন থেকে পূর্ব জার্মান সাংবাদিক সমিতির পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। ১৯৭২ সালে জিডিআর সফরকালে একই প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। আমি সম্মত হইনি। আমি তখন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। কোনো জাতীয় সাংবাদিক ইউনিয়ন তখনো গঠিত হয়নি। এছাড়া সরকারের সঙ্গে আলোচনা ব্যতীত দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ১৯৭২ সালে কোনো দেশের সঙ্গে আমাদের চুক্তি করা সঠিক হবে কিনা তাও আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না। ১৯৭২ সালে সে চুক্তি আমি স্বাক্ষর করিনি। এতে আমার কমিউনিস্ট বন্ধুরা অখুশি হয়েছিল। জিডিআর-এর সাংবাদিক ইউনিয়নও আদৌ আমার প্রতি খুশি ছিল না।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু আমি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি। এবার আবার নতুন করে জিডিআর সাংবাদিক ইউনিয়ন আমাদের কাছে প্রস্তাব পাঠায়। আমরা তাদের সঙ্গে চুক্তি খসড়া নিয়ে আলোচনা করি। উভয় সরকারকে অবহিত করি এবং এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্যে আমি ও তৎকালীন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কামাল লোহানী জিডিআর যাই।

জিডিআর যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যায় আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে যাই। ঢুকেই আমি প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন সচিব এককালের পুলিশ প্রধান আব্দুর রহিমকে লেখার কাগজ নিয়ে আসার অনুরোধ জানাই। তাকে বলি, আমার সেই মামলাটা প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি লিখে দিন। কারণ ওই মামলা চলতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে ঘটনা ছিল ভিন্নরকম। আমার বন্ধু কোলকাতায় ছ'মাস থেকে চলে এসেছে। কিন্তু মামলা নিয়ে আদৌ এগোনো যাচ্ছিল না। পুলিশ কর্তৃপক্ষ বারবার বাধা দিচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রী কোনো কিছু করতে পারছিলেন না। আমার বন্ধুকে বাঁচানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। এ সময় জানা গেল, পুলিশের সকল কর্মকাণ্ডই একটি ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করে রচনা করা হয়েছে। যে বাড়িতে অস্ত্র পাওয়া গেছে সে বাড়ির মালিক আমার বন্ধুর এক পড়শি। অথচ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে মামলায় জড়ানো হয়েছে আমার বন্ধু এবং তার পরিবারকে। আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল—বিদেশ যাওয়ার আগে এর একটি ফয়সালা করে না গেলে আমার বন্ধুর বিপদ হবে। আমার অনুপস্থিতিতে দুঃখজনক কিছু ঘটে যেতে পারে।

আমিও তাই প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে ঢুকেই মামলা প্রত্যাহারের কথা বললাম। রহিম সাহেবকে কাগজ আনতে বলে প্রধানমন্ত্রীকে সব ঘটনা জানালাম। তিনি যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, আপনি বিদেশ চলে যান। আমি দেখছি কী করা যায়। আমাদের সঙ্গে সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী গিয়াস কামালকে বললেন—তুই এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখবি। প্রধানমন্ত্রী তাঁর কথা রেখেছিলেন। দেশে ফিরে এ মামলা নিয়ে আমাকে তেমন আর ঝামেলা পোহাতে হয়নি। শুধুমাত্র এসব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেয়া দরখাস্তটি ফিরিয়ে আনা হয়নি।

প্রায় মাস খানেক পর ঢাকায় ফিরে বিমানবন্দরেই খবর পেলাম ভিন্ন ধরনের। ১৭ মার্চ জাসদের মিছিলে গুলি হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছেন গণকণ্ঠ সম্পাদক কবি আল মাহমুদ।

www.nagorikpathagar.com

মনটা খিঁচিয়ে গেল। ভাবলাম দেশে ফিরে আরেক গোলমালে পড়তে হবে। আবার সরকারের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডায় যেতে হবে। এক অপূর্ব দেশে জন্মগ্রহণ করেছি আমরা। অন্য কোনো দেশের সঙ্গে তার যেনো তুলনা নেই।

পৃথিবীর যে কোনো দেশে পত্রিকা বন্ধ হলে বা সম্পাদক গ্রেফতার হলে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করে রাজনৈতিক দল। তারা মিছিল করে। সমাবেশ করে। প্রতিবাদ করে। তাদের কাছে পত্রিকা বন্ধ হওয়া বা সম্পাদক গ্রেফতার হওয়া গণতন্ত্রের ওপর হস্তক্ষেপ। তাই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং শ্রমিক সংগঠন সামনে এগিয়ে আসে।

কিন্তু পাকিস্তান আমল থেকে আমাদের দেশে তেমনটি ঘটেনি। সব দায়িত্ব নিতে হয়েছে সাংবাদিক এবং সংবাদপত্র কর্মচারীদের। কাউকে বোঝানো যায়নি, পত্রিকা বন্ধ হলে সকলের বাকরুদ্ধ হবে। এখানে মুখ্য প্রশ্ন সাংবাদিক ও সংবাদপত্র কর্মচারীদের রুটি-রুজির নয়। এ ক্ষেত্রে মুখ্য প্রশ্ন গণতন্ত্র। কিন্তু তবুও রাজনৈতিক দলগুলোর টনক নড়েনি। দু'একটি বিবৃতি দিয়ে তারা দায়িত্ব শেষ করেছে। পাকিস্তান আমলে বারবার সংবাদপত্র বন্ধ হয়েছে। আইয়ুব আমলে ইত্তেফাক বন্ধ হয়েছে। সেকালে ইত্তেফাক ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ ও দাবি আদায়ের মুখপত্র। সেই ইত্তেফাক বন্ধ করা হলে কেউ হরতাল বা ধর্মঘট ডাকেনি। ধর্মঘট ডেকেছে সংবাদপত্র শিল্পের কর্মচারীরা।

এ ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের এবং এ ঐতিহ্যের একটি ভিন্ন কারণও আছে। এই ঐতিহ্যের জন্যে লক্ষ করা গেছে সেকালের পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলো কখনো কখনো রাজনৈতিক দলের ভূমিকা পালন করেছে।

তাই লক্ষ করেছি এদেশের মানুষ কোনো অঘটন ঘটলে প্রেস ক্লাবের দিকে তাকিয়েছে। দেখার চেষ্টা করেছে সাংবাদিকরা কিছু করছে কিনা। তারা তাকিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। সকলের প্রত্যাশা কেউ প্রতিবাদ না করলেও এদেশের ছাত্র সমাজ প্রতিবাদ করবেই। তাই লক্ষ করা গেছে পাকিস্তান আমলে রাজনীতির দুই প্রধান কেন্দ্র ছিল প্রেসক্লাব ও বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন।

এ প্রেক্ষিতেই ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় রাজনৈতিক নেতারা প্রেস ক্লাবে গিয়েছিলেন। সাংবাদিকরাই সেকালের ঐতিহাসিক ঘোষণা 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' প্রণয়ন করেছিলেন। সেকালের পূর্ব পাকিস্তানের সব ক'টি প্রধান দৈনিকের এ ঘোষণা প্রথম সংবাদ হিসেবে ছাপা হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রেস ক্লাব এবং সাংবাদিকরা ছিল প্রথম সারিতে।

www.nagorikpathagar.com

ঠিক একইভাবে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল আইয়ুব আমলে। খাজা সাহাবুদ্দিন তখন পাকিস্তানের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী। তিনি ঢাকার প্রেস ক্লাবে এসে ঘোষণা দিলেন, বেতার-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হলো।

সে সময় কৌতুক করে বলা হতো, গভর্নর মোনায়েম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান আবদুল হাইকে নাকি প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারেন না কেন?

খাজা সাহাবুদ্দিনের এ ঘোষণার পর সারাদেশে বুদ্ধিজীবীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। তার নেতৃত্বেও ছিল ছাত্র সমাজ ও প্রেস ক্লাব। এর পেছনে ছিল আর একটি ইতিহাস।

সে ইতিহাসের জন্ম পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। সেকালে যারা সংবাদপত্রে কাজ করত তাদের অধিকাংশই ছিল বাম দলের সদস্য। পরবর্তীকালে সংবাদপত্রই বামপন্থীদের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়াল। বামপন্থীরা গ্রেফতার হতো রাজনৈতিক কারণে। তারা কোথাও চাকরি পেত না। চাকরি পেতে হলে পুলিশের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হতো। সংবাদপত্রে চাকরিতে পুলিশের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হতো না এবং বাঁচার স্বার্থে যে কোনো মাইনেতে বামপন্থীরা সংবাদপত্রে চাকরি নিত। চাকরিতে তারা ছিল একনিষ্ঠ। রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, কে জি মুস্তফা, হাসানুজ্জামান খান, শহিদুল্লাহ কায়সার, আমি, আমরা এরকম কিছু পেশাদার রাজনীতিক হিসেবে সংবাদপত্রে এসেছিলাম।

১৯৫৯ সালের কথা। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের এক বছর কাটতে চলল। ডাকসুর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২৪ ঘণ্টার নোটিসে ঢাকা হল অর্থাৎ শহিদুল্লাহ হল থেকে আমাকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে আমাকে কলা ভবনে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। তখন বন্ধু আহমেদুর রহমান ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ভীমরুল ছদ্মনামে কলাম লিখতেন। ইত্তেফাকের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন এমএ আউয়াল। তিনি দীর্ঘদিন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আমি ছিলাম দফতর সম্পাদক। একদিন আহমেদুর রহমান এসে বললেন, আপনাকে ইত্তেফাকে জয়েন করতে হবে। আউয়াল সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি বলেছিলাম, আমি রাজনীতি করি। কারো অধীনে চাকরি করব না। টিউশনি করেই বেঁচে থাকব। বন্ধুরা বললেন, এভাবে বেঁচে থাকা যাবে না। গ্রেফতার হলে সাংবাদিক হিসেবেই মুক্তি দাবি করা যাবে। বন্ধুদের কথায় ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে ইত্তেফাকে যোগ দিলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

www.nagorikpathagar.com

অক্টোবরে শেষ সপ্তাহে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়ে গেলাম। ১৯৬২ সালে জেলখানা থেকে এসে যোগ দিয়েছিলাম দৈনিক জেহাদে। তখন থেকে রাজনীতির সঙ্গে আমার অন্যতম পেশা হচ্ছে সাংবাদিকতা। আমার মতোই অধিকাংশ সাংবাদিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমাদের দেশের সাংবাদিকদের একটি রাজনৈতিক পরিচয় ও অবস্থান ছিল সর্বকালের। ফলে কোনো জাতীয় সমস্যা দেখা দিলে সাংবাদিক এবং একই সঙ্গে রাজনীতিকের ভূমিকা পালন করতে হতো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার স্বাক্ষর আছে।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও সে ঐতিহ্য অব্যাহত ছিল। গণতন্ত্রের সংগ্রামে সাংবাদিকদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। মানুষ মনে করতো সাংবাদিকরা সব সমস্যার সমাধান দেবে। তারাই গণতন্ত্রের লড়াই করবে।

কিন্তু কেউ লক্ষ করলো না যে, ১৯৭১ সালের পর জাতীয় জীবনে একটি মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে একটি ঐক্য ছিল। সেই ঐক্য থাকার জন্যে সাংবাদিকদের মধ্যেও ঐক্য ছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এককালের সংগ্রামের শরিক আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায়। বাকি সব বিরোধী দলে। তাই সাংবাদিকদের সমস্যাও এখন অভিন্ন নয়। এ পরিস্থিতি কেউ অনুধাবন করল না। সংবাদপত্র শিল্পে একের পর এক সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকল। ওই সমস্যা জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও সকলে আগের মতো পাশ কাটিয়ে থাকল যে সাংবাদিকরাই সকল সমস্যার সমাধান করবে।

এ সময় সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলাম আমি। তাই ঢাকা বিমানবন্দরের পৌছে গণকণ্ঠ সম্পাদক কবি আল মাহমুদের গ্রেফতারের খবর শুনে মনটা খিঁচিয়ে গেল।

বুঝলাম ঘটনাটি জাসদ ও আওয়ামী লীগ সরকার ঘটালেও এর দায় বহন করতে হবে আমাদের অর্থাৎ সাংবাদিকদের।

জাসদ ১৭ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর বাড়ি ঘেরাও করেছিল। সেই ঘেরাওকে কেন্দ্র করে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য আছে। বলা হয় জাসদের মিছিল থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভবন লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। অপর পক্ষে বলা হয় রক্ষীবাহিনী জাসদের মিছিলে বেধড়ক গুলিবর্ষণ ও লাঠিপেটা করেছিল। কোন পক্ষের বক্তব্য সত্য সে নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ওই দিন যে অসংখ্য জাসদ কর্মী ও নেতা আহত ও নিহত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি তখন পূর্ব ইউরোপে ছিলাম। কোনো খবরই পাইনি। ঢাকা বিমানবন্দরে পৌছাতেই

www.nagorikpathagar.com

বিমান কর্মীরা বলল, আবার গণকণ্ঠ বন্ধ হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছেন গণকণ্ঠের সম্পাদক।

আমি খানিকটা অবাক হলাম। বুঝতে পারলাম যে জাসদ এ ধরনের একটি ঘেরাও কেন করল। ঘেরাও করতে হলে প্রধানমন্ত্রী ভবন ঘেরাও করাই স্বাভাবিক ছিল। তারা সে কাজটি করল না। সকলেরই জানা ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন বাসায় ছিলেন না। এরপরও কেন যে জাসদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসা ঘেরাও করেছিল সে ব্যাখ্যা আজো আমি পাইনি। তবে বেশ কিছুদিন যাবত জাসদের মধ্যে একটি অস্থিরতা লক্ষ্য করেছিলাম। আমার ধারণা জাসদের এ অস্থিরতা ছিল জন্মলগ্ন থেকেই।

জাসদের জন্ম আমার কাছে অনেকটা রহস্যময় ছিল। আমার রাজনীতির প্রথম দিন থেকেই আমি সমাজতন্ত্রের একটি দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। দীর্ঘদিন তাদের ছাত্রফ্রন্টের কাজ করেছি। কিন্তু দলের সদস্যপদ পাইনি। এমনকি সদস্য পদের জন্যে আবেদনের অনুমতিও দেয়া হয়নি। ছাত্রফ্রন্টের সেল-এর সদস্যপদও পাইনি। এ ধরনের দলের সদস্যপদ পাওয়া খুবই কঠিন। দীর্ঘ দিনের পরীক্ষা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এসকল দলের সদস্যপদ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। অথচ একদিন সুপ্রভাতে ঘোষণা হলো জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ নামে একটি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দলের জন্ম। এ দলের লক্ষ্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র এবং লক্ষ করলাম রাতারাতি এ দলের সদস্যসংখ্যা হাজার থেকে লক্ষের কোঠায় পৌঁছাতে যাচ্ছে। এ দলের লক্ষ্য সম্পর্কে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল দলটি যদি সমাজতন্ত্র চায় তাহলে ঘটা করে বৈজ্ঞানিক কথাটি লেখার দরকার কী। তাতে কী বাড়াবাড়ি হয়ে যায় না কি।

কেউ নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারেন এই উপমহাদেশে অনেক আগে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম নিয়েছে। কমিউনিস্ট শব্দের আগে বিপ্লবী শব্দটি বসানো গেলে সমাজতন্ত্রের আগে বৈজ্ঞানিক শব্দটি বসাতে আপত্তি কোথায়? আমার জবাব হচ্ছে, ভারতে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গঠনেরও একটি ইতিহাস ও তাৎপর্য আছে। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (Revolutionary Communist Party of India—RCI) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সৌমেন্দ্র ঠাকুর লেনিনের সমসাময়িক ছিলেন। এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের বলশেভিক পার্টির সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের সাথে তাঁর মতানৈক্য হয়। ফলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাথেও তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। সেই পটভূমিতে সৌমেন ঠাকুর বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। বাংলাদেশের জাসদের

www.nagorikpathagar.com

কাছে এ সমস্যা ছিল না। জাসদ—জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ইংরেজিতে National Socialist Party। জার্মানির হিটলারের দলেরও একই নাম ছিল। সেই নাম গ্রহণ করে ললাটে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র লিখে দিলে যে সংশয় এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয় এ ধরনের দল গঠনের কারণ কী। আওয়ামী লীগ থেকে ভেসে এসে এ ধরনের একটি সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের তখন কোনো কার্যকারিতা ছিল কি এবং তখন থেকেই আমার ধারণা ছিল রাজনীতিতে একটি গোজামিল দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। একথা আমি পূর্বেও লিখেছি এবং লক্ষ করা গেছে, এ ধরনের গোজামিলের ফলে জাসদ প্রথম থেকেই অস্থিরতায় ভুগছে। তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব ছিল না তাদের আশু এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণের।

জাসদ ছিল মূখ্যত একটি দুঃসাহসী টগবগে তরুণের দল। এরা অস্ত্র হাতে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছে। তাদের চোখে অনেক স্বপ্ন। তাদের জীবন দেবার নেশা অফুরন্ত। তাদের চোখে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন। কিন্তু এই স্বপ্ন রূপায়নের কোনো পরিকল্পনা তাদের চোখের সামনে নেই। অভিজ্ঞতা নেই নেতৃত্ব নেই। আছে অশান্ত তারুণ্য। এই তরুণদের স্বপ্ন ধারণ করা আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগ কোনো সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে বিশ্বাসী দল নয়। আওয়ামী লীগ উঠতি বাঙালি ধনীদের একটি নড়বড়ে প্রতিষ্ঠান। এই আওয়ামী লীগ থেকে বিপ্লবের চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। এই অশান্ত তরুণদের বাঁচাতে হলে আওয়ামী লীগ ছাড়তেই হবে।

কিন্তু তারপর? তারপর কী হবে? এই তরুণেরা কেন সংগঠন গড়ে তুলবে। এই তরুণরা সবাই কি একই মত-পথে বিশ্বাসী? শুধুমাত্র তারুণ্যের উচ্ছ্বাসই কাউকে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী করে তোলে না। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে ত্যাগ, তিতীক্ষা ও অনিশ্চিত সংগ্রামী জীবনকে গ্রহণ করে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের পথে এগুতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয় দলীয় কাঠামো। সব প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নিতে হয় শ্রেণির ভিত্তিতে। জাসদের ক্ষেত্রে তার কোনোটাই ঘটেনি। আওয়ামী লীগ ছেড়ে আওয়ামী লীগের মতো একটি সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে জাসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবস্থা এমন না হলে মেজর জলিলের মতো রাজনীতিতে একান্ত অপরিচিত ব্যক্তি হুট করে জাসদের সভাপতি হতে পারতেন না। অর্থাৎ প্রথম থেকেই একটি গোজামিলের ভিত্তিতে জাসদের সৃষ্টি হলো। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে আওয়ামী লীগের মতোই একটি রাজনৈতিক দল দাঁড় করাবার চেষ্টা হলো। আর প্রশ্ন দেখা দিল ভিন্ন ক্ষেত্রে।

www.nagorikpathagar.com

লক্ষ্য সমাজতন্ত্র অথচ সাংগঠনিক কাঠামো আওয়ামী লীগের। এই কাঠামো নিয়েই সংগ্রাম করতে হবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। তাহলে সরকারি দলের সাথে তফাৎ কোথায়? এ তফাৎ দেখাতে গিয়ে বিপত্তি ঘটল। একমাত্র কড়া কড়া কথা, প্রতিদিন হুমকি এবং যখন তখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি জাসদের নিত্যদিনের কাজ হয়ে দাঁড়াল। কারণ এই অশান্ত তরুণদের হাতে রাখতে হলে তাদের কাজ দিতে হয়। একটি সমাজতন্ত্রী দল সে কাজ খুঁজে নেয় শ্রমিক কৃষক এবং মেহনতি মানুষের এলাকায়। খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে শক্তিশালী সংগঠন থাকলেই রাজপথের আন্দোলন শক্তিশালী হয়। একটি শ্রেণি ভিত্তি পায়। জাসদ তার জন্মলগ্নে এভাবে শ্রেণিভিত্তি ও শক্তি অর্জনের পূর্বেই প্রকাশ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এটা ছিল নেতৃত্বের এক ধরনের চমক। নিজেদের ভেজাল রাজনীতি গ্রহণযোগ্য করার জন্যে কথায় কথায় তরুণদের ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামে। এ ধরনের একটি কাজই ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ জাসদ করেছিল। আমি যতদূর জানি কোনো পূর্ব সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেদিন পল্টন ময়দান থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করার জন্যে জাসদের মিছিল গিয়েছিল। সেদিন কেন মিছিল গিয়েছিল তার প্রকৃত ব্যাখ্যা কোনোদিন পাওয়া যায়নি। আর আমার মনে হয়েছিল এটাও ছিল জাসদের লক্ষ্যহীন রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি।

তবে এর একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। একজন রাজনৈতিক ভাষ্যকারের মতে জাসদ ছিল একটি তরুণের দল। এরাই ছিল ১৯৭১ সালের সংগ্রামের স্থপতি। এরা ছয়কে নয় করতে পারে। ১৯৭১ সালের সংগ্রামের পর তাদের নিয়ে জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের একটি ভয় ও শঙ্কা ছিল। ভয় ছিল এরা হয়তো বাম রাজনীতিতে ঝুঁকবে। সমাজতন্ত্রের পথ ধরবে। এরা এখন স্বপ্নীল। এরা ঐক্যবদ্ধ হলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন অনিবার্য। তাই এদের ঠেকাতে হবে। লাল পতাকা দিয়ে লাল পতাকা ঠেকাতে হবে। লাল পতাকা দিয়ে লাল পতাকা ঠেকাবার মতোই সমাজতন্ত্রের স্লোগান দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে হবে। এই হঠকারী স্লোগানের ভিত্তিতে প্রতিদিন আন্দোলন করতে গিয়ে ওই টগবগে তরুণগুলো নিঃশেষিত হবে। আর সাধারণ মানুষের কাছে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটাই হবে ভয় এবং শঙ্কার। প্রশ্ন উঠতে পারে সমাজতন্ত্র বিরোধীরা যদি সবকিছু বুঝেশুনে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে তবে বামপন্থীরা কিছু করল না কেন? আজকে আমার কথায় নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয়, আমার মতো বামপন্থী সবকিছুই বুঝতে পেরেছিলাম। আবার একথাও প্রমাণিত হয় যে, আমাদের ব্যর্থতা পর্বতপ্রমাণ। এরও একটি পটভূমি আছে।

www.nagorikpathagar.com

প্রশ্ন উঠেছিল সেকালের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে নিয়ে এমন ষড়যন্ত্র করতে পারলে তৎকালীন বামপন্থীরা কী করেছিল। একদল অশান্ত মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ দেশের প্রতিষ্ঠিত বাম দলগুলোতে যোগ না দিয়ে নতুন দল গড়তে গেল কেন? বিদেশিরা ষড়যন্ত্র করল একথা বললেই কি এ প্রশ্নের জবাব হয়ে যায়?

আমার জবানবন্দিতে এ প্রশ্নের জবাব আমি বারবার দিতে চেষ্টা করেছি। আজকেও আমার জবাব হচ্ছে সেকালে বাংলাদেশে বামপন্থীদের জীর্ণ দশা। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর নতুন করে কোনো বামপন্থী দল জন্মগ্রহণ করেনি। সর্ব ভারতীয় সূত্রে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল (আরএসপি)-এর অস্তিত্ব ছিল। দু'টি দলের নেতৃত্বে ছিল মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়। দেশ বিভাগের ফলে নেতৃত্বের শূন্যতা দেখা দেয়। অপরদিকে নেমে আসে পাকিস্তান সরকারের চরম নির্যাতন। কমিউনিস্ট পার্টি তার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ফলে কোনোরকম টিকে থাকলেও আরএসপির অস্তিত্ব নড়বড়ে হয়ে যায়। আত্মগোপন করে কমিউনিস্ট পার্টি অস্তিত্ব রক্ষা করতে চেষ্টা করে। অপরদিকে আরএসপি শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে কোনোমতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে।

এ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনকে কেন্দ্র করে বিভক্তি দেখা দেয়। আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি একান্তভাবেই বিদেশ নির্ভর বলে একেবারে যান্ত্রিকভাবে এদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতেও মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী হিসেবে বিভক্তি দেখা দেয়। ১৯৫৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ গঠন করে। কমিউনিস্ট পার্টির কথায় এ দলটি ছিল প্রগতিশীল জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠান। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় এ দলের মাধ্যমে তাঁরা কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইতিপূর্বে কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের মাধ্যমে কিছুটা কাজ করতো। কিন্তু শহীদ সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আসার পর বামপন্থীদের পক্ষে আওয়ামী লীগে কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক। আর সেটা ছিল আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তখন তীব্র সংঘর্ষ ছিল। এই সবকিছু মিলেই এদেশের কমিউনিস্টদের আওয়ামী লীগ করা সম্ভব ছিল না এবং তাদের উদ্যোগেই গঠিত হয় ন্যাপ। আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষণীয় যে পিকিং-মস্কো দ্বন্দ্ব ন্যাপেও প্রভাব ফেলে। ন্যাপ বিভক্ত হয়ে যায়। ন্যাপের প্রথম

www.nagorikpathagar.com

সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী। আর মস্কোপন্থী অংশের প্রেসিডেন্ট হলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এ বিভক্তি বামপন্থী আন্দোলনে বিপর্যয় ডেকে আনে। পরবর্তীকালে দুই ন্যাপেই ভাঙন সৃষ্টি হয়। মস্কোপন্থী নামের ভাঙন সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও পিকিংপন্থী ন্যাপের ভাঙনের কোনো শেষ ছিল না। এদের কোনো কোনো অংশ ৭১-এর যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। আর মস্কোপন্থী ন্যাপের বন্ধুরা মস্কোর নির্দেশ ব্যতীত কোনো পদক্ষেপই নেয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে গোপনে তারা যতই দলিল লিখুক না কেন প্রকাশ্যে তাদের ভূমিকা ছিল বিভ্রান্তিমূলক। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পূর্বে তাদের কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পক্ষে ভূমিকা গ্রহণ করেনি। এ হলো কমিউনিস্ট বামপন্থীদের কথা। আর আমরা যারা আরএসপি করতাম তাদের বিপদ ছিল নানা দিক থেকে। শুধুমাত্র সরকার বা বুর্জোয়া দলগুলোর পক্ষ থেকে নয়, মস্কো এবং পিকিংপন্থী দুই কমিউনিস্ট পার্টি ছিল আমাদের ঘোর বিরোধী। আমাদের সম্পর্কে কোনো তাত্ত্বিক লেখাপড়া না করেই আমাদের ট্রটস্কিবাদী বলে অভিহিত করত। আমার ছাত্রজীবন থেকে আমি নিশ্চিত যে আমাদের ওই বন্ধুদের অধিকাংশ ট্রটস্কির কোনো বইয়ের একটি পাতাও উল্টিয়ে দেখেনি। অনেককে আমি হেসে ইংরেজিতে ট্রটস্কি নামের বানান জিজ্ঞেস করে কোনো উত্তর পাইনি। তাদের এই অন্ধতা ও অন্ধ বিরোধিতা আমাদের পদে পদে বিব্রত করত। মস্কো পিকিং বিভক্তির আগে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুরা বলতেন তাঁরাই একমাত্র কমিউনিস্ট। অন্য সবাই আমেরিকার এজেন্ট। এই মনোভাব থেকেই তারা ৬০-এর দশকে আমাদের নেতৃত্বে আইয়ুব আমলে ঐতিহাসিক চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের সময় তারা মালিকের সাথে সহযোগিতা করেছে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী চুক্তি করে ধর্মঘট ভেঙেছে। আর এই চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সাফল্যের মধ্য দিয়েই ষাটের দশকে আমরা রাজনীতিতে পথে উঠেছিলাম। ১৯৬৯ সালে এককালের আরএসপির নেতা ও কর্মীদের উদ্যোগে আমরা গঠন করেছিলাম শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল। এ দল গঠনের এক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আসন্ন হয়ে উঠল। এ কথা সত্য, চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট শিল্প এলাকায় এক নতুন সংগ্রামের পরিবেশ সৃষ্টি করে। খুলনা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সকল শিল্প এলাকায় শ্রমিকরা আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে। তখন শ্রমিক এলাকায় আমরা ছাড়া কাজী জাফরদের সংগঠন ছিল টঙ্গী এলাকায়। আমরা আন্দোলন করেছিলাম কঠোর সামরিক সরকারের আমলে। আইয়ুব খান তখন প্রেসিডেন্ট। মোনায়েম খান গভর্নর।

www.nagorikpathagar.com

এই আন্দোলনে আমাদের সাফল্যে শ্রমিকরা সাহসী হয়ে উঠল। ষাটের দশকের শেষ দিকে ঘেরাও আন্দোলনের শরিক হয় এবং সেই জোয়ারেই তারা ১৯৭১ সালের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমাদের বাম প্রগতিশীল কোনো লেখকের লেখায় এই ইতিহাস পাওয়া যাবে না। তাঁরা লিখবেন না যে আমাদের কোনো ভূমিকা ছিল। এককভাবে সবকিছু যেন তাঁরা করেছেন। অথচ একাত্তরের পূর্বেও সে আন্দোলনে তাঁদের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না।

কিন্তু ৭১-এর সংগ্রামে আমাদের তেমন ইতিবাচক ভূমিকা ছিল না। আমরা আমাদের শ্রমিকদের ৭১-এর সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম কি? আদৌ নয়। আমি ইতোপূর্বে বারবার উল্লেখ করেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা। এ ব্যাপারে সেকালের বিভিন্ন আত্মগোপনকারী বামপন্থী দলসহ ছাত্রলীগের নেতারাও আমাদের সাথে কথা বলেছেন। আমরা বারবারই বলেছি স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা আমরা জানতে চাই। আমরা আর একটা পাকিস্তান গড়তে চাই না। আমরা শোষণমুক্ত বাংলাদেশ চাই। এ কথায় আমাদের সাথে আলোচনা ভেঙে গেছে।

আমাদের ভূমিকা ওই পর্যন্তই। এর পরে আমরা দেশ স্বাধীন করার নিজস্ব কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করিনি। হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকেছি। ১৯৭১ সালে সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর আমরা গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেজেছি। আমার জানা মতে এটাই ছিল মোটামুটিভাবে বামপন্থীদের ভূমিকা।

পরিস্থিতি এমন হলে একাত্তরের পরে টগবগে অশান্ত তরুণদের দলে টানা যেত। তাদের আকৃষ্ট করা যেত। আমি মনে করি বামপন্থীদের ভূমিকার জন্যেই আওয়ামী লীগের সেই অশান্ত তরুণরা ভিন্ন দল করেছে। প্রতিষ্ঠিত কোনো বাম দল তাদের টেনে নিতে পারেনি।

তবে ষাটের দশকের শেষ দিকে পূর্ব বাংলা স্বাধীনতার ডাক দিয়ে একটি নতুন দল আত্মপ্রকাশ করেছিল। দলটির নাম সর্বহারা পার্টি। নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড সিরাজ সিকদার। দলটি কখনো ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে আসেনি। এ দলের অনেক সদস্যই অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু এক সময় কোনো অর্জন ছাড়া এ দলের জীবন দেয়াটাই বড় হয়ে উঠেছিল। ফলে দেখা দেয় অভ্যন্তরীণ সঙ্কট এবং নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব। এ দলটি চমক সৃষ্টি করলেও কোনো বিকল্প রাজনীতির ছবি তরুণদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারেনি।

এই প্রেক্ষাপটেই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে একটি নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। একটি রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলোর

www.nagorikpathagar.com

ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। জন্ম নিয়েছিল একটি সংগ্রামী তরুণ গোষ্ঠী। সেকালের বামপন্থীরা তাদের ধারণ করতে পারেনি। ধারণ করতে পারলে এদেশের ইতিহাস ভিন্নভাবে লিখিত হতো।

সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন তখন বিপর্যস্ত। আমরা মাত্র কয়েকটি দল। অলি আহাদ সাহেবের জাতীয় লীগ, লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, ভাসানীপন্থী ন্যাপ ও আমাদের দল শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল। আন্দোলনে জাসদের ভূমিকা নড়বড়ে। মওলানা ভাসানীর ভূমিকাও স্পষ্ট নয়। তিনি কোনো যৌথ সিদ্ধান্ত মানেন না। আমরা এক সময় আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়েছিলাম। তিনি নির্দিষ্ট দিনের আগেই এসে নিজে নিজেই আইন অমান্য করলেন। কাগমারি চলে গেলেন। শুনলাম তিনি অন্তরীণ হয়েছেন। এ ব্যাপারে আমার বরাবরই সংশয় ছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে মওলানা সাহেব গ্রেফতার হতে পারেন বা তাকে অন্তরীণ করা হতে পারে এ কথা আমি আজো বিশ্বাস করি না। এ সময় কখনো কখনো গ্রেফতার হতেন মশিউর রহমান এবং অলি আহাদ। এর মধ্যে মশিউর রহমান সম্পর্কে নানারকম কথা ছিল। সবচে' বেশি বিভ্রান্তি ছিল এককালের পিকিংপন্থীদের নিয়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা যে কত ভাগে বিভক্ত হয়েছিল সে হিসাব করা আজো কঠিন। মতিন, আলাউদ্দিন, হক, তোয়াহা, জাফর-মেনন, এর পরে সর্বহারা পার্টি। এ নামগুলো তখন পিকিংপন্থী বলে বলা হতো। আবার এদের মধ্যেও দল-উপদল ছিল। কারো সাথে কারো সদ্ভাব ছিল না। অপরদিকে মস্কোপন্থী বলে কথিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, দুই ন্যাপ এবং একতা পার্টি তখন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষে। ফলে আন্দোলন গড়ে তোলাই ছিল কষ্টকর। আত্মগোপন করা সর্বহারা পার্টি কখনো কখনো হরতাল ডেকে বা থানা লুট করে চমক সৃষ্টি করত। আন্দোলনের পরিবর্তে সৃষ্টি হতো ভয় এবং শঙ্কা।

তখন আমার নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হতো। দেশ স্বাধীন হয়েছে। পাকিস্তান আমলের কাঠামো নেই। আমাদের দল সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। দু'বছর না কাটতেই স্বাধীনতা সংগ্রাম। দল দাঁড়াতেই পারছে না। এককালে শিল্প এলাকায় শক্তিশালী ছিলাম। তাই সকলের লক্ষ্যবস্তু আমরা। আমাদের দলছুটরাই জাতীয় শ্রমিক লীগ গঠন করে এবং সরকারের ছায়ায় একের পর এক আমাদের ইউনিয়ন হাইজ্যাক করতে শুরু করে। ঢাকায় প্রতিবাদ সভা করা যায় না। সরকারি দল হামলা করে। থানায় এজাহার করা যায় না। আমি সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি বলে কিছু কিছু সামাল দিতে পারি। কিন্তু সাংবাদিক ইউনিয়নের অবস্থাও ভালো নয়।

www.nagorikpathagar.com

আমি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছি। কিন্তু সাংবাদিক ইউনিয়নে আমার দলের একজনও সদস্য নেই। ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ, ভাসানী এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যাই বেশি। এদের মধ্যে অনেককেই অন্ধ সরকার বিরোধী। আবার অনেকে সরকারের অন্ধ সমর্থক। যারা দেশের স্বাধীনতা চায়নি ইউনিয়নের তাদের সংখ্যাও কম নয়। অপরদিকে ইউনিয়নের প্রবীণ নেতারা অধিকাংশ পেশা ছেড়ে চলে গেছেন। অনেকে খুন হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে। এই পরিস্থিতিতে ভারসাম্য বিধান করা আদৌ সহজ ছিল না। এরপরে ছিল স্বাধীনতা উত্তর অস্থিরতা। হুমকি এবং সন্ত্রাস। আমি নিতান্তই বিব্রত। দেশ স্বাধীন হলো ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। ঢাকা ফিরতে ফিরতে ডিসেম্বর শেষ। তারপর ৭২-৭৩ চলে গেছে। বাড়ি ফিরতে পারিনি। ঢাকায়ই থাকতে হয়েছে। আমার ভাবনার মধ্যে হয়তো একটা বাড়াবাড়ি ছিল। ভাবতাম ঢাকা ছেড়ে গেলে কী অবস্থা হবে। দলের প্রতিদিনের সমস্যা, ইউনিয়নের প্রতিদিনের সঙ্কট। এ সঙ্কটকে মোকাবেলা করবে কে?

এর মধ্যে গ্রাম থেকে একটি খবর এল। খবর হচ্ছে কোটালীপাড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নাম হয়েছে শেখ লুৎফর রহমান আদর্শ মহাবিদ্যালয়। নাম পরিবর্তন করেছে আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা, যারা কোনোদিন এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ধারে কাছেও ছিল না। দেশ স্বাধীন হবার পর তারা সব ব্যাপারেই কর্তা সেজে বসেছিল। এরপর একদিন কলেজের অধ্যক্ষ প্রেসক্লাবে এসে আমার সাথে দেখা করলেন। তিনি বললেন, তিনি কলেজে একটি নতুন বিভাগ খুলেছেন। এই বিভাগে মুজিববাদ পড়ানো হবে। আমি অবাক বিস্ময়ে অধ্যক্ষের দিকে তাকালাম। মনে পড়ল ৭১ সালে তাঁর ভূমিকা এবং মনে হলো সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে তিনি এ কাজটি করেছেন। তিনি আমাকে জোর করেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি বললাম, আপনি মুজিববাদের অর্থ জানেন? কলেজে এই বিভাগ খোলবার আগে আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে এই বাদের ব্যাখ্যা কী। পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, সাম্যবাদের সংজ্ঞা বই পুস্তকে আছে। মুজিববাদের এমন একটা সংজ্ঞা আপনি দিতে পারবেন? তিনি চুপ করে গেলেন।

কোটালীপাড়া কলেজের একটি ইতিহাস আছে। ষাটের দশকের শেষ দিকে ঢাকায় আমরা কয়েক বন্ধু কোটালীপাড়ায় একটি কলেজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এর মধ্যে আমি ছাড়া অ্যাডভোকেট শরাফত চৌধুরী,

www.nagorikpathagar.com

অ্যাডভোকেট বজলুর রহমান এবং প্রতিষ্ঠার পুরোভাগে ছিলেন অ্যাডভোকেট কাজী হারুনার রশিদ। যিনি মুংগু কাজী নামে পরিচিত। টাকা, ধান, চাল ও জমি দিয়ে এলাকার মানুষের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় আলোচনা হয়েছিল কলেজের নাম নিয়ে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী বা শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এই কলেজের নাম রাখার প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল কোনো ব্যক্তির নামে নয়, কোটালীপাড়ার নামে এই কলেজের নামকরণ করা হবে এবং এই নামেই কলেজ স্বীকৃতি পায়।

সবকিছু পাল্টে গেল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। যারা কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় কাছাকাছি ছিল না তারা কোন জাদুবলে সব কিছু করার এখতিয়ার পেয়ে গেল। আমার মনে হয় শুধুমাত্র তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার জন্যেই প্রধানমন্ত্রীর পিতার নামে কলেজের নামকরণ করল। আমাদের মতামত নেয়ার প্রয়োজনও অনুভব করল না। আর এ ঘটনার পরে অধ্যক্ষ আমার কাছে এলেন কলেজে মুজিববাদ পড়াবার জন্যে বিভাগ খুলবার কথা শোনাতে। আমার সেদিন ঘৃণা হয়েছিল শিক্ষক নামক এই প্রাণিটির জন্যে। চামচাগিরি করে নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্যে শিক্ষিত বলে কথিত এই প্রাণিগুলো যে কত নিচে নামতে পারে, এই ভদ্রলোক ছিলেন তার অন্যতম উদাহরণ।

আমি ভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে গণভবনে গেলাম। তখন গণভবনে ছিল আমার অবারিত দ্বার। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের কলেজের নাম পাল্টাল কেন। তিনি বললেন, আপনাদের কথা আমি জানব কী করে। আমি বললাম, আপনি না জানলে এ কাজ হতে পারে না। আপনি জানেন, আমরা কারো নামে কলেজ করতে রাজি হইনি। পাকিস্তান আমলে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল কোনো ব্যক্তির নামে কলেজ হবে না। অথচ আপনারা ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই সে পরিস্থিতি পাল্টে গেল। আমরা বরাবরই একটি নির্দিষ্ট অর্থে কোনো ব্যক্তির নামে কলেজ করতে রাজি হইনি। সে ব্যাখ্যা আপনি জানেন। আদর্শ কলেজ হতে হলে আদর্শ ব্যক্তির প্রয়োজন। আমাদের দেশে আদর্শ ব্যক্তির খুব অভাব। এ কথা ভেবেই আমরা কোটালীপাড়া কলেজ নামকরণ করেছিলাম। এ কথা জেনে আপনিও কিছু বলেননি। ঠিক আছে—আপনারা যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, কলেজের নাম পরিবর্তন করবেনই, তাহলে প্রয়োজনীয় টাকাটা আপনাদের সংগ্রহ করতে হবে। কারণ কলেজের নাম পাল্টাতে হলে বিরাট অংকের টাকা দিতে হয়।

www.nagorikpathagar.com

আমার কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী গম্ভীর হয়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে বললেন, কলেজের নাম যারা পাল্টিয়েছে এই টাকা তারাই দেবে। আমি দিতে যাব কেন? আমাদের কথা সেখানেই শেষ হয়ে গেল। ইচ্ছে ছিল সব জানতে বাড়ি যাব। দেশ স্বাধীন হয়েছে তিন বছর হতে চলল। কিন্তু আমি বাড়ি যেতে পারছি না। এ সময় আবার সংকট দেখা দিল সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের নিয়ে। সরকার নিউজ প্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেছে। সংসদের লবণ সংক্রান্ত একটি খবর রিপোর্ট করতে গিয়ে দু'জন পূর্ববঙ্গের রিপোর্টার চাকরি হারিয়েছে। আমার আর বাড়ি যাওয়া হলো না।

এসময় মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগত। নিজেকে মনে হতো লেখাপড়া না করলে ভালো হতো। আমার পড়া কিতাবের কোনো কিছুই কাজে লাগছে না। দেশে মুখ্যত তখন তিন দলের রাজনীতি। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক জোট 'গজ' গঠন করেছে। মনে হয় মুক্তিযুদ্ধের মালিকানা তাদের। অন্য কারো কিছু বলার নেই। ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা ভিয়েতনামে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে মিছিল করতে গিয়ে গুলি খেয়েছিল। প্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে। এবার ভিন্ন স্লোগান দিচ্ছে। স্লোগান হচ্ছে—দেশ স্বাধীন করেছি, এবার দেশ গড়ার পালা। সত্যি সত্যি ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানের অঙ্গ হিসেবে বীজতলা গড়ে তুলল। জিজ্ঞাসা করলে বলত ওটা আপনারা বুঝবেন না। আপনারা হটকারী। প্রকৃতপক্ষে সেকালে কমিউনিস্ট পার্টি চলত মস্কোর নির্দেশে। তাদের তত্ত্ব হচ্ছে, মস্কোর সাথে যে দেশের সম্পর্ক ভালো সে দেশের সরকারও ভালো। সেই অনুসারে বাংলাদেশ সরকারও ভালো। বাংলাদেশের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুসম্পর্ক। তাই বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন করতে হবে। ন্যাপের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও রাজনীতি একই।

অপরদিকে সক্রিয় জাসদের গণবাহিনী আর সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পার্টি। এদের কাজ থানা লুট, ফাঁড়ি লুট এবং নির্বাচিত হওয়া। এছাড়াও কোনো কোনো এলাকায় সক্রিয় ছিল পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি। এদের রাজনীতি ছিল আমার কাছে দুর্বোধ্য। ১৯৭৪ সালের ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায় স্লোগান শুনেছি। তাদের সাথে জেল খেটেছি। দিনের পর দিন অনশন করেছি। তাদের রাজনীতি আমি বুঝতাম। ১৯৪৭ সালের আজাদী গরিব মানুষের জন্যে ঝুটা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে প্রশ্ন ছিল ওই সময় ওই স্লোগানের ভিত্তিতে ওই আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল

www.nagorikpathagar.com

কিনা। আমার ধারণা সে সময়ে শ্লোগান দিয়ে অসহ্য নির্যাতন সহ্য করেছে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা। তবে সংগঠন মজবুত থাকায় এত নির্যাতনের পরেও টিকে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কেন যে আমাদের বন্ধুরা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়াকে একেবারে তোয়াক্কা না করে পূর্ব বাংলা আবার কেউ পূর্ব পাকিস্তান নাম বহাল রেখেই বিপ্লব করতে চাইল তা আজো আমার বোধগম্য নয়। এ ভুল কৌশলের ফলে প্রথমেই ডেকে আনা হলো সরকারি হামলা। কেউ বুঝতে চাইলেন না, অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করার পর ওই নাম দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো কঠিন হবে এবং এ কৌশল গ্রহণযোগ্য হবে না ইতিহাসের বিচারে। এই দু'রাজনীতির যাঁতাকলে আমি বিপর্যস্ত। আমি সর্বত্র আসামির কাঠগড়ায়। কখনো সংবাদপত্রে লিখি, রাজনীতি করি। সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি। সকলের সকল অধিকার রক্ষার একটি দায়িত্ব এই সাংবাদিকদের।

এরপরে আছে সাংবাদিকদের স্বার্থ রক্ষা। প্রকৃতপক্ষে তাদের জন্যে কিছুই করা যায়নি। পাকিস্তান আমলে সাংবাদিকদের জন্যে দ্বিতীয় বেতন বোর্ড কাঠামো হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। পাকিস্তান থাকলে এতদিনে বেতন বোর্ডের রোয়েদাদ প্রকাশিত হতো। সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা বাড়ত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে দ্বিতীয় বেতন বোর্ড গঠিত হয়েছিল। কোনো বাজেট আসছে না। সরকার এগোচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে সকল পত্রিকা বন্ধ হবে। দেশে একদলীয় রাজনীতি হবে। হাতেগোনা কয়েকটি পত্র-পত্রিকা থাকবে। এ সংবাদে সাংবাদিক মহলে নানা শঙ্কা।

সাংবাদিকদের বাসস্থানের সমস্যা আছে। পাকিস্তান আমল থেকে এ দায়িত্বে আমি ছিলাম। এখন দেশ স্বাধীন। সকলের ধারণা আমি ইউনিয়নের সভাপতি না হলে অনেক কিছু পাওয়া যেত। আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করি। কোনো ব্যাপারে কারো কথা শুনি না। তাই সরকার আমার উপর খুশি নয়। এ নিয়ে ইতোমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। সরকারের সাথে মতান্তর চলছেই।

১৯৭৪ সালে নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ আইন জারি হলো। সংসদে লবণ নিয়ে বিতর্ক রিপোর্ট করতে গিয়ে চাকরি হরাল দু'জন সাংবাদিক। সব নিয়েই ইউনিয়নকে লড়তে হচ্ছে। আর প্রতিবারই প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমাকে বিতর্কে নামতে হচ্ছে। এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটলো পাবনায়। আমার এক বন্ধুর শ্যালকের বিয়ে। নাম গোবিন্দ দত্ত। ঢাকা থেকে বিমানে ঈশ্বরদী হয়ে পাবনা পৌঁছালাম। দুপুরের দিকে একটি গুলির শব্দ শুনলাম। কৌতূহল হলো।

www.nagorikpathagar.com

শুনলাম পাবনায় ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে একটি রিজার্ভ হাউস আছে। এই রিজার্ভ হাউসে নাকি যে কোনো লোককে ডেকে এনে যখন তখন হত্যা করা যায়। আমাকে আরো বলা হলো—দীর্ঘদিন ধরে পাবনার আদালতে নাকি কোনো বিচার বসছে না। বিচারকরা শঙ্কিত। তাদের নাকি কোনো বিচারের কাজ করতে দেয়া হয় না। জেলা ছাত্রলীগের নির্দেশে রায় দিতে হয়।

একথা শুনে আমি খানিকটা অবাক হলাম। মনে হলো এ আমি কোন দেশে আছি। একটি জেলা শহরে যে কোনো সময় যে কাউকে ডেকে এনে গুলি করা যায়। আদালতে বিচারক বসে না। অথচ দেশে একটি সরকার আছে। সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে কোনো কথা বলে না। অর্থাৎ ওই শহরে বিরাজ করছে একমাত্র ভয়, শঙ্কা আর সন্ত্রাস। এ ব্যাপারে আমি নিজেই কিছুটা খবর নেবার চেষ্টা করলাম। চেষ্টা করলাম মহকুমা হাকিমের সাথে দেখা করতে। তার দফতরে ঢুকেই আমার আক্কেল গুড়ুম। আমি তাঁর দফতরের বাইরে বসা। ভেতরে তিনি আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলছেন। কথা বলছেন, আটঘরিয়া থানার একটি অভিযান নিয়ে। ওই থানা নাকি জাসদের ঘাঁটি। সেই থানা অভিযান নিয়ে বিস্তারিত কথা শুনলাম। কিছুক্ষণ পর মহকুমা হাকিমের সঙ্গে কথা হলো। আমি কথা না বাড়িয়ে ঢাকায় ফিরে এলাম। দৈনিক বাংলায় উপ-সম্পাদকীয় লিখলাম। যতদূর মনে আছে শিরোনাম ছিল 'পাবনায় একটি রিজার্ভ হাউস'। আমার লেখার পরে মনে হলো সকলের ভয় ভাঙল। সাম্যবাদী দলের নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা বিবৃতি দিলেন সংবাদপত্রে। সরকারি মহলেও কিছুটা প্রতিক্রিয়া হলো। শুনেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কথা তুলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নাকি বলেছিলেন, আমার সাথে নয়, নির্মল সেনের সাথে কথা বলো। আমার সঙ্গে কেউ কোনোদিন কথা বলেনি।

তবে আমার লেখার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল পাবনায়। আমার লেখায় ক্ষুব্ধ হয় ছাত্রলীগ। আমাকে তারা প্রেস ক্লাবে খুঁজতে যায়। সেখানে না পেয়ে গোবিন্দ দত্তের বাড়িতে চড়াও হয়। গোবিন্দ ওরফে রণজিৎ দত্ত পাবনা শহরে তখন দু'টি রেশন দোকানের মালিক। শুনেছি আমাকে আশ্রয় দেওয়ার খেসারত হিসেবে তাঁকে একটি রেশন দোকানের মালিকানা ছেড়ে দিতে হয়। পরবর্তীকালে রণজিৎ দত্ত দেশান্তরী হন। কয়েক বছর আগে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই ১৯৭৪ সালেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। খুন-ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তরা বাদে ৭১-এর

www.nagorikpathagar.com

অপরাধীদের মুক্তিদানের নির্দেশ দেয়া হয়। আমি আগেই উল্লেখ করেছি এই ক্ষমা ঘোষণার খবরটি তৎকালীন রাষ্ট্রপতিও জানতেন না। সেদিন বিকালের দিকে বঙ্গভবন থেকে দৈনিক বাংলায় ফোন করে এ খবরের সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করা হয়।

আমার সেদিন অদ্ভুত লাগছিল। ১৯৭২ সালের শেষের দিকে আমি শ্রেণি বিভাগ করে ৭১-এর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছিলাম। আমি লিখেছিলাম এই অপরাধীদের মধ্যে চিহ্নিতদের ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠানো হোক। অন্যদের বিরুদ্ধে ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। আমি সব কিছুই লিখেছিলাম পূর্ব জার্মানির অভিজ্ঞতা থেকে। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি সাংবাদিক প্রতিনিধি দল নিয়ে আমি পূর্ব ইউরোপে যাই। আমার সফরের প্রথম দেশ ছিল পূর্ব জার্মান। অর্থাৎ সেকালের কমিউনিস্ট জার্মান। আমি কমিউনিস্ট নেতাদের কাছ থেকে জার্মান যুদ্ধবন্দিদের খবরাখবর নিয়েছিলাম এবং যেখানে তারা নাৎসী যুদ্ধ অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল সেই ব্যবস্থার কথাই সুপারিশ করেছিলাম বাংলাদেশে। কিন্তু কেউই আমার কথা মেনে নেয়নি। তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বিভিন্ন মহলে। দৈনিক বাংলার বাণীতে লেখা হয়েছিল—সরকারি পত্রিকায় চাকরি করে এত সাহস আমি কোথায় পাই? মুক্তিযুদ্ধের ১৮ মাস না কাটতেই আমি কী করে ৭১-এর অপরাধীদের মুক্তির কথা বলতে পারি? এ নিয়ে পরবর্তীকালে আমাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে।

কিন্তু এখনো আমি বিশ্বাস করি সেদিন আমি সঠিক কথা বলেছিলাম। ১৯৭৪ সালের পরিবর্তে ১৯৭২ সালে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলে দেশ ও জাতি অনেক লাভবান হতো। আরো দুঃখের হচ্ছে এ কাজটি আমাদের করতে হলো সিমলাচুক্তি অনুযায়ী। অথচ এ চুক্তির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো। এ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভারতে আটক ৯৩ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে দেয়া হয়। বাংলাদেশে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এ চুক্তি কেন আমাদের মানতে হলো সে প্রশ্নের ব্যাখ্যা কেউ কোনোদিনই দেননি।

এই সাধারণ ক্ষমার পর আমাকেই আবার নতুন ঝামেলায় পড়তে হলো। সিলেটের কুলাউড়া থেকে এক ভদ্রমহিলা আমার নামে দৈনিক বাংলায় একটি চিঠি লিখলেন। তিনি লিখেছিলেন—সাহস থাকলে এ চিঠি কাগজে ছাপাবেন। চিঠিতে সাধারণ ক্ষমা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের তীব্র সামালোচনা করা

www.nagorikpathagar.com

হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, ৭১-এর যুদ্ধে তিনি ইজ্জত হারিয়েছেন। তাঁর স্বামী হারিয়েছেন। আগরতলা ত্রাণ শিবিরে তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর শিশু পুত্রকে। লাখ লাখ মানুষ সর্বস্ব হারিয়েছে। প্রাণ দিয়েছে। এদের শবের ওপর দাঁড়িয়ে রাজাকারদের ক্ষমা করার অধিকার প্রধানমন্ত্রীকে কে দিয়েছে? তিনি প্রশ্ন করেছিলেন এভাবে প্রধানমন্ত্রীর কোনো ঘনিষ্ঠজন কি আদৌ প্রাণ দিয়েছে? তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—অন্যের শবের উপর দাঁড়িয়ে কাউকে ক্ষমা করার অধিকার প্রধানমন্ত্রীর নেই।

এ চিঠি আমি ছেপে দিলাম দৈনিক বাংলায়। তবে তার সাথে আমার কিছু মন্তব্য ছিল। আমি বলতে চেষ্টা করেছিলাম, শুধুমাত্র আবেগ দিয়ে কোনোদিন রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না। আজ হোক কাল হোক আবেগকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই।

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। এ সফর নিয়ে তীব্র বিতর্ক ছিল। ভুট্টো আসার আগে প্রবীণ সাংবাদিক আতাউস সামাদ আমাকে ফোন করেন। কিছু একটা লিখুন। ভুট্টো আসছে অথচ আপনারা কেউ কিছু লিখছেন না। এ কেমন কথা। একজনকে কিছু লিখতে হবে।

সেদিন আমার পক্ষে লেখা ছিল খুবই কষ্টকর। তবুও লিখেছিলাম। সে লেখার কিছু কিছু কথা এখনো আমার মনে আছে। আমি লিখেছিলাম ভুট্টো আসবে। আর সেদিন হয়তো সংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেন ও শহিদুল্লাহ কায়সারকে আমার মনে পড়বে। আমার চোখে জল নামবে। তবুও ভুট্টো আসবে। এটাই বাস্তব। কিছুদিন পর গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা। তিনি বললেন, আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। ভুট্টো আসবে, এ বাস্তবতা অস্বীকার করে রাষ্ট্র পরিচালনা করা আদৌ সম্ভব কি!

১৯৭৪ সালে আর এক ঘটনা হচ্ছে দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ নাকি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে তাঁর তত্ত্ব লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অমর্ত্য সেন তার জীবনে দু'টি দুর্ভিক্ষ দেখেছেন। একটি ১৯৪৩ সালে। অপরটি ১৯৭৪ সালে। এই দুই দুর্ভিক্ষ থেকে তাঁর অভিজ্ঞতা হচ্ছে—খাদ্যের অভাবই দুর্ভিক্ষের কারণ নয়। প্রচুর পরিমাণ খাদ্য জমা থাকলেও দুর্ভিক্ষ হয়। সেই খাদ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা সেটাই বড় কথা। এই পৌঁছানোর সাথে জড়িত সরকারি নীতি এবং জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা। তাঁর মতে, ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের জন্যে খাদ্য অভাব দায়ী ছিল না। আর আমার মতে, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে একটি ভিন্ন সমস্যাও ছিল। সমস্যাটি হচ্ছে

www.nagorikpathagar.com

যোগাযোগের অভাব। আমি যতদূর জানি তখন রাজনৈতিক কারণে খাদ্যের অভাব ছিল। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখে দু'টি অপরাধ করেছিল। একটি অপরাধ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরম শত্রু কিউবার সাথে সম্পর্ক স্থাপন। দ্বিতীয় অপরাধ হচ্ছে ঢাকায় বিশ্ব শান্তি পরিষদের উদ্যোগে দক্ষিণ এশিয়া শান্তি সম্মেলন। এই দুই অপরাধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশগামী খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেয়। বাংলাদেশে খাদ্যের অভাব সৃষ্টি করে। দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে অমর্ত্য সেনের তত্ত্ব বোঝাও আমাদের মতো দরিদ্র দেশের জন্য কঠিন নয়। কিন্তু ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের যে এমন একটি রাজনৈতিক কারণ ছিল এবং সত্যি সত্যি যে খাদ্যশস্যের অভাব ছিল একথা ভুললে চলবে না।

তবে দুর্ভিক্ষের ভিন্ন কারণও ছিল। সে কারণটি হচ্ছে সরকারি দলের দুর্নীতি, দূরদৃষ্টির অভাব এবং সমস্যা মোকাবেলায় নিদারুণ ব্যর্থতা।

এই দুর্ভিক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশে এক অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সকলের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়—এই জন্যই কি আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম? এর চেয়ে তো পাকিস্তান ভালোই ছিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চিৎকার করা যেত। কিন্তু এখন তো কিছু বলা বা করা যাচ্ছে না। সভা-সমাবেশ মিছিলে সরকারি দল হামলা করে। ট্রেড ইউনিয়ন হাইজ্যাক করে। কোথাও কোনো নিরাপত্তা নেই। রক্ষী বাহিনীর হাতে কবে কতজন নিহত হচ্ছে সে খবর কেউ দিতে পারে না। অসংখ্য তরুণ গ্রেফতার হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তাদের কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে আছে সংশয় ও বিভ্রান্তি। কেউ জানে না দুর্ভিক্ষে কত লোক মারা গেছে। এ নিয়ে জনমনে প্রচণ্ড অসন্তোষ। এ সময় সংসদে জানানো হয় দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ২৭ হাজারের কিছু বেশি। এ তথ্য সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করল না।

অথচ দেশে রাজনৈতিক কোনো আন্দোলন নেই। কথায় কথায় জাসদ বা সর্বহারা পার্টির কিছু খবর পাওয়া গেলেও অন্যান্য রাজনৈতিক দল একেবারে চুপ। সকলেরই ধারণা একটা কিছু হতে যাচ্ছে। সরকার হয়তো কোনো নতুন পদক্ষেপ নেবে।

সত্যি সত্যি সরকার নতুন পদক্ষেপ নিল। দেশে বিদেশে ক্ষমতা আইন জারি করা হলো। সংবাদপত্রের উপর কড়া নির্দেশ দেয়া হলো। শেষ পর্যন্ত দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলো। সমাবেশ-মিছিল নিষিদ্ধ হলো। সাপ্তাহিক অভিমত নিষিদ্ধ করা হলো। অভিমত-এর সম্পাদক শেখ আলী আশরাফকে গ্রেফতারের নির্দেশ জারি করা হলো।

www.nagorikpathagar.com

আমি তখন বাড়িতে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাড়ি যাওয়া হয়নি। ১৯৭১ সালেব এপ্রিল মাসে বাড়ি ছেড়েছিলাম। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো। দেশে ফিরলাম জানুয়ারির প্রথমে। কিন্তু ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বাড়ি যেতে পারিনি। একের পর এক ঝামেলা আমাকে ঢাকায় থাকতে বাধ্য করেছে। এছাড়া দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এলাকায় ছিল অস্বস্তিকর পরিবেশ। ক্ষুদে আওয়ামী লীগওয়ালারা রাতারাতি নেতা বনে গেল। যাদের কোনোদিন কোথাও দেখা যায়নি তারা মুক্তিযোদ্ধা বনে গেল। রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান হলো। কলেজ স্কুলের হর্তাকর্তা হয়ে বসল। এলাকায় গেলে এদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা সম্ভব নয়। সংঘাত অনিবার্য। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম একটু অপেক্ষা করি। নতুন নেতৃত্বের উচ্ছাস হ্রাস পাক। লুটপাট শেষ হোক। তারপর বাড়ি যাব। এমনকি ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়ও বাড়ি যাইনি। আর এ সময় হলো এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড। প্রকাশ্য দিবালোকে কোটালীপাড়ার মুক্তিযুদ্ধের নেতা কমলেশ বেদজ্ঞ, গোপালগঞ্জের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা লেবুসহ কয়েকজনকে হত্যা করা হলো। বাড়ি পৌছে শুনলাম জরুরি আইন জারি হয়েছে। বাড়ি থাকা হলো না। বরিশাল থেকে ঢাকা। দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয় তখন বন্ধ করেছে। নির্দেশ দিয়েছে অনিকেত ছদ্মনামে নির্মল সেনের উপসম্পাদকীয় আর দৈনিক বাংলায় ছাপা হবে না।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে পড়লো অবজারভারের সহকারী সম্পাদক জোয়াদুর রহমানের কথা। জোয়াদুর রহমান আওয়ামী লীগের ঘোরতর সমর্থক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে দু'জন সাংবাদিক প্রেস ক্লাবে আওয়ামী লীগের কথা বলত তার মধ্যে একজন জোয়াদুর রহমান অপরজন আমিনুল হক বাদশা।

ক্ষমতায় যাবার পর আওয়ামী লীগের আচরণ জোয়াদুর রহমানকে ব্যথিত করেছে। জোয়াদুর রহমান বলত নির্মল দা, আপনি ও মিন্টু অর্থাৎ হলিডের এনায়েতুল্লাহ খান লিখে লিখে প্রমাণ করেছেন, দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে। দেশে কেউ কিছু লিখতে পারছে না। একদিকে সরকার অপরদিকে তাদের সন্ত্রাসী গ্রুপ। তাদেরও হাত থেকে সাংবাদিকদের রেহাই নেই। এ কথা সত্য, সেকালে আবদুল গাফফার চৌধুরী সম্পাদিত জনপদ পত্রিকায় মাঝে মাঝে সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হতো। এমনকি দৈনিক বঙ্গবার্তায় ফয়েজ আহমেদও শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে লিখতেন। কিন্তু সকলের ধারণা এরা শেখ সাহেবের নিজের লোক। এরা সকালে লিখলে বিকেলে

www.nagorikpathagar.com

এদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দেখা হয়। কিন্তু বিপদ হয়েছিল আমাকে এবং এনায়েতুল্লাহ খানকে নিয়ে। আমার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দেখা হতো কিন্তু লেখালেখি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তিনি করতেন না। শুনেছি দৈনিক বাংলায় আমার লেখা থাকলে তিনি ভোরবেলাই পড়তেন এবং তাৎক্ষণিক নির্দেশ দিতেন। এর প্রমাণ আমি বারবার পেয়েছি। জোয়াদুর রহমানের অভিযোগ আমি ও এনায়েতুল্লাহ খান লিখছি বলে সাধারণ মানুষের ধারণা দেশে সংবাদপত্রে স্বাধীনতা ছিল।

এ সময় ব্যবস্থা নেয়া হলো সাপ্তাহিক হলিডের বিরুদ্ধে। হলিডে বন্ধ করে দেয়া হলো। এনায়েতুল্লাহ খান আমাকে একদিন ফোনে জানালেন তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে। আমার বিশ্বাস হলো না। আমি গিয়াস কামাল চৌধুরীকে বললাম, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করো। গিয়াস কামাল চৌধুরী ব্যবস্থা করল। কিন্তু আমাকে ওই দিন ভোরবেলা জানানো হলো—প্রধানমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন না। আমি বললাম, তবু যাব। সকাল ৯-১০টার দিকে বঙ্গভবনে পৌঁছালাম। আমি, গিয়াস কামাল, কামাল লোহানী, রিয়াজ উদ্দিন আহমদ ও এনায়েতুল্লাহ খান। আমাকে দেখে সচিব আবদুর রইস বললেন, আজ আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না। আমি চেয়ে দেখলাম পেছনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী। বললেন, এসে গেছেন—আবার সাথে এনায়েতুল্লাহ খান। আমি বললাম, দোতলায় চলুন। পুরান গণভবনের দোতলায় উঠেই ডান দিকে কক্ষ। ওই কক্ষের কাছে একটি ছোট কক্ষ আছে। উপরে উঠে ওই কক্ষে গেলাম। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বললাম, আপনি ও এনায়েতুল্লাহ খান ওই কক্ষে যান। আপনাদের কথা শেষ করুন।

প্রায় আধঘণ্টা পর প্রধানমন্ত্রী এবং এনায়েতুল্লাহ খান ওই কক্ষ থেকে বের হলেন। দেখলাম দু'জনের মুখ অপ্রসন্ন। এনায়েতুল্লাহকে বললাম, প্রেস ক্লাবে যান—আমরা আসছি।

প্রধানমন্ত্রী আমাকে তাঁর কাছে বসালেন, তারপর হঠাৎ উত্তপ্ত হলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, এই এনায়েতুল্লাহ খান কে! তার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয় না। সে পত্রিকা কী করে চলে? এ পত্রিকা জুলফিকার আলী ভুট্টোর। আমার পুত্রকে নিয়ে আমি মস্কো সফরে গিয়েছি। এটা কি কোনো সমালোচনার বিষয়বস্তু? পণ্ডিত নেহেরুর সাথে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী গেছেন তাতে কি কোনোদিন কেউ সমালোচনা করেছে? হলিডে আমাদের পক্ষে না লিখে মিথ্যাচার করে। তাদের জন্যে আপনি এসেছেন আমার কাছে। নিজে কোনোদিন আমার পক্ষে একটা লাইন লিখেননি।

www.nagorikpathagar.com

প্রধানমন্ত্রী এত উত্তপ্ত ছিলেন, আমি প্রথমে কিছু বলতে পারিনি। এক সময় আমি বললাম, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন? আমি গোপালগঞ্জের নির্মল সেন নই। বিএফইউজের সভাপতি। প্রধানমন্ত্রী বললেন, বলুন তাহলে আমাকে কী করতে হবে? আমি বললাম—১. এনায়েতুল্লাহ খানের গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করতে হবে। ২. হলিডে বের করতে দিতে হবে। ৩. হলিডে'র আটক কপি ফেরত দিতে হবে। ৪. হলিডে'র নতুন ডিক্লারেশন দিতে হবে। ৫. হলিডে ছাপাবার জন্যে নিউজপ্রিন্ট দিতে হবে। ৬. তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শেখ আব্দুল আজিজকে পাল্টাতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী কামাল লোহানীকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোহানী, এগুলো করতে হবে নাকি? লোহানী বলল, হ্যাঁ। প্রধানমন্ত্রী বললেন—ঠিক আছে আপনারা যান। কিছুক্ষণ পরে নিচে এসে দেখি শেখ আজিজ এসে হাজির। তিনি আবার ডাক-তার মন্ত্রী হলেন।

যতদূর মনে আছে তখন ছিল রমজান মাস। বিকেলের দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি জিপ পাঠালেন আমার বাসায়। ইফতার পার্টিতে যেতে হবে। ইফতার পার্টিতে গিয়ে দেখলাম এনায়েতুল্লাহসহ সকলে হাজির। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মালেক উকিল খাঁটি নোয়াখালীর ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন, আপনি নির্মল সেন—আপনি স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই লিখেছেন। এ লেখা আমি গ্রামে গ্রামে জনসভায় পড়ে শুনিয়ে বলি আমার মানুষকে স্বাভাবিকভাবে মরতেও দিতে পারছি না। এখন কথা হলো, বঙ্গবন্ধু আমাকে একটি সবুজ সংকেত দিয়েছেন। আপনার সকল দাবি মানা হবে।

আমি বললাম, আমার প্রথম প্রশ্ন, সংসদে এনায়েতুল্লাহ খানের বাবার নাম তুলে গালি দিলেন কেন? নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে সংসদে যাদের কথা বলার সুযোগ নেই তাদের সম্পর্কে অবমাননাসূচক কথা বলা যায় না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মালেক উকিল বললেন—ওই সব কথা আর না। দোষ স্বীকার করছি। আপনার সঙ্গে বসতে হবে। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, প্রেস অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে আপনাদের আপত্তি আছে। আপনাদের সঙ্গে বসে অর্ডিন্যান্স সংশোধনের ব্যবস্থা করতে বলেছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর কথা রেখেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। এরপরেও এনায়েতুল্লাহ খানকে জেলে যেতে হয়েছিল। সে প্রেক্ষিত ভিন্ন। আর আমারও কোনোদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বসা হয়নি প্রেস অর্ডিন্যান্স সংশোধনের জন্যে।

এই পটভূমিতে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইন জারি করা হয়। এ আইনে বিনা বিচারে

www.nagorikpathagar.com

আটকসহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের সব ব্যবস্থা করা হয়। আগেই বলেছি আমি তখন বাড়িতে ছিলাম। দেশ স্বাধীন হবার ৩ বছর পরেও বাড়ি যেতে পারিনি। সব সময় একটা আশঙ্কা থাকত কোথায় কী একটা ঘটবে। আমার ঢাকা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। এবার বাড়ি গিয়ে সেই অবস্থারই মুখোমুখি দাঁড়ালাম। জরুরি অবস্থার কথা শুনে ঢাকায় ফিরলাম। ঢাকায় ফিরে শুনি দৈনিক বাংলায় আমার উপসম্পাদকীয় লেখা বন্ধ। সম্পাদকদের মিটিং ডেকে নাকি এই নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। মাথাটা বিগড়ে গেল। পরের দিন সন্ধ্যায় নতুন গণভবনে গেলাম প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে। আমার সাথে ছিলেন গিয়াস কামাল চৌধুরী, কামাল লোহানী ও রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ। আমাকে দেখেই প্রধানমন্ত্রী বললেন, জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরপর আপনি নাকি আত্মগোপন করেছেন। বিবিসি বলেছে, নির্মল সেন ঢাকায় নেই; ঢাকার বাইরে চলে গেছে। আমি বিবিসির খবর শুনিনি। বললাম, আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী বললেন, শুধু বাড়ি নয়, আপনি বরিশালও গিয়েছিলেন। আমি সবই জানি। আপনি কোথায় কখন যান।

আমি বললাম—ঠিক আছে, আমি বরিশালও গিয়েছিলাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি সাপ্তাহিক অভিমত বন্ধ করেছেন কেন? অভিমতের সম্পাদক আলী আশরাফকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন। আমি নই, আলী আশরাফ আত্মগোপন করেছে। প্রধানমন্ত্রী বললেন, আলী আশরাফ কোথায় আছে আমি জানি। তার পত্রিকা বের করার দরকার নেই। আলী আশরাফ বরিশালের বগুড়া রোডে তার বোনের বাসায় সন্তোষ ভবনে আছে। তাকে ইচ্ছে হলেই গ্রেফতার করা যায়। তাকে গ্রেফতার করার ইচ্ছে আমার নেই। তাকে কিছুদিন গোপনে থাকতে বলুন। প্রয়োজন হলে সে ঢাকায় এসে আপনার বাসায় থাকুক। তবে পথে যদি তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে আমি কিছু করতে পারব না। কারণ বিশেষ ক্ষমতা আইনে জামিনের ব্যবস্থা নেই। ওকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

আমি বললাম—এবার আমার কথায় আসা যাক। আপনি আমার লেখা বন্ধ করলেন কেন? আর সে কথা আমাকে না জানিয়ে সম্পাদক সাহেবকে জানালেন কেন? তারা তো আপনার সামনেই ভয়ে কথা বলে না। তাদের কাছে এ কথা বলে লাভ আছে? তবে আপনার কথা আমি মানব না। আমি আজকেই এই গণভবন থেকে ফোনে দৈনিক বাংলায় আমার লেখা দেবো। প্রধানমন্ত্রী খানিকটা গম্ভীর হলেন। ইংরেজিতে বললেন—নির্মল সেন, আপনাকে আমি জেলে পুরব না; আপনি জনপ্রিয় হবেন। আপনার জন্য একটি সিসার গুলিই

www.nagorikpathagar.com

যথেষ্ট। আমি বললাম, প্রধানমন্ত্রী, একই কথা আপনার জন্যেও প্রযোজ্য। আপনার জন্যেও একটি সিসার গুলিই যথেষ্ট। প্রধানমন্ত্রী হেসে ফেললেন। বললেন, শুনুন, একটি ঘটনার কথা বলি। সেদিন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়েছিলাম। ফিরতে ফিরতে মাধাইয়ার কাছে সন্ধ্যা হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হলো কেউ যদি একটা গুলি করে দেয়। তাহলে কী হবে। সবাই চুপ হয়ে গেলাম। আমি বললাম, সব কথাইতো শুনলাম। আমি কিন্তু আজই দৈনিক বাংলায় অনিকেত নামে আবার লিখব। প্রধানমন্ত্রী বললেন, ঠিক আছে। তবে একটি শর্ত আছে। শর্তটি হচ্ছে আপনি গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়া নিয়ে লিখতে পারবেন না। আমি বললাম, নিজের এলাকা নিয়ে লিখতে পারব না কেন। সেখানে তো হাজার হাজার মানুষ এখনও পুনর্বাসিত হয়নি। এখনও তাঁবুতে আছে ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থী। প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমি সবই জানি। আপনিও লিখেছেন। কিন্তু নিজের এলাকায় আগে কিছু করা যাবে না। আমি বললাম, গোপালগঞ্জ কোটালীপাড়া সড়ক সম্পর্কে আপনি একই কথা বলেছেন। এ সড়ক শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। আজ পর্যন্ত সে সড়ক সমাপ্ত হলো না। আপনি মাটি কাটার জন্যে একটি বার্জ দিয়েছেন। সেই বার্জ থেকে তেল চুরি হচ্ছে। কোনো কাজের কাজ হচ্ছে না। এ কথা আমি বারবার লিখেছি। আপনি জবাব দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এলাকার কাজ আগে করতে নেই। এতে দুর্নাম হয়।

এরপর আমাদের বৈঠক শেষ হলো। আমি গণভবন থেকে দৈনিক বাংলার জন্যে ফোনে একটি লেখা দিলাম। লেখাটি ছিল বস্তি উচ্ছেদ নিয়ে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর ৬৪ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে বস্তি উচ্ছেদ শুরু হয়। এই বস্তি এলাকায় এককালে আমাদের ও পরবর্তীকালে জাসদের সংগঠন ছিল। আমি মনে করি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে বস্তিবাসীরাই সবচে' বড় ভূমিকা পালন করেছে। তাদের খবর কেউ রাখে না। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে এদের উপরই প্রথম হামলা হয়েছে। আবার ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রে হাজির করেছে। প্রতিশ্রুতি দেয়া ছাড়া তাদের পুনর্বাসনের কথা কেউ ভেবে দেখেনি। এবারও তারা জরুরি অবস্থার প্রথম শিকার হয়েছে। আমি আমার লেখায় প্রশ্ন করেছিলাম, বছর বছর কি এরাই নির্যাতিত হবে? এদের বলির পাঠার মতো ব্যবহার করা হবে। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কি এদের পুনর্বাসনের কথা ভাবতেও পারত না।

এর ক'দিন পরে আমার একটি লেখা বের হলো দৈনিক বাংলায়। সে লেখা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় হলে সস্তায় খাবারের ব্যবস্থা

www.nagorikpathagar.com

ছিল এবং সব খরচই ছিল দুর্নীতিমূলক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি হলে হাজার হাজার বাড়তি রেশন কার্ড দেয়া হতো। বাড়তি রেশন কার্ড দিয়ে সস্তায় খাওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। আমি লিখেছিলাম, এ অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চলতে পারে না। শিক্ষাঙ্গনে যদি এভাবে দুর্নীতি চালু করা হয়, সেখানে সুশিক্ষার অবকাশ কোথায়। আমি তো দেখছি সরকারি উদ্যোগে ছাত্রদের চৌর্যবৃত্তি শেখানো হচ্ছে। ছাত্রদের হাতে রাখার জন্যে এটা কোনো কৌশল হতে পারে না। এটা একান্তভাবেই অপকৌশল। অবিলম্বে এটা বন্ধ করা হোক।

তখন বাকশাল আইন জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে। সর্বত্র একটি ভয় ও শঙ্কার পরিবেশ। সকল বিরোধী দল, বিরোধী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্র, যুব শ্রমিক সকল সংগঠন ভেঙে দেয়া হয়েছে। দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে। দলের নাম বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)। ছাত্রফ্রন্টের নাম হবে জাতীয় ছাত্রলীগ। এমনি করে জাতীয় শ্রমিক লীগ, জাতীয় কৃষক লীগ নামে বিভিন্ন ফ্রন্ট থাকবে। বাংলাদেশে কাউকে রাজনীতি করতে হলে এই সংগঠনে যোগ দিতে হবে। ভিন্ন কোনো সংগঠন করা যাবে না।

তখন আমাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। স্কুল জীবন থেকে রাজনীতি করেছি। বাবা-মা, ভাই-বোন কারো দিকে ফিরে তাকাইনি। বছরের পর বছর জেল খেটেছি। একাত্তরে যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। সেই স্বাধীন দেশে একটি দল ক্ষমতায় এসে বলল—আর কারো দল থাকবে না। শুধুমাত্র থাকবে তাদের দল। রাজনীতি করতে হলে আমাদের দল অর্থাৎ বাকশালে যোগ দিতে হবে। এই 'আমাদের দল' বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, মোজাফফর ন্যাপ ও একতা পার্টি। তারা সবাই মিলে আমাদের দল ভেঙে দিলেন। আমাদের সাথে একটি কথাও বলা হলো না। জিজ্ঞাসাও করা হলো না এ সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে। অথচ আমরা তার কারো খাস তালুকে বাস করতাম না। আমাদের দল ভেঙে রাজনীতি শেষ করে দেবার জন্যে কাউকে আমরা সংসদে নির্বাচিত করিনি। সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে এমন কোনো প্রতিশ্রুতিও ছিল না। সবচেয়ে বিস্ময়ের এবং দুঃখের হচ্ছে সেকালে যাঁরা এ রাজনীতি করতেন তাঁরা আমাদের মনের অবস্থা ভাবতে চেষ্টা করতেন না। আমাদের দীর্ঘদিনের ত্যাগ তিতিক্ষাকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। তাঁরা আমার বুকের কাছে যেন ছুরি ধরে বললেন—আমরা তোমাদের রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছি। তোমাদের সমস্ত অতীত সংগ্রামের ইতিহাস নস্যাৎ করে দিচ্ছি। তবে এরপরেও তোমাদের বাকশালকে ভালোবাসতে হবে। এই ভালোবাসা চাওয়া-পাওয়ার বাক বিতণ্ডা এখনো

www.nagorikpathagar.com

চলছে। আর এ পটভূমিতে আমাকে ডেকে পাঠালেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এখন প্রধানমন্ত্রী নন। তিনি বাকশালের প্রেসিডেন্ট এবং দেশেরও। আমি সেদিন সংসদ ভবনে গিয়েছিলাম। আমাকে খবর দেয়া হলো প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে ডেকেছেন। আমার সাথে আর কেউ নয়। আমাকে একাই যেতে হবে। সংসদে প্রেসিডেন্টের কক্ষে ঢুকে দেখলাম শেখ সাহেবের সাথে আছেন সংসদ সদস্য মহিউদ্দীন আহমদ। কোটালীপাড়ার সংসদ সদস্য সন্তোষ বিশ্বাস ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তারা। আমি ঢুকতেই প্রেসিডেন্ট বললেন, কাল থেকে দৈনিক বাংলায় আপনার লেখা বন্ধ। আপনি উপসম্পাদকীয় লিখতে পারবেন না। আপনি দৈনিক বাংলায় চাকরি করবেন, বেতন নেবেন, এর বেশি কিছু নয়। আমি বললাম, আপনার এ নির্দেশ আমি মানতে বাধ্য নই। আমি আজই দৈনিক বাংলায় আবার লিখব। কারণ এ পত্রিকার মালিক আপনি নন। দৈনিক বাংলা আমাদের রক্তে গড়ে উঠেছে। আপনারা এ পত্রিকার দখলদার মাত্র।

অনেকে বলেন, আমি শেখ সাহেব খুন হওয়ার পর আর সরকারের বিরুদ্ধে লিখিনি। আজো আওয়ামী লীগের বন্ধুরা এ কথা বিশ্বাস করেন এবং মানুষকে বলে বেড়ান। এ কথা সত্যি, ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন করার পর ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাকে লিখতে কেউ বারণ করেনি বা বাধা দেয়নি। মনে রাখতে হবে তখন দেশ স্বাধীন হয়েছে সবেমাত্র। আমাদের কলাম নিষিদ্ধ করা বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হাত দেয়া সম্ভব ছিল না এবং ১৯৭৩ সালের আগস্টে সেকালের সরকার পাকিস্তান আমলের প্রেস আইন নামক কালাকানুন বাতিল করেছিলেন। আর ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে জরুরি আইন জারি করার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আমার লেখা বন্ধ করেন। আমি বারবার এ কথা লিখেছি। কিন্তু এক শ্রেণির রাজনৈতিক নেতা এবং সাংবাদিক আজো বলেন—আওয়ামী লীগের আমলে আমার স্বাধীনতা ছিল। তারপর ছিল না এবং লিখিওনি। একথা সত্যি, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত আমার লেখার স্বাধীনতা ছিল। মনে রাখতে হবে আমি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাচিত প্রথম সভাপতি ছিলাম। তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। বাকশাল আইন পাস হওয়ার পর তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে ডেকে নিয়ে জানান—দৈনিক বাংলায় অনিকেত ছদ্মনামে আপনার লেখা আর চলবে না। আপনি চাকরি করবেন—বেতন নিবেন। আপনাকে উপ-সম্পাদকীয় লিখতে হবে না।

www.nagorikpathagar.com

ওই সময় সেখানে তৎকালীন সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। তিনি শেখ সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, উনি তো ভালো লেখেন। লেখা তুমি কেন বন্ধ করবে? শেখ সাহেব বললেন, জানি ভালো লেখে। আর লিখলে ছ'টি এজেন্সির ফোন আসে। আরো লক্ষ করেছি তার লেখার শেষ দিকে হুল থাকে, যা আমাদের লোকদের কাছে সমস্যা। আমি বললাম, এতে কিছু আসে যায় না। আমার কথা আমি লিখি। মহিউদ্দিন সাহেব আবার মুখ খুললেন। বললেন, দেখুন আমরা বাকশাল গঠন করেছি। আপনি বাকশালের বিরুদ্ধে লিখলে আমাদের পক্ষে অসুবিধা হবে। মানুষ আমাদের চেয়ে আপনাকে বেশি বিশ্বাস করে। তাই আপনার লেখা বন্ধ করা প্রয়োজন কিছুদিনের জন্যে হলেও। আমি বললাম, আমার পক্ষে কোনো অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। এবার শেখ সাহেব তাঁর পুরানো কৌশল নিলেন। তিনি হাত জোড় করে বললেন—বলুন তো আমি কে?

আমি বললাম, বর্তমানে রাষ্ট্রপতি। পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। শেখ সাহেব বললেন, রাষ্ট্রপতির অনুরোধ—আপনি তিন মাসের জন্যে লিখবেন না। আপনি চাকরি করবেন—বেতন নিবেন। এ কথা আপনার সম্পাদকও জানবেন না। আমি বললাম, এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ইউনিয়নের সভাপতি।

অবস্থা এমন হলে আমি দৈনিক বাংলা থেকে পদত্যাগ করব। শেখ সাহেব বললেন, ঠিক আছে পদত্যাগ করুন—And join my Government. আমি বললাম, You have chosen a wrong person. I will not join your Government.

শেখ সাহেব চুপ করে থাকলেন। আমি বললাম, আমি আসি। এই বলে রাষ্ট্রপতির কক্ষ থেকে বের হয়ে এলাম। বাইরে এসে দেখলাম সাংবাদিকদের ভিড়। সামনে বাংলাদেশ টাইমস-এর সম্পাদক শহীদুল হক। জিজ্ঞাসা করলেন, কী হলো রে, নির্মল? আমি বললাম, দৈনিক বাংলা থেকে পদত্যাগ করব। চাকরি করব, বেতন নেব, লিখব না, এটা হতে পারে না। শহীদুল হক চিৎকার করে উঠলেন, না নির্মল, তা হয় না। আপনি না থাকলে কেউ থাকবে না। আমাদের কী অবস্থা হবে?

ক্লাবে ফিরে এলাম। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করলাম। রাজনীতির বন্ধুরা বলল—এ পরিপ্রেক্ষিতে দৈনিক বাংলায় চাকরি করা ঠিক হবে না। তবে ইউনিয়নে থাকতে হবে। কারণ সকল রাজনৈতিক দল ভেঙে দেয়া হয়েছে। কথা বলার কেউ নেই। আপনাকে ইউনিয়ন ছেড়ে গেলে চলবে না।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু আমি কী করব? বাকশাল আসছে। মাত্র চারটি দৈনিক থাকবে। তাও ঢাকায়। পরে দু'টি দৈনিক বের হতে পারে। আরো থাকবে শতাধিক সাপ্তাহিক। সিনেমা, বিনোদন পত্রিকা। শত শত সাংবাদিক চাকরি হারাবে। আমি এদের কী জবাব দেব? এখন ইউনিয়ন ছাড়লে বলা হবে নির্মল সেন গোপালগঞ্জের লোক, শেখ সাহেবের লোক। আমাদের বিপদে ফেলে চলে গেছে। নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত নিলাম। পত্রিকা থেকে ছুটি নেব। তারপর দেখব কোথার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? এরপর একটির পর একটি ঘটনা ঘটতে থাকল। একদিন প্রেসিডেন্ট ইউনিয়নকে ডাকলেন পত্রিকা বন্ধ করা নিয়ে। এনায়েতুল্লাহ খান গ্রেফতার হলেন। বন্ধ হলো দ্য পিপল। সম্প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকল। কখনো সে সম্পর্কের আর উন্নতি হয়নি।

নির্দিষ্ট তারিখ মনে নেই। একদিন দুপুরে শুনলাম হঠাৎ সরকার দ্য পিপল পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে প্রথম পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এই পত্রিকাটি পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আমি অবাক হলাম। কারণ সরকারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিল ইউনিয়নকে না জিজ্ঞেস করে কোনো পত্রিকা বন্ধ করা হবে না। কারণ বাকশাল আমলে ওই সব ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে আলোচনার মাধ্যমে।

আমি, গিয়াস কামাল, কামাল লোহানী ও রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ নতুন গণভবনে গেলাম। সন্ধ্যা আসছে। গিয়ে শুনলাম কেবিনেট মিটিং শেষ হয়েছে। মন্ত্রিসভার সকল সদস্য লনে পাঁয়তারা করছেন। আমরা ওখানে পৌঁছালে দেখলাম কেউ তেমন অভ্যর্থনা জানায় না। সবাই চুপ। আমি শেখ সাহেবকে বললাম, আমাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমি বললাম, আপনি পিপল বন্ধ করেছেন কেন? আমাদের সকলকে চমকে দিয়ে তিনি বললেন, Nirmal Sen, You are going far. আমি বললাম—প্রেসিডেন্ট, তাহলে You are a Liar. শেখ সাহেব আরো জোরে বললেন, You are going too far. আমি আবার বললাম, Then You are a Liar. একথা বলে আমি বসতে গেলাম। চারদিকে পিনপতন নিস্তব্ধতা। আমি বললাম, আপনার সাথে কথা ছিল আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনো পত্রিকা বন্ধ হবে না। অথচ আজ দুপুরে আমাদের না জানিয়ে পিপল বন্ধ করা হয়েছে। এবার শেখ সাহেবের গলা চড়া হলো। বললেন, মনসুর, পিপল কি বন্ধ হয়েছে? প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী বললেন, পিপল বন্ধ করা হয়েছে। শেখ সাহেব বললেন, ঠিক আছে, আমি জ্যামাইকা যাচ্ছি। জ্যামাইকা থেকে ফিরে আসার পূর্বে সকলের টাকা

www.nagorikpathagar.com

পয়সা দিয়ে দেব। আমি বললাম, আমি টাকা চাইতে আসিনি, পত্রিকা চাইতে এসেছি। শেখ সাহেব বললেন, ঠিক আছে, আমি ফিরে আসি।

চারদিকে আবছা অবন্ধকার। দূরে বড় কালো গাড়িটার দিকে শেখ সাহেব দাঁড়ানো। দূরে কামাল লোহানীর সঙ্গে দেখা করলেন মনসুর আলী। এ সময় শেখ সাহেব আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন—দেখছেন, পাবনার মানুষ কি ভালো? মনসুর আর লোহানী কথা বলছে। তখন বললাম, হ্যাঁ, হেমায়েতপুরে তাঁদের বাড়ি।

এবার শেখ সাহেব অন্ধকারের দিকে তাকালেন। বললেন, নির্মল সেন সত্যি সত্যি দেশটা গুণ্ডার দেশ হয়ে গেছে। কিছু করতে পারলাম না। আপনি ঠিক বলেছেন, দেশটা হবে গুণ্ডার দেশ। ছোট মামাকে কোলকাতা থেকে না এনে ভালো হয়েছে।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, শেখ সাহেবের মা আমার ছোট কাকাকে ভাই ডেকেছিলেন। সেই সুবাদে আমার ছোট কাকা শেখ সাহেবের ছোট মামা। আমার ছোট কাকা ১৯৬৫ সালে কোলকাতা চলে যান। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে শেখ সাহেব বলেছিলেন, ছোট মামাকে নিয়ে আসুন। আমি বলেছিলাম, তাঁকে আনা ঠিক হবে না। দেশটা হবে গুণ্ডার দেশ। কাকা ভারতের নাগরিক। বিপদ হবে।

এরপরে একটি অদ্ভুত কথা বললেন তিনি। বললেন, নির্মল সেন, আপনি আর কামালের মা আমাকে সমর্থন দিলেন না কোনো ব্যাপারে। কিছু করতে পারল না। দিন দিন অন্ধকার গভীর হচ্ছে। আমার কিছু বলার ছিল না। কারণ শেখ সাহেবের পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠ ছিলাম না। আমি শেখ সাহেবের মৃত্যুর পূর্বে মাত্র দু'দিন তাঁর ৩২ নম্বরের বাসায় গিয়েছি। তবে এ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ছাত্রজীবনে। আমি গিমাডাঙ্গা-টুঙ্গিপাড়া নিম্নমাধ্যমিক স্কুলে পড়েছি। একই শিক্ষক আমাদের পড়িয়েছেন তবে বিভিন্ন সময়ে। আমরা দু'কাকা ওই এলাকায় পাটগাতীতে ডাক্তারি করতেন।

শেখ সাহেবের সাথে আমাকেও ভাবতে হলো বারবার। সত্যি সত্যি আমি কী করব। বাকশাল গঠিত হতে যাচ্ছে। সকল রাজনৈতিক দল ভেঙে দেয়া হয়েছে। একটি মাত্র রাজনৈতিক দল অর্থাৎ বাকশাল থাকবে। এমনি করে থাকবে জাতীয় ছাত্রলীগ, জাতীয় যুবলীগ, কৃষক লীগ। সর্বত্র আওয়ামী লীগ পন্থীদের খবরদারি। সাথে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও জনতা পার্টি। এদেরও খুব পাত্তা দেয়া হবে বলে আমার ধারণা নেই। আমাদের আর কারো রাজনৈতিক অস্তিত্ব থাকবে না।

www.nagorikpathagar.com

তাহলে আমরা বাঁচব কী করে? আমরা কি আত্মগোপন করব? কিন্তু দল তো সেভাবে গঠিত হয়নি। এমনিতেই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের বিপর্যস্ত অবস্থা।

এই তোপের মুখে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। আমি সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা হওয়ায় কিছুটা হালে পানি পাচ্ছি। আমার লেখার জন্যে দেশবাসীর কাছে আমি পরিচিত। সাংবাদিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকায় হয়তো আমার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। ইতোমধ্যে তিন মাসের নোটিশে আমাদের দলের পুরনো অফিস থেকে উৎখাত করা হয়েছে। এরপরে সংসদে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সব দল ভেঙে দেয়া হবে। একটি মাত্র দল থাকবে। এই দলের নাম হবে বাকশাল।

এরপরেও আমার একটা বাড়তি অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব হচ্ছে সাংবাদিক ইউনিয়ন নিয়ে। এই একটি মাত্র ইউনিয়ন দেশ স্বাধীন হবার পর সরকারের কাছে মাথা নত করেনি। কিন্তু এখন কী করবে? সাংবাদিক ইউনিয়ন কোনো জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত নয়। একক এবং স্বাধীন। দেশের আইন মানতে হলে সাংবাদিক ইউনিয়নকে শ্রমিক লীগের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। অথচ মরে গেলেও আমরা অনেকেই শ্রমিক লীগে যাব না, সে কথা সবাই জানে।

কিন্তু আমি কিংবা আমরা শ্রমিক লীগে না গেলেও সাংবাদিকদের সমস্যা থাকবে। এ সমস্যা আমি এড়াব কী করে? তাই একমাত্র বিকল্প পথ হচ্ছে বাকশালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা বা সব কিছু থেকে সরে দাঁড়ানো।

কিন্তু সরে দাঁড়ানো কি সম্ভব? সংবাদপত্রের কয়েক হাজার সাংবাদিক ও কর্মচারী কর্মচ্যুত হবে। তাদের সমস্যার সমাধান কী করে হবে? ভুল করে হোক আর শুদ্ধ করে হোক তখন আমার মতো তিন-চারজন নেতাই সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমার বন্ধুরা আমার ওপর খুবই নির্ভরশীল। আমার বাড়ি গোপালগঞ্জ। শেখ সাহেবের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আমি সরকারের কাছ থেকে কোনো সুযোগ-সুবিধা নিইনি। আমি মন্ত্রীদের সাথে মুখে মুখে তর্ক করি। ফলে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, আমার অধিকাংশ বন্ধুরা আমার ওপর বেশি নির্ভর করত। এ নির্ভরতা আদৌ সঠিক ছিল না।

এছাড়া আমার নিজস্ব একটি রাজনৈতিক দর্শন ছিল। আমি একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য। আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি, বাকশাল একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। বাকশাল একটি রাজনৈতিক আদর্শ। বিকল্প রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে বাকশালকে ঠেকানো যাবে না। এ দায়িত্ব না ইউনিয়নের না রাজনীতিকদের।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু বাকশাল গঠনের পর লক্ষ করলাম কোনো দলই তেমন কথা বলল না। রাজনৈতিকভাবে কেউ বাকশালের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টাও করল না। মনে হলো সকলেই যেন সাংবাদিক ইউনিয়নের দিকে তাকিয়ে আছে। এ ঐতিহ্য দীর্ঘদিন আগের। পাকিস্তান আমলে বিশেষ কারণে সাংবাদিকদের একটি রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল। রাজনৈতিক অঙ্গনে শূন্যতার জন্য সাংবাদিকদের মাঠে নামতে হতো। সেকালে যে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকত সাংবাদিকরা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে তাদের মুখ্য ভূমিকা নিতে হতো। অথচ মুখ্যত এ দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের। কারণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ব্যাহত হলে দেশবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল। তাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলন মুখ্যত রাজনীতিকদের। সাংবাদিকরা সেখানে সহায়ক শক্তি। ভারতেও লক্ষ করা গেছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে মুখ্যত লড়ছে রাজনৈতিক দল। অপরদিকে পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে কোনো কিছু হলেই সাধারণ মানুষ সাংবাদিকদের দিকে তাকিয়ে থাকে। রাজনীতিকদের দিকে নয়। এ প্রেক্ষিতে বাকশাল গঠনের পর বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলো সাংবাদিক ইউনিয়ন।

বাকশাল গঠনের পর মুখ্য হয়ে উঠলো সংবাদপত্রের কথা। দেশে মাত্র ৪টি সংবাদপত্র থাকবে। হাজার হাজার সাংবাদিক কর্মচারী চাকরি হারাবে। এটাই বড় হয়ে দেখা দিল এবং সকলের মুখে একই কথা, দেখি না সাংবাদিকরা কত দূর যায়। অথচ কেউ প্রশ্ন করল না, দেশে একদলীয় শাসন হচ্ছে। রাজনৈতিক দল ভেঙে দেয়া হচ্ছে। বহুদলীয় গণতন্ত্রের যুগ শেষ হচ্ছে। অথচ কোনো রাজনৈতিক দলই মাঠে নামছে না। এমনকি মওলানা ভাসানী পর্যন্ত একটি হুঙ্কার দিচ্ছেন না। কেন? তিনি ডাকলে তো অনেক কিছু হয়। সেই রাজনীতিকরা টু-শব্দটি করলেন না। সকল প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো সাংবাদিক ইউনিয়নকে।

এই পরিস্থিতিতে দেশের প্রেসিডেন্ট ও বাকশালের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ইউনিয়ন নেতাদের সাথে কথা বলবেন। আমার সাথে তখন শেখ সাহেবের সম্পর্ক ভালো নয়। তবু আমাকে যেতে হবে। বন্ধুরা বললেন—আপনি কোনো কথা বলবেন না। সব কথাই আমরা বলব। আপনি কথা বললে শেখ সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে যান। কোনো আলোচনাই এগোয় না। এবার আপনি কোনো কথা বলবেন না।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু ঘটনা সেখানে ঘটল না। আমি নতুন গণভবনে ঢুকতেই শেখ সাহেব বললেন, কেমন আছেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব? আমার পাশেই বসুন। আমি তাঁর পাশে বসলাম। শেখ সাহেব তাঁর কথা শুরু করলেন। তিনি বললেন, বাকশাল গঠন করেছি। ৪টি পত্রিকা থাকবে। পরবর্তীকালে আরো দু'টি পত্রিকা বের করা হবে। কিন্তু সাপ্তাহিক ও মাসিক থাকবে। এসব হবে বিনোদনমূলক কাগজ। চাকরিচ্যুত সাংবাদিক ও কর্মচারীরা নতুন চাকরি পাবে। যতদিন তারা চাকরি না পায় ততদিন তাদের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা সরকার দিয়ে যাবে। তাদের চাকরির ধারাবাহিকতা ও মূল বেতন সংরক্ষণ করা হবে। আপনাদের কাউকে আমি কর্মচ্যুত করতে চাই না।

আমরা চুপ করে শেখ সাহেবের কথা শুনছিলাম। আমার বন্ধুরাও চুপ। আমার সাথে ছিলেন গিয়াস কামাল চৌধুরী, কামাল লোহানী ও রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ। শেখ সাহেব আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, কোনো কথা বলছেন না কেন। আমি বললাম—আমার বলার কিছু নেই। আমি বিএফইউজের সভা ডাকব। এ সভায় কী সিদ্ধান্ত হয় তা আপনাকে জানাব। ব্যক্তিগতভাবে আমার বলার কিছু নেই। আমার কথার প্রতিক্রিয়া হলো। শেখ সাহেব তীব্র কণ্ঠে বললেন—এ দেশে কোনো ইউনিয়ন-টিউনিয়ন নেই। সব বাতিল হয়ে গেছে। আপনাদের ডেকেছি সমস্যা সমাধানের জন্যে। অন্য কিছু বলার অবকাশ নেই। আমি বললাম, আমি যা বলেছি তারচে' বেশি কিছু বলতে পারব না। শেখ সাহেব বললেন, ঠিক আছে, মিটিং করুন। কিন্তু সংবাদপত্রে কোনো বিজ্ঞপ্তি যাবে না। এ কথা যেন মনে থাকে।

বৈঠক শেষ হলো। ফেরার পথে শেখ সাহেবের সচিব আবদুর রহিমের সাথে দেখা হলো। তিনি বললেন, দাদা এটা আপনি কী করলেন? কোনো প্রতিবাদ না করে বঙ্গবন্ধুর কথা মেনে নিলেন? ভোরবেলা থেকে তিনি বড্ড বিচলিত ছিলেন। তিনি বারবার বলেছেন, আমি সকলকে মানাতে পারব। নির্মল সেনকে মানাতে পারব না। নির্মল সেন বাকশাল মানবে না। পত্রিকাও বন্ধ হতে দেবে না। সে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। তাকে নিয়ে কী করব। এই বলে রহিম সাহেব কিছুটা থামলেন। বললেন, কাজটা আপনি ভালো করেননি। আপনিই একমাত্র পত্রিকা বন্ধ ঠেকাতে পারতেন। আমি এর কোনো জবাব না দিয়ে নতুন গণভবন থেকে চলে এলাম।

প্রেস ক্লাবে ফিরে দেখি প্রায় একই পরিস্থিতি। বিদেশি সাংবাদিকরা বসে আছে। সব কথা শুনে তাঁরা বললেন—নির্মল সেন, আপনি ভুল করেছেন। আপনি স্ট্যান্ড নিলে পত্রিকাগুলো বাঁচত। প্রয়োজন হলে আপনি আজই

www.nagorikpathagar.com

ঘোষণা দিয়ে আমরণ অনশন করুন। সরকার আপনার কথা শুনবে।

আমি বললাম—আপনারা বিচ্ছিন্নভাবে শুধু পত্রিকার কথা ভাবলেন। বাকশাল একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও আদর্শ। রাজনীতিকরাই বাকশাল ঠেকাতে পারে। সেই রাজনৈতিক শক্তি আমার নেই। আমি রাজনীতি করি। তাই ব্যক্তিগত অহমিকায় ভুগে কোনো একক সিদ্ধান্ত নেব না। যৌথভাবে ইউনিয়ন যে সিদ্ধান্ত নেয় সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করব। আমি শেখ সাহেবকে কোনো কথা দিয়ে আসিনি। আসছে সপ্তাহ চট্টগ্রাম ইউনিয়নের বৈঠক বসবে। সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হবে না।

আমার সাথে শেখ সাহেবের সম্পর্কের অবনতি ঘটায় অনেকের মন খারাপ। তাদের ধারণা ছিল হয়তো আমি কিছু একটা করতে পারব। কিন্তু এমন বিশ্বাস আমার কোনোদিন ছিল না। শেখ সাহেব আমার অনেক কথা শুনেছেন। কিন্তু বাকশালের ব্যাপারে আমার কথা শুনবার কোনো অবকাশ নেই। বাকশাল একটি রাজনৈতিক দর্শন। এ দর্শনের মূল কথা হচ্ছে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রে পৌঁছানো। এ দর্শন সোভিয়েত ইউনিয়নের তাত্ত্বিক উলিয়ানভের।

এ দর্শনের মূল কথা যে সকল দেশে শিল্প বিপ্লব হয়নি বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়নি, সে সকল দেশে জাতীয় বুর্জোয়াদের সহযোগিতায় এক সরকার গঠন করতে হবে। শিল্প না হওয়ায় শ্রমিক নেতৃত্ব দুর্বল। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো এ দেশে বিপ্লব হবে না। এ জন্যে বলা হয় যে, জাতীয় বুর্জোয়াদের এখনো একটি বিপ্লবী ভূমিকা আছে। তাই প্রগতিশীল শ্রেণির দলের কাজ হবে জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজতন্ত্রের পক্ষে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদন করা। এ রাজনীতি তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি তানজানিয়া, সোমালিয়ায় এ বিপ্লব করেছে এবং শেষ পর্যন্ত এ বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে ইথিওপিয়ায়। এ তত্ত্ব অনুযায়ী রাজনীতির ধরন হচ্ছে একদলীয় গণতন্ত্র। সম্পন্ন হয়েছে ইথিওপিয়ায়। এ তত্ত্ব অনুযায়ী রাজনীতির ধরন হচ্ছে একদলীয় গণতন্ত্র। প্রগতিশীল শ্রেণির সহযোগিতায় দক্ষ একটি রাজনৈতিক, শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র সংস্থা গড়ে তোলা। তার ভিত্তিতে সেকালে বাকশাল গঠিত হয়েছিল। সেকালে এ তত্ত্বের সমর্থনে মোজাফফর ন্যাপ তানজানিয়া, সোমালিয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে বই ছাপাত এবং আমাদের কাছে বিলি করত।

আমার দলের মতে, এ ছিল ভুল, মহাভুল। লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে ভুল শুরু হয়েছিল

www.nagorikpathagar.com

এ হচ্ছে তার শেষ পরিণতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লাল ফৌজের সহায়তায় পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়ে যেন বলা হয়েছিল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে। এবার শান্তিপূর্ণভাবেই সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হবে। শেষ পর্যন্ত ওই একই অগণতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতন্ত্রে পৌছবার দাওয়াই দেয়। তার ফসল বাকশাল। আমাদের মতে, বাংলাদেশে সনাতন ধারার কোনো বুর্জোয়া শ্রেণি গড়ে ওঠেনি। এদের কোনো দলীয় শ্রেণি চরিত্র নেই। এরা মুখ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল। সঙ্কটকালে এরা সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয় নেবে। এদের কাছে বাকশাল ছিল সমাজতন্ত্রের লেবেল। এ লেবেল এঁটে বামপন্থীদের ভাওতা দিয়ে একদলীয় শাসন কায়েম করা। জনতার রোষ থেকে বেঁচে যাওয়া। একই সঙ্গে অন্যান্য দল ভেঙে দেবার অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করা এবং এ কথা প্রমাণিত, কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ, একটা পার্টি ভেঙে যাওয়ায় সেদিনের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের কোনো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছিল না। তখন মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক দলগুলো ছিল নিষিদ্ধ। ফলে বাকশাল হয়ে উঠবে একটি একদলীয় শাসনের স্টিম রোলার। জনগণের আন্দোলন বিপর্যস্ত হবে। এটাই ছিল আমাদের ধারণা। তাই আমার ব্যক্তি বা পরিবারের সম্পর্কের জন্যে শেখ সাহেবের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো থাকবে, এ বিশ্বাস ঠিক ছিল না। তবু শেখ সাহেব নাকি আমার সম্পর্কে বলেছেন, নির্মল সেন একটি আদর্শবাদী রাজনীতি করে। সে বাকশালে আসবে না। তাই ওকে এ অনুরোধ কেউ করবেন না। এ আমার শোনা কথা। তাই আমার কাছে স্পষ্ট ছিল আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নয়, একেবারে রাজনৈতিক। আমার পক্ষে পত্রিকা বাঁচানো সম্ভব নয়। পত্রিকা থাকবে কি থাকবে না তা হবে দলীয় সিদ্ধান্ত। একটি দলীয় সরকারের শাসনে একদলীয় মুখপত্র থাকে। বহুদলীয় পত্রিকা থাকতে পারে না। অথচ আমাদের ইউনিয়নের মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে বহুদলীয় ধারাকে বাঁচিয়ে রাখা। তাই এখানে সমঝোতার অবকাশ কোথায়!

এছাড়া তখন লক্ষ্য করেছিলাম আমার সাথে শেখ সাহেবের বনিবনা হচ্ছে না। তিনি আগে কথা শুনতেন। কিন্তু এখন দেখছি কথা শুরু হলেই তিনি উগ্র হয়ে যান। এর একটা কারণ হলো আমার লেখালেখি, কাউকে তোয়াক্কা না করার ভাব এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল দলের সঙ্গে মতানৈক্য। কারণ আমি সমাজবাদে বিশ্বাসী হলেও মস্কোপন্থী এবং পিকিং দু'দলকে ভুল বলে মনে করতাম। মনে করতাম আমাদের দেশে মস্কোপন্থী পিকিংপন্থীরা নির্ভেজাল মস্কো-পিকিং'র দালালি করছে। সমাজের বারোটা বাজাচ্ছে। ফলে বাম

www.nagorikpathagar.com

রাজনীতির ক্ষেত্রেও তেমন কোনো বন্ধু ছিল না। এক সময় শিল্প এলাকায় আমাদের প্রবল প্রতাপ ছিল। তাও ভেঙেচুড়ে প্রায় নিঃশেষ আওয়ামী লীগ আমলে। তাই রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার প্রায় একক। হাতে একটি কলম, মুখে তীক্ষ্ণ কথা এবং বাকশাল গঠনের প্রাক্কালে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাই আমার পক্ষে আসছিল না।

মাঝখানে শেখ সাহেবের বাবা শেখ লুৎফর রহমান মারা গেলেন। সন্ধ্যার দিকে আমি ও গিয়াস কামাল শেখ সাহেবের বাসায় গেলাম। চারদিকে অনেক লোক। শেখ সাহেবের কাছে দাঁড়ানো তাজউদ্দীন আহমদ, কোরবান আলীসহ অনেক নেতা। শেখ সাহেব কাঁদছিলেন। দূরে আমাকে দেখে গিয়াস কামালকে ডেকে বললেন, নির্মল সেনকে ডেকে নিয়ে আয়। আমাকে বললেন, দেখি এবার নির্মল সেনকে কে বাঁচায়। মা মারা গেছে আগে, এবার বাবা গেলেন। এবার নির্মল সেন বুঝবে শেখ মুজিবুর রহমান কে এবং কেমন। আমি বললাম—তা পরে দেখতে পাবেন, আপনি আজ একি বলছেন? কাছাকাছি সকলে অবাক, বিস্ময়ে চুপচাপ। কারণ এদের কারোরই আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক জানার কথা নয়। এবার শেখ সাহেব কথা ঘোরালেন। বললেন, বাবার লাশের সঙ্গে টুঙ্গীপাড়া যাবেন। মার লাশের সঙ্গে যাননি। এবার যেন ভুল না হয়। শেষ পর্যন্ত আমার লাশের সঙ্গে যাওয়া হয়নি।

চেহলামের দিন টুঙ্গীপাড়ায় গেলাম। সঙ্গে সেনাবাহিনীর তিন প্রধান, হুইপ আব্দুস সামাদ আজাদ ও তাহের উদ্দীন ঠাকুর। শেখ সাহেব আমাকে দেখে ফরিদপুরের ডিসি মোহাম্মদ আলীকে ডাকলেন—বললেন, একটা স্পিড বোট ঠিক করেন, নির্মল সেন কোটালীপাড়া যাবে। আমি বললাম, আমি আপনার স্পিড বোটে যাব না। হেলিকপ্টারে টুঙ্গীপাড়ায় এসেছি তাতেই প্রেস ক্লাবে কথা শুনতে হবে। আমি ঢাকা ফিরে যাব। শেখ সাহেব চুপ করে গেলেন। তিনি বসে আছেন গাজী স্টিমারে। সঙ্গে খন্দকার মোশতাক, আবদুর রব সেরানিয়াবাত, কোরবান আলী এবং অনেকে। ফনি বাবু বললেন, তিনি স্পিড বোটে মাদারীপুরে যাবেন। এর মধ্যে হঠাৎ যেন শেখ সাহেব গর্জে উঠলেন—তাহের ঠাকুর, তুই কোন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী। তুই মোশতাকের সঙ্গে ঘুরিস কেন। তোরে আমি ঠ্যাং পিটিয়ে ভেঙে দেব। তাহের ঠাকুর বললেন, বঙ্গবন্ধু, আমি কুমিল্লার লোক তাই। শেখ সাহেব বললেন, থাম, তুই তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী, মনে থাকে যেন। সমস্ত পরিবেশটা একটু হোঁচট খেল। এর মধ্যেই কথা বললেন খোন্দকার মোশতাক। বললেন, ঠাকুর মনে থাকে যেন তুমি এক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী। শেখ সাহেব আমাকে লক্ষ করে

www.nagorikpathagar.com

বললেন, চলুন বাইরে যাই। আপনি তো সবাইকে চেনেন। আমরা দু'জনেই বের হলাম।

স্টিমারের সামনের দিকে অনেক ছেলেমেয়ের ভিড়। শেখ সাহেব তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন। বললেন, রেনু তোমার কুটুম এসেছে। শেখ সাহেবের স্ত্রী এলেন এবং শেখ সাহেব বললেন, তোমার কুটুম আমার বিরুদ্ধে কাগজে লেখে। তার লেখা বন্ধ করে দিয়েছি। আমি বললাম, প্রধানমন্ত্রী হলে আমিও এরকম লেখা বন্ধ করে দিতে পারতাম। হঠাৎ শেখ সাহেবের স্ত্রী মুখ খুললেন। বললেন, উনি তোমার বিরুদ্ধে তো লেখেন। এ পরিবারের মানুষ তোমার বিরুদ্ধে লিখলে তোমার পক্ষে কি কেউ নেই দেশে? আমরা দু'জনই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। দূরে দেখলাম সাধারণ একজন গ্রামের মানুষের মতো গাজী গোলাম মোস্তফা কাজ করছেন। একেবারে ঘরের মানুষ। তার কোনো বিকল্প নেই। সেদিন এ দৃশ্য না দেখলে এ মানুষটির জীবনের ভিন্ন রূপটি দেখা হতো না। আমি আর খেলাম না। বিকেলে হেলিকপ্টারে ঢাকা ফিরলাম। বাড়ি যাবার সকল প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন হেলিকপ্টারের কমান্ডার ছিল এক প্রিয় ছাত্র। তাকে বললাম, আমাদের বাড়ির উপর একটু দাঁড়াবি। বাড়ি যাওয়া আর হলো না।

সব দল ভেঙে দিয়ে একটি দল বাকশাল গঠন, সকল বৈধ রাজনৈতিক দলকে আত্মগোপন করতে বাধ্য করা এবং আমাদের সাংবাদিকদের বাকশালে যোগদানে বাধ্য করার জন্য অভিযান—কোনোটাই আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হলো না। মনে হতো সারাদেশে একটি অস্বস্তি। কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে।

এ গোলমাল বিস্ফোরিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকা সফরকালে। ভুট্টোর ঢাকা সফর নিয়ে মন্ত্রিসভা একমত ছিল না। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। সকলকেই বলা হয়েছে ১৯৭১ সালের গণহত্যার মূল নায়ক ভুট্টো। ভুট্টোর যা বাসনা ছিল পাকিস্তানে তা সম্ভব ছিল না। তিনি তাই ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য বছরে দু'মাসের প্রধানমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তানের এবং বাকি দু'মাসের প্রধানমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তানে দেবার প্রয়াস নিয়েছিলেন। এ প্রস্তাব কেউ গ্রাহ্য করেনি। তাই ভুট্টোর পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা হবার জন্যে পাকিস্তান ভাঙার প্রয়োজন ছিল। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভুট্টো ছিল ১৯৭১ সালের গণহত্যার সবচে' বড় নায়ক। সেই ভুট্টো পরে ভাঙা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। সেই ভুট্টো বাংলাদেশে আসুক তা জনগণের কাছে কাম্য ছিল না।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু শেখ সাহেব ভেবেছিলেন অন্যভাবে। তিনি পাকিস্তান থেকে ফিরে দেখলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও পাকিস্তানসহ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ বা চীনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে ভারতের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশকে বাঁচতে হচ্ছে। তিনি চাইলেন ভারসাম্য বিধানের জন্যে এবং কাজ শুরু হলো ইসলামি সম্মেলনে যোগদান এবং ভুট্টোর বাংলাদেশ সফরে আমন্ত্রণের মধ্যদিয়ে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের ইসলামি সম্মেলনে যোগদান মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ভালো লাগেনি। পরবর্তীকালে ভুট্টোকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ নতুন প্রশ্নের জন্ম দিতে থাকে। তাহলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কী চান। তিনি কি ভাবতে পারছেন না, ভুট্টো এদেশে এলে কী প্রতিক্রিয়া হবে।

আমার ধারণা শেখ সাহেব ভেবেছিলেন তার নেতৃত্বে মুগ্ধ বাঙালি সবই মেনে নেবে। ভুট্টো নির্বিঘ্নে বাংলাদেশ সফর করে যাবেন এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিনি সাফল্য লাভ করবেন। পাকিস্তানসহ মুসলিম দেশসমূহের স্বীকৃতি পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু ঘটনা সে রকম ঘটল না। ভুট্টোর সফরকালে প্রমাণ হলো সেদিনের বাংলাদেশের একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর কাছে পাকিস্তান ভাঙা কাম্য ছিল না। এরা ইয়াহিয়াকে চায়নি।

এরা গণহত্যার বিরোধী। কিন্তু পাকিস্তান থাকুক, ক্ষমতা পরিবর্তন হোক—এটাই চেয়েছে। এরা হাজারে হাজারে রাজপথে নামল ভুট্টোকে সংবর্ধনা জানাতে। বিমানবন্দর থেকে ফিরতি পথে এরা ভারতীয় হাইকমিশনারের গাড়ি থেকে ভারতীয় পতাকা ছিনিয়ে নিল। ভুট্টোকে অভিনন্দন জানাল পাকিস্তানের পক্ষে স্লোগান দিয়ে। ফলে ভুট্টো ফিরে যাবার দিন জনতা ঠেকাতে বাংলাদেশ সরকারকে রাজপথে পুলিশ নামাতে হয়েছে। জনতা ঠেকাতে কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ করতে হয়েছে।

আমার কাছে এ ঘটনা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু এ বাস্তবতা আদৌ গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। মনে হয়েছে কোনো কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আর এ মুহূর্তে দেশে সরকার একদল গঠন করে সকল জনমত বন্ধ করতে যাচ্ছে। দেশে মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ। তারপর নিষিদ্ধ হলো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতির একটি অংশ বাকশালের নামে। কারণ বাকশালে যোগদানকারী ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং একতা পার্টি ব্যতীত অনেক পার্টি এবং গ্রুপ ছিল যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে। কিন্তু বাকশালে যোগ দেয়নি।

আমার কাছে পরিষ্কার ছিল না কেন শেখ সাহেব এ পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এমনিতে মন্ত্রিসভা থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রধান নেতা তাজউদ্দীন

www.nagorikpathagar.com

আহমদকে বের করে দেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান শক্তি ছাত্রলীগ বিভক্ত এবং এদের সংগ্রামী অংশটি তখন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ নামে বিরোধী শিবিরে। অথচ পাকিস্তান থেকে ফিরে আসা সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং চিহ্নিত পাকিস্তানপন্থী আমলাদের পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। মুখে বলা হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং প্রগতির কথা।

এছাড়া বাকশালে যোগদানকারী অন্য দলের সঙ্গেও যে তেমন আলাপ-আলোচনা ছিল শেখ সাহেবের তা আমার মনে হচ্ছিল না। নিজের তত্ত্বের গরজে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি বাকশালের গেলেও বাকশাল গঠনে যে তাদের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল তাও মনে হচ্ছিল না।

ঠিক এ সময় একদিন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (আজকের হোটেল রূপসী বাংলা) একদিন একটি পার্টিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মনি সিং অর্থাৎ মনিদার সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে আদর করে নির্মল দা ডাকতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী হচ্ছে বলতে পারেন? চেষ্টা করে সংবাদ পত্রিকাটি কি রক্ষা করা যায় না?

আগে উল্লেখ করেছি সরকারি সিদ্ধান্ত হচ্ছে দেশে মাত্র চারটি সংবাদপত্র থাকবে (ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, অবজারভার, বাংলাদেশ টাইমস)। অন্যান্য সকল পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হবে। বন্ধ হবে দীর্ঘদিনের প্রগতিশীল পত্রিকা দৈনিক সংবাদ।

মনি দার কথায় আমি হতভম্ব। আমি বাকশাল বিরোধী। আমার সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। অন্যদিকে সকলের ধারণা কমিউনিস্ট পার্টি বাকশাল গঠনের অন্যতম উদ্যোগী। অথচ মনি দা এ আবেদন আমাকে করছেন। ব্যাপারটা কী? আমি বললাম, মনি দা, বাকশালের তত্ত্ব আপনাদের। এ তত্ত্ব দেশে দেশে অগণতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর জন্যে আপনাদের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব। আপনাদের তত্ত্বে পত্রিকা বন্ধ হচ্ছে। বিপদে পড়েছি আমরা। আর আপনি আমাকে সংবাদ পত্রিকা বাঁচার কথা বলছেন। আপনারা শেখ সাহেবকে বলতে পারেন। একটি পত্রিকা বাঁচলেও আমরা উপকৃত হয়। মনি দা বললেন, দীর্ঘদিন ধরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। চেষ্টা করেও সাক্ষাৎ পাচ্ছি না।

মনি দা'র সঙ্গে আমার কথা শেষ হলো না। অসংখ্য আওয়ামী লীগ নেতা আমাকে ঘিরে ধরলেন। তাদের প্রশ্ন, আপনি জানেন কী হতে যাচ্ছে। কবে আপনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দেখা হয়েছে। আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা হয়েছে। আপনি জানেন না এমন কিছু হতে পারে না।

www.nagorikpathagar.com

আমি অবাক হলাম। সকলের ধারণা আমার বাড়ি গোপালগঞ্জ। তাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আমি দৈনিক বাংলায় অনিকেত ছদ্মনামে কড়া কড়া কথা লিখতাম। তাই নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, একমাত্র এনায়েতুল্লাহ খান ও আমি বাদে তখন সকল কলামিস্টরা তাদের লেখা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখত এবং সে থেকেই ধারণা হতো, আমাকে নিশ্চয়ই শেখ সাহেব সব কিছু বলেন এবং আমার সঙ্গে সব আলোচনা করেন। অথচ আমার সঙ্গে কোনোদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কোনো আলাপ হয়নি। যেমন হয়নি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে। শুধু সকলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার দুর্নাম বা সুনাম নিয়ে আমি সাংবাদিকতা ও রাজনীতি করছি। সেদিন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মনি দা এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ফলে মনে হলো দেশ একটি গভীর সঙ্কটের দিকে এগোচ্ছে। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সকলের আশঙ্কা আছে। কিন্তু কেউ কিছু জানে না। বাকশাল বিরোধিরা ভাবছে এবার সব শেষ। দীর্ঘদিনের রাজনীতি আর করা হলো না। তাই বাকশালপন্থীরাও জানেন না কী হবে, কী হতে পারে। ফলে এক শ্রেণির শিক্ষিত মানুষ বাকশালে যাচ্ছে, যাবার প্রশ্নে প্রথম সারিতে থেকে কিছু সুযোগ সুবিধা পাবার জন্যে। অপর দল যাচ্ছে চাকরির ভয়ে, জীবনের ভয়ে, সম্মানের ভয়ে। সে কী এক মর্মান্তিক জ্বালা! এক অসহনীয় অপমানজনক পরিবেশ।

বাকশালে যোগদানের জন্যে সাংবাদিকদের মধ্যে প্রচারণা তখন তুঙ্গে। বাকশাল একটি রাজনৈতিক দল। এ দলে যোগ দিতে হবে। এটাই ছিল এ প্রচারকদের বক্তব্য। অথচ এ সাংবাদিকরা একসময় আমার সমালোচনা করত, আমি রাজনীতি করি বলে। এরা বলত ইউনিয়ন হবে দল নিরপেক্ষ। ইউনিয়ন কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করবে না। সেকালের পরিবেশে আমিও এ নীতি অনুসরণ করতাম। আমি যতদিন ইউনিয়নের সভাপতি ছিলাম ততদিন দলের কোনো সভা সমাবেশে বক্তৃতা দেইনি, দলের পরিচয়ে কোথাও প্রতিনিধিত্ব করিনি।

আমি শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। আমি সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা বলে দলের নামে কোনোদিন কোথাও একটি বিবৃতি পর্যন্ত দেইনি। সাংবাদিক মহল এ জন্য খুশি ছিল। আমি আমার দলের জন্য কখনো সাংবাদিক ইউনিয়নের পদটি ব্যবহার করিনি। আমি শেষ দিন পর্যন্ত এই নীতি অনুসরণ করেছি।

www.nagorikpathagar.com

কিন্তু বাকশাল গঠন করার পর লক্ষ করলাম একদল অতি উৎসাহী বাকশালপন্থী সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে এরা অনেকেই আওয়ামী লীগের সমর্থক নয়। এদের মুখে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভূমিকা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি আছে। কিছুদিন আগেও এরা ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে বাঘাবাঘা কথা বলেছে। তাদের কথা ছিল কিছুতেই ইউনিয়নে রাজনীতি আনতে দেবে না। দেয়া হবে না।

হঠাৎ করে পট পরিবর্তন হয়ে গেল। এরা বাকশালী হয়ে গেলেন। সাংবাদিকদের বাকশালে যোগ দেয়াতে চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। ভয় দেখাতে লাগলেন। বলতে শুরু করলেন—বাকশালে যোগ না দিলে চাকরি থাকবে না। কারণ চারটি দৈনিক ব্যতীত অন্যান্য সকল দৈনিক বন্ধ হয়ে যাবে। শত শত সাংবাদিক বেকার হয়ে যাবে। তাই তাদের কথায় অনেক সাংবাদিক ভয় পেলেন। বিভ্রান্ত হলেন। বাকশালে যোগ দিতে রাজি হলেন।

অথচ শেখ সাহেবের সঙ্গে ইউনিয়নের ভিন্ন ধরনের কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন রাজনৈতিক পরিচয় নয়, বেকার সাংবাদিক পরিচয়ে সকলকে চাকরি দেয়া হবে। এখানে ভয় বা শঙ্কার কোনো কারণ নেই। আর নব্য বাকশালীরা বলতে শুরু করল, বাকশালে যোগ না দিলে চাকরি হবে না। এরা ইউনিয়নকে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ষড়যন্ত্র শুরু করল।

কিন্তু কেন? বারবার আমি এ কথাটি ভাবতে চেষ্টা করেছি। এ অরাজনৈতিক সাংবাদিকরা কেন হঠাৎ বাকশালের প্রতি অনুরক্ত হলো। কেন হঠাৎ রাজনীতির প্রতি এতো অনুরক্ত হলো। আমার সন্দেহ হলো তাদের নিশ্চয়ই ভিন্ন একটি লক্ষ্য আছে। এ লক্ষ্যটি হচ্ছে আখের গোছানো। নিশ্চয়ই তাদের কোনো মহল থেকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে, সাংবাদিকদের গরু খেদানোর মতো তাড়িয়ে বাকশালে ঢোকাতে পারলে ভবিষ্যতে পুরস্কৃত করা হবে। তাদের নিশ্চয়ই আশ্বাস দেয়া হয়েছিল, তাদের চাকরির আর অভাব হবে না। প্রয়োজন হলে তাদের ওই পদে নিয়োগ করা হবে। তারা তাদের দালালির পুরস্কার পাবে।

পরবর্তীকালে আমার এ অনুমানই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। বাকশাল গঠনের প্রাথমিক পর্ব শেষ হবার পর শুনেছিলাম এদের অনেককেই তথ্য দফতর ও টেলিভিশনে উচ্চপদ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল এবং ৭২-এর সরকার পরিবর্তনের পর এদের অনেকের প্রতিশ্রুত চাকরি দেয়ার জন্য আমি তদবির করেছি। তথ্য দফতরে কর্মকর্তাদের প্রতিবাদের জন্য এরা তথ্য

www.nagorikpathagar.com

দফতরে চাকরি পাননি। তবে কেউ কেউ চাকরি পেয়েছিলেন টেলিভিশনে শুল্ক বিভাগ বা থানায় সার্কেল অফিসার হিসেবে। এদের মধ্যে অনেকেই এখন প্রচুর অর্থের মালিক। সুতরাং যারা সেদিন বাকশালে যোগ দেয়ার জন্য ভীত সাংবাদিকদের বাধ্য করেছিলেন তাদের আদর্শ ছিল ব্যক্তি স্বার্থ, নিজের মঙ্গল ও অন্য কারো মঙ্গল নয়। আবার এদের অনেকেই শেখ সাহেবের মৃত্যুর পর নিজ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

এখন আবার পূর্বের কথায় ফিরে যাই। বাকশালে যোগ দেয়ার হিড়িকের সময় ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের একটি বৈঠক বসে। এ বৈঠকের আলোচ্যসূচি ছিল বাকশালে যোগদান প্রসঙ্গে। প্রশ্ন উঠেছিল সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্যরা বাকশালে যোগ দেবে কিনা। একদল সাংবাদিক যখন বাকশালে যোগ দেয়ার পক্ষে তখন অন্য সাংবাদিকরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। তাঁরা স্বাভাবিকভাবে ইউনিয়নের কাছে মতামত চান।

কিন্তু এ ব্যাপারে ইউনিয়ন কী সিদ্ধান্ত নেবে? ইউনিয়ন কোনোদিন এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি। ইউনিয়নের সদস্যরা বিভিন্ন দলের সদস্য হতে পারে। আর সাংবাদিক ইউনিয়ন কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন নয়। সুতরাং এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার ইউনিয়নের ছিল না। কিন্তু এমন পরিস্থিতিও আমাদের দেশে কোনোদিন সৃষ্টি হয়নি এবং হয়নি বলেই এ পরিস্থিতিতে ইউনিয়নকে বৈঠকে বসতে হয়েছিল।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ সাংবাদিকদের মধ্যে সবচে' বড় ইউনিয়ন। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন। সুতরাং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের মতামত ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কী করার ছিল ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের। তখনো এ ব্যাপারে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সর্বশেষ বৈঠক বসেনি। কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। এছাড়া কে কোন দলে যোগ দেবে সে ব্যাপারে সাংবাদিক ইউনিয়নে কিছু বলার আছে আমি মনে করি না। কারণ আমিও সাংবাদিক ইউনিয়নের মতামত নিয়ে শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলে যোগ দেইনি। তবে আমি জানি সেদিনের পরিস্থিতিতে আমার এ বক্তব্য ছিল একান্তই একাডেমিক। সমস্যা এড়িয়ে যাবার কথা।

তবে যদি আমরা বন্ধুরা উৎসাহী হয়ে বাকশালে যোগদানের জন্য সাংবাদিকদের বাধ্য না করতাম তাহলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। অন্যান্য সংগঠনের মতোই সাংবাদিক ইউনিয়নের নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যতদূর সম্ভব কাজ চালিয়ে যেতাম। কিন্তু সংকট সৃষ্টি করেছিল আমাদের সেই

www.nagorikpathagar.com

স্বার্থপর সুবিধাবাদী বন্ধুরা। নিজের আখের গোছাবার জন্য তারা ইউনিয়ন এবং সমগ্র সাংবাদিক সমাজকে ঠেলে দিয়েছিল নৈরাজ্যের দিকে। এদের ব্যক্তিস্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল সাংবাদিকরা। কারণ এ সমস্যা শুধু সাংবাদিকদের নয়। বাকশাল গঠনের পর সকল ইউনিয়নকে এ সমস্যায় পড়তে হয়। কিন্তু কোনো ইউনিয়নের সদস্যকে ভয় দেখিয়ে বাকশালে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়নি। তাদের কেউ বলেনি, বাকশালে যোগ না দিলে তাদের চাকরি থাকবে না বা তাদের জীবন বিপন্ন হবে। অথচ এ ধরনের একটি প্রচারণা চালানো হয়েছিল সাংবাদিকদের মধ্যে। একটি মহলের ধারণা এই কর্মকাণ্ডের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইউনিয়নকে ভাঙা। সেদিনের সরকার কখনোই ইউনিয়নের নেতৃত্ব মেনে নেয়নি। সরকারি মহল থেকে বলা হতো দেশে দু'টি সরকার চালু আছে—একটি গণভবনে, অপরটি প্রেস ক্লাবে। গণভবনের কোনো নির্দেশই প্রেসক্লাব অর্থাৎ সাংবাদিক ইউনিয়ন মানে না। প্রতিরোধ করে। এ মহলের আশঙ্কা সাংবাদিক ইউনিয়ন হয়তো বাকশাল মানবে না। সাংবাদিক ইউনিয়ন বাকশাল না মানলে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। এই হিসাব থেকে সেকালের সরকার প্রথমেই সাংবাদিক ইউনিয়নকে আঘাত করেছিল। তারা মনে করেছিল সাংবাদিক ইউনিয়ন বাকশাল মেনে নিলে প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করার কেউ থাকবে না। কারণ ইতোমধ্যে কেউ প্রকাশ্যে বাকশাল গঠনের বিরোধিতা করেনি। সকল রাজনৈতিক দল ছাত্র, কৃষক, মহিলা সংগঠন ভেঙে দেয়া হয়েছে বাকশালের মাধ্যমে। একমাত্র বাকি সাংবাদিক ইউনিয়ন। সাংবাদিক ইউনিয়নকে শায়েস্তা করতে পারলে প্রকাশ্যে প্রতিরোধ করার মতো আর কেউ এ দেশে থাকবে না। আমারও ধারণা এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়া তখন সাংবাদিক ইউনিয়ন ভাঙার জন্য ন্যক্কারজনক উদ্যোগ নেবার কোনো কারণ ছিল না। তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেননি যে এ ধরনের ছলে-বলে-কৌশলে ছাগল-ভেড়ার মতো সাংবাদিকদের ধরে কোনো দলে ঢোকালে সে দল আদৌ সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে না। এ পরিস্থিতিতে সেদিন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাকশালে যোগ না দেয়ার। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত কাজে আসেনি।

সাংবাদিক সমাজ আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মতো ত্রিধারায় বিভক্ত। স্বাধীনতার ৪০ বছর পর আজ বড্ড জানতে ইচ্ছে করে শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে তরুণরা যুদ্ধে গিয়েছিল, তাদের অনেকেই আজ রাষ্ট্রক্ষমতায়— সরকারের অংশ। কেউ

www.nagorikpathagar.com

কেউ এর আগে বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু যে চেতনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সেই শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ কি আমরা এই ৪০ বছরে পেয়েছি? কিংবা বর্তমান অবস্থা ও বাস্তবতায় তা পাওয়ার সম্ভাবনা আদৌ আছে কি? আর কত পথ হাঁটলে ধরা দেবে আমাদের স্বপ্নের সেই সোনার হরিণ?

পাঠক, আপনাদের কাছেই ছেড়ে দিলাম এ প্রশ্নের উত্তর। আপনারা বুঝে নিন। বেছে নিন। আমি এখন 'ক্লান্ত প্রাণ এক'।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একটি ইত্যাদি প্রকাশনা

ISBN 984 70289 0238 8
9 847028 902388